

শিখণ্ডিবাহন দেখিলেন, মহাশ্বেতার ব্রত-
ভঙ্গের চেষ্টা করা বুঝা, অগ্নিরাশিতে জল-
বিন্দু নিক্ষেপমাত্র ;—বলিলেন, “তবে আমি
পিতাকে এই সকল বুভুক্ষু বলিব ?”

মহাশ্বেতা উত্তর করিলেন, “হাঁ, বলিবেন
যে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত সন্নিকট, নরঘাতকের
দণ্ড সন্নিকট । রাজা টোডরমল্ল তৃতীয়বার
বঙ্গদেশে আসিয়াছেন ; তাঁহার যুদ্ধকাষা
শেষ হইলে সমরসিংহের বিধবা তাঁহার
নিকট সমরসিংহের বধের জন্ত বিচার
প্রার্থনা করিবে । পিতাকে বলিবেন যে,
পক্ষিধাবক ব্যাধ কড়ক আহত হইলে আপ-
নার যাতনায় ক্রন্দন করিয়া প্রাণত্যাগ করে,
কিন্তু মানিনী ফণিনী পদাহত হইলে আঘাত-
কারীকে দংশন করিয়া হবে, হেলায় প্রাণ-
ত্যাগ করে !

বলিতে বলিতে মহাশ্বেতা আসন ত্যাগ
করিয়া সমস্যা দাড়াইয়া উঠিলেন । মহা-
শ্বেতার সমস্ত শরীর কম্পিত ও কটকিত !
তিনি গহের দ্বার উল্লসিত করিলেন ;
প্রভাতের আলোকচ্ছটা তাঁহার কঙ্কিত
ললাটে পতিত হওয়ায় তিনি চমকিয়া উঠি-
লেন । দেখিলেন, বৃক্ষের অগ্রভাগ তরুণ
অরুণকিরণে স্বেৰ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে, ডালে
ডালে নানা পক্ষী নানা রঙ্গে নানা গান
করিতেছে ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

সরলা ও অমলা ।

Wei Hernia, like two artificial goods,

Have with our needles created both one

flower

Both on one sample, sitting on one

Both, warbling of one song

As if our hands, our sides,

Had been incorporate, so we

Like to a double cherry see

And yet a union in partition

Two lovely berries moulded

বৃক্ষশাখা হইতে পক্ষিগণ
অনেক পূর্বেই সরলা গাে
গৃহকাষ্যে নিযুক্ত হইল ; ঘর,
সকল পরিষ্কার করিল ।
করিবেন, রাজকুমারীণ কি এ
সাজে ? সরলা যে রাজকুমারী
জানিত না । পিতার মৃত্যুর
বয়স্ক বালিকা ছিল, তখনক
একেবারে বিস্মৃত হইয়া
মাতাও এ কথা তাহাকে কহ
তাহার বালিকা-হৃদয়ে অজ
মানের লেশমাত্র ছিল না
বাস করিয়া মাতাকে
পত্নীদিগের সহিত অলাপ
ইহা অপেক্ষা উচ্চাভিলাষ ত
করণে তখন স্থান পাইত না

গৃহাদি পরিষ্কার করিয়া

লইয়া নদীতে স্নান করিতে
দিনই সূর্যোদয়ের পূর্বে তা
পন হইত । পথিমধ্যে এ
দাড়াইয়া মৃদুস্বরে ডাকিল,
উত্তর দিল না । পুনরায়
অমলা । ” “বাইলো ! ” এই
ভিতর হইতে কে উত্তর দিল ।
এক পঞ্চদশবর্ষীয়া, প্রখরনয়না

এক রাঙ্গাপেড়ে শাড়ী, কক্ষে কলস, হাতে শাখা, পায়ে মল । আসিয়াই সরলার চুল ধরিয়া টানিয়া চিম্টা কাটিয়া বলিল, “তোমর যেমন আক্কেল! আমার ঘরে বুদ্ধ স্বামী, আমাকে কি এত ভোরে আসিতে দেয়? তোমর কি বল, যা বিবাহ দিলেন না, সমস্ত রাত্রি ভাবনায নিদ্রা হয় না, প্রভাত হইতে না হইতে ঘর হইতে বাহির হইতে পারিলে বাচিস্।” এই বলিয়া আবার সরলাকে চিম্টা কাটিল ও হাসিতে হাসিতে গাল টিপিয়া দিল।

সরলা বলিল, “সই, তুমি আমাকে আসিতে বল, তাই আমি ডাকিতে আসি?”

অমলা। তা না হইলে আসিতে না?

সরলা। আসিতাম ।

অমলা। কেন আসিতে?

সরলা। তা আমি জানি না। সকালে উঠিয়াই তোমার মুখখানি মনে পড়ে। যদি একদিন তোমায় না দেখি, তা হ'লে আমার সমস্ত দিন কাঁজক্ষে মন থাকে না।

অমলা প্রেমপূর্ণলোচনে সরলার মুখখানি নিরীক্ষণ করিল, বালিকার মুখখানিও প্রেম-রাশিতে উলমল করিতেছে। ক্ষণেক পরে অমলা বলিতে লাগিল, “সই, আর শুনেছ—জমীদারের কাছারীর নতুন খবর শুনেছ?”

সরলা। না, কি খবর?

অমলা। আমাদের জমীদার নাকি এক বড় বরের মেয়ের সঙ্গে তাঁর ছেলের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন, মেয়ে নাকি বড় রূপসী, রূপ যেন বিদ্যুতের-মত, আর চক্ষু দুটি যেন—

—যেন—দুটি কালো কালো জয়রাম-মত।

সরলা। তার পর?

অমলা। তার পর সম্বন্ধ স্থির হইলে আমাদের জমীদারের ছেলে নাকি বলিলেন, “আমি ও মেয়েকে বিবাহ করিব না।”

সরলা। কেন?

অমলা। কেন, তা জানি না, শুনিয়াছি, কোন পল্লীগামে কোন এক গরীব মেয়েকে দেখিয়া মন হারাইয়াছেন। তা সেই মেয়েকে বিবাহ করিবার জন্য নাকি গৃহত্যাগী হইয়াছেন। আমার সইকেই বা দেখিয়া থাকিবেন।

সরলা। তামাসা কর কেন সই? আচ্ছা, বাপ বলিতেছেন একজনকে বিবাহ করিতে, ছেলে আর একজনকে বিবাহ করিবেন?

অমলা। তা বার থাকে মনে ধরে, বাপ যাহাকে বিবাহ করিতে বলেন, তাহাকে যদি মনে না ধরে?

সরলা। কেন ধরবে না?

অমলা। “তুই যেমন হাবা, তোকে আর কত শিখাব। বলি, মাঝে বন্ বিবাহ দিতে, তাহা হইলে সব শিখবি।” এই বলিয়া আবার সরলার গাল টিপিয়া দিল।

এই প্রকার কথোপকথন করিতে করিতে উভয়ে নদীর ঘাটে উপস্থিত হইল। নদীর তীরে ঘাইয়া এক অশ্রুপূর্ণ দর্শন দৃষ্ট হইল। তথায় নিবিড় রক্তবর্ণী, দীর্ঘায়তা, ছিন্নবসনা এক স্ত্রীলোক দণ্ডায়মান আছেন। তাহার গলদেশে অক্ষমালা, হস্তে দণ্ড, শরীরে তাম্র, চক্ষু রক্তবর্ণ ও ঘূর্ণায়মান। দেখিয়া দুই জনই বিস্মিত হইল। অমলা জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কে গা?”

সে উত্তর করিল, “আমার নাম বিবেশ্বরী পাগলিনী।” অমলা বলিল, “হাঁ হাঁ, আমি বিপু পাগলীর নাম শুনিয়াছি। তুমি আগে এ গ্রামে একবার আসিয়াছিলে না?”

বিবেশ্বরী। আসিয়াছিলাম।

অমলা। তুমি না হাত দেখিতে জান?

বিবেশ্বরী। জানি।

অমলা। আচ্ছা, আমার হাত দেখ দেখি? পাগলিনী হাত দেখিয়া ক্ষণেক পরে বলিল, “তুমি দেওয়ানের ঘৃণিণী হইবে।”

অমলা। দূর পাগলী! আমার স্বামী বর্তমান; বলে কি না দেওয়ানের দ্বী হবে। আমার দেওয়ান উজীরে কাজ নাই, আমার বৃদ্ধ স্বামী বাঁচিয়া থাকুক। এখন বল দেখি, আমার সহায়ের কবে বিবাহ হবে? বিবাহের ভাবনায় সহায়ের রাত্রিতে ঘুম হয় না।

পাগলিনী অনেকক্ষণ সরলার হস্তধারণ-পূর্বক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে তাহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল, আবার হস্ত দেখিতে লাগিল। অনেক-ক্ষণের পর বলিল, “তোমার ভবিষ্যৎ আকাশ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন; কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশি ও ঘোর অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। সম্প্রতি তুমুল প্রলয় উপস্থিত। তাহার পর কি আছে, বলিতে পারি না। তিন দিনমধ্যে বড় আসিবে, অগ্নি এ গ্রাম হইতে পলায়ন কর, পলায়ন কর, পলায়ন কর।”

সরলা ভীত হইল। অমলা প্রিয়সখীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া পাগলিনীকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিল, “ধান ভানিতে শিবের গীত! আমি কি না জিজ্ঞাসা করিলাম, সহায়ের বিবাহ হইবে কবে, উনি আকাশ, মেঘ, প্রলয়ের কথা আনিলেন। দাঁড়া তো আমি পাগলীকে জন্ম করি।”

এই বলিয়া অমলা পাগলিনীর গায়ে জল দিতে লাগিল, পাগলিনী ধীরে ধীরে চলিয়া গেল; দূরে যাইয়া পুনরায় সরলার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিল, “পলায়ন কর, পলায়ন কর, পলায়ন কর!”

এ দিকে অস্ফুট কুমকপত্নীগণ আসিয়া ঘাটে উপস্থিত হইল। স্বামী, স্বামী, স্বামী, নৃত্যের বো, হরির মা ইত্যাদি অনেক গ্রাম্য স্কন্দরী আসিয়া ঘাট আগো করিয়া বসিল; নানাপ্রকার কণ্ঠ্যবাহা ও রঙ্গরসে ঘাট

জমকাইয়া তুলিল। ইচ্ছামতী নদী এত সৌন্দর্যের ছটা দেখিয়া আনন্দে ফীত হইয়া কল কল শব্দে প্রবাহিত হইতে লাগিল; গ্রাম্য স্কন্দরীরাও আনন্দে কল-কল শব্দে গল্প আরম্ভ করিল। গল্পের মধ্যে অল্পবয়স্কারা স্বামীর কথা ও প্রাচীনরা পর-নিন্দার কথা আনিল। সরলা ও অমলা কলসে জল লইয়া নিজ নিজ গৃহে আসিল।

অমলার স্বামী বিহিত পাঠক অগ্রেই পরিচিত হইয়াছেন। নবীন দাস জাতিতে কৈবর্ত, সে গ্রামে একজন মহাজন ছিল ও অনেক প্রকার ব্যবসাও করিত। তাহার স্বভাব অতি সন্তুষ্ট ও সরল। তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় সঙ্গতিও ছিল। প্রায় একশত বিঘা জমী, ২০১২৫ টা গরু, ১৫ খানা লাঙ্গল ও বাটির মধ্যে আট দশটা গোলা ছিল। আর লোকের মুখে এমনও শুনা যাইত যে, নগদ কিছু টাকা মাটিতে পুতিয়া রাখিয়াছিল। ইহা ভিন্ন আপন পত্নীকে অনেক গহনাও দিয়াছিল। প্রথম পক্ষের দীর্ঘমুতুর পর প্রায় ৩৫ বৎসর বয়সের সময় দশমবর্ষিয়া অমলাকে বিবাহ করে। এখনও বৃদ্ধ হয় নাই, কিন্তু অমলা উপহাস করিয়া তাহাকে “বৃদ্ধ স্বামী” বলিয়া ডাকিত। অমলা স্নেহবতী ভাব্যা, কিন্তু অত্যন্ত রসিকা। “বৃদ্ধ স্বামীর” সেবাশুক্র্যা করিত, কিন্তু দিবারাত্রি উপহাস করিতেও ক্রান্ত থাকিত না। এ প্রকার পত্নী পাইয়া “বৃদ্ধ স্বামীর” স্নেহের ও স্নেহের সীমা ছিল না।

সরলার কদম্বপুরে আগমন অবধি অমলা তাহাকে আপন সোদরা অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিত, প্রাণের অপেক্ষা অধিক বাসিত, দুঃখের সময়ে সরলার বালিকা-মুখখান দেখিয়া সকল

বারে ভুলিয়া যাইত, সুখের সময়ে সরলার প্রেমপূর্ণ চক্ষু দুইটি দেখিতে পাইলে সুখ দ্বিগুণ হইত। ছয় বৎসরকাল একত্র থাকিয়া তাহাদের স্নেহ বর্ধিত হইয়াছিল, ভালবাসার শেষ ছিল না। সরলা সময় পাইলেই অমলার নিকট যাইত, অমলা অবকাশ পাইলেই সরলার নিকট আসিত। কত দিন তাহারা দুইজনে মধ্যাহ্নে একটি বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া কোন কার্যে নিযুক্ত থাকিত, কত দিন রাত্রি দুই প্রহর পর্যন্ত দুই জনে নিভৃত স্থানে বসিয়া গল্প করিত। দুই জনের বিচ্ছিন্ন হইবার ইচ্ছা নাই, স্তব্ধতা সে গল্পেরও শেষ নাই। ফলতঃ, তাহাদিগের শরীর বিভিন্ন হইলেও একই মন, একই প্রাণ, একই হৃদয় ছিল।

সরলা বাটী আসিয়া দেখিল, মাতা ও ব্রহ্মচারী ঘর হইতে বাহির হইলেন। সরলা বলিল, “মা, সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাও নাই?”

মহাশ্বেতা। না মা, ব্রহ্মচারীর সহিত কথা কহিতেছিলাম, কথায় কথায় সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। তোমার আজ ঘাট হইতে আসিতে বিলম্ব হইয়াছে, সূর্য্য উঠিয়াছে।

সরলা। হাঁ মা, আজ ঘাটে বিশু পাগলী নামে এক স্ত্রীলোক আসিয়াছিল।

এই বলিয়া সরলা সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিল। তাহার মাতা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। বিবেচনারী পাগলিনীর জন্ত অনেক অন্বেষণ করাইলেন, কিন্তু তাহাকে আর দেখা গেল না।

সন্ধ্যাকাল সমাগত। মহাশ্বেতা দৈনিক রীতাহুসারে স্নানার্থ গমন করিলেন। ফুটরে সরলা একাকিনী কাজ করি চলে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমজনিত ক্লান্তিবশতই হুটক বা অনেকক্ষণ একাকিনী বলিয়াই

হুটক, সরলার মূখমণ্ডল যেন কিছু য়ান বোধ হইতেছে, সন্ধ্যার ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন সরলার হৃদয়ে ছায়া ঘনীভূত হইতেছে। চিন্তা কিছুই নাই, দুঃখ কিছুই নাই, তথাপি হৃদয় আকাশ যেন অল্প অল্প মেঘাচ্ছন্ন হইতেছে। ভবিষ্যতে কোন ভয় নাই, স্মৃতিতে কোন পরিতাপ নাই, অথচ হৃদয় আপনা হইতেই ভারগ্রস্ত। সম্মুখে চরকা ঘুরিতেছে, ললাটে দ্বিবৎ ঘর্ষবিন্দু দেখা যাইতেছে, সরলা একাকিনী বসিয়া কার্য্য করিতেছে ও অতি মুহূর্ত্তেরে এক একবার গান করিতেছে। অতি মুহূর্ত্ত গুণ গুণ শব্দে একটি খেদের গান এক-বার, দুইবার, তিনবার সাজ হইল, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল, “সরলা!”

যিনি ডাকিলেন, তিনি একজন যুবা-পুরুষ, বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর হইবে। মূখমণ্ডল অতি সুশ্রী, ঔদার্য্যবাহুল্য, বিস্তৃত দ্বিবৎ গম্ভীর ও য়ান। কেশবিজ্ঞাসে কিছুই বহু নাই, স্তব্ধতা নিবিড় কৃষ্ণকুল অধুনা মালিন্য প্রাপ্ত হইয়া মূখমণ্ডল কিঞ্চিৎ আচ্ছন্ন করিতেছে। চক্ষুঃ সমস্ত জ্যোতিঃপূর্ণ, কিন্তু দারিদ্র্য অথবা দুঃখ অথবা চিন্তায় চতুষ্পার্শ্বে কালিমা পড়িয়াছে। ললাট প্রশস্ত, বক্ষঃস্থল আয়ত, বাহুযুগল দীর্ঘ, শরীর গম্ভীর ও শান্ত, অথচ তেজোবান্ধব। আকৃতি দেখিলে সহসা বীরপুরুষ বলিয়া বোধ হয়। যতক্ষণ গীত হইতেছিল, আগন্তুক নিম্পন্দশরীরে পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিলেন ও অনিমেঘলোচনে সরলার প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। বোধ হয়, যেন সরলার শোকাবহ গানে আগন্তকের হৃদয়ে কোন শোকচিন্তার উদ্রেক হইয়াছিল। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া যুবক সরলার নাম উচ্চারণ করিলেন,—“সরলা!”

সরলা হঠাৎ পশ্চাতে দেখিয়া চমকিত হইয়া বলিল, “ইন্দ্রনাথ?”

ইন্দ্রনাথ। সরলা! তোমার সংসারে কি এতই বৈরাগ্য হইয়াছে যে, এরূপ শোকাবহ গান গাহিতেছ?

সরলা। “না, আমি মনে কিছুই ভাবি নাই, আমার মনে কোন ভাবনাই নাই, তবে আমি ঐ একটি ভিন্ন আর গান জানি না। সেই জন্ম আমি ঐটি বার বার গাহিতে-ছিলাম। সেই আমাকে অনেক গান শিখাইয়াছিল, তাহার মধ্যে আমার কেবল ঐটি মনে লাগে। যখন একলা থাকি, তখন বসিয়া বসিয়া গাই। আমি কি জানি যে, তুমি লুকাইয়া শুনিতেছ?” এই বলিয়া সরলা মুখ নত করিল, —ক্ষণেক পর আবার বলিল, “মা পূজা করিতে গিয়াছেন, আমাদের দাসী হাটে গিয়াছে, সেই জন্ম আমি একলা বাড়ীতে আছি।” কুমি বস, দাসী এখনই আসিবে।”

এতক্ষণ একাকিনী থাকিয়া সরলা স্নেহপূর্ণ মনে হইয়াছিল, চিরপরিচিত বন্ধুকে অনেক দিন পরে দেখিয়া সেইরূপ আগ্রহ ও আনন্দের সহিত কথাবার্তা কহিতে লাগিল। সরলার কি কথা? সরলচিত্ত বালিকার যে কথা, সরলা সেই কথাই কহিতেছিল। কখন মাতার কথা কহিতেছিল, কখন আপন কার্যের কথা কহিতেছিল, কখন ক্ষুদ্র উচ্চানে লইয়া গিয়া আপনি যে পুষ্পচারা রোপণ করিয়াছিল, তাহাই দেখাইতেছিল। ইন্দ্রনাথ আগ্রহপূরক তাহাই শুনিতে ও দেখিতে-ছিলেন। ক্রমে ক্রমে নিবিড় বৃক্ষাবলীর ভিতর দিয়া পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল। প্রথমে আকাশ সুরবর্ণ-বর্ণ হইয়া আসিল, ক্রমে ক্রমে বৃক্ষপত্রের ভিতর দিয়া উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রের আলোক দেখা যাইতে লাগিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্র উচ্চে আরোহণ করিয়া নীল

আকাশে স্বর্ণ-আলোক বিস্তার করিল। সে আলোক সরলার সুগোল শরীর প্রাণিত করিল, সুন্দর বদনমণ্ডলের কিশোরভাব বর্দ্ধন করিল, সুহাসপরিপূর্ণ ওষ্ঠদ্বয় আরও মধুরিমাময় করিল, শান্তজ্যোতিঃ নয়নদ্বয় স্নেহরসে আধ্রুত করিল। ইন্দ্রনাথেরও মুখে কথা নাই; স্নেহনয়নে সেই সুরবর্ণ-পুষ্প-লীর দিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, সেই নিবিড় কৃষ্ণকুন্তল, সেই স্নবক্ষিম ক্রয়গল, সেই প্রেম-প্রাণিত নয়ন, সেই স্নিতমধুর ওষ্ঠাধর, সেই যৌহন মুগমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, “সরলা!”

ইন্দ্রনাথের গম্ভীরস্বরে সরলা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল; দেখিল, তাঁহার স্নানমুখ আরও স্নান হইয়াছে।

ইন্দ্রনাথ পুনরায় বলিলেন, “সরলা! বোধ হয়, তোমার সহিত আমার এই শেষ দেখা।” সরলার প্রফুল্ল-নয়নে এক বিন্দু জল আসিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, “কেন, তুমি কি আর রত্নপুরে থাকিবে না?”

ইন্দ্রনাথ। না। আমি আর রত্নপুরে থাকিব না; কারণ বোধ হয় তুমি পরে জানিতে পারিবে।

সরলা। কেন, তোমার এ গ্রামে থাকিতে কোন ক্লেশ হইতেছে? তুমি কেন আমাদের বাড়ী থাক না? আমি মাকে বলিলে সম্মত হইবেন। আমাদের যাহা সামান্য আয় আছে, তাহাতে তোমার এখানে কোন কষ্ট হইবে না, স্বচ্ছন্দে থাকিবে।

ইন্দ্রনাথ। সরলা, তোমার দয়ার শরীর, তোমার স্নেহ অসীম। কিন্তু আমার থাইবার কষ্ট কিছুই নাই, আমি নবীন দাসের বাড়ীতে অতিথি হইয়া আছি, তোমার সহি আমাকে বিশেষ যত্ন করেন, তাহা ত তুমি জান। এখানে স্থান না হইলেও আমার

থাকিবায় অল্প স্থান আছে। আমি অল্প কারণে গ্রাম ত্যাগ করিতেছি।

সরলা। নিতান্তই কি গ্রাম ত্যাগ করিতে হইবে ?

ইন্দ্রনাথ। সরলা, আমি চলিয়া গেলে কি তোমার মনে কষ্ট হইবে ?

সরলা। কষ্ট হইবে না ? আমাদের আর কে আছে বল ?

ইন্দ্রনাথ। সরলা ! তোমার মনের কষ্ট দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, কিন্তু আমি কোনও প্রকারে আর এ গ্রামে থাকিতে পারি না। সরলা, বিদায় দাও ; যদি বাচিয়া থাকি, যদি কার্য্য সিদ্ধ হয়, পুনরায় দেখা করিব ; না হয়, এই শেষ।

ইন্দ্রনাথের মুখ হইতে আর কথা বাহির হইল না। সরলার প্রশান্ত নীলোৎপলসদৃশ চক্ষুতে অশ্রু টল টল করিতে লাগিল। সরলা ইন্দ্রনাথকে ভ্রাতার মত ভালবাসিত, তাহা ভিন্ন অল্প কোন প্রকার ভালবাসা আপন হৃদয়কোরকে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা জানিত না ; বিদায় দিতে এমন যাতনা হইবে, তাহা জানিত না।

সেই পৌর্ণমাসী রজনীতে, সেই নিভৃত উত্তানে, উভয়ে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া উভয়ের হস্তধারণ করিয়া, পরস্পরের বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ; পরস্পর-দর্শন-স্বধা সন্তুষ্কনয়নে পান করিতে লাগিলেন ; পরস্পরের বদনমণ্ডল দেখিয়া হৃদয়ের যাতনা কিছু কিছু প্রশমিত করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে ইন্দ্রনাথ স্নেহভরে সরলার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া, আশ্বাস দিয়া বলিলেন, “সরলা, আমি ধর্ম্মের গৌরবের জন্ত, পাপের দণ্ডের জন্ত যাইতেছি। ভগবান্ আমাকে অবশ্যই সাহায্য করিবেন। যদি

তিনি সাহায্য করেন, তবে কাহাকে ভয় ? অবশ্যই কৃতকার্য্য হইয়া আবার তোমারই নিকট আসিব।”

সরলা কিঞ্চিৎ শাস্ত হইয়া বলিল, “যদি এস, কবে আসিবে ?”

ইন্দ্রনাথ বলিলেন, “ছয় মাসের মধ্যে আসিব। আজ পূর্ণিমা, আজ হইতে সপ্তম পূর্ণিমা-তিথিতে আবার তোমার সহিত দেখা হইবে। যদি না হয়, তবে জানিবে, ইন্দ্রনাথ আর এ জগতে নাই।”

এই কথা বলিতে বলিতে দ্বারদেশে শব্দ হইল। সরলা বুলিল, দাসী আসিয়াছে। দ্বার খুলিয়া দ্বিতে গেল। ইন্দ্রনাথ অনিমেষ-লোচনে তাহার দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ও মনে মনে বলিলেন, “ভগবান্, সহায় হও, যেন এই রমণীর লাত করিতে পারি। যদি না পারি, এ হৃদয় শুষ্ক হইবে, এ জীবন মরুভূমি হইবে।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রুদ্রপুর-পরিত্যাগ।

And there sudden partings, such as press
The life from one young hearts,
and choking sighs
That ne'er might be repeated.
who could guess,
if e'er again should meet those mutual eyes
since upon a night so sweet such awful
morn could rise.
Byron,

রাজা সমরসিংহ রায় বঙ্গদেশীয় সমস্ত হিন্দু জীবদাবদিগের সম্পদকালে পরম বদ্ধ ও বিপৎকালে অবলম্বন এবং আশ্রয় ছিলেন। তিনি নিজ সাহস ও বাহুবলে যে খ্যাতি ও ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন, তদ্বারা স্বধর্ম্ম-

লক্ষী জমীদারদিগের গৌরব বর্দ্ধন করিবার চেষ্টা করিতেন। ফলতঃ বিপৎকালে তাঁহার নিকট উপকার প্রাপ্ত হন নাই, এ প্রকার জমীদার প্রায় বঙ্গদেশেই ছিল না। ইচ্ছা-পূরের প্রজারজক জমীদার নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী রাজা সমরসিংহের বিশেষ অমুগ্রহভাজন ছিলেন। নগেন্দ্রনাথও রাজা সমরসিংহকে জোঁদনাচবং শ্রদ্ধা করিতেন ও তাঁহার আজ্ঞা না লইয়া কোন কার্যই করিতেন না।

রাজা সমরসিংহের মৃত্যুর পর বিধবা রাজ্ঞী ও বাঙালীগণ জন্ম নগেন্দ্রনাথ অনেক অমুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ছদ্মবেশে চতুর্দেষ্টিত দুর্গ হইতে পলায়ন করাতে কেহই তাঁহাদের কোন সন্ধান পাইল না। বিশেষতঃ রাজা সমরসিংহের অপত্যের নিমিত্ত অধিক স্নেহ প্রকাশ করিলে দেওয়ান সতীশচন্দ্রের ক্রোধভাজন হইতে হইবে, এই বিবেচনায় ত্রাতরিক স্নেহও কিঞ্চিৎ পরিমাণে সংবৃত রাখিতে হইয়াছিল। মানব-জন্মদয়ে স্নেহরুজু অতি সূক্ষ্ম ও ক্ষণস্থায়ী, স্বার্থপরতা যৎপরোনাস্তি প্রবল। দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে নগেন্দ্রনাথ আপনার উন্নতির পথে ধাবিত হইতে লাগিলেন, যাঁহাতে ধন, মান, ক্ষমতা-বর্দ্ধন হয়, যাঁহাতে বঙ্গদেশের শাসনকর্তা ও দেওয়ান মহাশয়ের প্রণয়ভাজন হইতে পারেন, তাঁহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে অভাগা বিধবা ও অনাথা কন্ডার কথা বিস্মৃত হইতে লাগিলেন, বৎসর-মধ্যেই সে ছুঃখের কথা তিনি সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গেলেন। রাজা সমরসিংহের যে বিধবা স্ত্রী ও অনাথা কন্ডা আছে, তাহা নগেন্দ্রনাথের স্বরণপথ হইতে এককালে দূরীভূত হইল।

পাঠক মহাশয়, নগেন্দ্রনাথকে রুতয় বলিয়া মনে করিবেন না। এই অখিল ভ্রমও

লের প্রতি দৃষ্টি করুন। ইহার মধ্যে কয়জন উপকারের প্রত্যাশা করিবার জন্ত আপন পথে কাঁটা দেন? কয় জন পূর্বকৃত উপকার-স্বরণে আপন স্বার্থসাধনে বিরত হন? স্নেহ, দয়া, মায়া, এ সকল স্বর্গীয় পদার্থ। কিন্তু স্বার্থপরতা প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে স্নেহ কত দিন থাকে? মায়ার পাত্র নয়নের বহির্গত হইলে মায়া কত দিন থাকিতে পারে? আমরা যদি নগেন্দ্রনাথের প্রতি রাগ করিয়া থাকি, তবে নগেন্দ্রনাথকৃত অপরাধ হইতে আপনারা নিরস্ত থাকিতে যেন চেষ্টা করি। বোধ করি, অনেক দরিদ্র আত্মীয়-কুটুম্ব আমাদিগের মুখ চাহিয়া আছে, তাহাদিগকে যেন আশ্রয় দান করি; বোধ করি, অনেক অনাথা বিধবা যাতনায় ও কষ্টে কথঞ্চিৎ জীবনধারণ করিতেছে, স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া তাহাদের সহায়তা-দানে যেন ধাবমান হই। এ ছুঃখপূর্ণ সংসারে চারিদিকে যে ছুঃখরাশি দেখিতে পাই, তাহা সমস্ত নিবারণ করা মনুষ্যের অসাধ্য; কিন্তু যদি একজন ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দান করিতে পারি, একজন তৃষ্ণার্ত্তকে স্নেহবারি দিয়া তৃপ্ত করিতে পারি, একজন অনাথিনীর নয়নজল মোচন করিতে পারি, তবে এ কার্যক্ষেত্রে আমরা বৃথা জন্মধারণ করি নাই।

নগেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ এ জগতে বৃথা জন্মধারণ করেন নাই। ধনবান্ জমীদার-পুত্র হইয়াও ধনে তাঁহার আদর ছিল না; উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি কৃষকদিগের সহিত বাক্যালাপ করিতে ভালবাসিতেন, কখন কখন কৃষকদিগের সহিত বাস করিতেন, সদাই কৃষকদিগের পরম বন্ধু ছিলেন! কতবার তিনি ছদ্মবেশে কৃষকদিগের গ্রামে ভ্রমণ করিতেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যখন সাংসারকে

কৃষকদিগের কুটীরে প্রদীপ জলিত, যে সময়ে গো-শালায় গাভীসকল আসিয়া প্রবেশ করিত, কতবার তিনি কুটীরাবলীর পার্শ্বে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেন, প্রজাদিগের দারিদ্র্যে সন্তোষ, জ্ঞানশূন্যতায় দোষ-শূন্যতা, দুঃখ ও ক্রেশে তপস্বীর বৈধ্য ও সহিষ্ণুতা আলোচনা করিতেন ; দিনে দিনে, বৎসরে বৎসরে, যুগ-যুগান্তরেও প্রজাদিগের অপরিবর্তিত অবস্থা আলোচনা করিতেন। কতবার প্রজাদিগের সামান্য বিষয়ের কথা-বার্তা শুনিতেন— অমুক গ্রামে একটি পুষ্করিণী খনন হইতেছে ; অমুক গ্রামে ধাতু দুর্খল্য হইতেছে, এ স্থানের মহাজন বড় শিষ্ট লোক, ও স্থানের গোমস্তা বড় অত্যাচারী— সুরেন্দ্রনাথ এই সকল কথাই আগ্রহপূর্বক শ্রবণ করিতেন। এরূপ সময়ে তিনি আপন ধনমর্যাদা বিস্মৃত হইতেন ; আপন কুলগৌরব বিস্মৃত হইতেন ; সেই ধাতুক্ষেত্র-বেষ্টিত, আশ্রয়কাননশোভিত কুটীরবাসীদিগকে আপন ভ্রাতা জ্ঞান করিয়া ভ্রাতার মত তাহাদিগের সাহায্যে তৎপর হইতেন।

যখন মহাশ্বেতা বালিকা কন্যা লইয়া চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেন, সুরেন্দ্রনাথ আপন পিত্রালয় তাগ করিয়া অনেক দিন অবেশের পর তাহার সন্ধান পাইলেন। তৎকালে মহাশ্বেতা ইচ্ছামতী-তীরে মোহান্ত চন্দ্রশেখরের নিকট মহেশ্বর-মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ তথায় যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে আশ্রয়দানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন ; কিন্তু অভিমানিনী মহাশ্বেতা দরিদ্রাবস্থায় ও গর্ভিতা ছিলেন, সহায়তা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। সুরেন্দ্রনাথ বার বার উপরোধ করিলেন, কিন্তু মহাশ্বেতা বার বার অসম্মত প্রকাশ করিয়া বলিলেন,

“রাজা সময়সিংহের বংশ এই দরিদ্রাবস্থায় মাননীয়, পরের গৃহে আশ্রয়গ্রহণ করিবে না।” এ কথায় সুরেন্দ্রনাথ অগত্যা উপরোধ হইতে নিরস্ত হইলেন ; অবশেষে বলিলেন, “আপনার স্বামীর নিকট আমরা অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, অনেক বিষয়ে ঋণগ্রস্ত আছি, এই অসময়ে যদি কোন প্রতাপকার না করিতে পারিলাম, তবে চিরকাল আমরা জন্ম বিফল মনে করিব। অতএব যদি আমাদের গৃহে আশ্রয়গ্রহণ না করেন, বলুন, আর কি প্রকারে আপনার উপকার করিতে পারি ?” মহাশ্বেতা উত্তর করিলেন, “তবে তোমার জমিদারীর মধ্যে আমাকে থাকিবার স্থান দান কর, আমি বৎসরে বৎসরে তাহার খাজানা দিব, আর কোন নদীতীরে একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া দাও, তথায় প্রতি-রাত্রে পূজা করিব, ইহা ভিন্ন আমার প্রার্থনীয় আর কিছুই নাই।” সুরেন্দ্রনাথ রুদ্রপুর গ্রামে মন্দির নির্মাণ করাইয়া দিলেন এবং সেই অবধি মহাশ্বেতা ও তাঁহার কন্যা তথায় থাকিতেন।

যে সময়ে সুরেন্দ্রনাথ চন্দ্রশেখরের নিকট গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ছদ্মবেশ, তখনই তিনি ইন্দ্রনাথ নাম ধারণ করিয়াছিলেন। ছদ্মবেশেই তিনি দেশে দেশে অহুসন্ধান করিয়া মহাশ্বেতার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, ছদ্মবেশেই তাঁহার সহিত সেই নিম্নরূপ আশ্রমে সরলার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ইচ্ছামতীতীরে তিনি কতবার বালিকাকে খেলা দিয়াছেন, কতবার তাহাকে গল্প বলিয়াছেন, কতবার তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া চুম্বন করিয়াছেন। এইরূপে ছয় বৎসর পর্যন্ত ইন্দ্রনাথ ও সরলার মধ্যে সোদর-সোদরার প্রেম জন্মিয়াছিল। তাহা ভিন্ন অল্প কোম

প্রকার ভাব অন্তরে উদয় হইয়াছে, তাহা অজকার এই পূর্ণিমা-রজনীর পূর্বে কেহই জানিতে পারে নাই ।

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় মহাশ্বেতা পূজা সমাধা করিয়া গৃহে আসিলেন । ইন্দ্রনাথ তাহার নিকট বিদায় লইবার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন । ইন্দ্রনাথ বলিলেন, “আপনি যে দৃঢ় ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে সতীশচন্দ্রের নিধনসাধন না করিলে বোধ হয়, আপনার কন্ডার পাণিগ্রহণ করিতে পাইব না ?”

মহাশ্বেতা । পাইবে না ।

ইন্দ্রনাথ । আশীর্বাদ করুন, আমি অগ্নাই সেই অভিপ্রায়ে যাত্রা করিতেছি । আশীর্বাদ করুন, অবশ্যই মনোরথ সিদ্ধ হইবে ।

মহাশ্বেতা । আশীর্বাদ করিতেছি, দেব-দেব মহেশ্বর তোমার যত্ন সফল করুন । কিন্তু তুমি বালক, সেই চতুর বুদ্ধিবিশাল দেওয়ানকে কিরূপে পরাস্ত করিবে, আমার বুদ্ধির অগোচর ।

ইন্দ্রনাথ । অধুনা আমারও বুদ্ধির অগোচর, দেখা যাউক কি হয় ।

মহাশ্বেতা । অবশ্যই তোমার জয় হইবে । ধর্মের যদি জয় না হয়, তবে এ সংসার ছারখার হইবে, কেহ আর ভগবানের আরাধনা করিবে না ।

ইন্দ্রনাথ ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, “ধর্মের যদি সর্বদা জয় হইত, তবে আপনার স্বামী নিধন প্রাপ্ত হইতেন না, সতীশচন্দ্রও বঙ্গদেশের দেওয়ান হইতেন না, মানবজাতি কখন ধর্মপথ পরিত্যাগ করিত না । যখন চারিদিকে পাণের গোরব দেখিতেছি, যখন অত্যাচারী ও কপটাচারিগণ ধন, মান, ঐশ্বর্য লাভ করিতেছে, যখন পরমধার্মিক,

পবিত্রচেতা, পরোপকারিগণ নিপীড়িত ও পদদলিত হইতেছে, তখন আর সংসার ছারখার হইবার বাকি কি ? যদি সদাই ধর্মের জয় থাকিত, তাহা হইলে পাতক ও কপটাচারণ এ সংসার হইতে একেবারে দূরীভূত হইত । তথাপি কেন যে অধর্মের জয় হয়, কে বলিবে? ভগবানের লীলাখেলা কে বুঝিতে পারে ?”

পরে মহাশ্বেতা বিশ্বেশ্বরী পাগলিনীর কথা ইন্দ্রনাথকে বলিলেন । ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “এই পাগলিনী মাহুঘী, কি যোগিনী, কি প্রেতকন্ডা, বুঝিতে পারি না, কিন্তু তাহার কথা কখন মিথ্যা হয় নাই ।”

মহাশ্বেতা । মিথ্যা কখনও হয় নাই । আমার স্বামীর মৃত্যুর পূর্বে আমাকে ভবিষ্যৎ গণিয়া বলিয়াছিল । আমি স্বামীকে সবিশেষ অবগত করাইয়া সপরিবারে পলাইবার উপদেশ দিলাম । সেই বীরপুরুষ যে উত্তর দিলেন, তাহা আমার স্মৃতিপথে অজাপি জাগরিত রহিয়াছে । বলিলেন, “ষোর সংগ্রামস্থলে হিন্দু কি মুসলমান, মোগল কি পাঠান, কেহ কখন সময়সিংহকে পলায়ন করিতে দেখে নাই ; আমি পায়ের সতীশচন্দ্রের ভয়ে পলায়ন করিব ? মরিতে হয় মরিব, যোদ্ধার তাহাতে ভয় কি ?”

ইন্দ্রনাথ বলিলেন, “সেইবার ভিন্ন আরও দুই তিনবার ঐ পাগলিনী যে যে কথা বলিয়াছে, তাহা সত্য হইয়াছে । আমার পরামর্শে আপনাদিগের এই গ্রাম হইতে পলায়ন করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই ।”

মহাশ্বেতা চিন্তা করিতে লাগিলেন । উক্ত পাগলিনী দুই তিনবার এই প্রকার সহসা দেখা দিয়া যে যে ভবিষ্যৎ কথা বলিয়াছিল, কখনও মিথ্যা হয় নাই । তিনি অন্তরে নিশ্চয় জানিলেন যে, সেই পায়ের

সতীশচন্দ্র আবার সমরসিংহের নিরাশ্রয় বিধবার অনিষ্টচেষ্টা করিতেছে, পাগলিনী মামুষী হউক বা প্রেত-কত্তা হউক, জানিতে পারিয়া সতর্ক করিবার জন্ত আসিয়াছিল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—“অতাই পলায়ন করা শ্রেয়ঃ, উপায়ান্তর নাই।”

ইচ্ছনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় যাইবেন? আমার আশ্রয়ে কি আপনাকে আশ্রয়ান করিতে পারি?”

মহাশ্বেতা উত্তর করিলেন, “মহেশ্বর-মন্দিরের মোহান্ত চন্দ্রশেখরের নিকট পুনর্বাস যাইব।” ইচ্ছনাথ কিঞ্চিৎ ক্ষণ হইলেন, কোন উত্তর করিলেন না। তৎক্ষণাৎ গ্রাম পরি-তাগ করিবার উদ্যোগে গমন করিলেন।

মহাশ্বেতা সরলাকে নিদ্রা হইতে তুলিয়া সবিশেষ বলিলেন। সরলার বালিকামুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। রুদ্রপুর গ্রামে ছয় বৎসর কাল থাকিয়া সকল দ্রব্যে মায়া হইয়াছিল। সেই পরিপাটী কুটীর, সেই উজ্জ্বল, সেই স্বহস্ত-রোপিত পুষ্পচারা, সকলই তাগ করিতে হইবে। প্রাতঃকালে উঠিয়া আর রুদ্রপুরের পক্ষীদিগের সুললিত গান শুনিতে পাইবে না, দুই প্রহরে সেই আশ্রয়ক্ষেত্র নিশ্চর, শিথিল ছায়াতে উপবেশন করিয়া আর কার্য্য করা হইবে না, সন্ধ্যায় অমলার সেই স্নানধূর হান্তবিকসিত মুখ আর দেখিতে পাইবে না। অমলার কথা শ্রবণ হওয়াতে চক্ষুতে জল আসিল;—বলিল, “মা, আমি সইয়ের নিকট বিদায় হইয়া আসি।” মহাশ্বেতা বলিলেন, “যাও মা, কিন্তু শীঘ্র আসিও।”

সরলা বিদায় লইতে চলিল। অমলার গৃহের নিকট যাইয়া ডাকিল, “সই!” প্রফুল্ল-বদন অমলা গৃহের বাহিরে আসিল। কি তাৎপর্য্য করিবে বলিয়া তাহার

অধরোষ্ঠে হাসি দেখা দিতেছে; কিন্তু সর-লার মুখপানে চাহিয়া অমলার প্রফুল্লমুখ গম্ভীর হইল; অধরে হাসি শুকাইয়া গেল, দেখিল, সরলার নয়নযুগল জলে ছল্-ছল্ করিতেছে, টস্ টস্ করিয়া বক্ষঃস্থলে জল পড়িতেছে। অমলা নিকটে আসিয়া স্নেহ-ভরে হস্তধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি সই, কি হইয়াছে?”

সরলা উত্তর করিল, “মা বলিয়াছেন, আমরা এই গ্রাম হইতে অতাই চলিয়া যাইব, তোমার সঙ্গে বোধ হয়, এই শেষ দেখা।” এই বলিয়া সরলা অমলার বক্ষঃস্থলে আপন মূখ লুকাইয়া দরবিগলিত-ধারায় রোদন করিতে লাগিল। দ্বিপ্রহর রাত্রিতে সহসা এই কথা শুনিয়া অমলার হৃদয়ে যেন বজ্রপাত হইল! প্রথমে সে কথা বিশ্বাস করিতে পারিল না, কিন্তু সরলার অবস্থা দেখিয়া সন্দেহেরও স্থল থাকিল না। তখন অমলা অশ্রুবেগ সংবরণ করিতে পারিল না, চক্ষুজলে সরলার কেশ সিক্ত করিল।

অনেকক্ষণ পর কষ্টে চিন্ত-সংযম করিয়া অমলা বলিতে লাগিল, “সে কি সই? আমার সঙ্গে আবার শেষ দেখা? তুমি যেখানে থাকিবে, আমি সেইখানে যাইয়া তোমার সহিত দেখা করিব, এক্ষণে এ গ্রাম হইতে তোমরা কেন যাইবে, বল দেখি?”

সরলা কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া বলিল, “তাহা আমি জানি না; মা তাহা বলেন নাই; কিন্তু আমরা ইচ্ছামতী-তীরে মহেশ্বর-মন্দিরে যাইতেছি।”

অমলা বলিল, “তা মহেশ্বর-মন্দির আর রুদ্রপুর ত এপাড়া ওপাড়া, প্রত্যহ যাইয়া তোমার দেখিয়া আসিব। তার জন্ত আবার ভাবনা কিসের?”

কণেক পরে অমলা বলিল, “দাঁড়াও সই,

যে পুরুষ কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশদ্বর্ষ হইবে না ; কিন্তু আকার দেখিলে সহসা ষাট বৎসরের বৃদ্ধ বলিয়া ভ্রম হয়। মস্তকের অধিকাংশ কেশ শুক্ল ; ললাট চিন্তারেখায় অঙ্কিত ; শরীরের চর্ম শিথিল, সর্বাঙ্গ ক্ষীণ, তথাপি চক্ষুদ্বয় জ্যোতির্ময় ও মুখমণ্ডলে চিন্তাদেবী সততই অধিষ্ঠান করিতেছেন। দীর আচরণ, দীর গমনাগমন, দীর অথচ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসঞ্চালন। নানারূপ বহুদূরদর্শিনী বহুদূরব্যাপিনী কল্পনাতে তাঁহার জীবন ও অন্তঃকরণ চিরকালই পরিপূরিত হইয়া রহিয়াছে। কক্ষে প্রবেশ করিয়া কন্যাকে চিন্তাময় দেখিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ রহিলেন, পরে ঈষৎ হাস্য সহকারে ডাকিলেন, “বিমলা !”

বিমলাও পিতাকে দেখিয়া আপন গভীর ভাবনা কিঞ্চিৎ বিস্মৃত হইলেন। বদনমণ্ডলে গভীরভাব ক্রমে অপনীত হইয়া পবিত্র পিতৃস্নেহের আবির্ভাব হইল। পিতা কক্ষ আসিয়াছেন, অনবধানতা বশতঃ এতক্ষণ দেখিতে পান নাই। মনে করিয়া কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন। সতীশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিমলা, এত কি ভ্রংশ হইয়াছে যে, মৌনভাবে বসিয়া রহিয়াছ ?”

বিমলা উত্তর করিলেন, “আপনি কল্যাণ ভ্রংশ ত্যাগ করিবেন, কত দিন আপনাকে দেখিতে পাইব না, কত দিন এই প্রকাণ্ড ভ্রংশ শূন্য থাকিবে, এই চিন্তায় আমার মন অস্থির হইয়াছে, আমি আপন মন শান্ত করিতে পারিতেছি না।”

পিতা উত্তর করিলেন, “সে কি বিমলা, কেন মিথ্যা ভাবনা করিতেছ ? আমি লীড়াই ফিরিয়া আসিব, আমি কি তোমাকে ছাড়িয়া অধিক দিন থাকিতে পারি ?”

বিমলা। পিতা, আপনি যে আমাকে

অতিশয় স্নেহ করেন, তাহা জানি। পিতা কন্যাকে ইহা অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতে পারেন না।

সতীশ। তবে চিন্তা করিতেছ কেন ? আমি ত প্রতি বৎসর একবার রাজধানী বাইরা থাকি, এবার তোমার বিশেষ চিন্তা কেন ?

বিমলা। প্রতি বৎসর আমার এ প্রকার ভাবনা হয় না ; এবার সহসা হৃদয়ে ভয় হইয়াছে কেন, জানি না। পিতা, আপনি গৃহে থাকুন, কোথাও যাইবেন না।

শেষ কথাগুলি অতি অর্দ্ধশুট মুদ্রস্থরে উচ্চারিত হইল, শুনিয়া সতীশচন্দ্রের হৃদয়ে যেন আহত ও কিঞ্চিৎ ভীত হইল। ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া সতীশচন্দ্র বলিলেন, “বিমলা ! কেন মিথ্যা ভয় করিতেছ ? আমাকে যাইতেই হইবে ; যাইবার সময় রোদন করিও না।”

বিমলা উত্তর করিলেন, “পিতা, মিথ্যা ভয় নহে, কল্যাণ রঞ্জনীযোগে আমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, বোধ হইল যেন স্বর্গীয় মাতা দেখা দিলেন, প্রলোচনে যেন অতি মুদ্রস্থরে বলিলেন, ‘মা, সাবধান ! ঘোর বিপদ সমাগত।’ এখনও বোধ হইতেছে, তাঁহার শুষ্ক মুখখানি—তাঁহার অশ্রুপূর্ণ লোচন দুইটি দেখিতে পাইতেছি। কি পাণ করিয়াছি, বলিতে পারি না, কি পাপে স্নেহময়ী মাতাকে হারাইলাম, জানি না ; আবার কি ঘোর বিপদ সমাগত, ভগবান্‌ই জানেন। পিতা, ক্ষমা করুন। আমার ভাবনা হইতেছে, আপনি প্রস্থান করিলে আর এ আলয়ে প্রত্যাগমন করিবেন না।”

এই বলিয়া বিমলা বাস্পাকুলিতলোচনে পিতার নিকট যাইয়া তাঁহার হৃদয়ে আপন

বদনমণ্ডল লুকাইলেন। বিমলার যদি স্থির-
ভাবে থাকিত, দেখিতে পাইতেন যে, পিতা-
রও মৃণমণ্ডল সহসা বিকৃতভাবে ধারণ করিয়া-
ছিল। স্বপ্নকথা শুনিয়া সতীশচন্দ্র শিহ-
রিয়া উঠিলেন, যেন ভয়াবহ কোন পূর্ব-
কথা হৃদয়ে সহসা জাগরিত হইল, যেন কোন
গুট পাপের প্রায়শ্চিত্ত সেইক্ষণেই আরম্ভ
হইল। যখন বিমলা পিতার হৃদয়ে মুখ
রাখিয়া রোদন করিতেছিলেন, পিতার
সাহসনা করিবার আর ক্ষমতা রহিল না।
কিঞ্চিৎ পরেই সতীশচন্দ্র আপন চিন্তা-সংযম
করিয়া স্থিরভাবে বলিতে লাগিলেন,
“বিমলা, এ সকল তোমার মিথ্যা ভয়।
দিশাযোগে তুমি কেবল মিথ্যা চিন্তা কর,
তাছাড়াই রজনীযোগে সেই প্রকার ভয়ের
স্বপ্ন দেখ। আমি দেখিয়াছি, গত কয়েক
দিন অবধি তুমি কেবলই চিন্তামগ্ন রহিয়াছ,
আমাকে যথার্থ করিয়া বল, সে মহাচিন্তার
কারণ কি?”

বিমলা ধীরভাবে উত্তর করিলেন,
“পিতা, আপনি যখন জিজ্ঞাসা করিলেন,
আমি অবশ্যই তাহার উত্তর করিব; আপ-
নার নিকট লুকাইবার আমার কোন কথাই
নাই। আপনিই সে মহাচিন্তার কারণ।
অগ্গ প্রায় একমাস হইতে আপনাকে কোন
গভীর দুঃখে বা চিন্তায় মগ্ন দেখিতেছি, দিন
দিন সেই চিন্তা গাঢ়তর হইতেছে। আপ-
নার আহ্বারের সময় খাণ্ডস্রব্যো মন থাকে
না, রজনীকালে আপনার নিদ্রা হয় না,
যদি নিদ্রা হয়, সে কুস্বপ্ন-পরিপূর্ণ। আমি
কতবার দিব্যযোগে লুকাইয়া আপনার
কক্ষে গিয়াছি; যতবার যাই, দেখি, আপনি
সেই চিন্তায় মগ্ন। নিশিযোগে আমি কত-
বার আপনার শয়নগৃহে গিয়াছি, যখনই
যাই, দেখি, কোন কুস্বপ্নে আপনার ললাট

কুঞ্চিত ও বদন বিকৃত হইয়া রহিয়াছে। কি
যোর চিন্তা! আপনাকে এ প্রকার যাতনা
দিতেছে? সামান্য জমীদার, সামান্য কৃষকও
দৈনিক পরিশ্রমের পর রজনীতে বিশ্রামলাভ
করে, বঙ্গদেশের রাজাধিরাজ দেওয়ান মহা-
শয়ের কি সে বিশ্রামে অধিকার নাই?”

বিমলা ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইলেন, দেখি-
লেন, পিতা স্থিরভাবে তাঁহার কথাগুলি শ্রবণ
করিতেছেন। পুনরায় বলিতে লাগিলেন,
“গত একমাস অবধি আপনার নিকট এত
চর আসিতেছে কেন? চর এত গুপ্তভাবে
আসিয়া গুপ্তভাবে চলিয়া যায় কেন? দিবা-
রাত্রি আপনিই বা কোন্ গুপ্ত পরামর্শে ব্যস্ত
আছেন? বঙ্গদেশের দেওয়ানের কার্যের
ভার অতি গুরুতর সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশের
স্বশাসন ও প্রজার মঙ্গল যে কার্যের উদ্দেশ্য,
সে কার্য ও সে পরামর্শ কি রজনী দ্বিপ্ত-
হরের সময় গৃহের কবাট রুদ্ধ করিয়া কতক-
গুলি নিতৃত চরের সহিত সিদ্ধ হয়? বালি-
কার এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে।
যদি আমি অপরাধ করিয়া থাকি, পিতা,
মার্জনা করুন। কিন্তু আপনি বুদ্ধিমান ও
বিচক্ষণ, বিবেচনা করিয়া দেখুন, খলস্রব-
সর্পেরই গতি বক্র; উদারচিত্ত মনুষ্যের গতি
সরল। সাঁহার চরিত্র সরল, সাঁহার উদ্দেশ্য
সরল, তাঁহার গতি বক্র হইবে কেন? পিতা,
বালিকার কথায় অবধান করুন। কপট
লোকের পরামর্শ তাগ্য করুন, ধর্মের পথ—
সরল পথ—অবলম্বন করুন, তাহা হইলে
কাহাকেও ভয় থাকিবে না, কোন চিন্তা
থাকিবে না। পাপপথে সর্বদাই ভয়, ধর্ম-
পথ নিরাপদ ও নিষ্কটক।”

বলিতে বলিতে বিমলার উদার ললাট ও
বদনমণ্ডল অধিকতর উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল,
তাঁহার উজ্জ্বল নয়নমণ্ডল হইতে উজ্জ্বলতর

করিব, যদি ক্ষমা না পাই, আমার অক্লিষ্ট-
কর শোণিত দিয়া সমরসিংহের রক্তপ্রবাহ
বর্ধন করিব।”

পরক্ষণেই শকুনি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করি-
লেন,—বলিলেন, “এ কি? অন্ধকারে
একাকী বসিয়া আছেন কেন?”

সতীশচন্দ্র অতিশয় গভীরস্বরে উত্তর
করিলেন, “আলোক সহ্য করিতে পারি না,
হৃদয়ে হৃদ্ভেদ অন্ধকার ব্যাপ্ত রহিয়াছে।
আমার জীবনালোকও শীঘ্র অনন্ত অন্ধকারে
লীন হইবে, আমার লীলাখেলা সাঙ্গপ্রায়।”

শকুনি এ কথার উত্তর দিতে পারিলেন
না, ভৃত্যকে আলোক আনিতে ইঙ্গিত করি-
লেন। ভৃত্য শীঘ্র আলোক আনিয়া পুনরায়
কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল।

সতীশচন্দ্র পুনরায় বলিতে লাগিলেন,
“শকুনি! তোমার পরামর্শে আমি এতদূর
কাষ্য করিয়াছি, তাহাতে কি ফল হইল?
আমার পক্ষকাল অনেক দিনই গিয়াছে,
এক্ষণে ইহকালেই সর্বনাশ উপস্থিত!
এই পাপরাশিতে, এই বিপদরাশিতে তুমি
আমাকে নিগ্ধ করিয়াছ, এক্ষণে আর কি
করিবে, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অস্ত
কোন উন্নতিশালী লোকের সর্বনাশ কল্পনা
কর, আমিও ঘোর পাপের যদি কোন
প্রায়শ্চিত্ত থাকে, তাহাতে প্রস্তুত হই।”

শকুনি প্রভুর গভীরস্বরে শুনিয়া চমকিত
লেন, বুঝিলেন, প্রভুর হৃদয়ে সামান্য
ব ও ক্ষোভের উদ্রেক হয় নাই; দুই
কতব অশ্রুবিন্দু দেখাইয়া শকুনি উত্তর
করিলেন, “প্রভুর গৌরবকালে তাঁহারই স্নেহ-
ব্যা ভিন্ন আমার অভিলାষ ছিল না,
ই সর্বনাশ উপস্থিত হয়, প্রভুর
গৌরব ভিন্ন আমার দ্বিতীয়
।”

সতীশ। শকুনি! তোমার কথা অতি
মিষ্ট, বিধাতা কেন এমন বিষপাত্র ক্ষীরদ্বারা
আবৃত করিয়াছেন?

শকুনি। আমি পাপিষ্ঠ বটে, তাহা না
হইলে প্রভুভক্তির এষ্ট ফল ফলিবে কেন?

এই বলিয়া শকুনি আর দুই চারিটি
অশ্রুবিন্দু বাহির করিলেন। সতীশচন্দ্র
দেখিয়া কিছু মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, “তুমি
আমার উন্নতিচেষ্টা কর, তাহা আমি
জানি, কিন্তু পাপপথে সর্বদাই বিপদ।
শকুনি! সে পথ ভিন্ন কি আর উন্নতির পথ
ছিল না?”

শকুনি দেখিলেন, তাহার অশ্রুবিন্দু
নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই, কাতরস্বরে বলিতে
লাগিলেন, “প্রভুভক্তি যদি পাপ হয়, তবে
আমি পাপিষ্ঠ বটে, তাহা ভিন্ন পাপ কি,
আমি জানি না।”

সতীশ। জান না? বঙ্গচড়ামণি রাজাসমর-
সিংহকে বিনাশ করিবার পরামর্শ কে দেয়?

শকুনি। রাজাজ্ঞার তাঁহার দণ্ড হইয়াছে।

সতীশ। ভাল, তাঁহার জমিদারী এক্ষণে
কে পাইয়াছে?

শকুনি। স্ববাদের স্বেচ্ছায়: যাহাকে যে
দ্রব্য দান করেন, তাহা সর্বদাই শিরোধার্য।

সতীশ। শকুনি! আর আমাকে ভুলাই-
বার চেষ্টা করিও না। অস্ত আমার জ্ঞানচক্ষু
উন্মীলিত হইয়াছে ও তদ্বারা স্বীয় হৃদয়ে এত
অন্ধকার, এত পাপ দেখিতেছি যে, সে দৃশ্য
আর সহ্য করিতে পারি না। অস্ত বালিকার
নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি।

এই বলিয়া সতীশচন্দ্র বিমলার সহিত
কথোপকথন সমস্ত ভাঙ্গিয়া বলিলেন। শকুনি
উত্তর করিলেন, “বঙ্গদেশের রাজাধিরাজ
দেওয়ানের কি বালিকার কথার ভাত হওয়া
যুক্তিসিদ্ধ?”

সতীশচন্দ্র উত্তর করিলেন, “বালিকা যদি সত্যকথা কহে, তবে সে কথা বালিকা-মুখনিঃসৃত বলিয়া পরিহার্য্য নহে। পাপ-পথে সৰ্কুদাই বিপদ, তাহা আমি এত দিনে জানিলাম।”

শকুনি। যদি আজ্ঞা করেন, তবে বলি, আপনাব বিপদ আমি দেখিতে পাইতেছি না।

সতীশ। আজি ছয় বৎসর হইল, তখন রাজা টোডরমল্ল প্রথমবার বঙ্গ ও বিহারদেশ জয় করিয়া দিল্লী প্রত্যগমন করেন, তাহার অনতিবিলম্বে পুণ্যাত্মা সমরসিংহ আমা কর্তৃক নিহত হন : সে কার্য্যো তুমিই পরামর্শ দিয়াছিলে।

শকুনি। দিল্লীধরের অধীনস্থ বঙ্গ ও বিহারদেশের সেনাপতি সনাইম খাঁর আজ্ঞায় সমরসিংহের দণ্ড হয়।

সতীশ। সত্য, কিম্ব সে আমাদেরই পাপ ষড়্‌বন্দে। তাহার দুই বৎসর পরে রাজা টোডরমল্ল দ্বিতীয়বার বঙ্গদেশ জয় করেন, তখন সমরসিংহের মৃত্যুর বিষয়ে কি মিথ্যা কহিয়া পরিভ্রাণ পাইয়াছিলাম, বোধ হয়, বিস্মৃত হও নাই।

শকুনি। তাহার পর ?

সতীশ। তাহার পর টোডরমল্ল পুনরায় সেনাপতি ও সুবাদার হইয়া যুদ্ধে আসিয়া-ছেন, আর নিস্তার নাই।

শকুনি। যে কৌশলে এত দিন কথা গুপ্ত ছিল, সে কৌশল এক্ষণে বার্থ হইবে কেন ?

সতীশ। দূরদর্শী টোডরমল্ল আমাদের কৌশলে পরাস্ত হইবেন না। তুমি রাজা টোডরমল্লকে জান না।

শকুনি। কিন্তু এই দূরদর্শী রাজাই এক-বার এই কৌশলে পরাস্ত হইয়াছিলেন।

সতীশ। সত্য, কিন্তু সেবার দুই এক মাসের

জন্ত আসিয়াছিলেন, এবার সুবাদার হইয়া আসিয়াছেন, অনেক দিন বাস করিবেন। শকুনি ! আমাকে নিবারণ করিও না, আমি তাহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিব, তান একবার আমাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, পুনরায় ক্ষম করিলেও করিতে পারেন। তাহার পর আমি পাপ সংসারে থাকিব না, বোগী হইয়া এই ঘোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিব।

শকুনি। তাহা হইলে আপনাকে ইচ্ছা পূরক সংসার ত্যাগ করিতে হইবে না। প্রিয়স্বহৃদ সমরসিংহের হত্যাকারক-সম্বন্ধে রাজা টোডরমল্ল কি আদেশ দিবেন, আপনি তাহা বুঝিতে পারেন না ?

এই বান্দবাক্যে সতীশচন্দ্র মনোমগ্নক বেদনা পাইলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, শকুনির কথাই সত্য। গুপ্তকথা অপ্রকাশ থাকার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু প্রকাশ হইলে প্রাণরক্ষার কিছুই অসম্ভবনা নাই। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, “শকুনি ! তুমি আমা অপেক্ষাও পাপিষ্ঠ, কিন্তু যদি তুমি মৃত্যুমান্ পাপ হও, তথাপি তোমার পরামর্শ অবলম্বন ভিন্ন আমার আর গতি নাই। তোমার তক্ব অলঙ্ঘনীয়।”

শকুনি। আপনাব সহিত তক্ব করা আমার সম্ভবে না ; কিন্তু কাহার মাথার উপর মাথা আছে যে, বঙ্গদেশের দেওয়ানের বিরুদ্ধে সুবাদারের নিকট অভিযোগ করিতে যাইবে ? প্রভো ! আমার কথা অবধান করুন, যে কথা ছয় বৎসর গুপ্ত আছে, তাহা প্রকাশিত হইবে না। আমি আপনাব নিকট-পূর্ণ করিতেছি, যদি এ কথা গুপ্ত না রাখিতে পারি, তবে আপনাব সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব।

আশার প্রভাব অতি চমৎকার ! যে আশা মনুষ্যকে কত সুখ ও মাধুর্য্য প্রদান

করে, সেই আশাই আবার কত দুঃখের কারণ হয়। মানবহৃদয়ও অতি চমৎকার! আশার কুহকে কতই খেলা করে। বিপদের সময়, পীড়ার সময়, দুঃখের সময়, হৃদয়ে ধর্মভয় প্রবল হয়; বিপদের শাস্তি হইলে, পীড়ার আরোগ্য হইলে, দুঃখের অবসান হইলে, ধর্মভয় ক্রমে দূর হয়। ইতিপূর্বে সতীশচন্দ্র বিপদাশঙ্কা করিতেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে পাপের প্রতি ঘৃণা ও ধর্মভয় মনে জাগরিত হইয়াছিল, ক্রমে কহিকিনী আশা কানে কানে বলিতে লাগিল, “ভয় কি? বিপদ কোথায়? মিথ্যা ভাবনা কেন?” সতীশচন্দ্রও সেই কুহকে যুগ্ম হইলেন, ভাবিলেন, “বিপদ না আসিলেও না আসিতে পারে।” ভাবিতে ভাবিতে বিপদভয় অস্তুহিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে ধর্মভয়ও চলিয়া গেল। মানবহৃদয়ে বিপদভয় যত প্রবল, ধর্মভয় যদি সেইরূপ প্রবল হইত, তাহা হইলে কি পৃথিবীতে অত্যাঁদৃশ দুঃখ থাকিত?

অনেক চিন্তা করিয়া সতীশচন্দ্র বলিলেন, “শকুনি! তোমার উপরই আমি নিভর করিব। আশু বিপদের কি কোন সম্ভাবনা আছে?”

শকুনি সময় বুঝিয়া উত্তর করিলেন, “আশু কি বিলম্বেও গুপ্তকথা প্রচারের কোন সম্ভাবনা নাই। আর যদিই বা বিপদের সম্ভাবনা থাকে, তদাদৃশ মহাপুরুষের পক্ষে কি বিপদের সময় কাতরতা যুক্তিসিদ্ধ? বঙ্গদেশে আপনার যশ কে না প্রশংসা করে? ব্রাহ্মণকুলে আপনার মত পবিত্র কুল কাহার? আপনার ক্ষমতার মত ক্ষমতা কাহার? আপনার গৌরবের মত গৌরব কাহার? আপনার অধিকারের মত অধিকার কাহার? বালিকার বাক্য অবলম্বন করিয়া এ সমস্ত সহসা ত্যাগ করা

কি বঙ্গদেশের রাজাবিরাজ দেওয়ান মহাশয়ের পক্ষে উচিত কর্ম? আপনাকে পরামর্শ দিব, আমার কি সাধ্য, আপনিই বিবেচনা করুন, আপনাকে পরামর্শ দিতে পারে, এরূপ পণ্ডিত বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই।”

সতীশচন্দ্র ও কথার কোন উত্তর করিলেন না। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, “যথার্থই কি আমি বাতুল হইয়াছিলাম, বালিকার কথায় ভীত হইয়াছিলাম!” শকুনি তাহার মুখ দেখিয়া আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারিলেন, প্রকাশ্যে বলিলেন, “কদ্রপুরে যে চর পাঠাইয়াছিলেন, তাহার সংবাদ শুনিয়াছেন কি?”

সতীশ। না, সেই এক বিষয়ে এখনও ভাবনা আছে। শুনিয়াছি, সমরসিংহের বিধবা ভগ্যানক স্ত্রীলোক, টোডরমল্ল দেশে আসিলে হয় ত সেই একটা কাণ্ড কবিয়া বসিবে।

শকুনি। সে ভয় করিবেন না। টোডরমল্ল আসিবার আগেই সমরসিংহের বংশের সকলেরই মূখ বন্ধ হইবে।

সতীশ। তবে কি আমরা যে চর কদ্রপুরে পাঠাইয়াছিলাম, তাহারা সমরসিংহের বিধবাকে ধরিয়! আনিতে পারিয়াছে?

শকুনি। না, এখনও পারে নাই, কিন্তু সে কাণ্ড শীঘ্রই সিদ্ধ হইবে।

সতীশ। পারে নাই কেন?

শকুনি। শুনিলাম, তাহারা তুই এক দিন পূর্বেই সমাচার পাঠাইয়াছিল। সেই পাগলিনী সমাচার দিয়াছিল।

সতীশ। পিশাচী আমার সকল কর্মেই বাধা দেয়। তাহাকে ধরিয়! আনাইতে পার না?

শকুনি। চেষ্টার ক্রটি নাই, কিন্তু তাহার

কিছুমাত্র সন্ধান পাই নাই। বোধ হয়, তাহার যথার্থই পৈশাচিক বল আছে, তাহা না হইলে আমাদের সকল গুপ্ত অনুসন্ধান জানিতে পারে কিরূপে? না হইলে একশত চরেও তাহার অনুসন্ধান পাঠিতেছে না কেন?

সতীশ। তবে এক্ষণে উপায় কি?

শকুনি। চিন্তা করিবেন না। শীঘ্রই সকলের মুখ বন্ধ হইবে। আর অধিক রাত্রি নাই, আপনি বিশ্রাম করুন। শকুনি শর্ম্মার মরণ হইতে কাহারও নিস্তার নাই।

এই বলিয়া শকুনি আপন কক্ষে প্রস্থান করিলেন। বাইবার সময় দুই একবার সতীশচন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। ভাবিলেন, তোমারও নিস্তার নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

—*—

ধূর্তে ধূর্তে ।

CURSE on his perjured arts !

dissembling smooth ?

Are honor, pity, conscience, all exiled ?

Is there on pity, no relenting truth ?

Burns.

পরদিন প্রাতে দেওয়ানজী মহাসমারোহে মন্দের যাত্রা করিলেন। কল্লার নিকট বিদায় লইবার সময় বিয়লা বলিলেন, “পিতঃ! আপনি চলিলেন, অহুমতি করুন, আমি প্রসিদ্ধ মহেশ্বর-মন্দিরে গাইয়া আপন-নার মঙ্গলার্থ পূজা দিব। তথায় আমাকে কিছু দিন অবস্থিতি করিতে হইবে।” পিতা সন্মত হইলেন ও অনেক স্নেহগর্ভ বচনে কল্লার নিকট বিদায় লইলেন। কল্লার চক্ষু-জলে বস্ম সিক্ত হইল, পিতা চলিয়া গাইবার

সময়, সেই দিকে নিরীক্ষণ করিয়া বিয়লা মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “এই বিপুল সংসারে আপনি ভিন্ন এ হতভাগিনীর আর কেহই নাই, আপনি না থাকিলে সংসার আমার পক্ষে অন্ধকার। ভগবান! আপনাকে নিরাপদে রাখুন, ধর্ম্মপথে আপন-নার মতি হউক। আপনার নৈসর্গিক চরিত্র উদার ও অকপট, কক্ষণে শকুনির সহিত মিলন হইয়াছিল।”

শকুনির সহিত বিদায় লইবার সময় শকুনি বলিলেন, “আপনি অগসর হউন, আমিও সমরসিংহের বিধবাকে উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া ও অজ্ঞাত কার্য্য সমাধা করিয়া আপনার নিকট গাইতেছি।”

সতীশচন্দ্র উত্তর করিলেন, “মহা উচিত হয় কর, আমি তোমারই তীক্ষ্ণবুদ্ধির উপর নির্ভর করি।” সতীশচন্দ্র যখন বহির্গত হইলেন, শকুনি মনে মনে বলিতে লাগিল, “বুদ্ধি তীক্ষ্ণ কি না, তাতে হাতেই টের পাইবে, বড় বিলম্ব নাই।”

শকুনির সহিত সতীশচন্দ্রের আজ আট বৎসর পরিচয়। যখন প্রথমে পরিচয় হইয়াছিল, তখন শকুনির বয়স্ক্রম বিংশতি বৎসর, সতীশচন্দ্রের বয়স্ক্রম চত্বারিংশৎ বয়। শকুনি দেখিতে সুশী ছিল ও অল্পবয়সে অনাথ ব্রাহ্মণপুত্র বালিয়া সতীশচন্দ্রের দ্বারে শরণাপন্ন হইয়াছিল। সতীশচন্দ্রও সুকুমার নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণপুত্রকে আশ্রয় দিয়াছিলেন—সেই দিন অবধি জুদয়ে কালসর্প ধারণ করিয়া ছিলেন।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি শকুনি শীঘ্রই সতীশচন্দ্রের জুদয় বুঝিল; সতীশচন্দ্রের দুর্দমনীয় উজ্জাভিলাষ লক্ষ্য করিল; সেই ভীষণ অগ্নিতে দিন দিন আভতি দিতে লাগিল; আভতি পাইয়া অপ্রাণশয্যা দিনে দিনে গগনস্পর্শী হইতে

চলিল। এই ঘোর অন্ধে মত্ত হইয়া সতীশ-
চন্দ্র দিবিদিবজ্ঞান হারাইলেন, ধর্মার্থ-
জ্ঞান হারাইলেন, একেবারে অন্ধপ্রায়
হইলেন।

শকুনি সুযোগ পাইল। অন্ধকে কুটিল
পথে লইয়া যাওয়া শুরু হইল, সংপরামর্শ
হইতে কুপরামর্শ দিতে আরম্ভ করিল,
প্রভুকে সংপথ হইতে কুপথে লইয়া চলিল।
অবশেষে এমন ঘোর পক্ষে নিমগ্ন করিল যে,
তথা হইতে উদ্ধার হইয়া প্রত্যাবর্তন করা
মহাবীর সাধ্য নহে। তখন সতীশচন্দ্রের
চক্ষু উন্মীলিত হইল, ক্রমে ক্রমে ভ্রম
দেখিতে পাইলেন : কিন্তু তখন পশ্চাত্তাপ
ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। শকুনির মনকামনা
সিদ্ধ হইল, প্রভুকে সম্পূর্ণরূপে হস্তগত
করিল।

শকুনিকে আশ্রয় দিবার অনতিবিলম্বেই
সতীশচন্দ্র • তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি লক্ষ্য করিয়া-
ছিলেন। শকুনির বিনীতভাবে সম্বোধন হইয়া-
ছিলেন, তাহার পরামর্শে চমকিত ও প্রীত
হইয়াছিলেন। দিন দিন তাহাকে অধিকতর
স্নেহ করিতেন, আপনাদি পুত্রের নত
ভালবাসিতেন। কখন তাহাকে পোষা-
পুত্র করিবার কামনা করিতেন, কখন
বা তাহাকে আপন হৃদিতার সহিত
বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিতেন। কিন্তু
নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণ-কুমারের সহিত কস্তার
বিবাহ দিলে মানহানি হইবে, এই
ভয়ে শকুনিকে গৃহ-জামাতা করিতে
পারেন নাই। ক্রমে কস্তার বয়ঃক্রম অধিক
হইতে লাগিল, কিন্তু কুলীন-কস্তার বয়ঃক্রম
অধিক হইলে ক্ষতি কি ? বিশেষ সতীশচন্দ্রের
স্ত্রীর মৃত্যু হওয়াতে কস্তার প্রতি স্নেহ দ্বিগুণ
হইয়াছিল, কস্তার বিবাহ দিলে গৃহ শূন্য
হইবে, এই ভয় বিবাহের বিলম্ব হইতে

লাগিল, এই ভয় শকুনিকে জামাতা করিয়া
গৃহে রাখিবার সঙ্কল্প হইতে লাগিল।

পরে যখন পানপক্ষে পতিত হইয়া
সতীশচন্দ্রের চক্ষু উন্মীলিত হইল, তখন এই
সঙ্কল্প আবার দূর হইল। পাপ এরূপ স্থগার
পদার্থ যে, একজন পাপী অন্য জনকে ভাল-
বাসিতে পারে না। সতীশচন্দ্র শকুনিকে
আর ভালবাসিতে পারিলেন না। উন্নত-
চরিত্রা ধর্মপরায়ণা হৃদিতাকে কুটিলস্বভাব
কপটাচারী শকুনির হস্তে অর্পণ করিবেন,
এ ভাবনা সতীশচন্দ্র সহ্য করিতে পারিলেন
না, মনে মনে ভাবিলেন, “আমি পাপিষ্ঠ
বটে, কিন্তু পাপেরও সীমা আছে। ধর্মপরা-
য়ণ সময়সিংহকে হত্যা করিয়াছি, কিন্তু
আমার স্নেহের পুত্রলি বিমলাকে নরকে
ফেলিতে পারিব না। আমার যাহা হইবার,
হইয়াছে, বিমলা ধর্মপথে থাকুক। সতীশচন্দ্র
এইরূপ চিন্তা করিতেন, কিন্তু শকুনিকে কিছু
বলিতে পারিতেন না। শকুনি সুবাদারের
নিকট একটি কথা জানাইলে সতীশচন্দ্রের
শিরচ্ছেদন হইবে, তাহা তিনি জানিতেন,
সুতরাং তিনি শকুনির একরূপ হস্তগত
হইলেন।

শকুনি যে ঘোর পাপিষ্ঠ, তাহা বলা
বাচ্য। সতীশচন্দ্রও পাপিষ্ঠ, কিন্তু তাহার
পাপের সীমা ছিল, তাহার চরিত্রে দুই একটি
সদগুণও ছিল, তাহার হৃদয়ে দুই একটি
মহাত্ম্যও লক্ষিত হইত। পাপের প্রায়শ্চিত্ত-
স্বরূপ মধ্যে মধ্যে তাহার আত্মগোপন উপস্থিত
হইত। শকুনির এ সমস্ত কিছুই ছিল না,
কেবল ঘোর স্বার্থপরতা ও ভূর্ভোগ কুটিলতা।

সতীশচন্দ্রের মত তাহার হৃদমনীয়া বেগ-
বতী মনোবৃত্তি একটিও ছিল না ; তাহার
হৃদয়ের সকল প্রবৃত্তিই শাস্ত ; সকল প্রব-
ৃত্তিই ঘোর স্বার্থপরতার অঙ্গাঙ্গরিণী। উর্গভাত

যে রূপ বৃক্ষপত্রগুলি দেখিয়া ধীরে ধীরে জাল পাতিত করে, শকুনি সেইরূপ অস্ত্র লোকের মনোবৃত্তির বেগ বৃদ্ধি আতি ধীরে ধীরে আপন স্বল্পজাল বিস্তার করিত । সে মন্ত্রণাজাল এমন সুন্দর, এমন চুলকায় ও এমন দুর্ভেদ্য যে, কাহার সাধ্য তাহা ভেদ করে ? সুকুমার মনোবৃত্তি দ্বারা জগৎ বন্ধ ও মানব-জাতি একীকৃত হইয়া রহিয়াছে, শকুনি সে সকল হস্তে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। যশে অভিরুচি ও উচ্চাভিলাষ প্রভৃতি যে সকল দুর্দম মনোবৃত্তি অনেককে বিচালিত করে, তাহা হইতেও শকুনি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ছিল। সুতরাং আপন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও গূঢ় মন্ত্রণার দ্বারা আপন স্বার্থসাধনে কখনও নিফল হইত না।

শকুনি সতীশচন্দ্রকে বলিয়াছিল যে, চরেরা সমরসিংহের বিধবাকে ধরিতে অক্ষম হইয়াছে—সেটি মিথ্যা কথা। শকুনির বেক্রপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মহাখেতাকে ধরা তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য কার্য্য নহে ; সে কেবল সতীশচন্দ্রের সহিত শকুনিকে যুদ্ধেরে না যাইতে হয়—এই জন্ত। শকুনির বিত্তীয় মন্ত্রণাজাল ভেদ করি, আমাদের কি সাধ্য ? পাঠক মহাশয় ! চলুন, শকুনি যথায় বসিয়া চিন্তা করিতেছে, তথায় যাইয়া দেখা যাউক, যদি কিছু জানা যায়।

চতুর্বেষ্টিত দুর্গের প্রশস্ত কক্ষে শকুনি একাকী পাদচারণ করিতেছে, চারিদিকে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র অবলোকন করিতেছে, দুর্গ-পদসঞ্চারিণী কল্লোলিনী যমুনার কল কল শব্দ শ্রবণ করিতেছে, মধ্যে মধ্যে প্রশস্ত দুর্গের শুদ্ধান্তঃপুরদিকে অবলোকন করিতেছে। তাহার মুখমণ্ডলে আনন্দের লক্ষণ, স্বার্থসাধন হইলে স্বার্থপর লোকের যেক্রপ আনন্দ ও উল্লাস হয়, সেইরূপ আনন্দের

লক্ষণ। মনে মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হইতেছে,—

“এই সুবিশীর্ণ জমিদারী, এই প্রশস্ত দুর্গ, এই অন্তঃপুরবাসিনী সপ্তদশবর্ষীয়া সুন্দরী শীতাই নব স্বামী গ্রহণ করিবে ; সমরসিংহের প্রজাগণ, সতীশচন্দ্রের প্রজাগণ শীতাই শকুনির নাম উচ্চারণ করিবে ; কল্লোলিনী যমুনা শীতাই শকুনির গোরব-গীত গান করিবে। আর তুমি বিমলে ! তুমি আমাকে ঘৃণা কর জানি, কিন্তু ঘৃণার দিন শেষ হইল ; তোমার ইচ্ছা থাকুক আর নাই থাকুক, আমাকে স্বামী বলিয়া আলিঙ্গন করিতেই হইবে ; তথাপি যদি ঘৃণা কর, এই পতঙ্গের মত তোমাকে পদে দলিত করিব ; এই দলিত যুত পতঙ্গের দ্বায় দূরে নিক্ষেপ করিব। প্রেমের জন্ত বিবাহ করিতেছি না, প্রেম বালক-বালিকার স্বপ্নমাত্র। তোমার রূপ-লাবণ্যের জন্ত তোমাকে গ্রহণ করিতেছি না ; আমার নিকট রূপলাবণ্যের আদর নাই ; যদি থাকিত, লক্ষপতির রূপলাবণ্যের অভাব কি ? তবে তোমার দলিত না করিব কেন ? সতীশচন্দ্র, সাবধান, আজি তোমাকে যম-মন্দিরে প্রেরণ করিলাম ; যেক্রপ চর নিযুক্ত করিয়াছি, গুপ্তকথা নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে। অধিকন্তু শকুনির দোষও তোমার উপর নিক্ষিপ্ত হইবে। তাহার পর ? তাহার পর নিঃসন্তান সতীশচন্দ্র গত হইলে তাহার জামাতা ভিন্ন আর কে উত্তরাধিকারী হইবে ? তীক্ষ্ণবুদ্ধির চিরকালই জয় হইয়া থাকে।”

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শকুনি দেখিল, অন্তঃপুরে গবাক্ষপার্শ্বে বিমলা এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। পিতা চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু পিতার গমনপথ-দিক্ অনিমেষলোচনে নিরীক্ষণ করিতেছেন। ক্রন্দন করাতে সেই উন্নত প্রশস্ত ললাটের

পর্যন্ত আসিতে পারিত, তাহার ভিতর যাইতে পারিত না। সেই সিংহদ্বারের ভিতর প্রবেশ করিলে আর ধন-গৌরবজাত কোন প্রকার বিভিন্নতাই স্থান পাইত না। রাজ-কুমারী ভিখারিণীর সহিত একত্র পদব্রজে সিংহদ্বার হইতে মন্দির পর্যন্ত যাইতেন, ভ্রম-বিভূষিত সন্ন্যাসীর সহিত স্বর্ণরৌপ্যালঙ্কৃত মহারাজ একত্রে পথ অতিবাহিত করিতেন। ধর্মের সম্মুখে উচ্চ কে? নীচ কে? ধনীই বা কি? দরিদ্রই বা কি?

যদিচ চারিদিকের সৌধবেষ্টিত মধ্যস্থ ভূমি অতিশয় প্রশস্ত ও বিস্তারিত, তথাপি কখন কখন এত লোকের সমাগম হইত যে, সেই ভূমি লোকে পরিপূর্ণ হইত, তথায় যে কেবল উপাসকগণ আসিত, এমত নহে, নানা প্রকার লোকে নানা প্রকার দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আসিত। বালক-বালিকার জন্ত নানা প্রকার ক্রীড়া-দ্রব্য, যুবক-যুবতীদিগের জন্ত নানা প্রকার অলঙ্কার, সকলের জন্তই পরিধেয়, খাদ্য ও অন্যান্য নানারূপ ব্যবহার্য্য দ্রব্য তথায় দিবানিশি বিক্রয় হইত। ক্রেতাগণ তথায় দিবানিশি বাস্তব রহিয়াছে।

যখন বিমলা আপন সঙ্গিনীদিগের সহিত মহেশ্বর-মন্দিরে পৌছিলেন, তখন রজনী আগত হইয়াছে। বিশ্রাম করিয়া আহারাদি করিতে করিতে রজনী দ্বিপ্রহর হইল। বিমলার সঙ্গিগণ তাঁহাকে সে রাজ্যিতে পূজা করিতে নিষেধ করিল; কিন্তু বিমলার হৃদয় চিন্তা-পরিপূর্ণ। তিনি বলিলেন, “আমাকে ক্ষমা করুন, আমি উপাসনা না করিয়া অশ্রয়ন করিব না, যদি করি, নিদ্রা হইবে না।” এই বলিয়া বিমলা একাকিনী ধীরে ধীরে মন্দিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রোদয় হইয়াছে, সম্মুখে উচ্চ মহেশ্বর-মন্দির চন্দ্রালোকে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া

গভীর নীল আকাশপটে ঘন চিত্রের স্তায় স্তম্ভ রহিয়াছে। চারিদিকে উজ্জ্বল খেত সৌধমালা চন্দ্রকিরণে রৌপ্যমণ্ডিতের স্তায় শোভা পাইতেছে, সেই সৌধমালা হইতে অসংখ্য প্রদীপালোক বহির্গত হইয়া নয়নপথে পতিত হইতেছে। মধ্যস্থ প্রশস্ত ভূমিখণ্ড প্রায় জনশূন্য হইয়াছে, যে স্থানে সমস্ত দিন কলরব হইত—ছিল, এক্ষণে সেই স্থান প্রায় নিস্তক হইয়াছে। স্থানে স্থানে বৃক্ষপত্রের মধ্যে পুঞ্জ পুঞ্জ থাওয়াতমালা নয়ন-রঞ্জন করিতেছে। শীতল সুগন্ধ সমীরণ রহিয়া রহিয়া বহিতেছে ও নিকটস্থ উচ্চ বৃক্ষ হইতে সুমধুর গভীর রব বাহির করিতেছে। সেই রব ভিন্ন অন্য রব নাই; কেবল স্থানে স্থানে পেচকের শব্দ শুনা যাইতেছে; কেবল কখন কখন দূরস্থ ক্ষেত্র হইতে দুই একটা গভীর হাহারব শুনা যাইতেছে; কেবল দূরস্থ গ্রামবাসিনীগের গীত গান বায়ুপথে আরোহণ করিয়া কখন কখন কর্ণকূহরে প্রবেশ করিতেছে। সে সময়ে, সে স্থানে এই গীত শুনিতে বড় স্থূললিত বোধ হয়।

এই নিস্তক শান্তপথে যাইতে যাইতে বিনলার হৃদয়ও কিছু শান্ত হইল; চিন্তা কিঞ্চিৎ পরিমাণে দূর হইতে লাগিল, প্রকৃতির নিস্তকতা দেখিয়া বিমলার হৃদয়েও শান্তভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল। সেই দেবারতনে প্রাতঃকালে দুই একটি করিয়া লোক সমবেত হয়; মধ্যাহ্নে কোলাহলের সীমা থাকে না, সায়াংকালে সেই কলরব ক্রমে হ্রাস হইয়া আইসে। রজনীতে সমস্ত নির্জন, নিস্তক, শান্ত। বিমলা বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আমাদের জীবনেও এই-রূপ। শৈশবে মনের প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে চলিতে থাকে, যৌবনে সেই প্রবৃত্তিসমূহের হৃদ্যন্ত প্রভাপ—যেন জগৎসংসারকে গ্রাস

করিবে; বার্ষিকো ক্রমে নিম্নেজ হইয়া আইসে; শীতই শান্ত, নিম্নেজ, অনন্ত সাগরে লীন হইয়া যায়—চারিবিদ্যুৎ রত অনন্ত সাগরে লীন হইয়া যায়। তবে এত ধ্বংস কেন?—এত কর্ণ, এত গর্জ, এত কোশল, এত মল্লগা কেন? এত ক্রোধ, এত লোভ, এত অর্থলালসা, এত উচ্চাভিলাষ কেন? কে বলিবে কেন? বিধির নির্বন্ধ কে বুঝিবে? যে পতঙ্গ মুহূর্ত্তমধ্যে ভস্মসাৎ হইবে, তাহার পক্ষবিস্তার করিয়া আকাশ-দিকে ধাবমান হওয়া কেন? যে শিশিরবিন্দু মুহূর্ত্তমধ্যে মনুষ্যপদে দলিত হইবে বা প্রাতঃ-কালের রবিকিরণস্পর্শে শুকাইয়া যাইবে, তাহার হীরকখণ্ডের জ্যোতি-বিস্তার কেন? এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে বিমলা সহসা রজনী দ্বিপ্রহরের ঘণ্টারব শুনিতে পাইলেন। সেই ঘণ্টারব চতুর্দিকস্থ সৌধমালার প্রতিভাত হইয়া দশগুণ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বায়ুমার্গে সঞ্চরণ করিতে লাগিল; নিম্নক নৈশ গগনে আরোহণ করিয়া সঞ্চরণ করিতে লাগিল। ঘণ্টারব শেষ না হইতে হইতে দ্বিপ্রহরের পূজা আরম্ভ হইল। সপ্ত-স্বরে মিলিত হইয়া মহেশ্বরের অনন্ত মতিমা গীত হইতে লাগিল। কাদম্বিনীর গম্ভীর নির্ঘোষবৎ সেই গীত কখন মন্দীভূত, কখন সতেজে উচ্চারিত হইতে লাগিল; উপাসক-দিগের মন দ্রবীভূত হইতে লাগিল। বিমলা সপ্তস্বরে সেই গানের সহিত যোগ দিলেন, তাঁহার হৃদয় পবিত্র প্রেমে ও উল্লাসে প্রাবিত হইতে লাগিল।

বিমলা যখন মন্দিরের ভিতর আসিয়া পৌছিলেন, তখন আর অধিক উপাসক ছিল না, প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছিল। বিমলা পূজার রত হইলেন।

প্রায় এক প্রহরকাল মুদিতমননে নিম্পন্দ-

শীত্রে বিমলা পূজা করিতে লাগিলেন; হৃদয়ে যে পবিত্র কামনা উদয় হইতেছিল, বিমলার বদনমণ্ডলে তদনুরূপ পবিত্র ভাব অঙ্কিত হইতে লাগিল। বিমলার মাতা-ভ্রাতা, ভগিনী, স্বামী, বন্ধু কেহ নাই, পিতাই এক-মাত্র ভক্তির আধার, পিতাই স্নেহের পাত্র, পিতাই পরম বন্ধু, পিতাই পূজনীয় দেবতা। বিমলার অপার স্নেহশ্রোত, অপরিদৌম ভক্তিশ্রোত সেই একমাত্র আধারভিমুখে ধাবমান হইল। পিতার দুঃখেই দুঃখ, পিতার আনন্দেই আনন্দ, পিতার বিপদে চিন্তা, পিতার সম্পদে ভরসা, বিমলা পিতার জীবনেই জীবন ধারণ করিতেন। সেই পিতার মঙ্গলার্থ প্রার্থনা করিতে করিতে বিমলার হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল; হৃদয়ের নিভৃত কন্দর পর্যন্ত ভক্তিরসে প্রাবিত হইল, অর্দ্ধপ্রহর কাল বিমলা উপাসনা করিলেন। উপাসনান্তে যখন বিমলা প্রণিপাত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তখন তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে চিন্তাশূন্য ও শান্ত।

তখন বিমলা একেবারে মন্দির হইতে বহির্গত না হইয়া ঔৎসুক্যাকুললোচনে মন্দিরের চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি অনেক দিন এ মন্দিরে আইসেন নাই, মন্দিরের সকল দ্রব্যই নূন্য বোধ হইতে লাগিল। বিমলা একরূপ অসুস্থিত, প্রশস্ত, চমৎকার অট্টালিকা কখন দেখেন নাই। কখন কখন সুবর্ণমণ্ডিত পুষ্পালঙ্কৃত শুভ্রসমূহ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; কখন কখন ভিত্তির উপর সুন্দর ভাস্কর্য্যাবলোচন করিতে লাগিলেন; কখন ধীরে ধীরে ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতে লাগিলেন; কখন দুহ এক জন দেবদাসকে মন্দির-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। উপাসক আর কেহই নাই, সুতরাং বিমলার এইরূপ ঔৎসুক্যে কোন ব্যাঘাত জন্মে নাই।

একপাশে একমাত্র উপাসক নিদ্রিত
রহিয়াছেন, সহসা বিমলার নয়ন সেই দিকে
পতিত হইল। তাঁহার অলৌকিক তেজঃ-
পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমলা বিস্মিত হই-
লেন, নয়ন আর সে দিক্ হইতে অস্ত্র দিকে
ফিরাইতে পারিলেন না। যুবকের ললাট
উদার ও প্রশস্ত, কিন্তু নিদ্রাতেও যেন কোন
গাঢ় চিন্তায় ক্লান্ত রহিয়াছে। নয়ন মুদিত,
বদনমণ্ডল উজ্জ্বল ও বীরদৰ্প-প্রকাশক।
উপাসকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া
বিমলার বোধ হইল, যেন কোন বীরপুরুষ
বীরত্বে ব্রতী হইয়া দূরদেশ-যাত্রা করিতে-
ছেন, পথিমধ্যে এই দেবমন্দিরে উপাসনা
করিতে আসিয়াছেন; শ্রান্তিবশতঃ বা অস্ত্র
স্থান না থাকাতে উপাসনাস্থে এই স্থানেই
নিদ্রিত রহিয়াছেন। বিমলার অবলা-হৃদয়েও
বীরভাবের অভাব ছিল না; সুতরাং উপা-
সকের এই অলৌকিক বীর আকৃতি দেখিয়া
তাঁহার হৃদয় সহসা স্তম্ভিত হইল; অনিমেষ-
লোচনে সেই বীরপুরুষের দিকে নিরীক্ষণ
করিতে লাগিলেন।

উপাসকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি
গাত্ৰোত্থান করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; চক্ষু
উন্মীলন করিয়াই দেখিলেন, সম্মুখে উজ্জ্বল-
নয়না তরুণী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। চারি
চক্ষুর মিলন হইবামাত্র বিমলার সংজ্ঞা হইল,
অপরিচিত পুরুষের দিকে দেখিতেছিলেন,
জ্ঞান হইল, লজ্জার মুখ অবনত করিয়া ধীরে
ধীরে মন্দির হইতে নিষ্কাশিত হইলেন।

নিশা প্রভাতপ্রায় হইয়াছে। প্রাতঃ-
কালের প্রথম রশ্মি বিমলার নয়নোপরি
নিপতিত হইল। চারিদিকে দুই এক জন
করিয়া লোক বাহির হইতেছে। লোকের
সম্মুখে পদব্রজে যাওয়া বিমলার অভ্যাস
নাই, বিমলা ক্লান্ত হইয়া ক্ষতবেগে বাস-

স্থানাভিমুখে চলিলেন। প্রান্তীক্ষণ করিয়া
লিঙ্গাসা করিবেন, বিমলা এতক্ষণ কি
করিতেছিলেন, তখন তিনি কি বলিবেন ?
এতক্ষণ কি তিনি উপাসনা করিতেছিলেন ?

বিমলার অন্তর্য্যাক্ত দ্বিষ্টা হইতে লাগিল।
এ বীরপুরুষ কে ? কি ব্রতে ব্রতী হইয়া
সমস্ত রাত্রি উপাসনা করিতেছিলেন ? এমন
ভাগ্যবান বীরপুরুষের প্রার্থনীয় কি আছে ?
এইরূপ নানা চিন্তায় অভিভূত হইয়া বিমলা
শয়নগৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ ।

পরিচয় ।

AMID the jagged shadows
Of mossy leafless boughs.
Kneeling in the moonlight
To make her gentle vows

Her slender palms together prest,
And heaving sometimes on her breast ;
Her face resigned to bliss her bale,—
Her face O ! call it fair not pale.—
And both her eyes more blight than clear.
And each about to have a tear.

Coleridge.

সমস্ত রাত্রি-জাগরণের পর কিঞ্চিৎ
আরামলাভ কবিবার জন্ত বিমলা আপন
শয়নভবনে গমন করিলেন। দিনের বেলা
বড় অধিক নিদ্রা হইল না, যাহা হইল, তাহা
স্বপ্নে পরিপূর্ণ। সেই দেব-প্রাক্ষণ, সেই
চন্দ্রালোকে মহেশ্বরগীত, সেই দেবমন্দিরে
মহেশ্বরমূর্তি, তৎপার্শ্বে সেই উপাসক, বিমলা
এই সমস্ত বিষয়ের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

নিদ্রাভঙ্গে বিমলা দেখিলেন, গৃহে সূর্য্যরশ্মি
পতিত হইয়াছে, প্রাক্ষণে লোকের লম্বাগম

হইয়াছে; কলরব শুনা যাইতেছে। নিশি-
জাগরণে বিমলার চক্ষে কালিমা পাড়িয়াছে;
তাহার স্বাভাবিক গৌর-বদন রক্তশূন্য হইয়া
অধিকতর গৌর হইয়াছে; কপোলে, গণ্ডে,
বক্ষঃস্থলে ঈষৎ বর্ণ হইয়াছে। বিমলা আলু-
লায়িত কেশ কথঞ্চিৎ বন্ধ করিয়া গাত্রোখান
করিলেন।

সমস্ত দিন বিমলা অন্তমনস্কার ভ্রম হইয়া
রহিলেন। পূৰ্ণ-রাত্রির কথা তাহার বার
বার মনে পড়িতে লাগিল। অনেক চিন্তা
করিয়া কারণ বুঝিতে পারিলেন না।

সে দিন রজনী এক প্রহরের সময় বিমলা

উপাসনার্থ গমন করিলেন। সমস্ত দিন যদিও
তিনি অন্তমনস্কা হইয়া ছিলেন, উপাসনার
সময় তাহার চিত্ত স্থিরভাব ধারণ করিল।
তিনি প্রণিপাত করিয়া উপাসনা শেষ
করিলেন।

উঠিবারাত্র তিনি পুনরায় সেই অপরি-
চিত উপাসককে দেখিতে পাইলেন। তিনিও
পূজা সমাধা করিয়া গাত্রোখান করিয়াছেন।
বিমলার চিত্তসংযমের ক্ষমতা ছিল, তিনি
চিত্ত-সংযম করিলেন। স্বর্ণকমাত্র সেই
উপাসকের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া বিমলা
অবনতমুখে মন্দির হইতে বাহির হইবার
উদ্যম করিলেন।

যুবক কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। তুই
দিনই সেই পরম স্নন্দরী রমণীকে দেখিতে
পাইলেন, তুই দিনই স্নন্দরী একদৃষ্টে তাহার
দিকে ক্ষণেকমাত্র চাহিয়াছিলেন। তাহার
হৃদয়ে এই স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে, এই রমণীর
কিছু বিশেষ বক্তব্য আছে; কিন্তু লজ্জায়
অপরিচিত পুরুষের সমন্বিত কথা কহিতে
পারিতেছেন না। তাহার ইচ্ছা হইল, একবার
নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু অপরি-
চিতা তরুণী ভদ্রকস্তারসহিত কিরূপে বাক্যা-

লাপ করিবেন? তুই দিনের কথা ক্ষণেক
চিন্তা করিয়া অবশেষে ভাবিলেন, যদি আমি
না জিজ্ঞাসা করি, বোধ হয়, কোন বিশেষ
গুঢ় কথা অব্যক্ত থাকিয়া যাইবে—বোধ হয়,
যে কারণে রমণী মন্দিরে আসিয়াছেন, তাহা
নিষ্ফল হইবে।

যুবক ধীরে ধীরে বিমলার নিকটে যাইয়া
বলিলেন, “ভদ্রে! অপরিচিত হইয়াও আপ-
নার সহিত কথা কহিতেছি, ধৃষ্টতা মার্জনা
করিবেন; কিন্তু আমার বোধ হইতেছে,
আপনার কিছু বক্তব্য আছে—যদি থাকে,
আজ্ঞা করুন।”

বিমলার কর্ণে অমৃতবর্ষণ হইল, তাহার
শরীর ঈষৎ কম্পিত হইল, বিমলা মুখ অবনত
করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যুবক দেখিলেন, কোন উত্তর নাই, অথচ
রমণী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তিনি পুনরায়
জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভদ্রে! আপনার যদি
কিছু বক্তব্য থাকে, বলুন, আমি শুনিতেছি,
এখানে আর কেহই নাই।”

বিমলার বিহ্বলতা অধিকক্ষণ স্থায়ী নহে।
তিনি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপ-
নার নাম কি?”

যুবক উত্তর করিলেন, “নাম এক্ষণে
অজ্ঞাত থাকিবে, আমাকে অধুনা ইন্দ্রনাথ
বলিয়া জানিবে।”

বিমলা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপ-
নার মহেশ্বর-মন্দিরে উপাসনার কারণ
জিজ্ঞাসা করিতে পারি?”

ইন্দ্রনাথ। সংক্ষেপে বলিতেছি। কোন
অনাথা আশ্রয়হীন স্ত্রীলোকের সাহায্যে
কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি।

বিমলা। ধন দ্বারা কোন সাহায্য হইতে
পারে?

ইন্দ্রনাথ। না; কিন্তু আপনাকে অপূরি-

চিতের উপকারার্থ তৎপর দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। ঈশ্বর আপনাকে সুখে রাখুন।

বিমলা। তবে কিরূপে সাহায্য হইবার সম্ভব ?

ইন্দ্রনাথ। বিচার। আমি মুক্তের-যাত্রা করিয়া বিচার-প্রার্থনা করিব। কিন্তু আপনি এ সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন ?

বিমলা মুক্তের নাম শুনিয়া পিতার কথা স্মরণ করিলেন, পিতার বিপদ স্মরণ করিলেন, তখন লজ্জা একেবারে দূরীভূত হইল; সন্তল-নয়নে ইন্দ্রনাথকে বলিলেন, “আপনি বোধ হয় বীরপুরুষ, আপনার ক্ষমতা অপর, প্রতিজ্ঞা করুন, দাসীর একটি ভিক্ষা প্রতিপালন করিবেন।”

ইন্দ্রনাথ। রমণি! আমার ক্ষমতা নাই; কিন্তু সাধ্যমতে আপনার আজ্ঞা পালন করিতে যত্ববান হইব; আজ্ঞা করুন।

বিমলা। মুক্তেরে আপনি বঙ্গদেশের দেওয়ান সতীশচন্দ্রকে দেখিতে পাইবেন। তিনি এক্ষণে বিপদজ্বালে বেষ্টিত, প্রতিজ্ঞা করুন, তাঁহাকে রক্ষা করিতে যত্ন করিবেন।

ইন্দ্রনাথের মুখ গম্ভীর হইল; ললাট কুঞ্চিত হইল। বিমলা আবার বলিতে লাগিলেন, “এ বিষয়ে আপনি চিন্তা করিতেছেন কেন? বিপদের বিপদশাস্তি করাই বীরপুরুষের কার্য। আর যদি কখন তাঁহাকে অসং লোক বলিয়া শুনিয়া থাকেন, সে জঘন্য মিথ্যাকথা শকুনির প্রতারণা।”

ইন্দ্রনাথ। আমি আপনার কথা বুঝিতে পারিতেছি না, স্পষ্ট করিয়া বলুন। শকুনি কে?

বিমলা। শকুনি সতীশচন্দ্রের শনি। সেই পামরই সকল দোষে দোষী। সতীশচন্দ্রের উদার চরিত্রে কোন দোষ স্পর্শে না। বীরপুরুষ। এই দেবালয়ে অঙ্গীকার করুন, আপনি সতীশচন্দ্রের সহায় হইবেন।

ইন্দ্রনাথ এই সকল কথা শুনিয়া হতজ্ঞান হইলেন, কিঞ্চিৎ পরে বলিলেন, “যদি যথার্থই সতীশচন্দ্র নির্দোষী হন, তবে আমি নিজ শোণিত দিয়া তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিব। কিন্তু আপনার নাম কি বলুন। আপনি কে, কিরূপেই বা আমার উপাসনা, আমার প্রতিজ্ঞার কারণ জানিতে পারিলেন?”

বিমলা ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, “আপনার উদ্দেশ্য আমি জানি না, কিন্তু আপনি কোন মহৎ বীরপুরুষ, মুক্তেরে কোন মহৎ উদ্দেশ্যে যাইতেছেন, আমার হৃদয় আমাকে বলিতেছে। আপনার পরিচয়ও কিছু পাইতে ইচ্ছা হইতেছে।”

ইন্দ্রনাথ। আমার পরিচয় এই পর্য্যন্ত জানিবেন, আমি কোন কায়স্থ জমীদারের সন্তান, যুদ্ধ-বাবসার শিথিবার জন্ত মুক্তের যাইতেছি।

ব্রাহ্মণকুমারী নিমন্ত্বে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অপরিচিত নৌকাস্বামী।

How he heard the ancient helmsman

Chant a song so wild & clear,

That the sailing sea-bird slowly

Poised upon the mast to hear.

Till his soul was full of longing.

and he cried with impulse strong.—

“Helmsman for the love of heaven

Teach me, too, that wondrous song!”

Longfellow.

গঙ্গানদীর উপর মুক্তেরের ভীমকান্ত হুর্গ শোভা পাইতেছে, কল কল শব্দে গঙ্গার তরঙ্গমালা বহিয়া যাইতেছে, এক একবার

দুর্গের উপর আঘাত করিতেছে, আবার ফেনময় হইয়া জলবেগে বহিয়া যাইতেছে। কোথাও কোথাও তীরের যুক্তিকারাদি সম্বন্ধে জলে পতিত হইয়াছে। বারিরাশি কিঞ্চিদাত্মক কলুবিত ও চঞ্চল হইয়া পুনরায় মুহূর্ত্তমধ্যে আপন গভীররূপ ধারণ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। স্থানে স্থানে শুভ্র বালুকার চর দেখা যাইতেছে। সেই চরে নানাপ্রকার পক্ষী বিচরণ করে। কোথাও বা তীরবাসিগণ অবতরণ করিয়া সায়ংকালের ভোজ্য পাক করিতেছে, সেই তরী হইতে অসংখ্য দীপ তারকাভোষিতরূপে বহির্গত হইয়া গঙ্গার প্রশস্ত বক্ষে ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে; আকাশেও ক্রমে ক্রমে দুই একটি তারা দেখা যাইতেছে, গঙ্গাতীরে দুই এক জন উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছে, নগর ক্রমে নিশ্চল হইয়া আসিতেছে।

সেই গঙ্গাতীরে একজন যুবাধিকার একাকী ভ্রমণ করিতেছেন, তিনি আমাদের পূর্ব-পরিচিত ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথ অত্যন্ত মুগ্ধের পৌছিয়াছেন, চিন্তাময় হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন।

ইন্দ্রনাথ কি করিতে মুগ্ধের আসিয়াছেন? সমরসিংহের মৃত্যুর প্রতিহিংসা সাধন জ্ঞাত! সত্য, কিন্তু সে প্রতিহিংসা কিসে সাধন হইবে? আপনি আশ্রয়হীন, সহায়-হীন, সম্পত্তিহীন, অপরিচিত লোক হইয়া কিরূপে সে প্রতিহিংসা সাধন করিবেন? রাজা টোডরমল মুগ্ধের আছেন, তাহার নিকট যাইয়া বিচার প্রার্থনা করিলে হয় না? রাজা টোডরমল এক্ষণে যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়ে মগ্ন, এক্ষণে কিরূপে তিনি অন্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন? বঙ্গদেশ এখনও জয় করিতে পারেন নাই, কিরূপে বঙ্গবাসিদিগের ভ্রাতৃ অস্তায় বিচরণ করিবেন? আর যদিই বা সে বিচার করিতে এক্ষণে সক্ষম

হন, অপরিচিত লোকের কথা বিশ্বাস করিবেন কেন? মাতৃবর দেওয়ানজীর বিরুদ্ধে একজন অপরিচিত ভ্রমীদারপুত্র যাহা বলিবেন, তাহা কি বিশ্বাসনীয়? রাজা টোডরমল বিচার করিতে সক্ষম হইলেও ইন্দ্রনাথ এমন প্রমাণ কোথায় পাইবেন যে, সতীশচন্দ্রের উপর দোষারোপ হইবে?

আর সহসা দোষারোপ করা কি উচিত? মহেশ্বর-মন্দিরে অপরিচিতা রমণী যাহা বলিয়াছেন, ইন্দ্রনাথ তাহা বিশ্বস্ত হন নাই। সে রমণী যে মিথ্যা কথা বলিয়াছেন, তাহাও বোধ হয় না; কিন্তু তাহার কথা যদি সত্য হয়, তবে সতীশচন্দ্র নিরপরাধী। নিশ্চয় না জানিয়া কি সতীশচন্দ্রের উপর দোষারোপ করা উচিত?

আর সেই রমণী যাহার নাম করিয়াছিল, সে শকুনিই বা কে? ইন্দ্রনাথ যত ভাবিতে লাগিলেন, ততই অধিকতর ইতিকর্ষব্য-বিমূঢ় হইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ একাকী সেই গঙ্গাতীরে পাদচারণ করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; অবশেষে শ্রান্ত হইয়া সেই তীরে উপবেশন করিলেন। ভাবিলেন, এক্ষণে কোন উপায় দেখিতেছি না; মুগ্ধেরে কিছু দিন অবস্থান করা যাউক, সময় বুঝিয়া কার্য করিব।

সহসা এক অপূর্ব স্বর্গীয় সঙ্গীতে ইন্দ্রনাথের চিন্তাভঙ্গ হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, সেই বিস্তীর্ণ জলরাশির চন্দ্রাদোকো-জ্জল বক্ষঃস্থলে একটি ক্ষুদ্র তরী ভাসমান রহিয়াছে, তাহার একমাত্র আরোহী সেই গান করিতেছে। গান বিশেষ মধুর কি না, জানি না, কিন্তু ইন্দ্রনাথের কর্ণে স্বর্গীয় সঙ্গীতের ভ্রাতৃ বোধ হইল।

সেই গান একবার, দুইবার, তিনবার

গীত হইল ; গকায় অনন্ত গীতের সহিত মিলিত হইয়া বায়ুপথে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। ক্রমে ভাসিতে ভাসিতে সেই নৌকা ইন্দ্রনাথ যে স্থানে ছিলেন, তাহারই নিকটে আসিল। ইন্দ্রনাথ দেখিলেন, নৌকার উপর একজন ভদ্রলোক একাকী স্বহস্তে নৌকা বাহিতেছেন ও আপন মনে গান করিতেছেন।

সেই ভদ্রলোককে দেখিয়া ও তাঁহার গান শুনিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে ইন্দ্রনাথের ইচ্ছা হইল। প্রথমে তাঁহাকে মুদ্রের-সম্বন্ধে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনিও আগ্রহের সহিত উত্তর দিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে উভয়ের মধ্যে প্রণয়-সঞ্চার হইল।

তখন ইন্দ্রনাথ বলিলেন, “মহাশয় ! যদি অনুমতি দেন, তবে আমি আপনার নৌকায় যাইয়া আমিও একবার চন্দ্রলোকে দাঁড় বাহিব এবং আপনার অপূর্ণ গান আর একবার শুনিয়া হৃদয় তৃপ্ত করিব।”

নৌকারোহী উত্তর করিলেন, “আপনার স্ত্রায় লোকের সহিত সাফাং হওয়া আমারই ভাগ্য, আসুন, নৌকায় আরোহণ করুন ; আর যদি হতভাগ্যের গানে রুচি হয়, শ্রবণ করুন।”

আবার নৌকা বাহিত হইল, আবার সুন্দর খেদপূর্ণ গীতে নৈশগগন পূর্ণ হইল।

অনেকক্ষণ পর নৌকাস্বামী ইন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয় মুদ্রের কবে আসিয়াছেন ?”

ইন্দ্রনাথ। আমি অজুই আসিয়াছি।

নৌকাস্বামী। আপনার নাম কি ?
নিবাস কোথায় ?

ইন্দ্রনাথ। আমাকে ইন্দ্রনাথ বলিয়া জানিবেন, নিবাস অনেক দূরে, নদীয়া জিলায়।

নৌকাস্বামী। নদীয়া জিলায় কোন্ গ্রামে ?

ইন্দ্রনাথ। ইচ্ছাপুর গ্রামে।

নৌকাস্বামী। ইচ্ছাপুর গ্রামে ? আপনি কাহার পুত্র, জিজ্ঞাসা করিতে পারি ?

ইন্দ্রনাথ। কেন, আপনি ইচ্ছাপুরে গিয়াছিলেন না কি ?

নৌকাস্বামী অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, “আমায় কার্য্য-বশতঃ সকল স্থানে বাহিতে হয়, আপনার পিতার নাম কি ? হইতে পারে, আমি তাঁহাকে চিনিলেও চিনিতে পারি।”

ইন্দ্রনাথ আপন পরিচয় সকলেরই নিকট লুকাইয়া রাখিতেন, শুণ্ডভাবেই দেশবিদেশ পর্যটন করিতেন, কিন্তু ইহার নিকট পিতার নাম লুকাইবার কারণ দেখিতে পাইলেন না। ভাবিলেন, আমি অনেক দিন পিত্রালয় হইতে আসিয়াছি, যদি এই ভদ্রলোক সম্প্রতি সে গ্রাম হইতে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার পিতার কুশল সংবাদ দিলেও দিতে পারেন। বলিলেন, “ইচ্ছাপুরের জমিদার নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী আমার পিতা।” অপরিচিত ভদ্রলোক শুনিয়া মহশী চমকিত হইলেন ; হস্ত দ্বারা নয়নদ্বয় আবৃত করিয়া ধরিলেন—“হা নগেন্দ্রনাথ ! পুণ্যাত্মা নগেন্দ্রনাথ !”

পরে চিত্তসংযম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার নাম কি ইন্দ্রনাথ ?” ইন্দ্রনাথ তখন বলিলেন, “ইন্দ্রনাথ আমার কখনই নাম নহে, চিরকালই আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ ; তবে অজ্ঞাতরূপে দেশবিদেশ পর্যটন করিতে হয়, এই জন্ত মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রনাথ নাম ধারণ করি।”

“সুরেন্দ্রনাথ !” এই কথাযাত্র উচ্চারণ করাতে অপরিচিতের চক্ষে জল আসিল,

আর কিছু বলিতে পারিলেন না। কণেক পর বলিলেন, “আমার খাল্যাবস্থার পুণ্যাত্ম নগেন্দ্রনাথের বাসিতে কিছু কাল ছিলাম, সেই হেতু আপনাকে লৈশবাহার আমি দেখিয়াছিলাম। এক্ষণে আমার পূর্ববন্ধুর সংসারের বিষয় জিজ্ঞাসা করি। নগেন্দ্রনাথ ভাল আছেন?”

ইন্দ্র। আছেন।

নৌ। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র এক্ষণে কোথায়?

ইন্দ্র। আমার জ্যেষ্ঠের অনেক দিন

কাল হইয়াছে।

নৌ। তাহার নাম উপেন্দ্রনাথ ছিল না?

ইন্দ্র। হাঁ।

নৌ। তাঁহার কাল হয় কিরূপে?

ইন্দ্র। ইচ্ছাপুরে বড় বাঘের ভয়, আমার জ্যেষ্ঠকে বাঘে লইয়া যায়। আমার জ্যেষ্ঠকে প্রায় স্মরণ নাই। অনেক বৎসর হইল, তাঁহার কাল হইয়াছে।

নৌ। মাতাঠাকুরাণী কেমন আছেন?

ইন্দ্র। জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যুবাস্তা শুনিয়া তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন, সেই দুঃখে তাঁহার রোগ হয়, সেই রোগেই তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ হয়।

প্রায় এক দণ্ড কাল কেহ কথা কহিলেন না, এক দণ্ড কাল নৌকা জলে ভাসিতে লাগিল, এক দণ্ড কাল পরে ইন্দ্রনাথ চাহিয়া দেখিলেন, দর-বগলিত অশ্রুধারায় অপরিচিতের মুখমণ্ডল, বন্ধুস্থল ও সমস্ত বস্ত্র সিক্ত হইয়া গিয়াছে। ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেন।

নৌকা প্রায় এক ক্রোশ ভাসিয়া গেল, গঙ্গার জল উজ্জল চন্দ্রালোকে ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে, আকাশে দুই এক খণ্ড শুভ্র মেঘ দেখা যাইতেছে কখন কখন চন্দ্রকে ঈষৎ আবৃত করিতেছে, আবার বায়ুতে তাড়িত হওয়াতে চন্দ্রের পুণ্য জ্যোতিঃ নদীর প্রশান্ত

বকে পতিত হইতেছে। আকাশ গভীর নীলবর্ণ, দুই একটি তারা লজ্জাবতী নববধূর দ্বার কখন কখন মুখ দেখাইতেছে। জগতে সমস্ত জীব নিশ্চল, কেবল কখন কখন দূর হইতে একটি গীত বায়ুমার্গে ভাসিয়া আসিতেছে আর সেই বিস্তীর্ণ গঙ্গা-বারিতে ও পার্শ্বস্থ শুভ্র সৈকতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। গঙ্গার আর একখানি নৌকাও চলিতেছে না, কেবল সুরেন্দ্রনাথের ক্ষুদ্র তরী তর তর শব্দে ভাসিতেছে।

বাইতে বাইতে তীর হইতে একটি আলোক দৃষ্ট হইল। তখন অপরিচিত নৌকারোহী সেই আলোক দেখাইয়া ধীর-স্বরে বলিলেন, “এ আমার গৃহ, আর উহার অনতিদূরে বে নিরুপ্ত দেখিতেছেন, এ স্থানে আমার হৃদয় সংস্থাপিত আছে।”

নৌকাধারীর গভীর ভাবে চমকিত হইয়া সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি করিলেন,—দেখিলেন, তাঁহার চক্ষুতে অশ্রু-বিন্দু টল টল করিতেছে। সুরেন্দ্রনাথের হৃৎকের সঞ্চার হইল; স্নেহপূর্বক সেই জলমোচন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বন্ধু, আপনার নাম আমি জানি না, আপনার কার্য্য জানি না, কিন্তু তথাপি আপনাকে বন্ধু বলিয়া—ভ্রাতা বলিয়া বোধ হইতেছে। মনের দুঃখ বন্ধুর নিকট, ভ্রাতার নিকট, থলিয়া বলুন, যদি আমার সাধ্য থাকে, আপনার দুঃখ মোচন করিব।”

নৌকাধারী উত্তর করিলেন, “যদি আমার প্রতি আপনার রূপা হইয়া থাকে, অল্পগ্রহবোধে আমার কুটীরে আসুন, আমি সমস্ত কথা আপনাকে নিবেদন করিব।”

সুরেন্দ্রনাথ সম্মত হইলেন। তরী তীরে লাগিল। দুই জনে নিঃশব্দে সেই তরী-চালকের ক্ষুদ্র কুটীরে গমন করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

নৌকাস্বামীর পূর্বকথা ।

How sweet the days that I have spent.

In you sequestered bower ;

Those citrwon trees, still seet of Scent,

Had then some magic power.

Or some fair spirit did reside,

In that sweet purling brook,

Which runs by you green mountain side.

Now haunted by the rook.

No charm was in the spicy grove,

No spirit in the stream.

O'twas the smile of her I love.

Now vanished like a dream !

I. C. Dutt.

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার নতুন বন্ধুর কুটীরে আসিলেন,—দেখিলেন, কুটীর ক্ষুদ্র, কিন্তু ঘর পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। বাহিরে একটি ক্ষুদ্র বাগান আছে, তাহাতে কয়েকটি ফল-বৃক্ষ আছে, নিকটে একটি গ্রাম আছে, সম্মুখে অনন্ত নদী, পশ্চাতে সুন্দর কুঞ্জবন ও ধানক্ষেত্র। সেই কুটীরস্বামী মুন্সেরে সামান্য কার্য্য করিতেন, কিন্তু স্বভাবতঃ চিন্তা ও খেদপরায়ণ হওয়ার নগর হইতে দূরে একটি গ্রামের নিকট বাটা করিয়া-ছিলেন, তথায় একাকী থাকিতেন, একাকী গীত গাইতেন এবং সায়ংকালে একাকী আপন নৌকা আপনি নদীবেগে বাহিতেন। উঃয়ে উপবেশন করিলে পর সেই অপরিচিত, সুরেন্দ্রনাথকে বলিতে লাগিলেন, “যুবক! আপনার হৃদয়ে যদি ক্রোধ ও দর্প থাকে, তাহা ত্যাগ করুন। এই দর্পেই আমার সর্বনাশ হইয়াছে। শৈশবাবস্থা হইতে আমি অতিশয় গর্বী ছিলাম। শুনিয়াছি, অতি শৈশবেও আমার কোন বিষয়ে ইচ্ছা যদি সম্পন্ন না হইত, তাহা হইলে

আমি একদিন, দুই দিন অনাহারে থাকিতাম, এই বিজাতীয় ক্রোধেই আমার সর্বনাশ হইয়াছে।

বালাবস্থায়ও এইরূপ ছিলাম। আমার মন স্বভাবতঃ পাঠাভ্যাসে রত হইত, কিন্তু কখন যদি গুরুমহাশয় অজ্ঞায় তিরস্কার করিতেন, তাহা হইলে আমার সেই বিজাতীয় ক্রোধের আবির্ভাব হইত, পুস্তক দূরে নিক্ষেপ করিতাম, সহস্র বেত্রাঘাতেও আমি কথা কহিতাম না, ক্রন্দন করিতাম না। গুরুমহাশয় আমাকে ভালবাসিতেন, কিন্তু সময়ে সময়ে আমার ক্রোধ দেখিয়া আমার উপর অতিশয় রুষ্ট হইতেন। একদা এরূপ রুষ্ট হইয়া আমাকে সহস্র যাতনা দিলেন, আমি ক্রন্দন করিলাম না, মুহূর্ত্তমধ্যে অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলাম। তখন গুরুমহাশয়ের সংজ্ঞা হইল। তিনি আমাকে পুত্রবৎ মেহ করিয়া কোড়ে করিলেন, জল-সেচন দ্বারা আমাকে শীত্ৰই চুতন দান করিলেন। সেই অবধি আমার পড়া সাক্ষ হইল। গুরুমহাশয় আর আমাকে পড়াইলেন না, আমি জগ্নের মত মুখ রহিলাম।

আমার মাতাঠাকুরাণী আমাকে কখন নিষ্ঠুর বাক্য বলেন নাট। তিনি আমার হৃদয় জানিতেন ও আমাকে এরূপ ভালবাসিতেন যে, কখনও তাঁহার একটি কথাতেও মনে বেদনা জন্মে নাট। আমি পিতার অবাধ্য হইয়াছি, গুরুর অবাধ্য হইয়াছি, কিন্তু কস্মিনকালেও মাতার একটি কথা অবহেলা করি নাট। গৃহের সমস্ত লোক উপরোধ করিলে, ভয় প্রদর্শন করিলে, প্রহার করিলে, আমি যে কার্য্য না করিতাম, মাতা ইচ্ছা-প্রকাশ করিলেই আমি তাহা করিতাম। হায়! সে স্নেহের প্রতিমাকে আমি আর দেখিতে পাইব না।”

বলিতে বলিতে বক্তার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, মুখ নত করিয়া তিনি অনবরত অশ্রুবিদ্যুৎ বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ অতিশয় দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন, আপনার মাতার কাল হইয়াছে?”

অপরিচিত উত্তর করিলেন, “শুনিয়াছি, তাঁহার কাল হইয়াছে।”

ক্ষণেক অশ্রুবিসর্জনের পর হৃদয় কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, “আমার পিতা দেশের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ কায়স্থ জমীদার ছিলেন। তাঁহার প্রভূত ক্ষমতা, লোকজন এবং সৈন্যসামন্ত ছিল এবং স্বভাবতঃ তিনি কিছু গর্বিত ও কষ্ট ছিলেন। আমাকে যথার্থ ভালবাসিতেন, আমার সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহার লোচন আনন্দে উৎফুল্ল হইত, আমার নিন্দা শুনিলে তাঁহার মুখ শ্লান হইয়া যাইত, তিনি সর্বদা স্বাভাবিক ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিতেন না। এক দিন আমাকে নির্দোষে প্রহার করিলেন ও বলিলেন, ‘তোর মুখ আর দেখিতে চাচি না, আমার গৃহ হইতে বাহির হইয়া যা।’ ‘চলিলাম’ বলিয়া আমি পিতৃগৃহ হইতে নির্গত হইলাম।

প্রহারে ও তিরস্কারে অনেক বালক শান্ত হয়, কিন্তু আমি ক্রোধে অন্ধ হইলাম; হৃদয়ে হতাশন জ্বলিতে লাগিল। সেই হতাশন পিতৃভক্তি, মাতৃস্নেহ, সকলই দগ্ধ করিল, সেই হতাশন আমার ভাবী সংসার-সুখ, পিতা-মাতার আশা-ভরসা একেবারে দগ্ধ করিল। পিতা আমাকে দূর হইতে বলিলেন, আমি দূর হইলাম। সেই অবধি আমি পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়াছি। তখন আমার বয়ঃক্রম আদশ বৎসর মাত্র।

তাঁহার পর কয়েক বৎসর আমার জীবন

যে ক্রুরূপে অতিবাহিত হইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন না। মরুভূমিতে প্রচণ্ড বায়ুর স্রোত আমার জীবনের দশ বৎসর বহির্ভাগে লাগিল। প্রচণ্ডতা আছে, কিন্তু ফল নাই অর্থ নাই, কাহারও উপকার নাই। নিষ্কল্যাণশূন্য পর্বতপার্শ্বে সমুদ্রগর্জনবৎ আমাঃ হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি-সমুদ্র গর্জন করিয়াছে, কিন্তু সে গর্জনের শ্রোতা নাই; সে গর্জনে কেহ আনন্দিত হয় নাই, কেহ বিস্মিত হয় নাই। পাতাল-প্রবাহিণী, ভৈরবকল্লোলিনী ভোগবতীর তরঙ্গমালার স্রোত আমার হৃদয়কন্দরে কত প্রবৃত্তি প্রবাহিত হইয়াছে, কিন্তু সে প্রবাহ ভোগবতীর স্রোত মনুষ্যের অদৃশ্য, অন্ধকারাচ্ছন্ন। দশ বৎসর অতীত হইলে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন শিশুসংসার আলোক-চ্ছটায় চমকিত ও উদ্ভীষ্ট হইল।”

এই পয়ান্ত বলিয়া বক্তা ক্ষণেক নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্রনাথ নিম্পন্দ-নেত্রে সেই অপূর্ণ উন্মত্তপ্রায় লোকের দিকে দেখিতে লাগিলেন; অনন্তমনে তাঁহার উন্মত্ততার কথা শুনিতে লাগিলেন। তিনিও ক্ষণেক পরে আরম্ভ করিলেন, “যে সকল প্রবৃত্তিতে আমার হৃদয় দশ বৎসর কাল ব্যথিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রেম সর্বপ্রাধান্য। (সুরেন্দ্রনাথ অধিকতর আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সামান্য স্বীলোকের প্রেম আমি আকাজক্ষা করিতাম না। যে প্রেম মানব-হৃদয়কে একেবারে পরিপূর্ণ করিতে পারে, যে প্রেম জীবনের অংশস্বরূপ, দেহের আত্মাস্বরূপ, যে প্রেম শেষ হইলেই জীবন শেষ হয়, সেইরূপ প্রেম আমি আকাজক্ষা করিতাম। কতবার অন্ধকারে বসিয়া সেই প্রেমের কল্পনা করিতাম; চিন্তাবলে কতবার শূন্য হইতে অলৌকিক-স্নেহসম্পন্ন প্রেম-প্রতিমাকে জাগরিত করিয়া,

তাহারই সহিত কালহরণ করিতাম । সহসা সে মুষ্টি জলবিষের স্তার ভিন্ন হইয়া যাইত ; কল্লনাশক্তি শ্রান্ত হইত ; আমি সহসা মুচ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলাম ।

দিন দিন এইরূপ কল্লনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । দিবাকালে অর্ধেক সময় আমি এ জগতে থাকিতাম না, কাল্পনিক জগতে বিচরণ করিতাম । সে জগতে উজ্জ্বল আকাশ, উজ্জ্বল ক্ষেত্রবৃক্ষ, উজ্জ্বল অট্টালিকা, উজ্জ্বল গৃহদ্বাৰাদি—তন্মধ্যে উজ্জ্বল প্রেম-প্রতিমা আসীন রহিয়াছেন । নিবিড়কৃষ্ণকেশে জ্যোতির্ধর সুবর্ণকান্তি মুখমণ্ডল বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে । বালিকার রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ওষ্ঠ দুটি মল্ল প্রেমহাস্তে বিস্তারিত, ভ্রমর-কক্ষ চক্ষু দুটি প্রেমাক্রান্তে পরিপূর্ণ, সমস্ত মুখমণ্ডল প্রমে ঢল ঢল করিতেছে । সহসা কল্লনা-ক্তি ছিন্ন-তার বীণাসম নীরব হইত ; আমিও মুচ্ছিত হইতাম ।

একদিন নিশাবসানে কল্লনা এইরূপ ছিন্ন ওয়াতে আমি মুচ্ছিত হইয়া এই গঙ্গাভীরে । নিকুঞ্জবনে শুইয়া রহিয়াছি, কতক্ষণ চিত্ত ছিলাম, বলিতে পারি না । বোধ হইল, মস্তকে ও মুখে কে জলসিঞ্চন ও বাজন করিতেছেন । ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখি—আপনি বিশ্বাস করিবেন না—সেই প্রেম-প্রতিমা ! সেই স্বপ্নদৃষ্ট বালিকা স্তিমিত হইয়া আমার মুখে জল দিতেছে !”

উভয়েই অনেকক্ষণ নীরবে রহিলেন । রেন্দ্রনাথ এইরূপ অসম্ভব কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন । ক্ষণেক পরে সেই অপরিচিত লোক আবার বলিতে লাগিলেন, রেন্দ্রনাথ ! আমি আর অধিক কথা হিতে পারি না । জিজ্ঞাস্য জানিলাম, ই বালিকা কায়স্থকন্যা, অবিবাহিতা, নাথ্য এবং জাতির অগ্রে পালিতা । আমি

বালিকার পাণিগ্রহণ করিলাম, তাহার পর কয়েক বৎসর যেরূপ সুখস্বপ্নে অভিধাহিত হইল, তাহা বর্ণনার অতীত ।

ঐ যে নিকুঞ্জবন দেখিতেছেন, ঐ স্থানে আমরা বাস করিতাম । শরৎকালের উষা আকাশে যে পবিত্র বর্ণ বিস্তীর্ণ করে, প্রেম আমাদের হৃদয়-আকাশে তদপেক্ষা পবিত্র বর্ণে চিরকালই রঞ্জিত হইয়া থাকিত । সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকার যেরূপ শান্ত ও নিস্তর, আমাদের হৃদয়ের প্রেম তদপেক্ষা নিস্তর ও শান্ত-ভাবে বিরাজ করিত । আমি সে রমণীকে কুঞ্জবাসিনী বলিতাম, কেন না, ঐ যে কুঞ্জবন দেখিতে পাইতেছেন, ঐ স্থানে—”

আর কথা সরিল না । রেন্দ্রনাথ দেখিলেন, অপরিচিত উন্মত্তের স্তায় সেই কুঞ্জবনের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন—মুখে কোন ভাবই নাই, সংজ্ঞার কোন লক্ষণ নাই । রেন্দ্রনাথ অনেক যত্নে তাহার চৈতন্যদান করিলেন । পরে অল্প কথা কহিতে কহিতে রাত্রি অনেক হইল । দুই ভ্রাতার মত দুই জন এক শয্যা শয়ন করিলেন, অচিরে নিদ্রাঙ্গ অভিভূত হইলেন ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

বঙ্গবিজেতা ।

A combination and a form indeed
Where every god did seem to set his seat
To give the world assurance of a man.

Shakespeare.

মুন্দের প্রকাণ্ড দুর্গের মধ্যে একটা প্রশস্ত গৃহে এক বীরপুরুষ উপবেশন করিয়া

রহিয়াছেন। ইনি ক্ষত্রিয়কুলচূড়ামণি রাজা টোডরমল্ল।

তাহার নিকটে সে সময়ে অধিক লোক নাই, দুই চারি জন অতি বিশ্বাসী বোদ্ধা আসীন ছিলেন। অতি যত্নে যুদ্ধের পরামর্শ করিতেছিল। এমন সময় একজন সৈনিক আসিয়া প্রণিপাত করিয়া বলিল, “মহারাজ! একজন অশ্বারোহী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক, অহমতির জ্ঞান দ্বারা দণ্ডায়মান আছে।”

টোড। তাহার বক্তব্য কি, জিজ্ঞাসা কর।

সৈন্য। জিজ্ঞাসা করিলাম, বলিলেন, মহারাজের সহিত দর্শন ভিন্ন বলিতে পারি না, বিশেষ প্রয়োজন আছে।

টোড। হিন্দু কি মুসলমান?

সৈন্য। কাংস্থ জমীদারপুত্র।

টোড। বঙ্গদেশে অনেক পরাক্রান্ত কাংস্থ জমীদার আছেন। শুনিয়াছি, তাহাদিগের আট লক্ষ সেনা আছে, সম্রাটের কার্যে তাহাদিগের সহায়তা আবশ্যক। আগন্তুককে আসিতে বল।

সৈনিক পুরুষ অশ্বারোহীকে আনিতে যাইল।

এই অবসরে আমরা পাঠক-মহাশয়কে রাজা টোডরমল্লের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

ক্ষত্রিয়কুলাবতংস টোডরমল্ল অপেক্ষা সর্বগুণবিভূষিত বীরপুরুষ কখন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। রত্ন-প্রসবিনী ভারতভূমে অনেক পুণ্যাশ্রা ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বীরপ্রসূ ক্ষত্রিয়কুলে অনেক বীরপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন, প্রাচীন ভারতবর্ষে অনেক তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু রাজা টোডরমল্ল এই তিন গুণেই বিভূষিত ছিলেন। হিন্দুধর্মে তাহার অচলা

ভক্তি ছিল, ইতিহাসে তাহার অনেক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। একদা দিল্লীশ্বর আকবর শাহের সহিত পঞ্জাব গমন করিবার সময় দ্রুতভ্রমণবশতঃ তাহার দেবারাধন কার্যে বিঘ্ন হইয়াছিল। টোডরমল্ল প্রাতঃকালে দেবারাধনা না করিয়া কোন কষ্টই করিতেন না, জলগ্রহণ করিতেন না, স্নাত্তরাং দেবারাধনার বাধাত হওয়াতে তিনি অনাহারে রহিলেন। আকবর শাহ অনেক অমরোষ করিয়াও তাহাকে কোন কার্য করিতে লওয়াইতে পারিলেন না। আবুল ফজল প্রভৃতি আকবরের মুসলমান অমাত্যগণ টোডরমল্লকে গোড়া হিন্দু বলিয়া সততই নিন্দাবাদ করিত, কিন্তু মহাত্মা ভব দিল্লীশ্বর স্বধর্মাত্মরাগী বীরকে সম্মান করিতেন। যখন টোডরমল্ল বৃদ্ধ হইলেন, যখন তাহার যশে ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ হইল, যখন তাহার পদ ও গৌরব পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইল, তিনি সেই সম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া গঙ্গাতীরে মানবলীলা সংবরণ করিবেন, এই অভিলাষে দিল্লীশ্বরের অনুমতানুসারে রাজকর্ম পরিত্যাগ করিয়া হরিদ্বার গমন করেন।

ক্রমান্বয়ে তিনবার বঙ্গদেশ জয় করিয়া রাজা টোডরমল্ল সাহায্য ও যুদ্ধ-কৌশলের যথেষ্ট প্রমাণ দেন। প্রথমবার মনাইম খাঁর ও দ্বিতীয়বার হোসেন কুলী খাঁর অধীনে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহারই সাহায্যে দুইবারই জয়লাভ হয়। তৃতীয়বার তিনি স্বয়ংই সেনাপতি হইয়া আসিয়াছিলেন, কেবল বঙ্গদেশে নহে, তিনি যে স্থানে বাইয়াছিলেন, সেই স্থানেই অপূর্ণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গুজরাট-প্রদেশে বিজোহী-দিগের সহিত যে সকল যুদ্ধ হয়, তাহাতে টোডরমল্ল সিংহের মত বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। গোলকার-যুদ্ধে সেনাপতি ভিজার খাঁ

এলায়ন-তৎপর হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজা টোডরমল তাঁহাকে নিবেদন করিয়া একপূর্ণ বীরত্ব প্রকাশ করিলেন যে, বিজয়লক্ষ্মী অগত্যা তাঁহারই অক্ষশায়িনী হইলেন। আকবর শাহের অসংখ্য সেনাপতি ছিল, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে টোডরমল অপেক্ষা কোন সেনাপতিই অধিক সাহস ও বীরত্ব দেখাইতে পারেন নাই।

আকবর শাহ সমগ্র ভারতবর্ষের রাজস্ব-স্থিরীকরণ-ভার রাজা টোডরমলের উপর স্তম্ভ করেন। সেইরূপ দুর্ভিক্ষ ক্রম তিন বৎসরে সম্পন্ন করেন, তাহাতে তাঁহার স্বস্ববুদ্ধি ও রাজনীতি-জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

রাজা টোডরমল লাঠোরে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবাবস্থাতে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার মাতা দারিদ্র্যজনিত বৎসরোন্নতি কষ্টভোগ করিয়াও শিশুকে অতি যত্নে লালন-পালন করেন। শিশুও অল্পবয়সেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রকাশ করেন ও প্রথমে কেরানীর পদে নিযুক্ত হন। স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিবশতঃ এই নীচকর্ম হইতে তিনি আকবর শাহের রত্নপরিপূর্ণ সভার মধ্যে প্রধান রত্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন।

সৈনিক পুরুষ সেই অপরিচিত আগন্তুককে রাজার সম্মুখে আনয়ন করিল। তিনি পাঠকের অপরিচিত নহেন। টোডরমল জিজ্ঞাসা করিলেন, “যুবক! তোমার নাম কি?” যুবক উত্তর করিলেন, “ইন্দ্রনাথ চৌধুরী।”

টোড। নিবাস কোথায়?

ইন্দ্র। নদীয়া জিলার অন্তঃপাতী ইচ্ছাপুর গ্রামে।

টোড। তোমার কত সৈন্ত আছে?

ইন্দ্র। সম্রাটের কার্য্য ও দেশ-সুশাসনের জন্ত পিতার দুই তিন সহস্র পদাতিক সৈন্ত

বঙ্গদেশে আছে। কিন্তু আপাততঃ আমি একাকীই সম্রাটের কার্য্যসাধনার্থ বিহার-প্রদেশে আসিয়াছি।

রাজা টোডরমল কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া ক্ষণেক নিম্নরূপে যুবকের প্রতি তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিলেন। যুবকের আকারে উদারভাষ ভিন্ন কিছুমাত্র লক্ষিত হইল না। ক্ষণেক পর রাজা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার পিতা কি সম্রাটের কার্য্যে কিছু সেনা এই স্থানে পাঠাইতে পারেন নাই?”

ইন্দ্র। “প্রভুর আজ্ঞা পাইলে পাঠাইবেন। অধুনা অসুস্থ হইলে আমি প্রভুর কার্য্যসাধনের আশা রাখি।” এই বলিয়া কোব হইতে একবার অসি বাহির করিয়া পুনরায় কোবে রাখিলেন।

সাদীক খাঁ নামক সেনাপতি বলিলেন, “যুবক! তুমি যে রূপ অসি ধারণ করিলে, আমার বিশ্বাস, যুদ্ধে তোমার হস্তে অসির অপমান হইবে না।”

তারসন খাঁ নামক একজন সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্রে রাজাকে বলিলেন, “মহারাজ! এ শত্রুদিগের গুপ্তচর, ইহাকে জ্ঞানহস্তে অর্পণ করুন।”

রাজা টোডরমল কাহারও কথার উত্তর না দিয়া বার বার যুবকের উপর তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিলেন; তাঁহার আকৃতিতে বা মুখভঙ্গীতে কোনরূপ বৈলক্ষ্য্য দেখিতে পাইলেন না; বিশেষ পরীক্ষার জন্য পুনরায় বলিতে লাগিলেন, “তুমি একাকী আমাদের কার্য্যসাধনে আসিয়াছ, ইহার অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না।”

ইন্দ্র। আমার একটি ভিক্ষা আছে। আপনাকে যদি প্রভুভক্তি-প্রদর্শনে সন্তুষ্ট করিতে পারি, তবে সে ভিক্ষা চাহিব, এক্ষণে সে ভিক্ষা বৃথা হইবে।

টোড। শত্রুরা আমাদের সৈন্তমধ্যে
বিত্রোহ উপাশন করিবার জন্ত অনেক চর
প্রেরণ করিতেছে। তুমি তাহাদিগের এক-
জন নহ, আমি কিরূপে বুঝি ?

ইন্দ্র। কাহ্ন ক্রমীদারপুত্রের কথার উপর
বাস হয় আপনি নির্ভর করিতে পারেন।

টোড। অনেক সময়ে অভ্র লোকও
ভদ্রলোকের বেশ ধারণ করে; অনেক সময়ে
ভদ্রবংশীয় লোক কপটাচারী হয়।

ইন্দ্র। “মহারাজ! কপটাচরণ কখন করি
নাই, আমাদের বংশে সে দোষ নাই।”
ক্রোধে ইন্দ্রনাথের স্বর বন্ধ হইল।

টোড। তোমার কথা উদারচেতা বীর-
পুরুষের তায়, কিন্তু অনেক সময়ে গভীর
খলতা বাহ্যিক উদার্য্য অবলম্বন করে।

ইন্দ্রনাথের মুখ ক্রোধে রক্তিম। ধারণ
করিল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, “যদি
আপনার নিকট কপটাচরণ করিবার জন্ত
আসিয়াছি বিশ্বাস হয়, তবে বিদায় লিন,
সলিয়া যাই।”

টোডরমন্ড তুষ্ট হইলেন, ইন্দ্রনাথকে
বন্দনপূরঃসর অশ্বারোহীর পদে নিযুক্ত
করিলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ।

বন্ধুর স্মরণার্থ।

Alas they had been friends in youth !

Coleridge.

কয়েক মাস বিগত হইল। ইন্দ্রনাথ ক্রমে
দুঃখার্থে নৈপুণ্য ও ত্যাগ লাভ করিলেন।
বিত্রোহিণ ভাগলপুরে সমবেত হইয়াছিল,
তরাং ভাগলপুর ও মুন্দের মধ্যদেশে
কদাই যুদ্ধাঙ্গ হইত।

একদিন স্বর্ঘ্যোদয় হইতে স্বর্ঘ্যাস্ত পর্য্যন্ত
বিত্রোহিণ টোডরমন্ডের দুর্গ প্রবেশ করিবার
জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। টোডরমন্ড
তাহাদিগের উদ্দেশ্য পূর্বে জানিতে পারিয়া-
ছিলেন, সুতরাং অনায়াসে তাহাদিগের চেষ্টা
প্রতিরোধ করিলেন। প্রাতঃকাল হইতে
স্বর্ঘ্যাস্ত পর্য্যন্ত তিনি দুর্গের এক স্থান হইতে
অন্ত স্থানে গমনাগমন করিতে লাগিলেন-
এবং তাহার উৎসাহ, তাহার বুদ্ধিবল ও
রণকৌশলে, দৈন্তগণ প্রোৎসাহিত হইয়া
অনায়াসে শত্রুদিগকে সকল স্থানে পরাস্ত
করিল। টোডরমন্ড ইতিপূর্বে ইন্দ্রনাথের
সাহস ও যুদ্ধে উৎসাহ দেখিয়া তুষ্ট হইয়া-
ছিলেন, অতঃসমস্ত দিন ইন্দ্রনাথ যেক্রপ
সাহসের সহিত শত্রুদিগের সহিত বার বার
যুদ্ধদান করিলেন, তাহাতে সেনাপতি যার
পর নাই আনন্দিত হইলেন। স্বর্ঘ্যাস্তের সময়
শত্রুগণ রণে ভঙ্গ দিয়া ভাগলপুরের দিকে
প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যার পর ইন্দ্রনাথ সেনাপতির সহিত
সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তখন টোডরমন্ড
একাকী বিশ্রাম করিতেছেন, ইন্দ্রনাথকে
আসিতে অহুমতি দিলেন।

ইন্দ্রনাথের অন্তকার সাহসিক কার্য্য
দেখিয়া টোডরমন্ডের মন অক্ষুণ্ণ হইয়াছিল,
তিনি যুবা সৈনিককে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া
নিকটে বসাইলেন। তাহাদের নিকটে তখন
আর কেহ ছিল না।

তখন টোডরমন্ড বলিলেন, “ইন্দ্রনাথ !
তুমি অতঃ যেক্রপ বিক্রম দেখাইয়াছ, তাহাতে
আমি তুষ্ট হইয়াছি। আজিকার যুদ্ধে
তোমার জীবন সংশয়স্থলে ছিল।”

ইন্দ্র। মহারাজ! বেদিন সৈনিক কই-
লাম, সেই দিনই রাজকার্য্যে জীবন সমর্পণ
করিয়াছি, যদি এ যুদ্ধের পরও জীবিত

বদ্ধবিক্ষেভা ।

কি, তবে সে আপনার আশীর্বাদ আর
তায় পুণ্যবলে ।

টোড । দেশে তোমার পিতা আছেন ?
ইন্দ্র । আছেন ।

টোড । তোমার ভ্রাতা-ভগিনী কয়জন ?
ইন্দ্র । আমার একজন জ্যেষ্ঠ ছিলেন,
হার কাল হইয়াছে । এক্ষণে আমিই
তার একমাত্র সন্তান ।

টোডরমন্ডের মুখ গভীর হইল ; বলি-
ন, “যদি এই যুদ্ধে তোমার নিধন হয়,
ব তোমার পিতার কি মনঃসীড়া হইবে !
মারও পুত্র আছে, সেই জন্তই এই ভাবনা
সিতেছে । ধারুর বয়ঃক্রম তোমারই মত,
তার সাহস তোমারই মত ; তোমারই
সে বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, মরণকে
করে না । যদি সে যুদ্ধে নিধন প্রাপ্ত
তাহার পিতার হৃদয়ে বজ্রাঘাত হইবে ।
পি রাজকাৰ্য্যে মরণাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় আর
আছে ? সম্রাট্ আক্‌বর শাহের কাৰ্য্যে
রা পিতা-পুত্রে নিয়োজিত আছ, সে
র্য্য জীবন সমর্পণ করিতে আক্ষেপ নাই ।”
ইন্দ্র । বিধাতা সে দিন এখনও দূরে
ন ; তাহার পূর্বে প্রভু বহাদুর জীবিত
য়া দিল্লীশ্বরের কাৰ্য্য নিৰ্ব্বাহ করুন,
ব ও খ্যাতি অর্জন করুন । আপনার
গৌরবান্বিত নাম ভারতবর্ষের হিন্দু-
র মধ্যে কাহারও নাই, আপনার স্থায়
বের কাৰ্য্য কেহ সাধন করেন নাই ।

টোড । “আমার অপেক্ষা গৌরবের
আমার জীবনের একজন বন্ধু প্রাণ-
ন করিয়াছেন ।” টোডরমন্ড এই কথা
একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন ।

প্রনাথ নিশ্চল হইয়া রহিলেন । টোডর-
র বীরে কহিতে লাগিলেন, “অল্প
আনন্দের দিব্য, অল্প শ্রেয়স্কর শত্রু

পরাস্ত হইয়াছে, তাহা শুনিয়া দিল্লীশ্বরের অভি-
শয় তুষ্ট হইবেন, কিন্তু এই আনন্দের মধ্যে
অল্প আমার একটি দুঃখের কথা মনে উদয়
হইতেছে । এই মাসের এই দিনে আমার
বাল্যকালের একজন পরমসুহৃদ জীবন বিস-
র্জন করিয়াছিলেন । সে আজ ঠিক ষাটশ
বৎসর হইল ।

ইন্দ্র । সে মহাত্মাও বোধ হয় যোদ্ধা
ছিলেন, তিনিও বোধ হয়, দিল্লীশ্বরের কাৰ্য্যে
জীবন দান করিয়াছিলেন ।

টোড । আশৈশব তাঁহার যুদ্ধ ভিন্ন অন্য
ব্যবসা ছিল না, কিন্তু তিনি দিল্লীশ্বরের কাৰ্য্যে
জীবনদান করেন নাই, দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করিয়া জীবন দিয়াছিলেন ।

টোডরমন্ডের মুখে এই কথা শুনিয়া ইন্দ্র-
নাথ চমকিত হইলেন । টোডরমন্ড ঈষৎ
হাসিয়া বলিলেন, “দিল্লীশ্বরের পুরাতন দাসের
নিকট দিল্লীশ্বরের শত্রুর প্রশংসা শুনিয়া তুমি
চমকিত হইতেছ ; কিন্তু তুমি যদি দিল্লীতে
কখন গমন কর, স্বয়ং আক্‌বর শাহের মুখে
তাঁহার পরম শত্রু রাণা প্রতাপসিংহের
প্রশংসা শুনিয়া আরও চমকিত হইবে । ইন্দ্র-
নাথ ! আক্‌বরের কাৰ্য্যে আমার জীবন
অতিবাহিত হইয়াছে, আক্‌বরের শত্রুই
আমার শত্রু, কিন্তু তথাপি সাহস, অধ্যবসায়
ও স্বদেশপ্রিয়তা দেখিলে কি শত্রু, কি মিত্র,
সকলেই প্রশংসা করে । প্রতাপসিংহ স্বদেশের
স্বাধীনতায় যেরূপ প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া
পর্যতকাল ও মরুভূমিতে বাস করিয়া, বৎ-
সর বৎসর আক্‌বরের সৈন্যের সহিত যুদ্ধদান
করিতেছেন, তাহাতে আক্‌বর শাহ স্বয়ং
বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছেন ! আজি চারি
বৎসর হইল, প্রতাপ হলদীঘাটার যুদ্ধে
অনেক সৈন্য হারাইয়াছেন, তাহার পর
দুর্গ, ভূমি, সম্পত্তি সমস্তই হারাইয়াছেন,

কিন্তু মজ্জবোর পণ, মজ্জবোর সাহস ও অধ্য-
বসায় হারান নাই। কন্দরবাসী প্রতাপ
এখনও স্বদেশের অস্ত্র যুঝিতেছেন, বত দিন
জীবিত থাকিবেন, যুঝিবেন। কি শত্রু, কি
মিত্র, ভারতবর্ষে একরূপ হিন্দু নাই, একরূপ
মুসলমান নাই যে, তাঁহার সাধুবাদ করে না।
ভারতবর্ষ আজ প্রতাপসিংহের গৌরবে পূর্ণ।

ইন্দ্রনাথ এই কথা শুনিয়া উৎসাহপূর্ণ
হৃদয়ে শুদ্ধ হইয়া রহিলেন। টোডরমল্ল
ধীরে ধীরে বলিলেন, “কিন্তু প্রতাপসিংহের
কথা আমি অস্ত্র চিন্তা করি নাই। আর
একজন বোদ্ধা, যিনি দ্বাদশ বৎসর হইল,
সেই মেওয়ারের রাজধানী চিতোর-রক্ষার্থ
জীবনদান করিয়াছিলেন, তাঁহারই চিন্তা
করিতেছিলাম। ইন্দ্রনাথ! অস্ত্র তোমার
কার্য দেখিয়া আমি তুষ্ট হইয়াছি, যে কথা
আমি সকলের সম্মুখে বলি না, তাহা
তোমাতে বিশ্বাস করিয়া বলিতেছি। একটি
গল্প শ্রবণ কর।

যৌবনের প্রারম্ভে আমি মেওয়ার দেশে
একবার ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। একটি
বরাহ-শীকারে আমি প্রায় জীবন হারাইয়া-
ছিলাম। একজন অশুরবীর্য্য বোদ্ধার অব্যর্থ
বর্শার আঘাতে সে বরাহ হত হইল, আমি
পরিজ্ঞাপ পাইলাম। সে অশুরবীর্য্য বোদ্ধা
স্বর্ঘ্যমহল দুর্গের তিলকসিংহ।

ক্রমে তিলকসিংহের সহিত আমার
বিশেষ সৌহৃদ্য হইল। তখন তাঁহার অসা-
ধারণ গুণ আমি ক্রমে ক্রমে জানিতে পারি-
লাম, তিনিও আমাকে অতিশয় স্নেহ করিতে
লাগিলেন। ক্রমে আমাদের মধ্যে প্রকৃত
বন্ধু হইল।

জীবনের বহুত্ব একবার হয়, দুইবার হয়
না। ইন্দ্রনাথ! নারীর প্রণয়ের কথা তুমি
অনেক পড়িয়াছ, অনেক শুনিয়াছ, কিন্তু

যৌবনে দুই জন সরলস্বভাব, উৎসাহপূর্ণ পুরু-
ষের মধ্যে যে বন্ধুত্ব হয়, তাহা অপেক্ষা প্রকৃত
প্রণয় আমি এ জগতে কিছুই জানি না।

যখন আমি দিল্লীখরের কার্যে ব্রতী হই-
লাম, তখন তিলকসিংহকেও সেই কার্যে
ব্রতী করিবার চেষ্টা করিলাম। তাঁহার
স্বায়ং রণপণ্ডিত ও অশুরবীর্য্য বোদ্ধা যদি
দিল্লীখরের কার্য স্বীকার করিতেন, তাহা
হইলে দিল্লীখরের একরূপ সেনাপতি ছিল না
যে, তিলককে গুরু বলিয়া না মানিত।
তিনি এত দিনে বঙ্গদেশ বা দাক্ষিণাত্যের
শাসনকর্ত্তা হইতেন।

কিন্তু তিলকসিংহ সে কার্যে ব্রতী হই-
লেন না। তিনি আমার প্রস্তাবে যে উত্তর
দিলেন, তাহা অস্ত্রাবধি আমার হৃদয়ে
অঙ্কিত রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, “আমার
পিতা, আমার পিতামহ, আমার প্রপিতামহ
মেওয়ারের রাণার কার্য করিয়াছেন, আমিও
সেই কার্য করিব। দিল্লীখর চিরকালই
মেওয়ারের শত্রু, তাঁহার সহিত আমার
সম্পর্ক নাই, অথবা শুনিয়াছি, আকবর
চিতোর অধিকার করিবার জন্য উদ্বোধন
করিতেছেন; যদি তিনি সেই উদ্যমে
চিতোরে আইসেন, তবে তিলকসিংহের
সহিত তাঁহার একদিন লাক্ষ্য হইবে।”

বীর যে কথা বলিলেন, তাহা রক্ষা
করিয়াছিলেন। যখন দিল্লীখর চিতোর
আক্রমণ করিলেন, তখন তিলকসিংহ সিংহ-
বল প্রকাশ করিয়া চিতোর-রক্ষার্থ জীবন
দান করিলেন। স্বয়ং দিল্লীখর তাহা দেখিয়া-
ছিলেন, তিনি স্বয়ং আমাকে সে কথা
বলিয়াছিলেন।

টোডরমল্ল অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহি-
লেন। ধীরে ধীরে বীর আকৃতি রান হইল,
সেই বোদ্ধার গণ্ডস্থল দিয়া এক বিন্দু অঙ্গ

বহিরা পড়িল। সে অশ্রু যোচন করিয়া
টোডরমল্ল কহিলেন, “ইন্দ্রনাথ ! প্রতাপ-
সিংহ এক্ষণে আমাদের শত্রু। গুনিয়াছি,
তিলকের পুত্র তেজসিংহ * এখন প্রতাপ-
সিংহের অধীনে যুদ্ধ করিতেছেন। যদি দিল্লী-
খর আমাদের যোগদানে প্রেরণ করেন, তবে
বন্ধুপুত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে আমি সঙ্কুচিত
হইব না। তথাপি শত্রুরও যদি গুণ থাকে,
সে গুণ স্বীকার করা নিষিদ্ধ নহে, জীবনের
পরমবন্ধু যদি বিধির বিড়ম্বনায় শত্রুপক্ষীয়
হন, তাঁহার মৃত্যুর জন্য এক বিন্দু অশ্রু-
বিসর্জন করা নিষিদ্ধ নহে।”

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

অপরিচিত শত্রু ও পরিচিত বন্ধু ।

PRISONER ! pardon youthful fancies
Wedded ? If you can say no !
Blessed is and be you consyrt
Hopes ! cherished, let them go.

Wordsworth.

টোডরমল্লের শিবির হইতে ইন্দ্রনাথ
চিন্তা, বিষয় ও খেদ-পূর্ণ হইয়া নিজ শিবিরে
আসিলেন ; একাকী নির্জনে বসিয়া মেণ্ড-
য়ার, প্রতাপসিংহ ও তিলকসিংহের কথা
চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্রনাথ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন,
এমন সময়ে এক ভৃত্য আসিয়া তাঁহার হস্তে
একখানি পত্র দিল। পত্র খুলিয়া তিনি এক-
টার, দুইবার, তিনবার পাঠ করিলেন :

* বাহাদুর তেজসিংহের বীরত্বের কথা জানিতে
হব, তাহার জীবন-সম্বন্ধ আধারিতা পাঠ করুন।

মর্শগ্রহণ করিতে পারিলেন না। পত্রে এই-
রূপ লিখিত ছিল—

“তোমার বুদ্ধিকৌশল দেখিয়া চমৎকৃত
হইয়াছি। ভারতবর্ষে বাহাকে কেহ কৌশলে
পরাস্ত করিতে পারে নাই, তাহার চক্ষে
খুলি দিয়াছি। আমরাও ঐ পথ অবলম্বন
করিব, কেন না, বে পতনোন্মুখ গৃহ অগ্রে
তাগ করে, সেই বুদ্ধিমান। অস্ত্র এক প্রহর
রজনীতে আশানঘাটে দেখা হইবে।”

ইন্দ্রনাথ এ পত্রের কিছুই অর্থগ্রহণ
করিতে পারিলেন না। “ভারতবর্ষে বাহাকে
কেহ কৌশলে পরাস্ত করিতে পারে নাই,”
সে কে ? বোধ হয়, রাজা টোডরমল্ল, কিন্তু
তাঁহার চক্ষে খুলি কে দিয়াছে ? পতনোন্মুখ
গৃহ কি ? ইন্দ্রনাথের বোধ হইতে লাগিল
যে, কোন বিদ্রোহীকর্তৃক এই পত্র লিখিত
হইয়াছে। আশানঘাটে যাওয়া কি কর্তব্য ?
কণেক বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, যাও-
য়ায় কোন হানি নাই, বরং কোন গুপ্ত-
বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

ইন্দ্রনাথ নিরূপিত সময়ে আশানে উপস্থিত
হইলেন। তাঁহার সঙ্গে কেহই নাই, অসিই
তাঁহার একমাত্র সহায়।

রজনী ঘোর-তমসাক্ষর, আকাশ নিবিড়
মেঘাক্ষর। আকাশে কালো মেঘ উড়িতেছে,
এক একখানি করিয়া সেই মেঘ পশ্চিমদিকে
রাশীকৃত হইতেছে ; সেই পশ্চিমদিক হইতে
কণে কণে বিদ্যুৎ দেখা দিতেছে, বিদ্যুৎ-
আলোকে আশানের ভয়ানক বস্তু-সকল
এক একবার দেখা যাইতেছে। কোন স্থানে
সম্প্রতি শব্দ নাই হইয়াছে, ভয়রাশির মধ্যে
অগ্নি এক একবার দেখা যাইতেছে ; কোন
স্থানে বা উজ্জল অগ্নিশিখা চারিদিকে নিবিড়
অন্ধকারকে উদ্গোষ্ঠ করিতেছে। সেই আলোক
ও অন্ধকারের মধ্যে নানারূপ ছায়া দেখা

বাইতেছে, নিকটস্থ বৃক্ষরাশির মধ্য দিয়া বায়ুবেগবশতঃ নানারূপ অদ্ভুত শব্দ শ্রবণ-গোচর হইতেছে। সেই ছায়া দেখিয়া, সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রনাথের স্বভাবতঃ সাধসী হৃদয়ও এক একবার স্তম্ভিত হইতে লাগিল। কখন কখন তিনি দূরে যেন ভয়ানক আকৃতি দেখিতে লাগিলেন, সেই দিকে গমন করিয়া কখন বা দেখেন, ধূম-রাশি উখিত হইতেছে, কখন বা বোধ হয় যেন, সেই আকৃতি ধীরে ধীরে বাইয়া রক্তের অন্ধকারে লীন হইতেছে। গগনমণ্ডল ক্রমশই গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আসিল, বায়ু ক্রমশই গভীরতর শব্দ করিয়া বহিতে লাগিল, গঙ্গার তরঙ্গ ক্রমশই ভয়ঙ্কর হইতে লাগিল। আকাশে নক্ষত্রমাত্র দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, দূরে শিবাগণ মুহুমূহঃ বিকট শব্দ করিতেছে, যেন দূর হইতে প্রেত ও পিশাচের অট্টহাসি শ্রুত হইতেছে।

যে দিকে ভিবিড় জঙ্গল ছিল, সেই দিকে যেন বোধ হইল, দুইটি ভীষণ আকৃতি অন্ধকারে দেখা যাইতেছে। ইন্দ্রনাথ তাহা প্রথমে গ্রাহ্য করিলেন না, কিন্তু যতবার সেই দিকে নয়নপাত করেন, ততবারই সেই ভীষণ আকৃতি দেখিতে পাইলেন। ইন্দ্রনাথ সেই দিকে আগমন করিলেন, বোধ হইল, যেন সেই আকৃতিদ্বয় সহসা অদৃশ্য হইয়া যাইল। ইন্দ্রনাথ সে দিক হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন, বোধ হইল যেন, জঙ্গলের ভিতর হইতে অট্টহাসি শুনিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ আবার কিরিয়া দেখিলেন, সেই ভীষণ আকৃতি দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

“ভগবান্ সহায় হউন!” এই কথা বলিয়া ইন্দ্রনাথ অসি-হস্তে ধীরে ধীরে সেই দিকে পুনরায় গমন করিলেন; অতিশয় সতর্কতার সহিত আকৃতিদ্বয়ের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে

করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জঙ্গলের নিকটে আসিতে না আসিতে আবার সেই আকৃতিদ্বয় অদৃশ্য হইল। আবার দূর হইতে সেই পৈশাচিক অট্টহাসি শ্রুত হইল।

“ভগবান্ সহায় হউন!” বলিয়া ইন্দ্রনাথ সেই জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সে স্থানে একপ নিবিড় অন্ধকার য, চারি হস্ত দূরে কোনও দ্রবাই লক্ষিত হয় না। ইন্দ্রনাথের সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়াছে; ললাট হইতে ঘর্ম্ম বহির্গত হইতেছে। সেই ধাসির শব্দ লক্ষ্য করিয়া ইন্দ্রনাথ বাইতে লাগিলেন। হঠাৎ তাহার শরীরের উপর যেন কে হস্ত স্থাপন করিল।

ইন্দ্রনাথ চাহিয়া দেখিলেন, প্রেত নহে; তাহারা দুই জন ছদ্মবেশী মনুষ্য। তাহারা ইঙ্গিত করিয়া ইন্দ্রনাথকে সঙ্গে সঙ্গে আসিতে বলিল। ইন্দ্রনাথ তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

সেই দুই জন মহুষ্যের সহিত তিনি অনেকক্ষণ নীরবে বাইতে লাগিলেন। চতুর্দিকে নিবিড় জঙ্গল ও নিবিড় অন্ধকার, নিশেষে তিন জনে সেই অন্ধকারময় জঙ্গলের ভিতর দিয়া বাইতে লাগিলেন। অবশেষে তাহারা গঙ্গাতীরে এক নিভৃত স্থানে উপবেশন করিলেন। তখন সেই অপরিচিত ব্যক্তিদ্বয় মুখমণ্ডল হইতে আবরণ খুলিয়া লইল, ইন্দ্রনাথ তাহাদিগকে চিনিতে পারিলেন। তাহারা হমায়ুন ও তর্খান নামক রাজা চৌডরমল্পের অধীনস্থ দুই জন সেনাপতি।

ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “এত রাজ্যে এই ভয়ঙ্কর বেশে এ স্থানে আপনারা কি করিতেছেন?”

হমায়ুন কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,

“সেনানী ইন্সনাথের সাহস পরীক্ষা করিতে-
ছিলাম ।”

ইন্সনাথ । আমি আপনাদিগের নিকট
পরীক্ষা দিতে যদি অসম্মত হই ?

হুমায়ুন । তাহা হইলে বোধ করিব,
আমরা যে অসমসাহসিক কার্যে নিযুক্ত হই-
য়াছি, সেনানী ইন্সনাথ তাহা সমাধা করিতে
অক্ষম ।

ইন্সনাথ । ইন্সনাথ অক্ষম কি সক্ষম, কার্য-
কালে তাহা অল্প লোকে বিবেচনা করিবেন ;
শ্রমশানভূমিতে পিশাচের সহিত যুদ্ধ করিলে
কি সাহসের পরিচর পাওয়া যায় ?

হুমায়ুন । সেনানী ইন্সনাথের যে অসাধা-
রণ সাহস আছে, তাহা আমাদের অবদিত
নাই । তাঁহার পৈশাচিক সাহস আছে কি
না, তাহাই পরীক্ষা করিতেছিলাম । পৈশা-
চিক কার্যে নিযুক্ত হইলে পৈশাচিক সাহস
আবশ্যক হয় ।

ইন্সনাথ । কি পৈশাচিক কার্যে নিযুক্ত
হইয়াছি ?

হুমায়ুন । তাহা কি জানেন না ? উপ-
হাস করিতেছেন কেন ? আপনি যে
কার্যের স্বরূপাত করিয়াছেন, আপনি গৃহ-
মন্ত্রণায় ও চমৎকার কৌশলে যে কার্য-
সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, সে
কার্য কি আপনি জানেন না ? আপনার
কৌশল ও বুদ্ধি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি ।
রাজা টোডরমল্লকে কেহ বঞ্চনা করিতে
পারেন নাই, আপনি তাহা করিয়াছেন ।
আপনি ঐচরজীবী হউন, একদিন বঙ্গদেশের
গৌরবস্থল হইবেন ।

ইন্সনাথ বিস্মিত হইয়া রহিলেন । তথান
বলিতে লাগিলেন, “বোধহি হুমায়ুন ও
আমি কতবার অন্তরালে আপনার কৌশ-
লের ধন্যবাদ করিয়াছি । শিবিরে আমাদের

মত অনেকজনই বিদ্রোহোন্মুখ সেনানী
আছেন । ত্রিশৎসহস্র অশ্বরোহী সেনাপতি
মাস্তুমী কারাঘুরীও বিদ্রোহতৎপর । কিন্তু
রাজা টোডরমল্ল আমাদের সকলের অন্ত-
রের ভাব জানিয়াছেন, আমাদের সকলেরই
উপর এরূপ দৃষ্টি রাখিয়াছেন যে, আমরা
কামনা সিদ্ধ করিতে পারি নাই । কিন্তু
আপনি কি কুহকে, কি যত্নাকৌশলে যে
রাজা টোডরমল্লকে অন্ধ করিয়াছেন, কিছুই
বুঝিতে পারি না । বহু আপনার বুদ্ধিবল !”

তথান আরও বলিতেছিলেন, কিন্তু ইন্স-
নাথ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “আমি বিদ্রোহী
নহি । আপনারা যদি মনে করিয়া থাকেন,
আমি গুপ্তচর, কি কপটাচারী, কি বিদ্রোহ-
কামনা করিয়া রাজা টোডরমল্লের অধীনে
কর্ম করিতেছি, তাহা হইলে আপনারা
যোর ভ্রান্তিতে নিমগ্ন হইয়াছেন । আর
আপনারা যদি বিদ্রোহী হন, তবে আমাকে
বিদায় দিন । আমার সহিত আপনাদিগের
কোন সম্পর্ক নাই । আমি এইক্ষণেই রাজা
টোডরমল্লকে সর্ববৃত্তান্ত অবগত করাইব ।
কৃপণে আমার হস্তে আপনাদিগের লিপি
পড়িয়াছিল ।”

হুমায়ুন দিউরানা ও তথান ফামিলীর
মুখ গম্ভীর হইল, উভয়েই ভাবিতে লাগিল,
“আমরা এতদিন কি ভ্রান্ত ছিলাম, মাস্তুমী
কারাঘুরী কি এই হিন্দুর অন্তর বিশেষ
জানেন না ?” উভয়েই কোষ হইতে খড়্গ
বহির্গত করিবার উত্তম করিলেন । ইন্সনাথও
শস্ত্রবিষয়ে অপটু ছিলেন না, তিনিও কোষ
হইতে অসি বহির্গত করিলেন । এমত সময়ে
হুমায়ুন পুনরায় একটু হাসিয়া বলিলেন,
“বুঝিয়াছি, আপনি বোধ হয়, এখনও আমা-
দিগকে বিশ্বাস করেন নাই, এই জন্য আমা-
দিগের নিকট বিদ্রোহ-মন্ত্রণা ব্যক্ত করিতে

চাহেন না। কিন্তু আমাদিগের নিকট মন্ত্রণা গুপ্ত করিবার আরম্ভক নাই; আপনি এ কর্ণে নিযুক্ত হইবার পূর্বাধি আমরা বিদ্রো-হোদ্ভব। এই সেবু, বিদ্রোহীদিগের নিকট হইতে আমরা স্নেহকথানি পত্র পাইয়াছি।”

ইক্ষনাথ ক্রোধে ও বিশ্বয়ে অন্ধ হইলেন; বলিলেন, “গামর মুসলমান। কাপুরুষ বিদ্রোহী! তোমাদের পাপের সমুচিত দণ্ড দিব।”

হমায়ুন ও ইক্ষনাথের মধ্যে অসিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইক্ষনাথ হমায়ুন অপেক্ষা অনেক বলিষ্ঠ ছিলেন ও অল্পদিনমধ্যে চমৎকার অস্ত্রচালনা শিক্ষা করিয়াছিলেন। মুহুর্তমধ্যে হমায়ুনের শরীর ক্ষতবিক্ষত হইল, মুহুর্তমধ্যে হমায়ুন ভূতলশায়ী হইলেন।

যখন প্রথমে ইক্ষনাথ ও হমায়ুনের সহিত যুদ্ধ হয়, তখন তর্ধান কিছু দূরে দণ্ডায়মান ছিলেন। প্রথমেই যুদ্ধ একদম ভয়ঙ্কর বেগে আরম্ভ হইয়াছিল যে, তর্ধান ইতিকর্ন্তব্য-বিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন; কিন্তু সে কেবল মুহুর্তের জন্য। যখন দেখিলেন, হমায়ুন ভূতলশায়ী হইয়াছেন, তখন একেবারে লক্ষ দিয়া ইক্ষনাথকে আক্রমণ করিলেন।

ইক্ষনাথ ফিরিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিতে করিতে হমায়ুন উঠিয়া পুনরায় অসি-হস্ত হইলেন। সুতরাং দুই জনে একেবারে ইক্ষনাথকে আক্রমণ করিলেন।

এবার ইক্ষনাথের বিষম সঙ্কট উপস্থিত। দুই জনের সহিত একজনের অসি-যুদ্ধ সম্ভবে না; বিশেষতঃ তর্ধান ও হমায়ুন অসি-চালনে নিতান্ত অপটু ছিলেন না। কেবল হমায়ুনের কাতরতা ও রক্তনীর অন্ধকার বশতই কিছুক্ষণের জন্য তাহার প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা।

হমায়ুন ক্রমে অবসন্ন-শরীর হইলেন; তর্জন করিয়া একবার শেষ আক্রমণ করিলেন। তর্ধান সেই অবসরে সতেজে আক্রমণ করিলেন। দুই জনের সমরকালীন আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য ইক্ষনাথ হঠাৎ পশ্চাৎ ঘাইবার মানস করিলেন। তখন তিনি গঙ্গার তীরে দণ্ডায়মান ছিলেন, লক্ষ দিয়া যেই পশ্চাতে ঘাইবেন, অমনি গঙ্গাসলিলে নিপতিত হইলেন। “মাতঃ পৃথিবী! এই দিগে কালে তুমিও স্থান দিলে না?” এইরূপ মনে ভাবিতে ভাবিতে গঙ্গাসলিলে মগ্ন হইলেন। তর্ধান ও হমায়ুন ইক্ষনাথের মৃত্যু স্থির করিয়া আপস কাৰ্য্যে প্রস্থান করিলেন।

হমায়ুন ও তর্ধান বাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা বড় মিথ্যা নহে; ইক্ষনাথ যেরূপ আহত হইয়াছিলেন, তাহাতে উত্থানশক্তি ছিল না। সত্তরপ করা দূরে থাক, উচ্চ পাড় হইতে পড়িয়া তিনি একেবারে চেতন হইলেন। ভাগ্যক্রমে নিকটবর্তী একখানি নৌকা বাধা ছিল এবং সেই নৌকা একজন ভ্রলোক জাগরিত ছিলেন। মৃদু জলে পড়িতে দেখিয়া তিনিও মালাগণকে জলে নামাইয়া মৃতপ্রায় ইক্ষনাথের প্রাণ বাঁচাইলেন। মালাগণ ধীরে ধীরে ইক্ষনাথকে নৌকার দিকে লইয়া চলিল; শেষে ইক্ষনাথকে নৌকার তুলিল।

যিনি মালাদিগকে উঠাইয়া ইক্ষনাথের প্রাণ বাঁচায়াছেন, তিনি রমণী। অতিশয় বহুসহকারে ইক্ষনাথের শরীর ধোত করিয়া দিলেন, তাহার পর সেই অস্বাভাবিক গুণি একে একে সিক্ত বস্ত্রের দ্বারা বঁধিতে লাগিলেন; দেখিলেন, যদিও অনেক স্থানে ক্ষত হইয়াছে, তথাপি কোন ক্ষতই গভীর বা সাংঘাতিক নহে। তাহার স্পষ্ট বোধ হইল, সমস্ত

রাত্রি উত্তম নিদ্রা হইলে প্রাতঃকালে শরীরে অধিক বেদনা থাকিবে না ।

সমস্ত রাত্রি ইন্দ্রনাথের উত্তম নিদ্রা হইল । প্রাতঃকালে চতুঃকল্লীলন করিয়া ইন্দ্রনাথ দেখিলেন, পার্শ্বে এক পরমা সুন্দরী রমণী বসিয়া রহিয়াছেন । ইন্দ্রনাথের বোধ হইল যেন, তিনি এই সুন্দরীকে পূর্বে দেখিয়াছেন, কিন্তু কোথায় দেখিয়াছেন, স্মরণ করিতে পারিলেন না ;—বলিলেন, “ভদ্রে ! আপনি আমাকে প্রাণ দিয়াছেন, আপনি বোধ হয়, আমাকে জল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন । আপনি কে ? কি করিলে এ ঋণ শোধ করিতে পারিব ? আপনি আমার জীবনরক্ষা করিয়াছেন, জানিলে রাজা টোডরমল্ল কিছুই দিতে অস্বীকৃত হইবেন না ।”

রমণী অনেকক্ষণ উত্তর দিলেন না ; ইন্দ্রনাথ বার বার প্রশ্ন করাতে অবশেষে বলিলেন, “সৈনিকবর ! আমাকে কি ইহার মধ্যে বিস্মৃত হইয়াছেন ?”

সে কোকিলনির্দ্দিত কণ্ঠধ্বনি হইয়াছে এখনও ভুলেন নাই ; উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, “রমণীরত্ন ! আমি জীবিত থাকিতে আপনাকে বিস্মৃত হইব না । আপনি কিরূপে এ স্থানে আসিলেন ? মহেশ্বর-মন্দির কত দিন ত্যাগ করিয়াছেন ?”

সেই নোকাবাসিনী রমণী বিমলা । ইন্দ্রনাথ তাঁহাকে মহেশ্বর-মন্দিরে দেখিয়াছিলেন, অতঃপর এই স্থানে এই অবস্থায় দেখিয়া বিস্মৃত হইলেন । ইন্দ্রনাথের বিস্ময় দোষরা বিমলা এ রুটু হাসিলেন, অবগুষ্ঠন টানিয়া ধীরে ধীরে আহত সৈনিকের শুক্রা করিতে লাগিলেন ।

ইন্দ্রনাথ অনেক স্থানে আঘাত পাইয়াছিলেন, কিন্তু আঘাত গুরুতর নহে । বিমলা যত্নসহকারে আঘাতগুলিতে বস্ত্র বান্ধিয়া

দিলেন । তৎপরে ইন্দ্রনাথ প্রস্থান করিবার উদ্ভোগ করিলেন ।

বাইবার সময় ইন্দ্রনাথ সেই রমণীকে শত-বার ধন্যবাদ দিলেন এবং কোনরূপ পুরস্কার গ্রহণ করিতে বার বার অস্বরোধ করিলেন ।

বিমলা অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, শেষে সজল-নয়নে উত্তর করিলেন, “সৈনিক-বর ! প্রভু ! মহেশ্বর-মন্দিরে আপনার নিকট একটি ডিঙ্কা করিয়াছি—সতীশচন্দ্রের রক্ষা । তাহাই আমাকে পুরস্কারস্বরূপ দান করুন ।”

ইন্দ্রনাথ । কিন্তু সে ডিঙ্কা নহে, সতীশচন্দ্র যদি নির্দোষী হন, তবে তাঁহাকে রক্ষা করা মহাব্যমানেই কর্তব্য । আমি আপনার আর কি করিতে পারি, আদেশ করুন, আমি পালন করিতে প্রতীক্ষিত হইতেছি ।

বিমলা অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “আমার দ্বিতীয় ডিঙ্কা এই—আপনি আমাকে মহেশ্বরমন্দিরে দেখিয়াছেন, মুষ্কেরেও দেখিলেন, এ কথা বিস্মৃত হউন ।”

ইন্দ্রনাথ বিস্মৃত হইয়া বলিলেন, “আপনি আজ আমাকে জীবনদান করিলেন, তাহা আমি কখনও বিস্মৃত হইব না । আপনার এ বাচঞা কি জন্ত ?”

বিমলা ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, “আমি ব্রাহ্মণকুমারী, অতঃপর আপনার স্মরণপথে থাকিবার অযোগ্য । সরলা আপনাকে প্রতীক্ষা করিতেছেন, অতঃপর অস্ত্র নারী আপনার স্মরণপথে থাকিবার অযোগ্য ।”

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কমলা।

As in the bosom o' the stream.
The moon-beam dwells at dewy e'en
So trembling, pure was tender love,
Within the breast o' bonnie Jean,
And now she works her nammies work,
And aye she sighs with care and pain,
Ye wist and what her ail might be,
Or what was make her weel again,
Burna.

বিমলা কি জন্ত যুদ্ধে গমন করিয়া-
ছিলেন, জানিতে পাঠক মহাশয় উৎসুক হই-
বেন, কিন্তু সে কথা বলিতে হইলে আমাদের
তাহারও পূর্বকথা লইয়া আরম্ভ করিতে হয়।
সুতরাং ইচ্ছা নাথ যে মন্দিরে সরলাকে রাখিয়া
আসিয়াছিলেন, সেই মন্দিরের কথা লইয়া
আমরা আরম্ভ করিব।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ইচ্ছামতীতীরস্থ
মহেশ্বর-মন্দিরের অনতিদূরে একটি গ্রাম
ছিল, নাম বনগ্রাম। মন্দিরের মোহান্ত চন্দ্র-
শেখর প্রায়ই দেবালয়ে থাকেন, কিন্তু মধ্য
যুগে এই পল্লীগ্রামে আসিয়া বাস করিতে
ভালবাসিতেন।

দেবালয়ের মোহান্ত সচরাচর বেক্রপ
স্বার্থপর ও বিষয়লুকে হইয়া থাকেন, চন্দ্রশেখর
সেইরূপ ছিলেন না। তিনি অতিশয় নির্মল-
চরিত্র ছিলেন ও অনেক অনাথা ব্রাহ্মণ ও
অনাথা ব্রাহ্মণীকে এই পল্লীগ্রামে রাখিয়া
দ্রাভাভারায় জায় ব্যবহার করিতেন। দেবা-
লয়ের কার্য অত্যন্ত বিধিসম্মত পূজকের হস্তে সম-
পর্ণ করিয়া চন্দ্রশেখর আপন আশ্রিত কয়েক
ঘর লোক লইয়া এই গ্রামে উপাসনা করিতে
ভালবাসিতেন, আবার আবঙ্গক হইলে
স্বয়ংও মহেশ্বর-মন্দিরের কার্য করিতেন।

কমলানাম্নী একটি অনাথা কার্ত্তিক-কন্তাকে
পরিচারিকারূপে গৃহে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু
কন্তার জায় লালন-পালন করিতেন। চন্দ্র-
শেখর বেক্রপ নির্মলচরিত্র, সেইরূপ ধর্মপরা-
য়ণ, তাঁহাকে দেখিলে পুরাকালের মুনিকবির
জায় বোধ হইত, তাহার গ্রামটিকেও তিনি
যথার্থই পুরাকালের আশ্রমের জায় করিয়া
ভুলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার শিষ্যগণ কথা-
ছলে তাঁহাকে কথমুনি এবং তাঁহার পালিতা
কমলাকে শঙ্করলা বলিত।

সায়ংকাল উপস্থিত। সেই সায়ংকালে
দুই জন নদীতীরে আসীন ছিলেন। তাঁহা-
দিগের মধ্যে একজন 'আমাদিগের পূর্বপরি-
চিত সরলা, অন্ন কমলা।

কমলা অনেক দিন অবধি এই আশ্রমে
বাস করিতেছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম উন-
বিংশ বৎসর মাত্র। তিনি কাহার দুহিতা,
কাহার বনিতা, তাঁহার স্বামীর কত দিন মৃত্যু
হইয়াছে, এ সকল কথা কেহ জানিতেন না,
জিজ্ঞাসা করিলে কমলা ক্রন্দন করিতেন,
সুতরাং কেহ জিজ্ঞাসাও করিতেন না।

কমলার স্বভাব ও আচরণ দেখিয়া
আশ্রমবাসিগণ বিস্মিত হইতেন। কমলা
সততই শান্ত, অশ্রমসঙ্গী ও চিন্তাশীল। যে
স্থানে আশ্রমপাদপপুঞ্জ অতিশয় নিবিড় ও
অন্ধকারময়, সে স্থানে মনুষ্যের শব্দমাত্র নাই,
মধ্যাহ্নকালে গৃহকার্য সমাধা করিয়া কমলা
সেই নিভৃত স্থানে একাকী চিন্তা করিতে
ভালবাসিতেন, মধ্যাহ্নে অতি যত্ননিঃসৃত
পক্ষীর রব শুনিতে ভালবাসিতেন; যেখানে
আশ্রমের পদপ্রক্ষালন করিয়া ইচ্ছামতী
কুল কুল শব্দে প্রবাহিত হইত, সন্ধ্যার সময়
কমলা সেই স্থানে বসিয়া চিন্তা করিতে ভাল-
বাসিতেন; নদীর অনন্ত কুল কুল ধ্বনি
শুনিতে ভালবাসিতেন। সে অনন্ত ধ্বনি

তনিতে তনিতে কমলাকে অনন্ত চিন্তা করিতেন, সে চিন্তা কিসের?—কে বলিবে, কিসের? চন্দ্রশেখর কমলাকে আপন গৃহে রাখিয়াছিলেন, আপন কন্ডার মত বহু করিতেন এবং গ্রামবাসিনী সকলেই কমলাকে ভালবাসিতেন এবং কমলার কথাবার্তায় শ্রীত হইতেন। সে কথাবার্তা কি মধুর, কি ভাব-পরিপূর্ণ! শ্রোতার কর্ণে অমৃতবর্ণন করিত।

কমলা নিরুপম সুন্দরী। তাঁহার নয়ন দুটি অতিশয় শাস্ত্রোচ্চাতি ও চিন্তা-প্রকাশক, সমস্ত মুখখানি শাস্ত্র ও গাঢ় চিন্তার দ্বার। দেহ অতি সুকুমার, বিধবার মলিন বস্ত্রে সে সুকুমার দেহ আবৃত করিয়া শৈবালবেষ্টিত পদ্মবৎ শোভা পাইত। কিন্তু সে প্রক্ষুণ্ণিত পদ্ম নহে, সায়ংকালের মৃদিতপ্রায় পদ্ম যেরূপ জলহিল্লোলে ঈষৎ কম্পিত হইতে থাকে, কোমলাঙ্গী তপস্বিনী সেইরূপ সতত চিন্তায় মগ্ন, লোকালয়ে সেইরূপে মৃদিতপ্রায় হইয়া থাকিতেন। কমলা চন্দ্রশেখরকে পিতা বলিয়া ডাকিতেন, চন্দ্রশেখরের গৃহকার্য্য-সমাধা তিনিই নির্বাহ করিতেন, কার্য্যে অবসর পাইলেই আবার সেই নিভৃত নিবিড় পাদপাবৃত স্থানে বাইতেন। শিখণ্ডিবাহন তাঁহাকে উপহাস করিয়া বনদেবী বলিয়া সম্বোধন করিতেন, তদনুসারে আশ্রমের অনেকেই কমলাকে বনদেবী বলিয়া ডাকিত। ফলতঃ তিনি যেরূপ একাকী বনে বনে বিচরণ করিতে ভালবাসিতেন, তাহাতে তাঁহাকে সেই শাস্ত্র পবিত্র ছায়া-দ্বিত আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া বোধ করা কিছুই বিচিত্র নহে।

অন্ত সন্ধ্যার সময় কমলা সরলাকে লইয়া বনবিচরণ করিতেছিলেন, এক্ষণে দুই জনে নদীতীরে বসিয়া রহিয়াছেন। কমলা

সরলাকে ভালবাসিতেন। সে সরলচিন্ত বালিকাকে না ভালবাসিয়া কে থাকিতে পারে? সরলাও কমলার তুঃখে তুঃখ প্রকাশ করিতেন, আপনাতঃ তুঃখ বিস্তৃত হইয়া সেই বিধবার তুঃখে তুঃখী হইতেন। স্মৃতরাং ক্রমশঃ তাঁহাদিগের মধ্যে ভালবাসার সঞ্চার হইয়াছিল।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন, সরলার আবার তুঃখ কি? বালিকার হৃদয়ে চিন্তা কিসের? আমরা উত্তর করিব, সরলা আর বালিকা নাই, তাহার হৃদয়কোরকে প্রণয়-কীট প্রবেশ করিয়াছে।

যে দিন হঠাৎ ইন্দ্রনাথ সরলার নিকট বিদায় লইয়াছিলেন, সে দিন হইতে প্রণয় কাহাকে বলে, সরলা বুঝিল, চিন্তা কাহাকে বলে, বুঝিল। সরলা এখনও পূর্ব্বের ত্যায় স্নেহময়ী কন্যা, কিন্তু এক্ষণে মাতার সেবা-শুশ্রূষা করিতে করিতে সততই আর এক জনের কথা হৃদয়ে জাগরিত হইত, আর একখানি মুখ মনে পড়িত। এখনও সরলা পূর্ব্বের ত্যায় পারিশ্রম্য করিত, কিন্তু কার্য্য করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিত, আবার ধীরে ধীরে চক্ষে জল আসিত, লজ্জায় অশ্রু মুছিয়া আবার কার্য্যে নিযুক্ত হইত, আবার ধীরে ধীরে চক্ষে জল আসিত। ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সেই জলে চক্ষুঃস্রব পরিপূর্ণ হইত, ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সেই জলে মুখখানি সিক্ত হইত।

চিন্তা কি? সরলাকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর দিতে পারিত না, কিন্তু আমরা অনুভব করিতে পারি। “রুদ্রপুরে পূর্ণচন্দ্রালোকে যে দেবমূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, আবার কি সে মূর্ত্তি দেখিতে পাইব? বাঁহার কণ্ঠে লীলাক্রমে মালা দিতাম, তাঁহাকে কি আবার দেখিতে পাইব? যুদ্ধ হইতে ইন্দ্রনাথ

আবার কি কিরিয়া আসিবেন ?” এই চিন্তা করিতে করিতে সরলা কার্য-কৰ্ম ভুলিয়া বাইত, চারিদিক শূন্য দেখিত, জ্ঞানচক্ষে সেই রক্তপূরের কুটীর দেখিতে পাইত ; সেই কুটীরের পার্শ্বে সেই উজ্জান—সে উজ্জানে সেই পুষ্পচারা, উপরে পূর্ণচন্দ্র—সেই পুষ্প-চারামধ্যে সেই চন্দ্রালোকে সেই হৃদয়ের ইচ্ছানাথ—সহসা নরনকলে সরলার মুখখানি প্রাবিত হইয়া বাইত।

মন্দিরবাসীদিগের মধ্যে একজন যাত্র সরলার মনের ভাব বুঝিয়াছিল। কমলা সরলাকে কখন কখন আপনার সঙ্গে নিস্তরু নদীকূলে অথবা সুস্থিদ্ধ ছায়াবৃত বৃক্ষতলে লইয়া যাইতেন এবং আপনার চিন্তার ভাগিনী করিতেন, সরলার চক্ষের জল মুছাইয়া দিতেন, ভগিনীর স্নায় ভালবাসিতেন। সরলা কমলার গল্প শুনিতে শুনিতে আপন হৃৎক ভুলিয়া বাইত, কমলার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আপন হৃৎক দূর করিত। যেরূপ জনশূন্য স্থানে যাইতে তাহার ভয় করিত, চিন্তাশীলা কমলার সঙ্গে সে সকল স্থানেও বাইত, যেরূপ গভীর ভাবময় চিন্তা তাহার বালিকা-হৃদয়ে কখন স্থান পায় নাই, ভাবিনী কমলার নিকট তাহাও শুনিত। কলতঃ দুই জনে একত্র হইলে কমলা আপনার হৃদয়ের কবচ উন্মুক্ত করিয়া বালিকার নিকট নানারূপ গল্প করিতেন ও অন্তরের নানারূপ ভাব প্রকাশ করিতেন। সরলা বালিকার মত একমনে সেই সমুদয় শুনিত। সে ভাব তাহার বড় ভাল লাগিত, সে হৃদয়-গ্রাহী কথা শুনিতে শুনিতে আপন হৃৎকথা বিস্মৃত হইত।

আজি সন্ধ্যার সময় তাঁহারা দুই জনে নদীতীরে বসিয়া আছেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

—)*(—

কে বল দেখি ?

Manfred. Oblivioo, self-oblivion

Byron.

কমলা ডাকিলেন, “সরলা !”

সরলা উত্তর না করিয়া কমলার মুখের দিকে চাহিল।

কমলা জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ তোমাকে এত স্নান দেখিতে ছি কেন ?”

সরলা মুখখানি নত করিল।

কমলা দেখিলেন, আজ হৃৎকবেগ প্রবল হইয়াছে। স্নেহসহকাৰে সরলার নিকট বসিয়া সরলার হস্ত আপন হস্তে ধারণ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, “ভগিনী ! পৃথিবীতে তোমা অপেক্ষাও হতভাগিনী আছে। তোমার রেহমত মাতা আছেন, জগৎসংসারে থাকিবার স্থান আছে, হৃদয়-স্বর আবৃত আছে, তোমার অংশভরসা সকলই আছে ; পৃথিবীতে এরূপ হতভাগিনী আছে, বাহার কিছুমাত্র নাই, বাহার ভবিষ্যতের আশা নাই, অতীতের স্মৃতি নাই, কেবল অতুল চিন্তাজলে ভাসিতেছে।”

• সরলা কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইল;—বলিল, “দিদি, তোমার কথা ভাবিলে আমি আপন হৃৎক ভুলিয়া যাঃ।”

কমলা। বিধাতা সহ করিবার জন্তই নারীজন্ম দিয়াছেন। পুরুষে যত সহ্য করিবে, আমরা তাহার দশ গুণ সহ্য করিব।

সরলা। যদি না পারি ?

কমলা। তবে নারীজন্ম গ্রহণ করিলে কেন ? দেখ, মহুবার মানসময় আছে, ধন-সম্পত্তি আছে, কৃশমতি আছে, নামগৌরব আছে, জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সহস্র

অবলম্বন আছে, সহস্র স্রব্ধের কারণ আছে, একটি না হইলে অষ্টটি অবলম্বন করিতে পারে, সেটি না পাইলে অপর একটি অলম্বন করবে, সেই অলম্বনক্রমে জীবন যন্ত্রণা অতিবাহিত হয়। চেষ্টা সকল হউক বা না হউক, যত দিন চেষ্টা থাকে, যত দিন আশা থাকে, তত দিন জীবন ধূরুহনীয় হয় না। আর আশা নাই কোন্ মহুযোর? যুবকের উচ্চাভিলাষ, মান সম্মান, ক্ষমতা ও খ্যাতিলাভে আকাঙ্ক্ষা; বুদ্ধের ধন-কামনা, পুত্র-কামনা, বংশবৃদ্ধি-কামনা, সহস্র কামনা, সহস্র আকাঙ্ক্ষার জীবন অতিবাহিত হয়। আর অভাগিনী নারীকুলের কি আছে?

কমলা কণেক নিমন্ত হইলেন, সরলার দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, সরলা একাগ্র-চিত্তে শুনিতেছে আর তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে। তখন আবার বলিতে লাগিলেন, “অভাগিনী নারীকুলের কি আছে? সংসারযন্ত্রণা অপার সমুদ্রে তাহা-দিগের একটিমাত্র ক্ষুদ্র তরী আছে, সেটি ভালবাসা। সেই ভালবাসার উপর নির্ভর করিয়া তাহারা অপার সংসারে আইসে। যদি সেই তরীটি ডুবি, তবে নারীর আর অবলম্বন নাই, আর স্রব্ধের কারণ নাই, আর আশা নাই, আর ভরসা নাই, অতল জলে মৃত্যু ভিন্ন আর উপার নাই।”

সরলা বলিল, “আমার বোধ হয়, দিদি, তুমি বড় দুঃখিনী, তোমার দুঃখকথা জানিতে বড় ইচ্ছা হয়।”

কমলা উত্তর করিলেন, “তথাপি সরলা, আমি দুঃখিনী নহি। চিত্তাই আমার জীবন-যন্ত্রণা হইয়াছে। এই যে গলিত বৃক্ষপত্রের মর্দন শব্দ শুনিতে পাইতেছি, মধ্যাহ্নে যখন এই বৃক্ষতলে বসিয়া এই মর্দনশব্দ শ্রবণ করি, তখন আমার হৃদয় শান্তিরূপে পরিপূরিত

হইতে থাকে; এই যে আকাশে খণ্ড-খণ্ড শুভ্র মেঘের ভিতর দিয়া চন্দ্র বাইতেছে দেখিতেছি, কণেক মাত্র দ্রব্য অন্ধকার করিয়া আবার পরিষ্কার নীল গগনমণ্ডলে বাহির হইয়া আপন জ্যোতিঃ বিস্তার করিতেছে, এই চন্দ্র ও আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমি নিরুপম শান্তিলাভ করি। এই সকল দেখিয়া আমার হৃদয়ে যে অনন্ত ভাবের উদ্বেগ হয়, তাহাতেই আমার স্রব্ধ। সরলা, আমি দুঃখিনী নহি।”

সরলা কণেক নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিল, “দিদি, তোমার পূর্বকথা জানিতে আমার ইচ্ছা করে।”

কমলা বলিলেন, “সরলা, তুমিও আমাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করিলে? আশ্রম-বাসীদিগের নিকট আমি কিছুই বলি না, কিন্তু ভগিনি! তোমার নিকট আমার লুকাইবার কিছুই নাই। আমি সত্য সত্য বলিতেছি, আমার জীবন কোন অপক্লম মোহ-জালে জড়িত রহিয়াছে, তাহা আমি ভেদ করিতে পারি না—আমার পূর্বকথা কিছু-মাত্র স্মরণ নাই।”

সরলা আশ্চর্য হইল, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, “কিছু মনে নাই? দিদি, তোমাদের বাড়ী কোথায়?”

কমলা। পশ্চিমদেশে; গ্রামের নাম স্মরণ নাই।

সরলা। তোমার পিতার নাম কি?

কমলা। আমি শৈশব হইতে অনাথা।

সরলা। তোমার স্বামীর নাম কি ছিল?

কমলা। নাম স্মরণ নাই। কেবল সে দেবমুষ্টি হৃদয়ে আগ্রসিত রহিয়াছে।

সরলা। দিদি, তুমি অকালে বিব্বা হইলে কিরূপে?

কমলা। একটা কি মহাবিপদে তাঁহাকে

হারায়ে! তাহার পর আমার ভয়ঙ্কর পীড়া হয়, তদবধি এই শবিত্র মহেশ্বর-মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছি।

কমলা কণ্ঠে পর বলিতে লাগিলেন, “আমার কেবল এইমাত্র স্মরণ আছে যে, কিছুদিন পীড়ায় জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলাম, হৃদয়ে অতিশয় বেদনা বোধ করিয়াছিলাম, যাতনায় স্থির হইয়াছিলাম। সেই পীড়ার সময় স্বপ্নেও স্বামীর দেবমূর্তি দেখিতাম। বোধ হইত যেন, অপরিণীত নীলাকাশের মধ্যে চন্দ্র-করোজ্জ্বল একটি ক্ষুদ্র শুভ্র মেঘখণ্ডে সেইদেব-মূর্তি বসিয়া রহিয়াছেন। এখনও আকাশের দিকে চাহিলে তাঁহাকেই দেখিতে পাই।”

কমলা আরও বলিতে লাগিলেন, “যখন আমি ধোর পীড়া সহ করিতেছিলাম, তখন সকল লোকই স্থির করিল-যে, আমি আর বাঁচিব না। পিতা চন্দ্রশেখর সে সময়ে তীর্থপর্যটন করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হন। পিতার দরদার শরীর, তিনিই আমাকে যত্ন করিতে লাগিলেন। নিরাশ্রয় বিধবাকে পিতা আশ্রয়দান করিয়া আপন নৌকায় তুলিলেন। তখনও আমার ঘোর পীড়া, গ্রামের সকলেই স্থির করিল যে, নৌকাতেই আমার মৃত্যু হইবে। অনেক দিন জলপথে আসিতে লাগিলাম, নদীর স্বাস্থ্যজনক বায়ুতে আর পিতার যত্নে আমি পুনরায় আরোগ্যলাভ করিলাম। কিছু দিন পরেই নৌকা আসিয়া এই মন্দিরের ঘাটে লাগিল, সেই অবধি আমি পিতার গৃহেই রহিয়াছি।”

শুনিতে শুনিতে সরলার চক্ষুতে জল আসিল। সরলা ধীরে ধীরে কমলার নিকটে আসিয়া তাহার হস্তধারণপূর্বক বলিল, “দিদি, আমি আর নিজের জন্ত দুঃখ করিব না,

তোমার দুঃখকথা শুনিয়া আমি নিজের দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছি।”

তুই জনে অনেককণ এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইতিমধ্যে পশ্চাৎ হইতে একজন লোক আসিয়া সরলার চক্ষু চাপিয়া ধরিয়া বলিল, “কে বল দেখি?”

সরলা সে স্বর চিনিতে, কিন্তু হঠাৎ মনে পড়িল না, একে একে বনগ্রামীবাসিনীদিগের নাম করিতে লাগিল।

“নিম্মারিণী”—চক্ষু হইতে হস্ত উঠিল না।

“মনোমোহিনী”—তথাপি হস্ত উঠিল না।

“যোগেন্দ্রমোহিনী”—তবু হইল না।

“তারা”

“তোমার মাথা, আমাকে ইহার মধ্যেই ভুলেছি? তবু এখনও বিবাহ হয় নাই।” না জানি বিবাহের জল গায়ে লাগিলে কি হইবে!—ইত্যাদি বলিতে বলিতে সরলার প্রিয়সই অমলা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

সরলার বিশ্বাসের সীমা থাকিল না—“সই—এখানে?—কবে আসিলে?” বাষ্পপরিশুদ্ধ লোচনে সরলা অমলাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার বক্ষে আপন মুখ লুকাইল। অমলাও যখন অনেক দিন পরে সেই প্রেমপুষ্পটিকে হৃদয়ে স্থান দিল, তখন তাহার চক্ষুও শুষ্ক ছিল না।

কণ্ঠে পর অমলা বলিল, “এই দুই প্রহর যাত্রিতে এই অন্ধকারে এখানে বসিয়া আছ? আমি যে তোমার জন্ত কত অশেষণ করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না।”

সরলা। এখানে কমলাদিগের সহিত আসিয়াছি, কথায় কথায় যাত্রি অধিক হইয়াছে। সই, তুমি অত আসিলে?

অমলা। হাঁ, আমি আজই আসিয়াছি, তোমাকে দেখিবার জন্ত কত দিন আসিব

আসিব মনে করি, তা 'বুদ্ধবায়ী' কি আমাকে
ছাড়ে ? আজ কত করিয়া তবে আসিলাম ।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় তিন জন আশ্রমে
কিয়িরা আসিল ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।

ইচ্ছাপুরের জমিদার ।

BUT I have woes of other kind.
Trouble and sorrows more severe.
Give me to ease my tortured mind.
Lend to my woes a patient ear.

Crabbe.

চন্দ্রশেখর ও শিখণ্ডিবাহন ভিন্ন সে গ্রামে
আর কেহই মহাশেখতার প্রকৃত পরিচয় জানি-
তেন না । তাঁহারও এ কথা কাহারও নিকট
প্রকাশ করিবেন না, বিশেষরূপে প্রতিশ্রুত
ছিলেন ।

মন্দিরের শান্ত ঘেঘবিঘেঘশূন্য নিবাসি-
গণের সহিত একত্র বাস করিতে করিতে
মহাশেখতার অন্তঃকরণও কিঞ্চিৎ পরিমাণে
শান্ত হইয়া আসিয়াছিল । কিন্তু সে বয়সে
স্বভাবের পরিবর্তন কখনই হয় না । মহা-
শেখতার বিজাতীয় মান ও জিঘাংসা অন্তরে
সেইরূপ জাগরিত ছিল, স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া
তিনি সেইরূপই প্রতি রাত্রে বৈরনির্গাতনের
স্তম্ভ শিবপূজা করিতেন ।

চন্দ্রশেখরের কুটারে অল্প একজন অতি-
সমুদ্রিশালী অতিথি আসিয়াছেন বলিয়া
অনেকেই খাওয়া দাওয়া সাজ হইলে তথায়
থাইয়া সমবেত হইলেন । গৃহের মধ্যস্থানে
চন্দ্রশেখর বসিয়া রহিয়াছেন । তাঁহার বয়ঃ-
ক্রম পঞ্চাশৎ বর্ষেরও অধিক হইয়াছে । কিন্তু
দিন দিন মন্দিরের শান্ত দেবকণ্যা নির্বাহ
করিয়াই হউক বা মানসিক শান্তি বশতই

হউক, তাঁহার প্রশস্ত ললাটে একটিমাত্র
বার্হিকা-চিহ্ন নাই । নয়ন দুটি জ্যোতিঃপূর্ণ,
সমস্ত শরীর তেজঃপূর্ণ, সেই শরীরের উপর
যজ্ঞোপবীত লবিত রহিয়াছে । তাঁহার
দক্ষিণপার্শ্বে সেই সমুদ্রিশালী অতিথি বসিয়া
আছেন, তাঁহারও বয়ঃক্রম চন্দ্রশেখরের
সহিত সমান হইবে, কিন্তু সংসার-চিন্তার ও
পার্থিব দুঃখে তাঁহার শরীর লীর্ণ করিয়াছে ।
মস্তকের কেশ অধিকাংশ শুষ্ক হইয়াছে, অঙ্গুগ-
লের কেশও দুই একটি শুভ্রবর্ণ হইয়াছে ।
চক্ষুতে জ্যোতিঃ নাই, বদনমণ্ডলে কান্তি
নাই, বিশাল শরীরে এক্ষণে আর বল
নাই । তাঁহাদিগের দুই জনকে দোঁধলে
সংসার ও সংসারচিন্তার অকস্মিককারিতা ও
পুণ্যবলের মহিমা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় । এই
সমুদ্রিশালী অতিথি পাঠক মহাশয়ের নিতান্ত
অপরিচিত নহেন ; ইনি ইচ্ছাপুরের জমিদার
নগেন্দ্রনাথ ।

সেই দুই জনের উভয়পার্শ্বে ও পশ্চাতে
অনেক মন্দিরবাসী উপবেশন করিয়া রহিয়া-
ছেন । চন্দ্রশেখরের কিঞ্চিৎ পশ্চাতে, ঈষৎ
অন্ধকারে মহাশেখতা অবগুণ্ঠনবতী হইয়া
বসিয়া রহিয়াছেন । তাঁহার পার্শ্বে শিখণ্ডি-
বাহন বসিয়া রহিয়াছেন ; মুহূর্ত্ত কি কথা
কহিতেছেন, এক একবার নগেন্দ্রনাথের
দিকে লক্ষ্য করিতেছেন । চন্দ্রশেখরের বাম-
হস্তের নিকট কমলা বিনীতভাবে বসিয়া কি
চিন্তা করিতেছেন । কুটারের একপার্শ্বে
অমলা ও সরলা বসিয়া রহিয়াছে ; আজ
তাঁহাদিগের আনন্দ অপার, তাঁহাদিগের গল্প
শেষ হইতেছে না, তাঁহাদিগের স্মৃষ্টি ওষ্ঠে
সুহাসি শুকাইবার সময় পাইতেছে না ।
অপর একটি পার্শ্বে নিস্তারিণী, মনোমেহিনী,
যোগেন্দ্রমোহিনী ও তারাসুন্দরী প্রভৃতি অল্প-
বয়স্ক ব্রহ্মণকস্তাগণ আমোদ ও রহস্ত করি-

ভেদে। আমার এক একবার নিশ্চয় হইয়া
চন্দ্রশেখর ও নগেন্দ্রনাথের কথা শুনিতেছে।

নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাসিধাস পরিত্যাগ করিয়া
চন্দ্রশেখরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “মহাশয়!
আমি আপনার বিস্তারিত বহুধর-মন্দির দেখিয়া
অতিশয় মুগ্ধ হইলাম। যদি মোহময় সংসার
ত্যাগ করিয়া আপনার মত এই ধর্মপথ অব-
লম্বন করিতাম তাহা হইলে এই বার্ককে
আমি অসীম দুঃখসাগরে ডাসিতাম না।”

চন্দ্রশেখর উত্তর করিলেন, “মহাশয়,
কেবল কি মন্দিরেই পুণ্যকর্ম সম্ভবে?
শাস্ত্রে বলে, সত্য ও পরোপকারিতায় যত
পুণ্য বাগবজ্রে তত নাই। যে জমীদার
পরোপকারিতা ও প্রজাবাৎসল্যের জন্য সর্ব-
ত্রই সমাদৃত, তাহার কি মন্দিরবাসের জন্য
আক্ষেপ উচিত?”

নগে। মহাশয়! আপনি আমাকে অতি-
শয় সম্মান করিলেন, আমি সে সম্মানের
যোগ্য নহি। যদি যোগ্য হইতাম, তবে আজ
পাপপ্রশমনার্থ মহাত্মা চন্দ্রশেখরের নিকট
আসিতাম না।

চন্দ্র। এ জগতে সহস্র গুণ সত্ত্বেও কে
মহাপাপী নহে? কে বলিতে পারে, আমি
পাপ করি নাই? কে বলিতে পারে, আমি
নিষ্কলঙ্ক, নিরপরাধী?

দুই জনে অনেকক্ষণ এইরূপ কথোপকথন
করিতে লাগিলেন। অবশেষে নগেন্দ্রনাথ
আপনার আসিবার কারণ বলিতে লাগিলেন।

—*—

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

জমীদারের পূর্বকথা।

AND let me if I may not find
A friend to help, find one to hear.

Crabbe.

নগেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন, “মহাশয়!
আমার মত দুঃখী আর কেহই নাই, আমার
দুঃখকথা শ্রবণ করুন।

আমার সহধর্মিণী আমাকে বলিতেন যে,
যে দিন তাহার জন্ম হয়, সে দিন আকাশে
অপরূপ তিথি নক্ষত্র দেখা গিয়াছিল। ব্রাহ্মণ-
পণ্ডিত গণিয়া বলিয়াছেন যে, শিশুকল্পা
ঘোর উন্মাদিনী হইবেন। সে ভ্রম, আমার
সহধর্মিণী উন্মাদিনী হন নাই; কিন্তু তাহার
কতকগুলি মনোবৃত্তি অতিশয় বেগবতী ছিল,
সে জন্য আমি তাহাকে পাগলিনী বলিতাম।
আজি বাদশব্দ হইল, সে স্নেহময়ী পাগলি-
নীর কাল হইয়াছে।

পাগলিনীর গর্ভে আমার দুইটি পুত্র
জন্মে। দুই জনই তাহাদের গর্ভবারিণীর মত
পাগল। জ্যেষ্ঠটি চিন্তায় পাগল, কনিষ্ঠটি
কাজকর্মে পাগল। সে দুইটি পুত্র আমার
দুইটি নয়নের তারা ছিল। আজ তাহার।
কোথায়? হায়, দারুণ বিধি! বার্ককে কি
আমার কপালে এই লিখিয়াছিল? আমার
দুইটি নয়নই গিয়াছে। আমি অন্ধ হইয়াছি।
দুইটি রত্ন হারাইয়া আমি কান্দালী হইয়াছি।”

সে দুঃখবচনে সকলেরই হৃদয় জ্বলীভূত
হইল। কণেক পরে নগেন্দ্রনাথ বলিতে লাগি-
লেন, “আমার জ্যেষ্ঠপুত্রকে অল্পবয়সে ব্যাঘ্রে
লইয়া যায়; তাহারই শোকে তাহার মাতা
কালগ্রাসে পতিত হয়। কনিষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্র-
নাথের মুখ চাহিয়া আমি সে শোক সহ

করিয়াছিলাম। আহা! সেজন্য বীরপুত্র কেহ কখনও দেখে নাই। রজা-খশে, বিজা-লোচনার, বল ও বিক্রমে সুরেন্দ্রনাথের মত কে ছিল? বৎস নবীন-বরসে সিংহধ্বজ ধারণ করিত, মল্লযুদ্ধে পাণ্ডারানদিগকে পরাস্ত করিত, বাহুবলে সকলকে বিম্বিত করিত, অশচালনার তাহার সমকক্ষ এ দেশে কাহাকেও দেখি নাই। যে দেখিত, সুরেন্দ্রনাথকে দয়ার দাতা কর্ণ বলিত, বলবিক্রমে ভীমাবতার বলিত। বালক বাল্যকালেই রাজা সমরসিংহের নিকট যুদ্ধবার্তা শুনিতে ভালবাসিত, শুনিতে শুনিতে বালকের মুখ গভীর হইত নয়নদ্বয় প্রজলিত হইত। শিশু সমরসিংহের খড়্গ ধারণ করিত ও ‘যুদ্ধে বাই’ বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিত। রাজা সমরসিংহ অশ্রুপূর্ণলোচনে বালককে চুমন করিতেন। বাল্যকালেই তাহাকে রাজা সমরসিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া বাইতেন। রাজা সর্বদাই বলিতেন, ‘পাঠানেরা বাঙ্গালীকে ভীরা বলিয়া ভৎসনা করে, কিন্তু সেই বাঙ্গালীর মধ্যেও মধ্যে মধ্যে বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ! আমি মরিলে তুমি আমার তরবারি লইবে, তোমার হস্তে এ খড়্গের অপমান হইবে না।’ আজি সে সুরেন্দ্র কোথায়? বিধাতাঃ! এক্ষণে আর কে আছে, বাহার মুখ চাহিয়া আমি সুরেন্দ্রনাথের বিচ্ছেদ সহ করিব?”

বুদ্ধ একটি অশ্রুবিম্ব ত্যাগ করিলেন। চন্দ্রশেখর শোকার্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “সুরেন্দ্রনাথের কোন অমঙ্গল সমাচার শ্রবণ করিয়াছেন?”

নগেন্দ্রনাথ। আহা, যদি শ্রবণ করিতাম, তাহা হইলে আর এতক্ষণ জীবিত থাকিতাম না।

চন্দ্র। তবে এত চিন্তিত হইতেছেন

কেন? সুরেন্দ্রনাথ কিছু দিনের জন্য বিদেশে গিয়াছেন, ঈশ্বর-ইচ্ছায় অবশ্যই দূশমে প্রত্যাবর্তন করিবেন।

নথো। আশীর্বাদ করুন, যেন তাহাই হয়। কিন্তু আমি কল্যাণান্তিমোগে অভি-শ্রম হুস্ত দেখিয়াছি, সেই অন্তই ব্যাকুল হইয়াছি, সেই অন্তই আপনার নিকট আসিয়াছি। যোধ হইল যেন, ভরকর তরঙ্গরাশির মধ্যে আমার পুত্রকে দেখিলাম, যেন সে তরঙ্গরাশিতে আমার দেবতুল্য পুত্র নিমগ্ন হইতেছে, দূরদেশে উপায়হীন বন্ধুহীন হইয়া নিমগ্ন হইতেছে। প্রভু! এ স্বপ্নের অর্থ করিয়া দিন, যদি কোন অমঙ্গল ঘটয়া থাকে, তবে আমি এইক্ষণে প্রাণত্যাগ করিব।

চন্দ্রশেখর বলিলেন, “শাস্ত হউন। ‘ভগবান্ আপনার বীর পুত্রকে রক্ষা করিবেন, পুণ্যাত্মা প্রজাবৎসল জমীদারকে বৃদ্ধবরসে পুত্রহীন করিবেন না।”

নগেন্দ্রনাথ সজলনয়নে উত্তর করিলেন, “প্রভু! আমাকে পুণ্যাত্মা বলিবেন না, আমি বহুপাপে কলঙ্কিত। যদি রুচি হয়, যদি আমার প্রতি আপনার অহুগ্রহ হয়, আমার পাপকথা শ্রবণ করুন, তৎপরে উপায় বিধান করুন।

যখন আমার সুরেন্দ্রনাথের বয়ঃক্রম ষাটশ বর্ষ, তখন আমি সপুত্রে রাজা সমরসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। আপনি জানেন, রাজা সমরসিংহ বঙ্গদেশীর কার্য জমীদারদিগের শিরোরত্ন ছিলেন এবং আমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত ভালবাসিতেন। একদিন আমরা দুইজনে কথা বলিতেছি, আমাদের পার্শ্বে সুরেন্দ্রনাথ আর সমরসিংহের একমাত্র দুহিতা ক্রীড়া করিতেছিল। ক্রীড়াক্ষেত্রে সেই দুহিতা একটি পুশ-

মালা লইয়া সুরেন্দ্রনাথের গলায় পরাইয়া

দিল। রাজা কস্তাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল-
বাসিতেন, কস্তার এই কার্যটি দেখিয়া
আনন্দে তাঁহার চক্রেতে জল আসিল;
আমাকে বলিলেন, “নগেন্দ্রনাথ, অনেক
রাক্ষসের সহিত আমার এই কস্তাব সম্বন্ধ
হইতেছে, কিন্তু কস্তা যাঁহাকে আপনি বরণ
করিয়াছে, তাহারই সহিত আমি উহার
বিবাহ দিব।” আমার আনন্দের পরিসীমা
রহিল না, বঙ্গচূড়ামণি রাজা সমরসিংহ এক-
মাত্র হুঁতাকে যে এই অক্লিষ্টকর জমী-
দারের পুত্রের হস্তে অর্পণ করিবেন, তাহা
আমার সৌভাগ্য, সেই দিনই আমরা অঙ্গী-
কারে বদ্ধ হইলাম, সে অঙ্গীকার আমি ভঙ্গ
করিয়াছি।”

মহাশ্বেতা অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে
তাক্ষ কটাক্ষপাত করিতেছিলেন, তাঁহার
শরীর কণ্টকিত হইতেছিল। তিনি নগেন্দ্র-
নাথের মুখে এই কথা শুনিবার জন্ত তথায়
বসিয়াছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ আবার বলিতে লাগিলেন,
“আমি সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছি। সমর-
সিংহের মৃত্যুর পর আমি নিরাশ্রয় বিধবার
কস্তার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ দিতে
অসম্মত হইলাম। তখন আমি অন্ত সম্বন্ধ
হির করিতে লাগিলাম। বঙ্গদেশে সমৃদ্ধি-
শালী কায়স্থ জমীদারের অভাব নাই, ইচ্ছা-
পূরে জমীদারকুলের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনে
কেহই বিমুখ নহেন, নীলই উপযুক্ত পাত্রী
পাইলাম। কিন্তু যদিও আমি অঙ্গীকারভঙ্গে
তৎপর হইয়াছিলাম, আমার ধর্মপরায়ে পুত্র
তাঁহাতে অসম্মত হইল। একদিন আমাকে
বলিল, ‘পিতা, আমি আপনার কোন কথার
অবাধ্য হইতে পারি না, একটি বিষয়ে
আমাকে ক্ষমা করিবেন, আপনি রাজা সমর-
সিংহের নিকটে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন,

তাহা ভঙ্গ করিতে দিব না।’ পুত্রের এই
যথার্থ কথার আমি রুষ্ট হইলাম, তৎক্ষণাৎ
নূতন পাত্রীর সহিত বিবাহের দিন স্থির
করিলাম, বলপূর্বক তাহার সহিত স্বরেন্দ্র
নাথের বিবাহ দিবার উপক্রম করিলাম।
কিন্তু আমার পুত্রের কথাই রহিল, আমার
পুত্র গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন
করিল, তাহাকে সেই অবধি আর দেখি নাই।”

নগেন্দ্রনাথ আবার বলিতে লাগিলেন,
“সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছি, সেই জন্ত
এই বৃদ্ধবয়সে আমার এই বাতনা। কোথায়
এই বয়সে আমার অশ্বিনীকুমারের স্মার দুই
পুত্র আমার হস্ত হইতে জমীদারীর ভার
লইবে, কোথায় চন্দ্রাননা পুত্রবধূর বৃদ্ধ
ঋণের সেবা-শুশ্রূষা করিবে, তাহা না হইয়া
আমান পুত্র নাই, পুত্রবধূ নাই, স্নেহময়ী
সহধর্মিণী নাই, আমি অগাধ সমুদ্রে ভাসি-
তেছি। প্রভু! আমার স্মার হতভাগ্য এ
তিন সংসারে আর কে আছে?”

এই কথা শাঙ্গ করিয়া দুই হস্তে চক্ষু
আবরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে
লাগিলেন, সে রোদন শুনিয়া সকলের হৃদয়
বিগলিত হইল। চন্দ্রশেখর অনেকক্ষণ
সাক্ষী করার অবশেষে বৃদ্ধ শাঙ্গলাভ
করিলেন।

তৎপরে শিখণ্ডিবাহন নগেন্দ্রনাথকে
লজ্জা করিয়া বলিলেন, “প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়া
বদি অন্তায় করিয়া থাকেন, সে প্রতিজ্ঞা
পুনরায় পালন করিতে যত্নবান হউন।”

নগেন্দ্রনাথ কহিলেন, “শিখণ্ডিবাহন!
আমি প্রতিজ্ঞা পালন করিব, রাজা সমর-
সিংহের অনাথা হুঁতাকে আনিয়া দাও,
আমার স্বরেন্দ্রনাথের সহিত বিবাহ দিব।
আর আমার পূর্ববৎ গরু নাই, পূর্ববৎ
অভিমান নাই, এবার যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ

করি, তাহা হইলে বেন আমি আর পুত্রের
মুখ কখন না দেখিতে পাই। ইহা অপেক্ষা
অভিশাপ আমি আর জানি না।”

শিখণ্ডিবাহন কোন উত্তর না করিয়া
মহাশেতার সহিত পুনরায় কথা কহিতেলাগি-
লেন। সে কি কথা হইতেছিল, পাঠকমহাশয়
অন্যাসনে অস্থম্ব করিতে পারিবেন।

শিখণ্ডিবাহন বলিতেছিলেন, “ভগিনি !
আর বিলম্বে কাজ কি ? আপনার পরিচয়

মহাশেতা উত্তর করিলেন, “যদি বিধাতা
আমাদিগকে পূৰ্ব্বমত উন্নতিসম্পন্ন না করেন,
তাহা হইলে এ জন্মে পরিচয় দিব না, এ
জন্মে কস্তার বিবাহ দিব না।”

শিখণ্ডি। কেন ?

মহাশেতা। পরের নিকট অঙ্গুগ্রহ গ্রহণ
করা আমার স্বামীর রীতি ছিল না। তিনি
অপরকে অঙ্গুগ্রহ বিতরণ করিতেন, কাহা-
রও নিকট অঙ্গুগ্রহ গ্রহণ করিতেন না।

শিখণ্ডি। তবে আপনি আমাকে নগেন্দ্র-
নাথের নিকট প্রতিজ্ঞাপালনের প্রস্তাব
করিতে বলিলেন কেন ?

মহাশেতা। এ অবস্থায় উনি প্রতিজ্ঞা-
পালনে সম্মত আছেন কি না, দেখিবার
জন্ত, আমি সম্মত নহি।

বিংশ পরিচ্ছেদ ।

বনগ্রাম-ত্যাগ ।

All prevailing foe !

I curse thee ! let suffering curse

Clasp thee, his toriurer, like-remcrac.

Shelley

কুটীরে বাহারী আগিয়াছিলেন, একে
একে তাঁহারা সকলেই প্রায় উঠিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণপত্নী ও ব্রাহ্মণকস্তাপণ সকলেই আপন
আপন গৃহে গমন করিলেন। মহাশেতা
এখনও বসিয়া ছিলেন, আর অমলা প্রিয়-
সখীর মতক আপন কলরে ধারণ করিয়া
বসিয়াছিল। অমলা এককণ কি জন্ত বসিয়া-
ছিল, পাঠক মহাশয় জানিতে ইচ্ছা করেন
অমলা ডাখিতেছে, “জমীদার মহাশয়ের
পুত্র বিবাহ করিতে অসম্মত হইয়া পিতার
গৃহত্যাগ করিয়াছেন, জমীদার মহাশয় এই-
রূপ বলিতেছেন ; হরি ! হরি ! যদি ইন্দ্ৰ-
নাথ এই জমীদার মহাশয়ের পুত্র না হয়,
তবে আমি কৈবর্তের মেয়ে নহি ! মন, স্থির
হও, পিতা বাহাকে বিবাহ করিতে বলে,
তাহাকে বিবাহ করিবে না, সমরসিংহের
মেয়েকে বিবাহ করিবে, সমরসিংহের বিধবা
একণে নিরাজ্র, ছদ্মবেশে আছেন, তাঁহার
মেয়েকে বিবাহ করিবার জন্ত পাগল হই-
য়াছেন ; হরি ! হরি ! আমার সই কি সমর-
সিংহের কস্তা ? মহাশেতাকে দেখিলেও
রাজরাণীর মত বোধ হয়, সান্নিধ্য কীর্ত্তিবিধি-
বার মত বোধ হয় না, কাহারও সহিত
অধিক কথা কহেন না, প্রত্যহ শিব-পূজা
করেন, বৃদ্ধ-বয়সেও মুখে স্বর্গীয় মহিমা বিবাজ
করিতেছে। আর সরলা ! সই আমার
বকের উপর গাঢ় নিদ্রার অভিভূত, আমার
বোধ হয়, উহার মন ইহা অপেক্ষাও গাঢ়-
নিদ্রার অভিভূত। আপনি রাজকস্তা হইয়াও
তাহা জানেন না। রাজকুমারীর সহিত কি
আমি বন্ধুত্ব করিতে সাহস করিয়াছি ? রাজ-
কুমারীর পদবিক্ষেপে কি রুদ্রপুর ও বন-
গ্রামের পথ ঐ ঘাট পবিত্র হইয়াছে ? ভগ-
বান্ ! তুমিই জান, আমি কিছু স্থির করিতে
পারিতেছি না।” অমলা এইরূপ চিন্তায়
অভিভূত হইয়া নিদ্রা তুলিয়া গিয়াছিল।
জমীদার নগেন্দ্রনাথ শয়ন করিতে

গেলেন। স্নেহময়ী কমলা বৃদ্ধ শোকার্ত জমীদারের অনেক সেবা-সুপ্রভা করিলেন। কমলা ও সরলা, দুই জনে আজি নিজ হস্তে বৃদ্ধন করিয়া স্বজাতীয় জমীদারকে খাওয়াইয়াছেন, সবচে জমীদারের শয্যা রচনা করিয়াছেন, জমীদারের অনেক সেবা করিয়াছেন, জমীদার এই শান্ত নম্রমুখী রমণী-ঘরের বস্ত্র দেখিয়া প্রীত হইলেন, সজলনয়নে কহিলেন, “মা কমলা, তুমি আর ঐ বালিকা সরলা বৃদ্ধের জন্ত অল্প যে সেবা ও বস্ত্র করিলে, এ বৃদ্ধ এতটুকু বস্ত্র অনেক দিন পার নাই। আমি যদি অভাগা না হইতাম, তোমাদের মত স্নেহময়ী পুত্রবধূর আজি আমার সেবা করিত, তোমাদের স্ত্রায় শান্ত, সুরূপা পুত্রবধূর আমার ঘর আলো করিত। কিন্তু বিধাতা সে সুখ আমার কপালে কি লিখিয়াছেন? কার্তিকের স্ত্রায় পুত্রবধূ, লক্ষ্মীর স্ত্রায় স্নেহময়ী পুত্রবধূর আমার গৃহ কি পূর্ণ করিবে? আমি সংসারে অনেক দেখিয়াছি, এই গ্রামের স্ত্রায় শান্তিপূর্ণ স্থান সংসারে বিরল। আমি অনেক কারস্থকুল দেখিয়াছি, তোমাদের স্ত্রায় স্নেহময়ী সর্বগুণ-সম্পন্না কারস্থকুল অতি বিরল।”

অমলা ও শয়নার্থ গমন করিল। বাহিরের কুটারে কেবল মহাশ্বেতা সরলাকে লইয়া এখনও বসিয়া আছেন, লীড় শয়নকক্ষে যাইবেন মনে করিতেছেন, এমন সময়ে পরিচারিকাবেশে একজন নারী আসিয়া মহাশ্বেতার কানে কানে বলিল, “রাণী মা, একবার এদিকে আসুন।”

মহাশ্বেতা বিস্মিত হইলেন। এ গ্রামে তাঁহাকে “রাণী মা” বলিয়া কে চিনি? পরিচারিকা আবার বলিল, “রাণী-মা, আমাকে চিনিতে পারিলেন না? আমি যে আপনার পুরাতন দাসী।”

মহাশ্বেতা তখন তাহাকে চিনিলেন, সে চতুর্দেহিত দুর্গের একজন পুরাতন পরিচারিকা ছিল। বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “এ কি! তুই এত দিন পরে কোথা হইতে আসিলি? কি জন্তুই বা আসিলি? আমরা এ গ্রামে আছি, কিরূপে জানিলি?”

পরিচারিকা। আপনারা চতুর্দেহিত দুর্গ হইতে চলিয়া যাইবার পর আপনার শস্তর-কুলের লোক আপনার জন্ত কত অহুসন্ধান করিয়াছে, কচিমেয়ে সরলার জন্ত কত কাদাকাটি করিয়াছে, তাহা আর কি বলিব মা! সে সব কথা পরে বলিব। অনেক অহুসন্ধান করিয়া শেষে আপনাদের পাইলাম। সরলা-দিদির পিসীমা একবার ভাইবীর মুখখানি দেখিবার জন্ত কত দেশে ঘুরিয়াছেন, তাহা আর কি বলিব? শেষে রুদ্রপুরে যান, তথা হইতে নৌকা করিয়া এই গ্রামে আসিয়াছেন। এখানে তাঁহার আসিতে ভয় হয়; যদি রাণী-মা কন্ডাকে লইয়া একবার নৌকায় যাইয়া দেখা করেন, তাহা হইলে পিসীমা আপনাদিগকে অনেক দিন পরে দেখিয়া একবার চক্ষু জুড়ান।”

পুরাতন কথা মনে উদয় হওয়ায় মহাশ্বেতার পাষাণ-হৃদয় বিগলিত হইল। নয়ন দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল। সে অশ্রু সংবরণ করিয়া সরলাকে সঙ্গে লইয়া তিনি পরিচারিকার সঙ্গে বাটের দিকে চলিলেন।

ঘাট অতি নিকটে। বাটে আসিয়া পরিচারিকা নৌকা দেখাইয়া দিল। নৌকাখানি অতি ক্ষিপ্ৰগামী, দশ বারো জন দাঁড়ী দাঁড় ধরিয়া রহিয়াছে। নৌকায় ভিতর হইতে অনেক বৃদ্ধা রমণী তাঁহাকে আসিতে ইঙ্গিত করার মহাশ্বেতা তৎক্ষণাৎ সরলাকে লইয়া নৌকায় উঠিলেন। তদ্বহুতে নৌকা

ছাড়িয়া দিল। পরিচারিকা নৌকার না উঠিয়া
অল্প দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। নৌকার
ভিতর বৃদ্ধা নারী সরলার পিসীমা নহেন,
শকুনির একজন চরমাত্র। মহাখেতা ও
তাঁহার কস্তা অতঃসীশচন্দ্রের বন্ধী হইলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

কারাবাস।

The pale stars of the morning
Shine on a misery, dire to the borne
Dast thou faint ?

Shelly.

প্রাতঃকালে স্বর্ণবর্ণ সূর্য্যরশ্মি চতুর্দিকে
দুর্গের (আধুনিক চৌবেড়ে) শোভা বর্ধন
করিতেছে; প্রাচীর, স্তম্ভ, গবাক্ষ, কক্ষ, ছাদ,
সকলই আলোকময় করিতেছে, দুর্গপদ-
চারিণী শাস্ত্রপ্রবাহিনী যমুনার উপর অক্ষমকু
করিতেছে। নদীবক্ষে প্রকাণ্ড দুর্গের ছায়া
প্রতিফলিত রহিয়াছে, আর দুই একখান
ক্ষুদ্র তরী ভাসিতেছে। শীতল সমীরণ কেন্দ্ৰ-
স্থিত শিশিরবিন্দুতে সিক্ত হইয়া অধিকতর
শীতল হইয়া বহিতেছে ও ঘাটে যে সকল
রমণী স্নান করিতে বা জল লইতে আসি-
য়াছে, তাহাদিগের শরীর পুলকিত করি-
তেছে। কৃষ্ণকণ গরু লইয়া মাঠে বাইতেছে
ও রাহিয়া রাহিয়া আনন্দে গান করিতেছে
এবং পাঞ্চগণ তরুণ অরুণ-কিরণে পুলকিত
হইয়া সেই গানে যোগ দিতেছে। সমস্ত
জগৎ আলোকময় ও আনন্দময়।

সেই প্রকাণ্ড দুর্গের নিম্নতলে একটি
নিভৃত ঘরে একটি হীনজ্যোতিঃ প্রদীপা-
লোকে মহাখেতা ও সরলা শয়ন করিয়া

রহিয়াছেন। তাঁহার শকুনির চর বন্ধী
আনীত হইয়া এই দুর্গে বন্দী হইয়াছেন।

সরলা নিদ্রিত। মাতৃকোড়ে শিশুর জ্ঞান
মহাখেতার পার্শ্বে বালিকা নিদ্রিত রহি-
য়াছে। সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর সরলা
নিদ্রা বাইতেছে, সরলার শরীর ক্ষীণ হইয়াছে,
চক্ষু দুইটি কোটরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, মুখ-
মণ্ডলে পূর্বের জ্ঞান প্রফুল্লতা বা বালিকা-
ভাব দেখা যায় না। সরলা আর বালিকা
নহে। সহসা অসীম শোক লাগরে নিকপ্ত
হইয়া বালিকা-স্মৃতি স্মরণ হইতে জাগ-
রিত হইয়াছে।

সরলার পার্শ্বে মহাখেতা অনিদ্র হইয়া
শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার মুখে যে
ভাব লক্ষিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনাভীত, সে
ভাব ভয়ের নহে, হুঃখের নহে, কেবল চিন্তায়
নহে। নয়ন জলিতেছিল, স্মৃতি স্রষ্টার উপর
দস্ত চাপিয়া রহিয়াছে, সমস্ত মুখমণ্ডলে উন্মত্ত-
তার চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। ললাটের
শিবা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, হৃদয় পুরুষত্ব
ও চিন্তাতরঙ্গে প্রাবিত হইতেছে।

কণেক পর সরলা জাগিল, উঠিয়া
মাতার মুখমণ্ডলে চাহিয়া বলিল, “মা, সমস্ত
রাত্রি তোমার নিদ্রা হয় নাই?”

মহাখেতা কোনও উত্তর করিলেন না।
সরলা আবার বলিল, “মা, তোমার জন্ত কল্য
যে অন্ন রাখিয়া গিয়াছে, তাহা এক্ষণেও স্পর্শ
কর নাই, বৈরুপ ছিল, সেইরূপই আছে।”

মহাখেতা উত্তর করিলেন, “না বা,
আহারে কচি নাই।”

সরলা। না খাইলে শরীর কত দিন
থাকিবে?

মহাখেতা। বাছা, আর শরীর থাকার
আবশ্যক কি? ভগবান্ অহুগ্রহ করিয়া
যদি ইহার আগেই আমার মৃত্যু ঘটাইতেন,

তাহা হইলে তোমাকে এ অবস্থায় দেখিতে হইত না।

সরলা। যা, তুমি না থাকিলে আমি কাহার মুখ চাহিয়া থাকিব, জগতে আর আমার কে আছে যে, তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইবে?

মহাশ্বেতা সজলনয়নে উত্তর করিলেন, “না যা, হতভাগিনীর এখনও বাইবার সময় হয় নাই।”

এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময়ে ঘরের দ্বার খুলিল। মহাশ্বেতা ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একটি নিরুপমা সুন্দরী দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন। বলিবার আবশ্যক নাই যে, সে বিমলা।

বিমলা বাহা দেখিলেন, তাহাতে তাহার হৃদয় একেবারে দুঃখে অধীর হইল। দেখিলেন, পূর্বদিনের খাত্তরবা এখনও স্পর্শ করা হয় নাই, বৃদ্ধা মহাশ্বেতা প্রায় উন্মত্তের স্তায় হইরাছেন, তাহার পার্শ্বে বসিয়া বলিকা নীরবে রোদন করিতেছে।

বিমলা আপন চক্ষু মুছিয়া, মহাশ্বেতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “মাতঃ, আপনাদিগের কষ্ট দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, আপনারা রাহিরে আসুন।”

রমণীকণ্ঠনিঃসৃত করুণাসূচক কথা শুনিয়া মহাশ্বেতা সেই দিকে চাহিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে?” বিমলা উত্তর করিলেন, “এই দুর্গাধিপতি সতীশচন্দ্রের চুহিতা, আমার নাম বিমলা।”

ক্রোধে মহাশ্বেতা শিহরিয়া উঠিলেন; ক্রণেক পর ধীরে ধীরে বলিলেন, “তোমার পিতাকে বলিও, আমাদের আর অধিক দিন বাঁচিবার নাই, যে কয়েক দিন আছি, আমাদিগকে নিরুদ্ধে থাকিতে দাও, তোমরা আসিয়া বিরক্ত করিও না।”

অল্প সময়ে এরূপ উত্তর পাইলে মানিনী বিমলা ক্রুদ্ধ হইতেন, কিন্তু বন্দীদিগের অবস্থা দেখিয়া তাহার হৃদয়ে ক্রোধের লেশ-মাত্র উদয় হইল না। তিনি ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, “আমার পিতার উপর মিথ্যা দোষারোপ করিতেছেন, তিনি এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানেন না। আমি আপনাদিগকে বিরক্ত করিতে আসি নাই, এই জবাব দর হইতে অল্প বয়ে লইয়া যাইতে আসিয়াছি।”

মহাশ্বেতা পুনরায় বলিলেন, “বন্দীর এইরূপ ঘরেই থাক। ভাল, বাহার চরণে শিকল, তাহার সে শিকল সুবর্ণের না হইয়া লৌহের হওয়াই উপযুক্ত! যাও বাছা, হতভাগিনীদের কষ্টের উপর আর উপহাস করিও না।”

বিমলা সজল-নয়নে উত্তর করিলে “মাতঃ, আমি যে আপনাদিগকে উপভা করিতে আসি নাই, জগদীশ্বর জানেন।”

বিমলা আরও বলিতেন, কিন্তু মহাশ্বেতা তীব্রস্বরে বলিলেন, “জগদীশ্বরের নাম করিও না, তোমার পিতা যেন সে পবিত্র নাম কখনও গ্রহণ না করেন, এ বংশে সে নাম কেহ গ্রহণ করিয়া অপবিত্র না করে।”

বিমলা গম্ভীরস্বরে বলিলেন, “মাতঃ! আপনি আমাদিগকে অন্তর্য তিরস্কার করিতেছেন। আপনি যেরূপ হতভাগিনী, আমিও সেইরূপ; হতভাগিনীর জগদীশ্বরের নাম ভিন্ন আর কি আছে? স্বত্বাকাল পর্যন্ত সেই নাম স্মরণ করিব, এই দুঃখ-পরিপূর্ণ সংসারে হতভাগিনীর সেই নামই অবলম্বন, সেই নামই একমাত্র সুখ।”

সে পবিত্র কথা শুনিয়া মহাশ্বেতার ক্রোধ লীন হইল। বিমলার ঈশ্বর-ভক্তি দেখিয়া মহাশ্বেতা একদৃষ্টে তাহার দিকে দেখিতে

লাগিলেন ;—দেখিলেন,দেবকন্টার মত সেই উন্নত-প্রকৃতি স্বমণীর ন্যায়মান আছেন । নয়নে অশ্রুজল ; মুখে স্বর্গীয় প্রেম ও ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হইতেছে না।

মহাশ্বেতা ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, “বিমলা, ক্ষমা কর ; না জানিয়া তিরস্কার করিয়াছি, হৃৎখে বিবেচনাশক্তির লোপ হয়।”

বিমলা মহাশ্বেতাকে আর কথা বলিতে না ; নিকটে আসিয়া হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, “মাতঃ, ক্ষমা-প্রার্থনার কিছুই কারণ নাই ; আপনিও দুঃখিনী, আমিও অল্প দুঃখিনী নহি, আমার অবস্থা জানিলে আপনিও আমার প্রতি দয়া করিবেন।”

মহাশ্বেতা বিমলার হাত ধরিয়া রহিলেন। দুই জনে নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন, হতভাগিনী সরলাও রোদন করিতে লাগিল। কণেক পর মহাশ্বেতা বলিলেন, “বিমলা, তোমার দুঃখ আমি বুঝিতে পারিতেছি। পিতার পাপকর্ম দেখিয়া কোন্ ধর্মপরায়ণা কন্টার হৃদয় না বিদীর্ণ হয় ?”

বিমলা উত্তর করিলেন, “মাতঃ, আপনি এখনও ভ্রান্ত । আমরা যেরূপ হতভাগা, আমার পিতাও সেইরূপ হতভাগা, তাহার জীবন মরণ এখনও স্থির নাই। যে পামর আপনাকে ও আমাকে কষ্ট দিতেছে, সে পিতাকে হতভাগ্য করিয়াছে, আমি আশঙ্কা করি, সে পিতার নৃত্যসকল করিতেছে।”

মহাশ্বেতা বিস্মিত হইলেন,—ভাবিলেন, সে কি, সত্যীশচন্দ্র ভিন্ন ইহার ভিতর আর কে আছে ?

বিমলা বলিলেন, “উপরে আশুন, আমি সকল কথা আপনাকে অবগত করাইব।”

তিন জনে ধীরে ধীরে সেই জঘন্ত ঘর হইতে বহির্গত হইলেন। বিমলা সরলাকে

ভগিনীর মত স্নেহ করিয়া লইয়া বাইলেন । তাহাদিগের আহারাদি শাক হইলে বিমলা শকুনিগণ্ডাস্ত সমস্ত কথা মহাশ্বেতাকে অবগত করাইলেন ।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ।

এ স্থল নহে—পূর্বস্থতি ।

WALL of my Sires, if ye could speak,
If ye could have a tongue,
Save by the gowit's awful shriek
Or raven's uncouth song,
Fain would ask of days gone by,
And o'er each dale would heave a sigh.

F. O. Dutt.

পৃথিবীতে এক প্রকার লোক আছে যে, তাহাদিগের মুখদর্শন মাঝেই নির্দয়ের হৃদয়ে প্রেমের উদ্বেগ হয়, নিশ্চেষ্টমের হৃদয়ে প্রেমের উদ্বেগ হয়, সকলেরই হৃদয়ে স্নেহের উদ্বেগ হয়। মুখের সে ভাব কেবল সৌন্দর্য্য নহে, কেন না, সৌন্দর্য্য সকল হৃদয়কে সমস্তপে আকৃষ্ট করিতে পারে না ; কতক সৌন্দর্য্য, কতক আদ্যাত্মিকতা, কতক বালিকার লজ্জা, কতক বালিকার নির্দোষিতা। এক এক-ধানি মুখের সরলতা ও নব্রতা দেখিলে ইচ্ছা হয় যে, তাহাকে হৃদয়ে স্থান দিই, তাহার সুখসাধনের জন্য চিরকাল ত্রুটি হই। সরলা পরম স্মরণীয় নহে, অথচ তাহার মুখে এইরূপ অনির্বচনীয় ভাব ছিল, হৃদয়ও মুখের অবিকল প্রতিকৃতি। স্মৃতরাং অল্পসময়ের মধ্যে বিমলা যে তাহাকে কনিষ্ঠা ভগিনীর মত ভালবাসিবেন, আশঙ্কা নহে। আর এক প্রকার আকৃতি আছে, তাহাকে নিরুপম সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করি-

বার জন্ত প্রকৃতি আপন ভাণ্ডার শূন্য করিয়া-
ছেন। সে জ্যোতিঃপূর্ণ মুখমণ্ডল,
জ্যোতিঃপূর্ণ নয়নযুগল, হৃদয় ওষ্ঠাধর, উন্নত
ললাটে, তুলিকাচিহ্নবৎ ক্রমুগল, তরু অঙ্গ,
সুগঠিত সুদীর্ঘ অবয়ব দেখিলে হৃদয়ে
প্রেমের উদ্রেক হইবার অগ্রে ভক্তির উদয়
হয়। সে উজ্জ্বল নয়নদ্বয়ে, সে উন্নত প্রশস্ত
ললাটে হৃদয়ের উন্নতত্বাব প্রকাশ পায়,
হৃদয়ের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা বিরাজ করে। বিমলার
এইরূপ সৌন্দর্য্য ছিল, তাঁহারও হৃদয় মুখের
অবিকল প্রতিরূপিত। এইরূপ দেবীর অবয়ব
দেখিয়া সরলা বে তাঁহাকে জ্যোষ্ঠা ভগিনীর
স্বায় ভক্তি করিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে।

সরলার হৃদয় হইতে দুঃখ দূর করিবার
জন্ত বিমলা তাঁহাকে দুর্গের চারিদিক দেখা-
ইতে লাগিলেন। প্রথমে দুর্গের পশ্চাতে
উজানে লইয়া গেলেন। তথায় আত্মব্রহ্মের
নিবিড় ছায়া দিবা তুই প্রহরকেও সন্ধ্যার
স্বপ্নে মিশ্রিত করিয়াছে। দুই জনে সেই ছায়ায়
কণেক বসিলেন, দুই প্রহরের যুগ বায়ুতে
অল্প অল্প পত্রের মর্ম্মর শব্দ শুনা যাইতেছে,
মধ্যে মধ্যে ঘূঘুর অতি বৃহৎ অপরিষ্কৃত শব্দ
শুনা যাইতেছে। সে শব্দে হৃদয় মোহিত ও
শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়।

উভয়ে উজান হইতে সরোবরসমীপে
গমন করিলেন। তাহার জল অতি বিস্তীর্ণ,
চারি পার্শ্বে আপন স্থির বক্ষে আত্মচ্ছায়া
ধারণ করিয়া রহিয়াছে। দুই জনে অনেকক্ষণ
পর্য্যন্ত সেই সরোবরবাটে বসিয়া রহিলেন,
অভাবের নিস্তক শোভা দেখিয়া হৃদয় নিস্তক
হইল। বিললা মধ্যে মধ্যে কথা কহিতেছেন,
সরলার মুখে কথা নাই, নিস্তক হইয়া ধ্রুবণ
করিতেছে।

সূর্য্য অস্ত যাইবার অনেক পূর্বেই সে
ঘনচ্ছায়াবৃত আত্মবেষ্টিত সরোবরে অন্ধকার

হইতে লাগিল। বিমলার বোধ হইল, যেন
তাঁহার প্রিয়সখীর অন্তঃকরণেও কোন দুঃখ-
তিমির ঘনীভূত হইতেছে।

বিমলা অতি স্নেহসহকারে সরলাকে
আপন পার্শ্বে বসাইয়া আপন হস্তে তাহার
হস্ত ধারণ করিলেন; বলিলেন, “সরলা,
তোমার মনে কোন দুঃখ উদয় হইতেছে?
আমার নিকট লুকাইতেছ কি জন্ত?”

সরলা উত্তর করিল, “তোমার কাছে
লুকাইব কি জন্ত? সত্য, আমার মন কেমন
কেমন করিতেছে, কিন্তু বথার্থ বলিতেছি,
কি দুঃখ, তাহা জানি না।”

বিমলা! তবে কিছু চিন্তা করিতেছ?

সরলা। জানি না, চিন্তা কিছুই নাই,
এক একবার মন কেমন কেমন করিতেছে।

সরলা সম্পূর্ণ সত্যকথাই বলিতেছিল,
মন কি জন্ত চঞ্চল হইতেছিল, তাহা বুঝিতে
পারে নাই।

সন্ধ্যা হইল, বিমলা ও সরলা উজান
হইতে পুনরায় দুর্গাভাস্তরে আসিলেন।
তথায় আসিয়া বিমলা সরলাকে কক্ষ হইতে
কক্ষান্তরে লইয়া যাইতে লাগিলেন ও নানা-
রূপ অপরূপ ও বহুমূল্য সামগ্রী দেখাইতে
লাগিলেন। আপনাদিগের শরনাগারে লইয়া
যাইলেন। তথায় একটি ময়নাপাখী ছিল,
সে কথা কহিতে পারিত।

বিমলা সরলাকে দেখাইয়া দিয়া বলি-
লেন, “বল্ দেখি, এ কে?”

পাখী বলিল, “এ কে?”

বিমলা। তুই বল্ না, আমি বল্ কেন?
পাখী। বল্ কেন?

বিমলা। তবে বুঝি তুই জানিস্ না?

পাখী। তুই জানিস্ না।

বিমলা। বল্ দেখি, সরলা বাহিরের
মেয়ে, না বাড়ীর মেয়ে?

পাখী। বাড়ীর ঘরে।

বিমলা। পাবলিনি, দূর বাদী।

পাখী। দূর বাদী।

সরলা পাখীর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল,

ভাবিল,—“আমি কি এই বাড়ীর ঘরে?”

পাখীর কতদূর বিজ্ঞা, বিমলা তাহা জানিভেন, পাখীকে যে কথা বলি-
য়াইত, সে তাহার শেষ কথা উচ্চারণ করিতে পারিত।

তাহার পর বিমলা সরলাকে অল্প একটি কক্ষে লইয়া যাইলেন। কক্ষ দেখিবামাত্র সরলার বিষমতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল, হঠাৎ অস্ত্রমনস্কা হইয়া সে ভাবিতে লাগিল। বিমলা স্নেহভরে বলিলেন, “আইস, আবার চিন্তা কেন?”

সরলা উত্তর করিল, “আমার মন আরও কেমন করিতেছে, যেন স্বপ্ন দেখিতেছি; মা কোথা?”

বিমলা চাহিয়া দেখিলেন, সরলার চক্ষুতে জল, নিম্নে তাহাকে তাহার মাতার নিকট লইয়া গেলেন। সরলা জটবেগে মাতার নিকট যাইয়া অশ্রুপরিপূর্ণনয়নে মাতার বক্ষস্থলে লুকাইল।

মহাশ্বেতা অতিশয় ঔৎসুক্য ও স্নেহের সহিত সরলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি মা, কি হইয়াছে?”

সরলা উত্তর করিল, “মা, আমি জানি না, এ বাটতে কি আছে, আমি আজ সমস্ত দিন যেন জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছি। সকল জবাই যেন দেখিয়াছি বোধ হইতেছে। একটা ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র যেন এক দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। মা, আমি পাগ-
লিনী, সহসা সেই মূর্ত্তিকে পিতা বলিয়া ভাবিলাম। মা, আমি অজ্ঞান কিংবা স্বপ্ন দেখিতেছি।”

মহাশ্বেতা আর শুনিতে পারিলেন না, উঠিয়াই রোদন করিয়া উঠিলেন। অজ্ঞান বালিকার কথার অত্যন্ত তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল।

সে শোকের প্রথম বেগ সংবরণ হইলে মহা-
শ্বেতা কন্ডাকে পুনরায় আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “সরলা, এ স্বপ্ন নহে, পুরুষত্ব তোমার হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে যে কথা আমি এত দিন লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, যে কথা তুমি এত দিনে ভুলিয়া গিয়াছ, বোধ করিয়াছিলাম, সে কথা আপনা হইতেই তোমার অন্তরে উদয় হইতেছে, আর আমি তোমার নিকট কিছু লুকাইব না।”

এই বলিয়া মহাশ্বেতা আদোষাপ্ত সমস্ত কথা সরলার নিকট বলিলেন। সরলার জন্মকথা, রাজা সমরসিংহের সম্মান ও গৌরবের কথা, তাহার অজ্ঞায় মৃত্যুর কথা, আপনাদিগের পলায়ন ও ছদ্মবেশের কথা এ সমস্ত কথা বালিকার সশুধে ভাঙ্গিয়া বলিলেন। সেই সকল কথা প্রথমে সরলার স্বপ্নের ছায় বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে মোহজাল অন্তরিত হইতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে দুই একটি কথা স্মরণ হইতে লাগিল। ঘর, দালান, শুভ্র দেখিতে দেখিতে পূর্বকথা জাগরিত হইতে লাগিল।

মহাশ্বেতার লোহহৃদয়ও অত্যন্ত দ্রবীভূত হইতেছিল, মাতা-কন্ডার পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

বিমলা পার্শ্বে বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। তাহার জুগল কৃকিত, ওঠের উপর দস্ত স্থাপিত, নয়ন হইতে বিক্ষুণ্ণ দ্রবাহার হইতেছে। তাহার মনের ভার পাঠক মহাশয় অনায়াসে অনুভব করিবেন। শহনি যে কতদূর পামর, পিতাকে যে কত দূর পাপকণ্ঠে লিপ্ত করিয়াছে, কি জন্ত

মহাশেষতাকে বন্দী করিয়াছে, এ সমস্ত চিন্তা মহা-বাতার দ্বারা তাঁহার ক্ষয় আহত ও ব্যাধিত করিতেছিল ।

বিমলা সরলা চিন্তাশ্রম হইতে আগরিত হইয়া গভীর-স্বরে বলিতে লাগিলেন, “মাতঃ, পামর শকুনির পাশ আমি এত দিনে জানিলাম । এ বিশ্বসংসারে উহার মত পাতকী আর নাই, নরকেও উহার মত কীট নাই । কিন্তু উপরে ভগবান্ আছে, এ ভীষণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে ।”

এই গভীর কথা শুনিয়া মহাশেষতা বলিলেন, “বৎসে বিমলা, ভগবানের উপর আমার অচলা ভক্তি আছে, কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায়, তাঁহার লীলাখেলা আমরা বুঝিতে পারি না, না হইলে এ সংসারে পাপের জয় কি জন্ত ?”

বিমলা পূর্ববৎ স্বরে বলিলেন, “মাতঃ, আমার কথা অবধারণা করন্, পাপের জয় ক্ষণস্থায়ী মাত্র, পাপের ভীষণ প্রায়শ্চিত্তের বিলম্ব নাই । আমি এই পামরের মৃত্যুর উপার দেখিতে পাইতেছি, আপনার স্বামীর মৃত্যুর প্রতিহিংসার বিলম্ব নাই ।”

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ।

ভিখা গীর রত্ন ।

HA sorrow thy young lays shaded
As o'er the morning fleet ?
Too fast have those young days faded
That oven in sorrow were sweet ?
Dost time with his co wither
Each feeling that once was dear ?
Come, child of misfortune ! come hither,
T'all weep thee tear !

moore.

সন্ধ্যার সময় মহাশেষতা পূজার্থ যমুনাতীরে গমন করিলেন, শকুনির তাহাতে আপত্তি ছিল না । যে দুর্গে তাঁহার যৌবনাবস্থা,

তাঁহার স্মৃতির দিন গত হইয়াছিল, বখার তিনি রাজকুলচূড়ামণি সমরসিংহের রাজ-মহিষী হইয়া কালযাপন করিয়াছিলেন, আজি সেই দুর্গের পার্শ্বে হীন, নিরাশ্রয় বিধবা বন্দী হইয়া উপাসনা করিতেছেন । পূর্বে দুর্গপার্শ্বে যে তরঙ্গময়ী যমুনা কল কল শব্দে প্রবাহিত হইত, আজিও সেই নদী সেইরূপ ক্রকৃটি করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাতে কোন পরিবর্তন নাই । দূরে যে গলীস্থ বৃক্ষশ্রেণী দেখা যাইত, পার্শ্বে যে আম্রকানন দেখা যাইত, সম্মুখে যে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র দেখা যাইত, তাহাতে কিছুই পরিবর্তন হয় নাই ; কিন্তু মহাশেষতার জীবনে কি পরিবর্তন হইয়াছে । আজি সে পূর্বগৌরব কোথায়, সে দুর্গাধিপতি কোথায়, সে বীর-শ্রেষ্ঠ কোথায় ? গ্রীষ্মকালে প্রবল বাতায় বেরূপ শুষ্কপত্র দূরে নিক্ষিপ্ত হয়, সমুদ্রের তরঙ্গমালার মধ্যে বারিবিন্দু বেরূপ লীন হয়, অতীতকালরূপ অনন্ত সাগরে সেইরূপ পূর্ব-গৌরব লীন হইয়াছে ।

এ দিকে বিমলা সরলাকে আপনার ঘরে লইয়া গিয়া দুই সহোদরার দ্বারা এক শয্যায় শয়ন করিলেন । বিমলা সরলাকে দেখিয়া অবির তাহাকে ভালবাসিতেন, কিন্তু যখন জানিলেন যে, শকুনি ও পিতার পরামর্শে সরলা অনাথা হইয়াছে, তখন তাহার প্রতি স্নেহ ও মমতা দ্বিগুণ হইল । পিতা বোর পাশ করিয়াছেন, তাহার যদি পরিশোধ থাকে, মহাশেষা ও সরলার প্রতি গাঢ় বন্ধ ও স্নেহ দ্বারা বিমলা তাহার পরিশোধ করিতে লাগিলেন । দুই জনে একত্র শয়ন করিয়া অনেকক্ষণ অবধি কথোপকথন করিতে লাগিলেন । দুই জন অন্তরঙ্গ ও অবিবাহিতা, দুই জনের মধ্যে শীতল প্রগাঢ় ও পবিত্র ভালবাসার সঞ্চার হইল ।

বিমলা বার বার সরলা ও মহাশয়ের
অজ্ঞাতবাস ও কষ্টের কথা জিজ্ঞাসা করিতে
লাগিলেন, বার বার পল্লীগ্রামের কথা
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সরলার মুখ
হইতে সেই সকল গল্প শুনিতে শুনিতে বিম-
লার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল, পিতার পাণ-
কর্থে দ্বন্দ্বের মর্মান্তিক বেদনা হইতে লাগিল,
শকুনির চক্রান্তে তাহার শরীর কোণে কষ্ট-
কিত হইতে লাগিল। অতি রেহ-সহকারে
দুই বাহ দ্বারা সরলাকে আলিঙ্গন করিয়া
বিমলা বার বার সেই বালিকার মুখে সেই
দারিদ্র্যের কথা, সেই পল্লীগ্রামে নিবাসের
কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, বার বার
চক্ষুজলে সরলার নয়ন, বদনমণ্ডল ও কেশ-
রাশি সিক্ত করিলেন।

বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা
যখন কদ্রপুরে ছিলে, তখন তোমাদের বন্ধু
কে ছিল? কৃষকপত্নীরাই কি তোমাদের
বন্ধু ছিল?”

সরলা বলিল, “মা কাহারও সহিত
অধিক কথা কহিতেন না, দিবাভাগে প্রায়
চিন্তায় লিপ্ত থাকিতেন, সন্ধ্যার সময় উপা-
সনা করিতেন। আমার সহিত দুই এক
জন গ্রাম্য স্ত্রীলোকের আলাপ ছিল। অমলা
নামে এক মহাজনের স্ত্রী ছিল, তাহারই
সহিত অধিক সময় আমার কথাবার্তা
হইত।”

বিমলা। সে কি জাতি?

সরলা। জাতিতে কৈবর্ত।

বিমলা। সে তোমাকে ভালবাসিত,
তোমাকে যত্ন করিত?

সরলা। বোধ হয়, আমার মাতা ভিন্ন
আর কেহ আমাকে সেরূপ ভালবাসিতে
পারে না, তাহার কথা যনে হইলে চক্ষুতে
জল আসে।

বিমলা। সরলা, তোমাদের প্রতি
কিরূপ অত্যাচার করা হইয়াছে, তাহা আমি
বলিয়া শ্রবণ করিতে পারি না। যদি আমার
সাধ্য থাকে, আপনি ভিখারিণী হইয়াও
তোমাদের পুর্নাবস্থা বজায় রাখিব।

সরলা। আমি সত্য বলিতেছি, পল্লীগ্রামে
সেরূপ অবস্থার আমার কিছুমাত্র কষ্ট হইত
না, কিন্তু মাতা দিবারাত্রি চিন্তা করিতেন,
সেই জন্য আমার দুঃখ হইত। মাতাকে মুখে
রাখ, এই আমার ভিক্ষা।

বিমলা। সরলা, আমারও সেই ইচ্ছা,
প্রাণ দিয়াও যদি তোমার মাতাকে মুখে
রাখিতে পারি, তাহাতেও সন্মত আছি।

সরলা। কেন, তোমার অসাধ্য কি?
তোমাদের এত ধন, এত মানসম্মত!

বিমলা। সৎলা, তুমি আমার সকল কথা
জান না, যদি জানিতেন, তবে আমাকে তোমা
অপেক্ষাও হতভাগিনী বোধ করিতে। এ
ধনমান আমাদের নহে।

সরলা। কেন?

বিমলা। আমি প্রাতঃকালেই বলিয়া-
ছিলাম যে, পামর শকুনি আমার পিতার
প্রাণসংহার করিয়া এই দুর্গ ও জমীদারী
হস্তগত করিবার উদ্ভোগ করিতেছে। দিবা-
রাত্রি পিতার চিন্তায় আমার নিদ্রা হয় না।
কিন্তু কেবল সেই দুঃখ নহে।

সরলা। আর কি?

বিমলা। সরলা, তোমার নিকট কিছুই
লুকাইব না। এই পামর আমাকে বিবাহ
করিতে চাহে, তাহা হইলে পিতার মৃত্যুর
পর অনায়াসে উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে।
আমার বলিতে লজ্জা করে, এই পামর
কয়েক দিন অবধি প্রত্যাহ বিবাহের প্রস্তাব
করিতেছে। আমি অস্বীকার করাতে সে
বলপূর্বক পাণিগ্রহণ করিতে চাহে। কল্যা

প্রত্যয়ে সেই নরদাতক যমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। সরলা, আমি অপেক্ষা হতভাগিনী আর কে আছে ?

সরলা বিস্মিত হইল, ক্ষণেক পরে জিজ্ঞাসা করিল, “কাল পরিজ্ঞাপ পাইবে কিরূপে ?”

বিমলা অতি গভীরস্বরে উত্তর করিলেন, “কল্যা জগদীশ্বর আমাদের উদ্ধার করিবেন, তাঁহার কৃপায় কল্যা পরিজ্ঞাপের আশা আছে। তাহার পর নিশিযোগে পিতার নিকট পলয়ন করিব, তাহারও উপায় স্থির হইয়াছে, তাহার পর পামরের পাপের প্রায়-শ্চিত্ত হইবে, তাহারও উপায় পাইয়াছি। ভগবান! এই দুঃস্বপ্নে অবলার সহায় হও।”

সরলা নিমন্তক হইয়া রহিল। বিমলা আরও বলিতে লাগিলেন, “মুজের বাইরা পিতার পরিজ্ঞাপ করিব, পাণ্ডীর শান্তি দান করিব। তাহার পর পিতার নিকট প্রার্থনা করিয়া এই দুঃস্বপ্নে অবলার পুনরায় দান করিব। আমি পিতার অন্তঃকরণ জানি, শকুনির পরামর্শ হইতে মুক্ত হইলে তিনি জ্ঞানকর্ম করিতে অস্বীকার করিবেন না। আর মুজের এক বীরপুরুষ আছেন, তিনিও বোধ হয়, আমার সহায়তা করিবেন। ইন্দ্রনাথ! সত্য পালন করিও।”

“ইন্দ্রনাথ” নাম শুনিয়া সরলা চমকিত হইল, সহসা তাহার শরীর কাঁপিয়া উঠিল, বিমলা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, “সরলা, তুমি অমন করিয়া উঠিলে কেন? তুমি বেদনা পাইয়াছ ?”

সরলা কোন উত্তর করিতে চাহে না, মুখ গোপন করিয়া রাখে। কিন্তু অনেক জিজ্ঞাসায় বলিল, “ইন্দ্রনাথ নামক আমার পরিচিত একজন লোক তাছেন। তিনিও পশ্চিমযাত্রা করিয়াছেন।”

তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিমলার নিকট কোন কথা গোপন রহিল না। বিমলা সরলার নিকট হইতে একটি একটি করিয়া সমস্ত কথা বাহির করিয়া লইলেন। ইন্দ্রনাথ সরলার হৃদয়েশ্বর, ইন্দ্রনাথ সরলার প্রণয়ী, ইন্দ্রনাথ মহাশ্বেতা ও সরলার উদ্ধারার্থ দুই তিন মাস হইল পশ্চিমে গিয়াছেন, তবে কি সেই ইন্দ্রনাথকেই বিমলা মহেশ্বর-মন্দিরে দেখিয়াছেন? বিমলার হৃৎকম্প হইল, তিনি ধীরে ধীরে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, “সরলা, সেই বীরশ্রেষ্ঠের কোন স্থানে কোন বিশেষ চিহ্ন আছে, লক্ষ্য করিয়াছ ?”

সরলা উত্তর করিল, “তাঁহার বামহস্তে একটি নিবিড় কৃষ্ণ যৌতুঙ-চিহ্ন আছে।”

বিমলার শরীর কাঁপিয়া উঠিল, ইন্দ্রনাথের হস্তে সে চিহ্ন তিনিও দেখিয়াছেন। নীরবে বিমলা পাশ ফিরিয়া শুইলেন, তাঁহাকে নিজিতা বিবেচনা করিয়া বালিকা সরলাও ঘুমাইল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহের কথা।

“O! do not tempt,” she said
“O! do not add to my distress,
I have tasted much of bitterness.”

* * * * *
But ah, fair maid, thou plead'st in vain
His heart is proof to prayers,
A bit like darksome foods of rain
Thou sheddest thy scalding tears.

S. C. Dutt.

রাত্রি প্রভাত হইল। আজ বিমলার পক্ষে ভয়ানক দিন। কিন্তু বিমলা বিপদ হইতে পরিজ্ঞাপ পাইবার উপায় উদ্ভাবন

করিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে বিমলা শয্যা-
গৃহ হইতে অস্ত্র একটি গৃহে যাইয়া উপাসনা
করিতে লাগিলেন, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উপা-
সনা করিতে লাগিলেন, অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা
কপোলদেশ প্রাণিত করিয়া বহিতে লাগিল।

উপাসনা সাক্ষ করিয়া বিমলা বাহিরে
আসিলেন; দেখিলেন, শকুনি তথায় অপেক্ষা
করিতেছেন। দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন,
গায়ের রক্ত শুকাইয়া গেল।

শকুনি স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বিম-
লার দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।
সর্ব যেরূপ ভেককে ভক্ষণ করিবার অগ্রে
নিরীক্ষণ করে, সেইরূপ শকুনি বিমলার দিকে
অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

বিমলাও নিম্পন্দশরীরে দণ্ডায়মান হইয়া
ভূমির দিকে একদৃষ্টে চাহিতেছিলেন।
ঐহার হৃদয় ভয়ে ও ক্রোধে জর্জরীভূত
হইতেছে। অবশেষে মুহূর্ত্তের কহিলেন,
“শকুনি, আমি হতভাগিনী, আমার মত
হতভাগিনী আর নাষ্ট, আমাকে আর হুঃখ
দিও না, ক্ষমা কর।”

সে বচনে পাষণ্ড দ্রবীভূত হইত, শকু-
নির হৃদয় দ্রবীভূত হইল না। তিনি ঈষৎ
হাস্ত করিয়া বলিলেন, “এই অস্ত্র বৃষ্টি সময়
চাহিয়াছিলে?”

বিমলা। আমাকে সময় দিয়াছিলে
বলিয়া তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছি, কিন্তু
আমাকে ক্ষমা কর, আমার হৃদয়ে যে কষ্ট
হইতেছে, তাহা তুমি জান না। আমার
হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। শকুনি, আমাকে
ক্ষমা কর।

শকুনি। বিবাহের আগে সকল বালি-
কাই ঐরূপ বলে, শব্দরবাড়ী যাইবার সময়
সকলেই কাদে, কিন্তু একবার গেলে আর
শব্দর বাড়ী আসিতে চাহে না।

বিমলা। শকুনি, উপহাস করিও না,
আমি হৃদয়ে মর্মান্তিক বেদনা পাইতেছি,
উপহাস ডাল লাগে না।

শকুনি। আমি উপহাস করিতে আইসি
নাই, তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা
পালন করিতে সম্মত আছ কি না?

বিমলা। আমি কোন প্রতিজ্ঞা করি
নাই।

শকুনি। প্রতিজ্ঞা না করিয়া থাক,
আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছ কি
না?

বিমলা। জীবন থাকিতে সম্মত হইব না।

শকুনি। আর আমার দোষ নাই, এক্ষণে
বলপ্রকাশ করা ভিন্ন আর উপায় নাই।

বিমলা। আমার পিতা থাকিলে তুমি
এরূপ কথা বলিতে পারিতে না। পিতার
অবর্ত্তমানে, ব্রহ্মকর্ত্তার অবর্ত্তমানে, নিরাশ্রয়
অবলার উপর অত্যাচার ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নহে।

শকুনি। আমি বালিকার নিতটে ব্রাহ্ম-
ণের ধর্ম্ম শিখিতে আসি নাই।

বিমলা। তথাপি আমার কথা অবধারণ
কর। দেখ, আমার পিতা তোমাকে কত
অনুগ্রহ করেন, তোমাকে দরিদ্রাবস্থা হইতে
পুত্রের মত লালনপালন কার্য্যাছেন,
তোমাকে অত্যাপি পুত্রের মত বহু করেন।
ঐহার কত্তার প্রতি অত্যাচার করা তোমার
বিধেয় নহে।

শকুনি আপনার পূর্ব্বকার দরিদ্রাবস্থার
কথা শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “তোমার
পিতা সহস্র পাপ করিয়াও যে আজ পর্য্যন্ত
জীবিত রহিয়াছেন, সে আমার অন্ত্রগ্রহে।”

পিতার নিন্দাবাদে বিমলা আর ক্রোধ
সংবরণ করিতে পারিলেন না, আরক্ত-নয়নে
কহিলেন, “তুমিই আমার পিতার সর্ব্বনাশ
করিয়াছ; তুমিই আমার ঐহাকে তিরস্কার

কর? কখনে ভৃত্যের বেশে এই চূর্ণে আসিরাছিলে, এক্ষণে প্রভু হইতে চাহ? ভৃত্যের সহিত বিবাহে বিমলা কখনও সম্মত হইবে না।”

শকুনি। কাহার সম্মুখে এরূপ কথা কহিতেছ, জান? তোমার জীবন মরণ আমার চক্ষে, তাহা জান?

বিমলা। জানি—সতীশচন্দ্রের কথা সতীশচন্দ্রের ভৃত্যের সহিত কথা কহিতেছে, সে দিন যে নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণপুত্র অন্নর জন্ত পিতার নিকট আশ্রয় লইয়াছে, তাহারই সহিত আমি কথা কহিতেছি।

বিমলা স্বভাবতঃ মানিনী, পিতার নিন্দা-কথা শুনিয়া তাঁহার ক্রোধানল জলিয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার নয়নধর জলিতেছিল, আলুশাঘিত কেশ কপোল ও উন্নত বক্ষঃস্থলের উপর পড়াতে তাঁহাকে উন্নতের স্তায় দেখাইতেছিল। সে অপরূপ আকৃতি দেখিয়া নবীনও কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন ও ক্ষণেক নিমন্ত হইয়া রহিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে বিমলা ক্রোধ সংবরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “আমার মিথ্যা রাগ, শকুনি, আমি জানি, আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার অধীন আছি। তোমাকে যে ভৎসনা করিলাম, সে কেবল ক্রোধে অন্ধ হইয়া। পিতৃনিন্দা আমি সহ্য করিতে পারি না, আমার নিকট পিতার নিন্দা করিও না।”

শকুনি। আমি তোমার পিতার নিন্দা করিতে আসি নাই; তোমার পিতা আমার প্রতি যে দয়া করিয়াছেন, তাহা আমি বিশ্বস্ত হই নাই। এক্ষণে বাহার জন্ত আসিরাছি, তাহার উত্তর কি?

বিমলা। আমি জীবন থাকিতে তোমাকে বিবাহ করিতে পারিব না।

শকুনি। বিমলা, তুমি অতিশয় বুদ্ধিমতী। আমার স্বপ্নের দয়া, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি নানারূপ প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া আমার মনস্কামনা হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিতেছ; বিমলা, তাহা পারিবে না। আমি যে কর্ষে যখন দৃঢ়তর হইয়াছি, জগৎসংসারে কোন লোকই আমাকে তাহা হইতে নিরস্ত রাখিতে পারে নাই। তুমি বালিকা হইয়া যে এত দিন আমাকে এই বিবাহ হইতে নিরস্ত রাখিয়াছ, তাহাতে তোমার বুদ্ধি ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেছি; কিন্তু আর পারিবে না অতীত তোমার সহিত আমার বিবাহ হইলে, সকল আয়োজনই প্রস্তুত আছে। তুমি বাধা দিলেই বল-প্রকাশ করিব, তবে মিথ্যা আর কি জন্ত আপত্তি কর? আইস, হই জনে নীচে যাই।

এই কথা শুনিয়া বিমলা একেবারে জ্ঞানশূন্য হইলেন। তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও মুহূর্ত্তের জন্ত যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, অজ্ঞানের স্তায় ক্রন্দন করিয়া বলিলেন, “পিতা, এ বিপত্তির সময় সহায় হও।”

শকুনি। তোমার পিতা মৃত্যুর, তোমার বৃথা প্রার্থনা।

বিমলা। “তবে জগৎপিতা জগদীশ্বর আমার সহায় হও,” এই বলিয়া বিমলা হস্ত ঝোড় করিয়া উন্নতের স্তায় আকাশের দিকে চাহিতে লাগিলেন। কেশরাশিতে বদনমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল আবৃত করিয়াছে, বেশভূষা বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে, নয়নচূটি ভলে পরিপূর্ণ অথচ অপার্থিব জ্যোতিতে জলিতেছে। উন্নতের স্তায় উর্ধ্বে দৃষ্টি করিয়া বিমলা বলিলেন, “জগৎপিতা জগদীশ্বর, আমার সহায় হও!”

সে অকৃতি দেখিয়া শকুনি আবার নিমন্তভাবে দণ্ডায়মান হইলেন, একদৃষ্টে সেই অপরূপ সৌন্দর্য্যরাশির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বিমলা ধীরে ধীরে তাঁহাকে বলিলেন, “শকুনি, তুমি জগদীশ্বরকে ভয় কর, এ পৃথিবীতে এত পাণ করিয়াছ, অবশ্যই জগদীশ্বরকে ভয় কর। আমি তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার ভ্রাতাধরপ, আমি তোমার ভগ্নীধরপা, তুমি আমার পুত্রের স্বরূপ, আমি তোমার মাতার স্বরূপা, আমাকে বিবাহ করিতে চাহিও না।”

জগদীশ্বরের পবিত্র নামে কোন্ পাণীর হৃদয় কম্পিত না হয়? শকুন আর সঙ্ক করিতে পারিলেন না; বলিলেন, “হত-ভাগিনি! নিকোঁধ! দেখিব, কে তোমার সহায় হয়! এক দণ্ড সময় দিলাম। এক দণ্ডের পর এ কার্য সম্পাদিত হইবে।”

এক দণ্ড একাকী বসিয়া বিমলা চিন্তা করিতে লাগিলেন। চক্ষু হইতে অশ্রু বহিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু এ রোদনের সময় নহে, ভীকুবন্ধিমতী কয়েক দিন হইতে বে উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন, তাহাই স্থির করিলেন।

এক দণ্ড কাল পরে শকুনি পুনরায় দর্শন দিলেন। বিমলা কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ না হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “শকুনি, আমার কপালে নাহা আছে, তাহাই হইবে। তোমার পৃথিবী হইবার জন্ত বিধি যদি আমাকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহাই হইবে।”

শকুনির মুখে আর হাসি ধরে না, তিনি যন্ত্রের সহিত বিমলার হাত ধরিলেন। বিমলা তাহাতে আপত্তি করিলেন না, নরায় ধীরে ধীরে বলিলেন, “শকুনি, আমার একটি মাত্র ভিক্ষা আছে। পিতার কায় জন্ত আমি একটি ব্রত করিয়াছি, তাহা আর তিন দিনে সমাপন হইবে, এই তিন দিন অবসর দাও, এ ভিক্ষা-দানে

পরামুখ হইও না। শকুনি, এ ব্রত উদ্ভাপন না করিয়া আমি বিবাহ করিব না, বরং আত্মহতিনী হই, তুমি আমাকে পাইবে না।”

শকুনি কণেক চিন্তা করিতে লাগিলেন, অগত্যা আর তিন দিনের সময় দিলেন।

ভীকুবন্ধিমতী বিমলা পলারনের সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন। বিব্রত পরিচারিকা দ্বারা দুর্গ হইতে এক ক্রোশ দূরে নৌকা স্থির করিয়াছিলেন। এক প্রহর যাত্রির সময় মহাশেতা ও সরলাকে অনেক আশ্বাস দিয়া কয়েকজন অনুচর ও পরিচারিকা লইয়া এক ক্রোশ পদব্রজে বাইয়া নৌকার উঠিলেন। নৌকা তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ।

নির্কাসন ।

AND shall my life in one sad tenour run.
AND end sorrow as first begun.

Pope

নৌকা তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিল। উপরে নৈশ আকাশ নীল ও নিম্নজ, চারিদিকে ধাত্তক্ষেত্রে ও পল্লীগ্রাম নিব্রিত ও নিম্নজ, তাহার মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষিপ্ৰগ্রামী নৌকা ভাসিয়া বাইতেছে। নৌকার ভিতর একটিও দীপ নাই, কোনও প্রকার শব্দ নাই, নৈশ আকাশও জগতের স্তায় অন্ধকারময় ও শব্দশূন্য।

আকাশ অন্ধকারময়। যতদূর দৃষ্ট হয়, সম্মুখে ও পশ্চাতে নদীর জল ধুধু করিতেছে, রাশি রাশি মেঘ সেই নীলজলে প্রতিকলিত-

হইতেছে, অন্ন-বায়ুতে নদীর জল উচ্ছ্বসিত হইতেছে, তরঙ্গমালা ও কেনরাশির মধ্য দিয়া নৌকা কল কল শব্দে চলিতেছে। উভয় পার্শ্বে কোথাও আত্মকানন নিশাচর-শ্রেণীর দ্বার নিবিড় অন্ধকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে ও বায়ুতে গভীর শব্দ করিতেছে, কোথাও বা কতদূর গুহ্র বালুকারাশি বিস্তৃত রহিয়াছে। আকাশে দুই একটি মল্লভ্রমের মতো বাইতেছে, মেঘ ক্রমাগত উড়িতেছে, কক্ষবর্ণ মেঘের পর কক্ষবর্ণ মেঘ পশ্চিমদিকে রালী-কৃত হইতেছে। নৌকা কল কল শব্দে চলিতেছে।

বিমলা নৌকার পশ্চাভাগে বসিয়া চতুর্-কোণিত দুর্গের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে হৃদয়ে কত যে চিন্তার আবর্তন হইতে লাগিল, কে বলিবে? ছয় বৎসরকাল যে দুর্গে অতিবাহিত করিয়া-ছেন, স্নেহময়ী মাতার যে দুর্গে মৃত্যু হইয়াছে, বাল্যকাল হইতে যে দুর্গে যৌবনকাল প্রাপ্ত হইয়াছেন, আজি সেই দুর্গে পরিতাগ করিয়া অনন্ত সংসার-সাগরে ঝাঁপ দিলেন। সে সাগরের কি কুল আছে? বিমলা কি সেই কুল পাইবেন? আশ্রয়হীনা রমণী কি পিতাকে ফিরিয়া পাইবেন? মহাশ্বেতা ও সরলায় কি উদ্ধারসাধন করিতে পারিবেন? পাপাচারী শকুনির কি দণ্ডবিধান করিতে পারিবেন?

যিনি কখন অনেক দিনের জন্ত দেশ-ত্যাগী হইয়া যাত্রা করিয়াছেন, গোতে আরোহণ করিয়া মাতৃভূমির দিকে সতৃষ্ণ-নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু প্রিয় ও সুখকর আছে, সজল-নয়নে সকলের নিকট বিদায় লইয়াছেন, অন্ন বয়সে সহায়হীন, বন্ধুহীন, প্রবাসী হইয়া অনন্ত সংসার-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন

তিনিই বিমলার সে স্নাত্তির ঘোর চিন্তা ও ঘোর দুঃখ অনুভব করিতে পারেন। একা-কিনী নৌকার পশ্চাভাগে বসিয়া বিমলা সেই গভীর অন্ধকার রজনীতে চতুর্কোণিত দুর্গের দিকে দৃষ্টিতে লাগিলেন। জলের কল কল শব্দ শুনিতেছিলেন না, তরঙ্গমালার উচ্ছ্বাস ও কেনরাশির খেলা দেখিতেছিলেন না, কেবল চতুর্কোণিত দুর্গ দেখিতেছিলেন আর অনন্ত ভাবনা ভাবিতেছিলেন। সে ভাবনার শেষ নাই, আকাশ যেরূপ অনন্ত, নদীর প্রোত যেরূপ অব্যাহত, সে চিন্তা সেইরূপ অনন্ত ও অব্যাহত। ভাবিতে ভাবিতে বিমলা চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার স্বভাবতঃ বীরাস্তঃকরণ অল্প দ্রবীভূত হইতে লাগিল। যখন চাহিয়া চাহিয়া আর সে দুর্গ দেখিতে পাইলেন না, কেবল ছর্ত্তে ছর্ত্ত তিমিররাশি দেখিতে লাগিলেন, তখন হস্তদ্বয়ে মুখ আবরণ করিয়া দরবিগলিত অশ্রুধারা বিসর্জন করিলেন, তাঁহার অশ্রু-লীর মধ্য দিয়া অশ্রুজল বাহির হইয়া বাহ-দর ও বক্ষঃস্থল একেবারে সিক্ত করিল; শ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

বিমলা যে নিরাপদে মুন্সের পাছিয়া ছিলেন, তাহা পাঠক মহাশয় জানেন।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ ।

অপরূপ বাহ ।

YET thought thick the shafts as snow.
Though charging knights like whildwinds
go

Though billmen ply their ghastly blow,
Unbroken was the ring.

The stubborn spearmen still made good,
Their dark impenetrable wood,
Each stepping where his comrade stood,
The moment that he fell.

Scott.

শত্রুরা এক্ষণেও মুন্দের নিকট বসিয়া আছে, টোডরমল এক্ষণেও অসাধারণ যুদ্ধ-কৌশল প্রকাশ করিয়া দুর্গরক্ষা করিতে-ছিলেন, ইচ্ছানাথ দিন দিন খ্যাতিলাভ করিতেছিলেন। সুযোগ পাইলেই তিনি আপনাদের পক্ষত অঝারোহী লইয়া শত্রু-দিগকে আক্রমণ করিতেন, অল্পসংখ্যক শত্রু-সৈন্য কোথায় আছে, এরূপ সংবাদ পাইলেই মহারাজার অমুমতি লইয়া, তাহাণ্ডিকে আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিতেন, অধিক শত্রু আসিবার পূর্বেই দুর্গে প্রবেশ করিতেন। বার বার এইরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া শত্রুরা ব্যতিব্যস্ত হইল, দুর্গবাসিগণ নব সেনাপতির রণকৌশল, সাহস ও বীরত্ব দেখিয়া সাধুবাদ করিতে লাগিলেন, দিন দিন তাঁহার বীর-ত্বের যশ বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল।

শত্রুরা ভাগলপুর হইতে অগ্রসর হইয়া মুন্দের নিকটে একটি শিবির স্থাপন করিয়া-ছিল। এক দিন সূর্য্য অস্ত যাইবার সময় রাজা টোডরমল শত্রুদিগের শিবির দর্শনার্থ দুর্গের প্রাচীর ছাড়িয়া প্রায় অর্দ্ধকোশ দূরে গিয়াছিলেন। শত্রু শিবির সে স্থান হইতে অনেক দূরে ; সুতরাং কোন ভয়ের কারণ

ছিল না। বিশেষ মহারাজ ছদ্মবেশে গিয়া-ছিলেন ও তাঁহার সঙ্গে পঞ্চাশ জন অঝারোহী ছিল। অঝারোহিগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, রাজা একদৃষ্টে শত্রুর দিকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, সতসা দূর হইতে একটি শব্দ শ্রুত হইল। সকলেই বিস্মিত হইয়া দেখিল, দূরে ধূলিরাশি দেখা যাইতেছে। আরও দেখিল, একজন অঝারোহী বাহুবলে রাজার দিকে ধাবমান হইতেছে, দেখিলে বোধ হয় যেন, অস্ত্র ভূমিস্পর্শ করিতেছে না। সে অঝারোহী মুহূর্ত্তমধ্যে নিকটবর্ত্তী হইল, সকলেই চিনিল, সে মহারাজের একজন সৈনিক। রাজার নিকটবর্ত্তী হইয়া সে লক্ষ দিয়া ঘোটক হইতে অবতীর্ণ হইল, অস্ত্র এত বেগে দৌড়িয়া আসিয়াছিল যে, অঝারোহী অবতীর্ণ হইবামাত্র ঘোটক পড়িয়া গেল ও দুই চারিবার চীৎকার ও শূন্ত পদবিক্ষেপ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

ঘোটকের দিকে দেখিবার কাহারও অব-কাশ ছিল না। সৈনিক প্রণাম করিয়া ভীত-চিত্তে বলিল, “মহারাজ ! আমাদের শিবিরস্থ কোন বিদ্রোহানুষ্ঠান সেনার নিকট হইতে শত্রুরা সংবাদ পাইয়াছিল যে, অস্ত্র মহারাজ সন্ধ্যার সময় দুর্গপ্রাচীরে বহির্গত হইবেন। এই সংবাদ পাইয়া অর্দ্ধ কোশ দূরে দুই সহস্র অঝারোহী অপেক্ষা করিয়া ছিল, সেই দুই সহস্র অঝারোহী এক্ষণে আসিতেছে।” সৈনিক এইমাত্র বলিয়া প্রান্তবশতঃ ভূমিতে পড়িল।

রাজার অত্যাচারের আশঙ্কায় জ্ঞানশূন্য হইল। রাজা আত্মা দিলেন, “তোমর ও অঝারোহী দুর্গের দিকে ধাবমান হও শত্রুরা আসিবার অনেক পূর্বেই আমরা দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিব।” সকলেই বেগে দুর্গাভিমুখে অঞ্চালনা করিল।

ঔদ্যাপরমহাৎ ইন্দ্রনাথ দূরে দৃষ্টি দেখি-
রাই আপন রণভেদী বাজাইয়াছিলেন,
তাহার পক্ষত আরোহীও সেই আত্মকান-
নের এক অংশে কোন কারণবশতঃ স্থাপিত
ছিল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার আসিয়া মিলিত
হইল। তখন ইন্দ্রনাথ রাজাকে বলিলেন,
“মহারাজ! যদি আজা পাই, আমার পক্ষ-
শত অঝোরোহী লইয়া শত্রুদিগকে কণেক
বাধা দিতে পারি। ততক্ষণে আপনারা
অক্ষরে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি-
বেন।”

রাজা গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন,
“বালক! যুদ্ধের সময় উপস্থিত হইলে
টোডরমল্ল কখনও পলায়নতৎপর হয় না।
বৃথা প্রাণ নষ্ট করা যুদ্ধ নহে, নরহত্যা মাত্র।”

সকলে দুর্গের নিকট উপস্থিত হইল।
দুর্গের সম্মুখে পরিখা : সকলে বিস্মিত ও
ভীত হইয়া দেখিল, পরিখার উপরিস্থিত
সেতু ভগ্ন হইয়াছে। যে নরাদম শত্রুদিগকে
গোপনে সংবাদ দিয়াছিল, সেই সেতু
ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল; সুতরাং অঝোরোহী-
দিগের দুর্গে প্রবেশ করিবার উপায় নাই।

সকলেই সন্তরণ করিয়া পরিখা পার
হইবার প্রস্তাব করিল। রাজা শত্রুর দিকে
অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া বলিলেন, “পার
হইতে না হইতে শত্রুরা আসিয়া পড়িলে,
তখন কাপুরুষের জ্ঞান শত্রু কর্তৃক সকলে
আহত হইয়া জলমগ্ন হইবে। বীরপুরুষের
কার্য্য কর, শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ দাও, এই
কণ্ঠেই কাঠের নুতন সেতু নির্মিত হউক,
যতক্ষণ নির্মিত না হয়, শত্রুর সহিত যুদ্ধ
করিব। ইন্দ্রনাথ, শত্রুদিগকে যুদ্ধ দান কর।”

“ভূত্যা সাধামত কার্য্য করিবে” বলিয়া
ইন্দ্রনাথ ব্যাহ্নিনিষ্ঠায়ে তৎপর হইলেন। ব্যাহ্ন
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ও পক্ষ শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রতি

শ্রেণীতে একশত অঝোরোহী। প্রথম শ্রেণীর
পশ্চাতে দ্বিতীয় শ্রেণী দণ্ডায়মান রহিয়াছে,
তাহার পশ্চাতে তৃতীয় শ্রেণী ইত্যাদি।
সুতরাং যুদ্ধের সময় প্রথম শ্রেণী পরিশ্রান্ত
হইলে দ্বিতীয় শ্রেণী অগ্রসর হইতে পারিবে,
তাহার পর আবার তৃতীয় শ্রেণী সম্মুখীন
হইবে, এইরূপে ক্রমাগত প্রত্যেক শ্রেণীই এক
একবার করিয়া বিশ্রাম করিতে পারিবে।
সম্মুখে শত্রুর আক্রমণ রুদ্ধ হইবে, পশ্চাতে
পরিখার জল, সে দিক হইতে আক্রমণের
সম্ভাবনা নাই। সেই পরিখার নিকট কয়েক-
জন ছই চারিটি বৃক্ষ কর্তন করিয়া সেতু
বন্ধন করিতেছিল। মুহূর্ত্তমধ্যে শত্রু আসিয়া
পড়িল, ইন্দ্রনাথের হৃদয় উৎসাহে পরিপূর্ণ
হইল।

আজ প্রায় তিন চারি মাস পর্য্যন্ত যুদ্ধের
নগর বেষ্টিত ছিল, কিন্তু অস্ত্রযে রূপ ছই
পক্ষই ভীষণ সাহস প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ
করিতে লাগিল, এরূপ কখনও দেখা যায়
নাই। ব্যাহ্নেদ করিতে পারিলেই রাজা
টোডরমল্ল বন্দী হইবেন, এই জ্ঞানে শত্রুরা
সাগর-তরঙ্গের জ্ঞান বার বার ভীষণ আক্রমণ
করিতে লাগিল, কিন্তু সে ব্যাহ্ন ভাঙ্গিবার
নহে, পরীক্ষাশিক্ষার জ্ঞান বার বার শত্রু-
দলের তরঙ্গমালা দূরে নিক্ষেপ করিতে
লাগিল। শত্রুরা অধিকসংখ্যক বলিয়া
তাহাদিগের বড় সুবিধা হইল না, কেন না,
ইন্দ্রনাথ যেরূপ কৌশলে ব্যাহ্ন নির্মাণ করিয়া-
ছিলেন, তাহাতে একেবারে এক শত জনের
অধিক শত্রু আসিয়া সে ব্যাহ্ন আক্রমণ করিতে
পারিল না, বরং সেই অল্প স্থানের মধ্যে
ছই সহস্র সৈন্তের চলাচলের ব্যাঘাত হইতে
লাগিল। তথাপি শত্রুরা অস্ত্র বার বার
সিংহপর্জন করিয়া সিংহদ্রিক্রম প্রকাশ
করিতেছিল, বীরমদে উত্তম হইয়া বার বার

শব্দ করিয়া সেই ব্যক্তির চোখা করিতে লাগিল। ইন্দ্রনাথের সৈন্তেরাও সাহসে বীন ছিল না। অল্প স্বয়ং রাজা চৌডরমন্ডের দ্বারা চালিত হইয়া, তাহারদিগের উৎসাহ ও উল্লাসের সীমা ছিল না। ইন্দ্রনাথ ভীষ্মের মত ব্যূহের এ পার্শ্ব হইতে ওপার্শ্বে, এদিক হইতে ওদিকে অগ্রচালনা করিতে লাগিলেন। যেখানে যেখানে শত্রুর অতিশয় পরাক্রম প্রকাশ করিতেছিল, সেই সেই স্থানে সম্মুখীন হইতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, “আজি মহারাজ স্বয়ং তোমাদের যুদ্ধ দেখিতেছেন, আজি মহারাজের রক্ষার ভার তোমাদের হস্তে, আজি দিল্লীস্থরের নাম ও গৌরব তোমরা রক্ষা করিবে।” এইরূপ উৎসাহবচন শ্রবণ করিয়া তাহার সৈন্তগণ উল্লাসে পরিপূর্ণ হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল, ভৈরব গর্জনে আকাশ বিভিন্ন হইল, শত্রুর হৃদয় কম্পিত হইল।

তথাপি দুই সহস্র সৈন্তের সহিত পঞ্চ-শত সৈন্তের যুদ্ধ সম্ভবে না, ইন্দ্রনাথের সেনাগণ একে একে নিহত হইতে লাগিল, শত্রুদিগের অনেক সৈন্ত হত ও আহত হইল, কিন্তু দুই সহস্রের মধ্যে এক শত কি দুই শত যুদ্ধে অক্ষম হইলে ক্ষতি নাই। দেখিয়া রাজা চিন্তিত হইলেন, একবার ইন্দ্রনাথকে অন্তরালে ডাকিয়া বলিলেন, “ইন্দ্রনাথ! তুমি আপনার সৈন্তদিগকে যেরূপ রণ-শিক্ষা দিয়াছ, তাহাতে আমি চমৎকৃত হইলাম, কিন্তু সেনাগণ যেরূপ হত ও আহত হইতেছে, ভয় হয়, তাহারা রণে ভক্ত দিবে।”

ইন্দ্রনাথের মুখ রক্তবর্ণ হইল, তিনি বলিলেন, “মহারাজ, আমার সৈন্তদিগকে সম্মুখ-যুদ্ধ করিতেই শিখাইয়াছি, রণে ভক্ত দিতে কখনও শিখাই নাই। যতক্ষণ এক-

জন অথারোহী থাকিবে, ততক্ষণ সম্মুখ-যুদ্ধ হইবে।

সন্ধার ছায়ার যুদ্ধক্ষেত্র ক্রমে ক্রমে আবৃত হইতে লাগিল, কিন্তু সে চমৎকার ব্যূহ ভঙ্গ হইল না। একজন অথারোহী হত হয়, তাহার স্থানে অপর একজন অথারোহী আসিয়া দণ্ডায়মান হয়, সে হত হয়, আর একজন আসিয়া তথায় দণ্ডায়মান। শ্রেণী বত ক্রীণ হইতে লাগিল, সৈন্তগণের উৎসাহ ও উল্লাস যেন ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছিলেন, পলায়ন কাহাকে বলে, তাহার সৈন্তেরা শিখে নাই। শত্রুগণ হতাশ হইয়া একবার বেগে শেষ আক্রমণ করিল, ভীষ্ম গর্জনে করিয়া একবার শেষ আক্রমণ করিল। দুই সহস্র অথারোহীর সে ভীষণ গর্জনে এক ক্রোশ পর্যন্ত ক্ষত হইল, দুই সহস্র অশ্বের হৃৎপৎ পদবিক্ষেপে মেদিনী কম্পিত হইল, কিন্তু সে শব্দে ও সে পদবিক্ষেপে ইন্দ্রনাথের ব্যূহ কম্পিত হইল না। যুদ্ধ সাক্ষ হইল, সে অপরূপ ব্যূহ ভঙ্গ হইল না।

অবশেষে সেতু নিশ্চিত হইল। রাজা পরিতাপ পায় হইলেন, রাজা নিরাপদে পায় হইয়াছেন শুনিয়া ইন্দ্রনাথের সৈন্তগণ একেবারে সিংহগর্জনে করিল, সে গর্জনে শত্রুশিবিরে প্রবেশ করিল, তাহারা জানিল, যে ক্ষত দুই সহস্র সৈন্ত প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা বৃথা হইয়াছে।

আক্রমণকারিগণ ভয়েচ্ছন্ন হইয়া নীরবে নিজ শিবিরায়ুধে প্রস্থান করিল। যতক্ষণ রাজা চৌডরমন্ড সেতু পার হইতেছিলেন, ইন্দ্রনাথ একদৃষ্টে তাঁহার দিকে দেখিতেছিলেন। যখন দেখিলেন, রাজা নিরাপদে দুর্গে প্রবেশ করিয়াছেন, আপন অশ্ব হইতে অবতরণ করিবার চেষ্টা করিলেন,

কিন্তু সহসা পড়িয়া গেলেন, আর উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার সৈন্তেরা তাঁহাকে উঠাইতে আনিয়া দেখিল, শত্রুর বর্শাতে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভিন্ন হইয়াছিল, শোণিতে তাঁহার শরীর প্রাণিত হইয়াছিল, বশন্ততা-বশতঃ মুচ্ছিত হইয়া তিনি ভূমিতে পতিত হইয়াছেন।

ইন্দ্রনাথের সৈন্তেরা অনেকেই সেতু পার হইয়াছিল। শত্রুগণ বাইবার সময় দেখিল, ইন্দ্রনাথ আহত হইয়াছেন। উল্লাসে চীৎকার করিয়া ইন্দ্রনাথকে ভূমি হইতে তুলিয়া লইয়া শিবিরান্তিমুখে চলিল। ইন্দ্রনাথ বন্দী হইলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্দী।

The soldier's hope, the patriots's zeal,
For ever dimmed for ever crossed,
Oh ! who shall say what heroes, feel,
When all but life and honor's lost,
The last sad hour of freedom's dream,
And valor's task moved slowly by,
Whil mute they wached till

morning's beam,
Should rise and give them light to die,
There's yet a world where souls are free,
Where tyrants taint not nature's bliss
If death that world bright opening be,
Oh ! who would live a slave in this ?

moore.

শত্রুরা ইন্দ্রনাথকে অচেতন অবস্থায় বন্দী করিয়া শিবিরে লইয়া চলিল। অনেকক্ষণ পর পুনরায় ইন্দ্রনাথের চেতনা-সংকার হইল।

ইন্দ্রনাথ দেখিলেন, তাঁহার চারিদিকে শত্রুসমূহ আসীন রহিয়াছে। সম্মুখে এক উচ্চ

সিংহাসনে মান্ধুমা উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার দুই পার্শ্বে মহামন্ত্র ওমরাহ অমাত্যগণ বসিয়া রহিয়াছেন। ইন্দ্রনাথ তাঁহাদিগের মধ্যে টোডরমল্লের বিদ্রোহী সেনাপতি তর্কান ও হমান্থকে দেখিতে পাইলেন। ইন্দ্রনাথের পশ্চাতে জন্মান কুটার-হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্রভুর দিকে নিমেষশূন্যলোচনে চাহিয়া রহিয়াছে, আজ্ঞা বা ইঙ্গিত পাইলেই বন্দীর শিরশ্ছেদ করিবে। ইন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎস্বস্তিও ভীত হইলেন না, তীব্রদৃষ্টিতে মান্ধুমীর প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

মান্ধুমীও ইন্দ্রনাথকে সচেতন দেখিয়া গভীরস্বরে বলিলেন, “হিন্দু! তুমি বীরপুরুষ, কিন্তু বিদ্রোহাচরণ করিয়াছ, বিদ্রোহাচরণের দণ্ড শিরশ্ছেদন।”

ইন্দ্রনাথ ভীষণস্বরে উত্তর করিলেন, “যোদ্ধা মৃত্যুর আশঙ্কা করে না, বাহা ইচ্ছা হয় করুন, আমি বিদ্রোহাচরণ করি নাই।”

মান্ধুমী ইন্দ্রনাথের উগ্রভাবে কিছুমাত্র কুপিত না হইয়া বলিলেন, “টোডরমল্লের সহিত যোগ দিয়া বঙ্গদেশের জারগীরদারদিগের সহিত যুদ্ধ করা বিদ্রোহাচরণ নহে?”

ইন্দ্রনাথ পুনরায় সগর্বে উত্তর করিলেন, “বঙ্গদেশের অধীশ্বর, সমস্ত ভাতরবর্ষের অধীশ্বর ঝাকবর শাহের জন্ত আমি বিদ্রোহী জারগীরদারদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছি।”

সকলেই ভাবিলেন. ইন্দ্রনাথ আপনি আপনার মৃত্যু ঘটাইতেছেন, সকলেই ভাবিলেন, মান্ধুমী সেইক্ষণেই ইন্দ্রনাথের শিরশ্ছেদনের আদেশ দিবেন। কিন্তু বহান্ধব মান্ধুমী অসহায় হিন্দুর এইরূপ নির্ভীকতা দর্শনে কুপিত হইলেন না, বরং আশ্চর্য্যমিত হইলেন, ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন, “বীর! তোমার উগ্রতা ক্ষমা করিলাম,

তোমার বীরত্ব দেখিয়া আনন্দিত হইলাম ; কিন্তু তুমি বঙ্গদেশের জাগরিতারদিগকে আর কখন বিদ্রোহী বলিও না । আমরা মোগল-সম্রাট, আমরা বন্ধবিক্ষেপ, আমরা-দের বাহুবলে এ দেশ জয় হইয়াছে, আমরা এ দেশের প্রকৃত রাজা ।”

ইন্দ্রনাথ পূর্ববৎ সগর্বে উত্তর করিলেন, “আপনারা বঙ্গদেশ জয় করিয়াছেন, আমি অস্বীকার করি না । কিন্তু সম্রাট, আকবরের প্রতাপে আপনারা সে জয়লাভ করিয়াছেন, সেই সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বিদ্রোহ-চরণ করিতেছেন । বিধির নির্বন্ধের বিরুদ্ধা-চরণ করিয়া কেন শোণিতশ্রোতে স্তম্ভর বঙ্গদেশ প্রাপিত করিতেছেন ?”

মাসুমী । হিন্দু ! তোমরা বিধির নির্বন্ধের উপর প্রত্যস্ত করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাক, সাহসী মোগলেরা জীবন থাকিতে নিশ্চেষ্ট হইবে না, অধীনতা স্বীকার করিবে না ।

ইন্দ্রনাথ । পাঠানগণও এই কথা বলিয়াছিল, এক্ষণে পাঠানরাজ্য কোথায় ? দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে আপনারাও বৃথা যুদ্ধ করিতেছেন, বৃথা রক্তশ্রোতে বঙ্গদেশ প্রাপিত করিতেছেন ।

মাসুমী । হিন্দু ! তোমার জীবন মৃত্যু আমার হস্তে, তোমার কি জীবনের অভিলাষ নাই যে, আমার সম্মুখে এইরূপ কথা কহিতেছ ?

ইন্দ্রনাথ । আমার জীবনের অভিলাষ অনেক আছে, কিন্তু যখন আপনাদিগের হস্তে পড়িয়াছি, তখন আর জীবনের আশা রাখি না ।

মাসুমী । কেন ?

ইন্দ্রনাথ । সাহসী পুরুষ শত্রুকে ক্রমা করিতে পারেন, তাহার জয় নিশ্চয় জানেন, তাহার শত্রুকে ক্রমা করিতে পারেন ; কিন্তু

তাহারা নিজের জয় সংশয় করেন, তাহার শত্রুকে কখনও ক্রমা করিতে পারেন না ।

অনেকক্ষণ কথা কহিতে কহিতে ইন্দ্রনাথের হীনবল শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হইতেছিল, তাহাতে বন্ধুহুল হইতে পুনরায় শোণিত নির্গত হইতে লাগিল ।

মাসুমী ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিলেন, “পামর ! কৌশল বাক্যের দ্বারা ক্রমা পাইবার প্রত্যাশা করিও না ।”

ইন্দ্রনাথ পুনরায় সগর্বে উত্তর করিলেন, “আমি কোন প্রত্যাশা করি না, কেবল এই প্রত্যাশা করি যে, তজ্জন আপন কার্য্য শীঘ্রই নিশ্চয় করিবে ।”

কিন্তু তজ্জনকে সে ভীষণ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইল না । ইন্দ্রনাথের মৃত হইতে রক্তশ্রোত ক্রমশঃই বন্ধি পাইতে লাগিল । স্বাস্থ্য শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল । ইন্দ্রনাথ পুনরায় চেতনাশূন্য হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন ।

মাসুমীর হৃদয় স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর নহে । আহত, বলহীন, চৈতন্যহীন বোদ্ধার শির-ছেদনের আজ্ঞা দিলেন না, বলিলেন, “অধুনা কারাগারে লইয়া যাও ।”

ইন্দ্রনাথ কারাগারে প্রেরিত হইলেন ।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ ।

রমণীর বীরত্ব ।

THE midnight passed, and to the masey door
A light step came—it paused—it moved
once more.
Slow turns the grating bolt and sullen key
‘Tis his heart foreboded—that fair she !
byron,

একটি ক্ষুদ্র অন্ধকারময় কারাগারে একজন বীরপুরুষ তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়া-

ছেন ; কাগাগারের একটি ক্ষুদ্র বাতায়ন দিয়া প্রাতঃকালের তরুণ রোদ্দ্র আসিতেছে, অন্ধকাররাশি মধ্যে সেই রোদ্দ্রের রেখা স্পষ্ট দেখা বাইতেছে । অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গ সেই রোদ্দ্ররেখায় খেলা করিতেছে, উঠিতেছে, নামিতেছে, একবার রোদ্দ্ররেখায় দেখা বাইতেছে, আবার অন্ধকাররাশিতে লীন হইতেছে । দুই একটি ক্ষুদ্র পক্ষী সেই বাতায়নে আসিয়া বসিতেছে, আবার ক্ষণেক পর উড়িয়া বাইতেছে, তাহার বন্দী নহে, পক্ষবিস্তার করিয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষশাখায় বিচরণ করিতেছে, জগৎসংসারে ও আকাশ-মণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছে । বীরপুরুষ সেই জুগ্মশব্দায় শরন করিয়া সেই বাতায়নের দিকে একদৃষ্টিতে দেখিতেছেন, অন্ধকারস্থিত লতাপল্লব বেরুপ বাহুবিস্তার করিয়া আলোকের দিকে যায়, বন্দীর নয়ন সেইরূপ বাতায়নের দিকে রহিয়াছে । বন্দী কি চিন্তা করিতেছেন ? রোদ্দ্ররেখায় পতঙ্গসমূহের খেলা দেখিতেছেন ? বাতায়নাগত পক্ষিগণ বধন পুনরায় পক্ষবিস্তার করিয়া উড়িয়া বাইতেছে, বন্দী ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে মানস-পক্ষ বিস্তার করিয়া স্থলজ জগৎসংসার ও অনন্ত নীল আকাশে পর্যটন করিতেছে ।

ইন্দ্রনাথ এ সকল চিন্তা করিতেছেন না । তাঁহার ক্রমে অল্প চিন্তার উদ্রেক হইতেছে । ইন্দ্রনাথ বোকা, বোকার মত্বাতে ভয় নাই । কিন্তু তিনি মরিলে অন্তের কি রেশ হইবে, সেই চিন্তার তিনি অস্থির হইয়াছিলেন । তাঁহার পিতা পুণ্যাস্ত্রা নগেন্দ্রনাথ এই বার্কিণ্ডে একমাত্র পুত্রের মৃত্যুবাস্তা শ্রবণ করিলে জীবনত্যাগ করিবেন । নগেন্দ্রনাথের আর কেহই নাই, ভাৰ্য্যা নাই, কস্তা নাই, অল্প পুত্র নাই, বন্ধ একমাত্র পুত্রের উপর চাহিয়া জীবনধারণ করিতেছিলেন,

সেই পুত্রের নিধনবাস্তা শ্রবণ করিলে বৃদ্ধ প্রাণত্যাগ করিবেন । নগেন্দ্রনাথের গৃহ শূন্য হইবে ।

আর সেই অজ্ঞান বালিকা, সেই প্রেম-বিহ্বলা সরলা, সেই সহায়হীনা, সম্পত্তিহীনা কুটীরবাসিনী সরলা, তাহারই বা কি দশা বটিবে ? ইন্দ্রনাথ সপ্তম পূর্ণিমার মধ্যে বাইবার প্রীতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সে সপ্তম পূর্ণিমা অতীত হইবে, বালিকা আশানুজ্ঞে চাহিয়া চাহিয়া অবশেষে নয়ন মূদিত করিবে, জীবন অভাবে অপরিষ্কৃত পুষ্পের স্তায় নীরবে অসময়ে শুকাইবে । চিন্তা করিতে করিতে ইন্দ্রনাথের মস্তক ঘূর্ণিতে লাগিল, নয়ন দৃষ্টিশূন্য হইল, বলিলেন, “ভগবন্ ! তোমার বাহা ইচ্ছা কর, বিধির নিয়মে বাহা আছে হউক, আমি আর এ চিন্তা-বাতনা সহ করিতে পারি না ।”

শত্রুদিগের মধ্যে ইন্দ্রনাথকে পীড়ার সময় যত্ন করে, এরূপ কেহই ছিল না । কারাগারের পার্শ্বে প্রহরীগণ নিঃশব্দে খড়্গহস্তে দিবারাত্রি দণ্ডায়মান থাকিত । সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় একজন ব্রাহ্মণ নিঃশব্দে আহারীয় দ্রব্য আনয়ন করিয়া দিত, আহার সাজ হইলে একমাত্র দাসী নিঃশব্দে সেই স্থান পরিষ্কার করিয়া বাইত । ইহা ভিন্ন আর কেহই সেই গৃহে প্রবেশ করিতে পারিত না । শত্রুশিবিরের মধ্যে ইন্দ্রনাথের কেবল একমাত্র বন্ধু ছিল । বে দাসী প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় সেই কারাগৃহ পরিষ্কার করিতে আসিত, সেই ইন্দ্রনাথের দুঃখে বর্ষার্থ দুঃখিনী । প্রত্যহ নীরবে আসিয়া নীরবে প্রস্থান করিত বটে, কিন্তু সেই বীরের দুঃখ দেখিয়া সে অন্তরালে অশ্রুবিন্দু বর্ষণ করিত । নির্দয় শত্রুগণ বন্দীকে অতিশয় কষ্টে রাখিত, শরনের অল্প ভূমিতে কেবল-

মাত্র তৃণশয্যা রচনা করিত। দাসী ইন্দ্রনাথের অস্ত্র আপন বস্ত্র দ্বারা সেই তৃণশয্যা যুগ্মিত করিয়া বাইত। শত্রুরা ইন্দ্রনাথকে দিনের মধ্যে কেবল একবারমাত্র অপকৃত্ত আহার দিত, দাসী আপনি অনাহারে থাকিয়া ইন্দ্রনাথকে নানাপ্রকার সুপথ্য আনিয়া দিত। শত্রুগণ ইন্দ্রনাথের চিকিৎসা করাইত না, দাসী তাঁহার ক্ষতগুলি জলে ধোত করিয়া পুনরায় পরিকার বস্ত্রে বঁধিয়া দিত এবং ঔষধ আনিয়া দিত। সেই করুণা-জলসেচনে ইন্দ্রনাথের ক্ষত আরাম হইতে লাগিল, তিনি দিন দিন আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রনাথ প্রায় আপন চিন্তায় ব্যস্ত থাকিতেন, তথাপি সময়ে সময়ে দাসীর যত্ন ও মমতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। কারাগৃহের অন্ধকারে দাসীকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন না, কোন কথা কহিতে চাহিলে দাসী ধীরে ধীরে প্রহরীর দিকে অঙ্গুলী-নির্দেশ করিত। ইন্দ্রনাথ আবার নিশ্চয় হইয়া আপন চিন্তায় অভিভূত হইতেন।

প্রহরিগণ দাসীর এই স্বাভাবিক মমতা দেখিয়া কখন কখন উপহাস করিয়া বলিত, “এ বিবি, এ হিন্দু কি তোমাকে সাঙ্গী করিবে?” এরূপ উপহাসে দাসী বিরক্ত হইত না, কখন কখন অতি নম্রভাবে উত্তর দিত, কখন কখন প্রহরীদিগকে সুরাপান করিতে দিত, সুতরাং সকল প্রহরীই দাসীর উপর অতিশয় সন্তুষ্ট ছিল। সমস্ত রাত্রি দণ্ডায়মান হইয়া চোঁকি দিবার সময় সেই নব-প্রসুতিত পদ্মের স্তায় সুন্দরী দাসীর কথা ভাবিত, নিদ্রার সময়ে সাকী ও সুরাপেয়ালার স্বপ্ন দেখিত।

অন্ত রজনীতে দাসী রুক্মকম্বরকে সুরাপান করিতে দিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। রজনী প্রায় এক প্রহর হইয়াছিল, দাসী

সুরা লইয়া উপস্থিত হইল। দেখিয়া প্রহরী-ঘরের মন আক্লান্দে পরিপূর্ণ হইল। ক্রমে সুরা মস্তকে উঠিতে লাগিল, রজনী শিপ্রহরের মধ্যে প্রহরীঘর অজ্ঞান অবস্থায় শয়ন করিল। সুরাপেয়ালী ও সাকীর স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। দাসী কারাগারে প্রবেশ করিল।

ঘরের ভিতর তৃণশয্যার বীর-পুরুষ নিদ্রিত রহিয়াছেন। ইন্দ্রনাথের ললাট পরিকার, ওষ্ঠে হাসির ফি। এ দৃঃখসাগরে তিনি কি সুখস্বপ্ন দেখিতেছেন?—দেখিতে-ছেন, যেন আজি পূর্ণিমা, যেন অস্ত্র তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পুনরায় রক্তপূরে গিয়া-ছেন, যেন বহুদিন পরে হৃদয়ের সরলাকে পাইয়া হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন, যেন সরলার আনন্দাশ্রুতে তাঁহার বক্ষঃস্থল সিক্ত হইতছে! সহসা ইন্দ্রনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল; চমকিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার তৃণশয্যার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া একটি নারী যথার্থই রোদন করিতেছে, কারাগৃহের সেই দাসী নীরবে দরবিগলিত অশ্রুধারা বিসর্জন করিতেছে!

ইন্দ্রনাথ শিহরিয়া উঠিলেন। দাসীর দয়া ও মমতা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল। আপনি অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না—বলিলেন, “হতভাগার দুঃখে তুমি কি অস্ত্র দুঃখিনী? আমার আর জীবনের আশা নাই, পরমেশ্বর তোমাকে সুখী করুন।”

দাসী উত্তর করিল না, নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিল। ইন্দ্রনাথকে আবার বলিলেন, “এ অসময়ে তুমি আমার প্রতি যে যে মমতা প্রকাশ করিলে, জগদীশ্বর তজ্জন্য তোমাকে সুখে রাখিবেন। আমি তোমাকে কিছু দিয়া পুরস্কার করি, এরূপ আমার কিছুই নাই। আমি বন্দী। এই স্ববর্ণের অঙ্গুরীটি

গ্রহণ কর, আমার বিশৃঙ্খল পীড়ার সময় বেকার তত্ত্বাবধি করিলে, দুবলমানদিগের হস্তে আমার মৃত্যু হইলে পর এই অঙ্গুরীয়টি দেখিয়া এক একবার আমার কথা স্মরণ করিও।”

দাসী অনেকক্ষণ কোন উত্তর করিল না, অনেকক্ষণ অধোবদনে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল, অবশেষে নীরবে হৃৎ-প্রসারণ করিয়া সেই অঙ্গুরীয়টি গ্রহণ করিল, নীরবে সেটি আপনার গলার কণ্ঠমালায় বাঁধিয়া রাখিল; কতক্ষণ পরে চক্ষুর জল মোচন করিয়া অর্ধক্ষুণ্ণবরে বলিল, “সৈনিকবর! আপনি আমার প্রতি ভুট্ট হইয়াছেন, আমার প্রতি সদয় হইয়াছেন, তাহারই চিরস্বরূপ এই অঙ্গুরীয়টি গ্রহণ করিলাম, তাহারই স্মরণার্থ এটি আজীবন ধারণ করিব। সেনাপতি ইন্দ্রনাথ বোধ হয় দাসীকে বিস্মৃত হইয়াছেন।”

সে কোকিল-বিনিমিত্ত স্বরে ইন্দ্রনাথ চমকিত হইলেম, শয্যায় একেবারে উঠিয়া বসিলেন। বনগ্রামের মহেশ্বরমন্দিরে সে স্বর একবার শুনিয়াছিলেন, গঙ্গাবক্ষের উপর নৌকামধ্যে সে স্বর আর একবার শুনিয়াছিলেন। পক্ষীর জলমগ্ন হইবার সময় যে নারী ইন্দ্রনাথকে একবার উদ্ধার করিয়াছিলেন, অস্ত্র সেই নারী—সেই বিমলা দাসীবেশ ধারণ করিয়া শত্রুশিবির হইতে ইন্দ্রনাথকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন।

চিন্তা ভরজমালায় স্তায় ইন্দ্রনাথের হৃদয়ে উথলিত হইতে লাগিল, তাহার হৃদয় ক্ষীণ হইল, নয়ন দুইটি জলে পূর্ণ হইল। শেষে বিমলার হস্তদুইটি ধরিয়া কল্পণস্থরে বলিলেন, “মানবী কি দেবী! আপনি কে, আমি জানি না, কিন্তু বিপদকালে আপনি আমার চিরসহায়! এই বিপদপূর্ণ শত্রুশিবিরে

আপনি আমার উদ্ধারার্থ একাকিনী আসিয়াছেন, আপনাকে দাসী বলিয়া আমি কথা কহিয়াছি, আমার জীবন দান করিয়াছেন, তজ্জন্য তুচ্ছ অর্থ পুরস্কার দিতে চাহিয়াছি, এ সকল অপরাধ কি আপনি মাফনা করিবেন?”

ইন্দ্রনাথের কথাগুলি যেন বিমলার কর্ণে অমৃতবর্ষণ করিল, ইন্দ্রনাথের হস্তসংস্পর্শে বিমলার শরীর কাঁপিতে লাগিল, গাত্র কণ্টকিত হইল। কিন্তু বিমলা প্রত্যাশপন্নমতি, বস্ত্রে আত্মসংযম করিয়া ধীরে ধীরে ইন্দ্রনাথের হস্ত হইতে আপন হস্ত সরাইয়া লইলেন ও ধীরস্থরে উত্তর করিলেন, “সৈনিকবর, আপনার অপরাধ নাই, আমি দাসীবেশে আসিয়াছি, আপনি আমাকে দাসী বিবেচনায় বধেট সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন। আপনি যে পুরস্কার দিয়াছেন, তাহা আমি আজীবন হৃদয়ে ধারণ করিব, আজি যে আমার প্রতি একটু স্নেহ প্রকাশ করিলেন, আজীবন তাহা স্মরণ রাখিব; কিন্তু এক্ষণে এ সমস্ত কথা কহিবার অবসর নাই, এক্ষণে অন্ত কথা বলিতে আপনার নিকটে আসিয়াছি। আমি আপনার উদ্ধারের উপায় সঙ্কল্প করিয়াছি, কারাগৃহের ইন্নি-ঘর চৈতন্তশূন্য হইয়াছে, আপনি এই রমণীয় বেশ ধারণ করিয়া চলিয়া যাউন। কারাগৃহের বাহিরে সৈনিকগণ যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, বলিবেন—আমি তিথারিণী দাসী।”

ইন্দ্রনাথ এই কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন, বিমলার সাহস ও স্থিরসঙ্কল্প দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; কিন্তু ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন, “দেবী! কমা করুন, আমি আপনাকে বিপদে ফেলিয়া পলায়ন করিতে ইচ্ছুক নহি। আপনি এইরূপে আমার

উদ্ধার করিয়াছেন জানিলে নৃশংস শত্রুগণ আপনাকে প্রাণে বধ করিবে ।”

বিমলা বলিলেন, “আমার জন্ত চিন্তা করিবেন না, আমার উদ্ধারের উপায় আছে, উদ্ধার না হইলেও অধিক ক্ষতি নাই । আমার জন্ত চিন্তা করিবে, আমার জন্ত শোক করিবে, জগতে এরূপ অধিক লোক নাই । অনন্ত সাগরের মধ্যে একটি জলবিধ ঘেরূপ বীন হইয়া যায়, তজ্জপ এই জগৎসংসারে একজন হতভাগিনীর মূর্ত্য অশ্রুত অলঙ্কিত থাকিবে । আপনি বশস্বী, কমতাশালী, বীরপুরুষ, আপনি সুখে থাকিলে অনেকে সুখে থাকিবে ।”

ইন্দ্রনাথ বিমলার প্রতি তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিলেন ; অবশেষে ধীরভাবে বলিলেন, “দেবি ! আপনি আমার উদ্ধারে যত্নবতী হইয়াছেন, তাহার জন্ত আমি আজন্মকাল আপনার নিকট বাধিত রহিলাম ; কিন্তু আপনাকে এই স্থানে রাখিয়া আমি কারা-পরিত্যাগ করিব না, উপরোধ করিবেন না ।”

এবার বিমলা পরাস্ত হইলেন । অনেক অহরোধ করিলেন, অনেক কারণ দর্শাইতে লাগিলেন, কিছুতেই বীরপুরুষের প্রতিজ্ঞা বিচলিত করিতে পারিলেন না । ইন্দ্রনাথের একই উত্তর, “যিনি আমাকে একবার প্রাণদান করিয়াছেন, পুনরায় আমার উদ্ধারের জন্ত এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তাহাকে বিপদগ্রস্ত করিয়া আমি উদ্ধারপ্রার্থনা করি না, এরূপ উদ্ধারে, এরূপ জীবনে আমার কাজ নাই ।”

অবশেষে বিমলা অতি কষ্টে বলিলেন, “বীরপুরুষ ! আপনি বোধ হয় জানেন না যে, আপনার প্রেমাকাজক্ষী সরলা আজি চতুর্দশদিন হুগুণে আবদ্ধ রহিয়াছেন । আপনি শীঘ্র তাহার উদ্ধার না করেন, পায়র

শব্দনি নিজেই একজন ভৃত্যের সহিত সরলার বিবাহ দিবে স্থির করিয়াছে ।”

ইন্দ্রনাথ সহসা বজ্রাহতের স্তায় নিশ্পাশ হইয়া রহিলেন । তাহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, লজাট হঠাৎ খেদ-বিন্দু নির্গত হইতে লাগিল । বিমলা তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন, ইন্দ্রনাথ নীরবে শুনিলেন, নীরবে হস্তের উপর লজাট ক্রান্ত করিয়া অধোবদনে রহিলেন । মস্তকে শিরা ক্ষীত হইতেছিল, নয়ন হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতেছিল ।

অনেকক্ষণ পর ইন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে মস্তকোত্তোলন করিয়া বলিলেন, “ভদ্রে ! আপনার কথাই থাকিবে, আমি পলায়ন করিব, কিন্তু একটি প্রতিজ্ঞা ?”

বিমলা । কি প্রতিজ্ঞা ?

ইন্দ্রনাথ । যদি কল্যা আপনার উদ্ধারের উপায় না হয়, যদি নৃশংস শত্রুরা আপনার বধের আজ্ঞা দেয়, অঙ্গীকার করুন, রাস্তায় নিকট তিন দিবসের সময় প্রার্থনা করিবেন । আমি রাস্তামুখে বিলক্ষণ জানি, অবলার এ বাচ্চাদের কখনই অস্বীকৃত হইবেন না । তিন দিনের মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটিতে পারে ।”

বিমলা তাহাই প্রতিজ্ঞিত হইলেন ।

তখন বিমলা ইন্দ্রনাথকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া দিলেন । ইন্দ্রনাথ আপনার নুতন রূপ দেখিয়া হাসিলেন ; আবার বিমলার দিকে চাহিলেন ; উষ্মের সহিত বিমলার হস্ত দুইটি আপনার হুই হস্তে ধারণ করিয়া বলিলেন, “ভদ্রে ! দুইবার আপনি আমার প্রাণরক্ষা করিলেন, জগদীশ্বর আমার সহায় হউন । আমি আপনার এ ঋণ পরিশোধ করিতে চেষ্টা করিব ।” এই কথা কহিতে কহিতে ইন্দ্রনাথের উকনিখাস বিমলার বাহুলতার উপর পড়িল, ইন্দ্রনাথের

ওষ্ঠধর বিমলার করণরূপ স্পর্শ করিল। বাতাহত পত্রের জ্বালা বিমলার গাত্র কাঁপিতে লাগিল, শরীর অবসন্ন হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে ইন্দ্রনাথ অদৃশ হইলেন, বিমলা ললাটের বেদ মোচন করিয়া সেই অন্ধকারময় কুঠীতে বসিয়া পড়িলেন। নৈশ জগৎ ছুর্ভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন, বিমলার নারীরূপও ছুর্ভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পুরুষের বীরত্ব।

HEARD ye the din of battle bray.

Lance to lance and horse to horse.

Grey.

ইন্দ্রনাথকে সহসা শিবিরে দেখিয়া তাঁহার অধীনস্থ সেনাদিগের বিষয় ও আত্মাদের নীমা রহিল না। কিন্তু ইন্দ্রনাথ গভীরস্বরে বলিলেন, “কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না, আমার অধীনস্থ অবারোহিণী মস্তক লইয়া প্রস্তুত হও, এইক্ষণেই নিঃশব্দে শত্রুশিবির আক্রমণ করিব।”

সৈন্তেরা বিষয়াপন্ন হইল, কিন্তু আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া রণসজ্জা করিতে লাগিল। ইন্দ্রনাথ এই অবসরে ভগবানের নাম লইলেন; দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, “ভগবন্! অস্ত্রকার মত অসমসাহসী কার্যে আমি কখনও লিপ্ত হই নাই; অস্ত্র প্রসন্ন হইয়া আমাকে বিজয়লাভ করিতে দিন, আমার উপকারিণীর উদ্ধার সাধন করিয়া যদি প্রাণে হত হই, কতি নাই।”

রজনী তিন প্রহর অতীত হইয়াছে, চন্দ্র অস্ত গিয়াছে, চারিদিকে গভীর অন্ধকার।

আকাশে দুই একটি তার দেখা বাইতেছিল, আবার মেঘরাশিতে আবৃত হইতেছে; মধ্যে মধ্যে পেচকের ভাষণ শব্দ শুনা বাইতেছে, নিকটস্থ গজার ভীম কল্লোল শ্রুতিগোচর হইতেছে। সে গভীর অন্ধকারে ইন্দ্রনাথের সেনা নিঃশব্দে শত্রুশিবিরভিমুখে চলিল।

ক্ষণেক যাইতে যাইতে দূর হইতে একটি আলোক দৃষ্টিগোচর হইল, সে আলোক একবার দেখা যায়, অন্তবার নির্ঝাপ্ত হইয়া। ইন্দ্রনাথ দাঁড়াইলেন, একজন দূতকে অগ্রে প্রেরণ করিলেন। দূত নিঃশব্দে যাইয়া নিঃশব্দে প্রত্যাবর্তন করিল;—বলিল, “শত্রুপক্ষের চারিজন শিবিররক্ষক এই স্থানে পাহারা দিতেছে।” ইন্দ্রনাথ দশজন তীরন্দাজকে অগ্রে যাইতে বলিলেন ও আদেশ করিলেন, “যদি এই চারিজনের মধ্যে একজন পলাইয়া যাইয়া শিবিরে সংবাদ দেয়, তবে তোমাদের দশজনের প্রাণসংহার করিব।” তীরন্দাজগণ ধীরে ধীরে যাইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে চারি জনকেই ভূতলশায়ী করিল। ইন্দ্রনাথের সেনা অগ্রসর হইতে লাগিল।

আরও দুই তিন স্থানে ঐরূপ পাহারা ছিল, রক্ষকগণ ঐরূপে নিহত হইল। এতটুকু ইন্দ্রনাথ শত্রুদিগের পারিধার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সেনাদিগকে পরিধা পার হইতে আদেশ দিলেন।

পরিধার অপর পার্শ্বের সুসলমানগণ সহসা শত্রুর আগমন দেখিয়া রণসজ্জা করিতে লাগিল; কিন্তু তাহারা সজ্জিত হইবার পূর্বেই ইন্দ্রনাথ সৈন্তে পরিধা পার হইয়া তাহাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দূরে তাড়াইয়া দিলেন। ইন্দ্রনাথ তখন সৈন্তগণকে সেই পরিধা রক্ষা করিবার জন্য রাখিয়া কেবল পঞ্চাশ জনমাত্র সঙ্গে লইয়া উদ্ধাধানে কারাগারের দিকে যাইলেন।

কারাগৃহের বাহিরে সৈনিকগণ দায়রক্ষা করিতেছে। ইন্দ্রনাথ এখনও কারাগৃহে বদ্ধ আছে, তাহার এইরূপ বিবেচনা করিতেছিল, সহসা ইন্দ্রনাথের বন্ধনাদ শুনিয়া এবং ইন্দ্রনাথ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বেগে পলায়ন করিল। ঘরের নিকট বাইরা ইন্দ্রনাথ দেখিলেন, তাঁহার ঘরের রক্ষকগণ এখনও সুরার অচেতন, নিকটে একটি দীপ জলিতেছে। ইন্দ্রনাথ দীপটি হাতে লইয়া ঘরের ভিতর বাইলেন, দেখিলেন, সেই অন্ধকারময় কারাগৃহের তৃণশয্যার বিমলার শ্রান্ত শীর্ণ দেহলতা পড়িয়া রহিয়াছে। চক্ষু মুদিত, নিখাসপ্রস্থাসে বক্ষঃস্থল ধীরে ধীরে ক্ষীত হইতেছে।

ইন্দ্রনাথ এক মুহূর্ত্তকাল সজল-নয়নে ভগবানকে শত শত ধনবাদ দিলেন। তৎপরে মুহূর্ত্তমধ্যে সেই ক্ষীণ দেহলতা তৃণশয্যা হইতে উঠাইয়া ঘর হইতে নিজাক্ত হইলেন। ক্ষণেক পর বিমলার ঘেন চেতনা হইল, ইন্দ্রনাথকে চিনিতে পারিলেন, বলিলেন, "সেনাপতি ইন্দ্রনাথ আমার উদ্ধারের জন্য আসিয়াছেন? ভগবান আপনার উপকার করিবেন। আমি বৃত্তাই স্থির করিয়াছিলাম, কেবল মৃত্যুর সময় পিতাকে দেখিলাম না, এই ভক্ত মনে বড় ক্লেশ হইতেছিল। সেনাপতি, আমার উদ্ধার সাধন করুন, আমি পিতাকে আর একবার দেখিব।"

এই কাতর স্বর শুনিয়া, ইন্দ্রনাথের চক্ষু জলে পূর্ণ হইল, কিন্তু উত্তর দিবার অবসর ছিল না। ইন্দ্রনাথ অঝোরোহণ করিলেন এবং শিশুকে যেরূপ উঠাইয়া লয়, সেইরূপ বিমলার ক্ষীণ শরীর আপনার পশ্চাতে উঠাইয়া লইলেন। বিমলা না পড়িয়া বান, এই ভক্ত একটি পেট দিয়া বিমলার শরীর ইন্দ্রনাথের শরীরের সহিত বদ্ধ করা হইল।

বেখানে ইন্দ্রনাথের অঝোরোহিণী পরিখা

রক্ষা করিতেছিল, বিদ্যাদগতিতে ইন্দ্রনাথ সেইখানে বাইলেন। চারিরিকে কক্ষমন্ডের দ্বার প্রায় তিন চারি সহস্র শতসৈন্য সজ্জিত হইয়া আসিতেছে। ইন্দ্রনাথ দ্রুতবেগে সসৈন্তে পরিখা পার হইয়া দ্রুতবেগে দুর্গাভিমুখে চলিলেন, শত্রুসেনা নিকটে আসিবার পূর্বেই তাহার। মুক্তের পৌছিলেন।

সমস্ত শিবির জয় জয় রবে পরিপূরিত হইল। ইন্দ্রনাথ কারামুক্ত হইয়াছেন, হইয়াই শত্রুদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন, তাঁহার পঞ্চশত অঝোরোহীর সহিত শত্রুদিগের পরিখা উত্তীর্ণ হইয়া, সর্বনাশ করিয়া আসিয়াছেন, এরূপ সংবাদ পাইয়া মোগল-সৈন্তগণ উল্লাসে উন্মত্তপ্রায় হইল। টোডরমল্ল রেহনসহকারে ইন্দ্রনাথকে আলিঙ্গন করিলেন; তিনি কিরূপে উদ্ধার পাইলেন, জিজ্ঞাসা করিবার কাহারও অবসর রহিল না।

কয়েক জন অঝোরোহী ভিন্ন বিমলার কথা কেহ জানিল না। বিমলা, সেই রজনীযোগে পিজলায়ে বাইলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

Out ! out ! brief candle !
shakespeare.

উপর-উক্ত ঘটনার দুই তিন দিন পরে একদিন সন্ধ্যার সময় রাজা টোডরমল্ল ও ইন্দ্রনাথ দুইজনে দুগের শ্রাতিরোপরি পাদচারণ করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকক্ষণ কথোপকথন হইতেছিল।

রাজা। ইন্দ্রনাথ! যুদ্ধে কেবল সাহস আবশ্যক করে না, রণকৌশলও আবশ্যক।

ইজনাথ। কিন্তু আপনি কি বোধ করেন, যদি আমরা দুর্গ ছাড়িমা সমুখ-রূপে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমরা পরাস্ত হইব ?

রাজা। যুদ্ধ করিলে পরাস্ত হইব না, কিন্তু কয় জন যুদ্ধ করিবে ?

ইজনাথ। মহারাজ, তবে আমরা কয় দিন এই অবস্থায় দুর্গের ভিতরে থাকিব ?

রাজা। আর অধিক দিন নহে। ঐ যে একখানি শিবিকা আসিতেছে, উহার আরোহী আমাদের এক্ষণেই সংবাদ দিবেন যে, আর অল্প দিনের মধ্যে শত্রুর বিনাশ হইবে, আমাদের বিনা যুদ্ধে জয় হইবে।

ইজনাথ। মহারাজ ! আপনার যুদ্ধ-কৌশল জগদ্বিখ্যাত। কিন্তু আপনি ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন, তাহা আমি জানিতাম না।

সেই শিবিকা নিকটে আসিলে তাহার ভিতর হইতে দেওয়ানজী সতীশচন্দ্র অবতরণ করিলেন। ইজনাথ তাঁহাকে দেখিয়া আরও বিস্মিত হইলেন।

সতীশচন্দ্রের সহিত রাজা-টোডরমলের বে বো কথা হইল, তাহার বিস্তারিত বিবরণ আবশ্যক নাই। সতীশচন্দ্র রাজা টোডরমল কর্তৃক বঙ্গদেশীয় প্রধান প্রধান হিন্দু-জমীদারের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। সতীশচন্দ্র কার্যদক্ষ, বাক্পটু ও বুद्धিমান। সেই সকল জমীদারের নিকট নানারূপ কারণ দর্শাইয়া তাঁহাদিগকে একে একে শত্রুপক্ষ ত্যাগ করিয়া সম্রাটপক্ষ অবলম্বন করিতে লগ্নাইয়াছিলেন। আকবর শাহ হিন্দুদিগের পরম বন্ধু ; হিন্দুদিগের উপর অত্যাচার করতমুহ উঠাইয়া দিয়াছেন ; হিন্দুদিগের শাস্ত্র আলোচনা করিতেছেন ; হিন্দুরমণী বিবাহ করিয়াছেন ; হিন্দুদিগের আচার-ব্যবহারের কোন কোন অংশ অবলম্বন করিয়াছেন ; বঙ্গদেশে

হিন্দুসেনাপতি ও শাসনকর্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন, বিজয়লক্ষী স্বয়ং সে সেনাপতির ছাত্র-স্বরূপ ; তিনি দুইবার বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন এবং এবারও জয় করিবেন ; জয় করিলে, বিদ্রোহী জায়গীরদারদিগকে শাস্তি দিবেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার সহায়তা করিলে সে ক্ষত্রিয় মহাত্মা কখন সে স্বর্ণ বিস্মৃত হইবেন না ;—ইত্যাদি নানারূপ প্রলোভন ও ভয়প্রদর্শন করিয়া সতীশচন্দ্র অনেক জমীদারকে সম্রাটপক্ষাবলম্বী করিয়াছিলেন। সেই জমীদারগণ এক্ষণে শত্রুসৈন্যদিগকে ষাণ্ডভব্য পাঠাইবেন না স্বীকার করিয়াছিলেন। সুতরাং আর পাঁচ সাত দিনের মধ্যে শত্রুগণ আহাির অভাবে রণে ভঙ্গ দিয়া ভাগলপুর ত্যাগ করিয়া দিগ্বিদিক্ 'চলিয়া যাইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

রাজা সতীশচন্দ্রকে বহু সম্মানপূর্ব্বক বিদায় দিলেন, ইজনাথের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "ইজনাথ, আমার কথা সত্য কি না ?"

ইজ্র। মহাশয়, আপনি যুদ্ধে যেরূপ অজয়ের, কৌশলে সেইরূপ অতুল্য। কিন্তু—

রাজা। কিন্তু কি ?

ইজ্র। আমি কাহার বিপক্ষে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু সতীশচন্দ্রের সমস্ত কথা আপনি কি বিশ্বাস করেন ?

রাজা। তরুণ সেনাপতি কি টোডরমলকে রাজনীতি শিক্ষা দিতে চাহেন ? কাহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে, কাহাকে অবিশ্বাস করিতে হইবে, তাহা ইজনাথ কি আমা অপেক্ষা ভাল জানেন ?

ইজ্র। মহারাজ ! আমার অপরাধ লইবেন না, কিন্তু হইতে পারে, এই সতীশচন্দ্রের সম্বন্ধে আপনি বাহা জানেন, আমি তাহা অপেক্ষা অধিক জানি।

রাজা। হইতে পারে, ইজনাথ যতদূর

জানেন, আমিও ততদূর জানি, হইতে পারে, ইন্দ্রনাথের মনে এইকণে কি চিন্তা হইতেছে, তাহাও আমি জানি ।”

ইন্দ্রনাথ বিশ্বম্বে অবাক হইয়া রাজার দিকে চাহিয়া রহিলেন ; রাজা পূর্বের ভায় পুনরায় ঐষং হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “এই সতীশচন্দ্র রাজা সমরসিংহকে হত্যা করিয়াছে, ইন্দ্রনাথ তাহাই চিন্তা করিতেছেন ।”

ইন্দ্রনাথ বিশ্বম্বে সংজ্ঞাশূন্যের ভায় হইলেন, বলিলেন, “মহারাজ ! কমা করুন । আপনি অস্বাভাবিক !”

রাজা গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, “ইন্দ্রনাথ ! কেবল ভগবান্ই অস্বাভাবিক, কিন্তু দিল্লীশ্বরের সেনাপতি চারিদিকের সন্ধান না রাখিয়া কোন কার্যে প্রবৃত্ত হয় না । যুদ্ধ-কার্যে আমার কেশ শুরু হইয়াছে, ভগবানের ইচ্ছায় যুদ্ধকৌশল কিছু শিখিয়াছি ।”

ইন্দ্রনাথ কণেক মৌনভাবে থাকিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ ! তবে রাজা সমরসিংহের হত্যা-কথা আপনি অবগত আছেন ?”

রাজা গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, “সে হত্যা-কথা আমি জানি এবং বথাকালে সে হত্যার বিচার করিব । আমার পুত্রকে হত্যা করিলে হত্যাকারীকে ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু রাজা সমরসিংহের হত্যাকারীকে ক্ষমা করিতে পারি না ।”

সেই রাত্রি একপ্রহরের সময়ে সতীশচন্দ্র গঙ্গাতীরে পদচারণ করিতেছেন । আন্ধি তিনি রাজার নিকট সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার হৃদয় উল্লাসে পরিপূর্ণ হইয়াছে, মায়াবিনী আশা তাঁহার কানে কানে বলিতেছে, “তুমি একদিন পাপের দণ্ডের ভয় করিয়াছিলে, সে পাপ কে জানিতে পারি-

য়াছে ? দণ্ড কোথায় ? এখন মিল দিন তোমার সন্ধানবুদ্ধি হউক, পদবুদ্ধি হউক ।” সূর্য্য অস্তে বাইবার সময় অবধি কুহকিনী আশা তাঁহার কানে কানে এই প্রকারে বলিতেছিল, সেই সূর্য্য পুনরায় উদয় হইবার আগে সতীশচন্দ্র বুলিলেন, আশা মায়াবিনী—কুহকিনী—মিথ্যাবাদিনী ।

সহসা চন্দ্রালোকে সতীশচন্দ্র একজন দস্যুকে দেখিতে পাইলেন । দেখিতে দেখিতে সেই দস্যু ছুরিকা হস্তে সতীশচন্দ্রের দিকে দৌড়িয়া আসিল, সতীশচন্দ্র পলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল ; সেই হত্যাকারী ছুরিকাধারী সতীশচন্দ্রকে আহত করিল । সতীশচন্দ্রের ভৃত্যগণ তখন দৌড়াইয়া আসিয়া খড়্গ দ্বারা দস্যুকে ভূতলশায়ী করিলেন ।

মৃতপ্রায় দস্যু বলিল, “সতীশচন্দ্র, আপনার মৃত্যু সন্নিকট ।”

সতীশচন্দ্র । নরোধম ! ভগবান্ রক্ষা করিয়াছেন, তোর আঘাতে সামান্ত মাত্র রক্ত পড়িয়াছে ।

দস্যু । সেই সামান্ত আঘাতে আপনার প্রাণনাশ হইবে, আমার ছুরিকা বিবাক্ত । প্রভু ! আপনি আমাকে কি জানেন না ?

সতীশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ আপনার পুরাতন ভৃত্যকে চিনিলেন ; বলিলেন, “নরোধম !” তোকে কে এতদূর প্রভুতত্ত্ব শিখাইয়াছিল ?

ভৃত্য অতি ক্রোধ ও অলিতস্বরে উত্তর করিল, “পাপিষ্ঠ নহুনি ।”

সতীশচন্দ্র তখন ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, “আমিও ভাবিয়াছিলাম, সেই পাম-রেরই এই কার্য্য । পৃথিবীতে তাহার মত ভীষণ পাপী আর নাই, নরকেও নাই । কিন্তু তুমি আমার পুরাতন ভৃত্য হইয়া আমার বধে সন্মত করিয়াছিলি ?”

ভূতা আরও ক্ষীণস্বরে উত্তর করিল,
“শ—শ—শুনিনি অনেক লোভ দেখাইয়া-
ছিল, লোভে পড়িলে জ্ঞান থাকে না।
লোভে পড়িয়া পাপ করিলাম, প্রাণ হারাই-
লাম।”

আর কথা বাহির হইল না, শরীর হইতে
প্রাণ বহির্গত হইল, ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে কাঁপিতে
স্থির হইল, নয়ন দুইটি আকাশের দিকে
চাহিয়া বহিল। চক্ষুগুলোকে মৃতদেহের দিকে
চাহিয়া সতীশচন্দ্র বলিলেন, “ভূতা, তোর
অপেক্ষা জ্ঞানী লোকও লোভে পড়িয়া জ্ঞান
হারাইয়াছে, তোর অপেক্ষা ভীষণ পাপ
করিয়াছে, তোর মত প্রাণ হারাইবারও
বিলম্ব নাই, পরমেশ্বর তোকে ক্ষমা করুন,
আমার পাপের ক্ষমা নাই।”

প্রাতঃকালে রাজার নিকট সংবাদ আসিল,
দেওয়ানজী সতীশচন্দ্র যত্নাশ্রয় শয়ন
করিয়া রহিয়াছেন। রাজা তৎক্ষণাৎ সতীশ-
চন্দ্রের গৃহে গমন করিলেন, ইন্দ্রনাথ সঙ্গে
সঙ্গে ছিলেন।

তথায় বাইরা দেখিলেন, সতীশচন্দ্র
শয্যা শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, চারিদিকে
চিকিৎসক বসিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু যে
ভীষণ বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়াছে,
তাহাতে পরিত্রাণ নাই। রাজা এই অদ্ভুত
ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, পার্থক্য
অনুসন্ধান সর্বশেষ অবগত করাইল। তখন
সতীশচন্দ্র অতি ক্ষীণস্বরে বলিতে লাগিলেন,
“মহারাজ! আমি পাপী, পাপিষ্ঠকে ক্ষমা
করুন।”

রাজা নিম্ন হইয়া রহিলেন। সতীশচন্দ্র
পুনরায় বলিলেন, “আমি ভীষণ দোষ করি-
য়াছি, সে অপরাধ ক্ষমা করুন।”

রাজা তথাপি নিম্ন হইয়া রহিলেন।
সতীশচন্দ্র পুনরায় বলিলেন, “মহারাজ!

আমি নরহত্যাকারী, কিন্তু সকল অপরাধেরই
ক্ষমা আছে, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি
নরহত্যাকারী; যত্নাশ্রয় ক্ষমা প্রার্থনা
করিতেছি, আমাকে ক্ষমা করুন।”

সে কাতরস্বর শ্রবণ করিয়া রাজা আর
সংবরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন,
“রাজা সমরসিংহের হত্যাকারীকে আমি
কখনও ক্ষমা করিব ভাবি নাই। কিন্তু জগ-
দীশ্বর তোমাকে শান্তি দিয়াছেন, আমি
তোমাকে ক্ষমা করিলাম। তোমার জীবিত
ধাক্কা আর অধিক কাল নাই, ভগবানের
নাম গ্রহণ কর, তিনি দ্বারার সাগর, যত্ন-
কালে তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিলে
জীবনের পাপখণ্ডন হয়।”

চকিত হইয়া সতীশচন্দ্র আবার রাজাকে
লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “মহারাজ! তবে
আপনি সমরসিংহের যত্নার কারণ সর্বশেষ
অবগত আছেন?”

রাজা উত্তর করিলেন, “আছি।”

সতীশচন্দ্র বিস্মিত হইলেন, নিম্ন হইয়া
রহিলেন।

অনেকক্ষণ পর আবার বলিলেন, “মহা-
রাজ! আমার একটি নিবেদন আছে।
আমি পাপী বটে, কিন্তু জন্মাবধি পাপী
ছিলাম না, যৌবনে আমার জীবন পবিত্র
ছিল, উচ্চ মতি, উচ্চ আশ্রয়, উচ্চ প্রবৃত্তি
ছিল। লোভে, মহালোভে পড়িয়া সে
সকল হারাইয়াছি, জীবন পাণে কলুষিত
হইল, আজি প্রাণ হারাইলাম।”

সতীশচন্দ্রের ক্ষীণস্বর অধিকতর ক্ষীণ
হইয়া আসিল, আর কথা নিঃসৃত হইল না।
রাজা স্বপ্নেহে ওষ্ঠে দুই দিলেন, রসশূন্য ওষ্ঠ
পুনরায় সিক্ত হইল। সতীশচন্দ্র পুনরায়
বলিতে লাগিলেন, “আমি পাপী বটে, কিন্তু
আমার অপেক্ষাও ঘোরতর পাপী আছে।

মহারাজ ! আমার কৃত্য শুনিয়ে
বর্ষা সমরসিংহকে বধ করিয়েছে,
সেই অন্য আঘাত বধ করিল, আপনি
তাহার বিচার করিবেন "

ক্রোধে রাজা চৌদরমহলের নয়নধর রক্ত-
বর্ণ হইল। কিন্তু তিনি ক্রোধ সংবরণ করিয়া
বীরে বীরে বলিলেন, "চিন্তা নাই, জগদীশ্বর
পাপীর দণ্ড দিবেন।"

আবার অনেকক্ষণ পর্যন্ত সকলে নীরব
হইয়া রহিল। সতীশচন্দ্রের আত্ম নিঃশেষিত
হইয়া আসিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে
সতীশচন্দ্র অধিকতর ক্রীণ ও কাতরভাবে
বলিলেন, "কত্ভা, আমার ঘেহের বিমলা,"
সহসা বাকরোধ হইল।

রাজা পুনরায় অঙ্গুলি দ্বারা ওষ্ঠে ছন্দ
দান করিলেন। ক্ষণেক পর আবার বলিতে
লাগিলেন, "হতভাগিনী বিমলা, তোমার
মাতা নাই, তুমি আজ পিতৃহীনা হইলে!"
এই কথা বলিতে বলিতে পার্শ্বের গৃহ
হইতে হৃদয়বিহারক রমণীকণ্ঠজাত ক্রন্দন-
ধ্বনি উত্থিত হইল, সে ধ্বনি শুনিয়া
সতীশচন্দ্রের স্পন্দনহীন নয়নধর জলে পরি-
পূর্ণ হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে বিমলা বেগে পিতার
নিকটে আসিলেন। ঘর লোকে পরিপূর্ণ
ছিল, কিন্তু সে সময় সে জান কোন রমণীর
থাকে ?

ইন্দ্রনাথ পূর্বপরিচিত রমণীকে সতীশ-
চন্দ্রের কত্ভা বিমলা বলিয়া জানিয়া বিস্মিত
হইলেন।

বিমলা পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া
তাঁহার পদ-বন্দনা করিলেন, বোধ হইল
যেন, সেই পবিত্র আলিঙ্গনে সতীশচন্দ্রের
হৃদয় উদ্বেগশূন্য হইল; মুখমণ্ডল শান্তভাবে
ধারণ করিল, নয়ন দুইটি চিরনিজ্রায় স্থিত
হইল।

তখন বিমলা বার বার সেই কৃতবেহ
আলিঙ্গন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে
লাগিলেন। আজি বিমলার নয়নের
আলোক বিক্ষিপ্ত হইল, আজি চারিদিক
অন্ধকার হইল, আজি হৃদয় বিদীর্ণ হইল,
আজি জগৎ শূন্য হইল।

সেই দৃষ্ট দর্শন করিয়া রাজা নয়নধর
আবৃত করিয়া গৃহ হইতে নিশ্চাস্ত হইলেন।
ইন্দ্রনাথ খড়্গের উপর ভর দিয়া বালিকার
স্তায় অব্যাহত নয়নধারা বর্ষণ করিতে লাগি-
লেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

চতুর্কোটিত দুর্গে প্রত্যাগমন।

If after every tempest come such calms,
May the winds blow till they have
wakened death.
Shakespeare.

আজি পূর্ণিমা তিথি, কিন্তু আকাশ
দেখিলে কে বলিবে আজি পূর্ণিমা ? গভীর
ধূস্রবর্ণ মেঘরাশিতে আকাশ অস্ত আচ্ছন্ন রহি-
য়াছে, জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে।
মধ্যে মধ্যে বিভ্রান্ততার ভীষণ আলোকে
সেই অন্ধকার মুহূর্ত্তের অস্ত উদ্দীপ্ত হইতেছে,
আবার পূর্বাশ্রয় দোরতর অন্ধকার হই-
তেছে। মুঘলধারা বৃষ্টিতে ক্ষেত্র, গ্রাম, পথ,
ঘাট সকল ভাসিয়া বাইতেছে। মুহূর্ত্তে
মুহূর্ত্তে যেন সেই বৃষ্টি বৃদ্ধি পাইতেছে, বায়ু
রহিয়া রহিয়া অতিশয় শব্দ করিয়া প্রবাহিত
হইতেছিল, সেই বায়ু-শব্দের মধ্যে মধ্যে
মেঘের অনেকক্ষণস্থায়ী গর্জন জগৎসংসার
ত্রস্ত ও কণ্ঠিত করিতেছিল।

এরূপ ভরতর বাতায় সন্ধ্যা চতুর্কোটিত
দুর্গের অন্ধকারাচ্ছন্ন উজানের মধ্যস্থ একটি
জনশূন্য কুটীরাভ্যন্তরে একাকিনী বসিয়া

আছে, কি ভয়? বাসিকার হৃদয়ে কি ভয় নাই? এই অন্ধকারে এই ভয়াবহ যেষগর্জনে বাসিকার হৃদয়ে কি শব্দ হইতেছে না?—না, অন্ধ সরলার ডিঙে আর ভয় নাই, অন্ধ সরলা কাহাকেও ভয় করে না। সুখের আশা, জীবনের আশা অন্ধ শেব হইয়াছিল।

বাহার আশা নাই, তাহার ভয় কিসের? আকাশে যে ভীষণ বিদ্যুৎ ক্রমে ক্রমে নগ্নন ঝলসিতেছিল, সরলা স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে অবলোকন করিতেছিল; তাহার পর যে ভয়ানক মেঘগর্জন হইতেছিল, সরলা স্থিরচিত্তে তাহাও শ্রবণ করিতেছিল। আজি ছয় মাস হইল, ইন্দ্রনাথ পশ্চিম গিয়াছেন, তিনি সরলাকে ভুলিয়াছেন, পামর শকুনি সরলার অন্ধ বিবাহ স্থির করিয়াছে।

একবার বালাবস্থার কথা মনে আসিল। মহামাঙ্গ সময়সিংহের একমাত্র দুহিতা এই বিত্তীর্ণ উত্তানে বেড়াইত, পিতার কোড়ে উঠিয়া শাখা হইতে ফুল পাড়িত, মাতার কোড়ে উঠিয়া একদিন একটা পাখী ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল, পাখী উড়িয়া গেল, নিকোঁধ শিশু কাঁদিল, নিকোঁধ শিশু জানিত না যে, জীবনের আশা-ভরসা সকলই সেই পাখীর মত একে একে উড়িয়া যায়!

তাহার পর ছয় বৎসর কাল রুদ্রপুরে অতিবাহিত হইয়াছে। দরিদ্র পল্লীগ্রামে দরিদ্র কুটীরে সেই ছয় বৎসর কাটিয়াছে, কিন্তু এখন হইলেই সুখ হয় না, দারিদ্র্য হইলেই দুঃখ হয় না। সরলার অন্তঃকরণে সেই ছয় বৎসর পরম সুখের কাল বলিয়া বোধ হইল। প্রাণের সখী অমলা! তাহাকে কি আর দেখিতে পাইবে? প্রাতঃকালে সেই অমলার সহিত প্রত্যহ ঘাটে জল আনিতে যাইত, সন্ধ্যার সময়ে সেই অমলার সহিত অনন্ত

উপকথা, অনন্ত প্রণয়ের কথা হইত। সুখের সময় অমলা নিকটে থাকিলে সুখ দ্বিগুণ হইত, দুঃখের সময় অমলার প্রবোধ-বাক্যে দুঃখশান্তি হইত। আজি সে অমলা কোথায়? পাখীর মত উড়িয়া গিয়াছে।

তাহার পর বনগ্রামের আশ্রমবাসিনী কমলা, তিনিও সরলাকে বড় ভালবাসিতেন, আর এই দুর্গবাসিনী বিমলা, তিনিও সরলাকে কত যত্ন করিয়াছেন। তাহারা কোথায়? তাহারাও কি পাখীর মত উড়িয়া গিয়াছেন?

আর সেই ইন্দ্রনাথ! বাহার চিন্তায় আজি ছয় মাস সরলার হৃদয় পরিশূর্ণ রহিয়াছে, বাহার আশার আজি ছয় মাস সরলা জীবনধারণ করিয়া রহিয়াছে, সেই ইন্দ্রনাথ কোথায়? বালাকালে ইচ্ছামতীতীরে বাহার পার্শ্বে বসিয়া বালিকা গল্প শুনিত, গল্প শুনিত আর একদৃষ্টে সেই মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত: যৌবনের প্রারম্ভে যে প্রেমময় মুখখানির কথা সদাই ভাবিত, ভাবিত আবার সেই মুখখানি দেখিয়া হৃদয় শীতল করিত, সে ইন্দ্রনাথ কোথায়? রুদ্রপুরের কুটারপার্শ্বে চন্দ্রালোকে ইন্দ্রনাথ শিপায় লইয়াছিলেন, সে ইন্দ্রনাথ কোথায়? হায়! তিনিও পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া গিয়াছেন, অনন্ত সংসারাকাশে বিচরণ করিতেছেন।

সরলা ভাবিয়া ভাবিয়া হতজ্ঞান হইল। মাথা ঘুরিতে লাগিল, কিন্তু চকুতে জল নাই। বাসিকার হৃদয়ে আজি যে বাতনা, অশ্রুজলে তাহা নিবারণিত হয় না। হতদিন জীবনে একটি আশা থাকে, ততদিন জীবন সহনীয় হয়, কিন্তু সরলার পক্ষে এক একটি করিয়া সকল আশাই তিরোহিত হইয়াছিল, পৃথিবী শূন্য হইয়াছিল, সংসার তমেঘর

হইয়াছিল । এক একটি করিয়া নাট্যশালায়
শীপ নির্মাণ হইল, সরলা বীরে বীরে সেই
নাট্যশালা ত্যাগ করিবার আশার রসিয়া
আছে ।

কিন্তু আমাদের সুখ-সম্পদের মধ্যে
অনেক সময় বিপদ আইসে, আবার নৈরা-
শ্রের মধ্যেও আশার সঞ্চার হয় । সরলার
বোধ হইল যেন একটা শব্দ হইল । সরলা
বীরে বীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া চারি-
দিক্ দেখিল, কিন্তু সে নিবিড় অন্ধকারে
কিছুই দেখিতে পাইল না । অল্প দিন হইলে
সরলা ভীত হইত, কিন্তু আজি বালিকার
হৃদয়ে ভয় নাই ।

এমত সময়ে উজ্জ্বল বিদ্যুৎ-আলোক
দেখা দিল । সে আলোকে সরলা সম্মুখে কি
দেখিতে পাইল ? সরলার সম্মুখে, কেবল
দশ হস্ত দূরে, একটি মহাব্যোম আকৃতি !
দীর্ঘ আকৃতি, দীর্ঘ বাহু, উন্নত ললাটের
উপর যোদ্ধার উজ্জ্বল শোভা পাইতেছে, কটি-
দেশে যোদ্ধার অসি লম্বমান রহিয়াছে । সে
আকৃতি, সে বদনমণ্ডল, সে উজ্জ্বল নয়নঘর
সরলার অপরিচিত নহে, মুহূর্ত্তমধ্যে সরলার
পতনোন্মুখ কম্পিত দেহখানি সেনাপতি
ইন্দ্রনাথ হৃদয়ে ধারণ করিলেন ।

প্রাতঃকালে ইন্দ্রনাথ আপন নৌকা
হইতে কয়েক জন সৈনিক পুরুষকে ডাকা-
ইলেন ; পরে রাজা চৌডরমন্দের আজ্ঞা-
সারে শকুনিকে বন্দী করিয়া লইয়া ইচ্ছা-
পুরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন । রাজা স্বয়ং
অচিরে ইচ্ছাপুরে সুরেন্দ্রনাথের ভদ্রাসনে
আসিবেন, প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন । মহা-
বেতা, সরলা ও বিমলা এক নৌকায় যাত্রা
করিলেন । সেই দিন সন্ধ্যার সময় ইচ্ছাপুরে
পৌছিয়া ইন্দ্রনাথ পিতার চরণে প্রণিপাত
করিয়া তাঁহার চিন্তা দূর করিলেন ।

বাজ্রিশ পরিচ্ছেদ ।

ইচ্ছাপুরে প্রত্যাগমন ।

WHEN will war's deadly blast was blown
And gentel peace returning.
With many a sweet babe fatherless.
And many a window mourning,
I left the lines and tented field
Where long I'd been a lodger.

BURDS.

বহুকালের পর আত্মীয়-স্বজনের পরস্পর
মিলনে যে অপরিপাক্ত সুখ লাভ করিলেন,
তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না ।
নগেন্দ্রনাথ বহুকাল পরে পুত্রকে পাইয়া
অপার আনন্দ-মাগরে ভাসিতে লাগিলেন ;
পুত্রকে বার বার আলিঙ্গন করিয়া সহস্র
আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন ।

বনগ্রাম হইতে চন্দ্রশেখর কমলাকে
সঙ্গে করিয়া ইচ্ছাপুরে আসিলেন । রুদ্রপুর
হইতে অমলা স্বামীকে সঙ্গে করিয়া
আনিল । রাজা চৌডরমন্দের আসিবেন শুনিয়া
সকলেই সকল দিক্ হইতে ইচ্ছাপুরে
আসিতে লাগিল ।

ইন্দ্রনাথ যে জমীদার নগেন্দ্রনাথের পুত্র,
তাহা সকলেই জানিতে পারিল । সরলা
একদিন গোপনে ইন্দ্রনাথকে কহিল, “আমি
তোমাকে দরিদ্র ভদ্রসন্তান জানিয়া কথা
কহিতাম, জমীদার-পুত্র জানিলে ভয়ে কথা
কহিতাম না ।”

ইন্দ্রনাথ সহাস্তবদনে উত্তর করিলেন,
“সে জন্ত এখন যেন পুরাতন ভালবাসা
ভুলিও না ।”

সরলা মনে মনে ভাবিল, “পারিব
কেন ?” লজ্জাবতনমুখা বেগে পলায়ন
করিল ।

অমলা রক্তপুরে ইন্দ্রনাথকে সামান্য কার্যপুত্র বলিয়া কত তামাসা করিত, এক্ষণে তাঁহাকে জমীদারপুত্র জানিয়া লজ্জায় কণা কহিতে পারিল না, কিন্তু ইন্দ্রনাথ অল্পে চাড়িগার লোক নহেন, একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া নবীন দাসের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। অমলা তাঁহাকে দেখিয়া দেড় হাত ঘোমটা টানিল।

ইন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “বটে, এই বুঝ পুরাতন ভালবাসা।”

অমলা লজ্জিত হইল, অথচ তামাসা ছাড়িল না, অবগুষ্ঠনর ভিতর হইতে বলিল, “আগনি পরের বাড়ীর ভিতর গিয়া এইরূপ মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করেন, আমি সরলাকে বলিয়া দিব।”

ইন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, “অমলা, তুমি আমাকে পর মনে কর, আমি তোমাকে পর মনে করি না।”

অমলা এবার অপ্রতিভ হইল, অবগুষ্ঠন খুলিয়া বলিল, “আমায় কমা কর, আর তোমার নিকট লজ্জা করিব না।” সেই অবধি অমলার লজ্জাভঙ্গ হইল।

মহাখেতা যে রাজা সমরাসংহের বিধবা, তাহা জানিয়া লোকে অধিকতর বিস্মিত হইল। এখন আর মহাখেতা দরিদ্রা নহেন, রাজা টোডরমল্লের আজ্ঞাহসারে সমরসিংহের বিস্তীর্ণ অধিকার তাঁহার বিধবা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সকলের মুখ দেখিয়া বিমলাও আপনার দুঃখ কিরদংশ বিস্মৃত হইলেন। সরলার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় স্নেহ হইয়াছিল; সরলা আজ পিতার বিস্তীর্ণ জমীদারীর উত্তরাধিকারিণী, পাপাত্মা শকুনি এক্ষণে বন্দী, সকল বিষয় আলোচনা করিয়া বিমলা মনের ক্লেশ কথ-কিৎ বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

চিন্তাশীলা কমলাও তাঁহাদিগের সহিত থাকিতেন। তিনি এক্ষণে নগেন্দ্রনাথের গৃহে বাস করেন এবং প্রত্যাহ নিজহস্তে পাক করিয়া নগেন্দ্রনাথকে খাওয়ান। নগেন্দ্রনাথ কমলার ককাতুলা স্বত্তে শ্রীত হইলেন।

ইচ্ছাপুরে আনন্দের উৎস বহিতে লাগিল, রাজা টোডরমল্ল আসিবেন বলিয়া বড় ধুমধাম ও আরোজন হইতে লাগিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—:—

জমীদারের পুল ও পুলবধু।

SHE gazed—she reddened like a rose,

Sine pale like only lily ;

She sank within my arms and cried.

“Art thou my ain dear Willie ?”

“By him who made you sun and sky.

By whom true love's reargarded,

I am the man ; and thus way still,

True lovers be rewarded.”

BURNS.

সন্ধ্যাকাল আগত। কমলা একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে ইচ্ছাপুরের নিকটস্থ যমুনা নদীর তীরে যাঁহা পড়িলেন। একাকী যমুনার তীরে বসিয়া স্বভাবের নিস্তর্র ভাব অবলোকন করিতেছিলেন, ঘন বৃক্ষাবলীর মধ্যে পুঞ্জ পুঞ্জ খজোতমালা খেলা করিতেছে, তাহাই দেখিতেছিলেন। নীল আকাশে দুই একটি শুভ্র মেঘ ভাসিয়া বাইতেছে, শান্ত নদীর উপর অনেকগুলি নৌকা ভাসিতেছে। রাজা টোডরমল্লের ইচ্ছাপুর আগমন উপলক্ষে অনেক দেশের লোক তথায় আসিতেছে।

কমলা সত্য চিন্তাশীলা, কিন্তু অল্প বয়সে কোন বিশেষ চিন্তার আভ্যুত হইয়া রহিয়াছেন; সেই নদীতীরে বসিয়া শান্ত নয়ন দুইটি কিরাইরা আকাশের দিকে একদৃষ্টে

দেখিতেছেন। তারার শাস্ত জ্যোতিঃ সেই শাস্ত নয়ন ও মুখমণ্ডলের উপর পড়িয়াছে। আল্লায়িত কেশ পৃষ্ঠদেশে লখিত রহিয়াছে, বা বদনমণ্ডল দ্বিধা আবৃত করিয়া বক্ষঃস্থলের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। বাহর উপর বদনমণ্ডল স্থাপিত রহিয়াছে। কমলা কি চিন্তা করিতেছেন ?

কমলা আজি পূর্বকালের কথা স্মরণ করিতেছেন। স্বামীর মৃত্যুর কথা তাঁহার স্মরণ হইতেছে, স্বামীর দেবমূর্ত্তি হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে। স্বামীর প্রাণের হৃদয় উদ্বেলিত হইতেছে ! বোধ হইতেছে যেন, সন্ধ্যার বায়ুর সঙ্গিত তাঁহার স্বামীর কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত বহিয়া যাইতেছে। সঙ্গীতশব্দে চমকিত হইয়া সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন ; দেখিলেন, নদীর উপর দেবাকৃতি একজন মহুয়া একখানি তরীচালন করিতেছেন এবং আকাশের দিকে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে গীত গাইতেছেন।

কমলা বার বার সেই দিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয়ে সহস্র চিন্তা জাগরিত হইতে লাগিল। আবার নৌকা-রোহী সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। আবার সে সঙ্গীত কমলার হৃদয় উদ্বেলিত করিল। এক দণ্ড ধরিয়া কমলা সে গান শুনিতে লাগিলেন। যৌবনে কমলা সে গান শুনিয়াছিলেন; গানের কথায় কথায় মাদুরীষ করিতেছে; গানের অক্ষরে অক্ষরে পূর্বস্মৃতি গ্রথিত রহিয়াছে ! এ কি স্বপ্ন, না সত্য, না পূর্বস্মৃতিমাত্র ?

আকাশে চাঁদ উঠিল। সেই নীল আকাশ, সেই অনন্ত বৃক্ষাবলী, সেই নদী আলোক-পরিপূর্ণ করিয়া চক্রে উদ্ভিত হইল। নৌকাখানি ভাসিতে ভাসিতে নিকটে আসিল। কমলা সেই চক্রেগোকে নৌকা-

রোহীর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পতিব্রতা নারী পতির কণ্ঠস্বর বিশ্বত হন না, পতির দেবমূর্ত্তি বিশ্বত হন না, বাতাহত পত্রের স্ফার কমলার দেহলতা কাপিতে লাগিল; অচিরে মূৰ্ছিতা হইয়া কমলা ভূমিতলে পতিত হইলেন।

কণেক পর কমলা চৈতন্তলাভ করিয়া দেখিলেন, সেই যৌবনের হৃদয়েখর তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সমস্ত ললাটে জলসিক্কন করিতেছেন, সম্মুখে সেই কম্পপিত ওষ্ঠ চুষন করিতেছেন। চির-হত-ভাগিনী কমলা এই সৌভাগ্যের স্পর্শে শিহরিয়া উঠিলেন, পুনরায় চক্ষু মুদিত করিলেন, মনে মনে ভাবিলেন, “ভগবান্ ! এ যদি স্বপ্ন হয়, যেন এ স্নানিদ্ৰা হৃৎতে জাগরিত না হয়।”

সেই চক্রেগোকে, সেই জনশূন্য নদীতীরে সেই নিবিড় বৃক্ষশ্রেণীর পার্শ্বে, উপেক্ষনাথ অনিমেষ-লোচনে সেই বহুপূর্বদৃষ্ট বদনমণ্ডলের দিকে বার বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সুললিত ললাট, সেই নিবিড় কৃষ্ণ ক্রমুগল, সেই স্নেহপরিপূর্ণ চিন্তাপ্রকাশ-নয়ন, সেই মধুর ওষ্ঠ ও সেই নিবড কেশরাশি, সেই উন্নতহৃদয় ও সুসৌষ্ঠব বাহু যুগল। উপেক্ষ দেখিতে দেখিতে পাগলের ছায়া হইয়া সেই হৃদয়ের প্রতিমাকে চুষন করিতে লাগিলেন। জগতের মধ্যে ভাণ্য-বতী কমলা দেবতুল্য পতিকে পাইলে-
তাঁহার পুলকিত শরীর স্বামীর আলিঙ্গন
বন্ধ, স্বামীর ওষ্ঠে তাঁহার ওষ্ঠ, স্বামীর হৃৎ
তাঁহার হৃদয়।

অনেকক্ষণ পর উপেক্ষ বলিলেন, নিশ্চয় বাসিনী কমলা ! আমার নৌকা মগ্ন হইবার পর আমি পরিজ্ঞান পাইয়াছিলাম, কিন্তু তোমাকে আর পাইব, আমার আশা ছিল

না। গ্রামে ফিরিয়া আসিলে গ্রামের লোক আমাকে বলিয়াছিল, পীড়ায় তোমার কাল হইয়াছে।”

কমলা বলিলেন, “হুবহুবর ! তোমার যুতা-সংবাদ পাইয়া আমার সঙ্কট পীড়া হইয়াছিল, কিন্তু অনেক দিন পরে নিস্তার পাইয়াছিলাম। যখন নিস্তার পাইলাম, তখন আমি বনগ্রামের আশ্রমে।”

উপেক্ষ। জগদীশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার পবিত্র নাম গ্রহণ কর। এক্ষণে আইন, তোমাকে তোমার যন্তরালের লইয়া যাই।

কমলা। আমার যন্তরালয় কোথায় ?

উপেক্ষনাথ কমলাকে লইয়া জমীদার নগেন্দ্রনাথের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। সমস্ত কথা তখন প্রকাশিত হইল, তখন জমীদার-গৃহে যে হলহুল পাড়িয়া গেল, তাহা বর্ণনা করিতে আরম্ভ অক্ষম। জমীদারের জ্যেষ্ঠপুত্রের বহুদিন পূর্বে কাল হইয়াছে। বসিয়া সকলেই স্থির করিয়াছিল; সেই জ্যেষ্ঠপুত্র আজি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন; লক্ষ্মী-স্বরূপা পুত্রবধূ গৃহ আলো করিলেন; এ সকল কথা জমীদার-গৃহ হইতে সমস্ত গ্রামে, গ্রাম হইতে সমস্ত দেশে প্রচার হইল। ইচ্ছাপুর-নগর জয়চাকের নাদে পরিপূর্ণ হইল, দিবা নিশি লোকের আনন্দ-শব্দে শব্দিত হইল।

বৃদ্ধ নগেন্দ্রনাথ বার বার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতে লাগিলেন, কস্তাভূত্যা কমলাকে পুত্রবধূ জানিয়া বার পর নাই আনন্দিত হইয়া আশীর্বাদ করিলেন।

পথে, বাটে, গৃহে, কুঠীতে শব্দধ্বনি হইতে লাগিল, আনন্দের ঢাক বাজিতে লাগিল, পুরবাসিগণ উপেক্ষনাথের উপর পুষ্প

বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত, সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্যন্ত পুয়জন ও পুরনারীদিগের আনন্দলহরী বহিতে লাগিল।

প্রাতঃকালে সুরেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠের চরণ-যুগলে প্রণিপাত করিয়া শাশ্বতোন্মেনে বলিলেন, “ভ্রাতঃ ! আপনার অজ্ঞাতবাসে আমি আপনার প্রতি মুগ্ধে। কত অশ্রুদ্রা দেখাই-রাছি, তাহা কমা করিবেন, আমি জানিতাম না, ভ্রমবশতঃ করিয়াছি।”

উপেক্ষনাথ উত্তর করিলেন, “সুরেন্দ্রনাথ! তোমার কমা চাহিবার আবশ্যক নাই। জগৎসংসারে তোমার মত ভ্রাতা ভুলভ। তোমার সাহস, বীরত্ব ও যুদ্ধকৌশলের বশে বঙ্গদেশ যেরূপ পরিপূর্ণ হইয়াছে, তোমার দয়া, প্রজাবাংল্যা ও অমায়িকতা প্রভৃতি সদৃশগুণেও আমাদের দেশ সেইরূপ পরিপূর্ণ ও আনন্দিত হইয়াছে। বাহাদুরের হাতে ক্ষমতা ও ধন থাকে, তাহার সকলেই যদি তোমার মত অমায়িক হইত, তাহা হইলে এ জগৎসংসার স্বর্গ হইত।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—
বিচার।

Behold where stands
The usurpers cured head.

Shakespeare.

রাজা টোডরমল ইচ্ছাপুরে আসিয়াছেন, আজি আনন্দে ইচ্ছাপুরবাসিগণ মত্ত হইয়াছে।

বিশ্বীর্ণ ক্ষেত্রে রাজার সভা হইয়াছে। উপরে অতি বিশীর্ণ চম্ভাতপ লম্বিত রহিয়াছে। সে পট্টবস্ত্র-নির্মিত চম্ভাতপ জরীতে ঝলমল করিতেছে। চম্ভাতপ হইতে শব্দ

গন্ধ পুষ্পমালা ভূমিতে লম্বিত রহিয়াছে ।
 ন, রক্তবর্ণ, নীল, পীত প্রভৃতি নানা প্রকার
 পুষ্পে সেই চম্ভ্রাতপ অধিকতর শোভিত
 হইয়াছে । চম্ভ্রাতপের নীচে বিস্তীর্ণ শয্যা
 রচিত হইয়াছে, সে শয্যা পারশ্বদেশীয়
 গলিচায় মণ্ডিত, স্থানে স্থানে সুন্দর পুষ্প,
 সুন্দর লতা ও অপরাপ পত্র চিত্রিত রহিয়াছে,
 এত সুন্দর যে, সহসা সেই পুষ্পলতার উপর
 পদবিক্ষেপ করিতে সঙ্কোচ হয় । সভার মধ্য-
 স্থলে একটি বিরদ-রদ ও রৌপ্যানির্মিত এবং
 সুবর্ণে অলঙ্কৃত সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে ।
 তাহার চারিপার্শ্বে বোদ্ধা ও জমীদারগণ সম-
 বেত রহিয়াছেন । মধ্যে মধ্যে স্ত্রীপাকারে
 সুগন্ধ পুষ্প সজ্জিত রহিয়াছে, চতুর্দিকে ভূতা-
 গণ বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করিয়া চামরব্যঞ্জন
 করিতেছে । জমীদার ও বোদ্ধাগণ সকলেই
 সুবর্ণ ও রৌপ্যমণ্ডিত বহুমূল্য বস্ত্রে শোভা
 পাইতেছিলেন ।

সভার তিনদিকে পদ্মাতীগণ রণসজ্জায়
 সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, তাহার
 পশ্চাতে অশ্বারোহিণিগণ নিকোষিত অসি-হস্তে
 প্রস্তরপুতানকার স্তায় নিষ্পন্দ হইয়া রহি-
 য়াছে, তাহার পশ্চাতে আবার মাতঙ্গশ্রেণী
 দণ্ডায়মান রহিয়াছে । এইরূপে তিন দিক
 সৈন্যসামন্তে বেষ্টিত । সমুখে রাজ্যের আসি-
 বার জন্ত প্রশস্ত ও অতি দীর্ঘ একটা পথ ;
 সে পথ রক্তবর্ণ মক্কুল দিয়া মণ্ডিত, তাহার
 দুই পার্শ্বে আবার সৈন্যগণ সেইরূপে সন্নি-
 বেশিত । নিকটে দ্বজবহ পদ্মাতিক পতাকা-
 হস্তে দণ্ডায়মান, তাহার পশ্চাতে অশ্বারোহী
 কৃপাণপাণি হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে ।
 তরুণ-অরুণ-কিরণে সেই নিকোষিত ধ্বজ
 বকুমকু করিয়া উঠিল, প্রাতঃকালের নীতল
 বায়ুতে সেই উচ্চ পতাকা পত পত শব্দে
 উজ্জীন হইতে লাগিল, শত যুদ্ধক্ষেত্রে যে

জয়পতাকা উজ্জীন হইয়াছিল, আজি ইচ্ছা-
 পুরে সেই জয়পতাকা উজ্জীন হইতেছে
 দেখিয়া নিবাসিগণ আনন্দে নিমগ্ন হইতে
 লাগিল, বোদ্ধাগণের হৃদয় সাহস ও উৎসাহে
 পরিপূর্ণ হইতে লাগিল ।

সুযোদয় হইবার পরই রাজা টোড়রমল্ল
 সভার শুভাগমন করিলেন, তদর্শনে সভাসদ-
 সকলেই একবাক্যে “মহারাজের জয় হউক”
 বলিয়া উঠিল । তাহার নিম্নক হইলে সৈন্য-
 গণ ক্রমান্বয়ে সেই জয়স্ততি উচ্চৈঃস্বরে উচ্চা-
 রণ করিতে লাগিল । সে জয়নাদ চতুর্দিক
 গ্রাম পর্য্যন্ত শ্রুত হইল ; বোধ হইল যেন,
 দিগন্তব্যাপী মেঘগর্জন গিরিগুহার বার বার
 প্রতিধ্বনিত হইল ।

রাজা ধীরে ধীরে সভার দিকে আসি-
 ছিলেন । তাহার দক্ষিণপার্শ্বে নগেন্দ্রনাথ ও
 উপেন্দ্রনাথ, অপর পার্শ্বে সুরেন্দ্রনাথ ।
 পশ্চাতে আর কতিপয় ব্যাতিসম্পন্ন জমীদার
 ও সৈনিকপুরুষ ধীরে ধীরে যাইতেছেন ।
 রাজা ধীরে ধীরে যাইয়া সিংহাসনোপরি
 উপবেশন করিলেন ।

তখন একেবারে শত জয়ঢাক হইতে
 রণবাণ আরম্ভ হইল ; সে সুস্রাব্য গম্ভীর
 দিগন্তব্যাপী রণবাণ গ্রামে গ্রামে শ্রুত হইতে
 লাগিল, নির্মূল প্রাতঃকালের নীল গগন-
 মণ্ডলে উদ্ভিত হইতে লাগিল । সে শব্দ
 শুনিয়া সৈনিকদিগের রণক্ষেত্রের কথা মনে
 পড়িল, একেবারে সহস্র অসি কোষ হইতে
 বজ্রনাশকে বহির্গত হইয়া রবিকিরণে ঝক-
 মক করিতে লাগিল ।

সে বাণ নিম্নক হইল, তাহার পর কত-
 রূপ দর্শন ক্রমে ক্রমে প্রদর্শিত হইল ।
 আজি দিল্লীখয়ের সেনাপতি ও প্রতিনিধি
 বদদেশ জয় করিয়া ইচ্ছাপুরে উপস্থিত
 হইয়াছেন, আজি একজন হিন্দু সেনাপতি

দেশ শাসন করিতে আসিয়াছেন, তরাং বঙ্গদেশের মধ্যে যে স্থানে যে কোন শাস্ত্রা বস্তু ছিল, তাহা রাজার সম্মুখে প্রদর্শিত হইবার জন্য সমানীত হইয়াছিল। দূরদেশ হইতে খ্যাতিসম্পন্ন নিপুণ বাতকর আপনার বাত শুনাইয়া রাজা ও সভাসদগণকে সন্তুষ্ট করিল, দেশ-বিদেশ হইতে আশু সুলভ গায়কগণ সুললিত গীতধ্বনিতে সকলের মন মুগ্ধ করিল; নর্তকীগণ আপন অতুল্য রূপরাশি বিস্তার করিয়া সুললিত স্বরে গীত গাইয়া সকলের হৃদয় অপহরণ করিল; ঐশ্বর্যজালিকগণ বিচিত্র ইন্দ্রজাল দেখাইয়া যোদ্ধাগণ অদ্ভুত মল্লযুদ্ধ প্রদর্শন করিয়া, ধাতুগুণ বিষয়কর তীর নিক্ষেপ করিয়া সভাসদগণকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিল।

অবশেষে কবি ও কথকদিগের কথকতা আরম্ভ হইল। বঙ্গদেশে তৎকালে যাহারা কবিত্ব-শক্তিতে বা কথকতায় পারদর্শী ছিলেন, সকলেই রাজার নিকট আপনাপন গুণের পরিচয় দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন, একে একে সকলেই আপনাপন নৈপুণ্য প্রকাশ করিলেন। কেহ বা বৃদ্ধের বর্ণনা দ্বারা সকলকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, কেহ বা দেবদেবীর স্তুতিপাঠ করিয়া সকলের মন ভক্তিপরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন, কেহ প্রেমের কথা আনিয়া শ্রোতাদিগের হৃদয় দ্রবীভূত করিতে লাগিলেন, আবার কেহ দুঃখের কথা বলিয়া সভাসদগণের চক্ষু জলে প্রাবিত করিতে লাগিলেন। কবিতার মোহিনী শক্তিতে যোদ্ধার হৃদয়ও গলিতে লাগিল, যোদ্ধার নয়নেও জল আসিল।

পরে রাজা আদেশ দিলেন, “আর আশোদ-প্রমোদ আবশ্যক নাই, এখনও

আমাদিগের প্রধান কার্য বাকি আছে, সন্মৌকে লইয়া আইস।”

চারি জন সৈনিক পুরুষ শত্নিকে লইয়া আসিল। তখন সুরেন্দ্রনাথ সশুধীন হইয়া বজ্রনাথে নিবেদন করিলেন, “মহারাজ! আমি মহাত্মা সমরসিংহের অনাথ্রয় বিধবা ও অনাথা কন্তার পক্ষ হইতে অভিযোগ করিতেছি, এই নরাধম রাজা সমরসিংহের নামে মিথ্যা অভিযোগ করিয়া প্রাণদণ্ড করিয়াছিল।” আমি দেওয়ান সতীশচন্দ্রের অনাথা কন্তার পক্ষ হইতে অভিযোগ করিতেছি, এই নরাধম সতীশচন্দ্রকে হত্যা করিয়াছে।”

শত্নির দোষের প্রমাণের অভাব ছিল না। শত্নি যে কাগজ জাল করিয়াছিলেন, তাহা রাজার হস্তেই ছিল, তাহা বার বার পাঠ করিয়া দেখিলেন, সেই পত্র-সকল সমরসিংহের দ্বারা পাঠান-সেনাপতিগণকে লিখিত হইয়াছিল, এইরূপ অভিযোগে সমরসিংহের প্রাণদণ্ড হয়। কিন্তু সে সকল পত্রে শত্নির হস্তাক্ষর আর সমরসিংহের মোহর; সেই মোহরের প্রকৃতিতা একটি শত্নির নিজ কক্ষে পাওয়া গিয়াছে।

তাহার পর ছয় বৎসর কাল মহাশ্বেতা যেরূপে ছিলেন, শত্নির শত শত চর যেরূপে মহাশ্বেতাকে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে তাড়না করিয়াছিল, যেরূপে মহাশ্বেতা কন্তার সহিত পরিশেষে চতুর্বেষ্টিত দুর্গের অভ্যন্তরে রুদ্ধ হন, কোন বিষয়েই প্রমাণের অভাব ছিল না। আর সতীশচন্দ্রের হত্যার কথা রাজা আপনিই জানিতেন।

তখন রাজা টোডরমল সিংহের নত গর্জন করিয়া বলিলেন, “পামর! তোর জীবন পাপরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। এখনও ভগদোষের নিকট প্রার্থনা কর, পরকালে

ভাল হইতে পারে, ইহকালে তোর পাপের মা নাই ।”

শকুনি ধীরে ধীরে বলিল, “মহারাজ, যখন আমার শত্রুদিগের কথা শুনিয়াছেন, আমার একটি নিবেদন আছে ।”

রাজা বলিলেন, “শীঘ্র নিবেদন কর, তার আর অধিক পরমামু নাই ।”

শকুনি গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিল, আমার দোষ যদি প্রমাণ হইয়া থাকে, তথাপি আমি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ অবধ্য । আপনি হিন্দুধর্মের পরম ভক্ত, হিন্দুশাস্ত্রে বিশারদ, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ অবধ্য । শত সহস্র দাঘ করিলেও ব্রাহ্মণ অবধ্য । আমি মেরাশ্রয় বন্দী, যে দিকে নিরীক্ষণ করি, সেই দিকেই আমার শত্রু ; সুতরাং আপনার রাজ্যবাসীদিগের কেহ নাই, আমাকে হায়তা করিবার কেহ নাই । এক্ষণে আপনি আমাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিলে বধ করিতে পারেন, কিন্তু তাহা হইলে শত্রুর বিরুদ্ধে কার্য্য করিবেন । প্রায় চারি ত বৎসর হইতে মুসলমান বঙ্গদেশ শাসন রিতেছে, তাহার অপকৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ও যজ্ঞ, তথাপি তাহাদের মধ্যেও বোধ হয়, কেহ ব্রাহ্মণকে বধ করে নাই । আজি রেজ্জায় একজন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী পরম-শ্রদ্ধি রাজা বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন, শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করা, ব্রাহ্মণ বধ করা তাহার শাসনের প্রথম কার্য্য হইবে ? হারাজ ! আজি আপনি যে পুণ্যকর্ম্ম করিবেন, চিরকাল তাহার যশ থাকিবে, আজি আপনি যে পাপকর্ম্ম করিবেন, চিরকাল তাহার অপযশ থাকিবে । আমি রাজ্যের বন্দী, আমাকে বধ কর। শত্রুর কার্য্য, কিন্তু রাজা টোডরমল্লের শুভ কলঙ্ক যশোরানির মধ্যে সে কর্ম্ম কলঙ্কের

স্বরূপ হইবে, রাজা টোডরমল্লের জীবনচরিত হইতে ছুরগনের কলঙ্ক শত শতাব্দীতেও বিলীন হইবে না । সমস্ত ভারতক্ষেত্রে সে কলঙ্ক রটিবে ; আমাদের নিকট হইতে আমাদের পুত্রেরা, তাহাদিগের পর আমাদের পৌত্রেরা এ কথা স্মরণ করিয়া রাখিবে । সহস্র বৎসর পরেও বালকগণ পুরাতত্ত্বে পাঠ করিবে যে, রাজা টোডরমল্ল বঙ্গদেশে আগমনের পর, প্রথমেই এক ব্রাহ্মণকে হত্যা করিয়াছেন ; সহস্র বৎসর পরে বুদ্ধেরা গল্প করিবে যে, মুসলমানদিগের সময়েও যাহা হয় নাই, রাজা টোডরমল্লের শাসনকালে তাহা হইয়াছিল— ব্রাহ্মণহত্যা হইয়াছিল । মহারাজ ! আমাদের দণ্ড দিতে পারেন, কিন্তু দেশদেশান্তরে যুগ-যুগান্তরে আপনার এ কলঙ্ক যখনীত হইবে না, ব্রাহ্মহত্যারূপ মহাপাপে আপন বিস্তীর্ণ যশোরানির মলিন হইয়া যাইবে ।”

শকুনি নিস্তব্ধ হইল । তাহার কথা শুনিয়া রাজা চিন্তাশীল হইয়া মস্তক অবনত করিলেন । সমস্ত সভা নির্বাক—নিস্তব্ধ !

সাদীক খাঁ বলিলেন, “মহারাজ ! আপনি সেনাপতি, সেনাপতির ধর্ম্ম ভুলিবেন না ; আপনি শাসনকর্ত্তা, শাসনকর্ত্তার ধর্ম্ম ভুলিবেন না । দোষীকে দণ্ডবিধান করুন ।”

রাজা উত্তর দিলেন না ।

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, “এই বিধবা ও অনাথার আপনি ভিন্ন আর কেহ নাই । ইহাদের বিচার করুন, দোষীকে দণ্ড দিন । দেওয়ান সতীশচন্দ্র ব্রহ্মাকালে আপনার নিকট বিচারপ্রার্থনা করিয়াছিলেন, আপনি তাহার হত্যার বিচার করুন ।”

রাজা উত্তর দিলেন না ।

মভাসদগুণ বলিল, “মহারাজ ! আপনি শিষ্টের পালন করিবেন, দুষ্টের দমন করি-

বেদ। আপনি শাস্তি না দিলে এই মহাপাপীকে কে দণ্ড দিবে ?”

রাজা উত্তর দিলেন না।

ইতিমধ্যে সেই সভার কিছু দূরে একটা অতিশয় গোলমাল হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে একজন দীর্ঘকায়, শীর্ণকলেবর, কৃষ্ণবর্ণ, মলিনবেশ স্ত্রীলোক সেই সভার নিকট বোড়িয়া আসিল; চীৎকার শব্দ করিয়া ক্রমিতে পতিত হইল। সে বিবেচনায় পাগলিনী।

শকুনি এতক্ষণ স্থিরভাবে ছিল, কিন্তু পাগলিনীকে দেখিয়া একেবারে কম্পিতকলেবর হইল। পাগলিনী দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিল, “মহারাজ! আমাকে রক্ষা করুন। পামর আমার মাতাকে বধ করিয়াছে। আমি তাহা স্বক্ষেপে দেখিয়াছি। আমার মাতার বিকট মুখ এখনও দেখিতে পাইতেছি, আমি তাহার বিচার প্রার্থনা করি।”

সকলে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসা করার পাগলিনী রহিয়া রহিয়া আত্মবিবরণ দিতে লাগিল।

পাগলিনী গোপকন্ডা, তাহার মাতা গ্রামের মধ্যে স্কন্দরী ছিল, স্কন্দরী গোপ-বিধবাকে দেখিয়া একজন ব্রাহ্মণ মোহিত হন। তাঁহার গুরুর সেই গোপস্বীর গর্ভে শকুনির জন্ম হয়।

শকুনির পিতা বহু দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন সে গোপবনিতা ও তাহার পুত্র-স্বামীর গুরুর সজাত কন্যা বিবেচনাকে লালন-পালন করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার মৃত্যুর পর শকুনি অল্প বিঘের উত্তরাধিকারী হয়। সকলে তাহাকে জারজ বলাতে শকুনি অল্পবয়সে অতিশয় ক্ষুদ্র হইল; মাতার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিত ও গ্রহণ করিত।

সে বিধবা অচিরে শরীরের ও মনের ক্লেশে পীড়িত হইল, সেই পীড়ায় প্রাণ হারাইল। বিবেচনায় পলাইল, মাতার মৃত্যু হইতে পাগলিনী হইল। শকুনি এই মহাপাতকের পর দেশ ত্যাগ করিয়া সতীশচন্দ্রের গৃহে ব্রাহ্মণপুত্র বলিয়া আপনায় পরিচয় দিল।

বিবেচনায় প্রাণভয়ে অনেক দিন অবধি দেশদেশান্তরে লুকাইয়া বেড়াইত। অবশেষে যে দিন বনগ্রাম হইতে মহাশেষতা ও সরলা চতুর্কেষ্টিত দুর্গে বন্দীরূপে নীত হন, সেই দিন বিবেচনায়ও বন্দীরূপে চতুর্কেষ্টিত দুর্গে নীত হয়। পাছে বিবেচনায় শকুনির জন্মের কলঙ্কের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করে, সেই কল্প তাহাকে চতুর্কেষ্টিত দুর্গের মধ্যে এত দিন বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল।

এক্ষণে শকুনি বন্দী হইলে পর বিবেচনায় সেই কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু কারাগারে তাহাকে যে কষ্টে রাখা হইয়াছিল, তাহাতে তাহার শরীর কেবল অস্থিচর্খ অবশিষ্ট ছিল। তাহাকে দেখিয়াও তাহার সমস্ত কথা শুনিয়া সভাসদগণ ক্রোধে গর্জন করিয়া উঠিলেন।

শকুনি দেখিলেন, আর পরিচয় নাই। স্থিরপ্রতিজ্ঞ প্রস্তুতমতি শকুনি তখন নির্ভয়ে শেষ উপায় অবলম্বন করিল; ধীরে ধীরে বস্ত্রে লুক্কায়িত ছুরিকা বাহির করিয়া সমস্ত সভাসদসমক্ষে আপনাকে আঘাত করিল। ছিন্ন তরুর ত্রায় শকুনির মৃতদেহ ভূতলে পতিত হইল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

—•—

অজু রায়-প্রতিদান ।

WHY lea the sticken deer go weep,
The hart ungalled play,
While some must watch

while some must sleep.

Thus runs the world away.

Shakespeare.

উপরি-উক্ত ঘটনার কিছু দিন পরেই রাজা চৌভরমল্ল ইচ্ছাপুর পরিত্যাগ করিয়া প্রতিগমন করিলেন। নগেন্দ্রনাথ পুত্রদিগকে জমিদারীর ভার দিতে ইচ্ছা করিলেন, পিতার অমুরোধে উপেন্দ্রনাথ ইচ্ছাপুরের জমিদারীর ভার লইলেন, সুরেন্দ্রনাথ চতুর্কোষিত জমিদারীর ভার লইলেন।

সুরেন্দ্রনাথ সরলাকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার পূর্বের মত প্রজাবাসল্য, পূর্বের মত অমায়িকতা এখনও রহিল। এখনও ছদ্মবেশে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া প্রজা-দিগের অবস্থা জানিতেন, সাধ্যমতে সে অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে যতবান হইতেন।

সুরেন্দ্রনাথ পুরাতন বন্ধু নবীন দাসকে আগনার দেওয়ান করিলেন; রুদ্রপুরে বিশ্বেশ্বরী পাগলিনী অমলার হাত দেখিয়া বাহা বলিয়া দিয়াছিল, তাহা যথার্থ হইল, অমলা দেওয়ানের গৃহিণী হইলেন। অমলা সরলাকে সেইরূপ ভয়ীর ছায় ভালবাসিতে লাগিলেন, তাঁহার পুরাতন বন্ধু ইন্দ্রনাথের সহিত সেইরূপ আমোদ-রঙ্গ করিতেন।

আমাদের টচ্ছা, এই স্থানে আধ্যাত্মিক শেষ করি; কিন্তু জগতে সকলের কপালে সুখ ঘটে না, কাহারও কপালে সুখ থাকে, কাহারও কপালে দুঃখ থাকে, দুই একটি দুঃখের কথা না বলিয়া শেষ করিতে পারি না।

পাঠক-বহাশয় জানেন, শত্রুজিৎসাই মহাশেভার জীবনের গ্রন্থরূপ হইয়াছিল বুঝাবস্থায় যে চিন্তায় ছয় বৎসর কাল আন্ত-ভূত ছিলেন, সেই চিন্তা তাঁহার জীবনের প্রতিকৃতিস্বরূপ, জীবনের অবলম্বনস্বরূপ হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে সে চিন্তা শেষ হইল, জীবনের গ্রন্থি শিথিল হইল, সরলার বিবাহের কয়েক দিন পর কোন রোগ কি পীড়া বিনা মহাশেভা কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

আর বিমলা? উন্নতচরিত্রা, ধর্মপরায়াণা, রূপলাবণ্যসম্পন্ন বিমলার কি হইল? যে দিন বিমলার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল, সেই দিন তাঁহার হৃদয় শূন্য হইয়াছিল; সেই দিন অবধি বিমলার পক্ষে জগৎ-সংসার অন্ধকার-ময় হইয়াছিল। সেই দিন অবধি বিমলারী কোন আশা ছিল না, কোন ভরসা ছিল না, কোন সুখের অভিলাষ ছিল না, কোন দুঃখের ভয় ছিল না। মানবজাতি যে মায়াজালে জড়িত হইয়া জগতে সুখ-দুঃখ অমুভব করে, বিমলার সে মায়াজাল ছিন্ন হইয়াছিল।

প্রিয়সখী সরলার বিবাহের পর বিমলা বনগ্রামের মহেশ্বর-মন্দিরে চলিয়া গেলেন সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে চতুর্কোষিত দুর্গে অধিষ্ঠাত্র হইয়া থাকিতে অনেক অমুরোধ করিলেন; সরলা প্রিয়সখীর হাত ধরিয়া অনেক সাধ্য-সাধনা করিল; কিন্তু বিমলা সহাস্তবদনে কহিলেন, “সংসারে আমার লীলা-খেলা সাক্ষ হইয়াছে, আমাকে ছাড়িয়া দাও।” অগত্যা সুরেন্দ্রনাথ ও সরলা বিমলাকে বিদায় দিলেন।

বিমলা বনগ্রামের মহেশ্বর-মন্দিরে গিয়া গেলেন; শরীরে হারিদ্রবাস ধারণ করিলেন, কঠে রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিলেন, দিবারাত্রি মহেশ্বরের স্তব করিতেন এবং গ্রামের দরিদ্র-দুঃখিনীকে প্রাণপণে সাহায্য

করিয়া পুণ্য জীবন বাশন করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রশেখর এই পুণ্যভূমী তাপসীকে মা বলিয়া ডাকিতেন, আশ্রমের সকলে তাঁহার মায়া, বাৎসল্য ও পরোপকারিতা দেখিয়া তাঁহাকে ভক্তি ও পূজা করিতে লাগিল। আশ্রমবাসিনী বিমলার পুণ্যজীবন পবিত্র স্রুথে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

কয়েক মাস এইরূপে অতিবাহিত হইল। তৎপরে সরলা একদিন বিমলার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত মহেশ্বর-মন্দিরে আসিল, পিতা চন্দ্রশেখরের নিকট আসিয়া প্রণিপাত করিল।

যোগিনীবেশধারিণী বিমলার হাত ধরিয়া স্নেহময়ী সরলা আব্দ আব্দ করিয়া অশ্রুজল ভাগ করিতে লাগিল; চক্ষু মুছিয়া বলিল, “দিদি, আমার কষ্টের দিন, বিপদের দিন, তুমিই আমার প্রতি স্নেহ করিয়াছিলে। আজ কি আমি তোমার জন্ত কিছু করিতে পারি না?”

শান্তনয়না শাস্তবদনা বিমলা সহাস্তমুখে উত্তর করিলেন, “সরলা, তুমি স্নেহময়ী, তোমার মায়ার শরীর, কিন্তু আমার এমন কি প্রয়োজন বল? এই শান্ত আশ্রম অপেক্ষা ভগতে কোথায় সুখের স্থান আছে? পিতা চন্দ্রশেখর অপেক্ষা স্নেহপরায়ণ স্বজন কোথায় পাইব? দুঃখের সময়, চিন্তার সময়, স্বয়ং দেবদেব মহেশ্বর আমাকে সাহায্য করেন, তাঁহার নিয়মালুপ্তিনী হইলে আমি এ জগতে ক্লেশ পাইব না, পরন্তু শান্তিলাভ করিব।”

দুই সপ্তাহে অনেক প্রকার কথাবার্তা

দ্বারা সমস্ত দিন অতিবাহিত করিলেন। আশ্রমের মধ্যে যে যে স্থানে সরলা পূর্বে পদচারণ করিতে ভালবাসিত, সেই সেই স্থানে প্রিয়সখী বিমলাকে সঙ্গে লইয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় সরলা বিমলার নিকট বিদায় লইয়া শিবিকা আরোহণ করিল। বিমলা সখীর সঙ্গে সঙ্গে শিবিকা পর্যন্ত আসিয়া হাসিয়া বলিল, “সরলা, এখন তুমি রাজ্যরাণী, এখন কি দারুণ আশ্রমবাসিনীকে মনে থাকিবে?”

সরলা। দিদি, তোমাকে কি আমি ভুলিতে পারি?

বিমলা। সরলা! তোমার স্নেহের শরীর। তুমি আমাকে কখনও ভুলিবে না, তাহা জানি; তথাপি একটি স্মরণচিহ্ন তোমার নিকট রাখিব, তাহাতে না বলিও না।

এই বলিয়া বিমলা কণ্ঠমালা হইতে ধীরে ধীরে একটি স্বর্ণের অঙ্গুরীয় খসাইয়া সরলার অঙ্গুলে পরাইয়া দিলেন। সরলা বিস্মিত হইয়া বলিল, “এ কি দিদি? এ যে স্বর্ণের অঙ্গুরীয়! এ আমি লইব না। তোমার পৈতৃক সম্পত্তির অবশিষ্ট ছই এ আমি গহনা বাহা আছে, তাহা কি আমি লইতে পারি? সে সমস্ত তোমারই নিকট শোভা পায়।”

বিমলা একটু হাসিয়া বলিলেন, “সরলা, এ অঙ্গুরীয় আমার পৈতৃক সম্পত্তি নহে, ইহাতে আমার আধিকার নাই। তুমি ইহার অধিকারিণী; আজীবন এই অঙ্গুরীয় ধারণ করিও, জগদীশ্বর তোমাকে স্রুথে রাখুন।”

সন্ধ্যার ছায়াতে ধীরে ধীরে বিমলা আপন কুটীরান্তিমুখে প্রস্থান করিলেন।

End

উপহার ।

স্বদেশহিতৈষী শ্রীশুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

প্রিয়সুহৃৎ শুরেন্দ্র !

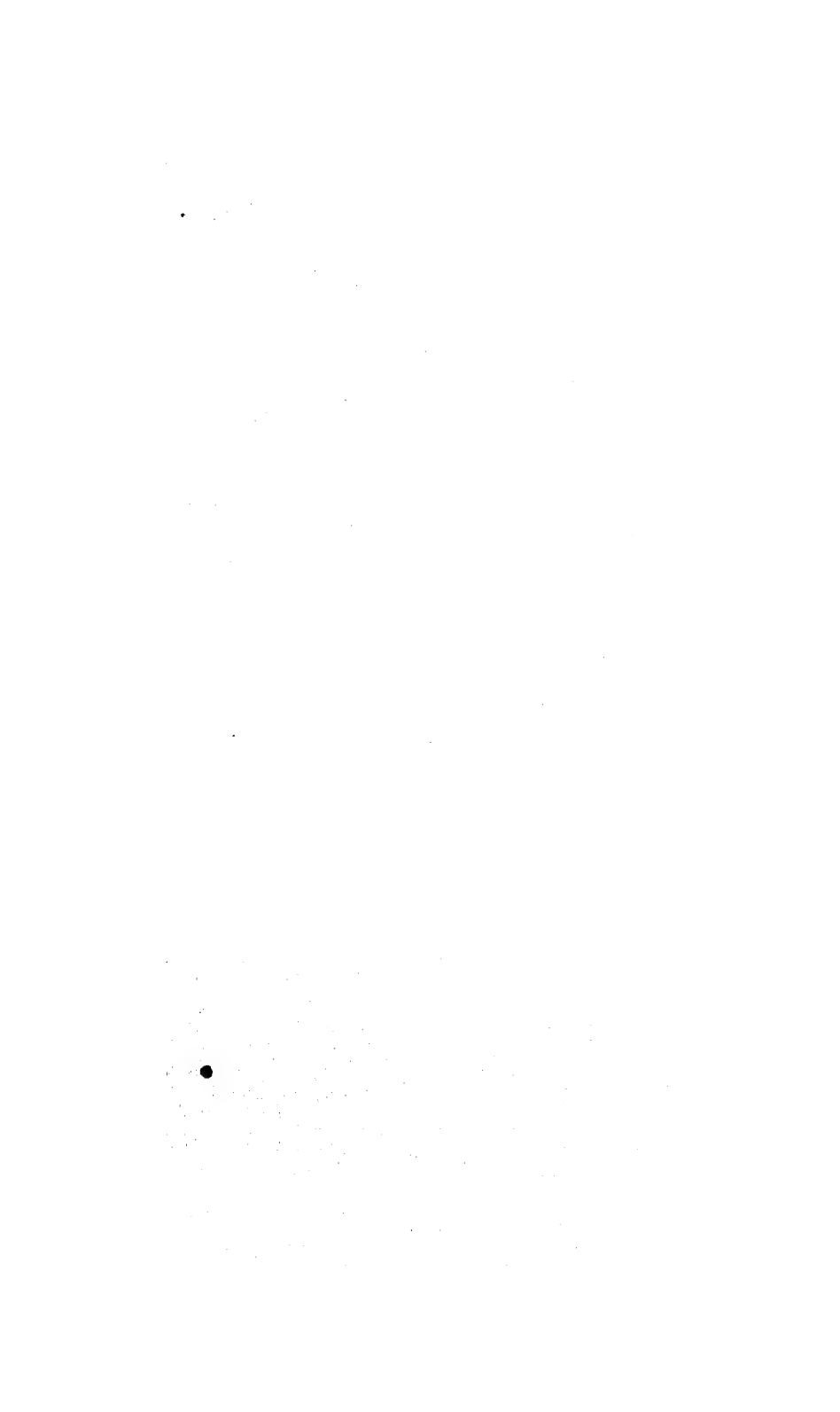
নয় বৎসর গত হইল, তুমি, সুহৃৎবর বিহারীলাল! আমি এই তিন জনে একদিন প্রাতঃকালে মাতৃভূমির নিকট বিদায় লইয়া একত্রে, একই উদ্দেশ্যে, বহুসমুদ্র-পার বিদেশযাত্রা করিয়াছিলাম। আমাদের জীবনের মধ্যে এই স্বর্ণীয় দিনটি স্মরণ করিয়া অগ্নি পুস্তকখানি তোমাকে অর্পণ করিলাম। অগ্নি আমরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কার্যে ব্রতী হইয়াছি, তুমি যে ব্রত ধারণ করিয়াছ, তাহা অপেক্ষা মহত্তর ব্রত জগতে আর নাই। মহৎকার্যে সফল হও, এই মঙ্গলাকাজ্জ্বল্য সহিত এই সামান্য পুস্তকখানি তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম।

কৃষ্ণনগর,

১২৮৩ বঙ্গাব্দ

}

তোমার স্নেহাভিলাষী
শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত ।



মাধবীকঙ্কণ

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

বালক-বালিকা ।

All the world's a stage.
And all the men and women merely playars,
They have their exits and their entrances.
Shakespeare.

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বীরনগর গ্রামে গ্রীষ্মঋতুর একদিন সাংকালে গঙ্গাসৈকতে দুইটি বালক ও একটি বালিকা ক্রীড়া করিতেছে । লক্ষ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হইয়া গ্রাম, প্রান্তর ও প্রশস্ত গঙ্গানদী আচ্ছাদন করিতেছে । জলের উপর কয়েকখানি পোত ভাসিতেছে, দিনের পরিলক্ষ্যের পর নাবিকেরা রক্তনাদিতে বাস্ত রহিয়াছে, পোত হইতে দীপালোক নদীর চঞ্চল বক্ষে বড় সুন্দর নৃত্য করিতেছে । বীরনগরের নদীকূলস্থ আম্র-কানন অন্ধকার হইয়া ক্রমে নিস্তরু ভাব ধারণ করিতেছে । কেবল বৃক্ষের মধ্য হইতে স্থানে স্থানে এক একটি দীপশিখা দেখা বাইতেছে, আর সময়ে সময়ে পর্ণকুটীরাবলী হইতে রক্তনাদি সংসার-কার্যসম্বন্ধীয় কুষক-পত্নীদিগের কণ্ঠস্ব শুনা বাইতেছে । কুষক-গণ লাজল লইয়া ও গঙ্গার পাল হাঘারব করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করিতেছে । ষাট হইতে স্ত্রীলোকেরা একে একে সকলেই কলস লইয়া চলিয়া গিয়াছে, নিস্তরু অন্ধকারে বিলাল শান্ত প্রবাহিণী

ভাগীরথী সমুদ্রের দিকে বহিয়া যাঁহিতেছে । অপর পার্শ্বে প্রাণ্ড বালুকাট ও অসীম কান্তার অন্ধকারে দৈবৎ দৃষ্ট হইতেছে । গ্রীষ্ম-পীড়িত ক্রান্ত জগৎ স্নানকালে নিস্তরু ও শান্ত ।

তিনটি বালকবালিকায় ক্রীড়া করিতেছে । বালিকার বয়ঃক্রম নয় বৎসর হইবে । ললাট, বদনমণ্ডল ও গণ্ডস্থল বড় উজ্জল, তাহার উপর নিবিড় কৃষ্ণকেশগুচ্ছ পড়িয়া বড় সুন্দর দেখাইতেছে । হেমলতার নয়নের তারা দুটি অতিশয় কৃষ্ণ, অতিশয় উজ্জল ; সুন্দরী চঞ্চলা বালিকা পরীকান্তার মত সেই নৈশ গঙ্গাতীরে খেলা করিতেছে ।

কনিষ্ঠ বালকটির বয়ঃক্রম একাদশ বৎসর হইবে, দেখিলেই বেন হেমলতার জাতা বলিয়া বোধ হয় । মুখমণ্ডল সেইরূপ উজ্জল, প্রকৃতি সেইরূপ চঞ্চল । কেবল উজ্জল নয়ন দুটিতে পুরুষোচিত তেজোরশি লক্ষিত হইত ও উন্নত প্রশস্ত ললাটের শিখা এই বয়সেই কখন কখন ক্রোধে ক্ষোভ হইত । নরেন্দ্রকে দেখিলে তেজস্বী ক্রোধপরবশ বালক বলিয়া বোধ হয় ।

শ্রীশচন্দ্র ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক, কিন্তু মনুষ্যের গম্ভীর ভাব ও অবিচলিতস্থির বুদ্ধির চিহ্ন বালকের মুখমণ্ডলে বিরাজ করিত । শ্রীশচন্দ্র বুদ্ধিমান, শান্ত, গম্ভীরপ্রকৃতি বালক ।

দুইটি বালকে বালুকার গৃহ নির্মাণ করিতেছিল, কাহার ভাল হয়, হেমলতা

দেখিবে। নরেন্দ্র গৃহ-নির্মাণে অধিকতর চতুর, কিন্তু চকল; হেম যখন নিকটে পাড়ায়, নরেনের ঘর ভাল হয়; আবার হেম শ্রীশের ঘর দেখিতে গেলেই নরেন রাগ করে, বালুকাগৃহ পড়িয়া যায়। মহা বিপদ, হুই তিনবার উৎকৃষ্ট ঘর পড়িয়া গেল।

হেম এবার আর শ্রীশের নিকট যাবে না, সত্য যাবে না, যথার্থ যাবে না, নরেন। আর একবার ঘর কর। নরেন মতা আচ্ছাদে চক্কর জল মুছিয়া ঘর আরম্ভ করিল।

ঘর প্রায় সমাধা হইল। হেম ভাবিল, “নরেনের ত জয় হইবে, কিন্তু শ্রীশ একাকী আছে, একবার উহার নিকট না যাইলে কি মনে করিবে?” কেশগুচ্ছগুলি নাচাইতে নাচাইতে উজ্জল জলহিল্লোলের স্রায় একবার শ্রীশের নিকটে গেল। শ্রীশ ক্ষিপ্তহস্ত নহে, বালুকাগৃহ নির্মাণে চতুর নহে, কিন্তু ধৈর্য ও হৃদ্যবলে একপ্রকার গৃহ করিয়াছে, বড় ভাল হয় নাই।

নরেন একবার গৃহ করে, একবার হেমের দিকে চাহে। রাগ হইল, হাত কাপিয়া গেল, উত্তম গৃহ পড়িয়া যাইল। ফুক হইয়া বালুকা লইয়া হেম শ্রীশের গারে হুড়কিয়া দিল। শ্রীশের জিত, ঘর হইল না।

নরেন্দ্রনাথ, সাবধান! আজ বালুকা-গৃহ নির্মাণ করিতে পারিলে না, দেখো, যেন সংসার-গৃহ ঐরূপে ছারখার হয় না। দেখো, যেন জীবন-খেলায়, শ্রীশচন্দ্র তোমাকে হারাইয়া বিষয় ও হেমলতাকে জিতিয়া পর না!

নরেন্দ্রনাথের ক্রোধধ্বনি শুনিয়া খাট হইতে একটি সপ্তদশ-বর্ষীয়া বিধবা স্ত্রীলোক টিয়া আসিল। তিনি শ্রীশের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। শ্রীশ শৈবলিনী।

শৈবলিনী আসিয়া আপন ভ্রাতাকে

তিরস্কার করিল। শ্রীশ ধীরে ধীরে বলিল, “না দিদি, আমি কিছুই করি নাই, নরেন ঘর করিতে পারে না, সেই জন্ত কাদিতেছে, হেমকে জিজ্ঞাসা কর।” “তা না পারুক, আমি নরেনের ঘর করিয়া দিব” এইরূপ সাঙ্ঘনা করিয়া শৈবলিনী চলিয়া গেলেন। শ্রীশ দিদির সঙ্গে চলিয়া গেল।

হেম ও নরেনের কলহ শীঘ্র শেষ হইল।

হেম নরেনের ক্রন্দন দেখিয়া সজলনয়নে বলিল, “ভাই, তুমি কাদ কেন? আমি একটবার শ্রীশের ঘর দেখিতে গিয়াছিলাম, তোমারই ঘর ভাল হইয়াছিল, তুমি ভাবিলে কেন? তোমার কাছে অনেকক্ষণ ছিলাম, শ্রীশের কাছে একবার গিয়াছিলাম বৈ ত নয়। তুমি ভাই রাগ করিও না, তুমি ভাই কাদ কেন?” নরেন কি আর রাগ করিতে পারে? নরেন কি কখন হেমের উপর রাগ করিয়া থাকিতে পারে?

তাহার পর বালক-বালিকার কি কথা?

আকাশে কেমন তারা ফুটিয়াছে! ওগুলো কি ফুল, না মাণিক? নরেন যদি একটি কুড়াইয়া পায়, তাহা হইলে কি করে? তাহা হইলে গাথাইয়া হেমের গলায় পরায়! ঐ দেখ, চাঁদ উঠিবার আগে কেমন রাঙ্গা হইয়াছে! ও আলোকোখা হইতে আসিতেছে? বোধ হয়, নদী পার হইয়া থাকি যাইলে ঐ আলো ধরা যায়। না, তাহা হইলেও পারের লোকে ধরিত। বোধ হয়, নোকা করিয়া অনেক দূর যাইতে যাইতে চাঁদ যে দেশে উঠে, তথায় যাওয়া যায়, সে দেশে কি রকম লোক, দেখিতে ইচ্ছা করে। নরেন বড় হইলে একবার যাবে, হেম, তুমি সঙ্গে যেও

বালক-বালিকার কথা কহিতে থাকুক, আমরা এই অবসরে তাহাদের পরিচয় দিব। এই সংসারে বয়োবৃদ্ধ বালকবালি-

আর বখন সায়াংকালে শান্ত নিস্তর নদীর
প্রশস্ত বক্ষে চন্দ্রতারাভিভূষিত স্বর্গের প্রতি-
বিম্ব দেখিয়া ভগবানের কথা মনে পড়িত,
যিনি চন্দ্র, তারা ও নদী সৃষ্টি করিয়াছেন,
যিনি পক্ষীকে শাবক দিয়াছেন ও শৈবকে শ্রীশ
দিয়াছেন, সেই ভগবানের কথা মনে পড়িত,
তখনই শৈবলিনীর হৃদয় অনন্ত প্রেমে সিক্ত
হইত। শৈবলিনীর স্বামী বা পুত্র নাই;
শৈবলিনীর প্রেমের একমাত্র ভাগী কেহ ছিল
না, সুতরাং বর্ষাকালের নদী-স্রোতের ছায়
শৈবের স্নেহবারি চারিদিকে বহিয়া
যাইত। গ্রামের সমস্ত বালকবালিকাকে
শৈব বড় ভালবাসিত; শৈব অনাথা, দরিদ্র-
দিগের সমভূষিনী; পশুপক্ষীও শৈবের
প্রেমের ভাগী; জগতে শৈবলিনীর ছায়
প্রেমিক আর কে আছে? জগৎ যেরূপ
বিস্তারিত, সমুদ্র যেরূপ গভীর, আকাশ
যেরূপ অনন্ত, শৈবলিনীর প্রেম সেইরূপ
বিস্তারিত, গভীর, অনন্ত।

এইরূপে কিছু কাল অতীত হইলে শৈব-
লিনীর মাতার কাল হইল; দীর্ঘ-স্বভাব,
রূপবান, উদ্রবংশজাত শ্রীশচন্দ্রকেও নব-
কুমার আপন কস্তুর সন্নিহিত বিবাহ দিবার
ইচ্ছায় বীরনগরে লইয়া গেলেন। যাহাদের
জন্ত শৈবলিনী স্বস্তরগৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন,
তাহারা না থাকায় শৈবলিনী পুনরায় গুপ্তরা-
লয়ে গেলেন ও তথায় বাস করিতে
লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বালিকা কাহার ?

If love be folly the severe divine,
Has felt folly though he censures mine.
Dryden.

পূর্বোক্ত ঘটনাবলীর পর চারি বৎসর
কাল অতিবাহিত হইল। বৎসরে ক্রিপ

পরিবর্তন হয়, পাঠকমহাশয় তাহা অনুভব
করিতে পারেন।

শ্রীশচন্দ্র এক্ষণে সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমের
যুবক, দীর্ঘ, শান্ত, বিচক্ষণ, ধর্ম্মশরারণ।
তাহার প্রশস্ত উদার মুখমণ্ডল ও উন্নত অবয়ব
দেখিলেই তাহার গভীর প্রকৃতি ও স্থিরবুদ্ধি
জানিতে পারা যায়।

নরেন্দ্র পঞ্চদশ বর্ষের উগ্র যুবা, শ্রীশ
অপেক্ষাও উজ্জল গৌরবর্ণ, উন্নতকায় ও
তেজস্বী, কিন্তু অতিশয় উগ্র, ক্রোধপরবশ ও
অসহিষ্ণু। নবকুমারের যুগ্ম সে সহ্য করিতে
পারিত না, শ্রীশচন্দ্রের যথার্থ গুণের কথাও সে
সহ্য করিতে পারিত না, সর্বদা তাহার মুখ-
মণ্ডল রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিত। এখনও
পর্যন্ত যে নরেন্দ্র এ সমস্ত সহ্য করিয়াছিল,
সে কেবল হেমলতার জন্ত। মরুভূমিতে এক-
মাত্র প্রস্রবণের ছায় হেমলতার অমৃতমাখা
মুখখানি নরেন্দ্রের উত্তপ্ত হৃদয় শান্ত ও
শীতল করিত, হেমলতার জন্ত নবকুমারের
তিরস্কারও সহ্য করিত, আপন বিজাতীয়
ক্রোধ সংবরণ করিত।

হেমলতা জ্যৈষ্ঠদশবর্ষের বালিকা।
আকাশে প্রথম উষাচিহ্নের ছায় প্রথম
যৌবনচিহ্ন হেমলতার শরীরে প্রকাশ পাই-
তেছে। নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাশি লম্বমান
হইয়া বক্ষঃস্থল ও গণ্ডস্থল আবরণ করি-
তেছে। উজ্জল গৌরবর্ণ যৌবনারম্ভে অধিক-
তর উজ্জল আভাষ প্রকাশ পাইতেছে।
সুন্দর আয়ত নয়ন দুটি বাল্যকালস্থলভ
চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে দীর্ঘ শান্ত-
ভাব ধারণ করিতেছে, সমস্ত অবয়বও ক্রমে
পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে।

সেই গঠিত, কুসুম-বিনিমিত শরীরে কি
নব নব ভাব প্রকাশ করিতেছে, তাহা বর্ণনায়
আমরা অক্ষম, তবে হেমলতার আচরণে যাহা

লক্ষিত হয়, তাহাই বলিতে পারি। হেম এখনও নরেন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে বড় ভালবাসে, কিন্তু বালিকা অগোবদনে ধীরে ধীরে কথা কহে, ধীরে ধীরে নরেন্দ্রের মুখের দিকে নয়ন উঠাইয়া আবার মন্তক অবনত করে। আহা, সেই আশ্রিত নয়ন দুইটি নরেন্দ্রের মুখের উপর চাহিতে বড় ভালবাসে। সেই বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয় নরেন্দ্রের কথা ভাবিতে বড় ভালবাসে। যখন সায়ংকালে

নৌকা আরোহণ করিয়া গঙ্গার প্রাশস্ত বক্ষে ইতস্ততঃ বিচরণ করে, বালিকা গবাক্ষপার্শ্বে বসিয়া স্থিরনয়নে তাহাই দেখে; যখন নৌকা অনেক দূর ভাসিয়া যায়, সন্ধ্যার অপরিষ্কৃত আলোকে যতদূর দেখা যায়, বালিকা সেই গঙ্গার অনন্ত স্রোত নিরীক্ষণ করে। সন্ধ্যার পর বাটী আসিয়া যখন নরেন্দ্র “হেম” বলিয়া কথা কহিতে আইসে, তখন সেই আনন্দদায়িনীর কথায় হেমের হৃদয় ঈষৎ নৃত্য করিয়া উঠে। যখন চুই এক দিনের জন্তও নরেন্দ্র ভিন্নগ্রামে গমন করে, প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়ংকালে হেম অন্তমনা হইয়া থাকে।

তথাপি হেমের মনের কথা কেহ জানে না। কপোতী যেরূপ আপন শাবকটিকে অতি যত্নে কুলারে লুকাইয়া রাখে, বালিকা নূতন ভাবটিকে অতি সঙ্কোপনে হৃদয়ের হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিত। বালিকা নিজে সে ভাবটি ঠিক বুঝিতে পারে না, না বুঝিয়াও সে প্রিয়ভাবটি সত্যে জগতের নিকট হইতে সঙ্কোপন করিত।

বৃদ্ধ নবকুমার হেমকে এখনও বালিকা মনে করিতেন, উদার সরল মুখখানি দেখিলে কেনই বা না মনে করিবেন? বিবাহ হিলে একমাত্র কস্তা পরের হইবে, এই ভয়ে যত দিন পারিলেন, বিবাহ না দিয়া রাখিলেন।

শ্রীশচন্দ্রও হেমের হৃদয়ের পরিচয় পাইল না, কিরূপেই বা পাইবে? হেম তাহার সহিত সর্বদাই একপটে সরল-হৃদয়ে নিঃসঙ্কোচে কথা কহিত। শ্রীশচন্দ্রের নিকট প্রত্যহ কিছু কিছু পড়িতে শিখিত, পাঠ বলিয়া লইত, পড়া হইলে পড়া দিত, যত্নের সহিত শ্রীশচন্দ্রের উপদেশবাক্য গ্রহণ করিত। নরেন্দ্র পড়াইতে আসিলে বালিকা মনস্থির করিতে পারিত না, নরেন্দ্র পড়া লইতে আসিলে বালিকা ভাল করিয়া বলিতে পারিত না, সমস্ত ভুলিয়া যাইত। সংসারকাণ্ডের তাবৎ ঘটনাই হেম শ্রীশচন্দ্রের নিকট বলিত, শ্রীশের উপদেশ ভিন্ন কোন কার্য্য করিত না। নরেন্দ্র উপদেশদাতা নহেন, নরেন্দ্র আসিলে অল্প কথা হইত অথবা অনেক সময় কথা হইত না। সুতরাং শ্রীশ মনে করিত যে, বালিকার হৃদয়ে যেটুকু প্রণয় বা স্নেহ আছে, তাহা শ্রীশকেই অবলম্বন করিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

*Death only death can break the last link.
Chain pope.*

এইরূপে কিছু কাল অতিবাহিত হইল। একদিন সায়ংকালে শ্রীশ ও নরেন্দ্র একখানি নৌকায় আরোহণ করিয়া গঙ্গার বিচরণ করিতেছিল। নরেন্দ্র আপন বলপ্রকাশ অভিলাষে দ্রুতকৌ উঠাইয়া দিয়া ছুই হস্তে ছুইটি দাঁড় ধারণ করিয়া নৌকা ফ্লাক্‌কৈতেছে, শ্রীশ স্থিরভাবে বসিয়া প্রকৃতির সায়ংকালীন শোভা দর্শন করিতেছিল। শ্রীশ ও নরেন্দ্রের মধ্যে কখনই যথার্থ প্রণয় ছিল না, অল্প অল্প কথা লইয়া তর্ক হইতে লাগিল। নরেন্দ্রের হস্ত হইতে সহসা একটি দাঁড় অলিত হওয়াতে নরেন্দ্র

পড়িয়া গেল, শ্রীশ উচ্চহাস্ত হাসিয়া বলিল, “তাহার কাজ, তাহাকে দাও, বীরষে আব-
শ্যক নাই।”

সেই সময়ে তীরস্থ অষ্টালিকা হইতে
হেমলতা দেখিতেছিল, হেমলতার সম্মুখে
অপদস্থ হইয়া নরেন্দ্র মর্শাস্তিক কষ্ট পাইয়া-
ছিল, তাহার উপর শ্রীশের রহস্যকথা সহ
হইল না, অশিশয় কঠোর উক্তি প্রত্যুত্তর
করিল। ক্রমে বিবাদ বাড়িতে লাগিল,
নরেন্দ্র অতি নীচ ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া
উঠিল এবং অত্যন্ত কটুভাষায় শ্রীশকে তির-
স্কার করিল। শ্রীশ এবার ক্রোধ সংবরণ
করিতে পারিল না, বলিল, “তোমার মত
অভদ্র লোকের সহিত কলহ করিলেও অপ-
মান আছে।”

এই অপমানসূচক কথায় নরেন্দ্রের ললা-
টের শিরা ক্ষীত হইল, নয়ন প্রজ্জ্বলিত হইল,
সে শ্রীশকে প্রহার করিতে উঠিল; শ্রীশও
উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্রুদ্ধ জ্ঞানশূন্য নরেন্দ্র সহসা
শ্রীশকে ঠেলিয়া জলে ফেলিয়া দিল। “বাবু
জলে পড়িল, জলে পড়িল” বলিয়া মাঝারা
শব্দ করিয়া উঠিল, একজন বাঁপ দিয়া জলে
পড়িল এবং শ্রীশকে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায়
নৌকায় উঠাইল।

সন্ধ্যার সময় নবকুমার নরেন্দ্রকে ডাকা-
ইয়া যথেষ্ট ভৎসনা করিয়া বলিলেন, “তুমি
না কি শ্রীশকে আজ গঙ্গার জলে ফেলিয়া
দিয়াছিলে? মাঝারা না থাকিলে সে আজ
ডুবিয়া মরিত।”

নির্বোধ জ্ঞানশূন্য নরেন্দ্র উত্তর করিল, “সে
আমার সহিত কলহ করিতে আসে কেন?”

নবকুমার। শ্রীশের সহিত কলহ করিতে
তোমার লজ্জা হয় না? জান না, তুমি কে
আর শ্রীশ কে? তুমি কি শ্রীশের সমান?

নরেন্দ্র ক্রোধকম্পিত-স্বরে বলিল, “আমি

শ্রীশের সমান নহি। আমি জমীদার
বীরেন্দ্রসিংহের পুত্র, শ্রীশ পথের কাঙ্গালী,
পরের অয়ে পালিত, তাহার সমান আমি
কিহুণে?”

নবকুমার এরূপ উত্তর কখন শুনে-
নাই; বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,
“কাহার সহিত কথা কহিতেছ, জান?”

নরেন্দ্র। জানি, যে দরিদ্র সন্তান আমার
পিতাকর্তৃক পালিত হইয়া কালসপের জ্ঞায়
তাঁহাকে দংশন করিয়াছে, এক্ষণে তাঁহার
বিষয়টি লইয়াছে, সেই নবকুমার বাবুর
সহিত কথা কহিতেছি।

নবকুমার এক মুহূর্তের জন্য নিরুত্তর
হইলেন। কি বিষয় তাঁহার স্মরণ হইতেছিল,
বলিতে পারি না। পরক্ষণেই বলিলেন,

“কৃতত্ত্ব বালক! তোর পিতা নিজ দোষে
জমীদারী হারাষ্টয়াছে, অন্যথাকে এত দিন
পালন করিলাম, তাহার এই ফল! আজ
শ্রীশকে ডুবাইয়াছিলি। কাল আমার গলায়
ছুরি দিবি! তুই অতাই আমার বাড়ী হইতে
দূর হ!”

নরেন্দ্র। চলিলাম! কিন্তু যদি ঠৈহজ্জয়ে
কি পরজন্মে বিচার থাকে, তুমি তাহার ফল
ভোগ করিবে।

সায়ংকালে গঙ্গাতীরে হেমলতা একাকী
বিচরণ করিতেছিল। যে যে ঘটনা হইয়া-
ছিল, হেমলতা সমস্ত শুনিয়াছিল। হেম-
লতাকে দেখিয়া নরেন্দ্র একবার দাঁড়াইল
দেখিল, হেম চক্ষুতে বস্ত্র দিয়া বর বর
করিয়া কাঁদিতোছে।

নরেন্দ্রের ক্রোধ গেল, সে হেমের নিকট
আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, “হেম,
কাঁদিতোছে কেন?”

কাতরস্বরে হেম উত্তর করিল, “নরেন্দ্র,
নরেন্দ্র, আমার হাত ছাড়িয়া দাও। শ্রীশকে

আমি দাঁটার স্তায় মান্ত করি, তাহাকে তুমি জলে ফেলিয়া দিয়াছিলে! আমার পিতাকে তুমি কালসর্প বলিয়া গালি দিলে? আমাদের তুমি ঘৃণা কর? নরেন্দ্র! আমার হাত ছাড়িয়া দাও।”

শ্রীশকে জলে ফেলিয়া দিয়াও ক্রুদ্ধ নরেন্দ্রের সংজ্ঞা হয় নাই, নবকুমারের তিরস্কারেও তাহার সংজ্ঞা হয় নাই, কিন্তু এখন হেমের চক্ষুতে জল দেখিয়া ও বালিকার কয়েকটি কাতর-কথা শুনিয়া নির্বোধ যুবকের সংজ্ঞা হইল। ধীরে ধীরে হেমের চক্ষুর জল মুছাইয়া দিয়া, ধীরে ধীরে তাহার হাত ধরিয়া নরেন্দ্র কাতরস্বরে বলিল, “হেম, ক্ষমা কর, আমি অপরাধ করিয়াছি। শ্রীশ শাস্ত, ধীর ও নির্দোষ, তাহাকে জলে ফেলিয়া দিয়া আমি নির্বোধের স্তায় কার্য্য করিয়াছি; তোমার পিতাকে গালি দিয়া আমি চণ্ডালের স্তায় কার্য্য করিয়াছি; কিন্তু হেম, তুমি আগাকে ক্ষমা কর, তুমি ভিন্ন স্নেহপূর্ব্বক কথা কহিবার জগতে আমার আর কেহ নাই। আজি আমি দেশত্যাগী হইয়াছি, যাইবার পূর্বে তোমার দুইটি স্নেহের কথা শুনিতে ইচ্ছা করি। হেম, আমাকে ক্ষমা কর।”

হেম ক্ষমা করিল, নরেন্দ্রকে গলাতীরে বসাইল, আপনি নিকটে বসিল, অশ্রুজল মুছিয়া কথাবার্তা আরম্ভ করিল। “নরেন্দ্র, কেন দেশত্যাগী হইতেছ? পিতা রাগ করিয়া একটি কথা বলিয়াছেন বলিয়া, নরেন্দ্র, কেন বীরনগর ত্যাগ করিবে? হেম নিজে পিতার নিকট অহরোধ করিয়া পিতার ক্রোধ অপনোদন করিবে, নরেন্দ্র, তুমি বীরনগর ছাড়িয়া যাইও না।”

কিন্তু হেমলতার এ অমুনস্ব বার্থ হইল। উদ্ধত নরেন্দ্র হেমলতার অশ্রুজল দেখিয়া

ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে, কিন্তু তাহার হৃদয়ে আজ যে ব্যথা লাগিয়াছে, তাহার শাস্তি নাই। নরেন্দ্র বলিল, “হেমলতা, তোমার অহরোধ স্বার্থ, বস্তুতঃ বীরনগরে আমার স্থান নাই। কয়েক মাস অবধি, কয়েক বৎসর অবধি আমি এই পৈতৃক ভবনে যে যাতনা ভোগ করিতেছি, তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে না, সে যাতনা তোমার স্নেহ, তোমার ভালবাসার জন্ত সহ্য করিয়াছি। যে দেশে আমার প্রাতঃস্মরণীয় পিতা রাজা ছিলেন, সে দেশে পরপালিত, ঘৃণিত, পদদলিত হইয়া বাস করিয়াছি, সে কেবল তোমার স্নেহের জন্ত! হেম, তোমারই স্নেহের জন্ত, তোমারই ভালবাসার জন্ত, তোমারই আশার এত দিন ছিলাম, সে আশাও সাদ হইয়াছে! আশা ছিল, তোমার পিতা আমার সহিত তোমার বিবাহ দিবেন। আমার কথায় রাগ করিও না, লজ্জা করিও না, লজ্জা বা রাগ করিবার এখন আর সময় নাই। তোমার পিতার মন বুঝিয়াছি, বিনীত শ্রীশচন্দ্রকে তিনি স্নেহ করেন, আমি তাঁহার চক্ষের শূল! শ্রীশচন্দ্রকে তিনি কল্যাণদান করিবেন, তাহা কি আমি চক্ষে দেখিব? তাহা দেখিয়া এই গৃহে বাস করিব? হেমলতা, হেমলতা, মনুষ্য যে আঘাত সহ্য করিতে পারে না, অথবা মূনিষ্যের সেক্ষণ সহিষ্ণুতা আছে। হেমলতা, আমি ঋণী নহি। হেন, আমাকে বিদায় দাও, বীরনগরে আমার স্থান নাই।”

কণেক পর নরেন্দ্র পুনরায় ধীরস্বরে কহিতে লাগিল, “হেমলতা, কাদিও না। সমস্ত জীবন কাদিবার সময় আছে, একবার আমার কথা শুন। আমি আজি জন্মের মত চলিলাম। কোথায় যাইতেছি, কি করিব, তাহা আমি জানি না। কিন্তু সে চিন্তা করি না, জগতে লক্ষ লক্ষ প্রাণী রহিয়াছে,

আমারও থাকিবার স্থান হইবে। কিন্তু এই জনাকীর্ণ জগতে আমি আজ হইতে একাকী। নানা দেশে নানা স্থানে অনেক লোক দেখিব, তাহাদের মধ্যে আমি বন্ধুশূন্য, গৃহ-শূন্য, একাকী। জীবনে নরেন্দ্রকে আপনায় ভাবিবে, এরূপ লোক নাই, নরেন্দ্রের মৃত্যু-কালে শোক করিবে, এরূপ লোক নাই।”

হেমলতার চক্ষুজলে বস্ত্র ও শরীর সিক্ত হইতেছিল, এক্ষণে আর থাকিতে না পারিয়া, উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। নরেন্দ্রের চক্ষু উজ্জ্বল, কিন্তু জলশূন্য, নরেন্দ্র আবার ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, “হেম, কখনেক হির হও, কাঁদিও না, আমি এক্ষণে কাঁদিতে পারি না। আমার মনে যে ভাব হইতেছে, তাহা ক্রন্দনে ব্যক্ত হয় না। হেম, তুমি আমাকে ভালবাস, জগতের মধ্যে কেবল তুমি এক একবার নরেন্দ্রের প্রতি স্নেহ দৃষ্টিতে দেখ, নরেন্দ্রের বিষয় স্নেহ-চিত্তে ভাব; কিন্তু নরেন্দ্র তোমাকে কিরূপ গাঢ় প্রণয়ের সহিত ভালবাসে, অন্ধকার, সুখশূন্য জীবনাকালেশের মধ্যে একটি প্রণয়-তারার প্রতি কিরূপ সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া থাকে, তাহা হেমলতা, জান না, বালিকার হৃদয় সে ভাব ধারণ করিতে পারে না। কিন্তু এ স্বপ্ন অল্প সাদৃশ্য হইল, জীবনের একমাত্র আলোক অল্প নির্মাণ হইল, অল্প হইতে অন্ধকারে দেশে দেশে অরণ্যে অরণ্যে যাব-জীবন পরিভ্রমণ করিব।”

নরেন্দ্র কখনে নিশ্চর হইয়া রহিল; পরে ধীরে ধীরে বলিল, “হেমলতা, আমার আর একটি কথা। বালাকালে আমরা দুই জনে এই মাধবীকল্পণটি পুতিয়াছিলাম, আমাদের ভালবাসার স্রাব লতাটি বাড়িয়াছে, আজ আর ইহার থাকিবার আবশ্যক কি?”

নরেন্দ্র সেই লতাটি উৎপাটন করিল ও

তদ্বারা একটি কল্পণ প্রস্তুত করিল, ধীরে ধীরে হেমলতাকে তাহা পরাইয়া দিয়া বলিল, “হেম, ফুল যত শীঘ্র শুকায়, লতা তত শীঘ্র শুকায় না, বোধ হয়, তুমিও আমাকে কিছু দিন স্মরণ রাখিবে। যদি রাখ, যত দিন নরেন্দ্রের জন্ত তোমার স্নেহ থাকিবে, তত দিন এই মাধবী কল্পণটি রাখিও, যখন অভা-গাকে ভুলিয়া যাইবে, নদীজলে শুষ্কলতা ফেলিয়া দিও।”

শোকবিহ্বলা দম্ভহৃদয়া হেমলতা বিম্মিত হইয়া নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখিল, নরেন্দ্র স্থির। নরেন্দ্রের স্বর গভীর ও অকম্পিত, নরেন্দ্রের চক্ষুতে জল নাই, কিন্তু অগ্নি জলিত-তেছে। ধীরে ধীরে হেমের হাত ছাড়িয়া নরেন্দ্র চলিয়া গেল, সে অন্ধকার রজনীতে আর নরেন্দ্রকে দেখা গেল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

সংসারে একাকিনী ।

Hear thee view thee gaze o'er all thy
charm
And round thy bhantum glue my
clasping arms,
Cope.

সারংকালীন অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বর্তীরে বসিয়া ত্র্যাদশবর্ষীয়া বালিকা অসংখ্য উন্মি-রাশির দিকে কি জন্ত চাহিয়া রহিয়াছে? যতদূর অন্ধকারে দেখা যায়, বীচিমালা উঠি-তেছে, পড়িতেছে তাহার পর একটি ঈষৎ ধূসর রেখা, তাহার পর আর অন্ধকারে দেখা যায় না। দেখিতে দেখিতে হেমের চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল, তথাপি হেম কিছু দেখিতে পাইল না, রজনী গাঢ় হইয়া আসিল, ক্রমে আকাশে তারা ফুটিতে লাগিল, তথাপি হেমের দেখা হইল না।

রজনীতে জব্বীদারের বাড়ীর সকলে নিদ্রিত হইল। হেয়লজ্ঞার পক্ষে সে রজনী কি ভীষণ। বালিকা ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিয়া গবাক্ষের নিকট আসিল, ধীরে ধীরে গবাক্ষ উদ্ঘাটন করিয়া বাহিরে দেখিল; দেখিল, তারা পরিপূর্ণ অন্ধকার আকাশের নীচে বিশাল গঙ্গা অনন্তপ্রান্তে ভাসিয়া যাইতেছে। সেই নৈশগঙ্গার দিকে দেখিতে দেখিতে কি হৃদয়বিদারক ভাব হেমলতার হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল। বাল্যকালের ক্রীড়া, কিশোর-বয়সের প্রথম ভাল-বাসা, কত কথা, কত কোতুক, একে একে জাগরিত হইয়া বালিকাহৃদয় দলিত করিতে লাগিল। এক একটি কথা মনে হয়, আর হৃদয়ে দুঃখ উথলিয়া উঠে, অবিরল অশ্রু-ধারায় চক্ষু ও বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যায়। আবার বালিকা শাস্ত হইয়া গঙ্গার দিকে দেখে, আবার একটি কথা স্মরণ হয়, আবার শোক-বিহ্বলা হইয়া অজস্র রোদন করে; কাঁদিয়া কাঁদিয়া বালিকা অবসর হইল, হায়! সে ক্রন্দনের শেষ নাই, সে ক্রন্দন অব্যাহত, অশান্তিপ্রদ। রজনী এক প্রহর, দ্বিপ্রহর হইল, তথাপি বালিকা গবাক্ষের নিকট দণ্ডায়মানা অথবা ভূমিতে লুপ্তিত হইয়া নীরবে রোদন করিতেছে।

শোকের প্রথম বেগের উপশম হইল, কিন্তু শোকচিন্তাপরম্পরা নিবারণ হইবার নহে। গণ্ডস্থলে হাত দিয়া একাকিনী গবাক্ষ-পার্শ্বে বসিয়া হেমলতা ভাবিতে লাগিল। এক একবার হেমলতার মনে একবিন্দু জল আসিতে লাগিল, ধীরে ধীরে সেটি গড়াইয়া পড়িল, আবার একবিন্দু জল হইতে লাগিল। সে বিন্দু-পরম্পরা শুকায় না, সে চিন্তা-পরম্পরা শেষ হয় না।

রজনী শেষ হইল, পূর্বাকাশে রক্তিমচ্ছটা

দেখা যাইতে লাগিল, মলিনা বালিকা তখনও গণ্ডে হস্ত দিয়া গবাক্ষপার্শ্বে বসিয়া আছে; তখনও চিন্তা-সূত্র শেষ হয় নাই। জীবনে কি শেষ হইবে?

রজনী প্রভাত হইল, প্রথম সূর্যালোকে হেমলতা চকিত হইয়া উঠিল। চক্ষু কোটর-প্রবিষ্ট, বদনমণ্ডল মলিন, শরীর অবসন্ন। ধীরে ধীরে বালিকা গবাক্ষপার্শ্বে হইতে উঠিল, শূন্যহৃদয়ে শূন্যগৃহে গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

সেই কি এক দিন? দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে বালিকা সেই গবাক্ষ-পার্শ্বে বসিত, যে গঙ্গাভীরে নরেন্দ্র বিদায় লইয়াছে, সেই গঙ্গার দিকে দেখিত। প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে, সাংসকালে, গভীর রজনীতে শূন্যহৃদয়া বালিকা সেই গঙ্গার দিকে চাহিয়া থাকিত, কত ভাবিত, কত কথা মনে আসিত, কে বলিবে? একদিন নরেন্দ্রনাথ হেমের কানে কানে কি বলিয়াছিল, একদিন ওপার হইতে হেমের জন্ত কি আনিয়াছিল, একদিন পাছ হইতে আত্র পাড়িয়া হেম ও নরেন লুকাইয়া থাইয়াছিল, একদিন পিতাকে না বন্ধিা হেম সন্ধ্যার সময়ে নরেনের সহিত নৌকায় চড়িয়াছিল, একদিন হেম নরেনকে কুলের মালা পরাইয়া দিয়াছিল, একদিন নরেন হেমের কেশ ফুল দিয়া সাজাইয়া দিয়াছিল, সহস্র সহস্র কথা একে একে নদীজলের হিল্লোলের স্তায় হেমের হৃদয়ে উঠিত। দ্বিপ্রহর হইতে সাংসকাল পর্য্যন্ত, কখন কখন সন্ধ্যা হইতে গভীর রজনী পর্য্যন্ত হেমলতা ভাবিত, এক একবার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইত, পাছে কেহ দেখিতে পায়, এই ভয়ে বালিকা জল মুছিয়া কেলিত। নবকুমারের বিপুল সংসারে সে দুঃখের ভাগিনী কে হইবে? হেম কাহাকেও মনের কথা মুখ ফুটিয়া বলিত না। বালিকা সকলের

নিকটেই সন্ধান করিত, বাড়ীর লোক-
দিগের নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া
ভাবিত। কখন কখন শোকপারাবার উৎ-
লিলে গোপন করিতে পারিত না, নয়ন
হইতে অবিরল বারিধারা বহিত।

ক্রমে বসন্তকালের পর গ্রীষ্মকাল আসিল;
প্রকৃতি বঙ্গদেশকে সুস্বাদু ফল, সুদৃশ্য ফুল,
সুকণ্ঠ পক্ষী দ্বারা পরিপূর্ণ করিল। নবপল্ল-
বিত বৃক্ষগণ সুমন্দ বায়ুতে মধুর গান করিতে
লাগিল, তাহার সঙ্গে সুন্দর পক্ষিগণ আনন্দে
গান করিয়া নিজ নিজ কুলায়নির্মাণ করিতে
লাগিল। মধ্যাহ্নে ছায়াপ্রদায়ী বৃক্ষমূলে উপ-
বেশন করিয়া, পত্রের মর্ম্মর শব্দ শুনিয়া,
পক্ষিশাবক ও পক্ষিদম্পতির দিকে চাহিয়া,
বালিকা হস্তে গণ্ড-স্থাপন করিয়া চিন্তা
করিত; যতক্ষণ না সন্ধ্যার গাঢ় ছায়া সেই
বৃক্ষাবলী আবৃত করিত, হেমলতার চিন্তাসূত্র
ছিন্ন হইত না। তাহার পর বর্ষা আসিয়া
তৎপক্ষে প্রাবৃত করিল, বর্ষা শেষ হইল।
কৃষ্ণকণ্ঠ আনন্দে ধাতু কাটিতে লাগিল।
গ্রামে, গৃহে, গোলায় ধাতু পরিপূর্ণ হইল।
জগৎ আনন্দিত হইল, কিন্তু হেমের নিরানন্দ
হৃদয় শান্ত হইল না। সুন্দর আশ্বিন মাসে
শ্রীজ্ঞান রব উঠিল, চারিদিকে আনন্দধ্বনি
উঠিল, আকাশ পরিষ্কার হইল, কিন্তু হেম-
লতার হৃদয়াকাশ তমসাক্ষয়। আবার শীত-
কাল আসিল, আনন্দে কৃষ্ণকণ্ঠ আবার
ধান কাটিল, আনন্দে সংসারী, গৃহস্থ, ধনী,
কাজলী সকলেই পৌষপার্বণ করিল, হেম-
লতার পার্বণের দিন কি ইহজন্মে আর
আসিবে?

নবকুমারের বিপুল সংসার। কাহারও
কিছু কোভ নাই, অভাব নাই, দুঃখ নাই।
সেই সংসারে স্নেহপালিতা একমাত্র ছুঁহিতা
বৈষ্ণবী। বিপুল সংসারেও হেমলতা একাকিনী!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—:—

জগতে একাকী।

And loves the world to darkness and

to me.
Gray

নরেন্দ্র অতিশয় সন্তরপটু ছিলেন,
সেই রাত্রিতে সন্তরপ দিয়া গঙ্গা পার হইয়া
অপর পারে উপস্থিত হইলেন। সম্মুখে
অনেক দূর পর্য্যন্ত কেবল বালুকা, তাহার
পর কেবল অনন্ত প্রান্তর দেখা যাইতেছে।
নরেন্দ্র সেই অন্ধকার নিশীথে সিন্ধুশরীর
ও সিন্ধুবস্ত্রে সেই বালুকাক্ষেত্রে বিচরণ
করিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্র গঙ্গার অপরপার্শ্বের দিকে দৃষ্টি
করিলেন। অন্ধকারেও বীরনগরের ধাত
প্রাসাদ ঈষৎ দৃষ্ট হইতেছে, নরেন্দ্র সেই দিকে
দেখিলেন, আবার চক্ষু ফিরাইয়া বিচরণ
করিতে লাগিলেন। আবাব স্থির হইয়া সেই
দিকে চাহিলেন। নিম্নক অন্ধকারে গঙ্গার
কল্ কল্ শব্দ শুনা যাইতেছে, সময়ে সময়ে
পেচকের ভীষণ রব শুনা যাইতেছে, আর
এক একবার দূরে শৃগালের কোলাহল শ্রুত
হইতেছে। নরেন্দ্র গঙ্গা দেখিতেছিলেন না,
নরেন্দ্র পেচক বা শৃগালের ধ্বনি শুনিতে-
ছিলেন না, তিনি নিঃশব্দে অন্ধকারে বিচরণ
করিতেছিলেন। অনেককণ পর আবার
বীরনগরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ঘোর
অন্ধকারে আর সে গৃহ দেখা যায় না।
নরেন্দ্র একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া
ফিরিলেন। সম্মুখে যে পথ পাইলেন, সেই
দিকে চলিলেন।

কোথায় যাইতেছেন, নরেন্দ্র জানেন
না। উপরে অসীম গগন, নীচে অসীম প্রান্তর,
নরেন্দ্রের চিন্তাও অসীম ও অনন্ত, নরেন্দ্র যে

দিকে পাইলেন চলিলেন। পথ-পার্শ্বে বটবৃক্ষ হইতে নিশাচর পক্ষী নরেন্দ্রকে দেখিয়া কুলার ছাড়িয়া পলায়ন করিল, নিশাচরহারী শৃগাল-পাল নরেন্দ্রকে দেখিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, নরেন্দ্র তাহা গ্রাহ্য করিল না।

অনেক দূর যাইয়া একটি গ্রামে আসিলেন, গ্রাম নিম্নতর, সকলেই সুপ্ত। ক্রুদ্ধবর্ণ বৃক্ষশ্রেণীর নীচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটার দেখা যাইতেছে ও বৃক্ষপত্রমধ্যে কোন কোন স্থানে প্রজ্বলিতমালা বিকসিত করিতেছে। নরেন্দ্রকে দেখিয়া গ্রাম্য কুকুর শব্দ করিতে লাগিল; দুই এক জন গৃহস্থ ঘরের দ্বার খুলিয়া চাহিয়া দেখিল; নরেন্দ্র কোন দিকে চাহিলেন না; পথ অতিবাহান করিতে লাগিলেন। গ্রামের পথ ঠিক জানেন না, স্থানে স্থানে বৃক্ষের নীচে ও ঝোড়পূর ভিতর দিয়া যাইতে নরেন্দ্রের শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইল। নরেন্দ্র গ্রাহ্য করিলেন না, কতক্ষণে গ্রাম-প্রান্তে উপস্থিত হইয়া এক প্রান্তরে পড়িলেন।

আবার প্রান্তর পার হইলেন, অল্প গ্রামে পড়িলেন; আবার নিঃশব্দে গ্রাম পার হইয়া গেলেন। সেই রজনীযোগে কত গ্রাম অতিক্রম করিলেন, কতদূর যাইলেন, জানি না, নরেন্দ্রও বলিতে পারেন না।

সমস্ত রজনী ভ্রমণ করিয়া নরেন্দ্রনাথ দূর-প্রান্তরে একটি আলোক দেখিতে পাঠিলেন, সেই আলোক অহুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। প্রায় এক ক্রোশ যাইয়া আলোকের নিকট পৌছিয়া দেখিলেন, স্তম্ভকগুলি লোক একটি শব্দাহ করিতেছে। নরেন্দ্রনাথ তখন একবার দাঁড়াইলেন। শব্দ দেখিয়া একবার দাঁড়াইলেন। কাষ্ঠের অগ্নি এক একবার জলিয়া উঠিতেছিল; আবার মধ্যে মধ্যে নিভেজ হইয়া যাইতেছিল। ঐরূপ

স্তিমিত আলোকে নরেন্দ্রের আকৃতি ও বিকট মুখমণ্ডল এক একবার দেখা যাইতে লাগিল। যাগার শব্দাহ করিতে আসিয়াছিল, তাহার নরেন্দ্রকে দেখিতে পাইল; প্রান্ত পথিক মনে করিয়া নিকটে আসিতে বলিল, নরেন্দ্র নিকটে গেলেন না; পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, নরেন্দ্র পরিচয় দিলেন না। শব্দাহিগণ কণেক নরেন্দ্রের অচল দীর্ঘ অবয়ব ও বিকট মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শব্দ ছাড়িয়া উল্লুখাসে পলায়ন করিল।

প্রত্যুষে গ্রামের স্থালোকেরা কলস লইয়া ঘাটে যাইতেছিল, এক দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ বিকৃত মনুষ্যমূর্ত্তি পথে শয়ান দেখিয়া সভয়ে পাশ কাটিয়া চলিয়া গেল।

প্রাতঃকাল হইল। গ্রামের লোক সমবেত হইয়া অপরিচিত ঘোর নিরোভিভূত পুরুষকে জাগাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে ধীরে ধীরে উত্তর দিল, “আমার নাম নাই, আমার নিবাস নাই, আমি জগতে একাকী।” নরেন্দ্র ঘোর উন্মত্ত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

র'জমহল।

Seldom alas ! the power of
logic reigns
With much pulchricity in
royal brains.
cawfer.

নরেন্দ্র সেই দিনেই পীড়াক্রান্ত হইলেন, গ্রামের একজন ভদ্রলোক তাঁহার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন, কিন্তু অনেক দিন তাঁহার জীবনের আশা ছিল না। অনেক দিন পর নরেন্দ্র ক্রমে আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন। যখন চলিবার শক্তি হইল,

তখন সেই ভক্তলোককে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়া নরেন্দ্র সে গ্রাম ত্যাগ করিলেন ।

প্রথম শোক ও নৈরাশ্রের বেগ তখন ক্রান্ত হইয়াছে, নরেন্দ্র তখন হেমলতাকে পাইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন । অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন যে, সুবাদারের নিকট আপন বিষয় পাইবার আবেদন করিব । পৈতৃক জমিদারী আমার হইলে স্বার্থপর নবকুমার অবশ্যই আমাকে কল্যাণ করিবেন ।

এই উদ্দেশ্যে নরেন্দ্র সুবাদার সুজার রাজধানীতে পৌঁছিলেন । সম্রাট শাজিহানের পুত্র সুজা বঙ্গদেশের শাসনকার্যে নিযুক্ত হইয়া রাজধানী ঢাকা হইতে রাজ-হালে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন এবং ঐশ্বর্যশ্রী বৎসর সুশাসন দ্বারা বঙ্গদেশে যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । তাঁহার শাসনকালে দেশে প্রায় যুদ্ধ বা কোনরূপ উপদ্রব হয় নাই, প্রজাবর্গ নিকৃৎবেগে কাল-যাপন করিতেছিললেন । ইতিহাসে তাঁহার অনেক সুখ্যাতি দেখিতে পাওয়া যায় । তিনি যুদ্ধে বীররূপ বিক্রমশালী ও সাহসী ছিলেন, অতীতসময়ে সেইরূপ জয়পরায়ণ ও দয়ালু ছিলেন । তাঁহার দয়া ও জয়পরতা দেখিয়া সমগ্র বঙ্গদেশে, কি জমিদার কি জায়গীরদার, সকলেই তাঁহাকে ভাস্বাসিত । কথিত আছে, তাঁহার মৃত্যুর সময়ে আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁহার জন্ত খেদ করিয়া-ছিল ; কিন্তু তাঁহার উদারস্বভাব হুই একটি দোষে কলঙ্কিত ছিল । যুদ্ধের সময় তিনি বীররূপে সাহসী, অস্ত্রসময়ে তিনি সেইরূপ বিলাসী । সুজা নিরস্ত্রের সুশ্রী পুরুষ ছিলেন এবং সর্বদাই হুল্লরী রমণীমণ্ডলীতে পরিসৃত থাকিতে ভালবাসিতেন । তাঁহার প্রধান রাজ্যী প্যারি বাহু বঙ্গদেশে রূপে,

ওণে ও চতুরতার অধিষ্ঠীতা বলিয়া খ্যাত ছিলেন । তিনি বাকপটুতা ও স্মৃষ্কর কৌতুকে সর্বদাই সুবাদারের হৃদয় প্রেম-রসে সিক্ত করিয়া রাখিতেন । কিন্তু প্যারি বাহুও একাকী সুজার প্রণয়-ভাগিনী ছিলেন না, শত শত বেগম উচ্চানস্থিত পুষ্পের জায় সুজার রাজমন্দির আলো করিয়া থাকিত । তাহাদের রূপে বিমোহিত হইয়া সুজা রাজকার্য্য বিন্ধত হইতেন কখন কখন হুই তিন দিন ক্রমাগত মত্তশয়ন ও আমোদে অতিবাহিত করিতেন ।

নরেন্দ্রনাথ সুবাদারের নিকট আবেদন করিতে বাহিলেন । এরূপ সুবাদারের নিকট উচিত বিচার-প্রত্যাশা সম্ভব নহে । গঙ্গাতীরে সুন্দর রাজমহলনগরী এখনও দেখিতে মনোহর, কিন্তু যখন বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল, তখন রাজমহলের শোভা অতুলনীয় ছিল । সুবাদারের উচ্চ প্রাসাদ, রাজবাটী, ওয়ারাহ ও জায়গীরদারদিগের সুদৃশ্য হর্য্যাবলী এবং বঙ্গদেশের সমস্ত ধনাঢ্য লোকের সমাগমে রাজমহল যথার্থই রাজ-পুরী বলিয়া বোধ হইত । স্বয়ং গঙ্গা সহস্র ধনাঢ্য বণিকের সহস্র পোত বক্ষে ধারণ করিয়া নগরের শোভা ও সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিত । প্রশস্ত রাজপথে যুদ্ধবিলাসী গর্জিত ওয়ারাহ ও মুসলমান জমিদারগণ সর্বদাই অশ্ব, হস্তী অথবা শিবিকায় গমন করিত । হিন্দু বণিক-ব্যবসায়ী লোক শান্তভাবে নগরের একপার্শ্বে বাস করিত ও নিজ নিজ ব্যবসায়ের রত থাকিত ।

এ সমস্ত দেখিবার জন্ত নরেন্দ্রনাথ রাজ-মহলে যান নাই, এ সমস্ত দেখিয়া তিনি শান্ত হইলেন না ; কিরূপে সুবাদারের নিকট আবেদন জানাইবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন । অনেক ধনাঢ্য হিন্দু-

বশিষ্ঠ নরেন্দ্রের পিতাকে চিনিতেন, কিন্তু নরেন্দ্র এক্ষণে দরিদ্র, দরিদ্রের জন্ত কে চেষ্টা করে? নরেন্দ্র বাহার নিকট যাইলেন, তিনিই বলিলেন, “হাঁ বাপু, তোমার পিতা মহাশয় লোক ছিলেন, তাঁহার পুত্রকে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম, করেক দিন এই স্থানে অবস্থিতি কর, পরে দেখা যাইবে,” ইত্যাদি। নরেন্দ্র বিফলপ্রযত্ন হইয়া রহিলেন।

অনেক দিন পরে ঘটনাক্রমে একদিন খাঁ নামক কোন মোগল জায়গীরদারের সহিত নরেন্দ্রের পরিচয় হইল। একদিন খাঁ বীরেন্দ্রের পরম বন্ধু এবং যথার্থ মহাশয় লোক ছিলেন, তিনি সাদরে নরেন্দ্রকে আহ্বান করিয়া স্বয়ং তাঁহার জন্ত সুবাদারের নিকট যাইতে প্রতীক্ষিত হইলেন। তথাপি দরিদ্রের আবেদন বিচারাসন পর্যন্ত যায় না, অনেক বস্তু, অনেক দিন পর একদিন খাঁ বহু অর্থে সুবাদার ও তাঁহার মন্ত্রিবর্গের মন পরিতুষ্ট করিয়া একদিন নরেন্দ্রনাথের আবেদন সুজার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

সুন্দর রোপ্য ও স্বর্ণখচিত সিংহাসনে সুবাদার বসিয়াছেন, রাজবেশে সুন্দর অবরবে বড় সুন্দর শোভা পাইয়াছে। চারিদিকে অমাত্য ও বড় বড় আফগান ও মোগল যোদ্ধাগণ শির নত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ও বহুবিধ লোকে বিস্তীর্ণ বিচারপ্রাসাদ পরিপূর্ণ রহিয়াছে। প্রস্তরবিনির্মিত সারি সারি স্তম্ভের উপর চারু খচিত ছাদ শোভা পাউতেছে ও সিংহাসনের দুই দিকে পরিচারক চামর হুলাইতেছে। প্রাসাদের বাহিরে বহুদূর দেখা যায়, লোকে সমাকীর্ণ, সুবাদার সর্বদা দেখা দেন না, সেই জন্ত জন্ত সকলেই দেখিতে আসিয়াছে।

সুবাদারের সম্মুখে বস্তু একদিন খাঁ উঠিয়া আবেদন করিলেন, “জের্হাপনা, এ দাস প্রায় বিংশতি বৎসর সম্রাটের কৰ্ম করিয়াছে, সুবাদারের কাছে আমার কেশ পুরু হইয়াছে, ললাট খণ্ডে ক্ষত হইয়াছে। গোলামের কিঞ্চিৎ আবেদন আছে।”

সুবাদার বলিলেন, “একদিন, তুমি আমাদের প্রধান অমুচর ও অতিশয় প্রিয়পাত্র, তোমার এমন কি যাচঞা আছে, যাঁহা আমাদের অদেয়?”

একদিন তুমি পর্য্যন্ত শির নোয়াইয়া পুনরায় বলিলেন, “জের্হাপনা! বঙ্গদেশ-বাসিগণ অতি দুর্বল; তাহাদের মধ্যে সময়ে সময়ে যে পরাক্রান্ত জমীদারগণ আমাদের যুদ্ধে সাহায্য করে, তাহারা সুবাদারের প্রীতিভাজন সন্দেহ নাই। জমীদার বীরেন্দ্র-সিংহ একজন সেইরূপ লোক ছিলেন।”

সুবাদার বলিলেন, “হাঁ, আমি সেই হিন্দুর নাম শুনিয়াছি, পাঠানদিগের সহিত আমাদের যুদ্ধে সে সাহায্য করিয়াছিল।”

একদিন পুনরায় তলসীম করিয়া বলিল, “জের্হাপনা! যাঁহা কহিলেন, যথার্থ। এই দাস যখন উড়িষ্যার যুদ্ধে গিয়াছিল, স্ত্রীকে বীরেন্দ্রের যুদ্ধকৌশল ও রাজভক্তি দেখিয়াছিল। এই রাজসভায় অনেক পরাক্রান্ত পাঠান ও মোগল যোদ্ধা আছেন; কিন্তু বীরেন্দ্র অপেক্ষা অধিক সাহসী পুরুষ এ গোলাম এ পর্য্যন্ত দেখে নাই।”

সভাস্থদিগের কোষে অসি-স্বনুনার শব্দ হইল, মুসলমানদিগের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; কিন্তু সুজা সহাস্ত-বদনে বলিলেন, “একদিন, তুমি কাকেরের অভ্যন্ত প্রাংশলা করিয়াছ, কিন্তু অবধার্ষ্য নহে, সে হিন্দু যথার্থ সাহসী ছিল শুনিয়াছি। এক্ষণে তাহার জন্ত কি বলিবার আছে বল,

তোমার উপরোধে আমি তাহাকে যে কোন পুরস্কার দিতে প্রস্তুত আছি।”

একদিন গভীরস্থরে বলিলেন, “যিনি স্বাধীনতার উপর স্বাধীন, বাদশাহের উপর বাদশাহ, তিনিই কেবল এক্ষেপে বীরেরূপে পুরস্কার বা শাস্তি দিতে পারেন। আমি তাঁহার অনাথ বালকের জন্ত আবেদন করিতেছি। বালক এক্ষেপে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে, কানকু মহাশয়ের ঘোঁষে এক শঠ তাঁহার পৈতৃক জমিদারী কাড়িয়া লইয়াছে।”

জ কৃষ্ণিত করিয়া স্বাধীন কানকুকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে সময়ে সমস্ত খাজানা ও জমিদারীর বিষয় কানকু মহাশয়ের হস্তে থাকিত। এমন কি, বঙ্গদেশের স্বাধীন যে সমস্ত কাগজাং দিল্লীতে পাঠাইতেন, তাহাও কানকুর সহি না হইলে গ্রাহ্য হইত না। কানকু মহাশয় নবকুমারের অর্থ-ভোগী, বিনীতভাবে বলিলেন, “স্বাধীন মহাশয়ের আদেশ আমাদের শিরোধার্য্য; বীর-জ্ঞের মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর খাজানা আদায় না হওয়ার জেহাপনা সেই জমিদারী নবকু মারকে দিতে আদেশ দিয়াছিলেন।”

সুজাকে কোন বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন ছিল না, কানকু মহাশয় বাহা বুঝাইলেন, স্বাধীন তাহাই বুঝিলেন; একদিনের আবেদন কানকু গেল। একদিন রোষে নতশির হইয়া রহিলেন, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে নরেন্দ্র দণ্ডারমান হইয়া কানকু মহাশয়ের দিকে তীব্রদৃষ্টি করিতেছিলেন।

স্বাধীন শেষে বলিলেন, “একদিন বা! স্বর্ঘ্য যে রশ্মি জগতে দান করেন, তাহা ফিরাইয়া লন না, জমিদারী স্বয়ং দান করিয়া ফিরাইয়া লওয়া রাজধর্ম্ম নহে; বীরেন্দ্রের বালক তেজস্বী দেখিতেছি, বীরেন্দ্রের মত

যুদ্ধব্যবসায় শিক্ষা করুক, অবশ্যই উৎকৃষ্ট পুরস্কার ও অস্ত্র জমিদারী এনাম পাইবে।”

সভাস্থ সকলে “কেরামৎ “কেরামৎ” বলিয়া স্বাধীনতার কথায় প্রশংসা করিল; একদিন অগত্যা তাহাতে সম্মত হইয়া সেই দিন হইতেই নরেন্দ্রকে নিকটে রাখিয়া যুদ্ধব্যবসায় শিখাইতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ ।

কাশীর যুদ্ধ ।

The diadem with mighty projects lined.
To catch renown by ruining mankind.
Is worth, with all its gold and glittering

store.
Just what the toy mill wofor and no more,
Cawper.

পূর্বোক্ত ঘটনার তিন বৎসর পর ১৬৫৬ খৃঃ অব্দে আশ্বিন মাসের প্রারম্ভে একদিন ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লী ও আগ্রা নগরে বড় হলমূল পড়িয়া গেল। আগ্রার রাজদ্বারলোকে সমাকর্ষ, সমগ্র নগরবাসী ভীত ও শশব্যস্ত, বাজার দোকান সমগ্র বন্ধ ওমরাহ, মনসবদার, রাজপুত, মোগল, পাঠান, সকলেই অস্থিরচিত্ত ও চিন্তাবিহীন। কার্য্যকর্ম্ম বন্ধ হইল, সকলেই ভীত ও উৎসুক। সম্রাট শাজিহান কয়েক দিন অবধি পীড়ায় শয্যাগত ছিলেন; আজি সংবাদ রটনা হইল যে, তিনি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।

মিথ্যা সংবাদে শীঘ্রই সমুদয় ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন হইল। বঙ্গদেশ হইতে সুজা, দক্ষিণ হইতে আরংজীব, গুজরাট হইতে মোরাদ রণসজ্জায় বহিষ্কৃত হইলেন; পিতৃবিয়োগে সকলেই সিংহাসনারোহণে লোলুপ হইলেন। পরে যখন প্রকৃত সংবাদ জানা গেল যে, শাজিহান জীবিত আছেন, তখনও রাজপুত

গণ রণোন্মত্ত হইতে নিরস্ত হইলেন না। তাহার কারণ এই যে, ইতিপূর্বে কয়েক মাস হইতে সম্রাট পীড়াবশতঃ রাজকার্য্য করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা এই অবসরে সমস্ত রাজকার্য্য আপনাই করিতে লাগিলেন, কোন বিষয়ে পিতার মত লইতেন না, জন্মের মত পিতাকে কক্ষ রাখিয়া আপনি রাজকার্য্য করিবেন, এইরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ শকা করিয়াছিল যে বিষপ্রয়োগ দ্বারা যুবরাজ আপন সিংহাসনের পথ নিকট করিবেন। দারার ভ্রাতৃগণ পিতার শাসনে সম্মত ছিলেন না, এই জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইল।

১৬৫৭ খৃঃ অব্দের শেষে বারাণসীর যুদ্ধ হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে শীতকালের সাংসকালের আলোকে ভীষণ রূপ ধারণ করিয়াছে। অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র ও মহুঘোর শবরাশিতে ক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইয়া রুতিয়াছে। কোথাও মৃতদেহ-সমুদ্র পড়িয়া যেন আকাশের নক্ষত্রের দিকে স্থিরদৃষ্টি করিতেছে : কোথাও মূর্খ অবস্থার অঙ্গহীন সিপাহী ক্ষৌণ্ডের “জল—জল” করিয়া চীৎকার করিতেছে ; কোথাও দুই একজন সেনা নিজ নিজ ভ্রাতা বা বন্ধুর অঙ্গসন্ধান করিতেছে। হার! তাহাদের এ জগৎ আর ফিরিয়া পাঠবে না। দুই একজন তরুর বহুমূল্য বস্ত্র বা স্বর্ণালঙ্কার বা অস্ত্রাদির অন্বেষণে ফিরিতেছে, ক্ষণে ক্ষণে পেচকের ভীষণ রব শুনা যাইতেছে এবং শৃগালগণ মহাকালাহলে রব করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে আসিতেছে। দুই এক স্থানে অগ্নিরাশি দেখা যাইতেছে ও ক্ষণে ক্ষণে আলোকচ্ছটার ক্ষেত্র ও শবরাশি উজ্জ্বল করিতেছে। দূরে গঙ্গার পবিত্র জল কল্ কল্ শব্দে প্রবাহিত হইতেছে ; নদীর বিশাল বক্ষঃস্থল শান্ত,

বিস্তীর্ণ ও উজ্জ্বল ; ক্ষুদ্র মানবের সুখ বা দুঃখ জয় বা পরাজয়ে বিচলিত হয় না।

ক্রমে রাজনী গভীর হইল, চন্দ্র উদিত হইল, তাহার নির্মল নিকলক কিরণে মানবের কি কলঙ্কের কথা প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতৃগণ পরস্পরের শোণিতপানে লোলুপ হইয়া এই যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিয়াছে ; শৃগাল, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও স্বজাতির উপর হিংসা করে না! সেই চন্দ্রালোকে দুই জন রাজপুত কোন বন্ধুর অঙ্গসন্ধানে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিল। এক স্থানে কতকগুলি শব পড়িয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে যেন বেদনাশ্রুচক স্বর বহির্গত হইল। রাজপুত সেনাধ্বজ দেখিল, একজন যুবক মূর্খ অবস্থায় পড়িয়া শব্দ করিতেছে। জনয়ে আঘাত পাইয়াছে ও সেই ক্ষতস্থান হইতে অনবরত শোণিত নির্গত হওয়ার প্রায় অচেতন হইয়াছে, কিন্তু মৃত্যুর আশু সম্ভাবনা নাই।

যুবকের আকৃতি দেখিয়া রাজপুত দুই জন বিস্মিত হইল। বয়ঃক্রম অতিশয় অল্প, বোধ হয়, অষ্টাদশ বৎসরের অধিক নহে। মুখমণ্ডল অতিশয় সুন্দর ও উজ্জ্বল, সেরূপ সৌন্দর্য্য ও উজ্জ্বলতা স্ত্রীলোকের সম্ভবে, পুরুষের প্রায় সম্ভবে না। চিন্তা অথবা বয়সের একটি রেখাও এ পর্য্যন্ত ললাটে অঙ্কিত হয় নাই, ললাটপুংপরিষ্কার ও উন্নত। সমস্ত বদনমণ্ডল দেখিলে যোদ্ধা বলিয়া বোধ হয় না, বালক বলিয়া বোধ হয়, বাগ্যাবস্থাতেই হতভাগা স্বজন ও স্বদেশ হইতে বহুদূরে আসিয়া আজি প্রাণ হারা-ইতে বসিয়াছে।

রাজপুতসেনা দুই জনেরই যুদ্ধব্যবসারে হৃদয়ের স্বাভাবিক দয়া অনেক হ্রাস

হইয়াছে, বালককে দেখিয়া তাহারা হাস্ত করিয়া এইরূপে কথোপকথন করিতে লাগিল ;—

প্রথম সেনা। এ বালক এই বয়সেই যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে ?

দ্বিতীয় সেনা। দেখিতেছি, সূজার পক্ষের সেনা। বালক যুদ্ধে পরাজিত নহে, আমাদের রেখা পর্য্যন্ত আসিয়া যুদ্ধ করিয়াছে। এ কোন্ দেশের লোক ?

প্রথম সেনা। জানি না।

দ্বিতীয় সেনা। আমার বোধ হয়, বঙ্গদেশের হিন্দু। মোগল বা পাঠান হইলে এরূপ বেশ হইত না।

প্রথম সেনা। হা হা হা ! সূজা এই বাঙ্গালী শিশু লইয়া মহারাজ জয়সিংহ ও সুলতানদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন ? পুনরায় যখন আসিবেন, আমরা যুদ্ধে না আসিয়া আমাদের বালকদিগকে পাঠাইয়া দিব। চল, এখানে আর কেন ? আমাদের বন্ধুর অন্বেষণ করি।

দ্বিতীয় সেনা। এ লোকটা জীবিত আছে, একটু সাহায্য করিলে বোধ হয় বাঁচিবে, ইহাকে ত্যাগ করিয়া যাইব ?

প্রথম সেনা। শত্রুকে বাঁচাইতে গেলে আমাদের সময় থাকে না। আমি এক দণ্ডে ইহার দফা শেষ করিতেছি।

এই বলিয়া সেনা অসি নিক্ষেপিত করিল। দ্বিতীয় সেনা তাহাকে নিবারণ করিয়া বলিল, “না না, মৃত্যু লোকের প্রাণনাশ করিতে আমাদের প্রভু মহারাজা যশোবন্ত সিংহ নিষেধ করিয়াছেন, তুমি যাও, আমি ইহাকে বাঁচাইব।”

প্রথম সেনা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল, দ্বিতীয় সেনা জলসেচন দ্বারা মৃত্যু বা ক হা হা । যুবা নেত্র উন্মী-

লিত করিয়া দেখিল, চারিদিকে শব্দ শুনিয়া রহিয়াছে, অসংখ্য চক্র উদয় হইয়াছে, যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, জগৎ নিস্তব্ধ। যুবক জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি আমার জীবন-রক্ষা করিয়াছ, তোমার নাম কি ? কোন্ পক্ষের জয় হইয়াছে, কোথায় গিয়াছেন ?”

সেনা বলিল, “আমার নাম গজপতি সিংহ, আমি মহারাজা যশোবন্ত সিংহের একজন সেনানী, এক্ষণে মহারাজা জয়সিংহের আজ্ঞাধীন। তোমার সূজা অতিশয় বিলাসপ্রিয়, এতক্ষণ বেগমদিগের বিচ্ছেদে পীড়িত হইয়া উদ্ধ্বাসে বঙ্গদেশাভিমুখে চলিয়া গিয়াছেন ! হা—হা।”

যুবক অতিশয় ক্ষুধা হইয়া ভূমির দিকে অবলোকন করিতে লাগিল। ক্ষণেক পর বলিল, “তুমি আমার শত্রু, কিন্তু আমার জীবনরক্ষা করিয়াছ, এক্ষণে আমাকে আর একটু সাহায্য কর। একটু জল দাও, আর দুই এক দিন থাকিবান স্থান দাও। আমার দেশ অনেক দূর, এখানে আমার একজনও বন্ধু নাই, আমার নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। জল দাও, জল দাও।”

নরেন্দ্রের বালকাকৃতি দেখিয়া গজপতি সিংহের দয়ার আবির্ভাব হইয়াছিল, বালকের কাতরোক্তি শুনিয়া একটু মমতা হইল, শুক্রবা করিয়া শিবিরে লইয়া গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ ।

রাজা জয়সিংহের শিবির ।

Where judgment its clear sighted and
surveys
The chain of reason with unerring gazes.
Thompson.

একটি প্রকাণ্ড শিবিরের অভ্যন্তরে দুই জন মহাবীর বসিয়া কথোপকথন করিতে-

ছিলেন। একজন রাজপুত রাজা জয়সিংহ, অপর জন তাঁহার পত্নী সুহৃৎ দেবের খাঁ, জাতিতে পাঠান।

রাজার বয়স্ক্রম অনেক হইরাছে, কিন্তু এখনও মুখমণ্ডল যৌবনের তেজে পরিপূর্ণ, শরীর যৌবনের বলে বলিষ্ঠ। সে সময়ে মোগল-সম্রাটদিগের প্রধান সেনাপতি অধিকাংশই রাজপুত ছিলেন। রাজপুত-দিগের বাহুবীর্য্যই মোগলগণ নিরুৎসাহ হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত সমুদয় ভারতবর্ষ শাসন করিতেন। যেখানে ঘোর বিপদ বা ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত, সেই স্থানেই রাজপুত সেনাপতি প্রেরিত হইতেন ও প্রায়ই বিজয়লাভ করিয়া আসিতেন। আখ্যায়িকা-বিবৃতকালে রাজপুতানার রাজাদিগের মধ্যে দুই জন বিশেষ ক্ষমতামণ্ডলী ও প্রবল-পরাক্রান্ত ছিলেন;—রাজা জয়সিংহ ও রাজা যশোবন্তসিংহ। সম্রাট শাজিহান উজ্জ্বলকেই বিশ্বাস করিতেন ও বিপত্তির সময় ইহাদিগকেই রণে প্রেরণ করিতেন। সে সময়ে কি পাঠান, কি মোগল, কোন সেনাপতিরই জয়সিংহের স্তায় প্রতাপ, ক্ষমতা বা রণকৌশল ছিল না। তাৎকালিক একজন বিচক্ষণ ও প্রসিদ্ধ ফরাসী ভারতবর্ষে অনেক দিন ছিলেন, তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন যে, জয়সিংহের মত কার্য্যদক্ষ লোক সে সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষে বোধ হয় আর কেহই ছিলেন না। শাজিহান ও যুবরাজ দারা যখন শুল্লাইমান সেথকে সুলতান সুজার বিরুদ্ধে পাঠান, সঙ্গে জয়সিংহকে তাঁহার রাজপুত-সৈন্তের সহিত পাঠাইয়াছিলেন। বারানসীর যুদ্ধে সুজা পরাস্ত হইয়া বঙ্গদেশাভিমুখে পলায়ন করিয়াছিলেন।

শিবিরে উজ্জ্বল দীপাবলী জ্বলিতেছে,

বাহিরে প্রহরী, তাহার চারিদিকে অগ্নিশিবির। সে সময়ে রাজার শিবিরের মধ্যে আর কেহ ছিলেন না। কেবল রাজা ও তাঁহার সুহৃৎ দেবের খাঁ গুপ্তকথা করিতেছিলেন।

দেবের খাঁ বলিলেন, “বথার্থই জয়সিংহ নাম পাঠাইয়াছিলেন, আপনি যে স্থানে, জয় সে স্থানে।”

রাজা বলিলেন, “অত্কার যুদ্ধের কথা বলিতেছেন? যুদ্ধ কোথায়? বঙ্গদেশের সেনার সহিত যুদ্ধ কি যুদ্ধ?”

দেবের। কিন্তু অগ্নি যুদ্ধের সময় সুলতান সুজা কি সাহস ও বিক্রম প্রকাশ করেন নাই?

রাজা। তাহা স্বীকার করি। যুদ্ধের সময় তিনি সাহসের পরিচয় দেন, কাৰ্য্যের সময় বিলাস বিস্মৃত হন। কিন্তু কেবল সাহসে কি হয়, রণকৌশল জানেন না।

দেবের। সম্রাট-পুত্রদিগের মধ্যে কাহার অধিক রণকৌশল আছে? আপনি আরং-জীবকে কি মনে করেন?

রাজা। উঃ! তাঁহার নাম করিবেন না, সেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন লোক আমি দেখি নাই, যেরূপ বীরত্ব, সেইরূপ কৌশল। ওনিয়াছি, তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য রাজা যশোবন্ত সিংহ নন্দাদিত্যের সাহায্যেছেন। যশোবন্ত সিংহ রাণার জামাতা ও সেইরূপ যোদ্ধা ও বিক্রমশালী; কিন্তু আরংজীবের সহিত যুদ্ধে কি হয়, জানি না। যশোবন্তের সাহস আছে, কৌশল নাই। আমার বোধ হয়, এই ব্রাত্যবিরোধে অবশেষে আরংজীবের জয় হইবে।

দেবের। আপনি দারাকে পরিত্যাগ করিবেন?

রাজা। ইচ্ছামত কখনই নহে, কিন্তু

যুদ্ধে যদি অবশেষে আরঞ্জীবের জয় হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে সম্রাট, বলিয়া মানিতে হইবে। আমরা দিল্লীর সম্রাটের অধীন, যিনি যখন সম্রাট হইবেন, তখন তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ রাজবিদ্বেষিতা।

দেবের। ভাল, অতঃ আপনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে সৃজাকে বন্দী করিতে পারিতেন। সৃজা যখন পলায়ন করিলেন, আপনি অনায়াসে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ধরিতে পারিতেন, তাহা হইলে যুবরাজ দারাও অতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন। আপনি সেরূপ না করিলেন কেন?

রাজা। অতঃ সৃজাকে পলাইতে দিয়াছি, তাহার কারণ আছে। ভ্রাতার ভ্রাতার যেরূপ বিজাতীয় ক্রোধ, যদি সৃজাকে দারার সম্মুখে লইয়া যাইতাম, বোধ হয়, যুবরাজ তাঁহার প্রাণদণ্ড করিতেন অথবা বাবজীবন কারারুদ্ধ রাখিতেন। তাহা কি বিধেয়? বিশেষ, আমি এই যুদ্ধে আসিবার সময় সম্রাট শাজিহান, যাহাতে যুদ্ধ না হয়, এরূপ চেষ্টা করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। সৃজার হানি করা তাঁহার ইচ্ছা নহে। সম্রাটের এই কথা অনুসারে আমি সন্ধিস্থাপনের কথা বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম, সৃজাও একপ্রকার সন্মত হইয়াছিলেন; কিন্তু সুলাইমান যুবা পুরুষ, আপনি বিরুদ্ধ দেখাইবার জন্য অধৈর্য হইয়া সহসা গঙ্গাপার হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এরূপ সময় একজন প্রহরী আসিয়া বলিল, “মহারাজ, সেনানী গজপতি সিংহ একবার সাক্ষাৎ কবিত্তে গাহেন।” রাজা আসিতে আজ্ঞা দিলেন।

কণেক পর গজপতি সিংহ আসিয়া

বলিলেন, “মহারাজ! বঙ্গদেশের একজন হিন্দু বন্দী হইয়াছে, সে আহত। তাহার নিকট হইতে বঙ্গদেশীয় অনেক সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে।”

রাজা কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন, “আপাততঃ আমার শিবিরে থাকিতে দাও।” নরেন্দ্রনাথকে অচেতন অবস্থায় শিবিরে লইয়া যাওয়া হইল।

পরে জয়সিংহ গজপতিকৈ সোধোন করিয়া বলিলেন, “গজপতি, অতঃ তুমি যুদ্ধে আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছ, সে জন্য তোমাকে ও তোমার প্রভু যশোবন্ত সিংহকে আমি ধন্যবাদ দিতেছি। এক্ষণে কি কথা বলিবার জন্য যশোবন্ত তোমাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন, নিবেদন কর।”

উভয়ে গুপ্তকথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

জেলখা।

My heart is sair, I dare no tell

My heart is sair, for some body.

I could range the world around,

For the sake o' some body.

Burns

তাহার পর কয়েক দিন নরেন্দ্রনাথ জুরে অচেতন অবস্থায় থাকিলেন। মধ্যে মধ্যে সংজ্ঞা হইত, বোধ হইত যেন, তরীতে অতি দ্রুতবেগে গঙ্গার উপর দিয়া যাইতেছেন। পুনরায় কি দেশে কিরিয়া যাইতেছেন? বোধ হইত যেন, এক অল্পবয়স্ক, রমণী তাঁহার স্তম্ভা করিতেছে। আবার কি হেমলতাকে কিরিয়া পাইলেন? রোগীর চক্ষে জল আসিল।

কয়েক দিন এইরূপে অতিবাহিত হইল। যোগের ক্রমশঃ উপশম হইল। যখন সম্পূর্ণ চৈতন্ত হইল, দেখিলেন, এক অপূর্ব ঘরে একটি দীপ জলিতেছে। তিনি একটি শয্যার উপর বসিয়া রহিয়াছেন। এরূপ সুরম্য ঘর তিনি কখনও দেখেন নাই। সমস্ত ঘর সুন্দর খেতপ্রস্তর দ্বারা নিৰ্মিত। রোপ্যের শাখাদানে দীপ জলিতেছে ও সমস্ত গৃহ সুগন্ধে আমোদিত করিতেছে। তাঁহার পালক দ্বিধরদ-খচিত, সুবর্ণ ও রোপ্য দ্বারা বিভূষিত। সমুখে একটি রোপ্য আধারের উপর এক রোপ্য-পাত্রে জল রহিয়াছে, নীচে শয্যা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটি বিচিত্র গালিচার উপর এক যবনকত্তা ও এক খোজা বসিয়া অতি মৃদু-স্বরে কথোপকথন করিতেছে। যবনকত্তা যুবতী, তরুণী এবং সুন্দরী। মুখে সৌন্দর্য্য বলমূল করিতেছে, নয়ন হইতে সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ হইতেছে, ললিত বাহুলতা ও কমলীয় দেহলতায় সৌন্দর্য্য প্রবাহিত হইতেছে। হেমলতার অবয়ব নরেন্দ্রের হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল, কিন্তু এরূপ উজ্জল সৌন্দর্য্য নরেন্দ্র কোথাও দেখেন নাই, এরূপ স্বর্গীয় পরীর স্থার অবয়ব কখন দেখেন নাই। যবনকত্তার দৃষ্টিতে ও অঙ্গভঙ্গীতে যেন তেজ ও দর্পের পরিচয় দিতেছে। যবনকত্তা এক একবার পীড়িত হিন্দুর দিকে চাহিতেছে, এক একবার বিষমভাবে ভূমির দিকে চাহিতেছে, আবার মৃদুস্বরে খোজার সহিত কথা কহিতেছে। খোজা কুম্ভবর্ণ ও বলবান। তাহাদের কি কথা হইতেছিল, নরেন্দ্রনাথ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, কেবল দুই একটা কথা শুনিতে পাইলেন।

যবনকত্তা বলিতেছিল, “মসরুর, কেন

এ হিন্দুর ও আমার সর্বনাশ করিবে? নিদোষী নিরাশ্রয় ব্যক্তির জীবননাশে কি তোমাদের আমোদ?”

মসরুর। জেলেথা, তবু আমি কাকেরকে এ স্থলে আনিলে কেন?

জেলেথা। সে আমার দোষ; ইহার কি দোষ? ইনি ত নিদোষী।

মসরুর। কেন, এত মায়া কিসের জন্য? এ কাকের কি তোমার আসেক?

জেলেথা যোদ্ধ-কত্তা, সহসা তাহার বদনে পৈতৃক ক্রোধ ও তেজের আবির্ভাব হইল, রক্তোজ্জ্বল মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া যাইল; সক্রোধে বলিল, “মসরুর! যদি তুমি জীলোক হইতে, তাহা হইলে আমার কাতরতা বুঝিতে, যদি পুরুষ হইতে, তথাপি হৃদয়ে দয়া থাকিত। তোমার পুরুষত্বের সহিত দয়া অন্তর্ধান হইয়াছে, এক্ষণে এই প্রস্তর-শাণের অপেক্ষা তোমার হৃদয় কঠিন ও দুৰ্ভেদ্য।”

মসরুর হাসিয়া বলিল, “ঐ দেখ; কাকের উঠিয়াছে, আমি চলিলাম।” মসরুর বাহিরে চলিয়া যাইল।

জেলেথাও উঠিল, শয্যার দিকে আসিবার জন্তই উঠিল, কিন্তু ক্ষণেক স্থির হইয়া ভূমির দিকে স্থিরনয়নে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণেক পর জেলেথা ধীরে ধীরে নরেন্দ্রের নিকট আসিয়া ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিল। ক্ষত প্রায় আরাম হইয়াছে, জ্বরও গিয়াছে, কেবল শরীর দুর্বল। নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া একদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিক চাহিয়া রহিলেন। জেলেথার মুখ রঞ্জিত হইয়া উঠিল, শরীরের রক্ত বেগে ললাট, চক্ষু ও গণ্ডস্থল আরক্ত করিল।

পূর্বেও এই গৃহ ও শয্যা দেখিয়া নরেন্দ্র অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন, কোথাও

মাসিরাছেন, কে তাঁহাকে আনিব, কে সেবা করিতেছে? জেলেখা ও মসকরের কথা শুনিয়া ভীত হইয়াছিলেন, এখন জেলেখার আচরণ দেখিয়া আরও বিস্মিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি কোথায় আছি,—এই কি বঙ্গদেশ,—আপনি কে, আপনার নাম কি?”

নিমন্তক নিশাযোগে সহসা বজ্রধ্বনি হইলে লোকে ঘেরূপ চমকিত হয়, জেলেখা সহসা নরেন্দ্রের এই প্রথম কথা শুনিয়া সেইরূপ চমকিত হইল; কোন উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে অস্ত্র ওষ্ঠদ্বরে অঙ্গুলি-স্থাপন করিল।

নরেন্দ্র আবার বলিলেন, “আমি অস-হায় ও নিরাশ্রয়। আমি কোথায় আছি, অস্ত্রগ্রহ করিয়া বলুন।”

জেলেখা আবার ওষ্ঠে অঙ্গুলি-স্থাপন করিয়া সহসা মুখ ফিরাইল। নরেন্দ্রনাথের বোধ হইল যেন, তিনি জেলেখার উজ্জ্বল চক্রে জল দেখিতে পাইলেন; কিছু বুঝিতে পারিলেন না, চিন্তা করিতে করিতে আবার নিদ্রিত হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

স্বপ্ন না ইন্দ্রজাল ?

Ye high exalted, virtuous dames.
Tied up in godly laces.
are ye give poor frailty names.
Suppose a change o' cases.

Burns.

কয়েক দিবসের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ বিশেষ আরোগ্যলাভ করিলেন। কিন্তু শারীরিক আরোগ্য হইলে কি হইবে, অস্ত্র-করণ

চিন্তায় ক্লিষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার সেই ঘরে কেবল মসকর বা জেলেখা ভিন্ন কেহ আইসে না, কেহই কথা কহে না, মসকরকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে হাসিয়া চলিয়া যায়, জেলেখা ওষ্ঠের উপর অঙ্গুলি স্থাপন করে, অথচ স্পষ্ট বোধ হয়, জেলেখা তাঁহার দুঃখে চুঃখিনী, তাঁহার বিপদে বিপদাপমা। নরেন্দ্রনাথ ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি কি বঙ্গদেশে আসিয়াছেন? সুলতান সুল্লা নরেন্দ্রনাথকে ভাল-বাদিতন, সুলতানই কি স্বয়ং আজ্ঞা দিয়া নরেন্দ্রের পীড়ার সময় রাজমন্ডলে আনাইয়াছেন? সম্ভব বটে, রাজ-অট্টালিকা না হইলে একরূপ বহুমুখ্য এবং কোথায় সম্ভবে? কিন্তু সুল্লা কালীর যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন, নরেন্দ্রনাথ মৃতপ্রায় হইয়া শত্রুহস্তে পড়িয়া ছিলেন, তাহা তাঁহার অন্ন অন্ন স্মরণ ছিল। শত্রুরা কি অবশেষে তাঁহাকে ও জলাদহস্তে দিবার জন্ত এইরূপ শুক্রবা করিতেছিলেন? নরেন্দ্র কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

রজনী দ্বিপ্রহর, নরেন্দ্রনাথ একখানি ঘিরদ-বদ-খচিত আসনে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। সম্মুখে একটি দীপ জলিতেছে। নরেন্দ্র হস্তে গণ্ড-স্থাপন করিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছেন।

যখন চিন্তা-বজ্র ছিন্ন হইল, একবার বদনমণ্ডল উঠাইয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন। কি দেখিলেন?—জেলেখা নিঃশব্দে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। জেলেখার মুখমণ্ডল ও ওষ্ঠদ্বয় পাণ্ডুর, কেশপাশ আনুলালিত, বদন বিষর, নয়নদ্বয় জলে ছল্ ছল্ করিতেছে। নরেন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, “রমণি! আপনি কে, আনি না, আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলুন।”

জ্যেষ্ঠা উত্তর করিল না, ধীরে ধীরে একবিন্দু চক্ষের জল মোচন করিল।

নরেন্দ্র আবার বলিলেন, “আপনাকে দেখিয়া বোধ হয়, কোন বিপদ বা ভয় সন্নি-
কট। প্রকাশ করিয়া বলুন, যদি উদ্ধারের
উপায় থাকে, আমি চেষ্টা করিব।”

জ্যেষ্ঠা তথাপি নীরব; নীরবে অশ্রু-
মোচন করিল। ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।
নরেন্দ্র বিম্বিত হইলেন। নিশাবোধে এই
সহসা সাক্ষাতের অর্থ কিছুই স্থির করিতে
পারিলেন না। তাঁহার বোধ হইল যেন,
কোন ঘোর সঙ্কট সন্নি-কট। তিনি হস্তে
গুণ্ড-স্থাপন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,
অন্তমন্বয় হইয়া, নানা বিপদের চিন্তা করিতে
লাগিলেন।

সহসা গৃহের দীপ নিষ্কাণ হইল, সেট
ঘোর অন্ধকারে একজন খোজা আসিয়া
নরেন্দ্রকে তাহার সঙ্গে যাইতে ইঙ্গিত
করিল। নরেন্দ্র সভয়ে তাহার পশ্চাৎ
পশ্চাৎ চলিলেন। উভয়ে নিম্নকোণে কত ঘর,
কত প্রাঙ্গণ পার হইয়া গেলেন, তাহা বলা
যায় না। নরেন্দ্র রাজমহলের প্রাসাদ
দেখিয়াছিলেন, কিন্তু এরূপ প্রাসাদ কখনও
দেখেন নাই। কোথাও খেত-প্রস্তর-বিনি-
শ্চিত ঘরের ভিতর সুন্দর গন্ধদীপ জলি-
তেছে, খেত-প্রস্তর স্তম্ভাকারে উন্নত
ছাদ ধরিয়া রহিয়াছে, স্তম্ভে, ছাদে ও চারি-
দিকে বহুমূল্য প্রস্তরের ও সুবর্ণের পোরা
বে কারুকার্য, তাহা বর্ণনা করা যায় না।
কোথাও প্রাঙ্গণে ঈষৎ চম্পাকালোকে সুন্দর
সুন্দর বাগান, পুষ্পলতা; তাহার উপর
কোরারাজ জল খেলিতেছে; চারিদিক
দিয়া নৈশ সমীরণ নিম্নকোণে বহিয়া যাই-
তেছে। কোথাও বা উদ্যান-বৃক্ষতলে
জ্বালীন হইয়া দুই একজন উজ্জলবর্ণা উজ্জল

বেশধারিণী রমণী বীণা বাজাইতেছে অথবা
নিজার বশীকৃত হইয় সুখে নিদ্রা যাইতেছে।
বাহিরে খোজাগণ নিঃশব্দে পরিদর্শন করি-
তেছে আর রহিয়া রহিয়া স্থানে স্থানে নৈশ বায়ু
সেই ইন্দ্রপুরীর উপর বহিয়া যাইতেছে।
নরেন্দ্র আপন বিপদকথা ভুলিয়া গেলেন,
এই সুন্দর প্রাসাদ, সুন্দর ঘর ও প্রাঙ্গণ,
সুন্দর উদ্যান ও এই অপূর্ব পরিবেশধারিণী
রমণীদিগকে দেখিয়া বিম্বিত হইলেন। তিনি
কোথায়? এ কোন্ স্থান?

কতক্ষণ পরে তিনি একটি উন্নত সুবর্ণ-
খচিত কবাটের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।
সহসা সেই কবাট ভিতর হইতে খুলিয়া
দেখ। নরেন্দ্র একটি উন্নত আলোক-পূর্ণ
ঘরে প্রবেশ করিলেন। সহসা অন্ধকার
হইতে উজ্জল আলোকে আনীত ওয়ার
কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আলোক
সহ করিতে না পারিয়া হস্ত দ্বারা নয়ন
আবৃত করিলেন, অমনি শত শত নারী-কণ্ঠ-
বিনিঃসৃত হাস্যধ্বনিতে সে উন্নত প্রাঙ্গণ
ধ্বনিত হইল।

নরেন্দ্র জীবনে কখনও এরূপ দৃশ্য
হন নাই। কোথায় আসিলেন? এ কি
প্রকৃত ঘটনা, না স্বপ্ন? এ কি পার্থিব ঘটনা,
না ইন্দ্রজাল? নরেন্দ্র পুনরায় চক্ষু উন্মীলন
করিলেন, পুনরায় উজ্জল আলোকস্রোত
তাঁহার নয়ন বলসিত হইল; আবার হস্ত
দ্বারা নয়ন আবৃত করিলেন। পুনরায় শত-
নারী-কণ্ঠ-ধ্বনিতে প্রাসাদ শব্দিত হইল।

ক্ষণেক পরে যখন নরেন্দ্র চাহিতে লক্ষ্য
হইলেন, তখন বাহা দেখিলেন, তাহাতে
তাঁহার বিষয় দশ গুণ বর্ধিত হইল। দেখি-
লেন, খেত-প্রস্তর-বিনিশ্চিত একটি উচ্চ
প্রাসাদের মধ্যে তিনি আনীত হইরাছেন।
সারি সারি প্রস্তরস্তম্ভ উচ্চ ছাদ ধারণ করিয়া

রহিয়াছে, সে ছাদে ও সে স্তম্ভে বেরূপ বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তরের কারুকার্য দেখিলেন, সেরূপ তিনি জগতে কত্য়পি দেখেন নাই। স্তম্ভ হইতে স্তম্ভান্তরে সুগন্ধ পুষ্পমালা লম্বিত রহিয়াছে, নীচে স্তম্ভকে স্তম্ভকে পুষ্পরাশি সজ্জিত রহিয়াছে, শত-নারীকণ্ঠ হইতে পুষ্পমালা দোড়ল্যমান হইয়া সুগন্ধে ঘর আমোদিত করিতেছে। ছাদ হইতে, স্তম্ভ হইতে, পুষ্প ও গজরাশির মধ্য হইতে সহস্র গন্ধদীপ নয়ন ঝলসিত করিতেছে ও সেই সুন্দর উন্নত প্রাসাদ আলোকময় ও গন্ধপরিপূর্ণ করিতেছে। রেখাকারে শত রমণী দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই রেখার মধ্যস্থানে দীপালোক-প্রতিঘাতী রত্নরাজিবিম্বিত উচ্চ সিংহাসনে তাহা-দিগের রাজ্ঞী উপবেশন করিয়া আছেন। এ স্বপ্ন না ইন্দ্রজাল? নরেন্দ্র আলফালায়লায় পড়িয়াছিলেন যে, এমনহাসেন নামক একজন দরিদ্র ব্যক্তি একদিন নিদ্রা হইতে উখিত হইয়া সহসা দেখিলেন, যেন তিনি বোঙ্গাদেশ কালিক হইয়াছেন। নরেন্দ্রের স্বপ্ন তদপেক্ষাও বিস্ময়কর, তিনি যেন সহসা স্বর্গোচ্চানে আপনাকে অমরাবেষ্টিত দেখিলেন।

নরেন্দ্র সেই অমরা বা নারীরেখার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাহারা নিঃশব্দে রেখাকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সকলেই বকের উপর দুই হস্ত স্থাপন করিয়া ভূমির দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, দেখিলে জীবনশূন্য পুতলির স্তায় বোধ হয়। তাহাদের কেশপাশ হইতে মণিহুঙ্কা দীপালোক প্রতিহত করিতেছে, উজ্জ্বল বহুমূল্য বসন সেই আলোকে অধিকতর উজ্জ্বল দেখাইতেছে। তাহারা সকলেই যেন রাজ্ঞীর আদেশ-সাধক হইয়া নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

সেই রাজ্ঞীর দিকে যখন চাহিলেন, নরেন্দ্র তখন শতশৃণু বিস্মিত হইলেন। যৌবন অতীত

হইয়াছে, কিন্তু যৌবনের উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য ও উন্নততা এখনও বিলীন হয় নাই, বোধ হয়, যেন প্রথম যৌবনের বেগ ও লালসা ধরসে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাজ্ঞীর শরীর উন্নত, ললাট প্রশস্ত, ওষ্ঠ ও সমস্ত বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ, কৃষ্ণ কেশপাশ চকিতে একটিমাত্র বহুমূল্য হীরকখণ্ড আলোকে ধক্ধক্ করিতেছে। নয়নদ্বয় তদপেক্ষা অধিক জ্যোতির সহিত উজ্জ্বল, মলমলের অলঙুতনে সে উজ্জ্বলতা গোপন করিতে অক্ষম। দেখিলেই বোধ হয়, নারী হউন বা অমরা হউন, ইনি কোন অসাধারণ মহিলা, জগৎ বা স্বর্গপুরী শাসন করিবার জন্তই অবতীর্ণা হইয়াছেন।

কিন্তু নরেন্দ্রের এ সমস্ত দেখিবার অবসর ছিল না। সহসা যেন স্বর্গীয় বাস্তব হইতে কোন স্বর্গীয় তান উখিত হইতে লাগিল, তাহার সহিত সেই শত অমরার কণ্ঠধ্বনি মিশ্রিত হইতে লাগিল। সেইরূপ অপরূপ গীত নরেন্দ্র কখনও শুনে নাই, তাহার সমস্ত শরীর কটকিত হইল, তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া সেই গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সেই গীত ক্রমে উচ্চতর হইয়া সেই উন্নত প্রাসাদ অতিক্রম করিয়া, নৈশ গগনে বিস্তার পাইতে লাগিল; বোধ হইল যেন, নৈশ গগনবিহারী অদৃষ্ট জীবগণ সেই গীতের সহিত যোগ দিয়া শতশৃণু বর্জিত করিতে লাগিল। ক্রমে আবার মল্লীকৃত হইয়া সে গীত বীরে বীরে লীন হইয়া গেল, আবার প্রাসাদ নিঃসর-শব্দশূন্য। এইরূপ একবার, দুইবার, তিনবার গীতধ্বনি স্রুত হইল, তিনবার সেই গীতধ্বনি স্রুত হইল, তিনবার সেই গীতধ্বনি ক্রমে লীন হইয়া গেল।

তখন রাজ্ঞী সজোরে পদাঘাত করার সেই প্রাসাদের একদিকের একটি রক্তবর্ণ যবনিকা পতিত হইল। নরেন্দ্র স্তম্ভে চাহিয়া দেখি-

লেন, তাহার অপর পার্শ্বে চারি জন কঠার-
ধারী রক্তবর্ণ খোজা রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান
করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রাজ্ঞী পুনরায়
পদাঘাত করায় তাহাদের মধ্যে প্রধান এক-
জন রাজ্ঞীর সিংহাসন-পার্শ্বে যাইয়া দণ্ডায়-
মান হইল। নরেন্দ্র দেখিলেন, সে মসরুর।
নরেন্দ্রের বয়নীতে শোণিত শুক হইয়া গেল।

মসরুর রাজ্ঞীর সহিত অনেকক্ষণ অতি
মৃদুস্বরে কথা কহিতে লাগিল, কি বলিতেছিল,
নরেন্দ্র তাহা শুনিতে পাইলেন না; কিন্তু
কথা কহিতে কহিতে মধ্যে মধ্যে নরেন্দ্রের
দিকে অভুলিনির্দেশ করিতে লাগিল, মধ্যে
মধ্যে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া, নয়ন আয়ত
করিয়া, যেন কি উদ্ভেজনা করিতে লাগিল।
মসরুর কি বলিতেছিল, নরেন্দ্র তাহা
জানিতে পারিলেন না, কিন্তু তাহার আকৃতি
ও রক্তভঙ্গী দেখিয়া নরেন্দ্রের হৃদয়ে ভয়ের
সঞ্চার হইতে লাগিল। নরেন্দ্রকে এই
অপরিসীত দেশে জন্মাদ-হন্তে প্রাণ দিতে
হইবে, তাহার প্রতীতি হইল।

রাজ্ঞী পুনরায় পদাঘাত করিলেন। তৎ-
ক্ষণাৎ প্রাসাদের অন্তর পার্শ্বে একটি হরিষ্রণ
যবনিকা পতিত হইল। তাহার অপর পার্শ্বে
চারি জন পরিচারিকা হরিষ্রণ পরিচ্ছদে
দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দ্বিতীয়বার পদাঘাত
করায় সেই পরিচারিকাগণ একজন বন্দীকে
রাজ্ঞীর নিকট ধরিয়া আনিল। নরেন্দ্র সবি-
শ্রয়ে দেখিলেন, সে বন্দী জেলেখা।

জেলেখা কি বলিল, নরেন্দ্র তাহা শুনিতে
পাইলেন না, কিন্তু তাহার আকার ও অঙ্গ-
ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইল, সে রাজ্ঞীর অঙ্গুগ্রহ
প্রার্থনা করিতেছে, অশ্রুত্যাগ করিয়া রাজ্ঞীর
পদে নৃত্তিত হইতেছে।

রাজ্ঞী বার বার নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া
দেখিলেন। নরেন্দ্র স্বভাবতঃ গৌরবর্ণ, তাহার

নয়ন জ্যোতিঃ-পরিপূর্ণ, ললাট উন্নত, বদন-
মণ্ডল উগ্র ও তেজোবাজক। সাংসী,
অন্নবস্ত্র, সুন্দর যুবক উন্নত ললাট ও প্রশস্ত
মুখমণ্ডলের দিকে রাজ্ঞী বার বার নয়নক্ষেপণ
করিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রের দিকে অনেকক্ষণ চাহিতে
চাহিতে রাজ্ঞী নরেন্দ্রের অভুলিতে একটি
অঙ্গুরীয় দেখিতে পাইলেন। হস্তভাগিনী
জেলেখা নরেন্দ্রের পীড়ার সময়ে একদিন
লীলাক্রমে সে অঙ্গুরীয়টি পরাইয়া দিয়াছিল,
সেই অবধি তাহা নরেন্দ্রের হাতে ছিল।
অঙ্গুরীয় রাজ্ঞীর পরিচারিকাগণ চিনিয়া, রাজ্ঞী
স্বয়ং চিনিলেন। তখন ক্রোধে রাজ্ঞীর স্নানর
ললাট রক্তবর্ণ হইল, নয়ন হইতে অগ্নি বহি-
র্গত হইল।

বিচার শেষ হইল। নির্দয়হৃদয়া রাজ্ঞী
আদেশ দিলেন, “জেলেখা অপরাধিনী, পাণী-
য়সীকে শূল দাও! কাফেরকে লট্টয়া বাও,
হস্তিপদে দলিত করিয়া কাফেরকে হনন
কর!”

একেবারে দীপাবলী নির্বাণ হইল।
নিঃশব্দে অন্ধকারে খোজাগণ রক্ত ধারী
নরেন্দ্রকে বন্ধন করিতে লাগিল।

অন্ধকারে কে নরেন্দ্রের যুগ্মের নিকট
একটি পাত্র ধারণ করিল। নরেন্দ্র বিশ্বয় ও
উদ্বেগে তৃষ্ণার্ত হইয়াছিলেন, সেই পাত্র
হইতে পানীয় পান করিলেন, অচিরে অচে-
তন হইয়া পড়িলেন। তাহার পর কি হইল,
তিনি জানিলেন না, কেবল বোধ হইল, যেন
সেই অন্ধকারে কে আসিয়া তাহার হস্ত
হইতে সেই অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিল, আর
কে যেন সেই অন্ধকারে রোদন করিতেছিল।
তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, অভাগিনী
জেলেখা।

নরেন্দ্রনাথ যখন আগ্রসিত হইলেন, তখন

দেখিলেন, সূর্য্যোদয় হইয়াছে, সূর্য্যের রশ্মিতে তিনি একটি প্রশস্ত বাজারের মধ্যে একটি শর্গকীরের ধারে শুইয়া রহিয়াছেন। সূর্য্যের নবজাত রশ্মি তাঁহার মুখে পতিত হইয়াছে ও পথ, বাট, অট্টালিকা, দোকান, বাজার, বস্তী আলোকময় করিয়াছে। এ কোন্‌ গহর ? এ কি বঙ্গদেশের রাজধানী রাজমহল ? সুলতান জ্ঞান কি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বারাগনী হইতে এই স্থানে আনিয়াছেন ? গত নিশায় কি তিনি এই ভূমিশ্যায় শুইয়া প্রাসাদ ও পরীর স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন ?

— — —

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

— :: —

গজপতি সিংহ ।

Hail majesty most excellent !
While nobles strive to please ye.
While ye accept a compliment
Simple poet gives eye ?

Burns.

নরেন্দ্রের বিশ্বয়ের পরিসীমা রহিল না। সে স্থানটি তিনি পূর্বে কখনও দেখেন নাই। সেই স্থান একটি প্রকাণ্ড সরাইয়ের মত বোধ হইল। মধ্যস্থানে একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, তাহার চারিপার্শ্বে দ্বিতল হস্ত্যক্ষেত্রী, প্রত্যেক প্রকোষ্ঠেই দুই একটি করিয়া লোক আছে। সমস্ত লোক অধিকাংশই সম্ভ্রান্ত পারস্ত, আরবিক, পাঠান বা হিন্দু বাণিজ্য-ব্যবসারী। প্রথমে নগরে আসিয়া এই সরাইয়ে দাঁড়াইয়া করিয়া আছে। সকল লোক সরাইয়ে আসিলে নিশায় হার রুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে প্রাতঃকালে পুনরায় সরাইয়ের বহির্দ্বার উন্মোচিত হইল, লোকে গমনাগমন করিতে লাগিল।

এক বৃদ্ধ পারস্তদেশীয় সেথ একটি প্রকোষ্ঠে বসিয়া তাম্বাক খাইতেছিল।

নরেন্দ্র বাইরা জিজ্ঞাসা করিলেন, “সেথজী, এটি কোন্‌ স্থান ? আমি এখানে নতুন আসিয়াছি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।” সেথজী বলিলেন, “বৎস, আমিও বাণিজ্যকর্মে এই সহরে কল্য আসিয়াছি, সহরের বিশেষ কিছু জানি না।”

নরেন্দ্র। আপনি আমার অপেক্ষা অধিক জানেন। এই স্থানের কথা কিঞ্চিৎ আমাকে বলুন।

সেথজী। আমি যথার্থই বলিতেছি, এ সহরের কিছুই জানি না। তবে শুনিলাম, এই স্থানটি বেগম সাহেবের সরাই। সম্রাটের জ্যেষ্ঠা কন্যা পাদশা বেগম সহরে নতন আগন্তকের থাকিবার সুবিধার জন্য এই উৎকৃষ্ট সরাই নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। আমি হুমরকন্দ ও বোখারা দেখিয়াছি, সিরাজ ও ইম্পাহান দেখিয়াছি, কিন্তু এমন সুন্দর সহর দেখি নাই।

নরেন্দ্র। এ সহরের নাম কি ? পাদশা বেগমই বা কে ?

বৃদ্ধ বণিক্‌ অনেকক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে দুবকের দিকে চাহিয়া একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, “এ কাকের দেখিতেছি জ্ঞানশূন্য, পাগ্‌ লাটাকে তাড়াইয়া দাও। পাগ্‌ লানী চড়িলেই এইক্ষেণে কি করিয়া বসিবে।

নরেন্দ্র গতিক মন্দ দেখিয়া সে স্থান হইতে সরিয়া গেলেন। পরে দেখিলেন, একজন পাঠান-স্ত্রী কতকগুলি ফলমূল লইয়া বিক্রয়ার্থ ধনী বণিকদিগের নিকট বাইতেছে। নরেন্দ্র তাহার কাছে বাইরা জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিবি, এ সহরের নাম কি, এ স্থানকেই বা লোকে কি বলে ?” বৃদ্ধা বিস্মিত হইয়া কণেক নরেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া পরে উত্তর করিল, “কাকের, আমার সে বরস নাই, উপহাস করিতে হয়, অস্ত্র স্থানে বাও, এ

খবরত মুখ দেখিলে অনেক কক্ষনীও
ভুলিয়া বাইবে।”

নরেন্দ্রনাথ অপ্রতিভ হইলেন; দেখি-
লেন, একজন রাজপুত সৈনিক-পুরুষ দাঁড়া-
ইয়া রহিয়াছেন, একজন ভৃত্য তাঁহার অখের
সেবা করিতেছে, সৈনিক সসজ্জ হইয়া
ভৃত্যকে শীঘ্র কার্য সমাধা করিতে বলিতে-
ছেন। নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি
এই স্থানে নূতন আসিয়াছি, এ স্থানটির নাম
কি, জানি না। আপনি বোধ হয়, অনেক
দিন এ স্থানে আছেন, আমাকে এ নগরের
কথা কিছু বলিতে পারেন?”

রাজপুত অনেকক্ষণ নরেন্দ্রের দিকে
দেখিয়া উত্তর করিলেন, “বালক, তোমার
মুখ আমি পূর্বে দেখিয়াছি, তুমি বঙ্গদেশ
হইতে আসিয়াছ, না? হাঁ, স্বরণ হইয়াছে,
তুমি আমাকে ইহার মধ্যে বিম্বত হইয়াছ?”

নরেন্দ্র তখন রাজপুতকে ভাল করিয়া
দেখিয়া বলিলেন, “না, বিম্বত হই নাট,
গজপতি, তুমি কাশীর যুদ্ধের পর আমার
জীবন রক্ষা করিয়াছ, জীবন থাকিতে আমি
তোমাকে বিম্বত হইতে পারিব না।”

তুমি জনে অনেকক্ষণ আলাপ-পরিচয়
হইতে লাগিল। বিম্বিত হইয়া নরেন্দ্র জানি-
লেন যে, নগর হিন্দুস্থানের রাজধানী প্রসিদ্ধ
দিল্লী নগর। কথার কথার গজপতি প্রকাশ
করিলেন, “আমি মহারাজ জয়সিংহের
নিকট হইতে কতিপয় পত্রাদি লইয়া মহা-
রাজ বশোবন্ত সিংহের নিকট বাইতেছি।
তিনি আপাততঃ উজ্জয়িনীতে আরাজীবের
সহিত যুদ্ধার্থে গিয়াছেন, যুদ্ধ না হইতে হই-
তেই আমি তথায় পৌঁছিতে পারিলেই
যত্ন। তুমি যদি ইচ্ছা কর, তবে আমার
সঙ্গে আইস, আমি মহারাজকে বলিয়া
তোমাকে অধারাহীর কার্যে নিযুক্ত করিয়া

দিব।” নরেন্দ্র সে দেশে বহুদীন ও অর্থহীন,
ভারিয়া চিন্তিয়া সেই প্রস্তাবে সম্মত হই-
লেন। তৎপরে দুই জনে দিল্লীনগর-ক্রমাণে
বাহির হইলেন।

মহাভারতে বিবৃত ইন্দ্রপ্রস্থ নগর যে
স্থানে ছিল, ভারতবর্ষের শেষ হিন্দু-সম্রাট
পৃথুরারের রাজধানী দিল্লী নগর যে স্থানে
ছিল, এই আধ্যাত্মিক-বিবৃত সময়ের কয়েক
বৎসর পূর্বে সম্রাট, শাজিহান সেই স্থানে
নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া ও স্থল
প্রাসাদ ও দুর্গ নির্মাণ করিয়া নগরের শাজি-
হানাবাদ নাম দেন। কিন্তু নগরের সে নাম
কেহ জানে না, অত্যাধি শাজিহানের নগর
নূতন দিল্লী নামে বিখ্যাত। পৃথুরারের সম-
য়ের হিন্দু নাম অত্যাধি পরিবর্তিত হয়
নাই।

দিল্লী এক দিকে যমুনানদী ও অত্র তিন
দিকে অর্ধগোলাকৃতিরূপে প্রাচীর দিয়া
বেষ্টিত। সে প্রাচীর প্রশস্ত ও তাহার উপর
দিরা বাতায়াতের একটি পথ ছিল। যমুনা
ও এই প্রাচীরের মধ্যে দিল্লীর নগর সন্নিবেশিত,
কিন্তু প্রাচীরের বাহিরেও তিন চারিটি বৃহৎ
বৃহৎ পল্লী ছিল ও ধনাঢ্য ও বহুলাংশে হিন্দু-
রাজগণের অট্টালিকা ও বাগান অনেক দূর
অবধি দেখা বাইত। দিল্লীর ভিতরে যমুনীর
অনতিদূরে প্রস্তর-প্রাচীর পরিবেষ্টিত দুই
আছে, তাহার ভিতর সম্রাটের প্রাসাদ
ও অগতে অভূত্যা যন্ত্র-নির্মিত হইল,
বলী।

গজপতি ও নরেন্দ্র দিল্লীর একটি প্রাচীর
পথ দিয়া দুর্গাতিমুখে যাঁতে লাগিলেন।
সমস্ত দিল্লীই প্রায় সৈনিকের বাস, সে নগর।
পঞ্চত্রিংশ সহস্র সৈন্য বাস করিত। সৈন্য
গণের স্ত্রী, পরিবার ও বহুসংখ্যক ভৃত্য
নগরে বৃত্তিকা ও পর্ণকুটীরে বাস করিত।

হুতরাং দিল্লী এইরূপ পৰ্বকূটীয়েই পরিপূর্ণ। বদিকে দেখা যায়, এইরূপ কূটীরশ্রেণীই দক্ষিণাংশ দেখা যায়। খাত্তজব্যা ও বস্ত্রাদি-বস্ত্রার্থে যে দোকান ছিল, তাহাও অধি-নাংশ পৰ্বকূটীর, সৰ্ব্বদাই অগ্নি লাগিত ও বৎসরে বৎসরে প্রায় বহু সহস্র পৰ্বকূটীর একেবারে নষ্ট হইয়া বাইত। নরেন্দ্র দুই পায়ে এইরূপ কূটীর দেখিতে দেখিতে চলিলেন। দোকানী-পশারী নানারূপ দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে; পথ লোকারণ্য; অধি-নাংশই অতি সামান্ত লোক, অতি সামান্ত-রূপে নিজ নিজ কর্মে বাইতেছে। দিল্লীতে এক্ষণে বৈরাগ্য মধ্যশ্রেণী বাবসারী ও অন্তান্ত লোক ইষ্টকালর নির্ধাণ করিয়া নগর পরি-পূর্ণ ও সুশোভিত করিয়াছে, দুই শত বৎসর পূর্বে তাহা ছিল না। তখন কেবল মহল্লোক বা ইতরলোক ছিল, প্রাসাদ বা পৰ্বকূটীর।

বাইতে বাইতে নরেন্দ্র একটি বড় রাজ-পথে গিয়া পড়িলেন। সে পথে অনেকগুলি প্রশস্ত ও বড় বড় অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন। মনুষ্যবাহার, কাজী, বণিক, ওয়রাহ, রাজা প্রভৃতি মহল্লোকের হর্য্যশ্রেণীতে পথ সুন্দর দেখাইতেছে। নরেন্দ্র এরূপ সুন্দর অট্টালিকাশ্রেণী কোথাও দেখেন নাই, প্রাসাদ সমূহের পার্শ্ব দিয়া বাইতে বাইতে পথটির সহিত তিনি কথোপকথন করিতে গেলেন।

কখনকখন বাইতে উভয়ে প্রসিক মসজীদ দেখিতে পাইলেন। ভারত-সকল মসজীদ আর একটিও ছিল না, হয়, ভগ্নস্তম্ভের ন্যায়। নরেন্দ্রনাথ ভাবত হইয়া ভিজ্ঞান করিলেন, “সম্মুখে বহু মসজীদ কি?”

পরিপত্তি। ওটী জুয়া মসজীদ। ওনি-ই, একটি পক্ষের উপরিভাগ সমতল

করিয়া তাহার উপর ঐ মসজীদ নির্মিত হইয়াছে। উহার আরম্ভবর্ষে নয়ন ঝল-সাইয়া বাইতেছে, তাহার উপর খেতপ্রস্ত-রের তিনটি গম্বুজ উঠিয়াছে। বামশাহ বখন দিল্লীতে থাকেন, বয়ঃ ঐ মসজীদে প্রতি শুক্রবার যান, সে সমারোহে দুই একদিন দেখিলে কখনও ভুলিতে পারিবেন না। দুর্গ হইতে মসজীদ পধ্যাঙ চারি পাঁচ শত সিপাহী সারি দিয়া দাঁড়ায়, তাহাদের বন্দুকের উপর হইতে সুন্দর রক্তবর্ণ পতাকা উড়িতে থাকে। পাঁচ ছয় জন অঝোরোহী পথ পরি-কার করিতে করিতে আগে যায়, পরে বাম-শাহ হস্তীর উপর জাজ্জল্যমান সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যান, তাহার পর ওয়রাহ ও মনুষ্যবাহারগণ অপরূপ সজ্জা করিয়া মস-জীদে গমন করে। কিন্তু আর এ স্থানে দাঁড়াইয়া কি হইবে? চল, আমরা দুর্গেব ভিতর বাইরা রাজবাটী দেখি।

দূর হইতেই রক্তবর্ণ উন্নত দুর্গ-প্রাচীরের অপরূপ সৌন্দর্য দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ চমৎ-কৃত হইলেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষে যে দেশের যে লোক আসিয়াছেন, তিনি দিল্লীর দুর্গ ও রাজবাটীর খেতপ্রস্তরনির্মিত মসজীদ, প্রাসাদ ও হর্য্যাবলীকে অগতের মধ্যে অভূত-বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। দুর্গ-প্রাচীরের স্থানে একটি বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ, তাহার মধ্যে একজন হিন্দুরাজার শিবিরশ্রেণী রহি-রাছে, রাজা দুর্গের দ্বাররক্ষা করিতেছেন। অঝোরোহী ও ওয়রাহগণ সৰ্ব্বদাই এদিক্ ওদিক্ বাতায়িত করিতেছেন, এবং দুর্গের ভিতর হইতে সিপাহিগণ বাহিরে আসি-তেছে, আবার ভিতরে বাইতেছে। বিদেশীর বণিকগণ দুর্গদ্বারে সমবেত হইতেছে এবং সহস্র সহস্র ইতরলোকও নদীর স্রোতের তীর এদিক্ ওদিক্ ধাবিত হইতেছে।

স্বায়ংসে দুইটি প্রস্তর-নির্মিত হস্তীর আকৃতি, তাহার উপর দুইটি মনুষ্যের প্রতিমূর্তি। নরেন্দ্র উৎসুক হইয়া, এ কাহার প্রতিমূর্তি, জিজ্ঞাসা করিলেন। গজপতি বলিলেন, “আপনি হিন্দু, আপনি জানেন, না ? ইহার দুই জন রাজপুত বীরপুরুষ। চিতোরের জয়মল ও পদ্ম সন্ধ্যাট আকুবরের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিয়া সেই দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। পরে যখন আর পারিলেন না, অধীনতা স্বীকার করিতে অস্বীকৃত হইয়া যুদ্ধে হত হন। আমার পিতামহ তিলকসিংহ সেই যুদ্ধে জীবনদান করিয়াছিলেন, পিতা তেজসিংহের নিকট বাল্যকালে সে অপূর্ণ-কাহিনী শুনিলাম। পদ্মের মাতা ও বনিতা বীররমণী ছিলেন, তাহারাও বীরত্ব প্রকাশ করিয়া হত হন। তাহাদিগের কীর্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্ত সন্ধ্যাট আকুবর এই প্রতিমূর্তি এই স্থানে স্থাপন করিয়াছেন।” পরে সগর্বে গজপতি বলিলেন, “কিন্তু রাজপুত রাজাদিগের কীর্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্ত প্রতিমূর্তির আবশ্যক নাই, যত দিন বীরত্বের গৌরব থাকিবে, রাজপুত নাম কেহ ক্ষান্ত হইবে না, রাজপুতানার প্রত্যেক পর্বতশিখরে রাজপুতের বীরনাম খোদিত আছে, ভারতবর্ষের প্রত্যেক বেগবতী নদীতরঙ্গে রাজপুতের বীরনাম শব্দিত হইতেছে।

প্রশস্ত পথ অতিবাহন করিয়া দুই জনে দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিলেন। পথের দুই ধারে অট্টালিকা, তাহার উপর রাজকর্ণ-চারিগণ রাজকাৰ্য্য করিতেছেন। দুর্গের দ্বারের বাহিরে বেরূপ হিন্দু রাজগণ দ্বার রক্ষা করিতেন, ভিতরে এই পথের উপর মন্দির-দার ও গুমরাহগণ সেইরূপ দ্বাররক্ষা করিতেন।

দুর্গের ভিতর উভয়ে বড় বড় কারখানা দেখিতে পাইলেন। রাজপরিবারের যে সমুদায় বিচিত্র দ্রব্য আবস্তক হইত, এই স্থানে তাহা প্রস্তুত হইত। এক স্থানে রেশম-কাৰ্য্যের কারখানা, অল্প স্থানে চিত্রকার-দিগের। ছুতার, দরজী, চৰ্ম্মবাবসারী, বস্ত্র-বাবসারী প্রভৃতি সকল প্রকার লোকের কারখানা ছিল। দেশে যত উৎকৃষ্ট কারিকর ছিল, তাহারা প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাৰ্য্য করিত ও মাসিক বেতন পাইত।

সে সমস্ত কারখানা পশ্চাতে রাখিয়া উভয়ে ভিতরে যাইতে লাগিলেন। অনেক সমারোহের মধ্য দিয়া, অনেক বিস্ময়কর দৃশ্য ও প্রাসাদের পার্শ্ব দিয়া যাইয়া অবশেষে জগদ্বিখ্যাত মর্ধ্যপ্রাসাদ, “দেওয়ান খাস” দেখিতে পাইলেন; প্রাসাদের ছাদ সুবর্ণ দ্বারা মণ্ডিত ও রৌদ্র-তাপে বলমল করিতেছে। প্রাসাদের ভিতরে সুবর্ণ ও হীরক-পচিত দিবালোক-প্রতিঘাতী রত্ন-বিনির্মিত রাজসিংহাসনের উপর সন্ধ্যাট শাজিহান উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন; তাহার গম্ভীর ও প্রশান্ত মুখমণ্ডলে এখনও পীড়িত চিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে; তিনি এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেন নাই। দক্ষিণপার্শ্বে জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা বসিয়া রহিয়াছেন; তাহার ললাট ও বদনমণ্ডল সুন্দর ও প্রশস্ত, কিন্তু মুখে দুর্দমনীয় দর্প ও অভিমান বিরাজ করিতেছে। বামদিকে পৌত্র সুলতান সলাইমান দণ্ডারমান রহিয়াছেন; বয়স পঞ্চবিংশতি বর্ষ হইবে, অবয়ব ও আকৃতি সুন্দর ও উন্নত। পশ্চাতে খোজাগণ ময়ূরপুচ্ছ বিনির্মিত চামর হেলাই-তেছে। তাহার চারিদিকে রৌপ্য-নির্মিত দেয় আছে, দেয়ালের বাহিরে রাজা, গুমরাহ,

পবনায়, হুত, সেনাপতি ও ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান লোক উচিত বেশভূষার ভূষিত হইয়া কুতাজলিপুটে ভূমির দিকে চাহিয়া নভারমান হইয়া রহিয়াছে। সমুখের সমভূমি লোকে পরিপূর্ণ। কি ধনী, কি নিধন, কি উচ্চ, কি নীচ, সে স্থানে যাইয়া, রাজ্যক দর্শন করিবার সকলেরই অধিকার আছে। সেই অপূর্ণ প্রাসাদে বথার্থই লিখিত আছে,—“যদি পৃথিবীতে স্বর্গ থাকে, তবে এই স্বর্গ, এই স্বর্গ, এই স্বর্গ।”

সম্রাটের সম্মুখে প্রথমে সুন্দর সুন্দর আরবদেশীয় অশ্ব প্রদর্শিত হইল। পরে বৃহৎকার হস্তিশ্রেণী পরিদর্শিত হইল। হস্তি-গণ কর উত্তোলন করিয়া বাদশাহকে “তসলীম” করিয়া চলিয়া গেল। পরে হরিণ, বৃষ, মহিষ, গণ্ডার, ব্যাঘ্র প্রভৃতি সকল জন্তু ও তৎপরে নানারূপ পক্ষী একে একে পরিদর্শিত হইল। সম্রাটের বর্মধারী অম্বারোহিণী, তৎপরে বহুদশী কয়েক শত পদাতিক, তৎপরে অস্ত্রাস্ত্র সেনাগণ একে একে সম্রাটের সম্মুখে দিয়া চলিয়া গেল; তাহাদিগের পদধরে মেদিনী কল্পিত হইল।

প্রদর্শন সমাপ্ত হইলে পর বাদশাহ দয়াক্ষ প্রহণ করিতে লাগিলেন। কি নীচ, কি উচ্চ, সকলেই আদিয়া রাজ্যধিরাজ ভারতবর্ষের সম্রাটের নিকট আপন আপন দুঃখ জানাইতে লাগিল, সম্রাট্‌ ছুই একটি আদেশ দিয়া সকলের দুঃখ মোচন করিতে লাগিলেন। সম্রাট্‌ যে বিষয়ে যে কথা বলিলেন, তৎক্ষণাৎ সকল প্রধান প্রধান ওমরাহগণ “কেরামৎ” “কেরামৎ” বলিয়া ধস্তবাদ দিতে লাগিলেন।

ছুই ঘণ্টার মধ্যে রাজকাৰ্য্য সমাধা হইয়া গেল, সম্রাট্‌ কয়েক জন প্রধান প্রধান ওমরাহের সহিত গোসলখানার গেলেন।

গোসলখানা কেবল হস্তমুখ-প্রকাশনের জন্য নিৰ্ম্মিত হয় নাই, তথায় প্রধান প্রধান অমাত্যদিগের সহিত রাজকাৰ্য্যের গৃহ-মন্ত্রণাদি হইত।

নরেন্দ্র গোসলখানার পশ্চাতে উচ্চ প্রাচীর দেখিতে পাইলেন, তাহার ভিতরে অনেক হস্তা ও প্রাসাদ আছে। গজপতি কহিলেন, “ঐ প্রাচীরের পশ্চাতে রাজ-বাটীর বেগমদিগের ভিন্ন ভিন্ন মহল আছে। শুনিয়াছি, সে সমস্ত মহল অতিশয় চমৎকার। প্রত্যেক বেগমের মর্ম্মর-প্রাসাদের চারিদিকে উজান ও কুঞ্জবন, গ্রীষ্মকালে দিব্যর থাকিবার জন্য যুতিকার অভ্যন্তরে ঘর এবং নিশায় শরনের জন্য প্রস্তর-নিৰ্ম্মিত উচ্চ উচ্চ ছাদ আছে। কিন্তু সম্রাট্‌ ভিন্ন অন্তপুরুষের নরন সে সৌন্দর্য্য কখন দেখে নাই, পুরুষের পদচিহ্নে সে রম্যস্থান অঙ্কিত হয় নাই।”

নরেন্দ্রনাথের পূর্ব্বজ্ঞির কথা সহসা স্মরণ হইল। তাঁহার বোধ হইল, ঐ প্রাচীরের পশ্চাতে বেগমদিগের প্রাসাদ-সমূহের সৌন্দর্য্য তাঁহার নয়ন দর্শন করিয়াছে, তাঁহার পদচিহ্নে সে রম্যস্থান অঙ্কিত হইয়াছে; কিন্তু সে পূর্ব্বজ্ঞির বিস্ময়কর কথা তিনি গজপতির নিকট প্রকাশ করিলেন না, আপনিও ঠিক বুঝিতে পারিলেন না।

—

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ।

দেওয়ানা তাতার-বালক।

—Beware of the day
When the lowlands shall meet the in
battle's array.
Campbell.

দুই জনে দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বহি-
র্ভাগে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে আসিয়া পড়িলেন।
সে স্থান তখনও জনাকীর্ণ; বড় বড় লোক
কেহ শিবিকায়, কেহ হস্তীর উপর, কেহ
অঝরোহী হইয়া এদিকে ওদিকে যাতায়াত
করিতেছে এবং শত শত ব্যবসায়ী লোক
নানা অপরূপ ও বহুমূল্য দ্রব্য বিক্রয় করি-
তেছে, তাহা ক্রয় করিতে বা দেখিতে সহস্র
সহস্র লোক ঝুঁকিয়া আসিতেছে। কেহ
গান করিয়া বা নৃত্য করিয়া অর্থপ্রাপ্ত করি-
তেছে, কেহ ভেকী দেখাইতেছে, কেহ সাপ
খেলাইতেছে, কেহ হাত গণিয়া বলিতেছে।
গণক বলিয়া পরিচয় দিয়া অনেকেই তথায়
আসিয়াছে এবং রৌদ্রে আপন জীর্ণ বস্ত্র
পাতিয়া বসিয়া রহিয়াছে। একদিকে এক-
পানা ঘর আর একদিকে একখানি করিয়া
পুস্তক। অনেক লোক তাহাদের নিকট
ছুটিতেছে, কুলকামিনীরাও শুভবসনে মণ্ডিত
হইয়া ব্যগ্র হইয়া আসিতেছে এবং এক এক
প্রসাদ দিয়া হাত দেখাইয়া লইতেছে।

তাহাদের মধ্যে নরেন্দ্র এক অপরূপ
গণক দেখিতে পাইলেন। তাহার বয়স
চতুর্দশ বৎসরের অধিক হইবে না, মুখমণ্ডল
অতিশয় কোমল ও অতিশয় গৌরবর্ণ, সূর্য-
তাপে আরক্ত হইয়া গিয়াছে। চক্ষু, গণ্ডস্থল
এবং ঝক্কের উপর জটা পড়িয়াছে; জটা
ঝারা ঝংঝং আবৃত হইলেও চক্ষু হইতে যেন

অগ্নিশূলিকরূপে জ্যোতিঃ-বাহির হইতেছে।
মস্তক হইতে পদ পর্যন্ত সমস্ত শরীর কৃষ্ণ-
বসনে আবৃত, কোমরে একটি বহুমূল্য পেটি
রৌদ্রে ঝক্কক করিতেছে। বালক তাতার-
দেশীয় মুসলমান, কাহারও নিকট পয়সা না
লইয়া হাত দেখিতেছে।

তাতার-বালকের আকৃতি দেখিয়াই
অনেকে তাহার নিকট যাইতেছে। গজ-
পতি ও নরেন্দ্র উভয়েই তাহার নিকটে
গেলেন। গজপতি প্রথমে হাত দেখাইয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন, “অত সন্ধ্যার সময়েই
আমরা দিল্লী নগর পরিত্যাগ করিয়া কোথায়
যাইব, বল দেখি?”

তাতার গজপতির মুখ ও বসন বিশেষ
করিয়া দেখিয়া বলিল, “মহারাজা যশোবন্ত
সিংহ নর্থদাতীয়ে গিয়াছেন, তুমি সেই
স্থানে যাইবে।”

গজপতি উচ্ছ্বাস করিয়া বলিলেন,
“মহারাজা যশোবন্ত সিংহ আরংজীবের
সহিত যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন, তাহা
আবাল-বুদ্ধ-বিনতা সকলেই জানে আর
আমি রাজপুত্র, আমার বসন দেখিয়া সক-
লেই বলিতে পারে। ইহার অধিক বলিবার
তোমার বিজ্ঞা নাই?”

তাতার প্রজ্বলিত-নয়নে গজপতির উপর
হ্রিদৃষ্টি করিয়া কণেক পর মস্তক নাড়িয়া
জটাতার পশ্চাদিকে ফেলিয়া বলিল, “রাজ-
পুত্র! আরও বলিতে পারি, আরংজীবের
হস্তে সমস্ত রাজপুত্রের নিধন হইবে। মহা-
রাজকে বলিও, যেন দ্রুতগতি একটি অশ্ব
বাছিয়া লয়ন, নতুবা পলাইবার সময় পাই-
বেন না। সপ্ত সহস্র রাজপুত্রের মধ্যে
সপ্ত শতেরও বৃদ্ধা নাই। রাজপুত্র! সে
যুদ্ধে তোমার নিশ্চয় নিধন।”

গজপতি সাহসী বোকা, কিন্তু তাতার-

দালকের আকার ও গম্ভীর স্বর ও প্রজলিত ক্ষুদেখিয়া ও কথা শুনিয়া মুহূর্তের জন্য তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। মুহূর্তমধ্যে সে ভাব অন্তর্হিত হইল, অতিশয় গম্ভীরস্বরে বলিলেন, “ক্ষতি নাই, যদি জগদীশ্বর লগাটে তাহাই লিখিয়া থাকেন, মহারাজের যুদ্ধে হৃদয়ের শোণিতদান অপেক্ষা রাজপুত অধিকতর গৌরবের কার্য্য জানে না।”

সকলে কণকাল নিস্তরু হইয়া রহিল। পরে নরেন্দ্র আপন হাত দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি যদি যথার্থ হাত দেখিতে জান, বল দেখি, কল্যা নিশাকালে আমি কোথা ছিলাম এবং কাহাকেই বা দেখিয়াছিলাম?”

তাতার অনেকক্ষণ নিস্তরু হইয়া ভূমির দিকে চাহিয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল, “যুবক! কোন মুসলমানী তোমার প্রণয়িনী, তুমি কল্যা রজনীতে তাহাকে দেখিয়াছিলে।”

গজপতিসিংহ হাসিয়া উঠিলেন, সকলে হাসিয়া উঠিল। নরেন্দ্রনাথ হাসিলেন না, তাতারের কথা শুনিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, বিষ্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পর তাতার নরেন্দ্রকে এক দিকে ডাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, “যুবক, দিল্লীতে তোমার মহাবিপদ, তুমি কি তাহা জান না? দিল্লী ত্যাগ করিয়া অতাই পলায়ন কর, তোমার বন্ধুর সহিত অতাই নন্দদাতীকে গমন কর। এ দেওয়ানাও সেই দিকে বাইতেছে। যদি অহুমতি দাও, তোমার সঙ্গে যাইব। দেওয়ানা তোমার অপকার করিবে না, বিপদ হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে।”

নরেন্দ্রনাথ আরও বিস্মিত হইলেন। এ বালক কে? বালক কি যথার্থই অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বলিতে পারে? বালক

কি যথার্থই গত রাজ্যের কথা জানে? দেওয়ানা বেই হউক, নরেন্দ্রনাথের হিতাকাঙ্ক্ষী; সম্ভবতঃ নরেন্দ্রনাথকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে। ভাবিয়া চিন্তিয়া নরেন্দ্রনাথ তাহাকে নিকটে রাখিতে সম্মত হইলেন।

সেই দিন সন্ধ্যার সময়েই গজপতি, নরেন্দ্র ও তাতার-বালক দিল্লীত্যাগ করিয়া নন্দদাতীমুখে চলিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

রাজা যশোবন্ত সিংহের শিবির ।

But hark the trump ! To-morrow thou,
In glory's fires shalt dry the tears !

Campbell.

১৬৫৮ খৃঃ অব্দে বসন্তকালে প্রাচীন উজ্জয়িনী নগর ও তরঙ্গবাহিনী সিপ্রানদী অপক্লপ দৃশ্য দর্শন করিল। চন্দ্র উদিত হইয়াছে, তাহার উজ্জল কিরণে সিপ্রানদীর উভয় কূলে যতদূর দেখা যায়, শুভ্র শিবির-শ্রেণী দেখা যাইতেছে। একদিকে রাজা যশোবন্ত ও তাঁহার সহবোদ্ধা কাসেম খাঁর অসংখ্য সেনা চন্দ্রকরোজ্জ্বল শিবিরশ্রেণীর মধ্যে বিশ্রাম করিতেছে, অপরতীরে এক পর্বতোপরি আরাজীব ও মোরাদের মোগল সৈন্যদল রহিয়াছে। মধ্যে কল-নাদিনী সিপ্রানদী প্রস্তরশয্যার উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, যেন মোগল ও রাজপুত-দিগের যুদ্ধের আয়োজন দেখিয়া ভীত না হইয়া উপহাস করিয়া যাইতেছে। দূরে ভারতবর্ষের কটিবন্ধনস্বরূপ বিষ্ণুপর্বত চন্দ্রলোকে দেখা যাইতেছে। কল্যা ভীষণ যুদ্ধ হইবে, কিন্তু অজ্ঞ সমস্ত জগৎ সুপ্ত। কেবল

সময়ে সময়ে গ্রন্থাবলী স্বয়ং মিত্রক রজনীতে
স্বপ্ন পৰ্যন্ত জ্ঞাত হইতেছে, কেবল সিপ্রা
নদীর তরঙ্গমালা কলকল করিতেছে, কেবল
দূর হইতে নৈশ শৃগালের শব্দ নদীকূলে ও
পৰ্বত-শ্রেণীতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

একটি শিবিরে নরেন্দ্র শয়ন করিয়া
মিষ্ট্রিত আছেন, তথাপি যুদ্ধের নানারূপ
চিত্রা স্বপ্নরূপে তাহার হৃদয়ে জাগরিত হই-
তেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন কথা হৃদয়ে
জাগরিত হইতেছে। সিপ্রানদীর কল কল
নাশ যেন ভাগীরথীর শব্দ বোধ হইল, সেই
ভাগীরথীতীরে সেই কুঞ্জবন-বেষ্টিত উচ্চ অট্টা-
লিকা দেখিতে পাইলেন। তীরে বালুকা-
রাশি, বালুকারাশিতে দুই জন বালক ক্রীড়া
করিতেছে আর একজন বালিকা দাঁড়াইয়া
যেন গান গাইতেছে। সে প্রেম-পুত্রলী
কে? সে কোথায়? ভাগীরথীতীরে কুঞ্জবনে
সেই তিনটি শিশু রজনীতে ক্রীড়া করিত
সত্য, কিন্তু কালের নির্ভর গতিতে সে চিত্রটি
বিলুপ্ত হইয়াছে।

স্বপ্ন পরিবর্তিত হইল। ভাগীরথীর কল্লোল
নহে, এ রমণীর গীতধ্বনি! রমণী না অপ্সরা?
উচ্চ প্রাসাদ, তাহার ছাদ ও স্তম্ভ সুবর্ণ ও
রৌপ্যমণ্ডিত, তাহার মধ্যে এক অপ্সরা গান
করিতেছে, সে বড় হৃৎখের গীত, জেলেখা
কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে হৃৎখের গীত গাইতেছে।
ঐ বে জেলেখা দাঁড়াইয়া আছে; ঐ বে
তাহার রত্নরাশি-বিভূষিত কেশপাশে উজ্জ্বল
বহনমণ্ডল কিংবা আবৃত রহিয়াছে; ঐ বে
তাহার প্রজলিত নয়নদ্বয় হইতে দুই এক
বিন্দু জল পড়িতেছে।

স্বপ্ন পরিবর্তিত হইল। এ জেলেখা নহে,
এ সেই ভাতার-বালক গীত গাইতেছে। যে
বার্ষ্য প্রেম করিয়া প্রেমের প্রতিদান পায়
নাই, সে দেওয়ানা হইয়া দেশে দেশে বেড়াই-

তেছে, তাহারই গান। গান শুনিতে শুনিতে
নরেন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি শিবির
হইতে বাহিরে আসিলেন। জগৎ মিত্রক,
স্বপ্নহর নিশার বায়ু রহিয়া রহিয়া বহিয়া
যাইতেছে, চন্দ্রকিরণে নদী, পৰ্বত, শিবির ও
মাঠ দৃষ্ট হইতেছে আর সেই অভাগা দেও-
য়ানা ভাতার-বালক শিবিরদ্বারে বসিয়া
উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছে। সপ্তাঙ্গমিলিত
সে গান বায়ুতে বাহিত হইয়া দেশ গগনে
উথিত হইতেছে ও চারিদিকে আকাশে
বিস্তৃত হইতেছে।

নরেন্দ্র সাক্ষরনয়নে বালকের হস্তধারণ
করিয়া তাহার অশ্রুজল মুছাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন, “তুমি কি যথার্থই প্রেমের জন্ত
দেওয়ানা হইয়াছ? তোমার হৃদয়ে কি কোন
গভীর দুঃখ আছে? তাহা যদি হয়, আমাকে
বল, আমি তোমার দুঃখের সমদুঃখী হইব।
মন খুলিয়া আমার নিকট সমস্ত কথা বল।”

বালক একদৃষ্টিতে নরেন্দ্রের দিকে চাহিতে
লাগিল, শরীর কঁপিতে লাগিল। কণেক
পর হৃদয়ের বেগ সংবরণ করিয়া ধীরে ধীরে
করণস্বরে বলিল, “মার্জনা করুন, আমি
দেওয়ানা, যখন যাহা মনে আইসে, তাহাই
গান করি।” নরেন্দ্র অনেক প্রবোধবাচ্য-
প্রয়োগ করিয়া বার বার তাহার হৃৎখের
কারণ ও এই অল্পবয়সে ককির্বা গ্রন্থের
কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক ভাষা
উত্তর দিল না, কেবল বলিল, “আমি
দেওয়ানা।”

নিশা-অবসানে নরেন্দ্র রণসজ্জা করিয়া
আপন বন্ধু গজপতি সিংহের শিবিরে গেলেন,
দেখিলেন, তিনিও বোদ্ধার কার্য করিতে-
ছেন; আপন তরবার, চর্ম, বর্শা প্রভৃতি স্বয়ং
শাণাইতেছেন, অস্ত্রগুলি দ্রোপার যত
উজ্জল হইয়াছে, তথাপি আশ্রয় উজ্জল

রিতেছেন। দেখিয়া নরেন্দ্র কিছু বিমিত
ইলেন; পরে শবার দিকে চাহিয়া দেখি-
লেন, গজপতি সমস্ত রাজি শয়ন করেন নাই,
শয়ন রাজিই এই কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার
ঘনমণ্ডল অতিশয় পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষুর ঈষৎ
কালিমাবেষ্টিত। কেন? নরেন্দ্র গত কয়েক
দিন অবধি গজপতির বে ডাব-গতিক
দেখিয়াছিলেন, তাহাতে কারণ কিছু কিছু
বুঝিতে পারিলেন। দেওয়ানা বালক হাত
দেখা অবধি গজপতি স্থির-নিশ্চর করিয়া-
ছিলেন, উজ্জয়িনীর যুদ্ধে তাঁহার নিধন
হইবে। বোধ হয়, গত নিশায় মৃত্যুর জন্ত
প্রস্তুত হইয়াছেন, শয়নের অবসর পান নাই।

পাঠক গজপতিকে ভীক মনে করিতেছ? রাজপুত সকলেই সাহসী, তথাপি তাহাদের মধ্যে তেজসিংহের পুত্র গজপতি অপেক্ষা সাহসী কেহ ছিল না। তথাপি কল্যা নিশ্চয় মৃত্যু জানিলে সাহসীর ললাটও চিন্তারেখায় অঙ্কিত হয়। যোদ্ধা যৌবনমদে মত্ত থাকিয়া, জীবনের সুখে মগ্ন থাকিয়া, যুদ্ধের উৎসাহে প্রফুল্ল থাকিয়া, জয়ের আশার আশ্রিত হইয়া মৃত্যুর চিন্তা দূর করে; যুদ্ধ তাহাদের পক্ষে আমোদমাত্র, অনেক লোক মরিতেছে, তাহারাও একদিন মরিবে, তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু “কল্যা মরিবে” বজ্রধ্বনিতে যদি এই শব্দ সহসা কণ্ঠে আঘাত হয়, তাহা হইলে সে উৎসাহ ও সে প্রফুল্লতা হ্রাস পায়। গজপতি যে সময়ের সকল লোকের স্বায় গণনা-বিস্তার দৃঢ়বিশ্বাস করিতেন, অস্ত্র যুদ্ধে তিনি মরিবেন, তাহা তাঁহার স্থিরবিশ্বাস ছিল। গত রজনীতে অনিদ্র হইয়া মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত হইয়াছিলেন। অস্ত্র পরিহার করা কেবল কাল কাটাইবার একটি উপায়মাত্র।

নরেন্দ্র আসিবামাত্র গজপতি উঠিয়া তাঁহার হস্তধারণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া রজি-

লেন, “দেখ দেখি, অস্ত্রগুলি পরিহার হই-
য়াছে কি না?”

নরেন্দ্র। বথার্থই কি আপনি অস্ত্র
যুদ্ধে গিষ্ট হইবেন? দেওয়ানা ককিরের
কথা শ্রবণ করুন।

গজপতি। সমুখে রণ করিয়া রাজপুত
কখনও পশ্চাতে চাহে না, পিতা তেজসিংহ
আমাকে এই শিক্ষা দিয়াছেন।

গজপতি আরও বলিলেন, “নরেন্দ্র, এক
যুদ্ধে আমি মহারাজা যশোবন্ত সিংহের উপ-
কার করিয়াছিলাম, রাজা সন্তুষ্ট হইয়া
আমাকে এই মুক্তাহার প্রদান করেন।
সেই অবধি সকল যুদ্ধেই আমি এই হার
ললাটে পরিধান করিয়াছি। অস্ত্রকার যুদ্ধে
তুমি নিস্তার পাইবে। এই হার রাজাকে দিও
এবং বলিও, দেশে আমার দুইটি শিশু-সন্তান
আছে, ইতড়াগাদের মাতা নাই। মহা-
রাজকে বলিও যেন, অস্ত্রগ্রহ করিয়া তাহা-
দিগের উপর কৃপাদৃষ্টি করেন,” বালক রঘু-
নাথও* কালে রাজার আজ্ঞার পিতার জ্ঞার
সংগ্রামে জীবন দিতে সক্ষম হয়, ইহা অপেক্ষা
অধিক মঙ্গল ইচ্ছা তাহার পিতা জানে না।”

নরেন্দ্র নিশ্চল হইয়া রহিলেন, তাঁহার
নয়ন হইতে এক বিন্দু জল পড়িল। গজ-
পতির নয়নধর শুক ও অতিশয় উজ্জ্বল।

সহসা ভেরী-শব্দ শুনা যাইল, আরংজীব
সিপ্ৰানদী পার হইবার উত্তোগ করিতে-
ছেন। গজপতি রণসজ্জ। পরিধান করিয়া
বাহিরে আসিলেন, লক্ষ দিয়া অশ্বে আরো-
হণ করিয়া ভীমবেগে নদীমুখে চলিলেন।

নরেন্দ্রও নির্বৃত্ত হইয়া যুদ্ধাভিমুখে
চলিলেন।

* বীহারা রঘুনাথের কথা জানিতে চাহেন, তাঁহারা
“জীবন-প্রত্যাপ” আখ্যায়িকা পাঠ করিবেন।

মোড়শ পরিচ্ছেদ।

মোগল-শিবির।

On ye brave

Who rush to glory or to grave.

Campbell.

যুদ্ধের পূর্বনিশায় রাজপুত-শিবির পাঠক দর্শন করিয়াছে; একবার সেই নিশায় মোগল-শিবির দর্শন কর।

আরংজীব পূর্বেই সেই স্থানে পৌছিয়াছিলেন, মোরাদের জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। দুই তিন দিন পরে মোরাদ সৈন্তে আরংজীবের সহিত যোগ দিলেন, দুই তিন দিনের মধ্যে যদি যশোবন্ত সিংহ আরংজীবকে আক্রমণ করিতেন, আরংজীব অবশুই পরাস্ত হইতেন। কোন কোন ইতিহাসবেত্তা বলেন যে, আরংজীবের অল্পমাত্র সৈন্ত আছে, এ কথা যশোবন্ত জানিতেন না, সেই জন্তই আক্রমণ করেন নাই। আবার কেহ কেহ বলেন, মহাভূতব রাজপুত সেনাপতি সে কথা জানিয়াও অল্পসংখ্যক সৈন্তের সহিত যুদ্ধ করা রীতিবিরুদ্ধ, এই জন্তই অপেক্ষা করিয়াছিলেন।

আজি আরংজীব ও মোরাদ দুই ভ্রাতার সাক্ষাৎ হইয়াছে, কালি যুদ্ধ হইবে। জয় জয় নামে দেশ পরিপূর্ণ হইতেছে। গটবস্ত্র-মণ্ডিত উৎকৃষ্ট দীপালোকশোভিত একটি প্রশস্ত শিবিরে দুই ভ্রাতা ভোজন করিতে বসিয়াছেন, চারিদিকে জগদ্বিমোহিনী নর্তকী ও প্রায়কীগণ নৃত্যগীতাদি করিয়া রাজপুত্র-দ্বয়ের মনোরঞ্জন করিতেছে। মোরাদের প্রশস্ত ললাট, বিশাল বক্ষঃস্থল, বীর আকৃতি ও অকপট হৃদয়; আরংজীবের ললাট কুঞ্চিত, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও তীব্র, মন সর্বদাই সহস্র

চিন্তায় অভিভূত। তথাপি আরংজীব কি যুদ্ধের সরল হাসিই হাসিতেছেন, কি সন্মান সহকারে মোরাদের সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন, যেন ভ্রাতাকে দেখিয়া তিনি আর আনন্দ রাখিতে পারিতেছেন না, যেন ভ্রাতার কার্যসাধন অপেক্ষা জগতে তাঁহার অস্ত্র আঘাত বা অস্ত্র কোনও প্রকার উদ্বেগ নাই।

ভোজন সাদৃশ্য হইল, ভৃত্যেরা কল ও মদিরা লইয়া আসিল। গায়কীগণ পুনরায় সপ্তবরে গান আরম্ভ করিল, শিবির আয়োজিত হইল। কেশ হীমকের সহিত কটাক্ষ-দৃষ্টির জ্যোতিঃ মিশিয়া বাইতে লাগিল, সুললিত গানের সহিত স্মৃষ্টি হস্তধ্বনি মিশিয়া বাইতে লাগিল, মোরাদ একেবারে বিমোহিত হইলেন। অবশেষে আরংজীবের ইঙ্গিতে নর্তকীগণ চলিয়া গেল।

আরংজীব সুবর্ণপাত্রের মদিরা ঢালিয়া মোরাদের হস্তে দিয়া বলিলেন, “আজি সেবার আপনাকে তুষ্ট করিতে পারিয়াছি, আজি আমার জীবন সার্থক।”

মোরাদ। আরংজীব, আপনার জায় অমায়িক ভ্রাতা আমি পাইব না। এতটুকু মদিরা আপনার জন্ত লউন।

আরংজীব। “কমা করুন, আপনি জানেন, আমার জীবনে সুখের বাজা নাই। হৃদয়ে বড় মানস আছে; আপনার মত বীর পুরুষকে পিতৃ-সিংহাসনে একবার দেখিব, তাহা ভিন্ন আর বিত্তীয় ইচ্ছা নাই। পৈগম্বর যদি এই এরাদা সফল করেন, তাহা হইলে সন্তুষ্টমনে ফকিরী গ্রহণ করিয়া মক্কার বাইব।” এই বলিয়া আরংজীব আর এক পাত্র মদিরা দিলেন।

মোরাদ। আরংজীব, আপনি যথার্থই ধার্মিক, তাহা না হইলে আমার জন্ত আপনি এরূপ যত্ন করিবেন কেন?

আরংজীব । কাহার জ্ঞান করিব ? তৈমুরের সিংহাসনে অধিকৃত হইবার উপ-
যুক্ত আর কে আছে ? সুজা বিশাসপ্রিয়
ও ভীক, সুজা তৈমুরের সিংহাসন কলঙ্কিত
করিবে ? আত্মাভিমানী মুখ কাফের দ্বারা
তৈমুরের সিংহাসন কলঙ্কিত করিবে ? তাহা
অপেক্ষা পুনরায় হিন্দুস্থান কাফেরদিগের
হস্তে ষাটক, তৈমুরের নাম বিলুপ্ত হউক !
ইহাদের জ্ঞান আমি যুদ্ধ করিব না ; ইহাদের
সাহস অপরিসীম, ইহাদের বশোরাশিতে
ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ হইয়াছে, যিনি মোগল-
সিংহাসনের স্তম্ভরূপ, যিনি মোগলকুলের
কুলতিলকস্বরূপ, তাঁহার জ্ঞান যুদ্ধ করিব ।
আমি আপনার সম্মুখে আপনার সুখ্যাতি
করিতে চাহি না, কিন্তু যখন আমি আপ-
নাকে দেখি, আমার যথার্থই বোধ হয় যেন,
আপনার উদার ললাটে ‘সম্রাট’ শব্দ খোদিত
রহিয়াছে, আপনার বিশাল বক্ষঃস্থল ও দীর্ঘ
বাহুতে ‘যোদ্ধা’ শব্দ অঙ্কিত রহিয়াছে,
আমার জীবন ধন্য যে, এই বীরপুরুষের
কার্য্য-সাধনে আমি লিপ্ত হইয়াছি ।” এই
বলিয়া আরংজীব সুবর্ণপাত্র আর একবার
মদে পরিপূর্ণ করিলেন ।

মোরাদ । আরংজীব, আমি যথার্থই
আপনার বাক্যে পরিতুষ্ট হইলাম । কালি
যুদ্ধ হইবে, সৈন্ত সকল প্রস্তুত আছে ?

আরংজীব । আমি তিন চারি দিন
হইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু যুদ্ধব্যবসারে
আমি এখনও অপরিপক্ক, একাকী সাহস
হয় না । আপনি নিকটে থাকিলে আমার
যেন বোধ হয়, আমি পর্ত্ত-পার্শ্বে
নিরাপদে আছি, আমার সাহস বিগুণ
হয় ।

মোরাদ এরূপ আত্মাভিমানী ছিলেন
যে, প্রবঞ্চনা এবং চাটুবাক্যও তাঁহার সত্য

বলিয়া জ্ঞান হইত, বিশেষতঃ এক্ষণে অধিক
মদ্যাসেবনে কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞানশূন্য
হইয়াছেন, আরংজীবের প্রশংসাবাক্যে
সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “ভ্রাতঃ ! আপনি
কালে রণপণ্ডিত হইবেন, এক্ষণে কিছু দিন
আমার উপর নির্ভর করুন । আর আমি,
আমি জগতে কাহারও উপর নির্ভর করি
না, কেবল আমার সাহস ও এই অসির
উপর ডরসা করি ।” এই বলিয়া মোরাদ
অসি নিক্ষেপিত করিলেন, দীপালোকে
অসি ঝঙ্কঙ্ক করিয়া উঠিল । পুনরায়
অসি কোষে রাখিতে গেলেন, কিন্তু অতি-
শয় মদ্যাসেবনে দৃষ্টি স্থির ছিল না, অসি
মুক্তিকার পড়িয়া বাইল । আরংজীব হস্ত
সংবরণ করিয়া আর এক পাত্র মদ্য
দিলেন, মোরাদ তাহাও শেষ করিলেন ।

আরংজীব বলিলেন, “ভ্রাতঃ ! তবে
বিদায় হই, রণক্ষেত্রে আবার আপনার
দর্শন পাইব ।”

মোরাদ । যাও, আরংজীব, যাও, আমি
আপনার উপর বড়ই পরিতুষ্ট হইলাম,
আইদ, আলিঙ্গন করি ।

মোরাদ আলিঙ্গন করিতে উঠিলেন, কিন্তু
অধিক মদ্যাসেবন বশতঃ ভূমিতে ঢলিয়া
পড়িলেন ।

আরংজীবের মুখের ভাব তখন পরি-
বর্ত্তিত হইল, ভ্রাতাকে যে সহাস্ত্র মুখ
দেখাইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা পরিবর্ত্তিত
হইল । মুখ গম্ভীরভাবে ধারণ করিল,
ললাটে দুই তিনটি ভীষণ রেখা অঙ্কিত
হইল ; নিঃশব্দে সেই শিবিরমধ্যে পদ-
সঞ্চারণ করিতে লাগিলেন ; মধ্যে মধ্যে
এক একবার হঠাৎ দগ্ধায়মান হন, স্থির-
দৃষ্টিতে এক একবার দেখেন, যেন সম্মুখে
কোম জ্বালা দেখিতে পাইতেছেন, আবার

পদসংকারণ করিতে থাকেন। এক একবার মুখে ঈষৎ হাত লক্ষিত হয়, আবার বদন-মণ্ডল কঠোরভাবে ধারণ করে, ললাট কৃষ্ণিত হয়।

একবার স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া, একটিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া অর্ধক্ষুণ্ট বচনে বলিতে লাগিলেন, “উজ্জয়িনী যুগুট, ময়ূর-সিংহাসন। প্রথম ভারতপ্রদেশ পিতার দুর্ভল হস্ত হইতে অধিষ্ঠিত হইতেছে। কে লইবে? দারী, সাবধান। তোমার সাহস আছে, বল আছে, কিন্তু আমিও দুর্ভল হস্তে অসি ধারণ করি নাই, পথ ছাড়িয়া দাও, নচেৎ অসিহস্তে পথ পরিকার করিব। তুমি আত্মাভিমানী, দর্পী, কিন্তু তোমা অপেক্ষা জীবন দর্পী ও দৃঢ়তর ব্রত সহাস্ত বদনের ভিতর লুক্কায়িত থাকে। মোরাদ! তুমি সাহসী বীর! সিংহাসনে বসিবে? তবে শূকর যেরূপ কর্দমে পড়ে, সেইরূপ তুমি ধরাতলে লুটাইয়া পড়িলে কেন? বজ্র শূকরেরও তোমার জ্ঞায় সাহস আছে! অচেতন? কল্যা যুদ্ধ হইবে, অস্ত্র বিলাসবিহীন? যত দিন আবশ্যক, তোমার দ্বারা আমার কার্য্যাসিকি করিব, তাহার পর এইরূপ পদাঘাত করিয়া তোমাকে দূরে কেলিয়া দিব! কল্যা যুদ্ধ হইবে, ললাটের লিখন কি আছে? পিতার হস্ত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, জীবন উদ্যমে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি, আর ফিরিবার উপায় নাই। হৃদয়! সাহসে নির্ভর কর, আরও অগ্রসর হইব। অসিহস্তে কণ্টকময় পথ পরিকার করিব, আবশ্যক হয়, উজ্জয়িনী হইতে আত্মা পর্য্যন্ত পথ নররক্তে রঞ্জিত করিব, কিন্তু এ জীবন প্রভিজ্ঞা বিচলিত হইবে না। পিতামহ! তৈমুর! তোমার

মুকুটে এই ললাট শোভিত করিব, নচেৎ কল্যা হৃদয়শোণিতে সিংহাবারি রঞ্জিত করিব।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

উজ্জয়িনীর যুদ্ধ।

Another deadly blow,
Another mighty empire overthrown.
Wordsworth.

১৬৫৮ খৃঃ অব্দে বৈশাখ মাসে জীবন যুদ্ধ হইল। মোরাদ ও আরংজীবের সৈন্তেরা সিংহাসন দ্বারা হইবার উদ্যম করিতে লাগিল, কিন্তু সে বড় সহজ ব্যাপার নহে। আরংজীব, সৈন্যের পার হইবার জন্য অতিশয় নিপুণ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উন্নত স্থানে তাঁহার কামান সাজাইয়া, সম্মুখে শত্রুর আগমন রোধ করিয়া, নিজ সৈন্তকে নদী পার হইতে বলিলেন। শত্রুরাও কামান সাজাইয়াছিল ও তন্দ্বারা আরংজীবের সৈন্তের নদী পার হওয়া বিধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, অনেক তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। যশোবন্ত সিংহ অপূর্ণ বীর্য্যবল প্রকাশ করিয়া মোগলদিগের গতিরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার সহযোগী কাসেম খাঁ সেরূপ যত্ন করিলেন না। তাৎকালিক লেখকেরা সম্ভেদ করেন যে, তিনি আরংজীবের অর্থে বশীভূত হইয়া আপন গোলা ও বারুদ লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার সৈন্তের কামান অচিরে নিশ্চয় হইল। এ অবস্থায় শত্রুর কামানের সম্মুখে যুদ্ধ করা যশোবন্তের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল; কিন্তু তিনি ভয়বিহীন না হইয়া অমানুষিক বীরত্ব

পূর্বক শক্রদিগের গতি রোধ করিতে লাগিলেন । সে স্থান ওরুতময় ; স্বতরাং আক্রমণকারিগণ সহজে নদী পার হইতে পারিল না, কিন্তু সাহসী মোরার্দ কতিপয় সৈন্ত লইয়া, সকল ব্যাঘাত অতিক্রম করিয়া, জয় জয় নাদে নদী পার হইলেন, তাহা দেখিয়া সমস্ত সৈন্য নদী পার হইল । ভীক কাসেম খাঁ তৎক্ষণাৎ সসৈন্তে পলায়ন করিলেন স্বতরাং যশোবন্ত সিংহের বিপদের সীমা রহিল না । কিন্তু সেই অসমসাহসী রাজপুত চতুর্দিকে শত্রুকর্তৃক বেষ্টিত হইয়াও তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন । তাহার সেনা-সংখ্যা ক্ষীণ হইতে লাগিল, তাহার প্রিয় অমুচরেরা চতুর্দিকে হত হইতে লাগিল, মোগলেরা জয় জয় নাদে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিতে লাগিল ; তথাপি বীর রাজপুতেরা রণে ভঙ্গ দিল না । অনেক-ক্ষণ যুদ্ধের পর পরাস্ত হইয়া যশোবন্ত সিংহ কেবলমাত্র পঞ্চ শত সেনা লইয়া যুদ্ধস্থল ত্যাগ করিলেন । সপ্ত সহস্র রাজপুত সেই দিন সেই ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন দান করিল ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।

চিতোর ।

Where like a man beloved of god,
through glooms, where never
woodman trod,
How oft pursuing fancies holy,
By moonlight way often flowering
weeds wound,
Inspired beyond the guess of folly.
By each rude shape and wild
unconquerable sound !
O ye loud waves ; and o ye forests
high

And ye clouds that far above me soared !
Thou rising sun ! and blue rejoicing sky !
Yea everything that is and will be free !
Bear witness for the wheresoe'er ye be
With what deep worship I have still adored
The spirit of divine Libery.

Coleridgeo.

যশোবন্ত সিংহের অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক সেনা রাজপুতানা-অভিমুখে আসিতে লাগিল । নরেন্দ্র তাহার পরম বন্ধু ধর্ম-পতির মরণে অতিশয় দুঃখিত ও ক্লিষ্ট হইলেন, কিন্তু প্রত্যাহ নূতন নূতন দেশ দেখিতে দেখিতে সে দুঃখ কিঞ্চিৎপরিমাণে বিস্মৃত হইলেন । কয়েক দিন আসিতে আসিতে সৈন্তেরা অবশেষে রাজপুতানার অভ্যন্তরে আসিয়া পড়িল । যশোবন্ত সিংহ মাড়ওয়ার দেশের রাজা, সে দেশে আসিতে হইলে মেওয়ার দেশের অভ্যন্তর দিয়া আসিতে হয় ।

মেওয়ার দেশের অসংখ্য দুর্গ দেখিয়া নরেন্দ্র বিস্মিত হইলেন । দুর্গগুলি প্রায়ই পর্কত-চূড়ায় নির্মিত, সহসা হস্তগত করা শক্রর দুঃসাধ্য । পর্কতগুলি উন্নত শিরে মুকুটস্বরূপ দুর্গ ধারণ করিয়া অপূর্ণ শোভা ধারণ করিয়াছে । সে সমস্ত দুর্গে উষ্টিবার পথ নাই, কেবল একদিকে সোপানের ন্যায় পথ আছে, তাহার উপর দিয়া লোকে গমনাগমন করে । যুদ্ধকালে দুর্গের শিতর খাদ্যসামগ্রী সঞ্চিত হয়, সেই একটিমাত্র দ্বার রুদ্ধ হয়, পরে শত্রুগণ যাহাই করুক না, দুর্গবাসিগণ নিশ্চিন্তে থাকিতে পারে । শত্রুরা দুর্গে উষ্টিবার উপক্রম করিলে উপর হইতে প্রস্তররাশি নিক্ষেপ হয়, ঐ প্রস্তর-বাতে একেবারে বহুসংখ্যক শত্রু বিনষ্ট হয় ।

এইরূপ দুর্গ দেখিতে দেখিতে সৈন্যেরা অবশেষে একদিন সন্ধ্যার সময় চিতোরের দুর্গের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল

সৈন্তেরা আহাঁরাধি সমাজ করিয়া আপন আপন শিবিরে বিজ্ঞান করিতে গেল, কিন্তু নরেন্দ্র কতিপয় রাজপুত্রের সহিত চিতোর-পর্কতে উঠিয়া তাহার উপরস্থ দুর্গে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র বিস্থিত, নয়নে কুম্ভরাজার স্মৃতির স্তম্ভ দেখিলেন, পদ্মিনী রাজ্যীয় প্রাসাদ ও সরোবর দেখিলেন, যে সিংহদ্বারে রাজপুত্র-রাজগণ বার বার অসি-হস্তে জীবনদান করিয়াছেন, তাহা দেখিলেন, যে চিতায় রাজপুত্র-রমণীগণ চিতারোহণ করিয়া কুলমান রক্ষা করিয়াছেন, সে গহ্বর দেখিলেন।

সহসা তাঁহাদের সম্মুখে একজন বৃদ্ধ মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজপুত্র-দিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন, তিনি চিতোরের পুরাতন “চারণ”। চারণগণ পূর্বকালে রাজপুত্র-নার রাজাদিগের গোরবগীত গাইয়া রাজ-পুত্রব ও নগরবাসীদিগের মনোরঞ্জন করিতেন; রাজপুত্রানার এখন পর্য্যন্ত সন্মার সময়ে লোকে সমবেত হইয়া চারণের গীত শুনিতে ভালবাসে ও পূর্বগোরবগান শুনিতে শুনিতে তাহাদিগের নয়ন বীরাশ্রিতে আঁপুত হয়।

নরেন্দ্র ও তাঁহার সঙ্গী রাজপুত্রগণ চারণকে একটি শিলার উপর বসাইলেন ও আপনারা চারিদিকে বসিয়া প্রতাপসিংহের গান শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। চারণ সেই গান আরম্ভ করিলেন।

গীত।

“রাজপুত্রগণ! এটি আমার গীত নহে, অধরগর্জ্জন-প্রাণবাতী পর্কতবৃদ্ধের গীত, বজ্র-নাদী জলপ্রপাতের গীত, তোমরা শ্রবণ কর। যে পর্কতকন্দর একজন রাজপুত্র-

সেনার অস্থি পড়িয়া রহিয়াছে, সেই গহ্বর হইতে গীত বহির্গত হইতেছে। যে পর্কত-তরঙ্গবাহিনীর জল এক বিন্দু রাজপুত্রের শোণিতেও আরক্ত হইয়াছে, সেই ভট্টিনীর কূলে এই গীত ধ্বনিত হইতেছে। প্রতাপ-সিংহ! এটি তোমার গীত।

ঐ দেখ, আকবরের ভাষণপ্রতাপে সমগ্র ভারতবর্ষ কম্পিত হইতেছে, চিতোর নগর কদর কম্পিত হইল না। চিতোর নগর আর তাঁহার নাই, তাঁহার পিতার রাজত্ব-কালে নিষ্ঠুর আকবর চিতোর কাড়িয়া লইয়াছে। দুর্গরক্ষার্থ জয়মল জীবন দিয়াছিল, পত্নী মাতা ও বনিতা স্বস্তে বুদ্ধ করিয়া জীবনদান করিয়াছিল, তথাপি রাজপুত্রের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া আকবর চিতোর কাড়িয়া লইলেন। প্রতাপ যখন রাজা হইলেন, তখন চিতোর নাই, সৈন্ত নাই, অর্থ নাই, কিন্তু তাহার বীরাঙ্গকরণ ছিল, বীরের দুঃসাধ্য কি আছে? প্রবলপ্রতাপাধিত রাজপুত্ররাজগণ দিল্লীর দাসত্ব স্বীকার করিলেন, প্রতাপ করিলেন না। অধরের ভগ-বান্ধাস ও মাড়ওয়ারের মল্লদেব নিজ নিজ দুহিতাকে দিল্লীর সম্রাট-হস্তে অর্পণ করিলেন, মহামুভব প্রতাপ য়েচ্ছের কুটুম্ব হইতে অস্বীকার করিলেন। কেন স্বীকার করিবেন? মেওয়ারাধিপতিরা সূর্য্যবংশ-বতংস, সে উন্নত বংশ কেন কলুষিত করিবেন?

সাগরতরঙ্গের দ্বার দিল্লীর সেনা মেওয়ার প্রাবিত করিল, তাহার সন্ধে—হা জগ-দীশ! এ লজ্জার অঙ্ক কেন রাজস্থানের ললাটে অঙ্কিত করিলে!—তাঁহার সন্ধে রাজপুত্ররাজগণ যোগ দিলেন। মাড়ওয়ার, অধর, বিকানীর, বুদ্ধী প্রভৃতি নানাদেশের রাজারা আপনাদিগের দাসত্বের কলঙ্ক

অপনীত করিবার জন্ত, প্রতাপকেও দিল্লীর দাস করিবার জন্ত, আকবরের সহিত যোগ দিলেন। অঘরের মানসিংহ প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, মহাহুতব প্রতাপ স্নেহের কুটুম্বের সহিত ভোজন করিতে অস্বীকার করিলেন। সরোবে মানসিংহ দিল্লী বাইরা অসংখ্য সেনাতরঙ্গে মেওয়ার দেশ প্রাণিত করিলেন। মানসিংহ! তুমি কাবুল হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষে বিজয়পতাকা উজ্জীন করিয়া শত্রুদমন করিয়াছিলে,—কাহার জন্ত ? হায়! স্নেহের অধীন হইয়া রাজপুত নাম ডুবািলে? স্নেহের পদরজ: রাজপুতের ললাটে কি সুন্দর শোভা পাইয়াছে!

অন্ধকারে ঐ জলপ্রপাতের ভীষণ ভেজ দেখিতে পাইতেছ? না, তোমরা পাইবে না, কিন্তু আমি অন্ধকারে থাকি, আমি দেখিতেছি। উহার মধ্যস্থলে উন্নত শিলাখণ্ড সগর্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, জলপ্রপাতেও কম্পিত হইতেছে না। জলপ্রপাত অপেক্ষা অধিক ভেজে সাগরগর্জনে মোগলৈক্য আসিয়া মেওয়ার দেশ প্রাণিত করিল, শিলাখণ্ডের দ্বায় সগর্বে প্রতাপ দণ্ডায়মান রহিলেন। হলুদীঘাটে মহাবৃদ্ধ হইল, সেনাদিগের রব পর্তকন্দর হইতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, আকাশে উন্মিত হইয়া মেঘ হইতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কিন্তু সাহসে কি হইবে? মোগলের অসংখ্য সেনা। বাবিশ সহস্র রাজপুতের মধ্যে কেবল অষ্ট সহস্র লইয়া প্রতাপ পলায়ন করিলেন, অবশিষ্ট হলুদীঘাটের ভীষণ উপত্যকার চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রহিলেন।

এই কি একবার? বৎসর বৎসর এই-রূপ সংগ্রাম হইল, বৎসর বৎসর প্রভুর

সেনা, ধন, রাজ্য হ্রাস পাইতে লাগিল, বৎসর বৎসর তাঁহার জীবনাকাল অন্ধ কারাচ্ছন্ন হইতে লাগিল; কিন্তু তাঁহার বীরত্ব হ্রাস হইল না, তিনি দিল্লীর দাস হইলেন না।

রাজপুত! তোমাদিগের চক্ষুতে যদি জল থাকে, বিসর্জন কর, হৃদয়ে যদি শোণিত থাকে, বিসর্জন কর! ঐ যথ প্রতাপের রাজরানী পর্তকন্দরে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মুঘলবারাণ বৃষ্টি হইতেছে, রাজরানী পর্তকন্দরে শয়ন করিয়া আছেন, প্রতাপ খড়্গহস্তে জাগরিত হইয়া আছেন। ঐ দেখ, বৃক্ষ হইতে রঞ্জু লম্বিত হইয়াছে, কাষ্ঠসনে কি দুলিতেছে? জগদীশ! রাজার শিশু পুত্রেরা কুলিতেছে, নীচে রাখিলে হিংস্রক জন্তু লইয়া বাইবে। ঐ দেখ, প্রতাপের পুত্রবধু শুকপজ জালাইয়া খাদ্য প্রস্তুত করিতেছেন, রুটী প্রস্তুত হইল, সকল খাইও না, অর্ধেক খাও, অর্ধেক রাখিয়া দাও, আবার ক্ষুধা পাইলে 'কোথায় পাইবে? ঐ শুন, ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইল! একটি বালিকার হস্ত হইতে বস্ত্রবিড়াল রুটী কাড়িয়া লইয়া গেল! রাজকন্যা ক্ষুধায় চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতেছে।

রাজপুতগণ! প্রতাপের জয়গীত গাও, তিনি পঞ্চাবিশ বৎসর মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, পর্ততশিখরে বাস করিয়াছেন, পর্তত-উপত্যকার যুদ্ধ করিয়াছেন, পর্তত-কন্দরে দ্রৌপদিবারকে পালন করিয়াছেন: তথাপি ইহজন্মে আকবরের অগ্রী-
নতা স্বীকার করেন নাই। পর্ততে পর্ততে এই গীত প্রতিধ্বনিত হইতে থাকুক, সমগ্র রাজস্থানে এই গীত শব্দিত হইতে থাকুক,

হিমালয় হইতে প্রবাহিত হইয়া সাগরবারি পর্যন্ত সঞ্চার করুক, হিমালয় অতিক্রম করিয়া সমস্ত জগতে বায়ু হউক, আর যদি স্বর্গে সাহস ও স্বদেশান্তরাগের গৌরব থাকে, এই গীত আকাশে উখিত হইয়া স্বর্গের দ্বারে আঘাত করিয়া-মানবের বশঃ-কীৰ্ত্তি বিস্তার করুক।”

চারপের ভীষণ গর্জন শুনিয়া সকলেই শুভিত হইয়া রহিল। ক্ষণপরে সকলে চাহিয়া দেখিল, চারণ নাই, তাহার চিরুমাত্রও নাই, কেবল আকাশে মেঘরাশি ভীষণ গর্জন করিয়া যেন তাঁহার ভয়াবহ গীত বার বার পুনিত করিতে লাগিল।

রাজপুত্রেরা স্বদেশের পূর্বগৌরব অরুণ করিতে করিতে উৎসাহে হুঙ্কার করিয়া উঠিল, যেহাদিগের চক্ষু বীরাশ্রিতে ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর তাহারা উঠিয়া আপন আপন শিবিরে প্রস্থান করিল। নরেন্দ্র তাহাদের সহিত প্রস্থান করিলেন না, তিনি হস্তে গুণ্ডল স্থাপন করিয়া সেই মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে ভীষণ চিতোর-দুর্গের তলে বসিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। মেঘ ক্রমে গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে, নরেন্দ্র প্রস্থান করিলেন না। আকাশের প্রান্ত পর্যন্ত উজ্জ্বল বিদ্যুতের ভগৎ ও গগনমার্গ চমকিত করিতে লাগিল, রহিয়া রহিয়া মেঘ ভীষণ গর্জনে পৃথিবী কম্পিত করিতে লাগিল, রহিয়া রহিয়া নৈশ বায়ু ভীষণ উচ্ছ্বাসে বহিতে লাগিল, নরেন্দ্র প্রস্থান করিলেন না।

নরেন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, “স্বদেশেও মহাবলপরাক্রান্ত রাজারা আছেন, তবে সুলার বঙ্গদেশের এ দুর্দশা কেন? যুদ্ধই রাজপুত্রদিগের ব্যবসা; বালক, বৃদ্ধ, সকলেই যুদ্ধশিক্ষা করে, তাহারা ধন দিয়াছে, ঐশ্বর্য্য দিয়াছে, প্রাণ দিয়াছে, তথাপি স্বাধীনতা

বিসর্জন দেয় নাই। তাহাদের গ্রাম দহ হইয়াছে, নগর লুণ্ঠিত হইয়াছে, দুর্গ শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছে, তথাপি তাহারা গৌরব বিসর্জন দেয় নাই। সে গৌরবগীত আজিও আরাবলীর কন্দরে ও উপত্যকার প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আর বঙ্গদেশ! বেগপ্রবাহিণী গঙ্গানদী তাহার গৌরবগীত গায় না, ব্রহ্ম-পুত্র স্বাধীনতার গীত গায় না, রাজা প্রজা সকলেই বড় হুখে নিদ্রা যাইতেছে! জগতে তাহাদিগের নাম নাই, বীরমণ্ডলীর মধ্যে তাহাদিগের স্থান নাই।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

যোধপুর।

Upon the mountain's dizzy brink she
stood ;
She spake not, breathed not moved ;
not—there was thrown
On her look the shadow of a mood
Which only clothes the heart in solitude,
A thought of voiceless death !

Shelley

পরদিন প্রভাতে নরেন্দ্র অতুসন্ধান করিয়া জানিলেন, উক্ত চারণ শৈশবে মেঘনারাধিপতি প্রতাপসিংহের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। বাল্যকালাবধি চারণ প্রতাপের সঙ্গে সঙ্গে পর্বতগুহা ও উপত্যকার বাস করিতেন ও সেই অল্পকালেই রাজার কীৰ্ত্তিগান রচনা কবিতা কবিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

দিল্লীখবরের সহিত অসংখ্য সংগ্রামের পর প্রতাপের যখন কাল হইল, তখন চারণের বয়ঃক্রম বিংশবৎসর। সে আজ বাট বৎসরের কথা, সুতরাং চারণের বয়ঃক্রম

একণে প্রায় অশীতি বৎসর। তথাপি চারণ এখনও চিতোরের পৰ্ব্বতদুর্গে রজনীতে বিচরণ করেন। সকলেই বলে, চারণ দৈব বলে বলিষ্ঠ।

প্রতাপের মৃত্যুর সময়ে তিনি মৃত্যুশয্যার নিকটে পুত্র অমরসিংহকে আনিয়া শপথ করাইয়াছিলেন যে, তিনিও পিতার জায় চিরকাল যোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন, পিত্রাজ্ঞা-পালনের জন্য অমরসিংহ অনেক বৎসর পর্য্যন্ত আক্বের ও তাঁহার পুত্র জেহাঙ্গীরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ও পিতার জায় বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই সকল যুদ্ধে চারণ সর্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন ও সর্বসময়ে পিতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া উত্তেজনা করিতেন। কিন্তু সে উত্তেজনা বিফল, শেষে অমরসিংহ জেহাঙ্গীরের অধীনতা স্বীকার করিলেন। কিন্তু সে নাম-মাত্র অধীনতা, তিনিই স্বদেশে রাজা রহিলেন, দিল্লীতে যে কর পাঠাইতেন, তাহা দ্বিগুণ করিয়া সম্রাট তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতেন। অমরসিংহকে দিল্লী যাইতে হইত না, তাঁহার পুত্র করণ ও পৌত্র জগৎসিংহকে জেহাঙ্গীর ও তাঁহার মহিষী জুরজাহান সর্বদাই সমাদরের সহিত আহ্বান করিতেন ও অনেক মণিমুক্তা দিয়া পরিতুষ্ট করিতেন। ইহাকে প্রকৃত অধীনতা বলে না, তথাপি চারণ যোষে ও অভিমানে অমরসিংহকে রাজা জ্ঞান না করিয়া অনেক কটুক্তি করিয়া প্রস্থান করিলেন। অমরসিংহও লজ্জিত হইলেন এবং পিতার নিকট যে অস্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা অরণ করিয়া রাজগদী ত্যাগ করিলেন; করণ রাজা হইলেন।

আক্বের কর্তৃক চিতোর ধ্বংস হওনের পরই উদয়পুর নামে এক সুন্দর রাজধানী

নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু চারণ ভয় চিতোরদুর্গে বাস করিতে লাগিলেন, এক দিন দুই দিন অন্তর দুর্গ হইতে অবতরণ করিতেন, নীচে পল্লীগামবাসীরা যাহা দিত, তাহাই খাইতেন, আবার দুর্গে আরোহণ করিয়া থাকিতেন। এইরূপ নির্জনে বাস করিয়া চারণ উন্নত হইয়া গিয়াছেন। পৰ্ব্বত-গম্বীর তাঁহার বাসস্থান হইয়াছে, মেঘগর্জন ও ঝটিকায় বন কম্পিত হইলে তাঁহার বড় উদ্ভাস হয়, তিনি স্বপ্ন দেখেন যেন, আবার প্রতাপ আক্বেরশাহের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন।

রাজপুত-সেনাগণ কয়েক দিন ভ্রমণ করিতে করিতে আরাবলী পার হইয়া যাইত। সেনাগণ কখন উপত্যকা দিয়া যাইল, দুই দিকে পৰ্ব্বতরাশি মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে, শিখরগুলি যেন আকাশ হইতে নীচে অবলোকন করিতেছে। সেই সমস্ত শিখর হইতে অসংখ্য জলপ্রপাত দূর হইতে রোপ্যপুষ্কের জায় দেখা যাইতেছে, কখন বা অন্ধকারে দৃষ্ট হইতেছে না। বরণার জল নিম্নে পড়িয়া কোন স্থানে শৈল-নদীরূপে প্রবাহিত হইতেছে, আবার কোথাও বা চারিদিকে পৰ্ব্বত থাকায় সুন্দর স্বচ্ছ হ্রদের জায় দৃষ্ট হইতেছে। তাহার জল পরিষ্কার ও নিষ্কম্প, তাহার উপর চারিদিকে পৰ্ব্বতশিখরের ছায়া যেন নিদ্রিত রহিয়াছে।

কখন বা সেনাগণ নিশাকালে পৰ্ব্বতপথ উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতে লাগিল। সে নৈশ পৰ্ব্বতের শোভা কাহার সাধ্য বর্ণনা করে। দুই দিকে পৰ্ব্বতচূড়া চক্ষুরে সমুজ্জল, কিন্তু দ্বিপ্রহর রজনীতে নিস্তরু ও শান্ত, যেন যোগীপুরুষ পার্থিব সকল প্রবৃত্তি নমন করিয়া পরিকার আকাশে ললাট উন্নত করিয়া ধ্যানে

বসিয়াছেন। সেই শান্ত রজনীতে উভয় দিকের পর্বতের সেইরূপ শোভা দেখিতে দেখিতে বধ্যস্থ পথ দিয়া সৈন্তগণ বাইতে লাগিল।

পর্বতের সহস্র উপত্যকা ও কলরে অসংখ্য আদিমবাসী ভীলগণ বাস করিতেছে। তাঁরওবর্ষের অশ্রান্ত স্থানেও যেরূপ, রাজপুতানায়ও সেইরূপ, আৰ্য্যবংশীরেরা অসি-হস্তে আসিয়া কৃষিকার্য্যোপযোগী সমস্ত দেশ কাড়িয়া লইয়াছে। আদিমবাসীরা পর্বতগুহার বাস করিতেছে। তাহারা রাজপুতানার রাজাদিগের অধীনতা স্বীকার করে না, তথাপি মোগলদিগের সহিত যুদ্ধের সময় অনেকে বহুক্ষণহস্তে পর্বতে আরোহণ করিয়া রাজপুতদিগের অনেক সহায়তা করিয়াছে।

পর্বত অতিক্রম করিয়া যশোবন্ত অচিরাৎ আপন মাড়ওয়ার দেশে আসিয়া পড়িলেন। মেওয়ার ও মাড়ওয়ার দুই দেশ দেখিলেই বোধ হয় বেন, প্রকৃতি লীলাক্রমে দুই দেশের বিভিন্নতা-সাধন করিয়াছেন। মেওয়ারের যেরূপ পর্বতরাশি ও বিশাল বৃক্ষাদি ও লতাপত্রের গৌরব, মাড়ওয়ারে তাহার বিপরীত। পর্বত নাই, উর্বরা-ক্ষেত্র নাই, বেগবতী তরঙ্গিণী নাই, পর্বত-বেষ্টিত হ্রদ নাই, কেবল মরুভূমিতে বালুকারাশি বৃদ্ধ করিতেছে ও স্থানে স্থানে অতি ক্ষুদ্র-কায় কটকমর বাবুল ও অজ্ঞাত বৃক্ষ দেখা যাইতেছে। এই মরুভূমির উপর দিয়া সেনাগণ যাইবার সময় মেওয়ারীদের সেনাগণ মাড়ওয়ারী সেনাদিগকে বিজ্ঞপ্তি করিয়া বলিল;—

“জাক রা কোণ, কোকরা আর,
বাজার রা রোদি, ঘোঠ রা দার,
মেণো বো রাজা তেরি বাড়ওয়ার।”

মাড়ওয়ারিগণ পূর্বের উত্তর করিল, “আমাদের ভয়ভূমি উর্বরা নহে, কিন্তু বীর-প্রসবিনী বটে।” প্রকৃত মাড়ওয়ারের রাজপুতরা কঠোর জাতি, রাজপুতানায় তাহাদের অপেক্ষা সাহসী জাতি আর ছিল না। সৈন্তগণ এইরূপে অনেক দিন ভ্রমণ করিতে করিতে রাজধানী যোধপুরের সম্মুখে পৌঁছিল ও শিবির সন্নিবেশিত করিল। তখন নরেন্দ্র স্বীয় বন্ধু গজপতির কথা স্মরণ করিয়া একবার রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন। রাজা যশোবন্ত সিংহ শিবিরে একাধী বিষন্ন-বদনে বসিয়া আছেন, নরেন্দ্র তাঁহার নিকট যাইয়া পৌঁছিলেন।

রাজার অদেশ পাইয়া নরেন্দ্র কহিলেন, “মহারাজ! সিপ্রাতীরে আপনার একজন অহুচর হত হইয়াছেন। পূর্বে একবার মহারাজ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই মুক্তামালা তাঁহাকে প্রদান করিয়া ছিলেন, তিনিও আপনার দানের অপমান করেন নাই, সম্মুখযুদ্ধে হত হইয়াছেন। মৃত্যুর পূর্বে গজপতি সিংহ এ মুক্তামালা আপনার হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে আমাকে আদেশ দিয়া গিয়াছেন।”

রাজা সেই মুক্তামালা অপেক্ষ নিরীক্ষণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, “হা গজপতি! মাড়ওয়ারে তোমা অপেক্ষা সাহসী বোদ্ধা কেহ ছিল না। তোমার পিতা-তেজসিংহকে আমি জানিতাম, সূর্য্যমহল-দুর্গে তাঁহার আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলাম। গজপতি! তুমি আমারই অহুরোধে মাড়ওয়ারে আসিয়াছিলে, বার বার যুদ্ধে গৈতুক বিক্রম দেখাইয়াছ। একবার যুদ্ধে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলে, সেই জন্য তোমাকে মুক্তামালা দিয়াছিলাম,

প্রবেশ করিতে পাইবেন না।” এই কথাবলিতে বলিতে রাজী হুজ্জাতা হইয়া পড়িলেন।

রাজ্যের সহচরীগণ অনেক বহু রাজ্যের চৈতন্যসাধন করিল। তখন রাজী ক্রোধে প্রায় জ্ঞানশূন্য হইয়া কহিতে লাগিলেন, “কি বলিলি ? তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে পলায়ন করিয়াছেন ? যিনি পলায়ন করিয়াছেন, তিনি ক্ষত্রিয় নহেন, আমার স্বামী নহেন, এ নহেন যশোবন্ত সিংহকে আর দেখিবে না। আমি যেওয়ারের রাণার হুজ্জাতা ! প্রতাপ-সিংহের কুলে যিনি বিবাহ করেন, তিনি ভীকৃ কাপুরুষ কেন হইবেন ? যুদ্ধে জয় করিতে পারিলেন না, কেন সম্মুখরণে হত হইলেন না ? দূতগণ ! এখনও দণ্ডায়মান আছে ? আমার বোদ্ধগণ কোথায় ? দূত-গণকে পক্ষতের উপর হইতে নীচে নিক্ষেপ কর, দুর্গের দ্বার রুদ্ধ কর !”

রাজ্যের সমস্ত শরীর কম্পিত হইতেছিল, ক্রোধে কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন নরেন্দ্র অগ্রসর হইয়া ধীরে ধীরে অতিশয় গভীরস্বরে উত্তর করিলেন, “মহারাজি আমাদের মৃত্যুর আদেশ দিয়াছেন, আমরা মৃত্যুর ভয় করি না, কিন্তু মহারাজা যশোবন্ত সিংহকে কাপুরুষ বলিবেন না। এই নয়নে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি, যত দিন জীবিত থাকিব, সেরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ কখনও দেখিব না।”

রাজী ক্ষণেক স্থির-নয়নে নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন, “যথার্থই যশোবন্ত সিংহ সম্মুখ-যুদ্ধ করিয়াছিলেন ? তুমি বিদেশীয়, তোমার জীবনের কোন ভয় নাই, যথার্থ কথা বিস্তার করিয়া বল।”

নরেন্দ্র যুদ্ধের বিষয় সবিশেষ বর্ণনা করিলেন ; রাজপুত-সৈন্তের বৈরূপ সাহস

দেখিয়াছিলেন, মহারাজের বৈরূপ সাহস দেখিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন। শেষে বলিলেন, “যখন মেঘরাশির স্তার চারিদিকে যোগল-সেনা আসিয়া বেষ্টন করিল, যখন ধূম ও ধূলার ক্ষেত্র অন্ধকার হইয়া বাইল, যখন ভীকৃ কাসেম ধাঁ পলায়ন করিল, তখনও মহারাজ রাজপুতের উচিত সাহস অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে রাজপুত-শোণিতে পর্কত; উপত্যকা ও সিপ্রানদী আরক্ত হইয়াছে, রাজার চতুর্দিকে অগ্ন্যস্ত্রকমাত্র রাজপুত আছে, আরংজীব ও মোরাদ সহস্র যোগল সৈন্য সহিত রাজার উপর আক্রমণ করিতেছেন, তখনও মহারাজা যশোবন্ত সাহস অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাজার পদতলে শত শত রাজপুত হত হইতে লাগিল, রাজপুতসংখ্যা ক্ষীণ হইতে লাগিল, যোগলের জয়-নাদে মেদিনী ও আকাশ কম্পিত হইতে লাগিল, কিন্তু মহারাজের হৃদয় কম্পিত হইল না। অষ্ট সহস্র রাজপুতের মধ্যে অষ্টশতও জীবিত ছিল না, তথাপি মহারাজ যুদ্ধ-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন না। ঘোর কল্লোলিনী সিপ্রানদী ও ভীষণ বিক্রাপর্কত রাজা যশোবন্তের বীরত্বের সাক্ষী আছে।”

শুনিতে শুনিতে রাজ্যের নয়নদ্বয় জলে ছল্ ছল্ করিতে লাগিল,—বলিলেন, “ভগবন্ ! তোমাকে নমস্কার করি, আমার যশোবন্ত রাজপুতের নাম রাখিয়াছেন ! বিদেশীয় দূত, এ কথায় আমার হৃদয় লীভল হইল। বল, তাহার পর কি হইল ?”

নরেন্দ্র। মজ্জুঘোর ঘাঘা সাধ্য, রাজপুতের ঘাঘা সাধ্য, যশোবন্ত তাহা করিয়াছেন। যখন কেবলমাত্র পঞ্চশত সৈন্য জীবিত আছে দেখিলেন, তখন রাজা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন।

রাজী। "পলায়ন করিলেন। হা বিধাতঃ।
রাণীর জামাতা পলায়ন করিলেন।"—
বন্ধুহলে সজোর করাবাত করিয়া রাজী
পুনরায় মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তৎক্ষণাৎ দাসীগণ রাজীর মুখে জলসিক্কন
করিতে লাগিল। রাজীও অল্পক্ষণমধ্যেই
চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া এবার করুণস্বরে বলি-
লেন, "সহচরী! চিতা প্রস্তুত কর, আমার
স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইয়াছেন, তিনি স্বর্গ-
ধামে আমার জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন,
আমি তথায় যাই। যশোবন্তের নামে যে
আসিয়াছে, সে প্রবন্ধক। আর তুই দূত,
তোর সঙ্গিগণের সহিত এক্ষণেই মাড়ওড়ার
দেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হ, নচেৎ প্রাণদণ্ড
হইবে।"

নবেঙ্গ ও দূতগণ দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হই-
লেন, রাজীর আজ্ঞায় দুর্গের দ্বার বন্ধ হইল।
বাহিরে ঘাইবার সময় বোধপুত্রের রাজমন্ত্রী
দূতের হস্তে একখানি পত্র দিয়া বলিলেন,
"মহারাজের সহিত তোমাদের দেখা
করিবার আবশ্যকতা নাই, এই পত্র লইয়া
শীঘ্র মেওয়ার দেশের রাজধানী উদয়পুরে
যাও। তথায় রাণা রাজসিংহকে এই পত্র
দিও, তিনি তোমাদিগকে আশ্রয় দিবেন।
আমাদের মহারাজীর আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়,
মাড়ওড়ারে আর থাকিতে পাইবে না। মহা-
রাজীর মাতা তথায় আছেন, এই পত্র প্রাপ্তি-
মাত্র তিনি বোধপুত্রে আসিবেন, তিনি ভিন্ন
তাহার কন্ঠাকে আর কেহ সাক্ষাৎ করিতে
পারিবেন না।"

ইতিহাসে লিখিত আছে যে, বোধপুত্রের
রাজী আট নয় দিবস অবধি উন্মত্তপ্রায়
হইয়া রহিলেন। পরে উদয়পুর হইতে
তাহার মাতা আসিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ করি-
লেন, তখন তিনি যশোবন্তের সহিত সাক্ষাৎ

করিতে সম্মত হইলেন। পুনরায় সৈন্ত
সংগ্রহ করিয়া যশোবন্ত সিংহ আরাজীবের
সহিত অচিরাত্ যুদ্ধ করিতে যাইবেন স্থির
হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

উদয়পুর।

He lingered pouring on memorials
Of the world's youth ; through the
long pouring day
Gazed on those speechless ; nor when the
moon
Filled the magisterial halls floating
shades
Suspended he that task, but ever gazed
and gazed, till meaning on his vacant
mind
Flashed like strong inspiration.
Shelly.

মেওয়ার দেশে পূর্বে চিতোর প্রধান
নগরী ছিল, এক্ষণে উদয়পুর, মাড়ওড়ার
বালুকারাশি ও মরুভূমি হইবার সহিত ঋজোর
মেওয়ার দেশে পুনরায় অঁক। আশ্বিন মাসে
বড়ই আনন্দাভিব্যক্তি করি নরেন্দ্রনাথ বৈরাগ্য ষটা ও
বলীর উচ্চ শেখর উন্নতলেন, তাহা বর্ণনা করা
পার্কীয় নদী ও পূর্বপুরুষগণ যে সমস্ত অল্প
সন্দর্শন করিলেন, জয় করিয়াছেন বা যুদ্ধে
হৃদের শোভা দিয়াছেন, বোদ্ধাগণ এখন মহা
আনন্দোদয় হইতেই সমস্ত অল্প আনন্দশালা হইতে
করিয়া নরেন্দ্র করিয়া মহাসমারোহে তাহার
উদয়পুরে উপস্থিত হইলেন, দেবীর মন্দিরে
নরেন্দ্রনাথ মন্দির ও মেঘ বলি হইল,
স্থানে সেই দিবসে মহাসমারোহে দুর্গার পূজা
দেখেন হইল, তাহার পর-দিবসে মহারাণা সমস্ত
নির্মল বোদ্ধাগণকে আহ্বান করিয়া বনহলে

হারী সপ্তদৈবকে রাগ করিতেছে। চতুর্দিকে স্বন্দর পর্কতরাশির পর পর্কতরাশি, যেন প্রকৃতি এই মনোহর উচ্চ প্রাচীর দিয়া এই স্থলের আবাসস্থানকে রক্ষা করিতেছে। হ্রদের নিকটবর্তী একটি পর্কতশ্রেণীর উপর স্বন্দর রাজপ্রাসাদ ও খেতবর্ণ সৌখ্যমালা যেন সহস্র-বদনে নির্মল দর্পণে আপনার স্বন্দর প্রতিরূপ অবলোকন করিতেছে।

স্বর্গাধার দিয়া যোধপুরের দূত নগরে প্রবেশ করিলেন। যোধপুরে ও উদয়পুরে তখন বন্ধুত্ব ছিল, সুতরাং যোধপুরের দূতগণকে তাহান করিবার জন্ত নাগরিকগণ অরঞ্জন করিতে লাগিল। প্রথম পথ দিয়া নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গিগণ রাজপ্রাসাদ-ভিমুখে বাইতে লাগিলেন, চারুগণ "টপ্পা" অর্থাৎ মঙ্গলসূচক গীত গাইতে লাগিলেন, দুই পার্শ্বের শ্রীলোকগণ কলসকক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া "সুহেলিয়া" অর্থাৎ আনন্দগীত গাইয়া যোধপুরের দূতদিগকে আহ্বান করিলেন।

দূতগণ সকলকেই দুই এক মুদ্রা পুরস্কার দিয়া পরিতুষ্ট করিলেন।

"হারাঙ্গি আমি। কলে রাজপ্রাসাদে পৌছিয়া ছেন, আমরা মৃত্যুর ভয়ে প্রাসাদের উপর উঠি-রাজা যশোবন্ত সিংহকে বিনির্মিত সোপান দায়া না। এই নয়নে তাঁহাকে ধ্যামহলে প্রবেশ করি-রাছি, যত দিন জীবিত থাকি-না। বিদেশীয় দূত-যুদ্ধ কখনও দেখিব না।"

বংশের আদি-রাজ্যী ক্ষণেক স্থির-নয়নে স্তম্ভিত সেই গৃহের দিকে চাহিয়া রহিলেন, ধীরে ধীরে সেই জন্ত উক্ত "যথার্থই যশোবন্ত সিংহ সম্মুখ-যুদ্ধ ছিলেন? তুমি বিদেশীয়, তোমার গ-রত্নবিনির্মিত কোন ভয় নাই, যথার্থ কথা বিস্তারিত বল।"

আছেন। নরেন্দ্র যুদ্ধের বিষয় সবিশেষ বর্ণনা উপর করিলেন; রাজপুত-সৈন্তের যেরূপ সাহস করি-

তেছে। কিকিছুই পারিষদগণ উপবেশন করিয়াছেন ও চারুগণ ভক্তিবাচ্যে এই অমর্যাবতী-ভূয়া রাজসভায় রাণার সাধুবাদ করিতেছেন। প্রথম সময়ে যোধপুরের দূত প্রবেশ করিলেন।

দূত বিনীতভাবে সমস্ত সমাচার অবগত করাইলেন। যশোবন্ত সিংহের পরাজয় ও দেশে প্রত্যাগমন, মহারাজার ক্রোধ ও রাজার হৃদশা, এই সমস্ত অবগত করাইয়া যোধপুরের মন্ত্রী পত্র রাণার হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাণা রাজসিংহ সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া যশোবন্তের জন্ত শোক প্রকাশ করিয়া দূতগণকে বিদায় করিলেন ও তাঁহাদের উদয়পুরে থাকিবার জন্ত উপযুক্ত স্থান নির্দ্ধারিত করিতে মন্ত্রিবরকে আদেশ করিলেন। অল্পদিন পরেই যোধপুর-রাজ্যের মাতা উদয়পুর হইতে যোধপুরে গমন করিলেন।

নরেন্দ্রনাথ উদয়পুরে কয়েক বাস বাস করিয়া পরম শ্রীতি লাভ করিলেন। হেমের প্রতিমূর্তি তাঁহার হৃদয়ে অনপনের অচ্ছেদ্য অঙ্কিত হইয়াছিল, হেমের চিন্তা তিরোহিত হইবার নহে, তথাপি সেই স্বন্দর উপত্যকার বাস-কালীন সে চিন্তাও কিঞ্চিৎ পরিমাণে লাভব হইল। উদয়পুর হইতে অল্প দূরে অনেক যুদ্ধস্থান, অনেক কীর্তিগুপ্ত, অনেক পুণ্ড্রস্থান আছে, নরেন্দ্র একে একে সমুদয় সন্ধান করিতে লাগিলেন। কখন একাকী, কখন দেওয়ানা তাহার-বালককে সঙ্গে লইয়া নরেন্দ্র নানা পর্কত উল্লঙ্ঘন করিতেন, হ্রদের এক অংশ হইতে অত্র অংশে, এক পর্কত হইতে অত্র পর্কতে, এক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অত্র যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিতেন; কখন কখন প্রাতঃকাল হইতে বিপ্রহর পর্যন্ত, বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পর্কত

উপত্যকার বিচরণ করিতেন। প্রাতঃ-
গলে ক্রোড়াসক্ত রাজপুত্র-বালকগণ অকুল-
নর্দেগ পূর্বক সেই অপরিচিত ভ্রমণকারীকে
দখাইত, সায়ংকালে রাজপুত্র-মহিলাগণ
দলসককে হ্রদ হইতে প্রত্যাবর্তনের সময়
সেই বিদেশীকে চারণ বিবেচনার প্রণাম
করিয়া চলিয়া যাইত।

দেওয়ানাও নিম্নক্কে প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে
বিচরণ করিত, নিকটস্থ বৃক্ষ হইতে ফল
আহরণ করিয়া আনিয়া দিত ও সায়ংকালে
নৌকা আনিয়া আপনি দাঁড় করিয়া প্রভুকে
উদয়পুরে পুনরায় লইয়া যাইত। নিম্নক
শান্ত হ্রদের উপর দিয়া ধীরে ধীরে নৌকা
ভাসিয়া যাইত, সে শান্ত সায়ংকালীন
আকাশ, নিম্নক পর্বতরাশি ও নির্মল শব্দ-
শূন্য হ্রদ দেখিয়া নরেন্দ্রনাথের হৃদয় শান্তি-
রসে পরিপূর্ণ হইত। কখনও বা দেওয়ানা
সপ্তম্বরে গীত আরম্ভ করিত, সে বাল-কণ্ঠ-
বিনিঃসৃত সুবিলম্ব স্বরে সেই নৈশব্রত,
পর্বতরাশি ও আকাশমণ্ডল ভাসিয়া যাইত।
তাতার-ভাষায় গীত, সে গান নরেন্দ্র বৃথিতে
পারিতেন না, তথাপি ছুই একটি কথা
তিনিয়া বোধ হইত যেন, তাহা প্রেমের
গান। অভাগা উন্নত বালক! তুই এই
বয়সে কি প্রেমে উন্নত হইয়াছিস? না
হইলে সে দেওয়ানা হঠবে কেন, তাহার
চক্ষু এরূপ অস্বাভাবিক জ্যোতিতে দীপ্ত
কেন, সে দেশ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া
উন্নত হইয়া দেশে দেশে বিচরণ করে
কেন? দেওয়ানা নরেন্দ্রনাথের উপযুক্ত
ভৃত্য!

রজনীযোগে চম্ভাপোকে সেই হ্রদের
নির্মল জল বড় সুন্দর শোভা পাইত।
জলহিল্লোলে চম্ভের আলোক বড় সুন্দর
নৃত্য করিত, বায়ু রহিয়া রহিয়া সেই সুন্দর

উন্মীষাশ্রমে চুবন করিয়া যাইত নরেন্দ্রনাথ
নৌকার উপর শয়ান হইয়া চারিদিকের
সেই অনন্ত পর্বতরাশি দেখিতেন, অনন্ত
আকাশে নির্মল নীল আভা দেখিতেন, ছুই
একখানি দৃষ্ট-কেন্দ্রিত শুভ্রমেঘ দেখিতেন।
এই সমস্ত দেখিতেন আর বাল্যকালের কথা
তাহার স্মরণ হইত, হেয়লতার কথা স্মরণ
হইত, অলঙ্কিত অশ্রু-বিন্দুতে বোকার বদন
সিক্ত হইয়া যাইত।

এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল।
ক্রমে আশ্বিন মাসে অধিকাংশের সময়
সমাগত হইল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

শারদীয়া পূজা।

(Go Where glory waits thee.

Moore.

শরৎকাল উপস্থিত। রাজপুতানার
এই সময় যুদ্ধ আরম্ভের সময়, স্তত্রাং
রাজস্থানে অধিকার পূজার সহিত খড়্গের
পূজা হইয়া থাকে। আশ্বিন মাসে
উপধুপরি দশদিন নরেন্দ্রনাথ বৈষ্ণব ষটা ও
সমারোহ দেখিলেন, তাহা বর্ণনা করা
যায় না। পূর্বপূর্বগণ যে সমস্ত অস্ত্র
লইয়া যুদ্ধ জয় করিয়াছেন বা যুদ্ধে
প্রাণ দিয়াছেন, বোদ্ধাগণ এখন মহা
উৎসাহে সেই সমস্ত অস্ত্র আয়ুধশালা হইতে
বাহির করিয়া মহাসমারোহে তাহার
পূজায় রত হইলেন, দেবীর মন্দিরে
প্রতিদিন মহিষ ও মেঘ বলি হইল,
দশম দিবসে মহাসমারোহে ভূগাঁর পূজা
হইল, তাহার পর-দিবসে মহারাণা সমস্ত
বোদ্ধাগণকে আহ্বান করিয়া রণস্থলে

উপস্থিত হইলেন। সে দিন সমস্ত উদয়পুর নৃত্য শোভার শোভিত হইয়াছে; বাঁকান, লোকান, গথ, ষাট পুষাখান্য ও বৃক্ষগজে পরিশোভিত হইয়াছে, ধারে ধারে স্থলর ও স্থশোভিত তোরণ বৃহৎ হইতেছে, গৃহে গৃহে বিজয়-পতাকা উজ্জীন হইতেছে। প্রাতঃকালে জয়চাকের শব্দে রাজপুত্র সৈন্তগণ সজ্জিত হইয়া রণস্থলে গমন করিতেছে, উদয়পুরের অধীনস্থ নানাহান হইতে অনেক সেনানী নিজ নিজ সৈন্ত-সামন্ত লইয়া সমবেত হইয়াছে, নানাহানীর লোকের নানারূপ পরিচ্ছদ, নানারূপ পতাকা ও নানারূপ অস্ত্রশর আজি উদয়পুরে সম্মিলিত হইতেছে। পঞ্চদশ সহস্র যোদ্ধা আজি মহারাণাকে বেষ্টন করিয়াছে, তাহাদের পদভরে যেন মেদিনী কম্পিত হইতেছে।

বেলা এক প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রণস্থল সৈন্তে স্তম্বাকীর্ণ এবং তাহাদিগের যুদ্ধকৌশল দেখিবার জন্য সমস্ত নগরবাসী ঈর্ষাক্ষা পড়িয়াছে। রাণার আদেশে সৈন্তগণ তীরনিক্ষেপে বা বর্ষাচালনে, খড়্গ-যুদ্ধে অথবা অশ্বচালনে নিজ নিজ কৌশল দেখাইতে লাগিল এবং মেওয়ারের নানা স্থান ও নানা দুর্গ হইতে আগত নানা কুলের রাজপুত্রগণ নিজ নিজ রণনৈপুণ্য দর্শাইতে লাগিল। চন্দাওরকুল, জগাওরকুল, রাঠোরকুল, প্রমারকুল, খালাকুল প্রভৃতি নানা কুলের রাজপুত্রগণ অশ্ব উদয়পুরে মহারাণার নিকট রাজভক্তি ও রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে আসিয়াছে এবং তাহাদিগের স্ব স্ব চারণগণ সেই সেই কুলের গৌরবস্থচক গীত গাইতেছে। নরেন্দ্র সমস্ত দিন এইরূপ সমরোৎসব দেখিয়া এবং চারণদিগের গীত শুনিয়া পুলকিত হইলেন। অতাবধি রাজ-

হানে শারদীয়া-পূজার শেষদিনে একপ খটা হয়, অতাবধি রাজপুত্র-যোদ্ধাগণ এই সময়ে নিজ নিজ রাজ্যের নিকট যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন করে, অতাবধি রাজপুত্র-নগরবাসি-গণ দেবীপূজার অবসানে রক্তস্থলে সমবেত হইয়া দেবীর রাজভক্তি প্রদর্শন করে। (বর্তমান লেখক রাজস্থানে) ভ্রমণকালীন শারদীয় বড়পূজা ও শারদীয় সমারোহ অবলোকন করিয়াছে, সহস্র নগরবাসি-দিগের সমাগম ও রাজভক্তি দৃষ্টি করিয়াছে, প্রাচীন নিয়ম অনুসারে স্বাধীন রাজপুত্র-দিগের শরণ্যাকালের আনন্দোৎসব দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত করিয়াছে।

সমস্ত দিন এইরূপ উৎসব দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ সন্ধ্যার সময় একটি বৃক্ষতলে যাইয়া কিছু ফলমূল আহারের আয়োজন করিলেন এবং নিকটস্থ একটি কূপ হইতে জল আনিতে গেলেন। কূপের নিকট গোস্বামিবেশে একজন দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনিও জল আনিতে গিয়াছিলেন। তিনি নরেন্দ্রকে কিঞ্চিৎ পরুষভাবে তেলিয়া দিয়া আগে নিজে জল তুলিতে লাগিলেন।

গোস্বামীর এই অভ্যাসের দৃষ্টে নরেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তিরস্কার করিলেন। গোস্বামী দ্বিগুণ কটুভাষায় তিরস্কার করিয়া বলিলেন, “তুমি বিদেশীয়, রাজস্থানে আসিয়া রাজপুত্রদিগের সহিত কলহ করিতে তোমার ভয় বোধ হয় না?”

নরেন্দ্র। আমি বিদেশীয় বটে, কিন্তু বহুকাল অবধি রাজপুত্রদিগের সহিত সহবাস করিয়াছি, তোমার স্বায় অভদ্র রাজপুত্র দেখি নাই।

গোস্বামী। যদি রাজপুত্রদিগের সহিত সহবাস করিয়া থাক, তাহা হইলে বোধ হয়, জান যে, রাজপুত্রমাত্রেই অসি ও তাল

চালাইতে জানে; অভাব চূপ করিয়া থাক ।

নরেন্দ্র । গরিত রাজপুত, আমিও অসি ও চাল চালনা কিছু শিখা করিয়াছি, আমার নিকট গরু করিও না। তুমি গোস্বামী বলিয়া এবার ক্ষমা করিলাম ।

কথায় কথায় বিবাহ বাড়িতে লাগিল, গোস্বামী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নরেন্দ্রকে প্রহার করিলেন, নরেন্দ্রও প্রহার করিলেন, অল্পকণ্ঠে উভয়ে জ্ঞানশূন্য হইয়া অসি ও চাল বাহির করিলেন । তখন অন্ধকার হইয়াছে, সে স্থান নির্জন, আর সকলে চলিয়া গিয়াছে ।

দুই জনে একেবারে বেগে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, কণকাল তাঁহাদের কাহাকেও ভাল করিয়া দেখা গেল না । যুদ্ধমধ্যে নরেন্দ্র পরাজিত হইলেন । সেই অপূর্ণ বলবান গোস্বামীর প্রচণ্ড আঘাতে নরেন্দ্রের অসি হস্ত হইতে পড়িয়া গেল, নরেন্দ্র স্বয়ং ভূমিতে নিপতিত হইলেন ।

তীব্রস্বরে গোস্বামী বলিলেন, “বিদেশীয় বোদ্ধা, তুমি বালক, তোমার অপরাধ ক্ষমা করিলাম । পুনরায় রাজপুত-গোস্বামীর সহিত কলহ করিও না, গোস্বামীর চির-জীবন কেবল পূজাকার্য্যে অতিবাহিত হয় নাই, সেও যুদ্ধ-ব্যবসা কিছু কিছু জানে ।”

নরেন্দ্র কর্কশস্বরে বলিলেন, “রাজপুত ! আমি তোমার নিকট জীবন ভিক্ষা চাহি না । তোমার বাহা ইচ্ছা, বাহা সাধা কর, আমি অহুগ্রহ চাহি না ।”

গোস্বামী তখন গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, “বোদ্ধা, আমিও যুদ্ধব্যবসায় করিয়া থাকি, বোদ্ধার নিকট ভিক্ষা চাহিতে বোদ্ধার কোন অপমান নাই । নরেন্দ্র, আমি তোমাকে জানি, তুমিও আমাকে শীঘ্র

জানিবে, আমার নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিতে কোনও অপমান নাই । তিন দিবসের মধ্যে আমারই আবার সাক্ষাৎ হইবে, সে দিন আমিও তোমার নিকট একটি ভিক্ষা প্রার্থনা করিব । আমার নাম শৈলেশ্বর ।”

এই বলিয়া গোস্বামী সহসা অন্ধকারে অদৃশ্য হইলেন । নরেন্দ্র বিম্বিত হইয়া রহিলেন ।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ।

একলিঙ্গের মন্দির ।

For thee young warrior welcome !

thou hast yet,
Some tasks to learn, some frailties

to forget
Moore.

রাজস্থানে নূতন নূতন দেশ ও নূতন নূতন আচার-ব্যবহার দেখিয়া, নরেন্দ্রনাথের হৃদয় কিছু দিন শান্ত হইয়াছিল, কিন্তু প্রান্তরে যে অন্ধ খোদিত হয়, একেবারে বিলুপ্ত হয় না । বঙ্গদেশ হইতে উদয়পুর শত শত ক্রোশ অন্তর, কত নদ, নদী, পর্বত, যক্ষুক্ষ্মি পার হইয়া নরেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত আসিয়াছেন । তথাপি প্রাতঃকালে যখন পূর্বদিকে আকাশে রক্তমাছটা অবলোকন করিতেন, তখন সেই পূর্বদেশবাসিনী বালিকা নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে জাগরিত হইত । রজনীতে যখন নরেন্দ্রনাথ একাকী ছাদের উপর অন্ধকারে বিচরণ করিতেন, বোধ হইত যেন, সেই প্রণয়প্রতিমা তাহার জ্যোতিতে নরেন্দ্রনাথের উপর প্রেম-দৃষ্টি করিতেছে ! কোথায় বীরনগরের খাটা, কোথায় কলনাদিনী ভাগীরথী, আর কোথায় নরেন্দ্রনাথ ? কিন্তু বঙ্গদেশ হইতে পলায়ন

করিলে কি চিন্তা হইতে পলায়ন করা যায়? যত্ন আর আগের একবার সেই হেমলতাকে দেখিবেন, প্রাতঃকালে, সায়ংকালে, নিশীথে তিনি যে চিন্তা করেন, হেমলতাকে একবার সেই সমস্ত কথা বলিবেন, নরেন্দ্রনাথের কেবল এই ইচ্ছা। যত্ন আর আগের একবার দেখা হইবে না? নরেন্দ্রনাথ দেওয়ানার নিকটে শুনিলেন, ভগবান্ একলিঙ্গের মন্দিরের কোন এক গোস্থামী ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন; নরেন্দ্রনাথ একদিন সেই মন্দিরে যাত্রা করিলেন।

রজনী এক প্রহরের পর নরেন্দ্র মন্দিরের নিকটে উপস্থিত হইলেন ও মন্দিরের যে শোভা দেখিলেন, তাহাতে বিস্মিত হইলেন। মন্দির একটি উপত্যকায় নির্মিত, তাহার চারিদিকে যতদূর দেখা যায়, কেবল অন্ধকারময় পর্বতশ্রাণি অন্ধকার আকাশের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, চারিদিকে যেন প্রকৃতি অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর দিয়া রত্নের উপ-গৃহ নির্মাণ করিয়াছেন।

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় নরেন্দ্র সেই প্রকাশ্য মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সারি সারি স্বেত-প্রস্তর-বিনির্মিত সুন্দর স্তম্ভের মধ্য দিয়া সেই বিস্তীর্ণ প্রস্তরালয়ে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখে মহাদেবের বসু ও নন্দীর পিতৃল-প্রতিমূর্ত্তি বিহাছে, ভিতরে শুভ্র প্রকোষ্ঠ ও স্তম্ভসারি উজ্জল সুগন্ধ দীপাবলীতে ঝলমল করিতেছে, মধ্যে ভোলানাথের প্রস্তর-বিনির্মিত প্রতিমূর্ত্তি প্রাতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মন্দিরের একজন দীর্ঘকায় তেজস্বী জটাদারী গোস্থামী এক প্রান্তে উপবেশন করিয়া আছেন, প্রশস্ত ললাটে অর্দ্ধশঙ্করের ছায় চন্দনরেখা, বিশাল স্বন্ধে যজ্ঞোপবীত লঙ্ঘিত রহিয়াছে। অল্প ছুই চারি জন গোস্থামী এদিক ওদিক বিচরণ করিতেছেন। ঐ মন্দি-

রের প্রধান গোস্থামী চিরকাল অবিবাহিত থাকেন, তাহার যত্নের পর শিষ্যের মধ্যে একজন ঐ পদে নিযুক্ত হন। মন্দিরের সাহা-য্যার্থে অনেকসংখ্যক গ্রাম নির্দিষ্ট ছিল, তাহা ভিন্ন ব্যক্তিদিগের দানও অল্প ছিল না।

দ্বিপ্রহরের ষষ্ঠারব সেই সুন্দর শিব-মন্দিরে প্রতিশ্রুতি হইল, বসু বসু হর হর শব্দে মন্দির পরিপূরিত হইল ও তৎপরে বস্ত্র-সম্মিলিত উচ্চ গীতধ্বনিতে ভোলানাথের স্তব আরম্ভ হইল। প্রৌঢ়বোবনসম্পন্ন নর্ত্তকীগণ তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল, গায়কগণ সপ্তশব্দে মহাদেবের অনন্ত গীত গাইতে আরম্ভ করিল। ক্ষণেক পর গীত সাক্ষ হইল, সেই জটাদারী গোস্থামী ইঙ্গিত করায় নর্ত্তকীগণ চলিয়া গেল, গায়কগণ নিবৃত্ত হইল, দীপাবলী নির্ঝাপিত হইল, পূজা সাদ হইল। নরেন্দ্রনাথ সে অন্ধকারে ইতিকর্ষব্যবিস্মৃত হইয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন।

ক্ষণেক পর বোধ হইল, যেন অন্ধকারে সেই দীর্ঘকায় জটাদারী গোস্থামী তাঁহাকে ইঙ্গিত করিতেছেন। নরেন্দ্রনাথ সেই দিকে যাইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয় কি এ মন্দিরের এবজন গোস্থামী?” গোস্থামী কিছু-মাত্র না বলিয়া ওষ্ঠের উপর অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। তৎপরে গোস্থামী অঙ্গুলি দ্বারা দূরে এক দিক নির্দেশ করিলেন, নরেন্দ্র সেই দিকে চাহিলেন; নিবিড় দুর্ভেদ অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আবার চাহিলেন, বাধ হইল যেন, অন্ধকারে একটি দীপশিখা দেখা যাইতেছে। গোস্থামী নরেন্দ্রনাথকে ইঙ্গিত করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন, নরেন্দ্রনাথ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

ছুই জনে অনেক পথ সেই অন্ধকারে অতিবাহিত করিলেন। এ অন্ধকারে এই

মোনাবলবী বোগী পুরুষ কে ? ইহার উদ্দেশ্য কি ? শৈবগণ কখন কখন নরহত্যার দ্বারা পূজাসাধন করে, এ দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ বিকট বোগীর কি তাহাই উদ্দেশ্য ? একবার নরেন্দ্রনাথ দাঁড়াইলেন, আবার খড়্গে হাত দিয়া ভাবিলেন, “আমি কি কাপুরুষ ? এই প্রশান্ত-মুষ্টি বোগীর সহিত বাইতে ভয় করিতেছি ?” আবার গোস্বামীর সঙ্গে সঙ্গে সেই “ভূর্ভুজ অন্ধকারে পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন । অনেকক্ষণ পর শৈব গোস্বামী এক পর্বত-গহবরে প্রবেশ করিলেন, নরেন্দ্রও প্রবেশ করিলেন । তাহার ভিতর যাত্রা দেখিলেন, তাহাতে নরেন্দ্র আরও বিস্মিত হইলেন । সম্মুখে করালবদনা কালীর ভীষণ প্রতি-মূর্তি, তাহার নিকট কয়েকখানি কাষ্ঠ জলিতোছে, তাহার আলোক সেই গহবরের শিলার চারিদিকে প্রতিফলিত হইতেছে । অগ্নির পার্শ্বে কয়েকখানি হস্তলিপি, একখানি শোণিতাক্ত খড়্গ ও স্থানে স্থানে প্রস্তরখণ্ড শোণিতে রঞ্জিত হইয়াছে । দূরজলস্রোতের দ্বারা একটি শব্দ সেই গহবরে শ্রুত হইতেছিল ।

গোস্বামীর আকৃতি অপূর্ণ । ঈষৎ ষেত শ্মশ্রু বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত লম্বিত রহিয়াছে, কেশের জটাবার পৃষ্ঠে চলিতেছে, শরীর অতিশয় দীর্ঘ, অতিশয় বলিষ্ঠ, অতিশয় তেজোময় বনিয়া অতুল্য হইয়াছে । নয়নদ্বয় সেই অগ্নির আলোকে ধক্ ধক্ করিয়া জলিতোছে । উন্নত ললাটে অর্ধচন্দ্রাকৃতি চন্দন-রেখা শোভা পাইতেছে ।

গোস্বামী জলস্তকাঠ নির্মাণ করিলেন, পরে তাহার অপর পার্শ্বে বাইরা সেই রক্তাক্ত খড়্গ হস্তে তুলিয়া লইলেন । বিকীর্ণ অগ্নিকণাতে তাহার মুখমণ্ডল ও দীর্ঘ অবয়ব আরও বিকট বোধ হইল, নরেন্দ্রনাথের হৃদয়

ভস্মিত হইল । তিনি অগত্যা একপদ পড়াতে বাইরা শিলারশিতে পৃষ্ঠ দিয়া দাঁড়াইলেন, অগত্যা তিনি কোষ হইতে অসি বাহির করিলেন । সাহসে ভয় করিয়া তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু তাহার হৃৎকম্প একেবারে অবসান হইল না ।

অতি গভীরস্বরে গোস্বামী ডাকিলেন, “নরেন্দ্রনাথ !”

নরেন্দ্রনাথ এতক্ষণে বুঝিলেন, শৈব সেই উদয়পুরের যোদ্ধা,—শৈলেশ্বর !

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ।

পর্বত-গহবর ।

Thy fatal ham
Is cursed in silence, sorrow shame,—
A passion without hope or pleasure,
In thy soul's darkness hurried deep
It lies some ill-gotten treasure
Some idol without shine or name,
O'er which its pale eyed votaries
Unholy watch while others sleep.

Moore.

শৈলেশ্বর । নরেন্দ্রনাথ ! ভগবান একলিঙ্গের মন্দিরে গোস্বামিগণ বোগবলে মানব-হৃদয় জানিতে পারেন । নরেন্দ্রনাথ ! তুমি পাপ হৃদয়ে এ পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছ । তোমার মনে পাপচিন্তা আছে ।

নরেন্দ্র । আপনি কে জানি না, আপনার কথা উত্তর দিতে বাধ্য নহি । শৈলেশ্বর । আমি ভগবান একলিঙ্গের মন্দিরের গোস্বামী, মন্দির-কলুণিতকারীকে প্রণয়ন করিবার আমার অধিকার আছে ।

নরেন্দ্র । আপনি আমাকে কিরূপে

চিনিলেন, জানি না, আপনি আমার কি পাপ দেখিয়েছেন, জানি না।

শৈলেশ্বর। এ বলিরে প্রভারণা অন্য-বস্তক। একটা রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া সেই নারীকে পুনরায় পাইবার লালসায় তুমি এই স্থানে আসিয়াছ।

নরেন্দ্র। যদি তাহাই হয়, তাহাতে পাপ কি? গোপ্যমিগণ যদিও রমণীপ্রেমে বঞ্চিত, তথাপি রমণী-প্রেম-আকাজ্জক পাপ নহে। স্বয়ং শূলপাণি অপর্যায় প্রেম আকাজ্জক করেন।

শৈলেশ্বর। নরেন্দ্র! এ প্রবন্ধনার স্থান নহে। তুমি কেবল রমণীর প্রেম-আকাজ্জকী নহ, তুমি পরস্ত্রীর প্রেম-আকাজ্জকী। জগতে এরূপ যন্ত্রণা কি আছে, নরকে এরূপ অগ্নি কি আছে, বাহাতে এ পাপের প্রার-
শ্চিত্ত হয়?

স। নরেন্দ্র। আমি যখন একটা বালিকাকে ভালবাসিতাম, তখন সে অবিবাহিতা ছিল। এক্ষণে যদি সে বিবাহিতা হইয়া থাকে, তবে সে আমার অস্পৃশ্য।

শৈলেশ্বর। নরেন্দ্রনাথ! আপনাকে ভুলাইও না, আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিও না। যে ঘোর পাপে লিপ্ত হইয়াছ, তাহা বিশেষ করিয়া আলোচনা কর, সুন্দর জাহ্নবীকূলে সেই সুন্দর অট্টালিকা স্মরণ কর। পবিত্রাত্মা শ্রীশচন্দ্র, পবিত্রহৃদয়া হেমলতা, পবিত্র সংসার! পাপিষ্ঠ, তোমার মনোরথ কি? সেই সংসার ছারখার হয়, সেই শ্রীশচন্দ্রের সর্কনাশ হয়, সেই হেমলতা তোমার হয়! সেই খেতপদ্ম-সম্ভিতা পুণ্য-হৃদয়া হেমলতা বাল্যকালে যে তোমার সহিত খেলা করিয়াছিল, এখনও সহোদরী অপেক্ষা তোমাকে যে স্নেহ করে, তোমার ভক্ত চিন্তা করে, সেই স্নেহময়ী পতিব্রতা

নারী কুলটা হইয়া তোমাকে সেবা করে। সতীর লগ্নাটে কুলকলঙ্কিনী, দুর্ভাগিনী শব্দ অনশনের অর্থে অঙ্কিত হয়। তাহার দুঃ-কেননিড খেত বশে অদাশ্রয় বৈশীপ্যমান হয়। তোমার ভক্ত সে সংসার ধ্বংস প্রাপ্ত হয়! হা রে নরেন্দ্রনাথ! আপনাকে ভুলাইও না। সত্য তুমি এতদূর ভাব নাই, কিন্তু তোমার মনোরথ পূর্ণ হইলে ইহা ভিন্ন আর কি ফল হয়? এই পাপ মনোরথে তুমি এই পাবত্র মন্দিরে আসিয়াছ।

শৈলেশ্বরের কথা সাক্ষ হইল, কিন্তু সে বজ্রধ্বনি তখনও নরেন্দ্রের কর্ণমূলে কম্পিত হইতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ অধোবদনে রহিলেন, তাহার শরীর কম্পিত হইতেছিল। চিন্তা করিতে করিতে তাহার ক্রোধ লীন হইল, নয়ন হইতে দুই একটি অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইল। অনেকক্ষণ পর দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “স্বামিন্! আমি পাপিষ্ঠ। আমাকে সমুচিত দণ্ডবিধান করুন।”

শৈলেশ্বর। বৎস! এ সংসারে এরূপ ব্যাধি নাই, যাহার ঔষধি নাই, ‘এরূপ পাপ নাই, যাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমি তোমার সংশোধন কামনা করি, দণ্ডবিধান কাঙ্ক্ষা করিও না।

নরেন্দ্র। স্বামিন্! আমি দয়ার উপযুক্ত নহি; যে পাপিষ্ঠ হেমলতার জ্ঞান পবিত্র-পুণ্ডরীর অপকার কামনা করে, তাহার ইহ-জীবনে প্রায়শ্চিত্ত নাই।

শৈলেশ্বর। নরেন্দ্র, তুমি আপনাকে যতদূর পাপী বিবেচনা করিতেছ, ততদূর পাপী নহ। আমার নিকট কিছুই অসিদ্ধ নাই। তুমি হেমলতাকে পাইবার মানস কর নাই, জীবনে আর একবার তাহাকে দেখিবে, এইরূপ মানস প্রকাশ করিয়াছিলে,

সেই যানসেই দেওয়ানের আদিরা ছিলে । কিন্তু তুমি বালক, জান না, হেমলতাকে আর একবার দেখিলে তাহার সর্বনাশ সাধন হইবে ।

নরেন্দ্র । প্রভো ! আপনি বাহা আদেশ করিলেন, যথার্থ, হেমলতার হানি করা দূরে থাক, তাহার শরীরের একটি কণ্টক বিমোচন করিবার জন্য আমি জীবন দিতে পারি, ভাগবান্ অমৃত্যুমুখী, তিনি তাহা তানেন ।

শৈলেশ্বর । তবে তাহার হৃদয়ে যে কণ্টকটি তুমিই স্থাপন করিয়াছ, সেটি তুলিতে যত্নবান্ হও না কেন ?

নরেন্দ্র । কিরূপে ? আদেশ করুন ।

শৈলেশ্বর । বাল্যকাবাবধি তুমি তাহার হৃদয়ে প্রেমস্বরূপ কণ্টক রোপণ করিয়াছ, সেটি তুমি উৎপাটন কর, না হইলে তাহা উৎপাটিত হইবে না, হেমলতা জীবন্ত থাকিবে । হেমলতা এক্ষণে সচ্চরিত্র ধর্ম-পরায়ণ স্বামী পাইয়াছে, সংসারকাষ্যে ব্রতী হইয়াছে, কেবল সময়ে সময়ে তোমার চিন্তা তাহার মনে উদয় হয়, কেবল সেই সময়ে স্বামীর প্রতি হৃদয়ে বিশ্বাসবাতিনী হয় । সেই চিন্তা তুমি দূর কর ।

নরেন্দ্র । কিরূপে দূর করিব ? আপনি বলিতেছেন, তাহার সহিত দেখা করিলে তাহার সর্বনাশ হইবে ।

শৈলেশ্বর । উপায় আছে । হেমলতার সহিত একেবারে চিরজন্মের মত বিচ্ছেদ ঘটান আবশ্যক । নরেন্দ্র, তুমি যদি যথার্থ হেমলতাকে ভালবাস, যদি যথার্থ তাহার কণ্টকোদ্ধারের জন্য প্রাণ দিতে সম্মত থাক, তবে যোগী হইয়া নারী-সংসর্গ ত্যাগ কর, কিংবা মুসলমান হইয়া মুসলমানকন্যা বিবাহ কর । হেম যখন শুনিবে যে, নরেন্দ্র আমার

বাল্যকালের ভগবান্ তুমিরা যোগী হইয়াছে, অথবা বিবাহী হইয়া অস্ত্র তাকে গ্রহণ করিয়াছে, তখন অবশ্যই তাহার হৃদয় ক্রমে পরিবর্তিত হইবে । যাক্ত-হৃদয় লতার মত শুক কাঠে জড়াইয়া থাকে না । যে আমাকে একেবারে বিশ্বস্ত হইয়াছে, বাহার অস্ত্র আশা, অস্ত্র প্রেম, অস্ত্র উদ্বেগ, অস্ত্র চিন্তা, তাহার প্রতি আত্মরক্ষা কখনও চিরকাল থাকে না । নরেন্দ্র ! তোমার বিষম পাপের এই বিষম প্রায়শ্চিত্ত ।

নরেন্দ্র । ভগবান্ জানেন, আমি তাহার জন্য অনেক ক্রেশ স্বীকার করিতে পারি, কিন্তু আপনি যে ব্যবস্থা করিলেন, তাহা অসম্ভব । আমি ! ঐ ঔষধ অতিশয় তিক্ত, অস্ত্র ঔষধের ব্যবস্থা করুন ।

শৈলেশ্বর । উৎকট রোগে উৎকট ঔষধ আবশ্যক ।

নরেন্দ্র । আমি ! আপনি পরম ধার্মিক । শৈব হইয়া আমাকে মুসলমান-ধর্ম অবলম্বন করিবার আদেশ করিতেছেন ?

শৈলেশ্বর । পাপের জন্য মৃত্যুবা গোজন্ম পর্যন্ত প্রাপ্ত হয়, কেবল জাতিনাশে ভীত হইতেছ ?

তুমি জনে অনেককণ নিশ্চয় হইয়া রহিলে । নরেন্দ্রনাথ হস্তে গণ্ডল স্থাপন করিয়া সেই অগ্নিকুলের দিকে চাহিয়া একমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, শৈলেশ্বর সেই পরীক্ষার মধ্যে ধীরে ধীরে বিচরণ করিতে লাগিলেন ।

অনেককণ পর শৈলেশ্বর গভীরভাবে বলিলেন, “নরেন্দ্রনাথ, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর ?”

নরেন্দ্র । আমার খণ্ডা গ্রহণ করুন, আর কি প্রমাণ দিব ?

শৈলেশ্বর । তবে একটি কথা শুন ।

প্রেম নারীর একমাত্র অবলম্বন, প্রেম নারীর জীবন, পুরুষের তাহা নহে। পুরুষের অনেক আশা, অনেক অভিলাষ, অনেক মহৎ উদ্দেশ্য আছে। তুমি যুবক, সাহসী, অভিমানী, এ প্রশস্ত জগতে কি আপন অসি সহায় করিয়া আপনার বশের পথ পরিষ্কার করিতে পার না? স্রোতের মত কি কেবল জলধন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে চাও? তুমিরাছি, তোমাদের বন্ধুদেশ বীরশূত্র—বশঃশূত্র। বাও, নরেন্দ্রনাথ! সেই দূর বন্ধুদেশে বশঃশূত্র স্থাপন কর, বাও, দেশের গৌরব-সাধন কর, সিংহবীৰ্য প্রকাশ করিয়া আপন কীৰ্ত্তি স্থাপন কর, এ মহৎ উদ্দেশ্যে তোমার জীবন সমর্পণ কর। আকাশে এরূপ দেবতা নাই, বিনি এ মহৎ উদ্দেশ্যে তোমার সহায়তা না করিবেন; স্বয়ং বজ্রপাণি পুরন্দর, স্বয়ং শূলপাণি মহাদেব তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন।

শৈলেশ্বর নিতম্ব হইলেন। নরেন্দ্রের নয়নস্বর জ্বলিতে লাগিল, তিনি একদৃষ্টিতে সেই অপূর্ণ শৈবের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পূর্বে একদিন এই শৈবকে বেরূপ যুদ্ধনিপুণ দেখিয়াছিলেন, অন্য মানব-হৃদয়-জ্ঞানে তাহাকে সেইরূপ নিপুণ দেখিলেন।

শৈব আবার বলিতে লাগিলেন, “নরেন্দ্র! এই ঘোর রক্তনীতে তুমি বিদেশে ভগবান্ একলিঙ্গের মন্দিরে পূজা দিতে আসিরাছ।” কি অজ্ঞ? দেশের হিতসাধনের অজ্ঞ আসিরাছ? কোন্ বীর-স্রোতে ব্রতী হইয়া আসিরাছ? কোন্ দেবোচিত মহত্বদেস্ত সাধনার্থ আসিরাছ? দ্বিক নরেন্দ্র! তোমার স্ত্রীর বীরপুরুষ একটি বালিকার মূখ দেখিবার অজ্ঞ জীবনের মহৎ

উদ্দেশ্য তুলিয়া থাকে? প্রেমচিন্তা দূর করে, অথবা যদি প্রেম বিনা জীবন স্তব্ধ বোধ হয়, তবে বীরোচিত প্রণয়ে-বদ্ধ হও। পুরুষ-সিংহ! সিংহী গ্রহণ কর।”

নরেন্দ্র। ভগবন্! আদেশ করুন।

শৈলেশ্বর। এ জগৎ অহুসঙ্কান কর।

পীড়ার সময় সাবিত্রীর স্ত্রীর তোমার সেবা করিবে, বিপদের সময় নৃমুণ্ডমালিনীর স্ত্রীর তোমার পার্শ্বে অসিহস্তে দাঁড়াইবে, কুশলের সময় বিমল প্রণয়দানে তোমার হৃদয় ভুগু করিবে, যুদ্ধের সময় বশোণী তোমার শরীর কটকিত করিবে, এরূপ ব্রহ্মণী যদি পাও, তাহাকে গ্রহণ কর।

নরেন্দ্র। এরূপ নারী কি পাতে আছে?

শৈলেশ্বর। স্বয়ং দেখিতে পাইবে।

নরেন্দ্র! আমার যোগফল মিথ্যা, এ, এরূপ নারী না থাকিলে আমি বুঝা তোমার এই গহ্বরে আশ্রয় করি নাই। আ একটি কথা শুন। যে নারীর কথা আমি বলিতেছি, সে হেমলতা অপেক্ষা তোমাকে তাড়াসে, এ নারীকে তুমি পূর্বে দেখিয়াছ।

নরেন্দ্র। স্বরণ নাই।

শৈলেশ্বর। অস্ত্র স্বপ্নে দেখিবে। আমি চলিলাম, এই কলসে যে মদিরা আছে, তাহা পান করিয়া আজ এই গহ্বরে শয়ন কর। এই নির্ঝাঁপপ্রায় অগ্নির দিকে দেখ, বখন শৈব অগ্নিকণা সমস্ত ভগ্ন হইয়া বাইবে, তখন সেই স্বপ্ন দেখিবে। যে নারীকে দেখিবে, সে এই জগতের মধ্যে তোমার প্রেমা-কাজীগী, তোমার স্ত্রীর অভিমানিনী। বীর-পুরুষ! সেই উপযুক্ত বীরনারী।

নরেন্দ্র। মহাশয়, আপনার কথার বিস্মিত হইলাম।

শৈলেশ্বর। আর একটি কথা আছে, এটি মন দিয়া শুন। এই স্বপ্ন দেখিয়া কাল

প্রাতে তুমি এই গহ্বরে হইতে বাহিরে বাইও। তিন দিন তোমাকে সময় দিলাম, স্বপ্নদৃষ্টা নারীকে বিবাহ করিবে কি না, তিন দিনের মধ্যে স্থির করিবে। যদি সম্মত হও, তবে তিন দিন পরে বেড়চন্দনেরেখা ললাটে ধারণ করিয়া অমাবস্তার সারংকালে আমার সহিত এই গহ্বরে সাক্ষাৎ করিও, কিরূপে সে কস্তা পাইবে, তাহার উপায় বলিয়া দিব, যদি এ বিবাহে সম্মত না হও, তবে রক্তচন্দনেরেখা ললাটে ধারণ করিয়া ঐ অমাবস্তার সারংকালে এই স্থানে আমার সঙ্গিত সাক্ষাৎ করিও, তোমার পাণের প্রায়চিত্ত-বিধান করিব। ইহাতে প্রতিশ্রুত হও, নচেৎ কালী তোমাকে স্বপ্ন দিবেন না।

নরেন্দ্র। প্রতিশ্রুত হইলাম, তিন দিন পর অমাবস্তার সন্ধ্যায় আপনার সহিত এই গহ্বরে সাক্ষাৎ করিব। ইহাতে যে প্রকার অস্বীকার করিতে বলেন, করিতে প্রস্তুত আছি।

শৈলেশ্বর। তুমি বীর-পুরুষ, তোমার কথাই অস্বীকার। রক্তমী তিন প্রহর হই-
রাছে, আমি বিনার হইলাম।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

বাণী হস্তে।

Who is this maid ? What means her lay ?
Scott.

নরেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ সেই অন্ধকার গহ্বরে বিচরণ করিতে লাগিলেন, বাস্যাকালের ভালবাসা, যৌবনের প্রেম সহসা উৎপাটিত করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। একাকী অনেকক্ষণ সেই গহ্বরে পদচারণ করিতে লাগিলেন, কি ভীষণ চিন্তার ভাঁহার ফল

উৎক্লিষ্ট হইতেছিল, তাহা আশ্রয় অন্বেষণ করিতে সাহস করি না।

অনেকক্ষণ পর অগ্নি নির্বাণপ্রায় দেখিয়া তিনি শৈবের আবেশ স্বরণ করিলেন, কলসে যে খদিয়া ছিল, সমস্ত পান করিলেন। মত্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, অগ্নির একপার্শ্বে নরেন্দ্রনাথ শয়ন করিলেন।

নরেন্দ্রনাথ অগ্নি দেখিতে লাগিলেন। এক একবার কাঠের এক অংশ প্রদীপ্ত হয়, আবার নির্বাণপিত হয়, এক একটি ক্ষুণ্ণিদ্ধ দেখা যায়, আবার অন্ধার হইয়া যায়। দেখিতে দেখিতে অঙ্গুল অন্ধারগুলি প্রায় সমস্ত নির্বাণিত হইল, হঠাৎ আলোকে সেই শিলা-গৃহের শিলাভিত্তি আরও অপূর্ণ দেখাইতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ সেই ভিত্তির উপর আলোক ও ছায়ার নৃত্যাতে বেন অমাব্যবিক ভীষের নৃত্য দেখিতে লাগিলেন, কালীর নয়নঘর যেন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল, কালীর হস্তের থগু যেন নরেন্দ্রের দিকে প্রসারিত হইতে লাগিল। নরেন্দ্র উত্তীয়ার চোটা করিলেন, উত্তীয়ার শক্তি নাই। জাগ্রত না স্বপ্ন ?

অচিরান্তে শেষ অগ্নিকণা নির্বাণ হইল। নরেন্দ্র তাহা দেখিতেছিলেন না, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। একক্ষণ দূরস্থ জলের শব্দ বাহা শুনা যাইতেছিল, নরেন্দ্রের বোধ হইল যেন, তাহা সহসা পরিবর্তিত হইয়া স্বর্গীয় সঙ্গীতধ্বনি হইল। গভীর অন্ধকারে যেন ক্রমে আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ হইতে লাগিল। যে স্থানে গহ্বরের ভিত্তি ছিল, তথায় যেন একটি প্রস্তর সহসা সরিয়া যাইল, তাহার ভিতর হইতে অপূর্ণ সঙ্গীতধ্বনি, অপূর্ণ চান্দ্র-আলোকের স্রার আলোক বাহির হইতে লাগিল। ক্রমে যেন চক্রে উপর হইতে যেন সরিয়া গেল, সে আলোকস্থান

সম্পূর্ণ মুক্ত হইল। এ কি অশ্রু না যথার্থ? স্বর্গীয় রূপরশ্মি-বিকিরিত। একটি ঘোড়ার বোঝাও উপবেশন করিয়া অপূর্ণ বাচ্চ করিতেছে। নরেন্দ্র বিষয়ে ভাবিত হইয়া সেই অপূর্ণ অশ্রু দেখিতে লাগিলেন।

কি অপূর্ণ সৌন্দর্য্য, কি উজ্জ্বল নয়ন, কি ক্লান্ত কেশপাশ, কি ক্ষীণ অঙ্গ! এ কি মানবী? নরেন্দ্রনাথ, ভাল করিয়া দেখ, এ বদনমণ্ডল, এ চাকননয়ন, ও ওঠ কি তুমি কখনও দেখ নাই? সুদূরপ্রসারিত সজীবতার জার বৃতিশক্তি নরেন্দ্রের মনে ক্রমে ক্রমে জাগরিত হইতে লাগিল। কানীর বৃদ্ধ, দিল্লী, দিল্লীতে একজন মুসলমান-নারী,— উঃ! এ সেই জেলেখা।

নরেন্দ্রের চিন্তা করিবার অবসর ছিল না। সহসা সপ্তম্বরসম্বিত অঙ্গরাকর্ষণিত অপূর্ণ গীত সেই পর্বতকন্দের আয়োজিত করিল; নরেন্দ্রের হৃদয় আলোড়িত করিল। জেলেখা সেই বোবার সঙ্গে সঙ্গে গান সংযোজনা করিয়াছে। আহা! কি মধুর, কি স্বদয়গ্রাহী, কি ভাবপরিপূর্ণ! নরেন্দ্র এক-দৃষ্টিতে জেলেখার দিকে চাহিয়া রহিলেন, গাইতে গাইতে জেলেখার কণ্ঠ একবার রুদ্ধ হইল, নয়ন দিয়া দুই এক বিন্দু জল গওহল বহিয়া পড়িতে লাগিল।

গীত।

“নারীর ধর্ম্ম কি? সত্য কি সাধিতে পারে? আজীবন প্রেমবারিদানে পতির প্রেমভূকা নিবারণ করিতে পারে। সম্পদ-কালে প্রেমালোক আলিয়া লক্ষীরূপিণী পতির আনন্দবর্ধন করিতে পারে। রূপের মাঝে বীর্ধ্যবতী প্রদীপ্ত আশা-রূপিণী হইয়া পতির হৃদয় বোরসে পরিপূর্ণ করিতে পারে। দুঃখ-অন্ধকারে জীবনের আশা-

প্রদীপ একে একে নির্ঝাঁপ হইয়া গেলে সমুদ্রে হুঃখিনী হইয়া স্বামীর ক্রেশবিমোচন করিতে পারে। জীব-আকাশ হইতে জীবতার স্বপ্ন ধসিয়া যায়, পতিব্রতা নারী উল্লাসে প্রিয়ের পার্শ্বে সহস্রতা হইতে পারে।”

এই মর্ম্মের স্মরণ গান সমাপ্ত হইল, কিন্তু নরেন্দ্রের কণ্ঠমূলে তখনও সেই সঙ্গীত শেষ হইল না। এক একবার মধুর বীরশব্দে, এক একবার বজ্রনাগে তাঁহার কণ্ঠে সে গান এখনও শব্দিত হইতে লাগিল। জেলেখা মানবী কি পরী-কন্ডা? হউক, নরেন্দ্র তাহার মুখমণ্ডল বার বার পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। বোধ হইল যে পূর্বে যে রূপ দেখিয়াছিলেন, এখন জেলেখা তাহা অপেক্ষা উজ্জলতর সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে। তথাপি শোকের পাণ্ডুবর্ণ ললাটে স্তম্ভ রহিয়াছে, বাহ ও অঙ্গুলি অপেকাকৃত ক্ষীণ, নয়নদ্বয়ে যেন দুঃখ নিবাস করিতেছে! নরেন্দ্র আর দেখিবার সময় পাইলেন না, আবার অপূর্ণ সঙ্গীতধ্বনি পর্বতকন্দের কাঁপাইতে লাগিল, আবার দুঃখের গানে নরেন্দ্রের হৃদয় আলোড়িত ও দ্রবীভূত হইল।

গীত।

“পতির নিকট পতিব্রতা নারী কি ভিক্ষা চাহে? প্রেমভিক্ষা ভিন্ন এ জগতে দাসীর আর কি ভিক্ষা আছে? প্রেমযতীকার বেশে তোমার পদযুগল ধরিয়াছে, রেহকণা দিয়া সজীব করিও, যেন ধরপীড়না লুটায়। জাতি, বন্ধু, দেশ দূরে রাখিয়া তোমার নিকট আসিয়াছে, যেন তোমার স্নেহে স্থিতি হয়, তোমার দুঃখে হুঃখিনী হয়, তোমার পদদ্বারা যেন পায়। যত দিন প্রাণ থাকে, ইহা ভিন্ন অন্য ভিক্ষা নাই,

আয়ুষের হইলে পতির চরণ ধরিয়া, পতির মুখের দিকে চাহিয়া প্রাণত্যাগ করিবে, ইহা ভিন্ন সতীর আর কি ভিক্ষা আছে ?”

গান সমাপ্ত হইল । নয়নজলে সে পাণ্ডু বদনখানি ও উরঃস্থল ঘোত হইয়া গেল । ধীরে ধীরে মেঘচ্ছায়ার সেন স্বৰ্য্যকান্তি আচ্ছন্ন হইল, আলোকবার ক্রমে রুদ্ধ হইল, সে স্বর্গীয় মৃষ্টি ঢাকিয়া গেল, গভীর অন্ধকারে বীণাধ্বনি ধামিরা গেল, পূৰ্ব্বজন্ম দূরস্থ জল-শব্দ ভিন্ন নরেন্দ্র আর কিছু শুনিতে পাইলেন না । নরেন্দ্র গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন, আর কি স্বপ্ন দেখিলেন, প্রাতে তাহা মনে রহিল না । নিদ্রাস্তে নরেন্দ্র গারোখান করিলেন । তাঁহার মত্ততা আর নাই, গহ্বর হইতে খড়্গ লইয়া বাহিরে আসিলেন । দেখিলেন, নবজাত স্বর্ঘ্যরশ্মিতে বৃক্ষলতা ও দূৰ্ব্বাশল ঝিক্‌ঝিক্‌ করিতেছে, ডালে ডালে পক্ষিগণ গান করিতেছে, দূরে একনিদের প্রকাণ্ড শ্বেতপ্রস্তর-নির্মিত মন্দির স্বর্ঘ্য-কিরণে বড় শোভা পাইতেছে । মন্দির লোকসমাকীর্ণ আর চতুর্দিকে বহুদূরে পৰ্ব্বতের উপর পৰ্ব্বত স্বর্ঘ্যরশ্মিতে স্তম্ভর দেখা বাইতেছে ।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ।

খড়্গহস্তে ।

A naked dirk gleamed in her hand.

Scott.

সেই তিন দিন নরেন্দ্রনাথ কি চিন্তা-জালে বেষ্টিত ও ব্যথিত হইয়া ছিলেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না । শত চিন্তা নরেন্দ্র-

নাথক শত বৃত্তিক-বন্দনাপেক্ষা অধিক ক্লেশ দিতে লাগিল ।

সেই পৰ্ব্বত-গহ্বরে শৈলেশ্বর যে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা নরেন্দ্রের হৃদয় হইতে তিরোহিত হইল না । শ্রীশচন্দ্রের সহিত হেমলতার বিবাহ হইয়াছে, তাহা নরেন্দ্র অনেক দিন হইল শুনিয়াছেন । হেমলতা পরের গৃহিণী, তাহার চিন্তা, তাহার প্রতি ভালবাসা কি উচিত কার্য্য ? নরেন্দ্রনাথ, এই কি বীরের উপযুক্ত কার্য্য ? শৈবের উন্নত আদেশ গ্রহণ কর, প্রেমচিন্তা উৎপাটন কর, বশের পথ পরিভার কর, দেশের গৌরব-সাধন কর, ইহা অপেক্ষা বীরের উপযুক্ত কার্য্য আর কি আছে ? নরেন্দ্র স্থির করিলেন, শৈবের আদেশ শিরোধার্য্য ।

আবার সেই গন্ধাতীয়ে বিলায়ের কালে নরেন্দ্রের আলোকে যে পাণ্ডুবর্ণ শুক মুখখানি দেখিয়াছিলেন, ধীরে ধীরে সেই ছুঃখিনী হেমলতার কথা মনে পড়িল । নরেন্দ্রের সমস্ত শরীর কটকিত হইয়া উঠিল । সেই হেম বাল্যকালে নরেন্দ্রের সহিত খেলা করিয়াছে, যে দিন নরেন্দ্র গৃহত্যাগী হয়, সেই দিন হেম যেন আপন জীবনকে বিলায় দিতেছিল, তাহা নরেন্দ্রের মনে পড়িল । বাল্যকালে হেম নরেন্দ্র ভিন্ন আর কাহাকেও জানিত না, যৌবনের প্রারম্ভে প্রাতঃসন্ধ্যা নরেন্দ্রের মুখ দেখিলে যেন হেম উষেগশূন্ত ও শান্ত হইত । বাল্যকালের সহস্র কথা অজস্র বারিতরঙ্গের দ্বারা নরেন্দ্রের হৃদয় ব্যথিত ও আশোড়িত করিতে লাগিল, নরেন্দ্র আর সহ্য করিতে পারিলেন না, একাকী মন্দিরপার্শ্বে উপবেশন করিয়া নিঃশব্দে রোমন করিতে লাগিলেন ।

আবার চিন্তা আসিতে লাগিল । নরেন্দ্র-

যেই দেশ নাই, গুল নাই, বন্ধু নাই, পরিজন নাই, নরেন্দ্র একাকী দেশে বেশে পরিভ্রমণ করিতেছেন, কেবল হেমের চিত্তাধরূপ মক্ষের উপর দৃষ্টি রাখিয়া সংসার-সমুদ্রে বিচরণ করিতেছেন। নিদারুণ শৈব! অভাগার একমাত্র সুখচিন্তা, একমাত্র সুখস্বপ্ন হ্র করিও না, এ নিদারুণ আদেশ করিও না। নরেন্দ্র অনেক ক্রেশ সহ করিয়াছে, আরও যে ক্রেশ আদেশ কর, সহ করিতে প্রস্তুত আছে। নরেন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিবে, বীরমণ্ডালা ত্যাগ করিবে, অন্নকষ্ট ভোগ করিতে সন্মত আছে, জগতের নিন্দাতার বহন করিতে সন্মত আছে অথবা সংসার পরিত্যাগ করিয়া সিংহ-বাসাদি জন্তর সহিত ষোর অরণ্যে জীবন অভিবাহিত করিতে সন্মত আছে। শৈলেশ্বর। আদেশ কর, ইহাতে যদি পাগের প্রায়শ্চিত্ত হয়, নরেন্দ্র আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিবে, ইহাতে যদি নরেন্দ্র মুহুর্তের জন্য সঙ্কোচ করে, করালবদনর সমুখে তাহার যন্ত্রকাজেদন করিও। কিন্তু বাল্যকাল অবধি যে চিন্তা অবলম্বন করিয়া নরেন্দ্র জীবনধারণ করিতেছে, যে আলোকভরূপ চিন্তার জ্যোতিতে নরেন্দ্র দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতেছে, নিদারুণ শৈব! সে চিন্তা হ্র করিতে বলিও না। এখন হেম পরের গৃহিণী, তথাপি নরেন্দ্রের ভালবাসা বিশ্বত হয় নাই, নরেন্দ্র তাহার চিন্তা ত্যাগ করিবে? নরেন্দ্র মুসলমান হইয়া ববনীকে বিবাহ করিবে? হেম তাহা শুনিবে? সে ভাবনা অসহ্য। প্রবঞ্চক শৈব! হিন্দু-পুরোহিত হইয়া তুমি ববনীর পাণিগ্রহণ করিতে উপদেশ দাও? বিধর্ষি! কপটালারিন! হ্র হও।

আবার শৈলেশ্বরের গভীর আদেশ যেন

পড়িল। “হা নরেন্দ্রনাথ! আপনাকে ভুলাইও না, আয়াকে ভুলাইবার চেষ্টা করিও না। যে ষোর পাগে লিপ্ত হইয়াছ, তাহা বিশেষ করিয়া আলোচনা কর।” শৈব কি মিথ্যাবাদী? পরনারী-চিন্তা কি পাপ নহে? নরেন্দ্রনাথ, সাবধান! আপনি পাগে লিপ্ত হইতেছ, শৈব তোমার দোষ দেখাইয়া দিতেছেন, তাহার নিন্দা করিও না। নরেন্দ্রনাথ ভাবিয়া ভাবিয়া সে দিন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

তিন দিন অতিবাহিত হইল, তৃতীয় দিবস রজনীতে নির্দ্রিষ্ট। সময়ের দুই দণ্ড পূর্বে নরেন্দ্রনাথ-গহ্বরমুখে একাকী দণ্ডারমান রহিয়াছেন, এক একবার এদিক ওদিক নিঃশব্দে পদসঞ্চারণ করিতেছেন, এক একবার অন্ধকার আকাশের দিকে স্থিরদৃষ্টি করিতেছেন, আবার গহ্বরমুখে আসিয়া দণ্ডারমান হইতেছেন। হস্তে নিকোষিত অসি, আকৃতি স্থির ও গভীর।

কণেক পর শৈলেশ্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও নরেন্দ্রকে আলীঙ্গন করিলেন।

নরেন্দ্রনাথ গোবামীকে প্রশ্ন করিতে বিশ্বত হইলেন।

শৈলেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, “স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়াছ?”

গভীর ও ঈষৎ কক্‌শব্দে নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, “হইয়াছি।” উভয়ে গহ্বরে প্রবেশ করিলেন।

গহ্বরে পূর্বদিনের ভায় অতি উজ্জল আলোক জলিতেছিল, সেই আলোকজুটায় শৈলেশ্বর যাহা দেখিলেন, তাহাতে চমকিত হইলেন। নরেন্দ্রনাথের ললাট, গণ্ডস্থল, ঠক, বাহ ও বক্ষস্থল যন্ত্রচন্দনে একেবারে স্নানিত রহিয়াছে।

শৈলেশ্বর। যাশিষ্ট! পরস্রী-আকাজ্জা
তাগ করিতে পারিলে না?

নরেন্দ্র। পরস্রী আকাজ্জা রাখি না।

শৈলেশ্বর। হেমলতাকে এ জীবনে
আর দেখিতে চাই না?

নরেন্দ্র। তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত
আছি।

শৈলেশ্বর। তবে ববনীকে বিবাহ
করিতে স্বীকৃত আছি?

নরেন্দ্র। এ জীবনে নহে।

শৈলেশ্বর স্বপ্নকাল নিশ্চয় হইয়া রহি-
লেন; আবার বলিলেন, “তবে প্রতিজ্ঞা-
পালনে প্রস্তুত হও। খণ্ডা তাগ কর,
কালীর সম্মুখে জীবনদানে প্রস্তুত হও।”

নরেন্দ্র। আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করি-
রাছি, তাহা পালন করিয়াছি। আগনার
সহিত সাক্ষাৎ করিব বলিয়াছিলাম।

শৈলেশ্বর। মৃত! সিংহের গৃহস্থরে
আসিয়াও জীবনের প্রত্যাশা আছে? এ
স্থলে কে তোমার সহায় হইবে?

নরেন্দ্র। এই অসি আমার সহায়।

শৈলেশ্বর নিঃশব্দে গৃহস্থরের এক স্থান
হইতে আপন অসি বাহির করিলেন।
উদয়পুরে একবার বেদরূপ বুদ্ধ হইয়াছিল,
অন্ত আবার দুই জনে সেইরূপ অসি ও ঢাল
লইয়া বুদ্ধ হইল। নরেন্দ্র সে দিন অপেক্ষা
অধিক সাবধানে অধিক যত্নে বুদ্ধ করিতে
লাগিলেন, কিন্তু সে বস্তু বৃথা। সিংহবীৰ্য্য
শৈব অলক্ষণমধ্যেই নরেন্দ্রকে পরাস্ত করিয়া
তাঁহার অসি কাড়িয়া লইলেন।

শৈলেশ্বর। কেবল পূজা-বাবসারে এই
কেশ স্তব্ধ হয় নাই। রাজস্থান-ভূমি বীর-
প্রসবিনী, বুদ্ধকালে শৈব-গোবামিগণও বীৰ্য্য-
প্রকাশে রাজস্থানে অগ্রগণ্য। বালক! তোমার
সহিত বুদ্ধ করিলাম, এই আমার কলঙ্ক রহিল!

নরেন্দ্র। আমি তাহার স্বাক্ষর প্রদত্ত
আছি, তোমার বাহা ইচ্ছা, বাহা রাখি,
কর।

শৈলেশ্বর একগাছি রজ্জু বাহির করি-
লেন, নরেন্দ্রের দুই হস্ত সেই রজ্জু দ্বারা
দুইদোরে বন্ধন করিলেন। একদল জোরে
বাঁধিলেন যে, হস্তের পিরা স্তোত হইয়া উঠিল।
নরেন্দ্র শব্দমাত্র উজ্জারণ করিলেন না। পরে
পূর্বের স্তায় কলস লইয়া নরেন্দ্রের মূখের
নিকট ধরিয়া মস্তপান করিতে বলিলেন,
নরেন্দ্র তাহাই করিলেন। গোবামী গৃহস্থর
হইতে নিষ্কান্ত হইলেন।

মস্ততাহেতু নরেন্দ্র অচিরেই ভূমিতে
নিপতিত হইলেন, চক্ষুতে অন্ধকার দেখিতে
লাগিলেন, গৃহস্থর-পার্শ্বে দুই জন বেন ধীরে
ধীরে কথা কহিতেছে, এইরূপ তাঁহার বোধ
হইতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে নরেন্দ্র
মদিরা-প্রভাবে নিজের অতিকৃত হইলেন,
পরে কি হইল, স্মরণ রহিল না।

কিন্তু সে নিজ গভীর নহে। নরেন্দ্র
সমস্ত রজনী স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, কখন
স্বপ্ন দেখেন, কখন অর্ধেক জাগ্রত হইয়া
থাকেন। কখন স্বপ্ন দেখেন, কখন জাগ্রত
থাকেন, মস্ততাপ্রযুক্ত কিছুই হির করিতে
পারিলেন না।

অনেককাল পরে বোধ হইল বেন, পূর্বের
একদিনের স্তায় আবার অন্ধকার হইতে
আলোকছটা প্রকাশ হইতে লাগিল, আবার
বেন প্রত্যহু সন্ধ্যা গেল, যেখ সন্ধ্যা
গেলে বেন চন্দ্রালোক প্রকাশিত হইল।
সেই আলোকে সেই উজ্জ্বলা রমণী! কিন্তু
জলেখা অন্ত গান গাইতেছে না, অন্ত
বীণাহস্তে আইসে নাই, অন্ত ধ্বজাহস্তে।

কি ভয়ঙ্করী মূর্তি! নরেন্দ্র হইতে
অগ্নিস্থূলিক বাহির হইতেছে, স্বপ্ন রক্তবর্ণ

ডাঙের উপর কত ছাটিয়া হইয়াছে, সবই বদলমণ্ডল কোথায় চলিত রক্তবর্ণ। বায়ার করে সেই শৈবের দীর্ঘ খড়, বায়ার বকে একখানি তীক্ষ্ণ ছুরিকা। নরেন্দ্র বিন্মিত হইলেন, তাঁহার লগাট হইতে শ্বেদ বহির্গত হইতে লাগিল। তিনি উঠিবার উত্তম করিলেন, কিন্তু যথেষ্ট বিপদাপন্ন ব্যক্তির জ্বর পলাইতে অক্ষম, উঠিতে অক্ষম।

বায়া যুগল-করে দীর্ঘ খড় ধারণ করিয়া গহবরে প্রবেশ করিল; একবার দণ্ডায়মান হইল, একবার নরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল। হস্ত হইতে খড় পড়িয়া গেল।

একবার সেই তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিল, এবার অকম্পিত-হস্তে সে ছুরিকা নরেন্দ্রের বক্ষঃস্থলের উপর ধরিল। আবার কি চিন্তা আসিল, ছুরিকা হস্তচ্যুত হইয়া পতিত হইল, বায়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

নরেন্দ্র চীৎকারশব্দ করিয়া উঠিয়া বসিলেন, তাঁহার নিজাভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন, ঘর্ষে তাঁহার সমস্ত শরীর আগ্নেয় হইয়াছে, উগ্রাভ্যন্ত গিয়াছে, গহবর অন্ধকার ও নিস্তব্ধ। ধীরে ধীরে তিনি গহবরের বাহিরে আসিলেন। রক্তনী অবলানপ্রায়, পূর্বদিকে রক্তমাচ্ছটার আকাশ রঞ্জিত হইয়াছে। নির্ভাগপ্রায় প্রদীপের জ্বালা ছুই একটি তারা দেখা যাইতেছে, প্রভাত্যের শীতল বায়ু সেই পর্বতশ্রেণী ও শিবমন্দিরের উপর বহিয়া যাইতেছে ও নবজাত পুষ্প-পরিমল বহিয়া নিম্নোখিত জগৎকে আমোদিত করিতেছে। ছুই একটি নিকুঞ্জন হইতে ছুই একটি পক্ষী সুন্দর গীত করিতেছে।

ষড়্ বিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্রামনগরের যুদ্ধ।

Like fabled goods, their mighty war
Shook realms and nations in its jur.

Scott.

উপরি-উক্ত ঘটনার কিছু পর যোধ-পুরাধিপতি রাজা যশোবন্ত সিংহ পুনরায় সৈন্ত-সামন্ত লইয়া আরংজীতে বিক্রদ্ধাচরণ-করণাভিলাষে আগ্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নরেন্দ্রনাথও সেই সৈন্তের সহিত রাজস্থান ত্যাগ করিলেন। যে কয়েক মাস নরেন্দ্রনাথ উদয়পুরে ছিলেন, তাহার মধ্যে আগ্রায় একটি রাজবিস্রব ঘটয়াছিল। আগ্রায় এক্ষণে সে সম্রাট নাই, সে রাজত্ব নাই। সে বিস্রবের কথা সংক্ষেপে বলা আবশ্যক, ইতিহাসজ্ঞ পাঠক ইচ্ছা করিলে এ পরিচ্ছেদ ছাড়িয়া যাইতে পারেন।

এই ভীষণ ভ্রাতৃত্বদ্বন্দ্ব আরম্ভ হইয়া অবধি প্রথমে বারানসীতে মুলতান সূজা ও তৎপরে উজ্জয়িনীতে যশোবন্ত সিংহ পরাস্ত হইয়া-ছিলেন, তাহা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে। এই শেষঘটনার বিষয় শুনিয়া সম্রাট শাজিহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারা বৎপরোনাতি ক্রুদ্ধ হইয়া এক লক্ষের অধিক সেনা লইয়া স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিলেন ও সম্বল নদীতীরে শিবির সংস্থাপন করিয়া যোরাড ও আরংজীবের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অচিরে তাঁহার ঐ নদীর অপর পাশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যোরাড বেক্রপ সাহসী, সেইরূপ যুদ্ধকৌশলে অভিজ্ঞ, তিনি নদী পার হইয়া সংগ্রাম করিবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কৌশলগণ্টু আরংজীব তাহা না করিয়া দারাকে

তুলাইবার জন্ত শিবির সেই স্থানে ত্যাগ করিয়া গোপনে সৈন্তসহ নদীর অপর এক স্থানে পার হইলেন ও আগ্রা হইতে ৭৮ ক্রোশ দূরে যমুনাতীরে শ্রামনগর নামক গ্রামে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। শত্রু চহল পার হইয়াছে ও আগ্রার নিকট যমুনাতীরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছে শুনিয়া দারা একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আপন সৈন্ত লইয়া সেই গ্রামের নিকট যমুনাতীরে আপন শিবির সন্নিবেশিত করিলেন।

শ্রামনগরের যুদ্ধের ফল ভারতবর্ষের সিংহাসন। উভয় পক্ষই এই যুদ্ধে লিপ্ত হইতে সঙ্কুচিত হইলেন, চারি দিবস কাল উভয় সৈন্ত উভয়ের সম্মুখীন হইয়া রহিল, পঞ্চম দিবসে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সে যুদ্ধের বর্ণনায় আমরাদিগের আবশ্যক নাই। দারার বামপার্শ্বে রাজপুত-রাজ রামসিংহ ও চহরশাল বীরোচিত বিক্রম প্রকাশ করিয়া নিহত হইলেন, দারার দক্ষিণদিকে কালীউল্লা নামক মুসলমানসেনাপতি বিদ্রোহী, আরংজীবের অর্থভূক্ত, তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন না। অবশেষে আরংজীবের জয় হইল।

যুদ্ধক্ষেত্রে কৌশলপটু আরংজীব কালীউল্লার সম্মান করিলেন ও মোরাদকে ভারতবর্ষের সম্রাট, বলিয়া তাঁহার মনঃস্ফূর্তিসাধন করিলেন।

অচিরে আরংজীব ছলে, বলে, কৌশলে আগ্রা হস্তগত করিয়া পিতাকে বন্দী করিলেন। শাজিহানের দুই কস্তার মধ্যে কনিষ্ঠা রোশন-আরা সকল বিষয়ে আরংজীবকে সমাচার প্রদান করিয়া তাঁহার অনেক সহায়তা করিলেন। আরংজীবের জয় হওয়ার রোশন-আরার প্রভুত্ব ও

কমতার ইয়ত্তা রহিল না। শাজিহানের জ্যেষ্ঠা কস্তা জেহান-আরা রূপে, শুণে, কৌশলে কনিষ্ঠা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠা,—সে লাষণ্যময়ী সম্রাট-পুত্রীকে পাঠক একদিন বেগমমহলে দেখিয়াছেন। আরংজীবের জ্যেহান-আরা হতমানা হইলেন, অতঃপর পিতার সেবার জীবনধারণ করিতে লাগিলেন।

আগ্রা হস্তগত করিয়া আরংজীব দিল্লী-যাত্রা করিলেন। পথে মথুরাতে মোরাদকে নিমন্ত্রণ করিলেন, মোরাদ মদিরাপানে এবং সুন্দরী গায়কী ও নর্তকীগণের সৌন্দর্য্যে মত্ত হইয়া পড়িলেন। মোরাদকে মথ্যে করিয়া সেই জগদ্বিমোহিনীগণ চারিদিকে বেটন করিয়া বসিল, মোরাদ একেবারে প্রমত্ত হইয়া পড়িলেন। আরংজীবের তাহাই উদ্দেশ্য, মোরাদ সেই রজনীতেই কারারুদ্ধ হইলেন।

তাঁহার পর? তাঁহার পর আরংজীব রাজচ্ছত্র আপন মস্তকের উপর ধারণ করিলেন। দারা শিকুনদীর দিকে পলায়ন করিলেন। বঙ্গদেশ হইতে সুলতান সুজা পুনরায় সৈন্ত লইয়া যুদ্ধবেশে বহির্গত হইলেন। রাজস্থানে যশোবন্ত সিংহ পরাজয়ের অপমান এখনও বিশ্বস্ত হন নাই। তিনিও সৈন্তে বহির্গত হইলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ।

দপণে প্রতিবিম্বি ।

"Tis something yet if, as she passed,
her shade is o'er the lattice cast.
"What is my life, my hope," he said—
"Alas ! transitory shade ;"

Scott.

কয়েক দিবস ভ্রমণানন্তর বশোবন্ত সিংহের সেনা আগ্রা নগরে উপনীত হইল। আরংজীবের পরাক্রম অসীম, তাহার সহিত সম্মুখ করা বশোবন্ত সিংহের সাধ্য নহে, তিনি সুবোগ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আরংজীবের মিত্রবেশে পরমশত্রু আগ্রা নগরে প্রবেশ করিল।

যমুনার অনন্ত সৌন্দর্য্য ও আগ্রা নগরের অপূর্ণ শোভা দেখিয়া কে না বিমোহিত হইয়াছে ? খেতপ্রস্তর বিনির্মিত অপূর্ণ চাকু শিল্পখচিত, জগতে অতুল্য তাম্রমহল সন্কার নীল-গগনে একটি প্রতিকৃতির তায় বোধ হয় ; তাহার চতুর্দিকে সুন্দর পথ, সুন্দর কুজবন, সুন্দর ফোয়ারা ; পার্শ্বে শ্রামা যমুনা ! আগ্রার প্রকাণ্ড দুর্গ ; তন্মধ্যে মর্ম্মর-প্রস্তর-বিনির্মিত সুন্দর মতি-মসজিদ, দেওয়ানখাস, দেওয়ান আম-রংমহল, নীশমহল ! আগ্রার সৌন্দর্য্য কত বর্ণনা করিব ? পাঠকগণ ! যদি এই অপূর্ণ নগরী না দেখিয়া থাকেন, অতুই যাইবার উদযোগ করুন। "তিনি" ব্যয়ের ওজর করিবেন, তাহা শুনিবেন না, আপনাদিগের অন্তরোধ অলঙ্ঘনীয়, আপনাদিগের অশঙ্কলে সকল আপত্তি ভাদিয়া যাইবে !

প্রসিদ্ধ মন্সুর-সিংহাসনে অল্প সম্রাট আরংজীব উপবেশন করিয়াছেন। প্রাসাদের খেত ভক্তসারি বড় শোভা পাইতেছে।

রক্তবর্ণ চম্রাতপ হইতে পুষ্পমাল্যের সহিত যশি-মণিকা বুলিতেছে ও প্রাতঃকালের আলোকম্পর্শে অপূর্ণ শোভা ধারণ করিয়াছে। চারিদিকে মহারাজা, রাজা, ওমরাহ মন্সবদার প্রভৃতি ভারতের অগ্রগণ্য বীর, ধনী ও মাত্র লোকে অল্প রাজপ্রাসাদকে ইন্দ্রপুত্রী করিয়াছে !

সেই প্রাসাদের সম্মুখে বিস্তৃত শিবির সরিবেশিত হইয়াছে, শিবিরের চতুর্দিকে রোপ্য-নির্মিত স্তম্ভ বন্ধুক করিতেছে। উপরের বস্ত্র উজ্জল রক্তবর্ণ, ভিতরে মসলী-পত্তনের ছিট, সেই ছিটে লতা-পুষ্প একরূপ সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে যে, শিবিরের পার্শ্বে যথার্থ পুষ্প ফুটিয়াছে, দর্শকদিগের একরূপ ভ্রম হয়। ভূমিতে অপরূপ গালিচা, তাহাতেও পুষ্পগুলি একরূপ সুন্দরভাবে বুন হইয়াছে যে, শিবির ব্যক্তি পুষ্প দলিত হইবে ভরে সহসা পদক্ষেপ করতে সঙ্কোচ করেন !

তাহার বাহিরে দুর্গের প্রাচীর পর্য্যন্ত জয়পতাকা ও পুষ্পপত্র দ্বারা দুর্গ সশোভিত হইয়াছে। সেনাগণ শ্রেণীবদ্ধ হই বিজয়-বাণে সর্ব্বলের মন উত্তেজিত করিতেছে, নবজাত স্বর্ঘ্যরশ্মিতে তাহাদের বন্ধুক বন্ধুক করিতেছে। দুর্গপ্রাচীরের উপর ইংরাজ ফরাসীস ও ওলন্দাজ সৈনিকগণ ঘন ঘন কামান ছাড়িতেছে। তাহারা বহুদূর হইতে রক্তগর্ভা ভারতবর্ষের রক্ত কুড়াইবার জন্য আসিয়াছে ও সম্রাটের বেতনভোগী হইয়া অল্প কামানের শব্দে সাম্রাটের বিজয় প্রচার করিতেছে। দুর্গের বাহিরে নগরের পথে, ঘাটে, গৃহে, দ্বারে ও যমুনাতীরে রাশি রাশি লোক নিজ নিজ স্থপরিচ্ছদে সজ্জিত ও দলবদ্ধ হইয়া প্রশস্ত আগ্রানগর ও যমুনাতীর পরিপূর্ণ করিতেছে।

পুরাতন রীত্যনুসারে আরংজীব স্বর্ঘ্যের

সহিত ওজন হইলেন, তাহার পর প্রধান ওমরাহগণ ঐরূপে ওজন হইলেন, প্রত্যেক ওমরাহ, রাজা ও মন্ত্রীদিগের সুবর্ণ, মুক্তা ও হীরক নজর দিয়া সম্রাটের মনস্তৃষ্টি করিলেন ।

তাহার পর জগবিমোহিনী কঞ্চনীগণ প্রোট-বোবন-মণ্ডে উন্নত হইয়া অপূর্ণ সন্যাস ও নৃত্য দ্বারা সভাসদগণের হৃদয় বিমোহিত করিল । কঞ্চনীগণ নর্তকী, বড় বড় ওমরাহদিগের মধ্যে বিবাহাদি কার্য্য হইলে তাহারা সঙ্গীত ও নৃত্য করিতে যাইত । শাজিহান তাহাদিগকে সৰ্বদাই নিকটে রাখিতে ভালবাসিতেন ও বেগমদিগের আলয়ে লইয়া বাইতেন । কিন্তু ইশ্রিয়স্থখ-পরামুখ আরম্ভী তাহাদিগকে প্রায় নিকটে আসিতে দিতেন না, তবে আজি আনন্দের দিনে কঞ্চনীগণ কেন না সমাদৃত হইবে ?

তাহার পর দুর্গের পূর্বদিকে অর্থাৎ যমুনা-তীরে মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি নানারূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল ; প্রাসাদের উপর হইতে বেগমগণ দেখিতে পাইবেন, এই জন্য এই স্থলে যুদ্ধ হইত । অবশেষে দুইটি মন্ত হস্তীর যুদ্ধ আরম্ভ হইল । মধ্যে আনাজ দুই হাত উচ্চ একটি যুগ্মকার প্রাচীর, তাহার দুই দিক হইতে দুইটি মন্ত হস্তী মাহত দ্বারা পরিচালিত হইয়া রণে লিপ্ত হইল । অনেকক্ষণ যমুনার উভয় পার্শ্ব হইতে লোকে সবিস্ময়ে এই ভীষণ যুদ্ধ দেখিতে লাগিল, শুণ্ডের চপেটাঘাতে ও দস্তদন্তিত আঘাতে হস্তিঘরের মস্তক ও শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইল । প্রত্যেক হস্তীর দুই জন করিয়া মাহত ছিল ; একটি হস্তীর এক জন মাহত পড়িয়া গেল ও সহসা হস্তী দ্বারা পদদলিত হইয়া জীবন ত্যাগ করিল, অপর পক্ষের একজন মাহতের ঐরূপে জন্মের মত হাত

ভাঙ্গিয়া গেল । এই হতভাগীরা জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াই হস্তিঘরকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিল, বহু অর্থলোভে স্বা পুত্র সকলের নিকট বিদায় লইয়া আনিয়াছিল । অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর একটি হস্তী অস্ত্রকে পরাণ্ড করিয়, যুদ্ধকাপ্রাচীর উন্নয়ন করিয়া পক্ষাদ্ধাবমান হইল । তাহাদিগকে ছাড়াইবার জন্য অনেকে চরকা প্রভৃতি আগুনের বাজা ছুড়িল, কিন্তু সজাত-ক্রোধ হস্তী তাহাতে নিরস্ত না হইয়া অপর হস্তীর পক্ষাৎ পক্ষাৎ চলিল । অবশেষে পরাজিত হস্তী সম্মুখ করিয়া যমুনা পার হইয়া গেল, পশ্চিমধ্যে দুই একজন লোক বাহারী সম্মুখে পড়িল, তাহারও নিহত হইল ।

এ সমস্ত আয়োদ্য দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে যমুনাপুলিনে বাইলেন ও হস্ত-মুখ প্রকালন করিয়া একটি সুন্দর বৃক্ষমূলে শয়ন করিলেন, যে স্থানে নরেন্দ্রনাথ শয়ন করিলেন, সেটি অতি মনোহর স্থল । বিশাল তমাল-বৃক্ষের উপর হইতে দুই একটি পক্ষী যেন দিনের তাপে ক্লিষ্ট হইয়া অতি যত্নস্বরে ডাকিতেছে । নিকটে বৃক্ষের এক পার্শ্বে একটি পুরাতন কবর আছে, প্রস্তর স্থানে স্থানে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে ও অস্থখ প্রভৃতি বৃক্ষলতাাদি সেই কবরের উপর জন্মিয়াছে । কবরের একপার্শ্বে পারস্ত ভাষায় একটি বায়েৎ লেখা আছে, তাহার অর্থ, “এহু ! আমার নাম জানিবার আবশ্যক কি ? আমি জগতে অভাগা, অসুখী ছিলাম । তুমি যদি হতভাগা হও, আমার জন্য এক-বিন্দু অশ্রুপূর্ণ করিও ।” মন্দ মন্দ যমুনাবায়ু সেই শীতল স্থানকে আরও শীতল করিতেছে, কল্লোলিনী যমুনা স্তম্ভধর কল কল শব্দে বহিয়া বাইতেছে ! নরেন্দ্রনাথ অচিরে নিদ্রাগ্র অভিভূত হইলেন ।

তিনি কতক্ষণ নিদ্রিত রহিলেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। নিদ্রায় একটি অপক্লপ স্বপ্ন দেখিলেন। বোধ হইল যেন, সেই অপূর্ণ গোরস্থান হইতে মৃত মহাযা পুনর্জীবিত হইল, সে একটি মুসলমান স্ত্রীলোক। মৃত্যুর ষেতবর্ণ স্ত্রীলোকের মুখে এখনও দেদীপমান। স্ত্রীলোকের চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট, শরীর ক্ষীণ, সমস্ত অবয়ব দুঃখব্যঞ্জক। গোরস্থানে যে বায়েংটি লেখা ছিল, স্ত্রীলোক যেন সেই বায়েংটি গান করিল, সে দুঃখব্যঞ্জক গীতধ্বনিতে নরেন্দ্রের মুদিত নেত্র হইতে এক বিন্দু জলভূতপে পতিত হইল। মুসলমানী যেন সহসা আর একটি গীত আরম্ভ করিল। নরেন্দ্রের বোধ হইল যেন, সে স্বর তাঁহার অপরিচিত নহে, বোধ হইল যেন, সে স্বর সেই অভাগিনী জেলেখার কর্ণনিঃসৃত। নরেন্দ্র, ভাল করিয়া দেখে, স্বয়ং জেলেখা গোরের উপর বসিয়া এই দুঃখগান গাইতেছে।

নরেন্দ্রের স্বপ্নভঙ্গ হইল; চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কোথাও কেহ নাই। স্বর্গ্য অন্ত গিয়াছে, সন্ধ্যার ললাটে একটি উজ্জল তারা বড় শোভা পাইতেছে, সন্ধ্যার বায়ু রহিয়া রহিয়া মৃদুগান করিতেছে, যমুনার নীল জল অধিকতর নীলবর্ণ ধারণ করিয়া বহিয়া যাইতেছে।

নরেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। এই জেলেখার গান তিনি নিজাবোগে ইতিপূর্বে তিন চারিবার শ্রবণ করিয়াছেন। জেলেখার প্রতি কি নরেন্দ্রের হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছে? নরেন্দ্র হৃদয় অহুসঙ্কান করিয়া দেখিলেন, হৃদয় হেমলতাময়! জেলেখা কি মানবী নহে, জেলেখা কি পরী? তবে মানবের প্রেমাকাজিক্ষী কেন? নরেন্দ্রনাথ ভাবিতে ভাবিতে সেই গোরস্থান নিকট আসিলেন,

সহসা গোরের পার্শ্ব হইতে স্বয়ং জেলেখা দণ্ডায়মান হইল। তাহার ক্ষীণ শরীরে পাণ্ডুবর্ণ বদনমণ্ডল দেখিলে বোধ হয় যেন বর্থাৎই কবর-গবরস্থ মৃতদেহ পুনর্জীবিত হইল। বদন পাণ্ডুবর্ণ বটে, কিন্তু নয়ন হইতে পূর্ববৎ তীব্র-জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। তীব্র-জ্যোতিঃ নারী বামা সরোষে অধর দংশন করিয়া নরেন্দ্রের দিকে কটাক্ষপাত করিতেছে, বক্ষঃস্থলে একখানি তীক্ষ্ণ ছুরিকার অগ্রভাগ দেখা যাইতেছে। এই নারী কি দুঃখগান গাইয়াছিল? বোধ হয়, না।

জেলেখা নরেন্দ্রকে আসিতে ইঙ্গিত করিয়া আপনি অগ্রে চলিল, অনেক দূর যাইয়া দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়া রাজপ্রাসাদের একটি অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিল। নরেন্দ্র এতক্ষণ ইতিকর্তব্যতা-বিমূঢ় হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন, এক্ষণে গৃহের ভিতর অন্ধকারে রমণীর সহিত যাইতে সঙ্কোচ করিয়া বলিলেন, “তুমি কে জানি না, আমি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিবার অহুমতি পাই নাই।”

জেলেখা। প্রাসাদে যাইবার আমার অধিকার না থাকিলে তোমাকে আসিতে বলিতাম না।

নরেন্দ্র। তথাপি তুমি কে জানি না, অজ্ঞাত স্থানে যাইব না।

জেলেখা কর্ণধ্বরে বলিল, “মৃত্যুভয় করিতেছ? তোমাকে হনন করিবার ইচ্ছা থাকিলে আমি তাতারদেশীয়া, আমি এই ছুরিকা এতক্ষণ ব্যবহার করিতে পারিতাম না? কিন্তু এই লও, ছুরিকা ত্যাগ করিলাম, রিক্তহস্ত স্ত্রীলোকের সহিত যাইতে বোধ হয়, বীরপুরুষের কোন আপত্তি নাই।”

জেলেখার বিকট হাস্যধ্বনিতে নরেন্দ্রের

মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্তবর্ণ হইল। তিনি নিঃশব্দে জেলেখার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। কণ্ঠে ঝাইলে পর জেলেখা এক স্থানে তাহা পরিধান করিতে কহিল। নরেন্দ্র তুলিয়া দেখিলেন, তাহা তাতারদেশীয় রমণীর পরিচ্ছদ। বিস্মিত হইয়া আবার জেলেখার দিকে চাহিলেন। জেলেখা এবার গম্ভীরস্বরে বলিল, “বিলম্ব করিও না, আমরা যে দ্বার দিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে সে দ্বার বন্ধ হইয়াছে, চারিদিকে খোজাগণ নিক্ষেপিত অসিহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এ বেগমদিগের প্রাসাদ, তুমি পুরুষ জানিলে এইক্ষণেই তোমার প্রাণবিমাণ করিবে।”

নরেন্দ্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া দেখিলেন, জেলেখার কথা সত্য। অগত্যা নরেন্দ্র কাঁচলি ও যাংরা পরিলেন, জেলেখা হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে পরচুলা পরাইয়া দিয়া মস্তকের উপর খোঁপা করিয়া দিল। নরেন্দ্র এই অদ্ভুত বেশে জেলেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদের অন্তঃপুরে চলিলেন।

নরেন্দ্র জেলেখার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন ; কত গৃহ ও পথ অতিবাহিত করিলেন, তাহা গণনা করা যায় না। ঘরে ঘরে অসি-হস্তে খোজাগণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে ও শত শত পরিচারিকা এদিক্ ওদিক্ পরিভ্রমণ করিতেছে। জেলেখাকে দেখিয়া সকলেই দ্বার ছাড়িয়া দিল।

নরেন্দ্রনাথ বেগমদিগের মহলের অভ্যন্তরে যত যাইতে লাগিলেন, ততই বিস্মিত হইলেন, “ঐশ্বর্য্য, শিল্পকার্য্য ও বিলাসপ্রিয়তার পরাকর্ষ্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। খেতমর্দরপ্রান্তর-বিনির্মিত কত ঘর, কত প্রাঙ্গণ, কত সুন্দর স্তম্ভসারি, কত উন্নত ছাদ, তাহা গণনা করা যায় না। সেই প্রান্তরে

কি অপূর্ণ শিল্পকার্য্য! দেয়ালে, স্তম্ভে, প্রকোষ্ঠে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের প্রস্তর খেতপ্রস্তরে সন্নিবেশিত হইয়া লতা, পত্র, বৃক্ষ, পুষ্পের রূপ ধারণ করিয়াছে, যেন সুন্দর খেত দেয়ালের পার্শ্বে যথার্থই পুষ্প ফুটিয়া রহিয়াছে। ছাদ হইতে যেন সেইরূপ পুষ্প লম্বিত রহিয়াছে অথবা উজ্জ্বল সুবর্ণ-মণ্ডিত ও চিত্রিত হইয়া অধিকতর শোভা ধারণ করিতেছে। খেত-প্রস্তরবিনির্মিত সুন্দর গবাক্ষ, সুন্দর ফোয়ারা, সুন্দর পুষ্পাধার ; তাহার উপর মনোহর স্নগন্ধ পুষ্প ফুটিয়া প্রাসাদকে আলোকিত করিতেছে। খেত, গীত, নীলবর্ণের আলোক সেই রঞ্জিত ঘরের ভিতর ও বাহিরে দেখা যাইতেছে। জগতে অতুল্য রূপবতী বেগমগণ কেহ বা সেই ঘরে বা প্রকোষ্ঠ ভ্রমণ করিতেছেন, কেহ বা পুষ্পচয়ন করিয়া কেশে ধারণ করিতেছেন, কেহ বা আনন্দে গান করিতেছেন। আজ আনন্দের দিন, রাজপ্রাসাদ আনন্দে ও নৃত্য-গীতে পরিপূর্ণ।

এই দেখিতে দেখিতে নরেন্দ্র যে স্থানে স্বয়ং আরংজীব ছিলেন, তথায় বাইরা উপনীত হইলেন ; দেখিলেন, সাম্রাট্ আরংজীব বেগমদিগের সহিত পচিশী খেলিতেছেন। পচিশীর ঘর খেতপ্রস্তরবিনির্মিত ও প্রকাণ্ড এক একটি রূপবতী কামিনী এক একটি ঘুঁটা! ঘুঁটা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের হওয়া আবশ্যক, এই লজ্জা কামিনীগণ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছেন।

তথা হইতে নরেন্দ্র জেলেখার সঙ্গে একটি মর্দর-প্রান্তরবিনির্মিত ঘরে প্রবেশ করিলেন। মর্দরপ্রান্তরবিনির্মিত স্তম্ভসারি সাতিন ও মকমলে বিভূষিত এবং নানা বর্ণের গন্ধদীপ আলোক ও গন্ধদানে ঘর আয়োজিত করিতেছে। ভিতরে তিন

চারি জন বেগম বাস্ত ও শীত করিতেছে, সপ্তস্বর-মিলিত সেই শীতঃশ্রুতি উন্নত ছাৎ উদ্ভঞ্জন করিয়া যমুনাতীরে ও নৈশ গগনে প্রধাবিত হইতেছে।

সে গৃহ হইতে কিছু দূরে যমুনানদীর দিকে একটি শ্বেতপ্রস্তরনির্মিত বারান্দায় সুন্দর চন্দ্রালোক পতিত হইয়াছে। এ স্থানটি নিস্তরু ও রমণীয়। উপরে আকাশ নীলবর্ণ, দুই একটি তারা দেখা যাইতেছে, শারদীয় চন্দ্র সুধাবর্ণ করিয়া গগনকে শোভিত ও জগৎকেতুপ্ত করিতেছে। নীচে নীলবর্ণ যমুনানদী কল কল শব্দে প্রধাবিত হইতেছে, তাহার চন্দ্রকরোজ্জ্বল বক্ষের উপর দুই একখানি ক্ষুদ্র শেতভা সমান রহিয়াছে। দক্ষিণে সুন্দর তাজমহল চন্দ্রকরে অধিকতর সুন্দর দেখা যাইতেছে। বারান্দা জনশূন্য, কেবল একজন রাজদাসী বীণাহস্তে গান করিতেছিল, এক্ষণে পরিশ্রান্ত হইয়া বারান্দার শ্বেত প্রস্তরে মস্তক রাখিয়া বোধ হয় সুখের বা দুঃখের স্বপ্ন দেখিতেছে। যমুনার বায়ু রমণীর চন্দ্রকরোজ্জ্বল কেশপাশ লইয়া জীড়া করিতেছে অথবা সে বীণার উপর কখন কখন সুখের গান করিতেছে। বারান্দায় দণ্ডায়মান হইয়া ও যমুনার সুন্দর গান ও শীতলবায়ু ভোগ করিয়া নরেন্দ্রের হৃদয়ে নব নব ভাব উদ্ভিত হইতে লাগিল। এইরূপ নিস্তরু রজনীতে এইরূপ নদীতীরে নরেন্দ্র দূরবঙ্গদেশে হেমকে শেষবার দেখিয়াছিলেন! আহা! সে সুন্দর মুখখানি চন্দ্র হইতেও সুধাপূর্ণ ও জ্যোতির্ময়। মুহূর্তের জন্ত নরেন্দ্রের হৃদয় হেমলভাপূর্ণ হইল, নরেন্দ্র আকাশের দিকে চাহিয়া অন্তরিকে বাইলেন।

যে দিকে বাইলেন, সে দিক হইতে

লোকের কলরব শুনিতে পাইলেন। প্রাসাদের মধ্যে এই কলরব শুনিয়া নরেন্দ্র কিছু বিস্মিত হইলেন এবং ঔৎসুক্যের সহিত সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন। বত নিকটে আসিলেন, ততই নারীকর্ণ-নিঃসৃত সুমধুর কথা ও হাস্যধ্বনি আবার কর্ণে প্রবেশ করিল; তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সেই দিকে যাইয়া অবশেষে একটি জনাকীর্ণ স্থানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সম্মুখে একটি অতি বিস্তার প্রাঙ্গণ; প্রাঙ্গণে বত সুন্দর পুষ্পচারা ও পুষ্পলতিকা, তাহা বর্ণনা করা যায় না। চতুঃপার্শ্বস্থ হর্ষাশ্রেণী হইতে পুষ্পমালা ছলিতেছে, বৃক্ষলতার পুষ্প ফুটিয়া রহিয়াছে, স্থানে স্থানে শুপাংকার পুষ্প রহিয়াছে, চারিদিকে সুগন্ধ পুষ্প বিকীর্ণ রহিয়াছে। স্বদর্শন ফোয়ারা যেন দ্রব রৌপ্য-স্তুভ নৈশ আকাশে উত্তোলন করিয়া আবার মুক্তারূপে চারিদিকে বিকীর্ণ করিতেছে। ঘোপে, বৃক্ষের শাখায়ে, সম্মুখে, পার্শ্বে, উচ্চে, নীচে নানাবর্ণের সুগন্ধ দীপাবলী জলিতেছে, যে আজ ইন্দ্রের অমরাপুরী লঙ্ঘিত করিবে এই বেগমমহল অপূর্ণ রূপ ধারণ করিয়াছে। সেই প্রাঙ্গণে একটি বাজার বসিয়াছে, ক্রেতা-বিক্রেতা দলে দলে বিচরণ করিতেছে। অস্ত্রাস্ত্র বাজার হইতে এই ভেদ যে, সকলেই রমণী। বিক্রেতা ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান রাজা, মহারাজা ও ওমরাহের মহিলাগণ,—ক্রেতা! সম্রাটের বেগমগণ। যে সমস্ত অর্ঘ্যসুস্পন্দ্রা কোমলাঙ্গী লাভগাময়ী যুবতীগণ ক্রন্দ-বিক্রন্দ করিতেছেন, তাঁহাদিগের! হাবভাব, রসিকতা ও বাকপ্রগল্ভতার নরেন্দ্র চমকিত হইলেন!

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, বৎসর

বৎসর নওরোজার দিন দিল্লীর সম্রাট্‌গণ বেগমমহলে এইরূপ একটা করিয়া বাজার বসাইতেন, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান মহিলা-গণ এই বাজারে দ্রব্য বিক্রয় করিতে আসিতেন । ওমরাহ ও রাজগণ পরিবারস্থ রমণীদিগকে বেগমদিগের সহিত পরিচিতা করিবার জন্য বাজারে পাঠাইতেন । পুরুষের মধ্যে কেবল স্বয়ং সম্রাট্‌ আসিতেন । পূর্ক-প্রথামতে এই আনন্দের দিনে আরংজীব সেইরূপ বাজার বসাইয়াছেন ও স্বয়ং দুই একজন বেগমের সহিত এক দোকান হইতে অল্প দোকানে পরিভ্রমণ করিতে-ছিলেন । ভ্রাতৃযুদ্ধে আরংজীবের ভগিনী রোশন-আরা আরংজীবের অনেক সহায়তা করিয়াছেন, সে বাজারের মধ্যে রোশন-আরার স্থায় কাহার গোরব, কাহার প্রভুত্ব ? অল্প ভগিনী জেহান-আরা দারার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, অল্প এই মহোৎসবের মধ্যে জেহান-আরা নাই ।

দ্বিস্রোংফুল্ললোচনে নরেন্দ্রনাথ এই মহোৎসব দেখিতে লাগিলেন । দেখিলেন, সম্রাট্‌ একজন রূপবতী মোগলকস্তার নিকটে কতকগুলি অলঙ্কার ও সাটিন ও সুবর্ণখচিত বস্ত্রের দর করিতে আরম্ভ করিতেছেন । দর করিতে উভয়পক্ষই সমান পটু, কখন কখন এক পরসার বিভিন্নতার জন্য মহা গুণ্ডগোল উপস্থিত হইতেছে । আরংজীব বলিলেন, “তোমার জিনিস মেকি, তুমি এখানে ঠকাইতে আসিয়াছ ?” চতুরা মোগল-কস্তা বলিলেন, “তুমি কিরূপ খরিদদার ? এরূপ জিনিস কখনও দেখ নাই, ইহার দর তুমি কি জানিবে ? তুমি ইহার উপযুক্ত নও, অল্প স্থানে বাও, তোমার যোগ্য দ্রব্য পাইবে ।” এইরূপ বহু বাণিত্যের পর মূল্য অবধারিত হইল । ক্রেতা তখন যেন

ভ্রমরবে দুই চারিটি রোপামুজার পানে বিক্রেতাকে সুবর্ণমুদ্রা দিয়া চলিয়া গেলেন !

অনেকরূপ এইরূপ বাজার দেখিয়া নরেন্দ্র জেলেখার আদেশানুসারে “শীশ-মহলে” প্রবেশ করিলেন, তথায় আবার অশ্রুপূর্ণ অপকৃপ দৃষ্ট দেখিলেন । সম্রাট্‌ ও বেগমদিগের আনার্থে এই মহল নির্মিত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠশস্ত্রের বিনির্মিত শাণের উপর দিয়া নির্মল জল প্রবাহিত হইতেছে, সেই শাণে অক্ষিত প্রতিভ্রমণ দেখিয়া বোধ হয় যেন, জলের নীচে অসংখ্য মৎস্য জৌড়া করিতেছে । চতুর্দিক হইতে কোয়ারার নির্মল জল বেগে উঠিতেছে, আবার মুজার শায়ি স্থায় প্রস্তরের উপর পতিত হইতেছে । ছাদ হইতে অসংখ্য নীপাবলী লম্বিত রহিয়াছে ও সেই সমস্ত নীপের বিবিধবর্ণের আলোক কোয়ারার জলের উপর বড় স্নন্দরভাবে প্রতিহত হইতেছে । চতুর্দিক হইতে অসংখ্য দর্পণ রত্নরাজিখচিত হইয়া দেয়ালে সন্নিবেশিত হইয়াছে, কেন না, স্নানকারিণী চতুর্দিকেই আপনার স্নন্দর অনারত অবয়ব দেখিতে পাইবেন ! বিলাসপটু সম্রাট্‌গণ বেগমদিগকে লইয়া এই গৃহে স্নান ও জলকেলি করিতে পারিবেন, এই জন্য কত দেশ হইতে অর্থ আনীত হইয়া এই অপূর্ণ বিলাসগৃহ বিনির্মিত ও সুশোভিত হইয়াছে !

নানাদেশ হইতে অনেক মুসলমান ও হিন্দু-রমণী অল্প প্রাশাদে সমবেত হইয়াছেন । তাহার মধ্যে অনেকেই শীশমহলের অপূর্ণ শোভা দেখিতেছিলেন । জেলেখা তাঁহা-দিগের ভিতর দিয়া, নরেন্দ্রকে হাত ধরিয়া একপার্শ্বে লইয়া গিয়া, একটি দর্পণের নিকট আনিলা এবং সেই দর্পণের ভিতর

একটি ছায়া দেখাইল। চকিত ও নিশ্পন্দ হইয়া নরেন্দ্র সেই দর্পণের ভিতর সেই ছায়া দেখিতে লাগিলেন, তথা হইতে আর নয়ন ফিরাইতে পারিলেন না, আলোকে আকৃষ্ট পতঙ্গবৎ নরেন্দ্র সেই ছায়ার দিকে চাহিয়া রহিলেন, অনিমেষলোচনে সেই দর্পণস্থ প্রতিমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন। নরেন্দ্রনাথ কি স্বপ্ন দেখিতেছেন? নরেন্দ্র কি উন্মত্ত হইয়াছেন? নরেন্দ্রের শরীর কাঁপিতেছে, তাঁহার হৃদয় সজোরে আঘাত করিতেছে, তাঁহার নয়ন স্পন্দহীন! ক্রমে সে প্রতিমূর্ত্তি দর্পণ হইতে সরিয়া গেল, সে রমণী অবগুষ্ঠন টানিয়া শীশমহল হইতে বাহির হইলেন, উন্মত্ত নরেন্দ্র তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

রমণী রাজপুত-বেশধারিণী। নরেন্দ্র ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিবার জন্ত ক্রমে নিকটে আসিলেন, তথাপি রমণীর অনাবৃত বাহু ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না, মুখমণ্ডল অবগুষ্ঠনের ভিতর দিয়া দেখা যায় না।

নরেন্দ্রেরও নারীবেশ, একবার ইচ্ছা হইল, রমণীর নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু নরেন্দ্রের কণ্ঠরোধ হইল। একবার ইচ্ছা হইল, রমণীর হস্তে আপন হস্ত স্থাপন করেন, কিন্তু তাঁহার হস্ত উঠিল না, হৃদয় সজোরে আঘাত করিতে লাগিল! অচিরাত্ সেই রমণী ও তাঁহার রাজপুত-সঙ্গিনীগণ সেই বাজার পরিত্যাগ করিলেন, নরেন্দ্রও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অনেক ঘর, অনেক দ্বার, অনেক পুষ্পোচ্ছান ও প্রাসাদ অতিক্রম করিয়া বাহিরে উপস্থিত হইলেন। তথায় অনেক শিবিকা ছিল, রাজপুতকামিনীগণ নিজ নিজ শিবিকায় আরোহণ করিলেন। যে রমণীর দিকে

নরেন্দ্র দেখিতেছিলেন, তিনিও শিবিকায় আরোহণ করিবার উপক্রম করিলেন। বোধ হইল যেন, তিনি যমুনানদী ও আগ্রার রাজপ্রাসাদ পূর্বে দেখেন নাই, কেন না, শিবিকায় আরোহণ করিবার পূর্বে একবার প্রাসাদ ও নদীর দিকে স্থির-দৃষ্টি করিয়া দেখিতে লাগিলেন। যমুনায় বায়ুতে তাঁহার অবগুষ্ঠন নড়িতে লাগিল, নরেন্দ্র তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয় ক্ষীত হইতে লাগিল! কিন্তু সে অবগুষ্ঠন উড়িয়া গেল না, নরেন্দ্র মুখ দেখিতে পাইলেন না। অচিরাত্ শিবিকা-যোগে সে রাজপুত-বেশধারিণী চলিয়া গেলেন।

এ কি হেমলতা? সেই গঠন, সেই চলন, সেই বাহ! দর্পণে সেই মধুম্বাধা মুখখানি প্রতিকলিত হইয়াছিল! কিন্তু হেমলতা আগ্রায় বেগমমহলে কেন? রাজপুত-বেশ কি জন্ত? নরেন্দ্রনাথ! প্রেমাক্ত হইয়া কাহাকে হেমলতা মনে করিতেছে? নরেন্দ্রনাথ! কেন দেশে দেশে সেই ছায়ার অমুখাবন করিতেছে?

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতৃস্নেহ।

But he who stems a stream with sand,
And fetters flame with flaxen band,
Has yet a harder task to prove
By firm resolve to conquer love.

Scott.

বীরনগরের জমীদারের প্রকাণ্ড আট্টা-লিকার পার্শ্বে সুন্দর ও প্রশস্ত উপবন ছিল, সেই উপবন দিয়া নদীতীরে আসা যাইত। সেই উপবনে রাজকুমার

হেমলতা নোড়ানোড়ি করিত, সেই নদীকূলে
শালকবালিকার সঙ্গে খেলা করিত, হাসিত,
কান্দিত, আবার উচ্চহাসে উপবন আয়োদিত
করিত। আজি সে দিন পরিবর্তিত হই-
রাছে, নরেন্দ্রনাথ শান্তিশূন্য-জ্বরে দেশে দেশে
বেড়াইতেছেন, শ্রীশচন্দ্র স্বপ্নের সম্প্রতি
মৃত্যু হওয়ার জমীনার হইয়াছেন, হেমলতা
আজি বালিকা নছেন, নবজন্মদারের
গৃহিণী ।

সায়ংকালে সেই উপবন দিরা দুইটি
রমণী ঘাটে বাইতেছিলেন ; একজন
হেমলতা, অপরটি শ্রীশচন্দ্রের বিধবা ভগিনী
শৈবলিনী ।

হেমলতার বয়ঃক্রম এক্ষণে পঞ্চদশ বর্ষ
হইবে, অবয়ব ক্রীণ, কোমল ও উজ্জল
রূপরাশিতে পরিপূর্ণ । নয়ন দুইটি জ্যোতি-
র্ময়, জুগল সূচিকণ, ওষ্ঠ সুন্দর, গণ্ডস্থল
রক্তিমাক্ষতার আরক্ত, মুখমণ্ডল উজ্জল ও
লাবণ্যময় । তথাপি যৌবনপ্রারম্ভের প্রফুল-
লতা সে অবয়বে লক্ষিত হয় না, যৌবনের
উন্নততা মুখমণ্ডলে দৃষ্ট হয় না । বোধ
হয় যেন, সে সুন্দর ললাটে, সেই স্থির চক্ষু-
বর্ষে, সেই সূচিকণ ওষ্ঠে, অল্পকালেই চিত্তার
অঙ্ক অঙ্কিত হইয়াছে । নয়নের উজ্জল
জ্যোতিঃ কেবল তিমিত হইয়াছে, মুখ-
মণ্ডলের প্রফুল্ল আলোকের উপর জীবনের
সন্ধার ছায়া বিকীর্ণ হইয়াছে । যৌবনের
সৌন্দর্য ও লাবণ্য দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু
যৌবনের প্রফুল্লতা কৈ, প্রফুল্লতা থাকিলে
কি হেম এরূপ নব্রভাবে ধীরে ধীরে
বাইত ? ঐ ক্ষুদ্র নতশির পুষ্পটিকে
ভুলিয়া কি উহার নিকে এরূপ স্থিরভাবে
চাহিত ? বে কক্ষবর্ণ সূচিকণ কেশপাশে
উহার বদনমণ্ডল ও নয়নদ্বয় কেবল আবৃত
হইয়াছে, ধীরে ধীরে সবয়ে সরাইয়া

দেখ, নয়নদ্বয়ে জল নাই, তথাপি নয়নদ্বয়
স্থির, শান্ত, যৌবনোচিত চপলভানুত ।
নিকটে বাইরা দেখ, হেমলতা দীর্ঘনিশ্বাস
তাগ করিতেছে না, তথাপি যেন ভারাক্রান্ত
হৃদয় হইতে ধীরে ধীরে নিশ্বাস বহির্গত
হইতেছে । অর্ধ-প্রক্ষুটিত কোরক হৃৎ-
কোট প্রবেশ করে নাই, তথাপি কোরক
জীবনাভাবে যেন ঈষৎ শুষ্ক ও নতশির ।
জীবনের অকণ্ঠোদয় যেন মেঘচ্ছটার
বিমিশ্রিত ।

শৈবলিনীর বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশবর্ষ হইবে ।
শৈবলিনী বিধবা, অবয়বে যৌবনের রূপ
নাই, কিন্তু অনির্লুপ্তনীর পবিত্র গৌরব
আছে । মস্তক হইতে নিবিড় কৃষ্ণ কেশ-
পাশ পৃষ্ঠদেশে লম্বিত রহিয়াছে, ললাট সুন্দর,
চক্ষু বিশাল ও শান্তপ্রভ মুখমণ্ডল গভীর
অধচ কোমল, অবয়ব উন্নত ও বিধবার
শুভ্রবসনে আবৃত । শৈবলিনী হেমলতাকে
কনিষ্ঠার স্তার ভালবাসিত, লরেহ-বচনে
তাহার সহিত কথা কহিতে কহিতে ঘাটে
বাইতেছিল । শৈবলিনীর জীবন যেন মেঘ-
শূন্য, বায়ুশূন্য সায়ংকাল, গভীর, নিশ্চল, শান্ত ।

বাল্যকালে হেমলতা নরেন্দ্রনাথের মুখ
দেখিলে ভাল থাকিত । যৌবনপ্রারম্ভে নরেন্দ্র-
নাথ হেমলতার জ্বরে স্থান পাইয়াছিল,
হেমলতা বৃদ্ধিতে পারে নাই, কিন্তু তাহার
হৃদয় নরেন্দ্রনাথ-পূর্ণ হইয়াছিল । বখন সেই
নরেন্দ্রের সহিত চিরবিচ্ছেদ হইল, বখন হেম
আর একজনের সহধর্মিণী হইয়া নরেন্দ্রের
প্রতিমাকে হৃদয় হইতে বিসর্জন দিতে বাধ্য
হইল, তখন প্রায় কি পরার্থ, হেম বৃদ্ধিতে
পারিল, তখন অর্থভেদী হৃৎ আদিয়া হেমের
হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল । বালিকা
সরলা নবোঢ়া বয়স, সে কথা কাহার কাছে
বলিবে ? সে হৃৎ তাহার কাছে জানাইবে ?

শৈবলিনী, পক্ষবর্ধের সময়েই বিধবা হইয়াছিল, বংশস্বামীরই থাকিত, কখন কখন ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। শৈবলিনী তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিমতী, দুই তিনবার বীর-শ্রমে অগ্নিসরাই হেমলতার অন্তরের ভাব কিছু কিছু বুঝিতে পারিল, মনে মনে সঙ্কল্প করিল, “বহি বালিকাকে আমি যত্ন না করি, বোধ হয়, ভ্রাতার সংসার ছারখার হইয়া যাইবে।” শৈবলিনী সেই অবধি বীরশ্রমে রহিল।

শৈবলিনীর সম্মুখে ব্যবহারে ও প্রবোধ-বাক্যে হেমলতার দুঃখভার কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইল। শৈবলিনী মানব-চরিত্র বিশেষরূপে বুঝিত, একবারও হেমকে তিরস্কার করিত না, কনিষ্ঠা ভগিনীকে যেন প্রবোধ-বাক্যে সান্ত্বনা করিত। তাহার সারগর্ভ মেহপরি-পূর্ণ কথাই কোন্‌ দুঃখিনীর দুঃখ নাটুবিদূরিত হয়? শৈবলিনী গল্প করিতে অতিশয় পটু, সর্বদাই হেমলতাকে পুরাণের গল্প বলিত। সে পবিত্র গল্প শুনিতে শুনিতে হেমলতা রজনীতে নিজা বিশ্বরণ হইত। গভীর রজনী, গভীর বন, চারিদিকে বৃক্ষের অন্ধকার দেখা যাইতেছে, বায়ুর শব্দ ও হিংস্রক জন্তুর নাদ শুনা যাইতেছে। রাজকন্তা দময়ন্তী অস্ত্র স্বামীর প্রেমকে একমাত্র অবলম্বন করিয়া ধন, মান, রাজ্য তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, সুখে অলাজলি দিয়া, ভিখারিণীবেশে বিচরণ করিতেছে। স্বামী ভ্রূকণ্ঠ হইলে গণ্ডুৰ করিয়া জল দিতেছে, স্বামী বস্ত্রহীন হইলে আপনাতঃ বস্ত্র দিতেছে, স্বামী পরিজ্ঞান হইলে আপন অঙ্গে তাঁহার মস্তক স্থাপন করিয়া স্বয়ং অনিদ্র হইয়া উপবেশন করিয়া আছে, সেই স্বামী বধন মায়া বিচ্ছিন্ন করিয়া অভাগিনীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইল, তখনও ভ্রাতৃগণের স্বামীচিন্তা ভিন্ন এ জগতে আর

চিন্তা নাই, স্বামীর পুনর্জীবন ভিন্ন এ জগতে আর আশা নাই।

অথবা সেই মহর্ষি বায়ীকির কুটীরে চিরদুঃখিনী বৈদেহী হস্তে গণ্ডুহাণন করিয়া এখনও হৃদয়েশ্বরকে চিন্তা করিতেছে। সম্মুখে পুত্র দুইটি খেলা করিতেছে, তাহার দিগের মুখ অবলোকন করিতেছে, আবার শ্রীরামের চিন্তা করিতেছে। যিনি নিরাশ্রয়া, নিরুলকা, অন্তঃসত্তা, রাজকন্তা, রাজরাণীকে চিরনির্বাহ করিয়াছেন, সেই নিষ্ঠুর পতিকেও অত্যাধি হৃদয়ে স্থান দিয়া অভাগিনী চিন্তা করিতেছে, পতিই সীতার জীবনের জীবন, হৃদয়ের সর্বস্বত্ব! পতি-ব্রতের কি মাহাত্ম্য!

রজনী তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত হেমলতা তাহার ধর্মপরায়াণা নন্দিনীর নিকট এই সকল পুণ্যকথা শুনিত। দুঃখকথা শুনিয়া হেমলতার হৃদয় আলোড়িত হইত, নন্দিনীর হৃদয়ে বদন ঢাকিয়া দয়-বিগলিত-ধারার স্রোদন করিত; আবার মুখ তুলিয়া সেই পবিত্র কথা শুনিত, আবার শোকাকুল হইয়া অবসুরিত অশ্রুজল ত্যাগ করিত। হেমলতা ভাবিত, “সংসারে সকলেই দুঃখিনী, পুণ্যাত্মা সীতা দুঃখিনী, ধর্মপরায়াণা সাবিত্রী দুঃখিনী, আমি কে অভাগিনী যে, নিজ দুঃখে বিহ্বলা হইয়া রহিয়াছি? তাঁহারা সাধু ছিলেন, পতিব্রতা ছিলেন, অভাগিনী হেমলতা আজি নরেন্দ্রের চিন্তা করে, দেবতুল্য স্বামীকে বিশ্বরণ হইয়া আছে। আমি অবলা, আমার বল নাই। ভগবান্! সহায় হও, পাশচিন্তা হৃদয় হইতে উৎপাটিত কর, অবলার যতদূর সাধ্য করিবে।”

শৈবলিনীর অপকল্প মেহ ও প্রবোধবাক্যে হেমলতা ক্রমশঃ শান্তিলাভ করিল, হৃদয়ের প্রথম প্রেযবরূপ ভীষণ শেল উৎপাটিত

হইল, কিন্তু অনেক দিনে, অনেক চেষ্টায়,
অনেক পরিশ্রমে, সে কললাভ হইল।
সেই পরিশ্রম ও চেষ্টায় যৌবনের প্রফুল্লতা
ভুগু হইয়া গেল, অবশ্যবে চিন্তার রেখা
অঙ্কিত হইল। হেমলতা আজ আর
দুঃখিনী নহে, কিন্তু স্বভাবতঃ দীর্ঘ, নম্র ও
নভলিয়।

একশ্রেণে হেমলতা ও শৈবলিনী সর্বদাই
নরেন্দ্রের কথা কহিত, বালাকাল হইতে
শৈবলিনী নরেন্দ্রকে ভ্রাতা স্বলিত, এখন
হেমও তাহাকে ভ্রাতার স্বরূপ জ্ঞান করিত।
ভ্রাতার বিপদে বা অবর্তমানে ভগিনীর চিন্তা
হয়, হেমও নরেন্দ্রের জন্ত ভাবিত, কিন্তু
তাহার হৃদয় আর পূর্ববৎ বিচলিত হইত
না কিংবা যদি কখন কখন সাংকালে এই
উপবনে একাকিনী বিচরণ করিতে করিতে
হেমের বালাকালের কথা মনে পড়িত, ভাগী-
রথীর কল্ কল্ শব্দ শুনিয়া, নীল গগনমণ্ডলে
উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্র দর্শন করিয়া, শীতল হরিৎ
কুঞ্জবনে উপবেশন করিয়া, বালাকালের
সঙ্গীয় কথা মনে পড়িত, যদি সে কথা মনে
পড়িয়া হেমের চক্ষে একবিন্দু জল লক্ষিত
হইত,—পাঠক, তাহা মাতৃস্নেহের নিদর্শন-
স্বরূপ বলিয়া মার্জনা করিও। অস্ত্র ভাব
তিরোহিত করিবার জন্ত হেম অনেক চেষ্টা
করিয়াছে, অনেক সঙ্কল্প করিয়াছে, অভাগিনী
অনেক কাঁদিয়াছে, সে ভাব তিরোহিত করি-
য়াছে। যদি হৃদয়ের কন্দরে অজ্ঞাতরূপে সে
ভাবের একবিন্দুও লুক্কায়িত থাকে, পাঠক,
সেটুকু অভাগিনী হেমকে ক্ষমা করিও না।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ ।

পুরাণ-কথা ।

yet, oh yet thyself deceive not.
Love may sink by slow decay.
But by sudden wrench believe not
Hearts can thus be torn away,

Byron.

বাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া হেমলতা
ও শৈবলিনী গৃহের সমস্ত কার্যাদি সমাপন
করিল। পরে দুই জনে একটি ঘরে বসিয়া
হেম বলিল, “দিদি! অনেক দিন অবধি
গল্প শুনি নাই, আজ একটু অবসর আছে,
একটি গল্প বল।”

শৈবলিনী স্নেহ-বচনে উত্তর দিল,
“বলিব বৈ কি বোঁ, কোন্ গল্পটি বলিব বল।”

হেম বলিল, “রাজা হরিশ্চন্দ্রের গল্প
অনেক দিন শুনি নাই, সেই গল্প বল।”

শৈবলিনী হরিশ্চন্দ্রের গল্প বলিতে
লাগিল। মহাভারতের কথা বথার্থই অমু-
তের তুল্য, তাহার গল্প কি মিষ্ট, কি স্থলিত,
কি হৃদয়-গ্রাহী! রাজার রাজ্য গেল,
ধন গেল, মান গেল, স্ত্রী-পুত্র লইয়া রাজা
বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। রাজ-
মহিষী শৈব্যা একশ্রেণে রাজার একমাত্র রত্ন।
সুখের সময়, সম্পদের সময় রথী অস্থিরা
চঞ্চলচিত্তা মানিনী! কত আশঙ্কায় করে!
কত অভিমান করে, কত মিথ্যা ক্রোধ করে!
কিন্তু যখন জীবনাকাশ ক্রমশঃ মেঘাচ্ছন্ন
হইয়া আইসে, যখন পৃথিবীর সমস্ত সুখ
নাট্যাভিনয়ের শেষে দীপ-শ্রেণীর স্তায় একে
একে নির্বাপিত হইতে থাকে, যখন আশা
মরীচিকারূপে আমাদেরিগকে অনেক পথ
লইয়া বাইয়া শেষে মরুভূমিতে রাখিয়া
অদৃষ্ট হয়, যখন বহুগণ আমাদেরিগকে ত্যাগ

করে ও লক্ষী বিবৃথ হন, তখন কে অনন্ত-মনা ও অনন্তক্লদয়া হইয়া অভাগার শুদ্ধা করে? মাতা বাতীত আর কে হতভাগার শয্যা রচনা করে? দুহিতা বাতীত আর কে রোগীর শুক কর্তে জলদান করে? ভার্য্যা বাতীত আর কে নিদ্রা বিবৃত হইয়া, ক্লান্তি বিবৃত হইয়া, নিবানিশি হতভাগার সেবার রত থাকে? রমণীর প্রেম অগাধ, অপরি-সীম। দারিদ্র্যে, দুঃখে, কষ্টেও শৈব্যা হরি-চন্দ্রকে সেবা করিতে লাগিলেন। সে দুঃখের কথা শুনিয়া হেমলতার চক্ষুতে জল আসিল।

তাহার পর আরও দুঃখ। রাজা শৈব্যাকে ও পুত্রটিকে বিক্রয় করিলেন, আপনাকে চণ্ডালের নিকট বিক্রয় করিলেন, অভাগিনী শৈব্যা ষামিবিব্রহে কায়িক পরিশ্রমে আপনার ও পুত্রটির ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন। আহা! সে পুত্রটিও অকালে কাল-প্রাপ্ত হইল।—হেমলতা আর থাকিতে পারিল না, ননদিনীর হৃদয়ে মন্তক স্থাপন করিয়া দরবিগলিত-ধারার রোদন করিতে লাগিল।

গল্প শাক হইলে, রাজা রাজ্যীকে ফিরিয়া পাইলেন, পুত্রকে ফিরিয়া পাইলেন, রাজ্য-সম্পদ সমস্তই ফিরিয়া পাইলেন। হেমলতার হৃদয় শান্ত হইল। অনেকক্ষণ, প্রায় এক দশকাল উভয়েই নিস্তর হইয়া রহিল, অনেকক্ষণ পর হেমলতা ধীরে ধীরে উঠিয়া একটি বাতায়ন খুলিল। বাহিরে চন্দ্রকরে জগৎ উদ্দীপ্ত হইয়াছে, নৈশ বায়ুতে বৃক্ষ-সকল ধীরে ধীরে মন্তক নাড়িতেছে, দূর হইতে গন্ধার জলের কল কল শব্দ শুনা যাইতেছে।

শৈবলিনী ধীরে ধীরে হেমলতার নিকটে আসিয়া ভগিনীর স্তায় সম্মেহে তাহার হস্ত ধারণ করিল। হেম কি ভাবিতেছিল?

ভাবিতেছিল, ঐ বৃক্ষের পাতার পাতার কত জোনাকী পোকা দেখা যাইতেছে, উহাদেরও জীবন আছে, সুখ, দুঃখ, ভরসা, ইচ্ছা আছে। যে ভগবান রাজা হরিচন্দ্রকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন, তিনিই এই নিশার অনিদ্র হইয়া ঐ পোকাগুলিকে খাও যোগাইতে-ছেন, উহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছেন। এই বিপুল বিশ্বসংসারে সকল জীবজন্তকে তিনিই রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাকে নিরিষ্ট-মনে পূজা করি, আমাদিগকে তিনি রক্ষা করিবেন।

হেমলতা বালিকা-স্বলভ পাতার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, “দিদি, যি পায়ার সাগর, তিনি তোমাকে অল্পবয়সে বিয়া করিলেন কেন?”

শৈবলিনী। সকলের কথা কি সকল সুখ থাকে? তিনি আমাকে বিয়া করিয়া-ছেন, কিন্তু দুঃখিনী করেন না। দেবতুল্য ভ্রাতা দিয়াছেন, ভোমার স্তায় ভ্রাতা দিয়াছেন, এই সোনার স্তরে স্থান দিয়াছেন। আমার আর কি কামনা নাই, কেবল একবার তীর্থ-ভ্রমণ করিয়া পূজা করিব, এই ইচ্ছা আছে।

হেমলতা। আমাদের কাশী বৃন্দাবন বাওয়ার কথা স্থির হইয়াছিল না?

শৈবলিনী। হা, ত্রিশ আমার উপরোধে সম্মত হইয়াছে, বোধ হয়, শীঘ্রই বাওয়া হইবে।

হেমলতা। দিদি, তোমার সঙ্গে তীর্থে বাইব ভাবিলে আমার বড় আনন্দ হয়; কত দেশ দেখিব, কত তীর্থ দেখিব। আর শুনিয়াছি, নরেন্দ্র না কি পশ্চিমে আছেন, হয় ও তাঁহার সঙ্গেও দেখা হইবে।

শৈবলিনী। হইতে পারে।

এমন সময়ে ত্রিশচন্দ্র ঘরে প্রবেশ করি-

গেন। শৈবলিনী একপাৰ্শ্ব দিয়া বাহির
হইয়া যাইল। তাহার ললাট চিন্তাকুল।

শৈবলিনীর কি চিন্তা? বাহিরে দণ্ডার-
মানা হইয়া শৈবলিনী ভাবিতেছিল, “হেম!
তুমি আমাকে বিধবা বলিয়া অভাগিনী বল,
কিন্তু নারীতে যাহা কখনও সহ করিতে
পারে না, বালিকা! তুমি তাহা সহ করি-
য়াছ। সে আঘাতে তোমার হৃদয় চূর্ণ হই-
য়াছে, তোমার জীবন শুষ্ক হইয়াছে, এ বয়সে
তোমার দুৰ্দ্ধল শরীর ও নীরস ওষ্ঠ দেখিলে
হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এ বিষম চিন্তার কথা
ভ্রাতা কিছুই জানে না, তুমি বালিকা, তুমিও
ভাবিয়াছ, এ চিন্তা নিরূপিত হইয়াছে, কিন্তু
নরেন্দ্রের সহিত আবার সাক্ষাৎ হইলে কি
হয় জানি না। ভগবান্ অনাধার নাথ, অস-
হায়ের সহায় হইবেন।

—

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—

তীর্থযাত্রা।

Upon her face was the tint of grief,
The settled shadow of an inward strife,
And an unquiet drooping of the eye,
As if its lids were charged with

inshed tears.
Byron.

শৈবলিনী পুনরায় ঘরের ভিতরে আসিল
ও ভ্রাতাকে আসন দিয়া ভোজনে বসাইয়া,
আপনি পার্শ্বে বসিয়া ব্যঞ্জন করিতে
লাগিল। হেমলতা সে ঘর হইতে বাহির
হইয়া দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্বামীর
ভোজন দেখিতে লাগিল।

ভ্রাতা-ভগিনীকে অনেকক্ষণ কথোপকথন
হইতে লাগিল। অবশেষে ত্রিশচন্দ্রের ধারণা
শাক হইল। রাত্রি অধিক হওয়ায় তিনি

শয়নের উদ্ভোগ করিলেন, শৈবলিনী অস্ত
গৃহে গেল।

তখন হেমলতা ধীরে ধীরে স্বামীর পার্শ্বে
আসিল ও বিনীতভাবে ডাঙল দিল। অস্ত
ত্রিশের অন্তঃকরণ কিছু আশ্বাসিত ছিল,
তিনি রহস্ত করিয়া বলিলেন, “আমি পান
খাইব না।”

হেম। কেন?

ত্রিশ। তোমার মুখে কথা নাই কেন?

হেম। কি কথা কহিব বল, কহিতেছি।

আগে পানটি খাও।

ত্রিশ। চিরকালই কি এই শুষ্ক মুখখানি
দেখিব? কবে তুমি শরীরে একটু সারিবে,
কবে তোমার মুখখানি প্রস্ফুট দেখিব?

হেম। আমার শরীর ত এখন ভাল আছে।

ত্রিশ। হাঁ, ঈশ্বরেচ্ছায় শরীর অল্প
সারিয়াছে, কিন্তু মনে উল্লাস কৈ?

হেম। উল্লাস আবার কি?

ত্রিশ। মনের ক্ষুধা কই? কবে
তোমাকে সুখী দেখিব?

হেম। কৈ, আমার মনে ত কোন কষ্ট
নাই। তবে দিদির কাছে একটু দুঃখের
গল্প শুনিতেছিলাম, তাই এক বিন্দু চক্ষুর জল
কেলিয়াছিলাম।

ত্রিশ। এ কথাও তুষ্ট হইলেন না;
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার মুখখানি
সহাস্ত দেখিব কবে?”

হেম আর উত্তর করিতে পারিল না,
ভূমির দিকেই চাহিয়া রহিল। হঠাৎ একটী
কথা মনে পড়িল, এবার হেম অল্প হাসিয়া
বলিল, “কবে তুমি আপন প্রতিজ্ঞা পালন
করিবে।”

ত্রিশ। কি প্রতিজ্ঞা?

হেম। তীর্থযাত্রা।

ত্রিশচন্দ্র এবার কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন।

হেমলতা ও শৈবলিনীর উপরোধে অনেক-
বার তীর্থযাত্রা করিবেন অলীকার করিয়া-
ছিলেন, কিন্তু এ পর্যন্ত কোন-উদ্দেশ্যে করেন
নাই। অতঃপর হেমলতার কথা কহিৎ নিস্তর
থাকিয়া পরে বলিলেন, “যদি যথার্থই তীর্থ-
যাত্রা করিলে তোমার শরীর ও মন ভাল
থাকে, তাহা হইলে আমি অবশ্যই যাইব।”
কহ্য হইতে আমি যাত্রার আয়োজন করিবা।

হেম পরিতৃপ্ত হইল। হেমকে একটু
প্রকৃত দেখিয়া শ্রীশ আনন্দিত হইলেন, সে
কণ দেহলতা হৃদয়ে ধারণ করিয়া সম্মুখে
হেমকে চুম্বন করিলেন।

উপরি-উক্ত ঘটনার অল্প দিন পরেই
শ্রীশচন্দ্র সপরিবারে পশ্চিমযাত্রা করিলেন।

গঙ্গাতীরস্থ সমস্ত তীর্থস্থান দেখিয়া অব-
শেষে মথুরা ও বৃন্দাবন বাইবার মানসে
আগ্রা পৌছিলেন। তথায় শ্রীশচন্দ্র প্রধান
প্রধান হিন্দুজাতিদিগের সহিত আলাপ
করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন
রাজার উপরোধে শ্রীশ সেই রাজার পরি-
বারের সহিত আপন পরিবারকে নওরো-
জার দিন প্রাসাদে পাঠাইতে বাধ্য হইয়া-
ছিলেন। হেমলতা অগত্যা রাজপুত-মহি-
লার বেশ ধরিয়া রাজপুতরমণীদিগের সহিত
আগ্রার বেগমহলে গিয়াছিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

জেলেখার পত্র।

The cold in clime are cold in blood,
Their love doth scarce deserve the name,
But mine was like the lava flood,
That boils in Etna's breast flame.

Byron

নরেন্দ্র আগ্রাভূর্গের ভিতরে দর্শনে হেম-
লতার মুখাবি দেখিয়া প্রায় হতজ্ঞান হইয়া-

ছিলেন, তাহা আমিরা পূর্বেই বলিয়াছি।
অনেককণ পরে নিস্তর আকাশ ও শান্ত-
প্রবাহিণী নদীর দিকে চাহিতে চাহিতে ধীরে
ধীরে আপন গৃহে যাইলেন।

নরেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন, একটি
প্রদীপ জলিতেছে, লোক নাই, নরেন্দ্র
বার বন্ধ করিয়া আলোকে বস্ত্র খুলিতে
লাগিলেন। সহসা তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে
একখানি পত্র ভূমিতে পড়িয়া যাইল। নরেন্দ্র
তুলিয়া দেখিলেন, তাহা ভাষার লিখিত।
নরেন্দ্র প্রদীপের নিকটে গিয়া পত্র খুলিয়া
পড়িতে লাগিলেন। অর্থাৎ না পড়িতে
পড়িতেই বৃত্তিতে পারিলেন, পত্রখানি পত্র।
তখন অধিকতর বিস্মিত হইয়া পড়িতে
লাগিলেন। পত্রে এই লেখা ছিল,—

“নরেন্দ্র।

আমি পাগলিনী, আমি হতভাগিনী,
সেইজন্য এই পত্র লিখিতেছি। আমি চক্ষুতে
আর দেখিতে পাইতেছি না, আমার মস্তক
ঘুরিতেছে, তথাপি মৃত্যুর পূর্বে একবার
মনের কথা তোমাকে বলিয়া দিই। তুমি
যখন এই পত্র পড়িবে, তখন অগত্যা আমি আর
এ জগতে থাকিব না।

আমি শাজিহানের জ্যেষ্ঠা কন্যা জেহান-
আরা বেগমের পরিচারিকা। যে দিন বারা-
ণসীর যুদ্ধ হয়, কার্যাবশতঃ আমি ও মসরুর
নামক খোজা রাজা জয়সিংহের শিবিরে
ছিলাম। সেই দিন আহত ও অচেতন হইয়া
তুমি সেই শিবিরে আনীত হও, সেই দিন
তোমাকে দর্শন করিয়া হৃদয়ে কালসর্প ধারণ
করিসাম।

দিসে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, আমি
হলাহল পান করিতে লাগিলাম। অশ্রান্ত
হইয়া সেই পীড়াময় উপর নত হইয়া
থাকিতাম, অনিদ্রিত হইয়া সেই নিদ্রিত

কলেবর নিরীক্ষণ করিতাম। ঐ প্রশস্ত গলাটি, ঐ রক্তবর্ণ ওষ্ঠ দুটীর দিকে দেখিতাম, আর পাগলিনী প্রায় হইতাম। পীড়াবশতঃ কখন তুমি আমাকে লক্ষ্য করিয়া তিরস্কার করিতে, আমি নিঃশব্দে মনের হুঃখে রোদন করিতাম। পীড়াবশতঃ কখন সন্নেহে আমার হস্ত ধরিতে, আমি পাগলিনী, আমার সমস্ত শরীর কটকিত হইত। ঘরে কেহ না থাকিলে আগ্রহের সহিত তোমাকে চুম্বন করিতাম। ক্ষমা কর, আমি পাগলিনী।

ক্রমে বারাণসী হইতে নৌকাযোগে তুমি দিল্লীতে আনীত হইলে। আমি কোন ছলে তোমাকে রাজপ্রাসাদের ভিতরে আনিয়া আপন ঘরে রাখিলাম; কেবল তোমাকে চক্ষে দেখিবার জন্ত আপন ঘরে রাখিলাম। তোমার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া হৃজনীবাগন করিতাম; কখন কখন আত্মসংযম করিতে না পারিলে তোমার সংজ্ঞাশূন্য দেহ হৃদয়ে ধারণ করিলাম।

দুই মসরুর তোমার কথা সাহেব-বেগমকে জানাইল। প্রাসাদের ভিতরে পুরুষ-আনিয়াছি শুনিয়া তিনি আমার ও তোমার প্রাণসংহারের আদেশ দিলেন। আবার মসরুর বাইরা সাহেব-বেগমকে তোমার অপূর্ববীর্য ও অপূর্ব সৌন্দর্যের কথা বলিল। বেগম পূর্বের আজ্ঞা রোধ করিলেন, আমাকে ঘরে বন্দী করিয়া রাখিলেন ও তোমার আরোগ্যের পর স্বয়ং আমাদের দোষের বিচার করিবেন, এইরূপ আদেশ দিলেন।

আমি বন্দী হইলাম, দিবারাত্রি ঘরে একাকিনী বসিয়া থাকিতাম; তোমাকে না দেখিয়া অসহ্য যাতনা হইত। অবশেষে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া দ্বাররক্ষক ও মসরুরের অনেক খোসামোদ করিয়া

গোপনে তোমাকে দেখিতে বাইতাম। তখন তুমি আরোগ্যলাভ করিয়াছ, কখন কখন আমার দিকে চাহিয়া দেখিতে, তাহা কি স্বরণ হয়? আমি অধিকক্ষণ থাকিতে পারিতাম না, কথা কহিতে পারিতাম না। নিষ্ঠুর মসরুর আমাকে শীঘ্রই আপন ঘরে পাঠাইয়া দিত, তথায় বাইরা আমি আবার সেই দেব-কান্তির চিন্তা করিতাম।

ক্রমে বিচারের দিন সমাগত হইল; সে দিন তোমার স্বরণ আছে? সিংহাসনোপবিষ্টা জেহান-আবার চারিদিকে সহচরীগণ দাঁড়াইয়াছিল, তাহা তোমার স্বরণ আছে? সাহেব-বেগম সেই দিন প্রথমে তোমাকে দেখিলেন, যে কঠোর আজ্ঞা দিলেন, তোমার স্বরণ আছে? শাহজাদি। আমার পাপের কি এই উচিত দণ্ড? তুমিও স্ত্রীলোক, তোমার হৃদয় কি পাষণ, কখনও বিচলিত হয় নাই? তবে আমি বান্দী, আমার স্বামী নতা নাই, সেই জন্ত আমার পাপের দিলে। কিন্তু তুমি সিংহাসনোপবিষ্টা রাহিতা, আমা অপেক্ষাও যে ঘোর পাপীরা তাহার কি দণ্ড নাই? *

কি কৌশলে সেই রাজ্ঞে আমি হইতে তোমাকে লইয়া পলায়ন করিলাম তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। তাহার পরই সৈনিকবেশে তুমি দিল্লী ত্যাগ করিলে, এ অভাগিনীও দেওরানা নাম ধারণ করিয়া পুরুষবেশে তোমার সঙ্গে সঙ্গে বাইল। নরেন্দ্র! তোমার প্রণয়ভাজন হইব, এরূপ আশা হৃদয়ে ধারণ করি নাই, দিবারাত্রি তোমার নিকটে থাকিব, দিবারাত্রি তৃষার্ত

* জেহান-আরা বা সাহেব-বেগমের প্রণয়ের অনেক গল্পকথা সে সময়ে প্রচলিত ছিল। করানী জয়নাকাঈ বর্ণনায় তাহার কতকগুলি লিপি বহু করিয়াছেন।

চাতকের জ্ঞান তোমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিব, দিবসে তোমার অমৃতকথা শ্রবণ করিব, রজনীতে সন্ধ্যা হইতে বিপ্রহর পর্যন্ত, কখন কখন বিপ্রহর হইতে প্রভাত পর্যন্ত তোমার সুপ্ত-কান্তি দেখিয়া হৃদয়ের পিপাসা নিবারণ করিব, কেবল এই আশায় আমি তোমার সহিত দিল্লী হইতে সিপ্রাতীরে, সিপ্রাতীর হইতে রাজস্থানে ভ্রমণ করিয়াছি। জগতে কোন্ স্থল আছে, নরকে কোন্ স্থল আছে, যথায় এই সুখের আশায় অভাগিনী হইতে পরামুখ ?”

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

অ।

পত্র সমাপ্ত ।

প্রথমে it she fall by bowl or steel
করিয়া that dark love she dared to fell.

রাজ।

Byron.

বারে: “নরেন্দ্র ! ভালবাসিয়াছি। বে হিন্দুরমণী জার মির প্রণয়ের পাত্রী, তাহাকেও আমি ছিলেবাসিয়াছি। কিন্তু তুমি কখনও ভালবাসার লার হ দেওয়ানা হও নাই ! আমার তাতার-আংশে জন্ম, তথাকার সকলেই উগ্রস্বভাব, কিন্তু আমি বাল্যকাল হইতেই অতিশয় উগ্রস্বভাবা ছিলাম। আমি ক্রুদ্ধ হইলে বালকগণও ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া বালিকার নিকট হইতে দূরে সরিয়া বাইত। একটু হুঙ্কে আমার পিতা হত হন, আমি ক্রুদ্ধ হইয়া বাঁদী অবস্থায় দিল্লীর সম্রাটের নিকট বিক্রীত হইলাম। স্বাধীনতা গেল, কিন্তু উগ্রস্বভাব গেল না, বোধ হয়, ভারত-বর্ষের উচ্চতার সূর্য্যতাপে আমার শোণিত ক্রমশঃ উকতর হইল। প্রাসাদে তাতার-

রমণীদিগের কি কাজ, বোধ হয়, তুমি জান না। আমরা বেগমদিগের সহল রক্ষা করি, খড়্গ ও ছুরিকা-ব্যবহারে আমরা অপটু নহি, বেগমদিগের আদেশে কত কত ভয়ঙ্কর কার্য সম্পাদন করি, তাহা জগৎসাধারণ কি জানিবে ? আমি এ সমস্ত ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া সকলের অসাধ্য কার্য সাধন করিতাম। আমার এই গুণের জন্যই সাহেব-বেগম আমার এরূপ সন্মান সহ্য করিতেন।

যখন দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া আমি তোমার সহিত আসিলাম, আমার স্বভাব কিছুমাত্র অন্তথা হইল না, দেওয়ানা হইয়া তোমার সহিত আসিলাম।

উদয়পুরের হুদে নৌকা করিয়া সন্ধ্যার সময় চন্দ্রালোকে বেড়াইতে বাইতে, স্মরণ হয় ? তোমাকে সর্বদাই চিন্তিত দেখিতাম, কিন্তু তুমি কি ভাবিতে, স্থির করিতে পারিতাম না। এক দিন আ নৌকার বসিয়া ছিলাম, তুমি আমার আশ্রিতক রাখিয়া শুইয়াছিলে ও চন্দ্রের দিকে দেখিতেছিলে, স্মরণ হয় ? আমি সমস্ত সন্ধ্যায় তোমার চন্দ্র-করোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া ছিলাম, তোমার কেশবিভাস করিয়া দিতেছিলাম। তোমার অঙ্গুলি লইয়া খেলা করিতেছিলাম। সহসা তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলে, ‘হেম ! আর কি তোমাকে এ জীবনে দেখিতে পাইব ?’ আমি বন্ধভাষা জানি না, কিন্তু এ কথা বুঝিলাম। আমার মনে সন্দেহ জাগ্রত হইল।

জীলোকের মনে একবার সন্দেহ উদয় হইলে তাহা শীঘ্র তিরোহিত হয় না। দিবাত্রি তোমার হেমের কথা জানিতে উৎসুক থাকিতাম, তোমার কাগজপত্র চুরি করিয়া পড়াইয়া লইতাম, কথার কথায় তোমার নিকট হইতে বীরনগরের সমস্ত কথা বাহির

করিয়া লইলাম । তখন তোমার হেমকে তোমার মন হইতে দূর করিয়া সেই স্থান অধিকার করিবার জন্ত আমার হৃদয় জলিতে লাগিল ।

তোমার হিন্দুধর্মে আস্থা দেখিয়া আমি একলিঙ্গ-মন্দিরের গৌরামৌদিগের নিকট আপনাদি ইষ্টলাভের জন্ত যাইলাম । প্রথম যাহার নিকট যাইলাম, তিনি পরম তেজস্বী ও ধার্মিক, আমার সমস্ত প্রস্তাব শুনিয়া আমাকে পদাঘাত করিয়া ঠাড়াইয়া দিলেন । এইরূপে তিন চারি জনের নিকট অবমানিত হইয়া অবশেষে সেই শৈলেশ্বরের নিকট যাইলাম । তিনি অনেক অর্থলোভে সন্মত হইলেন । আমি তৎক্ষণাৎ তিন শত মুদ্রার একটি হীরক-বলর তাঁহার হস্তে দিলাম, আর সহস্র মুদ্রার একটি মুক্তমালা তাঁহার সম্মুখে দোলাইয়া বলিলাম, “যদি ছলে বলে কৌশলে নরেন্দ্রকে হেমলতার চিন্তা ত্যাগ করাইতে পার, মুসলমানধর্ম অবলম্বন করাইতে পার, আমাকে গ্রহণ করাইতে পার, তবে এই মুক্তমালা তোমার গলায় স্বহস্তে পরাইয়া দিব ।”

এত অর্থ কোথায় পাইলাম, জিজ্ঞাসা করিবে । জেহান-আরার দাসদাসীরও অর্থের অভাব ছিল না । দেশের বড় বড় লোক সম্রাটের নিকট কোন আবেদন করিতে আসিলে বেগম-সাহেবকে উপঢৌকন না দিলে কোন কার্যই সম্পাদিত হইত না । কেহ একটি উচ্চ কক্ষের প্রার্থী, কেহ একটি বিষয়ের প্রার্থী, কেহ প্রজার উপর অত্যাচার করিয়াছেন, তাহার ক্ষমা চাছেন, কেহ পরের জায়গীর কাড়িয়া লইয়াছেন, তাহার একটি সনন্দপত্র চাছেন, কোন বোকা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছেন, তাহার ক্ষমাপ্রার্থী, কাহারও উপর সম্রাটের অস্ত্র

ক্রোধ হইয়াছে, সে ক্রোধ হইতে নিস্তার পাওয়া আবশ্যক,—সকলেই রাশি রাশি হীরা, মুক্তা ও অর্থ বেগম সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিয়া আপন আপন আবেদন জানাইতেন । বেগম সাহেবের দাসীরাও অর্থে বঞ্চিত হইত না ।

তাহার পর শৈলেশ্বর যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা তুমি জান । সে উপায় বিফল হইল, আমার আশা বিফল হইল । দুই দিন পর্তুগলুরে নিজে নারী-বেশে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, তুমি স্মর্য উন্নত ছিলে, দেখিয়াছিলে কি না, জানি না । প্রথম দিন তোমার পদ-তলে পড়িয়া রোদন করিয়াছিলাম, দ্বিতীয় দিবস তোমার প্রাণসংহারে উন্মত্ত হইয়াছিলাম । হস্ত হইতে খড়গ পড়িয়া গেল, তাতারের হস্ত হইতে খড়গ পড়িয়া যায়, কখনও জানিতাম না, আমি এরূপ ক্ষীণ, তাহা জানিতাম না ।

পরে তোমার সহিত পুনরায় আগ্রায় আসিলাম । অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, বঙ্গদেশ হইতে একজন ধনাঢ্য জমীদার আসিয়াছে, —তোমার হেমকে দেখিলাম । পাপিষ্ঠ ! পরস্পর তোমার হেম ! উঃ ! আর যাতনা সহ্য করিতে পারি না । মথুরার গোলোক-নাথের মন্দিরে তিন দিন পর এক প্রহর রাত্রির সময় যাইও, পরস্পরকে আবার দোখও ! তুমি আমাকে হস্তভাগিনী করিয়াছ, তোমাকেও হস্তভাগী করিব, সেই জন্ত এই সমাচার দিলাম ! সেই জন্ত আগ্রার দুর্গে লইয়া বাইরা হেমকে দেখাইয়াছিলাম !

আমার মৃত্যু সন্নিহিত, কিন্তু জিয়াংসা তাতারের ধর্ম, আমি স্বধর্ম তুলি নাই, আমার শোধিত শীতল হয় নাই ।

উঃ! আমার মস্তক ঘুরিতেছে।
যদি এ তৃষ্ণাক্ষকে দেহবারি দান করিতে,
তবে মুসলমানী অকৃতজ্ঞ হইত না, বত দিন
জীবন থাকিত—কিন্তু সে কবার আর কাজ
কি? নরেন্দ্র! এ জীবনের অন্ত বিদায়
দাও, যদি মৃত্যুর পর আর একবার দেখা হয়,
নিঃস্বর নরেন্দ্র! এই হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া
অন্তরের ভাব তোমাকে দেখাইব। নরেন্দ্র!
তখন তুমি আমাকে ভালবাসিবে,—নতুবা
এই ছুরিকা দ্বারা তোমার পাবাণ হৃদয় চূর্ণ
করিব।

উদ্ভাসিনী জেলেথা।”

পত্রপাঠ সমাপ্ত হইল। নরেন্দ্রের নয়ন
হইতে দুই এক বিন্দু অশ্রুবারি পড়িল।
তিনি নিম্নে চিন্তা করিতে করিতে গৃহ
হইতে বাহির হইলেন। রজনী প্রায় শেষ
হইয়াছে, সমস্ত নগর নিশুপ্ত। নরেন্দ্র পদ-
চারণ করিতে করিতে অনেক দূর বাইরা
পড়িলেন; দেখিলেন, সমুখে যমুনা।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নরেন্দ্র
প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, একরূপ সময়ে
দেখিলেন, যমুনা তীরে একস্থানে কতকগুলি
লোক সমবেত হইয়া একটি মৃতদেহ
জুড়িতে সন্নিবেশিত করিতেছে! জিজ্ঞাসা
করার সেই লোকের মধ্যে একজন উত্তর
দিল, “মৃত ব্যক্তি পূর্বে বেগমমহলে দাসী
ছিল। একজন কাকের সৈনিকের সহিত
ব্যক্তিচোরিণী হইয়া বাণির হইয়া যায়।
বোধ হয়, সে সৈনিক উহাকে এক্ষণে হত্যা
করিয়াছে, দাসীর বক্ষঃস্থলে এই তীক্ষ্ণ ছুরিকা
বসান দেখিলাম। হতভাগিনীর নাম
জেলেথা।”

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মথুরা ।

Allured bird as the become blaze allures
The bird of passage, till he madly strikes
Against it and beats out his weary life.

Tennyson.

সায়ংকালে শান্তপ্রবাহিনী যমুনাকূলে
মথুরা নগরী বড় সুন্দর দেখাইতেছিল।
সূর্য্য অনেকদূর অন্ত গিয়াছে, গগনে
নক্ষত্র এক একটি করিয়া প্রফুটিত হইতেছে,
যমুনার বিশাল বক্ষের উপর দিয়া সন্ধ্যার
বায়ু রহিয়া রহিয়া যাইতেছে, সমস্ত
জগৎ শীতল ও শান্ত। মথুরার প্রস্তর-
বিনির্মিত ঘাটশ্রেণী জল পর্য্যন্ত নামি-
য়াছে। বৃক্ষ ও কৃষ্ণবনের ভিতর দিয়া মথু-
রার গোলোকনীরথের মন্দির দেখা যাই-
তেছে।

ক্রমে রজনী অধিক হইল, হেমন্তকালের
চন্দ্রালোকে নদী, গ্রাম, বৃক্ষ ও মন্দির অতি
সুন্দর কান্তি ধারণ করিল। নীল গগনে
সুধাংশু যেন ধীরে ধীরে ভাসিতেছে। নদী-
বক্ষে দুই একখানি ক্ষুদ্রতরী ভাসমান রহি-
য়াছে। নদীর দুই পার্শ্বে নিবিড় কৃষ্ণ বৃক্ষ-
শ্রেণী নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; বোধ
হইতেছে যেন, চন্দ্রের সুধাবর্ষণে সমগ্র জগৎ
তৃপ্ত হইয়া সুখে নিমগ্ন রহিয়াছে।

সহসা নগরের মধ্যে সায়ংকালীন পূজা
আরম্ভ হইল, শত দেবালয় হইতে শব্দ-
ঘণ্টার নিনাদ শ্রুত হইতে লাগিল। সায়ং-
কালীন বায়ুহিল্লোলে সুদূরশ্রুত, সে নিনাদ
কি সুমধুর, কি মিষ্ট! সেই ঘণ্টারব ধীরে
ধীরে নদীর বক্ষে ও নগরের চতুর্দিকে বিস্তৃত
হইতে লাগিল, ধীরে ধীরে সেই নীল অনন্ত

নেশ গগনে উখিত হইতে লাগিল, উপাসক-দিগের মন যেন মুহূর্ত্তের জন্তও পৃথিবীর চিন্তা বিস্মরণ হইয়া সেই পবিত্র ঘণ্টারবের সহিত গগনের দিকে প্রাধান্য হইতে লাগিল ।

নদীকূলে একটি প্রস্তরবিনির্মিত সোপান শ্রেণীর উপরেই গোলোকনাথের মন্দির ; সেই দেবমন্দিরে আরতি হইতেছিল । বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও পূজক উচ্চৈঃস্বরে সায়ংকালীন গীত গাইতেছিল, অনেক যাত্রী সে পূজার উপস্থিত হইয়াছিল । যাত্রীদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকই অধিক, বহুদূর হইতে, বহু দেশ হইতে এই পুণ্যস্থানে সমবেত হইয়া অগ্নি মন্দির দর্শন করিয়া যেন জীবন চরিতার্থ করিল ।

আরতি শেষ হইল, যাত্রীগণ নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেল, কেবল দুই জন স্ত্রীলোক সেই মন্দির-পার্শ্বে একটি বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইয়া কথোপকথন করিতেছিল ।

হেমলতা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, “দিদি, মুসলমানী বলিয়াছিল, আজ এই মন্দিরে একপ্রহর রাত্রির সময় নরেনের সঙ্গে দেখা হইবে, কৈ, তাহা হইল না ?”

শৈবলিনী অতিশয় বুদ্ধিমতী, হেমের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিল যে, যদিও হেম হাসিতে হাসিতে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিল, তথাপি হেমের হৃদয় যথার্থই উদ্বেগে পরিপূর্ণ । সেই আশার হেমের হৃদয় আজি সজোরে আঘাত করিতেছে, হেমের শরীর এক একবার অল্প অল্প কম্পিত হইতেছে ।

শৈবলিনী মনে মনে ভাবিল, “আজি না জানি কি কপালে আছে, হেম বালিকামাত্র, নরেন্দ্রকে দেখিলে আবার পূর্ব্বকথা মনে পড়িবে, সে অসহ্য ব্যতনা বালিকা কি সহ্য করিতে পারিবে ?” প্রকাশে বলিল, “সে

পাগলিনীর কথাই কি বিশ্বাস করে ? নরেন্দ্র কোথায় কোন্ দেশে আছে, তাহার সহিত মথুরায় দেখা হইবার আশা করিতেছ ?”

হেমলতা । কিন্তু দিদি, জেলেখার অস্ত্র কথাগুলি ঠিক হইয়াছিল ।

শৈবলিনী । ঐ প্রকারে উহার মিত্যা আশা জন্মায়, দুটা সত্য কথা বলে, একটা মিথ্যা কথা বলে । কৈ, আমাদের দাদী আসিল না ? আমি যে পথ ঠিক চিনি না, না হইলে আমরা দুই জনেই বাড়ী বাইতাম ।

হেম । দেখ দিদি, আমার বোধ হইতেছে যেন, এই আমাদের বীরনগর, যেন এই গঙ্গা । আর বালাকালে চন্দ্রালোকে গঙ্গা-তীরে খেলা করিতাম, তোমার সহিত খেলা করিতাম আর,—আর,—আর, সকলের সহিত খেলা করিতাম, সেই কথা মনে পড়িতেছে ।

শৈবলিনীর মুখ আরও গম্ভীর হইল, দাদীর আসিতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া শৈবলিনী বৎপরোনাস্তি উৎসুক হইল । হেম তাহা লক্ষ্য না করিয়া আবার বলিতে লাগিল, “দেখ দিদি, ঐ নৌকাখনি কেমন তীরের মত আসিতেছে ! উঃ ! মাকীরা কি জোরে পাড় বাহিতেছে ! উঃ ! যেন উড়িয়া আসিতেছে ।”

শৈবলিনী সেই দিকে দেখিল ; তাহার ভয় ভগ্ন হইল । শৈবলিনী বাহা ভয় করিতেছিল, তাহাই হইল, নৌকা ঘাট হইতে চারি হস্ত দূরে থাকিতে থাকিতে একজন সৈনিক লক্ষ্য দিয়া ঘাটে পড়িল,—সৈনিক নরেন্দ্রনাথ !

হেম বৃক্ষের ছায়ায় ছিল, নরেন তাহাকে না দেখিতে পাইয়া মন্দিরের ভিতর বাইলেন । কিন্তু হেম নরেনকে দেখিয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তে যেন শরীরের সমস্ত রক্ত হেমের

মুখমণ্ডল দুই হইল; চক্ষু, কর্ণ, ললাট, ওষ্ঠ
একেবারে রক্তবর্ণ হইয়া গেল। পরমুহুর্তে
সমস্ত মুখমণ্ডল পাত্তবর্ণ হইল, শরীর কাঁপিতে
লাগিল, ললাট হইতে বোঝাবিন্দু বহির্গত
হইতে লাগিল।

শৈবলিনী শব্দে হেমকে ধরিল। হেম
কিঞ্চিৎ আরোগ্যলাভ করিলেন। শৈবলিনী
গভীরস্বরে বলিল, “হেম, আমি তোমাকে
ভগিনী অপেক্ষা ভালবাসি। আমি বলিতেছি,
আজ নরেনের সহিত দেখা করিও না, বাড়ী
চল। তুমি আমাকে ভগিনী অপেক্ষা ভাল-
বাস, আমার এই কথাটি শুন, বাড়ী চল।
তুমি বালিকা, আপনার মন জান না, নরেন-
নের সহিত অজ্ঞ তোমার কথোপকথন
হইলে কি বিপদ ঘটবে, ভগবান্ জানেন।”

হেমলতা মুখ নত করিয়া এই কথা
শুনিল, অনেককণ তুমির দিকে দৃষ্টি
করিতে লাগিল, নয়ন হইতে দুই এক বিন্দু
স্বচ্ছ অশ্রু বহির্গত হইল। আবার ধীরে ধীরে মুখখানি তুলিল। তখন
উদ্বেগের লেশমাত্র চিহ্ন নাই; হেমের মুখ-
খানি শান্ত, নির্মল, স্থির; নয়নে কেবল
একবিন্দু অশ্রুজল।

হেম শৈবলিনীর দিকে চাহিয়া বলিল,
“দিদি, তুমি আমার প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়,
তুমি আমাকে অবিখ্যাস করিও না। দিনে
দিনে, মাসে মাসে, তুমি আমাকে কত ধর্ম-
উপদেশ দিয়াছ, আমি তাহা ভুলি নাই।
দিদি, আমি অবিখ্যাসিনী নহি। আজি
এইমাত্র দেবপূজা সাধ করিলাম, এই পুণ্য-
তুমিতে দাঁড়াইয়া এই পুণ্য দেবমন্দিরে
আমি অবিখ্যাসিনী হইব না। যিনি আমার
প্রধান দেবতা, যে দেবতুল্য আমি আমাকে
ভালবাসেন, আমার জীবনের যিনি সর্বস্বদান,
জীবন থাকিতে এ দাসী তাঁহার অবিখ্যাসিনী

হইবে না। দিদি, আমাকে সন্দেহ করিও
না, আমাকে মন্দ ভাবিও না, তুমি আমাকে
মন্দ ভাবিলে এ সংসারে অভাগিনীকে কে
ভালবাসিবে?”

হেমলতার নয়ন হইতে ঝর ঝর করিয়া
জল পড়িয়া সমস্ত মুখমণ্ডল সিদ্ধ হইতেছিল।

তখন শৈবলিনীর মন শান্ত হইল, শৈব-
লিনীর চক্ষুতে জল আসিল। শৈবলিনী
সম্মুখে হেমের চক্ষু মুছাইয়া বলিল, “হেম,
আমাকে ক্ষমা কর। তুমি ধর্মপরায়ণা, তুমি
পতিব্রতা, আমি যে মুহুর্তের জন্তও তোমাকে
সন্দেহ করিয়াছিলাম, সে জন্ত ক্ষমা
কর।”

হেম। দিদি, তুমি ক্ষমা চাহিও না,
তোমার দয়া, তোমার ভালবাসা, তোমার
ঋণ আমি ইহজন্মে পরিশোধ করিতে পারিব
না। জন্মে জন্মে যেন তোমার ভগিনী হই,
আর আমার কিছু প্রার্থনা নাই।

আবার দুইজনে দুইজনকে ধরিয়া ক্রমশঃ
নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, দুইজনের চক্ষু দিয়া
পড়িতেছিল। পরে শৈবলিনী
“রাজি হইয়াছ, বাও, নরেন্দ্রের সহিত দেখা
করিয়া আইস।”

শৈবলিনী সেই বৃক্ষতলে অপেক্ষা করিতে
লাগিল, হেমলতা মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিল।
হেমলতার এক্ষণে উদ্বেগ নাই, ধীরে ধীরে
নরেন্দ্রের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল ও নম্র-
ভাবে শ্রুতিকার দিকে চাহিয়া রহিল।

এতদিনের পর হৃদয়ের হেমকে পাইয়া
নরেন্দ্রের হৃদয় উদ্বেগপূর্ণ হইল। নরেন
কথা কহিতে পারিলেন না, কেবল মাত্র
হেমের হাত ধরিয়া পিপাসিতের তায় সেই
অমৃতমাধা মুখখানি দেখিতে লাগিলেন,
শরীর কাঁপিতে লাগিল, নয়ন হইতে ঝর ঝর
করিয়া জল পড়িতে লাগিল। হেম আর সখ

করিতে পারিল না, মস্তক নত করিয়া রহিল।
তাহার নয়ন ছল ছল করিতেছিল।

অনেককণ পর হেমলতা নরেন্দ্রের দিকে
স্থিরদৃষ্টি করিয়া বলিল, “নরেন্দ্র !”

নরেন্দ্র দেখিলেন, হেমের মুখে আর
উষেগের চিহ্ন নাই, লজ্জার চিহ্ন নাই, মুখ-
মণ্ডল নির্মল ও পরিষ্কার। ধীরে ধীরে হেম-
লতা বলিল, “নরেন্দ্র !”

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

—•—

মাধবীকরণ যমুনার বিসর্জন ।

So she strove against her weakness,
Thought at times her spirit sank
Shaped her heart with woman's meekness
To all duties of her rank.

Tennyson.

দেবালয়ের সমস্ত লীপ তখন নির্মাণ হই-
য়াছে ও সমস্ত লোক সুপ্ত অথবা চলিয়া
গিয়াছে। স্তম্ভ ও প্রকোষ্ঠের উপর সুন্দর
চন্দ্রালোক পতিত হইয়াছে ও সারি সারি
স্তম্ভছায়া ভূমিতে পতিত হইয়াছে। পার্শ্বে
বিশাল যমুনানদী চন্দ্রকরে নিস্তব্ধে বহিয়া
যাইতেছে ও রহিয়া রহিয়া সীতল যমুনার
বায়ু মন্দিরের ভিতর দিয়া গাইয়া যাইতেছে।
সেই সুস্বপ্ন রজনীতে পবিত্র মন্দিরের একটি
স্তম্ভছায়াতে নিস্তব্ধ নরেন্দ্র ও হেম দাঁড়াইয়া
রহিয়াছে।

হেম স্থিরভাবে বলিল, “নরেন্দ্র ! অনেক
দিন পর আমাদের দেখা হইয়াছে, আমার
বোধ হয়, অনেক দিন দেখা হইবে না,
আইস, আমাদের মনের যা কথা, তাহাই কহি।
নরেন্দ্র ! বাল্যকালে আমরা দুইজনে গঙ্গা-
তীরে খেলা করিতাম, কত স্বপ্ন দেখিতাম।
একধে ভূমি সৈনিকের ব্রতে ব্রতী হইয়াছ,
আমি পরের স্ত্রী। নরেন্দ্র, বাল্যকালের
স্বপ্ন একেবারে বিস্মৃত হও।”

হেমলতা কণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল,
আবার বলিল, “বিধাতা যদি অতীত
ভেদ, তবে আমাদের জীবন অতীত
বাল্যকালের স্বপ্ন সকল হইয়াছে কিন্তু নরেন্দ্র,
আমরা যেন ভ্রমেও বিধাতার নিশা না করি।
যিনি তোমাকে পরাক্রম দিয়াছেন, বশ
দিয়াছেন, তাহার নাম লও, অবশ্য তোমাকে
সুখী করিবেন। যিনি আমাকে এই সংসারে
স্থান দিয়াছেন, দেবভূলা স্বামী দিয়াছেন,
শৈবলিনীর স্তায় নন্দিনী দিয়াছেন, ধন ঐশ্বর্য্য
দিয়াছেন, তিনি দয়ার সাগর, তাহাকে আমি
প্রণাম করি।”

হেমলতা গলায় বস্ত্র দিয়া করবোড়ে
বিশ্বের আদিপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া প্রণাম
করিল। তাহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল, পবিত্র,
শান্তি-রসে পরিপূর্ণ।

নরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া হেমলতার মুখের
দিকে চাহিল, তাহার বাক্যসুগন্ধি হইল না।
হেমলতা আবার বলিতে লাগিল, “নরেন্দ্র,
আমি শুনিয়াছি, তুমি অনেক যুদ্ধ করিয়াছ,
অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছ, সকল দেশেই
সুখ্যাতি লাভ করিয়াছ। তুমি পুণ্যাত্মা,
জগদীশ্বর তোমাকে স্নেহে রাখুন। কিন্তু
যদি যুদ্ধে শ্রাস্ত হইয়া বিশ্রাম আকাশ্জ্ঞা কর,
যদি বিপদ বা দারিদ্র্যে পতিত হও, আবার
বীর্য্যনগরে বাইও, তুমি বাইলে সকলেই
আশ্চর্য্যাদিত হইবে। আমার স্বামীর স্বয়ং
আমি জান, তিনি তোমাকে কনিষ্ঠের স্তায়
ভালবাসেন, সর্বদাই স্নেহে তোমার কথা
কহেন, তুমি বাইলেই তিনি অতিশয় আশ্চর্য্য-
দিত হইবেন।”

নরেন্দ্র নিস্তব্ধ হইয়া ছিল; হেমের কথা-
গুলি তাহার কর্ণে অপূর্ণ সঙ্গীতধ্বনির স্তায়
বোধ হইতেছিল। তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ,
তাহার নয়ন দুটিও পরিপূর্ণ।

হেম আবার বলিতে লাগিল, “আর তুমি হাইলে শৈবলিনীও কত আহ্লাদিত হইবেন। আবার হেমলতা বত দিন জীবিত থাকিবে, কনিষ্ঠা ভগিনীর স্তায় তোমার সেবা-তত্ত্বা করিবে। ভাই নরেন। আমি তোমাকে যখন দেখিব, তখনই আহ্লাদিত হইব।”

এই ব্রহ্মবাক্য শুনিয়া নরেন্দ্রের চক্ষুতে আবার জল আসিল; আবার দুই জনে অনেকক্ষণ নিমন্ত হইয়া রহিল।

শেষে হেম দ্বৈত গভীরস্থরে বলিল, “নরেন্দ্র, আর একটি কথা আছে, কিছু মনে করিও না, আমার দোষ গ্রহণ করিও না। নরেন্দ্র, আমাদের বিদায়কালে প্রণয়চিহ্নরূপ আমাকে একটি দ্রব্য দিয়াছিল, সেটি এখন পরিধান করিতে আমি অধিকারিণী নহি। নরেন্দ্র, সেটি ফিরাইয়া লও।”

হেমলতা আপন হস্তের বস্ত্র তুলিয়া লইল, নরেন্দ্র দেখিল, যে মাধবীকঙ্কণ নরেন দিয়াছিল, তাহা এখনও রহিয়াছে। লতা শুক হইয়া ঋণ ঋণ হইয়া গিয়াছিল, হেমলতা সেই অসংখ্য ঋণকে একে একে স্মৃতির দ্বারা গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছিল, অতঃপর তাহাই পরিধান করিয়া আসিয়াছে।

উভয়ের পূর্বকথা মনে আসিতে লাগিল, উভয়ের হৃদয় বিবাদজ্বালায় আচ্ছন্ন হইল, উভয়ে অনেকক্ষণ নিমন্ত হইয়া রহিল। নরেন্দ্র হেমলতার সেই সুন্দর বাহ ও সেই মাধবীকঙ্কণ দেখিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহার নয়ন জলে পরিপূর্ণ হইল, আর দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে দর-বিগলিত-ধারার অশ্রুবারি পড়িয়া হেমলতার হস্ত ও বাহ সিক্ত করিল। অবশেষে নরেন্দ্র একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, “হেম, তবে কি জন্মের মত আমাকে বিদ্বত হইবে?”

হেম বলিল, “জীবিত থাকিতে তোমাকে বিদ্বত হইব না; চিরকাল সচেষ্টতার স্তায় তোমার কথা ভাবিব। কিন্তু এই কঙ্কণ অল্প প্রণয়ের চিহ্নরূপ আমাকে দিয়াছিল, নরেন্দ্র, আমি প্রণয়ের অধিকারিণী নহি। নরেন্দ্র, মনে রোশবোধ করিও না, আমি এই কয় বৎসর এ কঙ্কণটি পূজা করিয়াছি, হৃদয়ে রাখিয়াছি, উহা ত্যাগ করিতে আমার বত কষ্ট হইতেছে, তাহা তুমি জান না। কিন্তু উটি উন্মোচন কর, উহাতে আমার অধিকার নাই। নরেন্দ্র, আমি অবিখ্যাসিনী পত্নী নহি।”

নরেন্দ্র আর কোন কথা কহিলেন না, নিঃশব্দে হেমলতার হস্ত হইতে সেই কঙ্কণ খুলিয়া লইলেন।

তখন হেমলতা বলিল, “নরেন্দ্র! আমি চলিলাম, তুমি ধর্মপরায়ণ, বালাকাল হইতেই তোমার ধর্মে আস্থা আছে, সে ধর্ম কখনও বিদ্বত হইও না, জগদীশ্বর তোমাকে সুখে রাখিবেন। তিনি যাহাকে বাহা করিয়াছেন, যেন আমরা সেইরূপ থাকি। এই চেষ্টা করি।” পুষ্পটি দুই এক দিন গন্ধ বিস্তার করিয়া শুক হইয়া যার, পক্ষীটি আলোকে প্রফুল্ল হইয়া গান করে, তাহাদের সেই কার্য। নরেন্দ্র, তুমি বীরপুরুষ, শত্রুকে জয় কর, দেশের মঙ্গল কর, পদাশ্রিত স্বর্ণের প্রতি দয়া করিও। আর ভগবান্ আমাকে দেবত্বা স্বামী দিয়াছেন, তিনি সহায় হউন, সেই স্বামীর সেবার যেন কখনও ক্ষতি না করি, সেই স্বামীতে যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে, আমি যেন তাঁহারই চিরপতিব্রতা দাসী হইয়া থাকি। নরেন্দ্র! ভাই নরেন! বালাকালে তুমি আমাকে ধর্ম-শিক্ষা দিয়াছিলে। এই পবিত্র দেবমন্দিরে আবার সেই শিক্ষা দাও। এস ভাই, আমরা

প্রতিশ্রুত হই, যখন কখন ভাগ করিব না, আমি জন্মে মরণে চিরপতিব্রতা হইয়া থাকিব।" কথা সাক্ষ করিয়া হেমলতা দেব-প্রতিশ্রুতির সম্মুখে প্রণত হইল, নরেন্দ্র নিঃশব্দে প্রণত হইলেন।

উষ্ণীয়া আবার সম্বন্ধে নরেন্দ্রের হাত ধরিয়া হেমলতা বলিল, "তাই নরেন, এক্ষণে রাত্রি অধিক হইয়াছে, বিদায় নাও, আমি চিরকাল তোমাকে কোঠপ্রান্তার দ্বার ভালবাসিব, তুমিও তোমার কনিষ্ঠ ভগিনীকে মনে রাখিও।"

একবিন্দু জল নয়ন হইতে মোচন করিয়া হেমলতা ধীরে ধীরে মন্দির হইতে নিজ্ঞান্স হইল। বতকণ দেখা যায়ল, নরেন্দ্র হেমের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর? তাহার পর এ জগতের মধ্যে নিতান্ত দূর্ভাগা লোকও নরেন্দ্রের সেরজনীর শোক ও বিবাদ দেখিলে বিষন্ন হইত। অভাগার হৃদয় আজ শূন্য হইল, অভাগার প্রণয়-ইতিহাস আজ সমাপ্ত হইল।

মাধবকঙ্কণটি হৃদয়ে ধারণ করিয়া নরেন্দ্র যমুনাতীরে বসিয়াছিলেন। হেমলতার কথাগুলি তাঁহার মনে বার বার উদয় হইতে লাগিল,—“উটি উন্মোচন কর, উহাতে আমার অধিকার নাই, নরেন্দ্র, আমি অবিখ্যাসিনী পত্নী নহি।” নরেন্দ্রের কি সে প্রণয়-নিদর্শনটি রাখিবার অধিকার আছে? সমস্ত রজনী নরেন্দ্র সেটি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিলেন, প্রাতঃকালে শূন্য-হৃদয়ে সেটি বিসর্জন দিলেন, যমুনার জলে ভাসিতে ভাসিতে শুক কঙ্কণটি অদৃশ্য হইয়া গেল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রয়াগের যুদ্ধ।

Suddenly, as if arrested by fear or feeling of wonder, Stile she stood, with her colorless lips. art while a shudder Ram through her frame * * * Sweet was te light of his eyes ; but it suddenly sank into darkness. As when a lamp is blown ou by a gust of wind casemet. Longfellow.

আমাদের আখ্যায়িকা শেষ হইল, কেবল আখ্যায়িকার নায়ক-নাট্যিকাদিগের সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে বাকী আছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শাস্ত্রজ্ঞা বঙ্গদেশ হইতে দ্বিতীয়বার যুদ্ধার্থে আগমন করিতে-ছিলেন। শীতকালে প্রয়াগের নিকট সূজাও আরংজীবের মধ্যে মহাযুদ্ধ হয়। দুই দিনের যুদ্ধের পর সূজা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। যশোবন্ত সিং এই যুদ্ধে আরংজীবের বিরুদ্ধাচরণ করিতে স্বেচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই ভীষণ বুদ্ধি মহাযোদ্ধার অধিক ক্ষতি করিতে পারিলেন না, কোড়ে রাজহানে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

সূজা প্রয়াগ হইতে পাটনা, পাটনা হইতে মুন্সের, মুন্সের হইতে রাজমহল এবং তথা হইতে গঙ্গা পার হইয়া তগুর পলায়ন করিলেন। আরংজীবের পুত্র মহম্মদ এবং সেনাপতি আমির জুমলা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিলেন। তগুর রাজপুত্র মহম্মদ, সূজার কন্যাকে বিবাহ করিয়া সূজার পক্ষ-বলধন করিলেন; কিন্তু উভয়েই আমির জুমলার নিকট পরাস্ত হইলেন। তৎপরে মহম্মদ পিতার কণ্ঠপদ্মে বিশ্বাস করিয়া

শ্রীশঙ্কর গোস্বামী

সদ্যক স্বাক্ষর পক্ষ ত্যাগ করিলেন, অভাগা স্ত্রী আত্মকানে পলায়ন করিলেন। তৎকাল রাজার সহিত বিরোধ হওয়ার স্ত্রী সৈন্তে হত হইলেন, তাঁহার কন্যাকে রাজা বিবাহ করিলেন। কথিত আছে, স্বাক্ষর রূপবতী সহধর্মিণী পারীবাহু বিবাহে আশ্ব-হত্যা করিলেন। যিনি বিংশতি বৎসর বঙ্গ-দেশ শাসন করিয়াছিলেন, যিনি বুদ্ধে সাহস, শাসনে দয়া ও হিন্দুদিগের প্রতি বদান্ততার জন্য খ্যাত হইয়াছিলেন, ষাঁহার রাজমহলের প্রাসাদ মধ্যে ইন্দ্রপুরী ছিল ও দিবারাত্র আনন্দলহরীতে ভাসিত, তিনি মৃত্যুকালে মস্তক রাখিবার স্থান পাইলেন না, বিদেশে শত্রুহস্তে সবংশে বিনষ্ট হইলেন।

দারী শ্রামনগর অথবা কতে-আবাদের বুদ্ধে পরাজয়ের পর সিদ্ধদেশে পলায়ন করিয়াছিলেন, আরংজীবের সৈন্ত তথা হইতে দারাকে দিল্লী লইয়া আইসে। নৃশংস সম্রাট জ্যেষ্ঠকে বথেষ্ট অপমান করিয়া পরে হত্যা করেন। কারারুদ্ধ মোরাদও অচিরে রাজাজ্ঞার হত হইলেন। ত্রাতুরক্ত স্নাত হইয়া আরংজীব ভারতবর্ষের রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

যে দিন মথুরায় হেমের সহিত নরেন্দ্রের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার পর নরেন্দ্র নিরু-দ্দেশ হইলেন। হেমলতা বঙ্গদেশে প্রত্যা-বর্তন করিয়া নরেন্দ্রের অনেক অশ্রুসন্ধান করাইলেন, মহামুভব শ্রীশঙ্কর দেশে দেশে সংবাদ পাঠাইলেন যে, নরেন্দ্র ফিরিয়া আসিলেই তাঁহাকে তাঁহার পৈতৃক জমী-দারীর অর্ধেক অংশ ছাড়িয়া দিবেন; কিন্তু সেই দিনের পর নরেন্দ্রকে আর কেহ দেখিতে পাইল না।

হেমলতা বীরনগরে শ্রীশঙ্করের সহিত বাস করিতে লাগিলেন, মথুরা-মন্দিরে যে

অস্বীকার করিয়াছিলেন, হেম তাঁহা বিশ্বত হন নাই, পতিসেবার ধর্মপরায়ণা হেমের অস্ত চিন্তা তিরোহিত হইল, পতিভক্তি ভিন্ন অস্ত ধর্ম তিনি জানিতেন না। ক্রমে শ্রীশঙ্করের ঔরসে তাঁহার হেমন্তকুমারী ও সরযুবালা নামক দুইটি কন্যা ও প্রতাপ নামক একটি পুত্র জন্মিল। বিংশতি বৎসর পূর্বে শ্রীশ, নরেন্দ্র ও হেমলতা যেরূপ সায়ংকালে গঙ্গাতীরে থেলা করিত, বাশ্পোৎফুল্ললোচনে হেমলতা দেখিলেন, তাঁহার পুত্র ভাগ্য সেই স্থানে সেইরূপে থেলা করিতেছে, দৌড়া-দৌড়ি করিতেছে, আনন্দধ্বনিতে চারি-দিকের বৃক্ষবন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সংসারের এই গতি, একদল ইতেছে, অস্তদল আসিতেছে। শিশুটি ললাট পরিষ্কার, নয়ন উজ্জ্বল, মুখমণ্ডল শাস্ত, এখনও মানব-জীবনের চিন্তায় স্বর্গা-বরব অক্লিত হয় নাই।

হেমলতার বিবাহের প্রায় দশ বৎসর পর হেমলতা পুত্রকন্যাগুলিকে লইয়া একটি সম্রাসীর আবাস দেখিতে গেলেন। বীরনগর হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে একটি সন্দ শিমূলবৃক্ষ ছিল। শিমূল বৃক্ষের ওড়ি হইতে প্রায় তিনদিকে তিনটি দেওয়ালের মত পাট বাহির হয়, এই বৃক্ষের পাটগুলি এত বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, দেখিলে বোধ হয় যেন, একটি উন্নত ঘর হইয়াছে। সেই অপক্লপ ঘরে একজন সম্রাসী কয়েক বৎসর অবধি বাস করিতেছিলেন। পল্লীগামস্থ গৃহিণী ও বালিকাগণ সম্মুখে সেই সম্রাসীকে প্রত্যহ চন্দ্র ও ফলমূল আনিয়া দিত তাহাতেই তিনি জীবন ধারণ করিতেন। সমস্ত দিন প্রায় ধ্যানে রত থাকিতেন, সায়ংকালে সেই গ্রামের ভিতর গৃহে গৃহে ঘাইতেন, শোক-বিদগ্ধকে সাহসনা করা, পীড়িতকে শুশ্রূষা

করা, দুর্বলকে সাহায্য করা, মানবের কষ্ট নিবারণ করা তাঁহার জীবনের কার্য। গভীর রজনী পর্যন্ত এই কার্য করিয়া আবার তিনি সেই তরুণকে ফিরিয়া আসিতেন, তথায় বাসের উপর কি শীত, কি গ্রাম, কি বর্ষা, সকল কালেই তিনি সমভাবে নিদ্রা বাইতেন। সেই তরুণ ও সেই সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য অনেক দেশ হইতে অনেক লোক আসিত।

হেমলতা বৃক্ষের কিকিদ্ধুরে নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন, ধীরে ধীরে পদ-ব্রজে তরুর নিকট বাইয়া সন্ন্যাসীকে উপলক্ষ্য করিয়া একটি প্রণাম করিলেন; পরে আপন শিশু পুত্রটিকে কোড়ে লইয়া দণ্ডায়মান হইয়া সেই সন্ন্যাসীর দিকে দেখিতে লাগিলেন। সে দিক হইতে আর নরন ফিরাইতে পারিলেন না, নিম্পন্দভাবে দেখিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসীও হেমলতার দিকে দৃষ্টিতে

চাহিতেছিলেন, তিনি দীর্ঘ-মরনে হেমলতাকে প্রণাম করিতে দেখিলেন, সত্বক-নয়নে হেমলতার কমনীয় কষ্ঠা-পুস্ত্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বোধ হইল যেন, দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসীর স্নায় একবার আলোড়িত হইল, বোধ হইল, চক্ষু একবিন্দু জলে আবৃত হইল; অবশেষে সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে হেমের নিকটে আসিয়া শিশুদিগের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন; পরে হেমলতার দিকে দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া বলিলেন, “আমি আশীর্বাদ করিতেছি, তোমার দেবতুল্য স্বামীতে যেন তোমার অচলা ভক্তি থাকে, অগ্নে মরণে যেন চির-পতিব্রতা হইয়া থাক।”

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। তাহার পর আর কেহ সে তরুণকে সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইল না, সন্ন্যাসী যে সে গ্রাম হইতে কোথায় চলিয়া গেলেন, কেহ আর জানিতে পারিল না।

উপহার।



বিজ্ঞানোৎসাহী, সংযতমনা, উদারচরিত্র,

কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দত্ত।

প্রিয় ভ্রাতঃ!

ইউরোপ হইতে তুমি যে নানা ভাষা ও নানা বিজ্ঞা আহরণ করিয়া আসিয়াছ, তাহা যখন চিন্তা করি, তখনই আনন্দিত হই। কিন্তু তুমি ইহা অপেক্ষাও অমূল্য রত্নের অধিকারী! সে রত্ন, নির্মল উদারচরিত্র, মনঃসংযমে অসাধারণ ক্ষমতা, বিজ্ঞানচর্চার আনন্দনীর উৎসাহ ও জীবনব্যাপী চেষ্টা।

এই অসাধারণ সঙ্গুণ-সমূহ দ্বারা স্বদেশের মঙ্গলসাধন কর, ভ্রাতার এই মঙ্গলোচ্ছাস। ভ্রাতার জীবনব্যাপী স্নেহের সামান্য নিদর্শনস্বরূপ এই পুস্তকখানি তোমাকে অর্পণ করিতেছি।

দক্ষিণ শাহবাজপুর,

১২৮৪ বঙ্গাব্দ।

তোমার চিরস্নেহাভিলাষী
শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

মহারাক্ষ জীবন-প্রভাত ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

জীবন-উষা ।

দেও করতালি, অব অব বসি,

করিয়া অজ্ঞানি কুহুম সহ ।

ঐ যে এটিতে, হাসিতে হাসিতে

উদয় অরুণ উষার সহ ।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে মহম্মদ বোরী আর্ঘ্যাবর্ত-প্রদেশ জয় করেন । সেই বিপুল ও সমৃদ্ধিশালী রাজ্য অধিকার করিয়া মুসলমানেরা এক শতাব্দী ক্ষান্ত থাকিল, বিক্ষাচল ও নর্মদারূপ বিশাল প্রাচীর ও পরিখা পার হইয়া দাক্ষিণাত্য জয় করিবার কোন উত্তম করে নাই । অবশেষে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে দিল্লীর মুবরাজ আলা-উদ্দীন খিলজী অষ্ট সহস্র অশ্বারোহী সেনার সহিত নর্মদানদী পার হইলেন এবং সহসা হিন্দুরাজধানী দেবগড়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । দেবগড়ের রাজপুত্র বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আলা-উদ্দীনকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তুমুল সংগ্রামে হিন্দুসেনা পরাস্ত হইল এবং হিন্দুরাজ বহু অর্থ ও ইলিশপুর প্রদেশ প্রদান করিয়া সন্ধি ক্রয় করিলেন । পরে আলা-উদ্দীন দিল্লীর সম্রাট হইলে তাঁহার সেনাপতি মালীক কাফুর তিনবার দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিয়া নর্মদাতীর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত ও ব্যতি-

বাস্ত করেন । দেবগড় প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজ্য দিল্লীর মুসলমান-সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিল ।

চতুর্দশ শতাব্দীতে মহম্মদ টোগলক দিল্লীর সম্রাট হইয়া রাজধানী দিল্লী হইতে দেবগড়ে আনিবার প্রয়াস করেন এবং দেবগড়ের নাম পরিবর্তন করিয়া দৌলতাবাদ রাখিলেন । কিন্তু দক্ষিণের হিন্দু ও মুসলমান সকলে বিরক্ত হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল । হিন্দুগণ বিজয়নগরে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া, একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিল এবং মুসলমানগণ দৌলতাবাদে একটি স্বতন্ত্র মুসলমান-রাজ্য স্থাপন করিল । কালক্রমে বিজয়নগর ও দৌলতাবাদ দাক্ষিণাত্যের মধ্যে দুইটি প্রধান রাজ্য হইয়া উঠিল । প্রায় তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত দিল্লীর সম্রাটগণ দাক্ষিণাত্য হস্তগত করিবার আর কোন চেষ্টা করেন নাই ।

কিন্তু দিল্লীর উপদ্রব হইতে নিস্তার পাইলেও দক্ষিণে হিন্দুসাম্রাজ্য বিপদমুগ্ধ ছিল না । হিন্দুগণ গৃহের মধ্যে দৌলতাবাদস্বরূপ মুসলমানরাজ্যকে স্থান দিয়াছিল । সে সময়ে হিন্দুদিগের জাতীয়

ঢাল; পরিচয় ও উকীষ রাজহানসেনীর।
অখারোহীর বয়সের অন্তিমবর্ষ হইবে,
অবসর উন্নত ও পৌরবর্ষ; কিন্তু পরিচয় ও
মৌলোত্তাপে এই বয়সেই তাঁহার মুখমণ্ড-
লের উজ্জ্বল বর্ণ কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ হইয়াছে। শরীর
শুষ্ক ও দৃঢ়ীকৃত, ললাট উন্নত, চক্ষুর
জ্যোতিঃপূর্ণ। মুখমণ্ডল উদারব্যাক্তক ও
অতিশয় তেজঃপূর্ণ। যুবক অথকে অন্ন বিশ্রাম
দিবার ক্ষমতা দিয়া ভূমিতে অবতীর্ণ হই-
লেন, বরা বৃক্ষোপরি নিক্ষেপ করিলেন, বর্ষা
বৃক্ষাখার হেলাইয়া রাখিলেন ও হস্ত দ্বারা
ললাটের বর্ষ মোচন করিয়া নিবিড় কৃষ্ণ
কেশজঙ্ঘ পক্ষাঙ্কিত সরাইয়া কণেক আকা-
শের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

আকাশের আকৃতি অতি ভয়ানক,
অচিরে তুমুল বাত্যা আসিবে, তাহার সংশয়
নাই। যদ্যপি বায়ু বহিতে আরম্ভ হই-
তেছে এবং অনন্তপর্কত ও পাদপশ্চৈী
হইতে গভীর শব্দ উদ্ভিত হইতেছে। দুই
একটি স্তিমিত মেঘগর্জন শুনা যাইতেছে
এবং যুবকের শুষ্ক ওষ্ঠে দুই এক বিন্দু বৃষ্টিজল
পতিত হইল। এখন যাইবার সময় নহে,
আকাশ পরিষ্কার হওয়া পর্য্যন্ত কোথাও
অপেক্ষা করা উচিত, কিন্তু যুবকের চিন্তা
করিবার সময় ছিল না। তিনি যে কার্যো
আসিয়াছিলেন, তাহাতে বিলম্ব সহ্য না,
তিনি যে প্রভুর কার্য্য করিতেছেন, তিনি
কোন আপত্তি শুনে নাই, যুবকেরও বিলম্ব
বা আপত্তি করার অভ্যাস নাই, পুনরায়
বর্ষা হস্তে লইয়া লক্ষ দিয়া তিনি অশ্বপৃষ্ঠে
উঠিলেন, আর এক মুহূর্ত্ত আকাশের দিকে
নিরীক্ষণ করিলেন, পরে পুনরায় বেগে অশ্ব-
চালন করিয়া সেই নিঃশব্দ পর্কতপ্রদেশের
শ্রুত প্রতিধ্বনি জাগরিত করিয়া চলিলেন।

অলক্ষণমধ্যেই ভয়ানক বাত্যা আরম্ভ

হইল। আকাশের এক প্রান্ত হইতে অল্প
প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুন্মতা চমকিত হইল। মেঘের
গর্জনে সেই অনন্ত পর্কত-প্রদেশ যেন শত-
বার শব্দিত হইল। অচিরে কোটি-রাক্ষস-
বল বিক্ষুব্ধ করিয়া ভীষণ-গর্জনের পবন প্রবা-
হিত হইয়া যেন সেই অনন্ত পর্কতকেও
সমূলে আলোড়িত করিতে লাগিল। শত
পর্কতের অসংখ্য পাদপশ্চৈী হইতে কণ্ঠভেদী
শব্দ উদ্ভিত হইতে লাগিল, জলপ্রপাত
পর্কত-ওরফিণীর জল উৎক্ষিপ্ত হইয়া চারি-
দিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল, যদ্যপি বিদ্যা-
দালোকে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রকৃতি এই ঘোর
বিপ্লব দৃষ্ট হইতে লাগিল ও মধ্য মধ্যে বহু-
শব্দে অগণ্য কল্পিত ও শুষ্ক হইতে লাগিল।
এরায় মূলধারার বৃষ্টি পড়িয়া পর্কত, অরণ্য
ও উপত্যকা প্রাবিত করিল, জলপ্রপাত ও
তরঙ্গিণী-সমূহকে ক্ষীতকার ও উজ্জ্বলিত
করিয়া তুলিল।

অখারোহী কিছুতেই প্রতিরুদ্ধ না হইয়া
সাবধানে চলিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে
বোধ হইল যেন, অশ্ব ও অখারোহী বায়ুবেগে
পর্কত হইতে সম্মুখে নাচে নিক্ষিপ্ত হইবে।
বায়ুপীড়িত বৃক্ষাখার সজোর আঘাতে
অখারোহীর উকীষ ছিন্ন হইল, তাঁহার ললাট
হইতে দুই এক বিন্দু কৃষ্ণের পড়িতে লাগিল,
তথাপি যে কার্য্যো ব্রতী হইয়াছেন, তাহাতে
অপেক্ষা করা দুঃসাধ্য, স্তবরাং যুবক মুহূর্ত্ত-
মাত্রও চিন্তা না করিয়া যত দূর সাধ্য, সতর্ক-
ভাবে অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন। দুই
তিন দণ্ড মূলধারার বৃষ্টি হওয়াতে ক্রমে
আকাশ পরিষ্কার হইতে লাগিল, অচিরে
বৃষ্টি ধামিয়া গেল। অস্তাচলচূড়াবলম্বী সূর্য্যের
আলোকে সেই পর্কতরাশি ও নবম্বাত বৃক্ষ-
সমূহের চমৎকার শোভা দৃষ্ট হইল।

যুবক হুর্গে উপস্থিত হইয়া একবার অশ্ব

ধামাইলেন ও সিন্ধু কেন্দ্রস্থ পুনরায় সুন্দর প্রশস্ত লগাট হইতে অপস্থত করিয়া নির-
দিকে লুপ্তপাত করিলেন। যতদূর দেখা যায়,
হুই তিন সহস্র উন্নত পর্বতশৃঙ্গগুলি
যোভা পাইতেছে ও সেই পর্বতসমূহের
পার্শ্বে, যতকে, চারিদিকে নবন্যাস নিবিড়
হরিষ্য অনন্ত পাদপশ্রেণী সূর্যালোকে চিক্
চিক্ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে জলপ্রপাত
দশগুণ ক্ষীতকার হইয়া বর্ধিত-গৌরবে শৃঙ্গ
হইতে শৃঙ্গান্তরে নৃত্য করিতেছে ও সূর্য্যের
সুবর্ণ-রশ্মিতে বড় সুন্দর ক্রীড়া করিতেছে।
পর্বত ও শিখরের উপর সূর্য্যরশ্মি নানাবর্ণ
ধারণ করিয়াছে, জলপ্রপাতের উপর রামধনু
খেলা করিতেছে, আকাশে একাধিক বহু
নানাবর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে ও বহুদূরে বায়ু
দ্বারা তাড়িত হইয়া মেঘরাশি বৃত্তিরূপে
গলিত হইতেছে।

যুবক ক্ষণমাত্র এই শোভার মুগ্ধ রহিলেন।
পরে সূর্য্যের দিকে অবলোকন করিয়া ক্ষীণ
দুর্গের উপর উঠিতে লাগিলেন; অচিরে
আপন পরিচয় দিয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন।
তখন সূর্য্য অস্ত হইতেছে, অমনি স্নান-
শয্যে দ্বার বন্ধ হইল।

দ্বাররক্ষকগণ দ্বার বন্ধ করিয়া যুবকের
দিকে চাহিয়া কহিলেন, “অধিক সকালে
শৌছেন নাই; আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে
অন্ত রাজ্যে প্রাচীরের বাহিরে অতিবাহিত
করিতে হইত।”

যুবক। সেই এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় নাই;
প্রভুর নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ভবানীর
প্রসাদে তাহা রাখিব, অতাই কিল্লাদারের
নিকট প্রভুর আদেশ জানাইতে পারিব।

দ্বাররক্ষক। কিল্লাদারও আপনার জন্ত
প্রতীক্ষা করিতেছেন।

যুবক তৎক্ষণাৎ কিল্লাদারের প্রাসাদে বাই-

লেন ও সন্ধ্যা অভিবাদন করিয়া নিম্ন
কটিদেশ হইতে বন্ধন খুলিয়া কড়কড়ালি
লিপি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন।
কিল্লাদার হাতীসীতার একজন শিবজীর
বিশ্বত বোদ্ধা, তিনি লিপিশিল্পির প্রতীক্ষা
করিতেছিলেন, দুতের দিকে না চাহিয়াই
মনোনিবেশ পূরক সেইগুলি পাঠ করিতে
লাগিলেন।

দিল্লীর সম্রাটের সহিত যুদ্ধারম্ভ, যুদ্ধের
আধুনিক অবস্থা, কিরূপে কিল্লাদার শিবজীর
বিশেষরূপে সহায়তা করিতে পারেন ও কোন
বিষয়ে শিবজীর কি কি আদেশ, লিপিপাঠে
সমস্ত অবগত হইলেন। অনেকক্ষণ সেই
লিপি পাঠ করিয়া কিল্লাদার অবশেষে পত্র-
বাহকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। অষ্টাদশ-
বর্ষীয় যুবকের কালকোচিত উদার মুখমণ্ডল
ও আনন্দনাবলম্বী গুচ্ছ নিবিড় কৃষ্ণকেশ
দেখিয়া কিল্লাদার একবার চকিত হইলেন।
লিপির দিকে দেখিলেন, আবার বালক বা
যুবক দিকে মর্খভেদী তীক্ষ্ণ নয়নদ্বয় উঠাই-
লেন; অবশেষে বলিলেন, “হাবিলদার!
তোমার নাম রঘুনাথজী? তুমি জাতিতে
রাজপুত?”

রঘুনাথজী বিনীতভাবে শির নামাইয়া
প্রশ্নের উত্তর করিলেন।

কিল্লাদার। তুমি আকৃতি ও ছিলেন
বালক যাত্র; কিন্তু বিবেচনা, জরসিংহের
কালে পরাভূত নহে।

রঘুনাথজী। যত্ন ও দে। তাঁহার পুত্র
সাধ্য, বোধ হয়, তাহাতে কষ্ট স্বদেশত্যাগে
দেখেন নাই। সিদ্ধি ভরনি এক ক্ষত্রিয়কন্তা

কিল্লাদার। তুমি শিলাইয়াছিলেন। কন্তা
দুর্গে এত ক্ষীণ আসিবে শৈশব পরমবন্ধ ছিলে
রঘুনাথজী।

মনোদ্বিনের দ্রীক ভাগ
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। কন্তার পিতামহাতার

উত্তরে পরিতুষ্ট হইয়া ঈষৎ হাস্ত করিয়া বলিলেন, “জিজ্ঞাসা অনাবশ্যক, কার্য্য-সাধনে তোমার বৈয়াকরণীয়, তোমার আকৃতিই তাহার পরিচয় দিতেছে।” রঘুনাথজীর সমস্ত বস্ত্র ও শরীর এখনও সিন্ধু ও ললাটের ঈষৎ ক্ষত দেখা যাইতেছিল।

পরে কিল্লাদার সিংহগড়ের ও পুনার সমস্ত অবস্থা, মহারাষ্ট্রীয়, যোগল ও রাজপুত সেনার অবস্থা ও সংখ্যা ত্বরিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রঘুনাথজী বতদূর পারিলেন, উত্তর দিলেন।

কিল্লাদার বলিলেন, “তবে কল্যাণ প্রাতে আমার নিকট আসিও, আমার পত্রাদি প্রেরিত থাকিবে। আর প্রভু শিবজীকে আমার নাম করিয়া জানাইও যে, তিনি যে তরুণ হাবিলদারকে এই বিবম কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সে হাবিলদার কার্য্যের অল্প-বুদ্ধ নহে।” প্রশংসাবাক্যে রঘুনাথ মস্তক নত করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন।

রঘুনাথজী বিদায় পাইয়া চলিয়া গেলেন। রঘুনাথকে একরূপ পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে এই যে, কিল্লাদার শিবজীকে অতিশয় গুঢ় মন্ত্রণা পাঠাইবার মানস করিতেছিলেন। সেগুলি লিপির দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, লিপি শত্রু-কার্য্যে পড়িতে পারে। রঘুনাথজীকে সেগুলি আসিয়ায় রচনা যাইতে পারে-কি না, অর্থবলে তিনি যে প্রভুরায়ে শত্রুর বশবর্তী হইয়া গুঢ় কোন আপত্তি গুরুত প্রকাশ করা রঘুনাথের বা আপত্তি করার কিল্লাদার তাহাই পরীক্ষা বর্শা হস্তে লইয়া লক্ষ্যরঘুনাথ নয়নপথের বহি-উঠিলেন, আর এক মুহূর্ত্তের ঈষৎ হাস্ত করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন, পরে এ বিষয়ে অসাধারণ চালন করিয়া সেই নিঃশর্ত্তা যথার্থই উপযুক্ত স্থপ্ত প্রতিধ্বনি জাগরিত হইল।

অনক্ষণমধ্যেই ডয়ানক—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসালা।

সজনি। ভাল করি পেখন না ভেল।
বেথবালা সঙ্গে ভড়িতলতা লহু দদরে শেল
আখ আঁচল ধসি, আখবদনে আখি আখই
আখ উরজ হেরি, আখ ভর তব
একে তহু গোরা কনক গোরা অতহু
হরি হরি কহ যব অহু হরি ঐহন কসি
দশন মুহুতাগতি অধর মিহু মুহু মুহু
বিদ্যাপতি কহ, অতয়ে সে হু হু হু হু
হেরি না পুঁথি বালা ॥

রঘুনাথ কিল্লাদারের নিকট বিদ্যা পাইয়া ভবানীদেবীর মন্দিরাভিমুখে যাইতে গেলেন এই দুর্গজয়ের অন্নদিন পরেই ভবানীর একটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া কোন ও অধরদেবীর অতি উচ্চকুলোদ্ভব এক গুণকে আহ্বান করিয়া দেবসেবার নিয়োজিত করিয়াছিলেন। বুদ্ধকালে এই দেবীর পূজা না দিয়া কোনও কার্য্যে লিপ্ত হইতেন না।

রঘুনাথ যৌবনোচিত উল্লাসের সহিত আপন কৃষ্ণকেশগুলি নাচাইতে নাচাইতে একটি যুদ্ধগীত মুহূর্ত্তের গাইতে গাইতে মন্দিরাভিমুখে আসিতেছিলেন।

যখন মন্দিরের নিকটে আসিলেন, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। পশ্চিমদিকের আকাশের স্তিমিত আলোকে শ্বেত-মন্দির স্থলর শোভা পাইতেছে, মন্দিরের পার্শ্ববর্তী একটি ক্ষুদ্র উদ্যান প্রায় অন্ধকারে আবৃত হইয়াছে। মন্দিরের পুরোহিত তখন বাটীতে নাই,

তারাঃ রঘুনাথ উত্তানে একটি প্রস্তরের উপর বসিয়া ক্ষণেক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ।

সন্ধ্যার সময়ে সেই উত্তানে একজন বালিকা ফুল তুলিতে আসিলেন । রঘুনাথ দেখিয়া ঈষৎ বিস্মিত হইলেন, কেন না, বালিকা এ দেশের নহে, পরিচ্ছন্ন দেখিয়া বুঝিলেন, বালিকা রাজপুত । বহুদিন পরে একজন স্বদেশীয় রমণীকে দেখিয়া রঘুনাথের হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল । ইচ্ছা হইল, রাজপুত বালিকার নিকট যাইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন ; কিন্তু রঘুনাথ সেই ইচ্ছা দমন করিলেন, বৃক্ষতলে সেই প্রস্তরের উপর বসিয়া ক্ষণেক সেই বালিকার দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । যত দেখিতে লাগিলেন, রঘুনাথের হৃদয় আরও সেই দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল ।

বালিকা অসুস্থমান ত্রয়োদশ-বর্ষীয়া । তাঁহার রেশম-বিনিমিত সুমার্জিত অতি রুক্ষ কেশপাশ গণ্ডস্থলে ও পৃষ্ঠদেশে লম্বিত রহিয়াছে এবং উজ্জল মুখমণ্ডল ও ভ্রমর-বিনিমিত চক্ষুদ্বয় কিঞ্চিৎ আবৃত করিয়াছে । ভ্রুগুল বেন তুলী দ্বারা লিখিত, কি সুন্দর বক্রভাবে ললাটের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে । ওষ্ঠদ্বয় সুস্থ রক্তবর্ণ, হস্ত ও বাহু সুগোল এবং সুবর্ণের বলয় ও কঙ্কণ দ্বারা সুশোভিত । কস্তার ললাটে আকাশের রক্তমাচ্ছটা পতিত হইয়া সেই তপ্ত কান্ধন-বর্ণকে সম-ধিক উজ্জল করিতেছে । কণ্ঠ ও ঈষৎহস্ত বক্ষঃস্থলের উপর একটি কর্ণমালা দোহলা-মান রহিয়াছে । রঘুনাথ অনিমেষলোচনে সেই সায়ংকালের স্তিমিত আলোকে সেই অপূর্ণদৃষ্টা রাজপুতকস্তার দিকে চাহিয়া ছিলেন ; তাঁহার হৃদয় পূর্বে অনহত আনন্দ-স্রোতে সিক্ত হইতেছিল ।

কস্তা ফুল তুলিয়া গৃহে যাইবার উপক্রম

করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, অনতি-দূরে একজন দীর্ঘকায় রাজপুত যুবক তাঁহার দিকে অনিমেষলোচনে দেখিতেছেন । ঈষৎ লজ্জার কস্তার মুখ রঞ্জিত হইল, তিনি মুখ অবনত করিলেন ; আবার চাহিয়া দেখিলেন । যুবক তখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, শুষ্ক শুষ্ক কক্ষকেশ যুবকের উন্নত ললাট ও জ্যোতিঃ-পূর্ণ নয়নদ্বয় আবৃত করিয়াছে ; কোঁবে খড়্গ, দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ বর্শা । যুবক অনিমেষ-লোচনে তখনও তাঁহারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন । বহুদিন পরে একজন দেশীয় বোদ্ধাকে এই মহারাষ্ট্র-ভর্গে দেখিয়া রাজপুত-বালা প্রথমে বিস্মিত হইলেন । যুবকের আকৃতি ও উজ্জল সৌন্দর্য্য দেখিয়া তিনি চকিত হইলেন, মুগ্ধমণ্ডল নত করিয়া ফুলের সাজি লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন ।

তখন রঘুনাথ বেন চৈতন্ত প্রাপ্ত হই-লেন ; মন্দিরের পুরোহিতের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত দীর্ঘ দীর্ঘে চিন্তিতভাবে মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও পুরোহিতের জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । এই অবসরে আমরা পাঠককে পুরোহিতের পরিচয় দিব ।

পূর্বেই বলিয়াছি, পুরোহিত অম্বর-দেশীয় উচ্চকুলোদ্ভব রাজপুত ব্রাহ্মণ । তাঁহার নাম জনাৰ্দ্দন দেব । তিনি অম্বরের প্রসিদ্ধ রাজা জয়সিংহের একজন সভাসদ ছিলেন, পরে শিবজীর বহু অহুরোধে জয়সিংহের অহুযতাহসারে শিবজীর সর্বপ্রথম বিজিত তোরণদ্বর্গে আগমন করেন । তাঁহার পুত্র-কন্তা কেহই ছিল না, কিন্তু স্বদেশত্যাগের অচিরকালপূর্বেই তিনি এক ক্ষত্রিয়কস্তার লালনপালনের ভার লইয়াছিলেন । কস্তার পিতা জনাৰ্দ্দনের আদেশের পরমবদ্ধ ছিলেন, কস্তার মাতাও জনাৰ্দ্দনের স্বীকৃত ভগিনী সখোদন করিতেন । কস্তার পিতামাতার

কাল হওয়ার নিঃসন্তান জনাৰ্দ্দন ও তাঁহার গৃহিণী ঐ শিশু কস্তুরবালার লালন-পালনভার লইলেন ও ভোরণদুর্গে আসিয়া সেই শিশুকে অগত্যনির্কীৰ্ণে পালন করিতে লাগিলেন।

পরে জনাৰ্দ্দনের ত্রী কাল হইলে কস্তা সরযু জিন্ন যুদ্ধের স্নেহের দ্রব্য আর কেহ রহিল না, সরযুবালাও জনাৰ্দ্দনকে পিতা বলিয়া ডাকিতেন ও ভালবাসিতেন। কালক্রমে সরযুবালা নিকুম্ভা লাভশ্যবতী হইয়া উঠিলেন, হুতরাং দুর্গের সকলে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ জনাৰ্দ্দনকে কণ্ঠ মুনি ও তাঁহার পালিতা নিকুম্ভা লাভশ্যময়ী কস্তুরবালাকে শকুন্তলা বলিয়া পরিহাস করিতেন। জনাৰ্দ্দনও কস্তার নৌদৰ্শ্য ও স্নেহে পরিতুষ্ট হইয়া রাজস্থান হইতে নির্কাসনের চুখ বিষ্ত হইলেন।

দেবালয়ে রঘুনাথ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলে পর জনাৰ্দ্দন দেবমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশৎ বৎসর হইয়াছে, অবয়ব দীৰ্ঘ ও এখনও বলিষ্ঠ, চক্ষুৰ্দ্ধ শান্তিরসপূর্ণ, বকঃস্থল বিশাল, বাহু দ্বয় দীৰ্ঘ ও বলিষ্ঠ। জনাৰ্দ্দনের বর্ণ গোঁর এবং স্কন্ধ হইতে বজ্রোপবীত লম্বিত রহিয়াছে। পূজকের পবিত্র মন ও সরল হৃদয় তাঁহার মুখ দেখিলেই বোধগম্য হইত। জনাৰ্দ্দন ধীরে ধীরে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রঘুনাথ সসম্মুখে আসনত্যাগ করিয়া গাজোপাধন করিলেন।

সংক্ষেপে মিষ্টালাপ করিয়া উভয়ে আসনগ্রহণ করিলেন ও জনাৰ্দ্দন শিবজীর কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। রঘুনাথ যতদূর পারিলেন, যুদ্ধের বিবরণ বলিলেন ও শিবজীর প্রণাম জানাইয়া পূজকের হস্তে করেকটি সুবর্ণমুদ্রা দিয়া বলিলেন, “প্রভুর প্রার্থনা যে, তিনি এক্ষণে যোগলদিগের সহিত রণে নিযুক্ত হইয়াছেন, আপনি তাঁহার

জয়ের জন্ত ভবানীর নিকটে পূজা করিবেন। দেবীপ্রসাদ ভিন্ন মহুষা-চেষ্টা বৃথা।”

জনাৰ্দ্দন তাঁহার নৈসর্গিক স্থির গম্ভীর-স্বরে উত্তর করিলেন, “সনাতন হিন্দুধর্ম-রক্ষার জন্ত বাদৃশ লোকের চিরকালই যত্ন করা বিধেয়, সেই ধর্মের প্রহরীস্বরূপ শিবজীর বিজয়ের জন্ত অবশ্যই পূজা দিব। মহাত্মাকে জানাইও, সে বিষয়ে জ্ঞাতি করিব না।”

রঘুনাথ। দেবীপদে প্রভুর আর একটি আবেদন আছে। তিনি ঘোরতর যুদ্ধে প্রযুক্ত হইবেন, তাহার ফলাফল কথঞ্চিৎ পূর্বে জানিবার আকাঙ্ক্ষা করেন। ভবাদৃশ দূরদর্শী দৈবজ্ঞ এ বিষয়ে অবশ্যই তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিতে পারেন।

জনাৰ্দ্দন কণেক চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলেন, পরে পুনরায় গম্ভীরস্বরে বলিলেন, “রজনীযোগে দেবীপদে শিবজীর বাসনা জানাইব, কল্যাণপ্রাপ্তে উত্তর জানিতে পারিবে।”

রঘুনাথ ধন্তবাদ দিয়া বিদায় হইবার উদ্দেশ্যে করিতেছেন, এমন সময়ে জনাৰ্দ্দন বলিলেন, “তোমাকে ইতিপূর্বে এই দুর্গে দেখি নাই, অতঃ কি এই প্রথম এ স্থানে আসিয়াছ ?”

রঘুনাথ। অজ্ঞাই আসিছি।

জনাৰ্দ্দন। দুর্গে কাহারও সহিত পরিচয় আছে ? থাকিবার স্থান আছে ?

রঘুনাথ। পরিচয় নাই, কিন্তু কোন এক স্থানে রজনী অতিবাহিত করিব, কল্যাণপ্রাপ্তেই চলিয়া যাইব।

জনাৰ্দ্দন। কি জন্ত অনর্থক ক্লেশ সহ করিবে ?

রঘুনাথ। প্রভুর অহুগ্রহে কোন ক্লেশ হইবে না, আমাদিগের সর্বদাই এইরূপে রাজি অতিবাহিত করিতে হয়।

জনার্দন । বৎস ! যুদ্ধ-সময়ে ক্রেশ অনি-
যা, কিন্তু অস্ত্র ক্রেশ-সহনের কোন আবশ্য়-
কতা নাই । আমার এই দেবালয়ে অবস্থিতি
কর । আমার পালিতকত্তা তোমার খাওয়ার
আয়োজন করিয়া দিবে । পরে রাজিতে
বিশ্রাম করিয়া কলা শিবজীর মিকটে দেবীর
আজ্ঞা লইয়া যাইবে ।

রঘুনাথজীর বক্ষঃস্থল সহসা ক্ষীত হইল,
তাহার হৃদয়ে যেন কে সজোরে আঘাত
করিল । এ বাতনা, না আনন্দের উৎসব ?
জনার্দনের পালিতকত্তা কে ? তিনি কি সেই
পুষ্পোদ্ভানে দৃষ্টা লাভণ্যময়ী রাজপুতবালা ?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

কণ্ঠমালা ।

[[মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পতন ।

ভারতচন্দ্র রায় ।

রজনী প্রায় একপ্রহর হইলে, সরসুবালা
পিতার আদেশে অতিথির খাওয়ার আয়োজন
করিয়া দিলেন । রঘুনাথ আসন গ্রহণ করি-
লেন, সরসু পশ্চাতে নুণায়মান রহিলেন ।
মহারাষ্ট্র-দেশে অতাবধি আহুত ব্যক্তিকে
পরিবারের মধ্যে কোন একজন রমণী
আসিয়া ভোজন করাইবার রীতি আছে ।

রঘুনাথ আহার করিতে বসিলেন, কিন্তু
রঘুনাথের হৃদয় আজি চাকল্য-পরিপূর্ণ ও
অস্থির । সরসু যত্ন করিয়া অনেক প্রকার
আহার প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু রঘুনাথ
অন্ত কি খাইলেন, ঠিক জানেন না । জনার্দন
ওষুধ্য-সহকারে রাজস্থানের কথা কহিতে
লাগিলেন, রঘুনাথ সময়ে সময়ে উত্তর দেন,
সময়ে সময়ে একটু অন্তমনস্ক হন ।

আহার শেষ হইল । শ্বেতপ্রস্তরবিনির্মিত

আধারে সরসু মিষ্ট সরবৎ আনিয়া দিলেন,
রঘুনাথ পাত্ৰধারণীর দিকে দোষগচিৎ
চাহিলেন, যেন তাহার হৃদয় সে দৃষ্টির
সহিত মিলিত হইয়া সেই কস্তার দিকে, বাব-
যান হইল, চাম্রিচন্দ্র মিলন হইল, সরসু
মুখমণ্ডল লজ্জায় ঈষৎ রক্তবর্ণ হইল, মুখ
অবনত করিয়া সরসু বীরে বীরে সরিয়া
গেলেন । রঘুনাথও বৎপরোন্মত্তি লজ্জিত
হইয়া অধোবদন হইলেন ।

হস্তমুখ-প্রকালনের জন্ত সরসু জল
আনিয়া দিলেন । রঘুনাথ বস্ত্র নহেন,
এবার তিনি মুখ অবনত করিয়া রহিলেন,
কেবল সরসুর সুন্দর সুবর্ণ-বর্ণ-বিকড়িত
সুগোল বাহুমাত্র দেখিতে পাইলেন । একটি
দীর্ঘশ্বাস-তাগ করিলেন ।

রঘুনাথের শয্যারচনা হইল । রঘুনাথ
শয়ন করিলেন না, ঘরের দ্বার বীরে বীরে
উন্মোচন করিয়া নক্ষত্রালোকে সেই পুষ্পো-
দ্ভানে পদচারণ করিতে লাগিলেন ।

সেই গভীর অন্ধকারে নক্ষত্র-বিভূষিত
নৈশ আকাশের দিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া অল্প-
বয়স্ক যোদ্ধা কি চিন্তা করিতেছেন ? নিশার
ছায়া ক্রমে গভীরতর হইতেছে, সেই
সুশ্লিষ্ট ছায়ার মহুবা, জীব, জন্তু, সমগ্র
জগৎ সুপ্ত হইয়াছে । হুর্গে শব্দমাত্র নাই,
কেবল মধ্যে মধ্যে প্রহরিগণের শব্দমাত্র শুনা
যাইতেছে ও প্রহরে প্রহরে ঘণ্টারব সেই
নিভর হুর্গে ও চতুর্দিকস্থ পর্বতে প্রতিহত
হইতেছে । এ গভীর অন্ধকার রজনীতে
রঘুনাথ অনিচ্ছ হইয়া কি চিন্তা করিতেছেন ?

রঘুনাথ অদ্য কেন সেই উদ্যানে পদ-
চারণ করিতেছেন, তাহা রঘুনাথ জানেন
না । এতদিন রঘুনাথ বালক ছিলেন, অদ্য
যেন সহসা তাহার শাস্ত্র, নীল জীবনা-
কাশের উপর একটি নূতন আলোক উদ্ভিত

হইল, তাঁহার সুখ চিন্তা ও বেগবতী মনের
বৃত্তি সহসা জাগরিত হইল। শতবার
সেই রাজপুত্রবালার আনন্দময়ী মুক্তি তাঁহার
মনে আসিতে লাগিল, সেই আলংখ্যলিখিত
কুমুদল, পুষ্পবিনিমিত্ত মধুময় গুঠ, সেই
পুগোল বাহুগল, সেই আরত রেহপূর্ণ
নয়ন, সেই চিত্তহারী অভুল লাবণ্য! রঘু-
নাথ! এ সুলক্ষী কি তোমার হইবে?
তুমি একজন সামান্য হাবিলদার মাত্র,
জনার্দন অতি উচ্চকুলোদ্ভব রাজপুত্র, তাঁহার
পালিতকন্যা রাজাদিগেরও প্রার্থনীয়। কি
জন্য এরূপ আশায় হৃদয় বৃথা ব্যথিত করি-
তেছ? রঘুনাথ! এ বৃথা তৃষ্ণায় কেন
হৃদয় দগ্ধ করিতেছ?

কিন্তু যৌবনকালে আশাই বলবতী হয়,
লীভ্র আমাদের হৃদয়ে নৈরাশ হয় না, অসাধ্য
আমরা সাধ্য বিবেচনা করি, অসম্ভবও
সম্ভব বোধ হয়। রঘুনাথ আকাশের দিকে
চাহিয়া চাহিয়া অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিতে
ছিলেন। অনেকক্ষণ পর দণ্ডায়মান হই-
লেন, আপন হৃদয়ের উপর উভয় বাহু
স্থাপন করিয়া কণেক দণ্ডায়মান রহিলেন,
মনে মনে বলিলেন, “ভগবান্, সহায় হও,
অবশ্য কৃতকার্য হইব। বশ, মান, খ্যাতি
মানুষ্য-সাধ্য, কি জ্ঞা আমার অসাধ্য হইবে?
আমার শরীর কি অন্য অপেক্ষা ক্ষীণ? বাহ
কি অন্য অপেক্ষা দুর্বল? দেবগণ, আমার
সহায় হও, আমি যুদ্ধে পিতার নাম রক্ষা
করিব, রাজপুত্রের উচিত সম্মান লাভ
করিব। তাহার পর? যদি কৃতকার্য
হই, তাহা হইলে সরযু! আমি তোমার
অবোগ্য হইব না, তখন সরযু! তোমাকে
গল্পচ্ছলে অদ্যকার এই সকল কথা বলিব,
তখন তোমার সুলক্ষ হস্তদ্বয় আমার এই
কম্পিত হস্তদ্বয়ে স্থাপন করিব, তখন ঐ

লাবণ্যময়ী দেহলতা এই উদ্বিগ্ন হৃদয়ে ধারণ
করিব, তখন ঐ সুলক্ষ বিষবিনিন্দিত গুঠ-
দ্বয়”—রঘুনাথ! রঘুনাথ! উন্মত্ত হইও না।

তখন রঘুনাথ কথঞ্চিৎ শান্ত-হৃদয়ে
গৃহের দিকে কিরিলেন। সহসা দেখিলেন,
একটি কণ্ঠমালা পড়িয়া রহিয়াছে। দুইটি
করিয়া মুক্তা, পরে একটি করিয়া পলা,—
রঘুনাথ সে মালা চিনিলেন। সেই মালা
পূর্নদিন সন্ধ্যাকালে সরযু কণ্ঠে ও বক্ষঃস্থলে
ধারণ করিয়াছিলেন, বোধ হয়, অদাবধানতা
বশতঃ ঐ স্থানে ফেলিয়া গিয়াছেন। রঘুনাথ
আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “ভগবান্!
এ কি আমার আশা পূর্ণ হইবার পূর্বলক্ষণ
দান করিলেন?”

মালাটি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রঘুনাথ
নিদ্রা গেলেন। পরদিন প্রাতে রঘুনাথের
নিদ্রাভঙ্গ হইল। জনার্দনদেবের নিকট
ভ্রাতৃবীর, আজ্ঞা জানিলেন, “স্নেহদিগের
সহিত যুদ্ধে জয়, অধর্মদিগের সহিত যুদ্ধে
পরাজয়।”

দুর্গত্যাগের পূর্বে রঘুনাথ একবার
সরযুর সহিত দেখা করিলেন। সরযু
যখন পুনরায় উদ্যানে ফুল তুলিতে আসিয়া-
ছেন, ধীরে ধীরে রঘুনাথও তথায় বাইলেন।
হৃদয়ের উদ্বেগ কথঞ্চিৎ দমন করিয়া ঈষৎ
কম্পিতস্বরে রঘুনাথ বলিলেন, “ভদ্রে!
কল্যাণিনিবোধে এই কণ্ঠমালাটি এই স্থানে
পাইয়াছি, সেইটি দিতে আসিয়াছি,
অপরিচিতের ধৃষ্টতা মাফনা করুন।”

এই বিনীতবাক্য শুনিয়া সরযু কিরিয়া
চাহিলেন। দেখিলেন, সেই কমলীয় উদ্যার
মুখমণ্ডল, সেই কেশাবৃত উন্নত ললাট, সেই
উজ্জ্বল নয়নদ্বয়, সেই তরুণ বোদ্ধা। রমণীর
গৌর মুখমণ্ডল পুনরায় রক্তবর্ণ হইয়া
উঠিল।

রঘুনাথ পুনরায় ধীরে ধীরে বলিলেন, দেখিলেন, সেই আরত নয়ন দুইটি ছল ছল করিতেছে, তাঁহার আপনার নয়নও শুক ছিল না।

এই অল্পগ্রহণ্ট আমাকে প্রদান করুন, ভগবান্ আপনাকে হুখে রাখিবেন।”

সরযু সলজ্জনয়নে একবার রঘুনাথের দিকে চাহিলেন, সে বিশাল আরত নয়নের ক্ষণদৃষ্টিতে রঘুনাথের হৃদয় কল্পিত হইল। তৎক্ষণাৎ রঞ্জিতমুখী লজ্জার আবার চক্ষু মুদিত করিলেন। সম্মতির লক্ষণ পাইয়া রঘুনাথ ধীরে ধীরে সেই কঠমালা পরাইয়া দিলেন, কণ্ঠার পবিত্র শরীর স্পর্শ করিলেন না।

ক্ষণেক পর রঘুনাথ ধীরে ধীরে বলিলেন, “তবে অতিথিকে বিদায় দিন।”

সরযু এবার লজ্জা ও উবেগ সংযম করিয়া ধীরে ধীরে রঘুনাথের দিকে চাহিলেন, আবার ধীরে ধীরে ভূমির দিকে নয়ন ফিরাইয়া অতি মৃদু অস্পষ্টস্বরে কহিলেন, “আপনার নিষ্ঠ অক্ষুণ্ণ হইত রহিলাম, পুনরায় যদি ভ্রগে আইসেন, ভরসা করি, পুনরায় পিতার এই মন্দিরে অবস্থান করিবেন।”

পিপাসার্ত চাতকের পক্ষে প্রথম বৃষ্টি+ বিন্দুর স্রাব, পথভ্রান্ত পথিকের পক্ষে উবার প্রথম রক্তমাফুটার স্রাব, সরযুর প্রথমোচ্চারিত এই অমৃতকথাগুলি রঘুনাথের হৃদয় আনন্দলহরীতে প্রাবিত করিল! তিনি উত্তর করিলেন, “ভদ্রে, আমি পরের দাস, বুদ্ধ আমার ব্যবসা, পুনরায় কবে আসিতে পারিব, কখনও আসিতে পারিব কি না, জানি না। কিন্তু যত দিন জীবিত থাকিব, তত দিন আপনার দেবনির্মিত মূর্ত্তি মুহূর্ত্তের লজ্জাও বিস্মৃত হইব না।”

সরযু উত্তর দিতে পারিলেন না। রঘুনাথ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সারেস্তা থাঁ।

কেন চিন্তাকুল আজি নবাবের ঘন?

নবীনচন্দ্র সেন।

যদি করেক বৎসর অবধি শিবজীর ক্ষমতা, রাজ্য এবং ভ্রগসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেন, তথাপি ১৬৬২ খৃঃ অকের পূর্বে দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহাকে বশীভূত করিবার অভিপ্রায়ে বিশেষ কোন যত্ন করেন নাই। সেই বৎসর সারেস্তা থাঁ আমীর উল উমরা খেতাব প্রাপ্ত হইয়া দক্ষিণদেশের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত হইয়া শিবজীকে একেবারে জয় করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। সায়েস্তা থাঁ সেই বৎসরেই পুনা, চানকডুর্গ ও অন্ত করেক স্থান অধিকার করেন। পর বৎসর অর্থাৎ এই আখ্যায়িকা-বিবৃত-সময়ে সায়েস্তা থাঁ শিবজীকে একেবারে ধ্বংস করিবার সঙ্কল্প করেন। দিল্লীর সম্রাটের আদেশানুসারে মাড়ওয়ারের রাজা প্রসিকনামা বশোবস্ত সিংহও এই বৎসরে (১৬৬৩ খৃঃ) বহু সৈন্ত লইয়া সায়েস্তা থাঁর সহিত যোগ দিলেন, সুতরাং শিবজীর বিপদের সীমা ছিল না। মোগল ও রাজপুত সৈন্ত পুনা নগরের নিকটে শিবির সন্নিবশিত করিয়াছিল ও সায়েস্তা থাঁ স্বয়ং দানাজী কানাইদেবের গৃহে অর্থাৎ যে গৃহে শিবজী বালাকালে মাতার সহিত বাস করিতেন, সেই গৃহেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। সায়েস্তা থাঁ শিবজীর চাতুরী

বিশেষরূপে জানিতেন, সুতরাং তিনি আদেশ করিলেন যে, অল্পমতিপত্র বিনা কোন মহারাষ্ট্রীয় পুনামগরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। শিবজী নিকটবর্তী সিংহগড় নামক এক দুর্গে সশস্ত্রে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা সে সময়ে যুদ্ধব্যবসারে অধিক পরিপক্ব হয় নাই, দিল্লীর শিক্ষিত সেনার সহিত সন্মুখ-যুদ্ধ করা কোনমতেই সম্ভব নহে, সুতরাং শিবজী কোশল ভিন্ন স্বাধীনতা রক্ষা করা ও হিন্দুরাজ্যবিস্তারের অন্য উপায় দেখিলেন না।

চৈত্র মাসের শেষ ভাগে একদিন সাংকালে পরাক্রান্ত মোগলসেনাপতি সায়েরস্তা খাঁ আপন অমাত্য ও মন্ত্রীগণকে আহ্বান করিয়া সভায় বসিয়াছেন। ক্রমশঃ শিবজীকে পরাজয় করিবেন, তাহারই পরামর্শ হইতেছিল। দাদাজী কানাই-দেবের বাটীর মধ্যে সভাগৃহে এই সভা হইয়াছিল। চারিদিকে উজ্জ্বল দীপাবলী জ্বলিতেছে। জানালার ভিতর দিয়া সাংকালের নীতল বায়ু উত্থানের পুষ্পগন্ধ বহিয়া আনিয়া সকলকে পুলকিত করিতেছে। আকাশ অন্ধকার, কেবল দুই একটি নক্ষত্র দেখা যাইতেছে।

আনওয়ারীনায়ে সায়েরস্তা খাঁর একজন চাটুকার বলিল, “আমীরের সেনার সম্মুখে মহারাষ্ট্রীয় সেনা যেন মহা-বাত্যার সম্মুখে তরু-পত্রের ন্যায় আকাশে উড়িয়া যাইবে, অথবা ভীত হইয়া পৃথিবীর ভিতরে প্রবেশ করিবে।”

চাঁদ খাঁ নামক একজন প্রাচীন সেনা কয়েক বৎসর অবধি মহারাষ্ট্রীয়দিগের বল-বিক্রম দেখিয়াছিলেন; তিনি ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, “আমি বোধ করি, তাহাদের ঐ দুইটি ক্ষমতাই আছে।”

সায়েরস্তা খাঁ। কেন?

চাঁদ খাঁ। গতবৎসর কতিপয় পার্শ্ব-ভিত্তীয় মহারাষ্ট্রীয় বখশ চাকন-দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, আমাদের সমস্ত সৈন্য দুই মাস অবধি চেষ্টা করিয়া ক্রমশঃ তাহাদিগকে বহিস্কৃত করিয়া দুর্গদ্বার করিয়াছে, তাহা জাহাঁপনার স্বরণ আছে। একটি দুর্গ হস্তগত করিতে অনেক মোগলের প্রাণনাশ হইয়াছে। আবার এ বৎসর সর্ব্বস্থানে আমাদের সৈন্য থাকাতোও নিতাইজী অশ্রম্যান দিয়া আহম্মদনগর ও আরকাবাদ পর্য্যন্ত উড়িয়া বাইয়া দেশ ছাড়াই করিয়া আসিয়াছে।

সায়েরস্তা খাঁ। চাঁদ খাঁর বয়স অধিক হইয়াছে, তিনি এক্ষণে পার্বত-ইন্দুরকে ভয় করেন! পূর্বে তাহার একরূপ ভয় ছিল না।

চাঁদ খাঁর মুখমণ্ডল আরক্ত হইল, কিন্তু তিনি নিরুত্তর রহিলেন।

আনওয়ারী। জাহাঁপনা ঠিক আজ্ঞা করিয়াছেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা ইন্দুরবিশেষ, তাহারা যে পার্বত-ইন্দুরের ন্যায় গর্ভে প্রবেশ করিয়া থাকিতে পারে, আশীর্বাদ করি না।

চাঁদ খাঁ। পার্বত-ইন্দুর পুনর ভিতর গর্ত করিয়া বাহির না হইলে রক্ষা!

সায়েরস্তা খাঁ। এখানে দিল্লীর সহস্র সহস্র নথায়ুধ বিভাল আছে, ইন্দুরে সহস্র কিছু করিতে পারিবে না।

সভাসদ সকলেই “কেয়ামৎ” “কেয়ামৎ” বলিয়া সেনাপতির এই বাক্যের অশ্রুমোদন করিলেন।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিষয়ে এইরূপ অনেক রহস্য হইলে পর কি প্রণালীতে যুদ্ধ চাইবে, তাহাই স্থির হইতে লাগিল। চাকন-দুর্গ

হস্তগত হইয়া অবশি সারেন্তা খাঁ দুর্গ হস্তগত করা একেবারে দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, “এই প্রদেশ দুর্গপরিপূর্ণ, যদি একে একে সমস্ত দুর্গ হস্তগত করিতে হয়, তবে কত দিনে যে দিল্লীশ্বরের কার্য্য সিদ্ধ হইবে, কখনও সিদ্ধ হইবে কি না, তাহার স্থিরতা নাই।”

চাঁদ খাঁ। জাহাঁপনা ! দুর্গই মহারাজীয়দিগের বল, উহারা সম্মুখ-রণ করিবে না অথবা রণে পরাস্ত হইলেও উহাদিগের ক্ষতি নাই। কেন না, দেশ পর্ত্তময়, উহাদিগের সেনা এক স্থান হইতে পলায়ন করিয়া কোন্ দিক্ দিয়া অস্ত্র স্থানে উপস্থিত হইবে, আমরা তাহার উদ্দেশ্য পাইব না; কিন্তু দুর্গগুলি একে একে হস্তগত করিতে পারিলে মহারাজীয়দিগকে অবশ্যই দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে।

সারেন্তা খাঁ। কেন ? মহারাজীয়রা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলে কি আমরা পশ্চাৎদিক্ করিতে পারিব না ? আমাদের কি অশ্বারোহী সেনা নাই, পশ্চাৎদিক্ করিয়া সমস্ত মহারাজীয়সেনা ধ্বংস করিতে পারিবে না ?

চাঁদ খাঁ। যুদ্ধ হইলে অবশ্যই মোগলের জয়, ধরিতে পারিলে আমরা মহারাজীর সেনা বিনাশ করিব, তাহার সংশয় নাই, কিন্তু এই পর্ত্ত-প্রদেশে মহারাজীর অশ্বারোহীকে পশ্চাৎদিক্ করিয়া ধরিতে পারে, এমন অশ্বারোহী হিন্দুস্থানে নাই। আমাদের অশ্বগুলি বৃহৎ, অশ্বারোহী বর্ধারূত ও বহু অস্ত্রসম্বিত, সমভূমিতে, সমুখ-ক্ষেত্রে তাহাদের তেজ দৃষ্টমণীয়, তাহাদের গতি অপ্রতিহত, কিন্তু এই পর্ত্ত-প্রদেশে তাহাদিগের যাতারাতুর ব্যাঘাত জন্মে। ক্ষুদ্র মহারাজীর অশ্ব ও অশ্ব-

রোহিণ্য যেন ছাগের জায় ভুল্লুদে লক্ষ দিয়া উঠে ও হরিণের জায় উপভুক্ত্য ও সুরাথের মধ্য দিয়া পলায়ন করে। জাহাঁপনা, আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন। সিংহগড়ে শিবজী আছেন, সহসা সেই স্থান অবরোধ করুন, এক মাস কি দুই মাস কালের মধ্যে দুর্গ জয় করিব, শিবজী বন্দী হইবে, দিল্লী-শ্বরের জয় হইবে। নচেৎ এ স্থানে মহারাজীয়দিগের অস্ত্র অপেক্ষা করিলে কি হইবে ? তাহাদিগের পশ্চাৎদিক্ করিতে চেষ্টা করিলেই বা কি হইবে ? দেখুন, নিতাইজী অনায়াসে আমাদের নিকট দিয়া যাইয়া আহম্মদ নগর ও আরম্মাবাদ ছাড়বার করিয়া আসিল, ক্রমশঃ জমান তাহার পশ্চাৎদিক্ করিয়া কি করিল ?

সারেন্তা খাঁ সজ্ঞাধে বলিলেন, “ক্রমশঃ জমান বিজ্রোহাচরণ করিয়াছে, ইচ্ছা করিয়া নিতাইজীকে পলাইতে দিয়াছে, আমি তাহার সমুচিত দণ্ড দিব। চাঁদ খাঁ, তুমিও সম্মুখ-যুদ্ধের বিরুদ্ধে পরামর্শ দিতেছ, দিল্লীশ্বরের সেনাগণের মধ্যে কি কেহই সাহসী নাই ?”

প্রাচীন যোদ্ধা চাঁদ খাঁর মুখমণ্ডল আবার আনন্দবর্ণ হইয়া উঠিল। পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া একবিন্দু অশ্রুজল মুছিয়া ফেলিলেন, পরে সেনাপতির দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, “পরামর্শ দিতে পারি, এরূপ সাধ্য নাই, সেনাপতি, যুদ্ধের প্রণালী স্থির করুন, বৈরূপ লক্ষ্য হইবে, তামিল করিতে এ দাস পরামুখ হইবে না।”

এই সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সমাচার দিল যে, সিংহগড়ের দূত মহাদেওজী জায়শাহী নামক ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, নীচে অপেক্ষা করিতেছেন। সারেন্তা খাঁ তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাকে সভাগৃহে

আনিবার আজ্ঞা দিলেন। সভাস্থ সকলে এই দৃতকে দেখিবার, জন্ত উৎসুক হইলেন।

ক্লেপের পর মহাদেওজী জায়শাস্ত্রী সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। জায়শাস্ত্রীর বয়স এখনও চত্বারিংশ বৎসর হয় নাই, অবরব মহারাত্রিরদিগের জায় ঈষৎ ধর্ম ও কৃৎসবর্ণ। ব্রাহ্মণের মুখমণ্ডল সুন্দর, বকঃস্থল বিশাল, বাহুযুগল দীর্ঘ, নয়ন গভীর বুদ্ধিব্যঞ্জক, ললাটে দীর্ঘ তিলকচন্দন, স্বক্লে যজ্ঞোপবীত লম্বিত রহিয়াছে। শরীর তুলার কুর্ভিতে আবৃত, স্ততরাং গঠন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। যন্তুকে প্রকাণ্ড উল্লীষ এরূপ প্রকাণ্ড যে, বদনমণ্ডল বেন তাহার ছায়াতে আবৃত রহিয়াছে। সায়ন্তা ঐ সান্নয়ে দৃতকে আহ্বান করিয়া উপবেশন করিতে বলিলেন।

সায়ন্তা ঐ জিজ্ঞাসা করিলেন, “সিংহ-গড়ের সংবাদ কি?”

মহাদেওজী একটি সংস্কৃত শ্লোক বলিলেন,—

“সস্তি নদ্যো দগুকেষু তথা পঞ্চবটীবনে।

সরযু-বিচ্ছেদশোকং রাঘবন্ত কথং সসেং ॥”

অর্থাৎ “দগুকারণ্যে পঞ্চবটীবনে শত শত নদী আছে, কিন্তু তাহা দেখিয়া কি রাঘব সরযু নদীর বিচ্ছেদ-দুঃখ ভুলিতে পারেন? সিংহগড় প্রভৃতি শত শত দুর্গ এক্ষণে শিবজীর হস্তে আছে, কিন্তু পুনা আপনার হস্তগত, সে সত্তাপ কি তিনি ভুলিতে পারেন?”

সায়ন্তা ঐ পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, “বাও, তোমার প্রভুকে বলিও, প্রেধান দুর্গ হস্তগত করিয়াছি, এক্ষণে তাহার যুদ্ধ করা বিকল, দিল্লীরবরের অধীনতা-স্বীকার করিলে বয়স এখনও আশা আছে।”

ব্রাহ্মণ ঈবদ্ধাগ্য করিয়া পুনরায় একটি সংস্কৃত শ্লোক বলিলেন,—

“ন শক্তো হি অভিলাষং জ্ঞাপয়িতুঞ্চ চাতকঃ।

জ্ঞাত্বা তু তৎ বারিধরন্তোবধতি হি যাচকম্ ॥” অর্থাৎ “চাতক কথা কহিয়া আপন অভিলাষ মেঘকে জানাইতে পারে না, কিন্তু মেঘ সেই অভিলাষ বুঝিয়া আপনার দয়াবশতই তাহা পূর্ণ করে। মহাজনের যাচককে দিবার এইরূপ রীতি। প্রভু শিবজী এক্ষণে পুনা ও চাকন হারাইয়া সন্ধিপ্রার্থনা করিতেও লজ্জা বোধ করেন, কিন্তু ভবাদৃশ মহাত্মক তাহার মনের অভিলাষ জানিয়া অল্পগ্রহ করিয়া বাহা দান করিবেন, তাহাই শিরো-ধার্য্য।”

সায়ন্তা ঐ আনন্দ সংবরণ করিতে পারিলেন না;—বলিলেন, “পণ্ডিতজী, তোমার পাণ্ডিত্যে আমি যে কতদূর পরিতুষ্ট হইলাম, বলিতে পারি না, তোমাদিগের সংস্কৃত ভাষা কি সুমধুর ও ভাব-পরিপূর্ণ। যথার্থই কি শিবজী সন্ধির ইচ্ছা কল্পিতেছেন।”

মহাদেওজী বলিলেন,—

“কেশরিণঃ প্রতাপেন ভগ্নবিবলচেতনঃ।

ত্রাহি দেব ত্রাহি রাজনু ইতি ক্রবন্তি ভূচরাঃ ॥”

অর্থাৎ “দিল্লীরবরের সৈন্তের দোন্ধিও-প্রতাপে বিপর্য্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া আমরা কেবল ত্রাহি ত্রাহি এই শব্দ করিতেছি।”

সায়ন্তা ঐ এবার আশ্লাদ সংবরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন, “ব্রাহ্মণ! আপনার শাস্ত্রালোচনার সন্তুষ্ট হইলাম, এক্ষণে যদি সন্ধির কথাই বলিতে আসিয়া থাকেন, তবে শিবজী আপনাকে নিমুক্ত করিয়াছেন, তাহার নিদর্শন কৈ?”

ব্রাহ্মণ তখন গভীরভাবে বয়ের ভিতর

হইতে নিদর্শনপত্র বাহির করিলেন । অনেকক্ষণ পর্যন্ত সারেন্তা খাঁ সেইটি দেখিলেন ; পরে বলিলেন, “হাঁ, নিদর্শনপত্র দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি । এক্ষণে কি কি প্রস্তাব করিবার আছে, বসুন ।”

মহাদেওজী । প্রভুর এইরূপ আজ্ঞা যে, এখন প্রথমেই আপনাদিগের জয় হইয়াছে, তখন আর যুদ্ধ করা বৃথা ।

সারেন্তা খাঁ । ভাল ।

মহাদেওজী । হুতরাং সন্ধির জন্য তিনি উৎসুক হইয়াছেন ।

সারেন্তা খাঁ । ভাল ।

মহাদেওজী । এক্ষণে কি কি নিয়মে দিল্লীশ্বর সন্ধি করিতে সম্মত হইবেন, তাহা জানিতে তিনি উৎসুক । জানিলে সেইগুলি পালন করিতে যত্ববান হইবেন ।

সারেন্তা খাঁ । দিল্লীশ্বরের অধীনতা-স্বীকার । তাহাতে আপনার প্রভু স্বীকৃত আছেন ?

মহাদেওজী । তাঁহার সম্মতি বা অসম্মতি জানাইবার আমার অধিকার নাই । মহাশয় যে যে কথাগুলি বলিবেন, তাহাই আমি তাঁহার নিকট জানাইব । তিনি সেইগুলি বিবেচনা করিয়া সম্মতি অসম্মতি পরে প্রকাশ করিবেন ।

সারেন্তা খাঁ । ভাল, প্রথম কথা আমি বলিয়াছি, দিল্লীশ্বরের অধীনতা-স্বীকার । দ্বিতীয়, দিল্লীশ্বরের সেনা যে যে দুর্গ হস্তগত করিয়াছে, তাহা দিল্লীশ্বরেরই থাকিবে । তৃতীয়, সিংহগড় প্রভৃতি আরও কয়েকটি দুর্গ তোমরা ছাড়িয়া দিবে ।

মহাদেওজী । সে কোন্ কোন্ট ?

সারেন্তা খাঁ । তাহা ছই এক দিনের মধ্যে পত্র দ্বারা জানাইব । চতুর্থ, অবশিষ্ট যে যে দুর্গ ও দেশ শিবজী আপন অধীনে

রাখিবেন, তাহাও দিল্লীশ্বরের অধীনে জায়-গীরখরূপ ভোগ করিবেন, তাহার অন্ত কর দিতে হইবে । এইগুলি তোমার প্রভুকে জানাইও, ইহাতে তিনি সম্মত কি অসম্মত, তহা যেন আমি ছই চারি দিনের মধ্যে জানিতে পারি ।

মহাদেওজী । বেরূপ আদেশ করিলেন, সেইরূপ করিব । এক্ষণে যখন সন্ধির প্রস্তাব হইতেছে, তখন ষত দিন সন্ধিহাপন না হয়, তত দিন যুদ্ধ কান্ত থাকিতে পারে ?

সারেন্তা খাঁ । কদাচ নহে । ধৃত কপটাচারী মহারাজীদিগকে আমি কদাচ বিশ্বাস করি না, এমত ধৃততা নাই যে, তাহাদিগের অসাধ্য । যত দিন সন্ধি একেবারে স্থাপন না হয়, তত দিন যুদ্ধ চলিবে, আমরা তোমাদিগের অনিষ্ট করিব, তোমরা পার, আমাদের অনিষ্ট করিও

“এবমন্ত্ৰ” বলিয়া ব্রাহ্মণ বিদ্যার গ্রহণ করিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতেছিল ।

তিনি ধীরে ধীরে প্রাসাদ হইতে অবতীর্ণ হইলেন । প্রত্যেক দ্বার, প্রত্যেক দর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইলেন । একজন মোগল গ্রহরী কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “দূত মহাশয়, কি দেখিতেছেন ?”

দূত উত্তর করিলেন, “এই গৃহে প্রভু শিবজী বাল্যকালে ক্রীড়া করিতেন, তাহাই দেখিতেছি । এটিও তোমাদিগের হস্তগত হইয়াছে । বোধ হয়, একে একে সমস্ত দুর্গগুলিই তোমরা লইবে । হা ভগবন্ !”

গ্রহরী হাস্য করিয়া বলিল, “সে অন্ত আর বৃথা খেদ করিলে কি হইবে ? আপন কাধ্যে যাও ।”

ব্রাহ্মণ শীঘ্রই বহু-জনাধীর্ষ পুনানগরীয়
লোকের মধ্যে মিশিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শুভকার্যের পুরোহিত।

অদূরে শিবিরে বসি নিশি বিপ্রহরে,
কুশল্য করিতেছে রাজজ্যোতিগণ।

নবীনচন্দ্র সেন।

ব্রাহ্মণ একে একে পুনার বহু পথ অতি-
বাহন করিলেন, যে যে স্থান দিয়া যাইতে লাগি-
লেন, সেই সেই স্থান বিশেষ করিয়া দেখিতে
লাগিলেন। দুই একটি দোকানে দ্রব্য-ক্রয়ের
ছলে প্রবেশ করিয়া কথায় কথায় নানা বিষয়
জানিলেন, পরে বাজার পার হইয়া গেলেন।
প্রশস্ত রাজপথ হইতে একটি গলীতে প্রবেশ
করিলেন, সেখানে রজনীতে দীপ সমস্ত
নির্কাণ হইয়াছে, নাগরিক সকলে দ্বার রুদ্ধ
করিয়া নিদ্রা নিদ্রা আলয়ে সুপ্ত।

ব্রাহ্মণ একাকী অনেক দূর যাইলেন।
আকাশ অন্ধকারময়, কেবল দুই একটি তারা
দেখা যাইতেছে, নাগরিক সকলে সুপ্ত, জগৎ
নিস্তর। ব্রাহ্মণের সন্দেহ হইল। তাঁহার
বোধ হইল যেন, পশ্চাতে তিনি পদশব্দ
শুনিতে পাইলেন। স্থির হইয়া দণ্ডায়মান
রহিলেন, কিন্তু সে পদশব্দ আর শুনিতে
পাইলেন না।

পুনরায় পথ অতিবাহিত করিতে লাগি-
লেন, ক্ষণেক পর পুনরায় বোধ হইল যেন,
পশ্চাতে কে অহুসরণ করিতেছে। ব্রাহ্মণের
হৃদয় ঝবৎ চঞ্চল হইল। এই গভীর নিশীথে
কে তাঁহার অহুসরণ করিতেছে? শব্দ না
মিড? শব্দ হইলে কি তাঁহাকে চিনিতে পারি-

রাছে? উদ্বেগ-পরিপূর্ণ-হৃদয়ে ক্ষণেক চিন্তা
করিলেন, পরে নিঃশব্দে তুলা-নির্ধিত কুণ্ডির
আস্তিনের ভিতর হইতে একখানি তীক্ষ্ণ
ছুরিকা বাহির করিলেন, একটি পথের পার্শ্ব
দেশে দণ্ডায়মান হইলেন, গভীর অন্ধকারের
দিকে ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিয়া রাহিলেন।
কৈ, কেহই নাই, সকলে সুপ্ত, নগর শব্দশূন্য
ও নিস্তর।

সন্দিগ্ধমনা ব্রাহ্মণ আলোকপূর্ণ
বাক্সারে ফিরিয়া গেলেন। তথায় অনেক
দোকান, নানাজাতীয় বিস্তর লোক এখনও
ক্রয়-বিক্রয় করিতেছে, তাহার ভিতর মিশিয়া
যাইবার চেষ্টা করিলেন। আবার তথা
হইতে সহসা এক গলীর ভিতর প্রবেশ
করিলেন, পরে ক্রতবেগে অস্ত্রাজ গলীর
ভিতর দিয়া নগরপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন।
তথায় নিঃশব্দে অনেকক্ষণ খাস-রুদ্ধ করিয়া
দণ্ডায়মান রহিলেন, শব্দমাত্র নাই, চারি-
দিকে পথ, ঘাট, কুটার, অট্টালিকা সমস্ত
নিস্তর, নৈশ গগন হুর্ভেজ অন্ধকার দ্বারা
সমস্ত জগৎকে আবৃত করিয়াছে। সহসা
একটি চীৎকার-শব্দ শ্রুত হইল, ব্রাহ্মণের
হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল, তিনি নিঃশব্দে
দণ্ডায়মান রহিলেন।

ক্ষণেক পর আবার সেই শব্দ হইল,
মহাদেওজীর ভয় দূর হইল, সে নাগরিক
প্রহরী পাহারা দিতেছে। দূর্তাগ্যক্রমে মহা-
দেও যে গলীতে লুক্কায়িত ছিলেন, সেই গলী-
তেই প্রহরী আসিল। গলী অতি সঙ্কীর্ণ।
মহাদেওজী পুনরায় সেই ছুরিকা হস্তে লইয়া
হুর্ভেজ অন্ধকারে দণ্ডায়মান রহিলেন।

প্রহরী দ্বারে দ্বারে এদিক্ ওদিক্ চাহিতে
চাহিতে সেই স্থানে আসিল, মহাদেওজী বে
স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন, সেই দিকে চাহিল।
মহাদেওজীর হৃদয় দ্রুত দ্রুত করিতে লাগিল,

তিনি খাস রুদ্দ করিয়া, হস্তে সেই ছুরিকা
দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

প্রহরী অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইল
না, ধীরে ধীরে সে পথ হইতে চলিয়া গেল।
মহাদেও ধীরে ধীরে তথা হইতে বাহির
হইয়া ললাটের শ্বেদ মোচন করিলেন,
পরে নিকটবর্তী একটি ঘারে আশ্রয়
করিলেন, সারোস্তা খাঁর একজন মহারাষ্ট্রীয়
সেনা বাহির হইয়া আসিল। দুই জনে অতি
সদোপনে নগরের মধ্যে অতি গোপনীয় ও
মহুয্যের অগম্য স্থানে যাইয়া উপস্থিত হই-
লেন। তথায় দুই জনে উপবেশন করিলেন।

ব্রাহ্মণ। সমস্ত প্রস্তুত ?

সেনা। প্রস্তুত।

ব্রাহ্মণ। অহুমতিপত্র পাইয়াছ ?

সেনা। পাইয়াছি।

আবার অস্পষ্ট পদশব্দ শ্রুত হইল। মহা-
দেওজী এবার ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া
ছুরিকাহস্তে সম্মুখে যাইয়া দেখিলেন; অন্ধ-
কারে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন,
কিছু দেখিতে পাইলেন না, ধীরে
ধীরে প্রত্যাবর্তন করিলেন, পরে সেনাকে
বলিলেন, “রক্তহস্তে আসিয়াছ ?”

সেনা বক্ষঃস্থল হইতে ছুরিকা বাহির
করিয়া দেখাইল। ব্রাহ্মণ বলিলেন, “ভাল,
সতর্ক থাকিও। বিবাহ কবে ?”

সেনা। কল্যা।

ব্রাহ্মণ। অহুমতি পাইয়াছ ?

সেনা। হাঁ।

ব্রাহ্মণ। কত জন লোকের ?

সেনা। বাদ্যকর দশ জন ও অস্ত্রধারী
ত্রিশ জন, ইহার অধিক অহুমতি পাইলাম
না।

ব্রাহ্মণ। এই বধেষ্ট, কোন্ সময়ে ?

সেনা। রজনী এক প্রহর।

ব্রাহ্মণ। ভাল, এই দিক হইতে বরষাভ্রা
আরম্ভ হইবে।

সেনা। স্মরণ আছে।

ব্রাহ্মণ। বাদ্যকরেরা সজোরে বাদ্য
করিবে।

সেনা। স্মরণ আছে।

ব্রাহ্মণ। জাতি-কুটুম্ব যত পারিবে
জড় করিবে।

সেনা। স্মরণ আছে।

ব্রাহ্মণ তখন অল্প হাস্য করিয়া বলি-
লেন, “আমি সেই শুভকার্য্যের পুরোহিত।
সে শুভকার্য্যের ঘটা সমস্ত ভারতবর্ষে
রাষ্ট্র হইবে।”

সহসা সজোরে নিকশিত একটি তীর
আসিয়া ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থলে লাগিল। সে
তীরে প্রাণনাশ নিশ্চয় সম্ভব, কিন্তু ব্রাহ্মণের
কুস্তির নীচে লোহ-বর্ষে লাগিয়া তীর
পড়িয়া গেল।

তৎপরেই একটি বর্ষা। বর্ষার আঘাতে
ব্রাহ্মণ ভূমিতে পতিত হইলেন, কিন্তু সে
দুর্ভেদ্য বর্ষা ভিন্ন হইল না, মহাদেও পুনরায়
উঠিলেন; সম্মুখে দেখিলেন, নিকোষিত
অসিহস্তে একজন দীর্ঘ মোগল যোদ্ধা,—
তিনি চাঁদ খাঁ।

অন্য সভাতে সেনাপতি সারোস্তা খাঁ
চাঁদ খাঁকে ভীত বলিয়াছেন।

চাঁদ খাঁর কেশ শুক্ল হইয়াছিল, এ অপবাদ
কেহ তাঁহাকে কখনও দেয় নাই। মনে
মর্মান্তিক বেদনা পাইয়াছিলেন, অস্ত্রকে
তাহা কি জানাইবেন, মনে মনে স্থির
করিলেন, কার্য্য দ্বারা এ অপবাদ দূর করিব,
নচেৎ এই যুদ্ধেই এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণ
ত্যাগ করিব।

ব্রাহ্মণের আচরণ দেখিয়া তাঁহার
সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি শিবজীকে বিশেষ

করিয়া জানিতেন, শিবজীর অসাধারণ ক্ষমতা, তাঁহার বহুসংখ্যক দুর্গ, তাঁহার অপূর্ণ ও দ্রুতগামী সেনা, তাঁহার হিন্দুধর্মে আস্থা, হিন্দুরাজ্যস্থাপনে অভিলাষ, হিন্দু-স্বাধীনতা-স্থাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, এ সমস্ত চাঁদ খাঁর অগোচর ছিল না। যোগলদিগের সহিত যুদ্ধপ্রারম্ভেই যে শিবজী পরাজয়-স্বীকার ও সন্ধি বাজ্ঞা করিবেন, এরূপ সম্ভব নহে, তথাপি এ ব্রাহ্মণ শিবজীর নিদর্শনপত্র দেখাইয়াছে। এ ব্রাহ্মণ কে? ইহার গুপ্ত অভিসন্ধি কি?

ব্রাহ্মণের কথাগুলিতেও চাঁদ খাঁর সন্দেহ জন্মিয়াছিল, মহারাষ্ট্রদিগের নিন্দা শুনিয়া বখন ব্রাহ্মণের নয়ন প্রজ্জ্বলিত হয়, তাহাও তিনি দেখিয়াছিলেন। এ সমস্ত সন্দেহের কথা সায়েস্তা খাঁর নিকট বলেন নাই, সত্য বলিয়া কেন আবার তিরস্কার সহ শুনিবেন? কিন্তু মনে মনে স্থির করিলেন, এই ভণ্ড দৃতকে ধরив। সেই অবধি দূতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন, পথে পথে, গলীতে গলীতে অদ্ভুতভাবে অহুসরণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের জন্তও ব্রাহ্মণ চাঁদ খাঁর নয়নবহির্ভূত হইতে পারে নাই। সেনার সহিত ব্রাহ্মণের যে কথা হয়, তাহাও চাঁদ খাঁ শুনিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি যোদ্ধা তখনই সমস্ত বুঝিতে পারিলেন, এই দৃতকে বিনাশ করিয়া সেনাকে সেনাপতিসমনে লইয়া যাইয়া প্রতিপত্তিলাভের সঙ্কল্প করিলেন; মনে মনে ভাবিলেন, “সায়েস্তা খাঁ! যুদ্ধব্যবসায় বৃথা এ কেশ স্তরু করি নাই, আমি তীক্ষ্ণও নহি, দিল্লীধরের বিরুদ্ধাচারীও নহি। অত্বে যে বড় বজ্রটি ধরিয়া প্রকাশ করিয়া দিব, তাহার পর বোধ হয়, এ প্রাচীন হােসের কথা ছুমি অবহেলা করিবে না।” কিন্তু আশা মারাবিনী।

মহাদেওজী ভূমি হইতে উঠিতে না উঠিতে চাঁদ খাঁ তীর ও বর্শা আঁধ দেখিয়া লক্ষ্য দিয়া তাহার উপর আসিয়া পড়িলেন ও থড়ল বর্ষে লাগিয়া সেবারও প্রতিহত হইল।

“কৃষ্ণে আমার অহুসরণ করিয়াছিল,” এই বলিয়া মহাদেওজী আপন আত্মন গুটাইয়া তীক্ষ্ণ ছুরিকা আকাশের দিকে উত্তোলন করিলেন। নিমেষমধ্যে বজ্রমুটি চাঁদ খাঁর বক্ষঃস্থলে অবতীর্ণ হইল, চাঁদ খাঁর মৃতদেহ ধরাতলশায়ী হইল।

ব্রাহ্মণ যুদ্ধ অধরোষ্ঠের উপর দস্ত স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল। ধীবে ধীরে সেই ছুরিকা পুনরায় লুকাইয়া বলিলেন, “সায়েস্তা খাঁ! মহারাষ্ট্রদিগের নিন্দা করার এই প্রথম ফল, ভবানীর কল্যাণে, দ্বিতীয় ফল কল্যাণ ফলিবো।”

গোছার কর্তব্যকার্যে যে সময়ে চাঁদ খাঁ জীবনদান করিলেন, সেনাপতি সায়েস্তা খাঁ সে সময়ে বড় সুখে নিজা বাইতেছিলেন, শিবজীকে বশীকরণ-বিষয়ে সুখস্বপ্ন দেখিতে-ছিলেন।

মহারাষ্ট্রীয় সেনা এই সমস্ত ব্যাপার বিস্মিত হইয়া বলিল, “প্রভু, কি করিলেন? কল্যাণ এ বিষয়ে গোল হইবে, আমাদের সমুদয় সঙ্কল্প বৃথা হইবে।”

ব্রাহ্মণ। কিছুমাত্র হইবে না। আমি জানিয়াছি, চাঁদ খাঁ অদ্য সভায় অপমানিত হইয়াছেন, এখন কয়েক দিন সভায় না যাইলেও কেহ সন্দেহ করিবে না। এই মৃতদেহ ঐ গভীর কূপে নিক্ষেপ কর, আর শরণ রাখিও, কল্যাণ রজনী এক প্রহরকালে।

সেনা। রজনী এক প্রহরকালে।

ব্রাহ্মণ নিঃশেষে পুনানগর ত্যাগ করিলেন। তিন চার স্থানে প্রহরিগণ তাঁহাকে ধরিল, তিনি সায়েস্তা খাঁর আকরিত

অচ্যুতপিতৃ দেবী হইয়া নিরাপদে পুনা হইতে
বর্গিত হইলেন ।

করিতে পাঠান নাই, খেদ করিতে পাঠা-
ইয়াছেন ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

—:—

রাজা যশোবন্ত সিংহ ।

কোন কর্মতে কর দাসে জনি,
জাতিব্রাহ্মণ্য ভাতি—এ সকলে দিলা
জলাভাস ? শাস্ত্রে বলে গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন তথাপি
নিগুণ স্বজন শ্রেয়ঃ পর পর সদা ।

মধুসূদন দত্ত ।

রজনী প্রহর-সময় রাজপুত-রাজা যশো-
বন্ত সিংহ একাকী শিবিরে বসিয়া রহিয়াছেন ।
হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া এই গভীর নিশী-
থেও তিনি কি চিন্তা করিতেছেন? সম্মুখে
কেবল একটিমাত্র দীপ জ্বলিতেছে, শিবিরে
অন্ত লোকমাত্র নাই । সংবাদ আসিল,
মহারাজীয়দূত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন ।
যশোবন্ত তাঁহাকে আনয়ন করিতে কহিলেন,
তাঁহারই জন্ত তিনি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন ।

মহাদেওজী ত্রায়শাস্ত্রী শিবিরে আসি-
লেন, যশোবন্ত তাঁহাকে সাদরে আহ্বান
করিয়া উপবেশন করিতে বলিলেন । উভয়ে
উপবেশন করিলেন ।

ক্ষণেক যশোবন্ত নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন,
কি চিন্তা করিতেছিলেন । মহাদেও নিঃশব্দে
রাজপুতের দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিতেছিলেন ।
পরে যশোবন্ত বলিলেন, “আমি আপনার
প্রভুর পত্র পাইয়াছি । তাহাতে বাহা
লিখিত আছে, অবগত হইয়াছি । তাহা ভিন্ন
অন্ত কোন প্রস্তাব আছে ?”

মহাদেও । প্রভু আমাকে কোন প্রস্তাব

বশোবস্ত । কেবল পুনা ও চাকন-ভূগ
আবাদিগের হস্তগত হইয়াছে যাত্র, এই
জন্ত খেদ ?

মহাদেও । ভূগনাশে তিনি ক্ষুব্ধ নহেন,
তাঁহার অসংখ্য ভূগ আছে ।

যশোবন্ত । যোগল-বুদ্ধস্বরূপ বিপদে
পড়িয়া তিনি খেদ করিতেছেন ?

মহাদেও । বিপদে পড়িলে খেদ করা
তাঁহার অভ্যাস নাই ।

যশোবন্ত । তবে কি জন্ত খেদ
করিতেছেন ?

মহাদেও । যিনি হিন্দুরাজতিলক, যিনি
কজ্রিয়ক্লাবতংস, যিনি সনাতন ধর্মের
রক্ষাকর্তা, তাঁহাকে অদ্য রেজের দাস দেখিয়া
প্রভু ক্ষুব্ধ হইয়াছেন ।

যশোবন্তের মুখমণ্ডল ঈষৎ আরক্ত হইল ।
মহাদেও তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না,
গভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, “উদয়পুরের
রাণার বংশে যিনি বিবাহ করিয়াছেন,
মাতৃওয়ারের রাষ্ট্রদ্রোহী বাহার মন্তকের উপর
বৃত্ত হইয়াছে, রাজস্থান বাহার সুখ্যাতিতে
পরিপূর্ণ রহিয়াছে, সিপ্রাতীরে বাহার বাহ-
বিক্রম দেখিয়া আরংজীব ভীত ও বিস্মিত
হইয়াছিলেন, ‘সমগ্র ভারতবর্ষ বাহাকে সনা-
তন হিন্দুধর্মের স্তম্ভরূপ জ্ঞান করে, দেশে
দেশে, গ্রামে গ্রামে, মন্দিরে মন্দিরে বাহার
জয়ের জন্য হিন্দুযাজ্জেই, ব্রাহ্মণযাজ্জেই জগ-
দীশ্বরের নিটক প্রার্থনা করে, অদ্য তাঁহাকে
মুসলমানের পক্ষ হইয়া হিন্দুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করিতে দেখিয়া প্রভু ক্ষুব্ধ হইয়াছেন ।
রাজন ! আমি সামান্য দূতমাত্র, আমি কি
বলিতেছি, জানি না, অপরাধ হইলে মার্জনা
করিবেন, কিন্তু এ যুদ্ধসজ্জা কেন ? এ সৈন্য-

সামন্ত কেন? এ সমস্ত বিজয়পতাকা কি
কল্প উদ্ভূত হইতেছে? স্বাধিকার বৃদ্ধি
করিবার জন্ত? হিন্দুস্বাধীনতা স্থাপন করি-
বার জন্ত? ক্ষত্রিয়োচিত যশোলাভের জন্ত?
আপনি ক্ষত্রকুলধ্বজ। আপনি বিবেচনা
করুন, আমি জানি না।”

যশোবন্ত অধোবদনে রহিলেন। মহাদেও
আরও বলিতে লাগিলেন, “আপনি রাজ-
পুত্র, মহারাজার পুত্র, রাজপুত্র-পুত্র, পিতা-
পুত্রের যুদ্ধ সম্ভবে না, স্বয়ং ভবানী এ যুদ্ধ
নিষেধ করিয়াছেন। আপনি আজ্ঞা করুন,
আমরা পালন করিব। রাজপুত্রের গৌরবই
অনাথ ভারতবর্ষের একমাত্র গৌরব, রাজ-
পুত্রের যশোগীত আমাদের রমণীগণ
এখনও গাইয়া থাকে, রাজপুত্রদিগের উদা-
হরণ দেখিয়া আমাদের বালকগণ শিক্ষিত
হয়। ক্ষত্রকুলভিলক! রাজপুত্র-শোণিতে
আমাদের খড়্গ রঞ্জিত হইবার পূর্বে যেন
মহারাজ-নাম বিলুপ্ত হয়, রাজ্য বিলুপ্ত হয়,
আমরা যেন বর্ষা ও খড়্গ ভ্যাগ করিয়া পুন-
রায় লাঞ্ছন ধারণ করিতে শিখি।”

যশোবন্ত সিংহ তখন নয়ন উঠাইয়া ধীরে
ধীরে বলিলেন, “দূতপ্রধান! তোমার কথা-
গুলি বড় মিষ্ট, কিন্তু আমি দিল্লীশ্বরের
অধীন, মহারাজার সহিত যুদ্ধ করিব বলিয়া
আসিয়াছি, মহারাজার সহিত যুদ্ধ করিব।”

মহাদেও। এবং শত শত বধুস্বর্গকে
নাশ করিবেন, হিন্দু হিন্দুর মস্তকচ্ছেদন
করিবেন, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের বক্ষে ছুরিকা
বসাইবে, ক্ষত্রিয়ের শোণিতস্ত্রোতে ক্ষত্রিয়-
শোণিতস্ত্রোতে মিশাইবে, শেষে য়েজ্ঞ-সম্রা-
টের সম্পূর্ণ জয় হইবে।

যশোবন্তের মুখ আরক্ত হইল, কিন্তু
উদ্বেগ সংবরণ করিয়া ক্রিষ্ণ কক্শভাবে
বলিলেন, “কেবল দিল্লীশ্বরের অয়ের জন্ত

যুদ্ধ নহে, আমি তোমার প্রভুর সহিত
কিরূপে মিত্রতা করিব? শিবজী বিজোহা-
চারী, চতুর শিবজী অত্যাচার, অত্যাচার
অনায়াসে কল্যা ভঙ্গ করে।”

এবার ব্রাহ্মণের নয়ন প্রজ্জ্বলিত হইল,
তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, “মহারাজ,
সাবধান, অলীক নিম্না আপনাকে সাজে
না। শিবজী কবে হিন্দুর নিকট যে বাক্য-
দান করিয়াছেন, তাহার অত্যাচার করিয়াছেন?
কবে ব্রাহ্মণের নিকট যে পণ করিয়াছেন,
ক্ষত্রিয়ের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,
তাহা বিশ্বস্ত হইয়াছেন? দেশে শত শত
গ্রাম, শত শত দেবালয় আছে, স্বত্বসন্ধান
করুন, শিবজী সত্যপালন করিতে, ব্রাহ্মণকে
আশ্রয় দিতে, হিন্দুর উপকার করিতে, গো
বৎসাদি রক্ষা করিতে, দেবদেবীর পূজা দিতে
কবে পরাজুথ? তবে মুসলমানদিগের সহিত
যুদ্ধ! জেতা ও বিজিতদিগের মধ্যে কবে
কোন দেশে সখ্যতা? বজ্রনখ যখন সর্পকে
ধারণ করে, সর্প সে সময় মৃতবৎ হইয়া
থাকে; মৃত বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ
করিবামাত্র জর্জরিত-শরীর নাগরাজ সময়
পাইয়া দংশন করে। এটি বিজোহাচার,
না স্বভাবের রীতি? কুকুর যখন খরগসকে
ধরিবার চেষ্টা করে, খরগস প্রাণরক্ষার জন্ত
কত বদ্ধ করে, একদিকে পলাইবার উদ্যোগ
করিয়া সহসা অন্য দিকে যায়। এটি চাতুরী,
না স্বভাবের রীতি? যাবতীয় জীবজন্তুকে
জগদীশ্বর যে প্রাণরক্ষার বদ্ধ ও উপায়
শিখাইয়াছেন, মহুযাকে কি তিনি সে উপায়
শিখান নাই? আমাদের প্রাণের প্রাণ,
জীবনের জীবনস্বরূপ স্বাধীনতা যে মুসল-
মানেরা শত শত বৎসর অবধি হরণ করি-
রাছে, হৃদয়ের শোণিতস্বরূপ বল, মান,
দেশ, গৌরব ও ধর্ম বিনাশ করিতেছে,

তাহাদিগের সহিত আমাদিগের সখ্যতা ও সত্যসম্বন্ধ ? তাহাদিগের নিকট হইতে যে উপায়ে সেই জীবনস্বরূপ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারি, স্বার্থ ও জাতিগৌরব রক্ষা করিতে পারি, সে উপায় কি চতুরতা ? সে উপায় কি নিশ্চিন্দ ? জীবনরক্ষার পলায়ন-পটু যুগের নীড়গতি কি বিদ্রোহ ? শাবককে বাঁচাইবার জন্য পক্ষী যে অগ্নিহরকে অন্তরিক্তে লইয়া যাইতে যত্ন করে, সেটি কি নিশ্চিন্দ ? ক্ষত্রিয়রাজ ! দিনে দিনে মুসলমানদিগের নিকটে মহারাজ্যীয় চতুরতার নিন্দা শুনিতে পাই, কিন্তু হিন্দু-প্রবর ! আপনি হিন্দু-জীবনরক্ষার একমাত্র উপায়কে নিন্দা করিবেন না, শিবজীকে নিন্দা করিবেন না ।”—মহাদেওজীর অলস নয়নদয় জলে প্রাবিত হইল ।

ব্রাহ্মণের চক্ষু জল দেখিয়া যশোবন্ত হৃদয়ে বেদনা পাইলেন,—বলিলেন, “দূতপ্রবর ! আমি আপনাকে কষ্ট দিতে চাহি না, যদি অন্তায় বলিয়া থাকি, মাৰ্জ্জনা করিবেন । আমি কেবল এইমাত্র বলিতে-ছিলাম যে, রাজপুতগণও স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে, কিন্তু তাহারা সাহস ও সম্মুখরণ ভিন্ন অন্য উপায় করেন না । মহারাজ্যীয়েরাও কি সেই উপায় অবলম্বন করিয়া সেইরূপ ফললাভ করিতে পারে না ?”

মহাদেও । মহারাজ ! রাজপুতদিগের পুরাতন স্বাধীনতা আছে, বিপুল অর্থ আছে, দুর্গম পর্বত বা মরুবেষ্টিত দেশ আছে, সুন্দর রাজধানী আছে, সহস্র বৎসরের অপূর্ণ রণশিক্ষা আছে, মহারাজ্যীয়দিগের ইহার কোনটি আছে ? তাহারা দরিদ্র, তাহারা চিরপরাধীন, তাহাদের এই প্রথম রণশিক্ষা । আপনাদিগের দেশ আক্রমণ করিলে আপনারা পুরাতন রীত্যাচরণে

যুদ্ধ দেন, পুরাতন দুর্ধ্ব ভেজ ও বিক্রম প্রকাশ করেন, অসংখ্যক রাজপুত-সেনার সম্মুখে দিল্লীর সেনা পলায়ন করে । আমাদিগের দেশ আক্রমণ করিলে আমরা কি করিব ? পূর্বরীতি বা রণশিক্ষা নাই, অসংখ্য সৈন্ত নাই, বাহারা আছে, তাহারা কখনও রণ দেখে নাই । যখন দিল্লীর কবুল, পঞ্জাব, অযোধ্যা, বিহার, মালব, বীরপ্রসবিনী রাজস্থানকুমি হইতে সহস্র সহস্র পুরাতন রণদর্শী বোদ্ধা প্রেরণ করে—, যখন অপরূপ বৃহৎ ও অনিবার্য রণ-অশ্ব ও রণ-গজ প্রেরণ করেন, যখন তাঁহার কামান, বন্দুক, বারুদ, গোলা, রৌপ্যমুদ্রা, স্বর্ণমুদ্রা সহস্র সহস্র শকটে আনিয়া রাশীকৃত করেন, তখন দরিদ্র মহারাজ্যীয়েরা কি করিবে ? তাহাদিগের সেরূপ অসংখ্য যুদ্ধদর্শী সেনা নাই, সেরূপ অশ্ব-গজ নাই, সেরূপ বিপুল অর্থ নাই । অরিতগতি ও পর্বতযুদ্ধ ভিন্ন তাহাদিগের আর কি উপায় আছে ? ক্ষত্রিয়রাজ । জীবনপ্রান্তে দরিদ্রতাভিগ্ন এইরূপ আচরণ ভিন্ন উপায় নাই । জগদীশ্বর করুন, মহারাজ্যীয়জাত দীর্ঘজীবী হউক, তাহাদিগের অর্থ ও যুদ্ধায়োজনের উপায় সংস্থাপন হইলে, তই তিন শত বৎসরের রণশিক্ষা হইলে, তাহারাও রাজপুতের অসাধারণ তপ অতীকরণ করিবে ।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া যশোবন্ত চিন্তায় অভিভূত হইয়া রহিলেন, হস্তে লজাটস্থাপন করিয়া একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন । মহাদেও দেখিলেন, তাহার বাক্যগুলি নিতান্ত নিফল হয় নাই, আবার ধারে ধারে বলিতে লাগিলেন, “আপনি হিন্দুশ্রদ্ধা হিন্দুগৌরবসাধনে সন্বেহ করিতেছেন কেন ? হিন্দুধর্মের জয় অবশ্যই আপনি ইচ্ছা করেন, শিবজীর ইচ্ছা ভিন্ন অন্য ইচ্ছা

নাই। মুসলমানশাসন-ধ্বংসকরণ, হিন্দুজাতির গৌরবসাধন, স্থানে স্থানে দেবালয়-স্থাপন, সনাতন ধর্মের গৌরববৃদ্ধি, হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা, ব্রাহ্মণকে আশ্রয়দান, গোবৎসাদি রক্ষাকরণ, ইহা ভিন্ন শিবজীর অন্য উদ্দেশ্য নাই। এ বিষয়ে যদি তাঁহাকে সাহায্য করিতে বিমুখ হন, তবে স্বহস্তে এই কার্যসাধন করুন। আপনি এই দেশের রাজত্ব গ্রহণ করুন, মুসলমানদিগকে পরাস্ত করুন, মহারাষ্ট্রে হিন্দুস্বাধীনতা স্থাপন করুন। আদেশ করুন, দুর্গের দ্বার এইরূপেই উন্মোচিত হইবে, প্রজারা আপনাকে কর দিবে, আপনি শিবজী অপেক্ষা সহস্রগুণ বলবান্, সহস্রগুণ দূরদর্শী, সহস্রগুণ উপযুক্ত। শিবজী সন্তুষ্টচিত্তে আপনার একজন সেনাপতি হইয়া মুসলমানদিগের ধ্বংসসাধন করিবেন। তাঁহার অন্য বাসনা নাই।”

এই প্রস্তাবে উচ্ছালিতা যশোবন্তের নরন যেন অনুন্দে উৎফুল্ল হইল। অনেক-ক্ষণ চিন্তা করিলেন, কিন্তু অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলেন, “মাড়ওয়ার ও মহারাষ্ট্র অনেক দূর, এক রাজার অধীনে থাকিতে পারেন না।”

মহাদেও। তবে আপনার উপযুক্ত পুত্র থাকিলে তাঁহাকেই এই রাজ্য দিন। নচেৎ কোন আত্মীয় বোদ্ধাকে দিন। শিবজী ক্ষত্রিয়-রাজার অধীনে কার্য করিবে, কিন্তু কদাচ ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধ করিবে না।

যশোবন্ত। এই বিপদকালে আরং-জীবের সহিত যুদ্ধ করিয়া এ দেশ রাখিতে পারিবে, এমত আত্মীয় নাই।

মহাদেও। কোন ক্ষত্রিয় সেনাপত্তিকে নিযুক্ত করুন। হিন্দুধর্ম ও স্বাধীনতা রক্ষা হইলে শিবজীর মনস্কামনা পূর্ণ হইবে,

শিবজী সানন্দচিত্তে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন।

যশোবন্ত। সেরূপ সেনাপতি নাই।

মহাদেও। তবে যিনি এই মহৎ কার্যসাধন করিতে পারিবেন, তাঁহাকে সাহায্য করুন। আপনার সাহায্যে, আপনার আশীর্বাদে, শিবজী অবশ্যই স্বদেশের ও স্বধর্মের গৌরবসাধন করিতে পারিবেন। ক্ষত্রিয়রাজ! ক্ষত্রিয়বোদ্ধাকে সহায়তা করুন, ভারতবর্ষে এরূপ হিন্দু নাই, আকাশে এরূপ দেবতা নাই, যিনি এজন্য আপনাকে প্রশংসাবাদ না করিবেন।

যশোবন্ত। দ্বিজবর, তোমার তর্ক অলঙ্ঘনীয়, কিন্তু দিল্লীস্থর আমাকে স্নেহ করিয়া এই কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমি কিরূপে এরূপ আচরণ করিব? সে কি ভদ্রোচিত?

মহাদেও। দিল্লীস্থর যে হিন্দুগণকে কাকের বলিয়া জিজিয়া কর স্থাপন করিয়াছেন, সে কার্য কি ভদ্রোচিত? দেশে দেশে যে হিন্দুমন্দির, হিন্দুদেবদেবীর অবমাননা করিতেছেন, সে কি ভদ্রোচিত? কালীর পবিত্র মন্দির চূর্ণ করিয়া তাহার প্রস্তর দ্বারা সেই পুণ্যধামে মসজিদ নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছেন, সে কি ভদ্রোচিত?

ক্রোধকম্পিতস্বরে যশোবন্ত বলিলেন, “দ্বিজবর! আর বলিবেন না, যথেষ্ট হইয়াছে। অত্যাধি-শিবজী, আমার মিত্র, আমি শিবজীর মিত্র; অত্যাধি শিবজীর পণ ও আমার পণ এক, শিবজীর চেষ্টা ও আমার চেষ্টা অভিন্ন! সেই হিন্দুবিরোধী দিল্লীস্থরের বিরুদ্ধে এত দিন যিনি যুদ্ধ করিয়াছেন, সে মহাত্মা কোথায়? একবার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ের সন্তাপ দূর করি।”

ব্রাহ্মণবেশধারী দূত তখন ব্রাহ্মণবেশ ত্যাগ করিলেন, ব্রাহ্মণের উকীষের নীচে বোদ্ধার শিরস্ত্রাণ দৃষ্ট হইল, তুলার কুর্তির নীচে লৌহ-বর্ষ প্রকাশিত হইল ! মহারাষ্ট্রীয় বীর ধীরে ধীরে বলিলেন, “রাজন্ ! ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আপনার নিকটে আসিয়াছিলাম, সে দোষ গ্রহণ করিবেন না। এ দাস ব্রাহ্মণ নহে, মহারাষ্ট্রীয় ক্ষত্রিয় ;—নাম মহাদেওজী নহে, দাসের নাম শিবজী !”

রাজা যশোবন্ত সিংহ বিস্ময় ও হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে সেই খাতনামা মহারাষ্ট্র-বোদ্ধার দিকে চাহিয়া রহিলেন, চকিত হইয়া সেই দিল্লীশ্বরের প্রতিষন্দী, দাক্ষিণাত্যের বীরশ্রেষ্ঠ শিবজীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণেক পর গাত্রোথান করিয়া সানন্দে ও সজল-নয়নে সেই পরম-শত্রুকে আলিঙ্গন করিলেন। শিবজীও সম্মান ও প্রণয়ের সহিত খাতনামা রাজপুত-বীরকে আলিঙ্গন করিলেন।

সমস্ত রাত্রি কথোপকথন হইল, যুদ্ধের সমস্ত কথা ঠিক হইল, তৎপরে শিবজী বিদায় লইলেন। বিদায় লইবার সময়ে কহিলেন, “মহারাজ, অগ্রহ করিয়া কল্যাণ কোন ছলে পুনা হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে থাকিলে ভাল হয়।”

যশোবন্ত। কেন, কল্যাণ তুমি পুনা হস্ত-গত করিবার চেষ্টা করিবে ?

মহারাষ্ট্রীয়বীর হাস্ত করিয়া বলিলেন; “না, একটি বিবাহকার্য্য সম্পাদন হইবে, মহারাজ থাকিলে শুভকার্য্যে ব্যাঘাত হইতে পারে।”

যশোবন্ত। ভাল, দূরেই থাকিব। বিবাহকার্য্যের মজাদি ভায়শাস্ত্রী মহাশয়ের এক্ষণে স্বরণ আছে কি ?

শিবজী। আছে বৈ কি। আমার শাস্ত্রবিদ্যা দেখিয়া দিল্লীর সেনাপতি সায়ের্ত্তা থাঁ বিস্মিত হইয়াছেন। কল্যাণ তিনি অন্তরূপ বিদ্যা দেখিবেন।

যশোবন্ত দ্বার পর্য্যন্ত সঙ্গে বাইলেন, পরে বিদায়ের সময়ে বলিলেন, “তবে যুদ্ধবিষয়ে যেরূপ কথোপকথন হইল, সেইরূপ কার্য্য করিবেন।”

শিবজী। সেইরূপ কার্য্য করিবার জন্ত প্রভু শিবজীকে বলিব !

যশোবন্ত। “হা, বিস্মৃত হইয়াছিলাম, সেইরূপ কার্য্য করিতে আপনার প্রভুকে বলিবেন।” এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে যশোবন্তসিংহ শিবিরান্তান্তরে প্রবেশ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

শিবজী ।

অম্বর উজ্জিষ্ট গ্রাসি পুষ্ট কলেবর !
অম্বর-পদারবজঃ শোভিত মস্তকে !
তার চেয়ে শতবার পশিব গগনে,
প্রকাশি অমরবীৰ্য্য সময়ের স্রোতে,
ভাসিব অনন্তকাল দৈত্যের সংগ্রামে,
দেবরক্ত যত দিন না হবে নিঃশেষ ।

হেবচল্ল বক্ষ্যোপাধ্যায় ।

পূর্বদিকে রক্তমাচ্ছটা দেখা বাইতেছে, এমন সময়ে ব্রাহ্মণবেশধারী শিবজী সিংহ-গড়ে প্রবেশ করিলেন। উকীষ ও তুলার কুর্তি ফেলিয়া দিলেন, প্রাতঃকালের আলোকে মস্তকের লৌহ-শিরস্ত্রাণ ও শরীরের বর্ষ বক্ষক করিয়া উঠিল। বক্ষঃস্থলে তীক্ষ্ণ ছুরিকা, কোষে “ভবানী” নামক প্রসিদ্ধ খড়্গ। বক্ষঃস্থল বিশাল শরীর ঈষৎ

বরু বটে, কিন্তু সুবহু, সুদৃঢ়বন্ধনী ও পেটী-
গুলি বর্মের নীচে হইতেও কেহা যাইতেছে।
পেশোরা মুরেশ্বর ত্রিমূল সানকে তাঁহাকে
আহ্বান করিয়া বলিলেন, “ভবানীর জয়
হউক! আপনি এতক্ষণ পরে কুশলে কিরিয়া
আসিলেন।”

শিবজী আপনার আশীর্বাদে কোন্
বিপদ হইতে উদ্ধার না পাইয়াছি?

মুরেশ্বর। সমস্ত স্থির হইয়াছে।

শিবজী। সমস্ত।

মুরেশ্বর। অত্ন রাত্রে বিবাহ?

শিবজী। অত্নই।

মুরেশ্বর। সারেসতা খাঁ কিছু জানেন
না? তাম্রপুন্ডি চাঁদ খাঁ কিছু জানেন না?

শিবজী। সারেসতা খাঁ ভীত শিবজীর
নিকট হইতে সন্ধিপ্ৰার্থনা প্রতীক্ষা করিতে-
ছেন; যোদ্ধা চাঁদ খাঁ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত,
তিনি আর যুদ্ধ করিবেন না।

মুরেশ্বর। রোজা যশোবন্ত?

শিবজী। আপনি পত্রে যে সমস্ত যুক্তি
দেখাইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার মন বিচ-
লিত হইয়াছিল। আমি যাইয়াই দেখিলাম,
তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিয়াছেন,
সুতরাং অনায়াসেই আমার কার্য সিদ্ধ
হইল।

মুরেশ্বর। ভবানীর জয় হউক!
আপনি এক রাত্রে একাকী যে কার্যসাধন
করিলেন, তাহা সহস্রের অসাধ্য! যে
অসমসাহস্য কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন,
তাঁহািলে এখনও হৃৎকম্প হয়। প্রভো,
একপ কার্যে আর প্রবৃত্ত হইবেন না, আপ-
নার অমঙ্গল হইলে মহারাষ্ট্রের কি
থাকিবে?

শিবজী। মুরেশ্বর! বিপদে ভয় করিলে
অভাববি আত্মীয়দার মাত্র থাকিতাম,

বিপদে ভয় করিলে এ মহৎ উদ্দেশ্য কিরূপে
সাধন হইবে? চিরজীবন বিপদে আচ্ছন্ন
থাকি, কতি নাই, কিন্তু ভবানী করুন যেন,
মহারাত্রীদেশ স্বাধীন হয়।

মুরেশ্বর। বীরশ্রেষ্ঠ! আপনার জয়
অনিবার্য, স্বয়ং ভবানী সহায়তা করিবেন।
কিন্তু দ্বিশহর রজনীতে, শত্রুশিবিরে,
একাকী ছদ্মবেশে?

শিবজী। এ তো শিবজীর অভ্যস্ত
কার্য। কিন্তু অত্ন সত্যই অত্ন একটি মহা
বিপদে পতিত হইয়াছিলাম।

মুরেশ্বর। কি?

শিবজী। এমন মূর্খকেও আপনি
সংস্কৃত শ্লোক শিখাইয়াছিলেন? যে আপ-
নার নাম স্বাক্ষর করিতে পারে না, সে
শ্লোক স্মরণ রাখিবে?

মুরেশ্বর। কেন, কি হইয়াছিল?

শিবজী। আর কিছু নহে, সারেসতা
খাঁর সভায় যাইয়া ভারশাস্ত্রী মহাশয় প্রায়
সমস্ত শ্লোকগুলি ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

মুরেশ্বর। তাহার পর?

শিবজী। হুই একটি মনে ছিল, তদ্ভা-
রায় কার্যসিদ্ধি হইল।

শিবজীর সহিত আমাদিগের এই
প্রথম পরিচয়; এই স্থলে তাঁহার পূর্ব-
বৃত্তান্ত আমরা কিছু বলিতে চাই। প্রতি-
হাসজ্ঞ পাঠক ইচ্ছা করিলে এই পরিচ্ছেদের
অবশিষ্ট অংশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে
পারেন।

শিবজী ১৬২৭ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ
করেন, সুতরাং আখ্যায়িকা-বিবৃতি সময়ে
তাঁহার বয়স ৩৬ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার
পিতার নাম শাহজী; পিতামহের নাম
মল্লজী। আমরা প্রথম অধ্যায় ফুলতন
দেশের দেশমুখ প্রসিদ্ধ নিমলকরবংশের

কথা বলিয়াছি, সেই বংশের যোগপাল রাণানায়কের ভগিনী দীপাবাইকে মল্লজী বিবাহ করিয়াছিলেন। অনেকদিন অবধি সন্তানাদি না হওয়ায় আহম্মদনগরবাসী শাহশরীফ নামক একজন মুসলমান পীরের নিকট মল্লজী অনেক অমূল্যবোধ করেন এবং পীরও মল্লজীর সন্তানার্থে প্রার্থনাদি করেন। তাহারই কিছু পরে দীপাবাইয়ের গর্ভে একটি সন্তান হওয়াতে মল্লজী সেই পীরের নামানুসারে পুত্রের নাম শাহজী রাখিলেন।

সে সময়ে যাদবরাও নামে আহম্মদনগরে প্রসিদ্ধনামা একজন সেনাপতি ছিলেন; তিনি দশ সহস্র অশ্বরোহীর নেতা এবং প্রশস্ত জায়গীর ভোগ করিতেন। ১৫৯২ খৃঃ অব্দে হলীর দিনে মল্লজী আপন সন্তান শাহজীকে লইয়া যাদবরাওয়ের বাড়ী গিয়াছিলেন। শাহজীর বয়স তখন পাঁচ বৎসর মাত্র, যাদবরাওয়ের কস্তা জীজীর বয়স তিন কি চারি বৎসর, সুতরাং বালক-বালিকা বড় আনন্দে একত্রে ক্রীড়া করিতে লাগিল। তদর্শনে যাদবরাও সম্ভ্রত হইয়া আপন কস্তাকে ডাকিয়া বলিলেন, “কেমন, তুই এই বালকটিকে বিবাহ করিবি?” পরে অন্তান্ত লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “তুই জনে কি সুন্দর যোড় মিলিয়াছে!” এই সময়ই শাহজী ও জীজী পরস্পরের দিকে ফাগ নিক্ষেপ করায় সকলেই হাস্য করিয়া উঠিল, কিন্তু মল্লজী সহসা দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, “বন্ধুগণ! সাক্ষী থাকিও, যাদবরাও আমার বৈবাহিক হইবেন, অল্প প্রতিশ্রুত হইলেন।” সকলে এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। যাদবরাও উচ্চবংশজ, শাহজীর সহিত আপনার কস্তার বিবাহ দিতে কখনই

বাসনা করেন নাই, কিন্তু মল্লজীর এই চতুরতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলেন।

পরদিন যাদবরাও মল্লজীকে নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু বৈবাহিক বলিয়া স্বীকার না করিলে মল্লজী বাইবেন না, বলিয়া পাঠাইলেন। যাদবরাও সেরূপ স্বীকার করিলেন না, সুতরাং মল্লজী আসিলেন না। যাদবরাওয়ের গৃহিণী যাদবরাও হইতেও বংশমর্যাদার অধিক অভিমানিনী। কথিত আছে যে, যাদবরাও রহস্ত করিয়া আপন চাহিতার সহিত শাহজীর বিবাহ দিবেন বলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার গৃহিণী তাঁহাকে বিলক্ষণ ছুই চারি কথা শুনাষ্টয়া দিলেন। মল্লজী সরোবে একটি গ্রামে চলিয়া গেলেন ও প্রকাশ করিলেন যে, ভবানী সাক্ষ্য অবতীর্ণা হইয়া তাঁহাকে বিপুল অর্থ দিয়াছেন। মহারাজীরদিগের মধ্যে জনশ্রুতি আছে যে, ভবানী এই সময়ে মল্লজীকে বলিয়াছেন, “মল্লজী! তোমার বংশে একজন রাজা হইবেন, তিনি শত্ৰুর স্তায় গুণাধিত হইবেন, মহারাজ্যেশে স্তায়-বিচার পুনঃস্থাপন করিবেন এবং ব্রাহ্মণ ও দেবালয়ের শত্রুদিগকে দূরীভূত করিবেন। তাহার সময় হইতে কালগণনা হইবে ও তাহার সন্তানসন্ততি সম্ভবিশ পুরুষ পর্য্যন্ত সিংহাসনারূঢ় থাকিবেন।”

সে যাহা হউক, মল্লজী যে এই সময়ে বিপুল অর্থ পাইয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। সেই অর্থের দ্বারা আত্মোন্নতির চেষ্টা করিলেন ও এ বিষয়ে তাঁহার স্ত্রীলক যোগপালও তাঁহাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। অচিরে মল্লজী আহম্মদনগরের সুলতানের অধীনে পঞ্চ সহস্র অশ্বরোহীর সেনাপতি হইলেন ও রাজ্য খেতাপ প্রাপ্ত হইয়া সুবর্ণী ও চাকন-দুর্গ

এবং তৎপার্বর্ষ দেশের ভার প্রাপ্ত হইলেন। তিনি জায়গীরদার পূনা ও সোপা-নগর পাইলেন। তখন আর যাদবরাওরের কোন আপত্তি রহিল না। ১৮-৪ খৃঃ অব্দে মহাসমারোহে শাহজীর সহিত জীজীর বিবাহ হইল, আহম্মদনগরের সুলতান অরং সেই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। তখন শাহজীর বয়স্ক্রম ১০ বৎসর মাত্র। কালক্রমে যদবীর মৃত্যুর পর শাহজী পৈতৃক জায়গীর ও পদ প্রাপ্ত হইলেন।

এই সময়ে দিল্লীখর আকবরশাহ আহম্মদনগর-রাজ্য দিল্লীর অধীনে আনিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছিলেন। আকবরশাহ কতক পরিমাণে জয়লাভ করিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর সম্রাট জাহাঙ্গীরও সেই উত্তমে ব্যাপৃত রহিলেন। এই যুদ্ধকালে শাহজী সুস্থ ছিলেন না। ১৬২০ খৃঃ অব্দে (জাহাঙ্গীরের শাসনকালে) তিনি আহম্মদনগরের প্রধান সেনাপতি মালীক অমরের অধীনে ছিলেন ও একটি মহাযুদ্ধে আপন সাহস ও বিক্রম প্রকাশ করিয়া সকলেরই সম্মানভাজন হইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর সম্রাট শাজিহান সেনাপতি শাহজীকে পঞ্চ সহস্র আখারোহীর সেনাপতি করিয়া অনেক জায়গীর দান করেন। কিন্তু সম্রাটদিগের অত্যাচার অসহ্য কলা থাকে না, তিন বৎসর পর সম্রাট শাহজীর কতকগুলি জায়গীর কাড়িয়া লইলেন। শাহজী বিরক্ত হইয়া বিজয়পুরে সুলতানের পক্ষ অবলম্বন করিলেন ও মৃত্যু পর্যন্ত বিজয়পুরের সুলতানের অধীনে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

পতনোন্মুখ আহম্মদনগররাজ্যের স্বাধীনতার জন্য শাহজী দিল্লীর সেনার সহিত অনেক যুদ্ধ করিলেন। সুলতান

শত্রু-হস্তে পতিত হইলে শাহজী সেই বংশের আর একজনকে সুলতান করিয়া সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, কতকগুলি বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের সাহায্যে দেশশাসনের সুন্দর রীতি স্থাপন করিলেন, বহুসংখ্যক দুর্গ হস্তগত করিলেন ও সুলতানের নামে সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

সম্রাট শাজিহান এই সমস্ত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া শাহজী ও তাঁহার পুত্র বিজয়পুরের সুলতানকে দমন করিবার জন্য বহুসংখ্যক আখারোহী ও পদাতিক প্রেরণ করিলেন। দিল্লীখরের সহিত যুদ্ধ করা বিজয়পুরের সুলতান বা শাহজীর সাধ্য নহে; করেক বৎসর যুদ্ধের পর স্থাপন হইল; আহম্মদনগর-রাজ্য বিলুপ্ত হইল (১৬৩৭)। শাহজী বিজয়পুরের অধীনে জায়গীরদার ও সেনাপতি রহিলেন এবং সুলতানের আদেশানুসারে কর্ণাট দেশের অনেক অংশ জয় করিলেন। সুতরাং বিজয়পুরের উত্তরে পুনর নিকট তাঁহার যেরূপ জায়গীর ছিল, দক্ষিণ কর্ণাট-দেশেও সেইরূপ বহু জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন।

জীজীবাইয়ের গর্ভে শজ্জী ও শিবজী নামে দুই পুত্র হয়। লিখিত হইয়াছে যে, জীজীর পিতা যাদবরাও পুরাতন দেবগড়ের হিন্দুরাজ্য বংশ হইতে অবতারণ, একজন জনপ্রতি আছে। একথা যদি বথার্থ হয়, তবে শিবজী সেই পুরাতন রাজবংশোদ্ভূত সন্দেহ নাই। ১৬৩০ খৃঃ অব্দে শাহজী টুকাবাই-নামী আর একটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। অভিমানিনী জীজীবাই তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বামীর সংসর্গ ত্যাগ করিয়া পুত্র শাহজীকে লইয়া পুনর জায়গীরে আসিয়া অবস্থিতি করিতেন। শাহজী টুকাবাইকে লইয়া

কর্ণাট্টে থাকিতেন ও তাঁহার পক্ষে বেন-
কাজী নামে একটি পুত্র হইল ।

শাহজীর হই জন অতি বিখ্যাত ব্রাহ্মণ মহী
ও কৰ্মচারী ছিলেন । তদ্ব্যতীত দাদাজী
কানাইদেব পুনার কার্যগীর এবং জীজী ও
শিশু শিবজীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন ।

১৬২৭ খৃঃ অব্দে সুবর্ণোদ্বর্গে শিবজীর জন্ম
হয় । এই দুর্গ পুনা হইতে অল্পমান ২৫ ক্রোশ
উত্তরে অবস্থিত । শিবজীর তিন বৎসর
বয়সের সময় শাহজী টুকাবাইকে বিবাহ
করিলেন, সুতরাং জীজীর সহিত তাঁহার
বিচ্ছেদ জন্মিল । জীজী সপুল পুনার আসিয়া
দাদাজী কানাইদেবের রক্ষণাবেক্ষণে বাস
করিতে লাগিলেন । শিবজীর বাসার্থে
দাদাজী পুনানগরে একটি বৃহৎ গৃহ নির্মাণ
করাইলেন, আমরা ইতিপূর্বে সেই গৃহে
সায়ন্তা থাকে দেখিয়াছি ।

মাতাপুত্রে সেই স্থানে বাস করিতে
লাগিলেন । বাল্যকালাবধি শিবজী দাদা-
জীর নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন ।
শিবজী কখনও নাম লিখিতেও শিখেন নাই,
কিন্তু অল্পবয়সেই ধর্মরূপ-বাবহার, বর্শা-
নিষ্কেপ, নানারূপ মহারাষ্ট্রীয় খড়্গ ও ছুরিকা-
চালন এবং অখারোহণে বিশেষ প্রতিপত্তি
লাভ করিলেন । মহারাষ্ট্রীয় মাত্রেই অশ্ব-
চালনায় তৎপর, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যেও
শিবজী বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিলেন ।
এইরূপ ব্যায়াম ও যুদ্ধশিক্ষায় বালকের দেহ
শীঘ্রই সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল ।

কিন্তু কেবল অস্ত্রবিদ্যায় শিবজী কাল
অতিবাহিত করিতেন না, যখন অবসর পাই-
তেন, দাদাজীর চরণোপাঙ্গে বসিয়া মহা-
ভারত ও রামায়ণের অনন্ত বীরত্বের গল্প
শ্রবণ করিতে বড়ই ভালবাসিতেন । শুনিত
শুনিতে বালকের হৃদয়ে সাহসের উদ্রেক

হইত, হিন্দুধর্মে আস্থা দৃঢ়ীভূত হইত, সেই
পূর্বকালীন বীরদিগের বীরত্ব অল্পকরণ করি-
বার ইচ্ছা প্রবল হইত, ধর্মবিদ্বেষী মুসলমান-
দিগের প্রতি বিবেচনাক্রমে এইরূপ কথা
শুনিতে শিবজীর এরূপ আগ্রহ ছিল যে,
অনেক বৎসর পর যখন তিনি দেশে খ্যাতি
ও রাজ্য লাভ করিলেন, তখন পর্যন্ত কোন
স্থানে কথা হইবে শুনিলে, বহু বিপদ ও বহু
কষ্ট সহ্য করিয়াও তথায় উপস্থিত হইবার
চেষ্টা করিতেন ।

এইরূপে দাদাজীর বয়সে শিবজী অল্পকাল-
মধ্যেই স্বধর্মায়ুক্ত ও অতিশয় মুসলমান-
বিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন । তিনি বোড়শ বর্ষ
বয়স্ক্রে স্বাধীন পলীগীর হইবার জন্ত নানা-
রূপ সঙ্কল্প করিতে লাগিলেন । আপনার
জায় উৎসাহী যুবকদিগকে চারিদিকে এক-
ত্রিত করিতে লাগিলেন । তিনি পর্তুগীজ-
পূর্ণ কর্তৃত্বদেশে তাহাদিগের সহিত সর্কদাই
যাত্রায় করিতেন । সেই পর্তুগীজ কিল্পে
উল্লঙ্ঘন করা যায়, কোথায় পথ আছে,
কোন পথে কোন দুর্গে যায়, কোন কোন দুর্গ
অতিশয় দুর্গম, কিল্পে দুর্গ আক্রমণ বা রক্ষা
করা যায়, এ সকল চিন্তায় বালকের দিন
অতিবাহিত হইত । কখন কখন কয়েকদিন
ক্রমাগত এই পর্তুগীজ ও উপত্যকার মধ্যে
যাপন করিতেন, কোনও দুর্গ, কোনও পথ,
কোনও উপত্যকা শিবজীর অজ্ঞাত ছিল না ।
শেষে কিল্পে দুই একটি দুর্গ হস্তগত করি-
বেন, এই চিন্তা করিতে লাগিলেন ।

বালকের এইরূপ কথা শুনিয়া ও আচরণ
দেখিয়া বুদ্ধ দাদাজী ভীত হইতে লাগিলেন ।
তিনি অনেক প্রবোধবাক্য দ্বারা বালককে
সে পথ হইতে আনয়ন করিয়া বাহাতে জায়-
গীর সুচারুরূপে রক্ষিত হয়, তাহাই শিখাই
বার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শিবজীর হৃদয়ে

যে বীরব্রতের অঙ্কুর স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা আর উৎপাটিত হইল না। শিবজী দাদাজীকে পিতৃভৃত্য্য সন্মান করিতেন, কিন্তু যে পথে প্রবর্তিত হইয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিলেন না।

মাউলীজাতীয়দিগের কষ্টসহিষ্ণুতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য শিবজী তাহাদিগকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার যৌবনসুহৃদগণের মধ্যে বশজী-কঙ্ক, তরজী-মালতী ও বাজীকাসলকর নামক তিন জন মাউলীই প্রিয়তম ও অগ্রগণ্য ছিলেন। পরিশেষে ইহাদের সহায়তায় ১৬৪৬ খৃঃ অব্দে তোরণ-দুর্গের কিল্লাদারকে কোনরূপে বশবর্তী করিয়া শিবজী সেই দুর্গ হস্তগত করিলেন। এই আধ্যায়িকার প্রারম্ভেই তোরণদুর্গের বর্ণনা করা হইয়াছে, এই প্রথম-বিজয়ের সময় শিবজীর বয়সক্রম ঊনবিংশ বর্ষ মাত্র; ইহারই পরবৎসর তোরণদুর্গের দেড় কোশ দক্ষিণ-পূর্বে একটি নূতন দুর্গ নির্মাণ করা-ইয়া তাহার নাম রাজগড় রাখিলেন।

বিজয়পুরের সুলতান এই সমস্ত বিষয়ের সমাচার প্রাপ্ত হইয়া শিবজীর পিতা শাহজীকে ভিন্নকার করিয়া পাঠাইলেন ও এই সমস্ত উপদ্রবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিজয়পুরের বিখ্যাত কৰ্মচারী শাহজী এ সমস্ত বিষয়ের বিবৃতিসম্পূর্ণ জানিতেন না, তিনি দাদাজীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দাদাজী কানাইদেব শিবজীকে পুনরায় ডাকাইলেন, এইরূপ আচরণে সর্বনাশ হইবার সম্ভাবনা, তাহা অনেক বুঝাইলেন; তাঁহার পিতা বিজয়পুরের অধীনে কার্য করিয়া কিরূপ বিপুল অর্থ, জায়গীর, ক্রমতা ও সম্মান লাভ করিয়াছেন, তাহাও বুঝাইলেন। শিবজী পিতৃসদৃশ দাদাজীকে আর কি বলিবে, মিষ্টবাক্য দ্বারা উত্তর দান

করিলেন, কিন্তু আপন কার্যে নিরন্তর হইলেন না। ইহার কিছু দিন পরেই দাদাজীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর প্রাক্কালেই দাদাজী শিবজীকে আর একবার ডাকাইয়া নিকটে আনেন। বৃদ্ধ পুনরায় ভৎসনা করিবে, এই বিবেচনা করিয়া শিবজী তথায় বাইলেন, কিন্তু বাহা শুনিলেন, তাহাতে বিম্বিত হইলেন। মৃত্যুশয্যায় যেন দাদাজীর দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইল। তিনি শিবজীকে সম্মুখে বলিলেন, “বৎস, তুমি যে চেষ্টা করিতেছ, তাহা ইহাতে মহত্তর চেষ্টা আর নাই। এই উন্নত পথ অহুসরণ কর, দেশের স্বাধীনতা রক্ষা কর, ত্রাণকর, গোবৎসাদি এবং কৃষকগণকে রক্ষা কর, দেবালয়-কলুষিতকারীদিগকে শাস্তি প্রদান কর, ঈশানী যে উন্নত পথ তোমাকে দেখাইয়া দিতেছেন, সেই পথ অহুসরণ কর।” এই বলিয়া বৃদ্ধ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। শিবজীর হৃদয় এই দিব্য উপদেশ পাইয়া উৎসাহ ও সাহসে দলগুণ ক্ষীত হইয়া উঠিল। তখন শিবজীর বয়সক্রম বিংশ বর্ষ মাত্র।

সেই বৎসরেই চাকন ও কান্দানী দুর্গের কিল্লাদারগণকে অর্থে বশীভূত করিয়া শিবজী উভয় দুর্গ হস্তগত করেন ও কান্দানীর নাম পরিবর্তিত করিয়া সিংহগড় নাম রাখেন। আধ্যায়িকার চাকন ও সিংহগড়ের কথা পূর্বেই কথিত হইয়াছে। শিবজীর বিমাতা টুকাবাইয়ের ভ্রাতা বাজী সোপ্রা দুর্গের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদিন দ্বিপ্রহর রজনীতে আপন মাউলীসৈন্য লইয়া শিবজী এই দুর্গ সহসা আক্রমণ করিয়া হস্তগত করেন। মাতুলের প্রতি কোনও অভ্যাস না করিয়া তাঁহাকে কর্ণাটে পিতার নিকট পাঠাইয়া দেন। তৎপরে পুরন্দর-দুর্গের অধীশ্বরের মৃত্যু হওয়ার তাঁহার পুত্রদিগের

মধ্যে ভ্রাতৃকলহ হয়, শিবজী কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতার সচায়তা করিবার ছলে আপনি সেই দুর্গ হস্তগত করেন। এই আচরণে তিনি ভ্রাতাই শিবজীর উপর বিরক্ত হইলেন, কিন্তু শিবজী যখন দেশের স্বাধীনতার স্বাক্ষর আপন মহৎ উদ্দেশ্য তাঁহাদিগকে ব্যক্ত করিলেন, যখন সেই উদ্দেশ্যসাধন জন্য ভ্রাতৃগণ হইতে সহায়তা বাঞ্ছা করিলেন, তখন তাঁহাদিগের ক্রোধ রহিল না, শিবজীর মহৎ উদ্দেশ্য সম্যক বুঝিতে পারিয়া তিন ভ্রাতাই শিবজীর অধীনে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

এইরূপে শিবজী একে একে অনেক দুর্গ হস্তগত করেন, তাহাদিগের নাম লিখিয়া এই আখ্যায়িকা পূর্ণ করিবার আবশ্যক নাই। ১৬৪৮ খ্রীঃ অব্দে শিবজীর কর্মচারী আবাজী স্বর্ণদেব কল্যাণদুর্গ ও সমস্ত কল্যাণী-প্রদেশ জয় করিলেন। তখন বিজয়পুরের সুলতান ক্রুদ্ধ হইয়া শিবজীর পিতা শাহজীকে কারারুদ্ধ করিলেন ও আদেশ করিলেন যে, নিয়মিত সময়ের মধ্যে শিবজী অধীনতা-স্বীকার না করিলে সেই কারাগৃহের দ্বার একেবারে রুদ্ধ হইবে। শিবজী দিল্লীর দরবারে নিকট আবেদন করিয়া পিতার প্রাণ বাঁচাইলেন, কিন্তু চারি বৎসর কাল শাহজী বিজয়পুরে বন্দীস্বরূপ রহিলেন।

জৌলীর রাজা চন্দ্ররাওকে শিবজী স্বপক্ষে আনিবার জন্য ও মুসলমানের অধীনতা-শৃঙ্খল চূর্ণ করিবার জন্য অনেক পরামর্শ দেন। চন্দ্ররাও যখন তাহা একেবারে অস্বীকার করিলেন, তখন তাঁহার ভ্রাতাকে হত্যা করাইয়া সুহসা রাজ্যযোগে আক্রমণ করত সেই দুর্গ হস্তগত করেন। তিনি সমস্ত জৌলী-প্রদেশ অধিকার করিলেন এবং ঐ বৎসরেই প্রতাপগড় নামক একটি নতুন দুর্গ নির্মাণ

করাইলেন। ইহার দুই বৎসর পর শিবজী মুরখর ও জিমুল পিললোকে পেশোয়া করেন এবং সমস্ত কল্যাণপ্রদেশ জয় করিবার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিলেন।

এবার বিজয়পুরের সুলতান শিবজীকে একেবারে ধ্বংস করিবার মানস করিলেন। ১৬৫২ খ্রীঃ অব্দে আবুল ফাজেল নামক একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ৫০০০ অশ্বারোহী ও ১০০০ পদাতিক ও বহুসংখ্যক কামান লইয়া যাত্রা করিলেন। তিনি গরীভভাবে প্রকাশ করিলেন যে, শীঘ্রই অক্লিষ্টকর বিজোহীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সুলতানের পায়-তখতের নিকট উপস্থিত করিবেন।

এত সৈন্তের সহিত সমুখ-যুদ্ধ অসম্ভব; শিবজী সন্ধি করিলেন। আবুল ফাজেল গোপীনাথ নামক একজন ব্রাহ্মণকে শিবজী-সম্মুখে প্রেরণ করিলেন। প্রতাপগড়-দুর্গের নিকট সভামধ্যে দুতের সহিত সাক্ষাৎ ও নানারূপ কথাবার্তা হইল। রজনীবাগনার্থে গোপীনাথের জন্য একটি স্থান নির্দেশ করা হইল।

রজনীবাগে শিবজী গোপীনাথের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। শিবজীর অসাধারণ বাকপটুতা ছিল। তিনি গোপীনাথকে অনেক প্রকার বুঝাইয়া বলিলেন, “আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি আমার শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আমার কথাগুলি শ্রবণ করুন। আমি বাহা করিয়াছি, সমস্তই হিন্দুজাতির জন্য, হিন্দুধর্মের জন্য করিয়াছি। স্বয়ং ভবানী আমাকে ব্রাহ্মণ ও গোবৎসাদিকে রক্ষা করিবার জন্য উত্তেজনা করিয়াছেন, হিন্দু দেব ও দেবালয়ের নিগ্রহকারীদিগকে নষ্ট দিতে আজ্ঞা দিয়াছেন ও ধর্মধর্মের শত্রুর বিরুদ্ধাচরণ করিতে আদেশ দিয়াছেন। আপনি ব্রাহ্মণ, ভবানীর আদেশ সমর্থন করুন এবং আপনি

ভাতির ও দেশীয় সৈন্যের মধ্যে স্বচ্ছন্দে বাস করুন ।”

গোপীনাথ এই সমস্ত বাক্যে তুষ্ট হইয়া শিবজীর সহায়তা করিতে স্বাকার করিলেন । পরামর্শ দ্বিধা হইল যে, কার্য্যসিদ্ধির জন্য আবুল ফাজলের সহিত শিবজীর কোন স্থানে সাক্ষাৎ করা আবশ্যিক ।

কয়েকদিন পর প্রতাপগড়-দুর্গের নিকটেই সাক্ষাৎ হইল । আবুল ফাজলের পঞ্চদশ শত সেনা দুর্গ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে রহিল, তিনি স্বয়ং একমাত্র সহচরের সহিত শিবকারোহণে নির্দিষ্ট গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । শিবজী সেই দিন বহু যত্নে প্রাতে আনুষ্ঠান সমাপন করিলেন ; শেহময়ী মাতার চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া তাঁহার আশীর্বাদ যাক্রা করিলেন ; ভুলার কুর্তি ও উকীষের নীচে লোহবর্ধ ও শিরস্ত্রাণ ধারণ করিলেন ; অবশেষে শিবজী দুর্গ হইতে অকর্তব্য হইয়া ও বালাসহচর তমজী মালজীকে সঙ্গে লইয়া আবুল ফাজলের নিকটে আসিলেন । সহসা আলিঙ্গনচ্ছলে তাঁক ছুরিকা দ্বারা মুসলমানকে ভুলশায়ী করিলেন । তৎক্ষণাৎ শিবজীর সেনা আবুল ফাজলের সেনাকে পুরাস্ত করিল এবং শিবজী অনেক দুর্গ হস্তগত করিয়া বিজয়পুরের দ্বার পর্য্যন্ত বাইরা দেশ লুণ্ঠন করিয়া আসিলেন ।

বিজয়পুরের সহিত যুদ্ধ আরও তিন বৎসর পর্য্যন্ত চলিতে লাগিল ; কিন্তু কোন পক্ষই বিশেষ জয়লাভ করিতে পারিল না । অবশেষে ১৬৬২ খ্রীঃ অব্দে শাহজী মধ্যবর্তী হইয়া বিজয়পুর ও শিবজীর মধ্যে সন্ধি-সংস্থাপন করিয়া দিলেন । শাহজী যখন শিবজীকে দেখিতে আসিলেন, শিবজী পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠী প্রদর্শন করিয়া-

ছিলেন । আপনি অব হইতে অবতরণ করিয়া পিতাকে রাজার তুল্য অভিবাদন করিলেন ; পিতার শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে চলিলেন ও পিতা বসিতে আদেশ করিলেও তিনি পিতার সম্মুখে আসন গ্রহণ করিলেন না । কয়েক দিন পুত্রের নিকট থাকিয়া শাহজী পরম তুষ্ট হইয়া বিজয়পুরে বাইলেন ও সন্ধিস্থাপন করিয়া দিলেন । শিবজী পিতা কর্তৃক সংস্থাপিত এই সন্ধির বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, শাহজীর জীবদ্দশায় বিজয়পুরের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করেন নাই । তাঁহার পরও যখন যুদ্ধ হয়, সে সময়ে শিবজী আক্রমণকারী ছিলেন না ।

১৬৬২ খ্রীঃ অব্দে এই সন্ধিস্থাপন হয়, পুত্রেরই বলা হইয়াছে, এই বৎসরেই মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হয় । আমাদের আখ্যায়িকা এই সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে । মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভের সময় সমস্ত কর্ণদেশ শিবজী অধিকৃত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সপ্ত সহস্র অশ্বরোহী ও পঞ্চাশৎ সহস্র পদাতিক সেনা ছিল । শিবজীর বয়স তখন পঞ্চত্রিশ বৎসর ।

নবম পরিচ্ছেদ ।

—৪—

শুভকার্য্য-সম্পাদন ।

যুগে যুগে কল্পে কল্পে নিত্য নিরন্তর,
অলুক গগনবাণী অনন্ত বহিতে ।
অলুক সে দেবভেজ স্বর্ণ সংবেষ্টিয়া,
অহোরাত্রি অবিশ্রান্ত প্রদীপ্ত শিখায়,
দহক দানবহুল দেবের বিরুদ্ধে,
পুত্র পরম্পরা দক্ষ চিরশোকানলে ।

হেবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

সূর্য্য অন্তাচলচূড়া অবলম্বন করিয়া-
ছেন, সিংহগড়-দুর্গের ভিতর সৈন্তগণ

নিঃশেষে সজ্জিত হইতেছে, একপা নিঃশেষে
যে, দুর্গের বাহিরের লোকও দুর্গের ভিতর
কি হইতেছে, তাহা জানিতে পারে নাই।

দুর্গের একটি উন্নত স্থানে করেকজন
মহাযোদ্ধা দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, সেই দুর্গ-
চূড়া হইতে দৃষ্ট অতি মনোহর। পূর্বদিকে
সুন্দর নীরানদী প্রবাহিত হইয়াছে, সেই
নদীর উপত্যকা বসন্তকালের নব পুষ্পপত্র ও
দূর্লাভলো সুশোভিত হইয়া মনোহর রূপ
ধারণ করিয়াছে। উত্তরদিকে বহুবিভূত
ক্ষেত্র, বহুদূর পর্যন্ত সুন্দর হরিষর্ষ ক্ষেত্র
সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বল দেখা যাইতেছে। বহুদূরে
বিস্তীর্ণ পুনানগরী সুন্দর শোভা পাইতেছে,
যোদ্ধাগণ প্রায় সেই দিকে চাহিয়া রহিয়া-
ছেন, অল্প রজনীতে সেই নগরীতে কি বিষম
ঘটনা সংঘটিত হইবে, তাহাই চিন্তা করিতে
ছিলেন। দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে পর্ব্বতের পর
পর্ব্বত, বতদূর দেখা যায়, অনন্ত পর্ব্বত
অন্তাচলচূড়াবলরী সূর্য্যকিরণে অপূর্ব্ব শোভা
পাইতেছে। কিন্তু বোধ করি, যোদ্ধাগণ এই
চমৎকার পর্ব্বতদৃশ্যের বিষয় ভাবিতেছিলেন
না, অল্প চিন্তায় অভিভূত রহিয়াছেন।

যে যুদ্ধে বা যে অসমসাহসিক কার্য্যে
একেবারে বহুকালের বাহিত ফললাভ হইতে
পারে বা এককালে সর্ব্বনাশ হইতে পারে,
তাহার পাকালে মুহুর্তের ক্ষণ অতিশয়
সাহসিক হৃদয়ও চিন্তাপূর্ণ হয়। অল্প
সামান্য ঝাঁ ও মোগল সৈন্য ভিন্নভিন্ন ও পরা-
ভূত হইবে অথবা অসমসাহসে মহারাত্রীসূর্য্য
একেবারে চির-অন্ধকারে অন্ত যাইবে, এই-
রূপ চিন্তা অগত্যা যোদ্ধাদিগের হৃদয়ে উদ্বেক
হইতে লাগিল। কেহ এ চিন্তা ব্যক্ত করি-
লেন না, তথাপি যখন নিঃশেষে যোদ্ধা
যোদ্ধার দিকে নিরীক্ষণ করিলেন, তখন
কাহারও মনোগত ভাব লুপ্তায়িত রহিল

না। কেবল বিংশ বা পঞ্চবিংশ যাত্র সেনা
লইয়া শিবজী শত্রুসেনার মধ্যে বাইরা আক্র-
মণ করিবেন, একপা তীর্থ কাণ্ডে শিবজী
কখনও লিপ্ত হইয়াছেন কি না সম্বন্ধ।
কেনই বা যোদ্ধাদিগের লগাট মুহুর্তের ক্ষণ
চিন্তা-মেঘাচ্ছন্ন না হইবে ?

সেই বীরমণ্ডলীর মধ্যে বহুদূর পেশোয়া
মুরেখর জিম্বুল ছিলেন। অল্পবয়সে তিনি
শিবজীর পিতা শাহজীর অধীনে যুদ্ধব্যবসারে
লিপ্ত ছিলেন, পরে শিবজীর অধীনে আসিয়া
প্রতাপগড়ের চমৎকার দুর্গ তিনিই নির্মাণ
করেন। চারি বৎসরাবধি পেশোয়াগণ প্রাপ্ত
হইয়া তিনি সেই পদের যোগ্যতা বিশেষ-
রূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আবুল ফাতে-
লকে শিবজী হত্যা করিলে পর মুরেখরই
তাঁহার সেনাকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত
করিয়াছিলেন, পরে মোগলদিগের সহিত
যুদ্ধারম্ভ হওনাবধি তিনিই পদাতিক সৈন্তের
সুনোবৎ অর্থাৎ সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। যুদ্ধ-
কালে সাহসী, বিপদকালে স্থির ও অবিকলিত,
পরামর্শে বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী মুরেখর অপেক্ষা
কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারী ও প্রকৃত বদ্ধ শিবজীর
আর কেহ ছিল না।

আবাজী স্বর্ণদেব তথায় দ্বিতীয় একজন
দূরদর্শী ও যুদ্ধপটু ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার
প্রকৃত নাম নীলপদ্ম স্বর্ণদেব, কিন্তু আবাজী
নামেই তিনি খ্যাত ছিলেন। তিনিই ১৬৪৮
খ্রীঃ অব্দে কল্যাণদুর্গ ও সমস্ত কল্যাণী-প্রদেশ
হস্তগত করেন এবং সম্প্রতি বায়গড়ের
প্রসিদ্ধ দুর্গ নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধনামা অন্নজীদত্ত ও অল্প সিংহগড়ে
উপস্থিত ছিলেন। চারি বৎসর পূর্বে তিনি
পবনগড় হস্তগত করেন এবং শিবজীর কর্ম্ম-
চারীমধ্যে একজন প্রধান ও অতিশয় কার্য্য-
দক্ষ ছিলেন।

অখারোহীর সরলৌবৎ অর্থাৎ সেনাপতি নিতাইলী সিংহগড়ে ছিলেন না; তিনি কিরূপে যোগল-সৈন্তের সমুখ দিয়া বাইয়া আরম্ভাবাদ ও আহম্মদনগর ছাড়বার করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা আমরা সারেস্তা বীর সন্তার তাঁর বীর প্রমুখ্যৎ শুনিয়াছি। সিংহগড়ে সে সময়ে কেবল অল্পসংখ্যক অখারোহী সেনা কর্তাজী গুজর নামক একজন নীচস্থ সেনানীর অধীনে অবস্থিত করিতেছিল।

পূর্ব-অধ্যায়ে শিবজীর তিন জন প্রধান মাউলী বালা-সুহৃদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে বাজী ফাসলকরের তিন বৎসর পূর্বেই মৃত্যু হইয়াছিল। তন্নজী মালজী ও যশজী-কক্ক অল্প সিংহগড়ে উপস্থিত ছিলেন। বাল্যকালের সৌহার্দ্য, যৌবনের বিবম সাহস, ইহারা এখনও ভুলেন নাই। ইহারা শিবজীকে প্রাণসম ভালবাসিতেন, শতবার রজনীযোগে মাউলী-সৈন্ত লইয়া শিবজীর সহিত শতপুরুষত্বগুণে নিশ্চেষ্টে আরোহণ করিয়া সহসা অধিকার করিয়াছিলেন।

হৃদয় অন্ত গেল। সন্ধার ছায়া যেমন স্তরে স্তরে জগতে অবতীর্ণ হইতেছে, তখনও সেই যোদ্ধামণ্ডলী দুর্গশৃঙ্গে নিঃশেষে দণ্ডায়মান, এমত সময়ে শিবজী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা-বাক্ক, ভরের লেশমাত্র দৃষ্ট হয় না। বস্তুর নীচে তিনি বর্ম ও অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন, অস্ত্র নিশির অসমসাহসিক কার্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। বোকার নয়ন উজ্জল, দৃষ্টি হির ও অবিচলিত।

শিবজী ধীরে ধীরে বলিলেন, “শমস্ত প্রস্তুত, বন্ধুগণ বিদায় দিন।”

মুরেশ্বর। তবে স্থির করিয়াছেন, অস্ত্র রজনীতে স্বর্ণদেব কি অন্নজী কি আমাকে

সঙ্গে বাইতে দিবেন না? মহাশয়! বিপদ-কালে কেবল আমরা আপনার সদ পরিভ্যাগ করিয়াছি?

শিবজী। পেশোয়াজী! কনা করুন, আর অহরোধ করিবেন না। আপনাদের সাহস, আপনাদের বিক্রম, আপনাদের বিজ্ঞতা আমার নিকট অবিদিত নাই, কিন্তু অস্ত্র কমা করুন। ভবানীর আদেশে আমি অস্ত্র বিবম প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অস্ত্র আমিই এই কার্য সাধন করিব, নচেৎ আকিঞ্চক্য প্রাণ বিসর্জন দিব। আশীর্বাদ করুন, জয়লাভ করিব; কিন্তু যদি অমঙ্গল হয়, যদি অস্ত্রকার কার্যে নিধনপ্রাপ্ত হই ৫থাপিও আপনারা তিনজন থাকি। মহারাষ্ট্রের সকলেই রহিল। আপনার আমার সহিত বিনষ্ট হইলে কাহার দূরদর্শী বুজিবলে দেশ থাকিবে? কাহার বাহুবলে স্বাধীনতা থাকিবে? হিন্দুগোবর কে রক্ষা করিবে? যাত্রাকালে আর অহরোধ করিবেন না।

পেশোয়া বুঝিলেন, আর অহরোধ করা যুগা; সুতরাং আর কিছু বলিলেন না। তখন অপেক্ষাকৃত মুদুস্থরে শিবজী পেশোয়াকে সঙ্ঘোধন করিয়া বলিলেন, “মুরেশ্বর, আপনি পিতার নিকট কার্য করিয়াছেন, আপনি আমার পিতৃতুল্য; আশীর্বাদ করুন যেন, আজ জয়লাভ করিতে পারি, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ অবশ্যই কলিবে। আবাজী! অন্নজী! আশীর্বাদ করুন, আমি কার্যে প্রস্থান করি।”

মুরেশ্বর, আবাজী ও অন্নজী সজলনয়নে মহারাষ্ট্র-বীরকে আশীর্বাদ করিলেন। তৎপর শিবজী তাঁহার মাউলী সুহৃদ্বর তন্নজী ও যশজীকে সঙ্ঘোধন করিয়া বলিলেন, “বাল্যসুহৃদ! বিদায় দাও।”

তন্নজী। প্রভু! কি অপরাধে আমা-

দিককে সঙ্গে যাইতে নিবেদন করিতেছেন ? কোন্ নৈশ বাপারে, কোন্ দুর্গজয়ের সময় আমরা প্রভুর সঙ্গে না ছিলাম ? পূর্বকাল স্মরণ করিয়া দেখুন, কঙ্কণদেশে আপনার সহিত কে স্রমণ করিত ? শৈলচূড়ে, উপত্যকার, পর্বতগহ্বরে, তরঙ্গিনীতীরে কে আপনার সহিত দিবার শীকার করিত, রজনীতে একত্র শয়ন করিত বা দুর্গজয়ের পরামর্শ করিত ?—যশজী, মৃত বাজী আর এই দাস তন্নজী । বাজী প্রভুর কার্য্যে হত হইয়াছে, আমাদেরও তাহা ভিন্ন অত্ন বাসনা নাই । অল্পমতি করুন, অত্ন প্রভুর সঙ্গে যাই, জয়লাভ হইলে প্রভুর আনন্দে আনন্দিত হইব, যদি প্রভু বিনষ্ট হন, আমাদের এ স্থানে জীবিত থাকিলে কোন উপকার নাই । আমাদের এতদূর বুদ্ধিবল নাই যে, রাজকার্য্যে কোন সাহায্য করি । আপনার বাল্য-সুহৃদকে বঞ্চিত করিবেন না ।

শিবজী দেখিলেন, তন্নজীর চক্ষে জল । মুগ্ধ হইয়া তন্নজী ও যশজীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “ভ্রাতঃ ! তোমাদিগকে অদেয় আমার কিছুই নাই, শীঘ্র রণসজ্জা করিয়া লও ।”

তৎপরে শিবজী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । দুঃখিনী জীজী একাকিনী একটি ঘরে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, পুত্রের অত্নকার বিপদে রক্ষা প্রার্থনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে শিবজী আসিয়া বলিলেন, “মাতঃ ! আশীর্বাদ করুন, বিদায় হই ।”

জীজী স্তম্ভচরিত্রের বলিলেন, “বৎস ! আইস, একবার তোমাকে আলিঙ্গন করি । কবে তোমার এ বিপদরাশি শেষ হইবে, কবে এ দুঃখিনীর শোক ও চিন্তা শেষ হইবে ?”

শিবজী । মাতঃ ! আপনার আশীর্বাদে কবে কোন্ বিপদ হইতে উদ্ধার না হইয়াছি ? কোন্ মুখে জয়না হইয়াছি ?

জীজী । “বৎস ! দীর্ঘ-জীবী হও, ঈশানী তোমাকে রক্ষা করুন ।” এই বলিয়া মাতা স্নেহে শিবজীর মস্তকে হাত দিলেন, দুই নয়ন বহিয়া অশ্রুজল শীর্ণ বক্ষঃস্থলের উপর পড়িতে লাগিল ।

শিবজী সকলের নিকট বিদায় লইয়াছেন ; এতদূর তাঁহার দৃষ্টি স্থির ও স্বর অকম্পিত ছিল । এক্ষণে আর সংবরণ করিতে পারিলেন না, চক্ষুর জল ছল করিতে লাগিল । উদ্বেগকম্পিতস্বরে শিবজী বলিলেন, “স্নেহময়ি জননি ! আপনিই আমার ঈশানী, আপনাকে বেন ভক্তিভাবে চিরজীবন পূজা করি, আপনার আশীর্বাদে সকল বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করিব ।”

বৃদ্ধা জীজী বহু অশ্রুপাত করিয়া বিদায়-কালে বলিলেন, “বৎস ! হিন্দুধর্মের জয়সাধন কর, স্বয়ং দেবরাজ শত্ৰু তোমার সাহায্য করিবেন । আমার পিতৃকুল দেবগণের অধিপতি ছিলেন, হিন্দুধর্মের অবলম্বন ছিলেন । বাছা ! আমি আশীর্বাদ করিতেছি, তুমিও মহারাষ্ট্র-দেশে রাজা হও, দাক্ষিণাত্যে হিন্দুধর্মের অবলম্বন হও ।”

সমস্ত সেনা সজ্জিত । শিবজী নিঃশব্দে অশ্বারোহণ করিলেন, নিঃশব্দে সৈন্তগণ দুর্গ-দ্বার অতিক্রম করিল ।

দুর্গদ্বার অতিক্রম করিবার সময়ে একজন অতি অল্পবয়স্ক বোদ্ধা শিবজীর সম্মুখে আসিয়া শির নামাইল । শিবজী তাহাকে চিনিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, “রঘুনাথজী হাবিলদার ! এ সময়ে তোমার কি প্রার্থনা ?”

রঘুনাথ । প্রভু, যে দিন তোরগছ

হইতে গজাদি আনিয়াছিলাম, সে দিন প্রসন্ন হইয়া পুরস্কার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

শিবজী। অল্প এই উৎকট ব্যাপারের প্রারম্ভে কি পুরস্কার চাহিতে আসিয়াছ?

রঘুনাথ। এই পুরস্কার চাই যে, ঐ উৎকট ব্যাপারে আমাকে বাইতে দিন। যে পঞ্চবিংশ বাউলী বোন্ধার সহিত পুনানগরে প্রবেশ করিবেন, দাসকে তাহাদের সহিত বাইতে আদেশ করুন।

শিবজী। রাজপুত্রবালক! কেন ইচ্ছা-পূর্বক এ সঙ্কটে আসিতেছ? অল্পবয়সে কেন প্রাণ হারাইতে উৎসুক হইয়াছ?

রঘুনাথ। রাজন্! আপনার সঙ্গে বাইলে প্রাণ হারাইব, এরূপ আশঙ্কা করি না। যদি হারাই, আমার জন্ত আক্ষেপ করিবে, জগতে এরূপ কেহই নাই। আর যদি প্রভুকে কার্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারি, জীবিত থাকিয়া প্রত্যাগমন করিতে পারি, তবে,—তবে ভবিষ্যতে আমার মঙ্গল।

রঘুনাথের সেই কৃষ্ণ কেশগুচ্ছগুলি ভ্রমরবিনিমিত্ত নয়নের উপর পড়িয়াছে, বালকের সরল উদার মুখমণ্ডলে যোদ্ধার স্থিরপ্রতিজ্ঞা বিরাজ করিতেছে। অল্পবয়স্ক যোদ্ধার এই কথা শুনিয়া ও উদার মুখমণ্ডল দেখিয়া শিবজী সন্তুষ্ট হইলেন ও সঙ্গে পুনার ভিতর যাইতে অহুমতি দিলেন। রঘুনাথ আবার শির নত করিয়া পায় লক্ষ্য দিয়া অশ্ব আরোহণ করিলেন।

সিংহগড় হইতে পুনা পর্য্যন্ত সমস্ত পথে শিবজী নিজ সৈন্ত রাখিলেন। সন্ধ্যার ছায়ায় নিঃশব্দে সেই পথের স্থানে স্থানে সেনা সন্নিবেশ করিতে লাগিলেন। একটি দীপ জলিলে বা সৈন্তেরা শব্দ করিলে পুনার ওঁহা এই কার্য প্রকাশ হইতে পারে,

সুতরাং নিঃশব্দে অন্ধকারে সৈন্ত সন্নিবেশ করিতে লাগিলেন।

সে কার্য শেষ হইল, রজনী ভগতে গাঢ় অন্ধকার বিস্তার করিল। শিবজী, তরঙ্গী ও বশজী ২৫ জন মাত্র বাউলী লইয়া পুনার নিকটে একটি বৃহৎ বাগানে পৌছিয়া তথায় লুকায়িত রহিলেন। রঘুনাথ ছায়ায় মত প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ রহিলেন।

আরও গাঢ়তর অন্ধকার সেই আশ্রয়-কাননকে আবৃত করিল, সন্ধ্যার শীতল বায়ু আসিয়া সেই কাননের মধ্যে মর্ম্মরশব্দ করিতে লাগিল। সন্ধ্যার পশ্চিম একে একে সেই কাননের পার্শ্ব দিয়া পুনাভিমুখে চলিয়া বাইল, নিবিড় অন্ধকার ভিন্ন আর কিছু দেখিল না, পত্রের মর্ম্মর শব্দ ভিন্ন আর কিছু শ্রবণ করিল না।

ক্রমে পুনার গোলমাল নিশ্চক্ৰ হইল, দীপাবলী নির্বাপন হইল, নিশ্চক্ৰ নগরে কেবল প্রহরীগণ এক একবার উচ্চ শব্দ করিতে লাগিল ও সময়ে সময়ে শৃগালের স্বর বায়ুপথে আসিতে লাগিল। ঢং ঢং ঢং সহসা শব্দ হইয়া উঠিল, শিবজীর হৃদয় চমকিত হইল। ঐ দিকে চাহিয়া দেখিলেন, গলীর মধ্যে শব্দ হইতেছিল, নগরের বাহির হইতে দেখা যায় না।

ঢং ঢং ঢং পুশরায় শব্দ হইল, আবার, শিবজী চাহিয়া দেখিলেন। বহুলোকে দীপাবলী লইয়া বাত্ম করিতে করিতে প্রশস্ত পথ দিয়া আসিতেছে,—এই বরষাত্রা!

বরষাত্রা নিকটে আসিল। পুনার চারিদিকে প্রাচীর নাই, স্পষ্ট দেখা বাইতেছে। পথ লোক-সমাকীর্ণ ও নানা বাত্মযন্ত্র দ্বারা অতি উচ্চরব হইতেছে। অনেক অস্বারোহী, অধিকাংশ পদাতিক।

শিবজী নিঃশব্দে বাল্যসুহৃদ তরঙ্গী ও

বশজীকে আলিঙ্গন করিলেন। পরস্পরে পরস্পরের বিকে চাহিলেন যাত্রী। “হর ত এই শেষ বিদায়”---এই ভাব সকলের মনে জাগরিত হইল ও মননে ব্যক্ত হইল, কিন্তু বাক্য অনাবশ্যক। নিঃশব্দে শিবজী ও তাঁহার লোক সেই যাত্রীদিগের সহিত মিশিয়া গেলেন।

যাত্রিগণ সারেসতা খাঁর বাটীর নিকট দিয়া বাইল, বাটীর কামিনীগণ গবাক্ষে আসিয়া সেই বহলোকসমারোহ দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে যাত্রিগণ চলিয়া গেল, কামিনীগণও শয়ন করিতে গেলেন, যাত্রীদিগের মধ্যে প্রায় ত্রিংশৎ জন খাঁ সাহেবের গৃহের নিকট লুকাইত রহিল, তাহা কেহ দেখিতে পাইল না। ক্রমে বরষাতার গোল ধামিয়া গেল।

রজনী আরও গভীর হইল। সারেসতা খাঁর রন্ধন-গৃহের উপর একটি গবাক্ষ ছিল, তথায় অল্প অল্প শব্দ হইতে লাগিল। খাঁ সাহেবের পরিবারের কামিনীগণ সকলে নিদ্রিত অথবা নিদ্রানু, সে শব্দ শুনিয়াও ঘ্রাণ করিলেন না।

একখানি ইষ্টকের পর আর একখানি, পরে আর একখানি সরিল, বরু বরু করিয়া বালুকা পড়িল। নারীগণ তখন সন্দিগ্ধ হইয়া সেই স্থান দেখিতে আসিলেন, ছিড়ের ভিতর দিয়া একজন, পরে আর একজন, পরে আর একজন বোকা পিপীলিকা-সারের স্তায় গৃহে প্রবেশ করিতেছে। তখন চীৎকার-শব্দ করিয়া বাইয়া সারেসতা খাঁর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে সমুদয় অবগত করিলেন।

শিবজী সন্ধিপ্রার্থনার মিনতি করিতেছেন, খাঁ সাহেব এইরূপ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, সহসা জাগরিত হইয়া শুনিলেন,

শিবজী পুনা হস্তগত করিয়া তাঁহার প্রাসাদ আক্রমণ করিয়াছেন।

পলায়নাৎ খাঁ সাহেব এক ঘরে আসিলেন, দেখিলেন, বর্ষধারী মহারাষ্ট্রীয় বোকা। অস্ত্রধারে আসিলেন, তাহাই দেখিলেন। সভয়ে সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিলেন, গবাক্ষ দিয়া পলাইবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময়ে শুনিলেন, “হর হর মহাদেও” বলিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ পার্শ্বের গৃহ পরিপূর্ণ করিল।

তখন রাক্ষুসী আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া চারিদিকে গোণ হইল। প্রাসাদের রক্ষকগণ সহসা আক্রান্ত হইয়া হতজ্ঞান হইয়াছিল, অনেকেই হত ও আহত হইয়াছিল, তথাপি অবশিষ্ট লোক প্রতুর রক্ষার্থ দৌড়িয়া আসিল ও সেই পক্ষিংশ জন মাউলীকে চারিদিকে বেঁটন করিল।

শীঘ্রই ভীষণরবে সেই প্রাসাদ পরিপূর্ণিত হইল। প্রাসাদের আলোক নির্মাণ হইয়াছে, অন্ধকারে মাউলীগণ চীৎকার করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। অন্ধকারে হিন্দু ও মুসলমান যুদ্ধ করিতেছে। কবাতের কনকনা শব্দ, আক্রমণকারীদিগের মুহুমুহঃ উল্লাস-রব এবং আক্রান্ত ও আহতদিগের আর্তনাদে প্রাসাদ পরিপূর্ণিত হইল। সেই সময়ে শিবজী বর্ষা-হস্তে লক্ষ দিয়া বোকা-দিগের মধ্যে পড়িলেন, “হর হর মহাদেও” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। মাউলীগণ সঙ্গে সঙ্গে হুকার করিয়া উঠিল, মোগল-প্রহরিগণ পলায়ন করিল, অথবা সমস্ত হত ও আহত হইল। শিবজী ভীষণ বর্ষাঘাতে দ্বার ভগ্ন করিয়া সারেসতা খাঁর শয়নঘরে আসিয়া পড়িলেন।

সেনাপতির রক্ষার্থে তৎক্ষণাৎ কয়েকজন মোগল সেই ঘরে ধাবমান হইল। শিবজী দেখিলেন, সম্মুখে যত টাদ খাঁর

বিক্রমশালী পুত্র শম্ভের খাঁ। পিতা অপ-
মানিত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে, ওখাপি
পুত্র সেই প্রভুর রক্ত প্রাণ দিতে প্রস্তুত ও
অগ্রগণ্য। শিবজী এক মুহূর্ত্ত নওয়ারমান
হইলেন, কোবে খড়্গ রাখিয়া বলিলেন,
“মুখক, তোমার পিতার রক্তে এখনও
আমার হস্ত কুলযিত রহিয়াছে, তোমার
জীবন লইব না, পথ ছাড়িয়া দাও।”

শম্ভের খাঁ উত্তর করিলেন না। শম-
শের খাঁর নয়ন অগ্নিবৎ জলন্ত। শিবজী
আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইবার পূর্বেই শম-
শেরের উজ্জ্বল খড়্গ আপন মস্তকোপরি
দেখিলেন।

শিবজী মুহূর্ত্তর জন্ত প্রাণের আশা
ত্যাগ করিয়া ঈষ্টদেবতা ভবানীর নাম লই-
লেন। সতসা দেখিলেন, পশ্চাৎ হইতে একটি
বর্শা আসিয়া খড়্গধারী শম্ভেরকে কৃতল-
শায়ী করিল। পশ্চাতে দেখিলেন, রঘু-
নাথজী হাবিলদার।

শিবজী। “হাবিলদার! এ কার্য আমার
শ্রমণ থাকিবে।” কেবল এইমাত্র বলিয়া
শিবজী অগ্রসর হইলেন।

এই অবসরে গবাক্ দিয়া রজ্জু অবলম্বন
করিয়া সায়েস্তা খাঁ পলাইলেন। কয়েকজন
মাউলী সেই গবাক্‌মুখে ধাবমান হইয়াছিল,
একজন খড়্গের আঘাত করিয়াছিল, তাহা
সায়েস্তা খাঁর অঙ্গুলীতে লাগিয়া একটি অঙ্গুলী
ছেদন করিল, কিন্তু সায়েস্তা খাঁ আর পশ্চাতে
না দেখিয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহার পুত্র
আবদুল কতর্ণা ও সমস্ত গ্রহরী নিহত হইল।
তখন শিবজী দেখিলেন ষর বারান্দা রক্তে
রঞ্জিত হইয়াছে, স্থানে স্থানে গ্রহরিগণের
মৃতদেহ পতিত রহিয়াছে, স্ত্রীলোক ও পলা-
তকগণের আর্ন্তনাদে প্রাসাদ পরিপূরিত হই-
তেছে, মাউলীগণ যোগলদিগের ক্ষেপসাধনার্থ

চারিদিকে ধাবমান হইতেছে। মশালের
অশ্লিষ্ট আলোকে কাহারও মৃতদেহ, কাহারও
ছিন্নমুণ্ড, কোথাও বা রক্ত-প্রণালী ভীষণ
দেখাইতেছিল। তখন শিবজী আপন মাউলী-
দিগকে নিকটে ডাকিলেন। সকল সময়ে
সকল বুদ্ধেই তিনি জয়লাভ করিলে পর
বুধা প্রাণনাশ দেখিলে বিরক্ত হইতেন এবং
শত্রুরও সেরূপ প্রাণনাশ বাহাতে না হয়, সে
জয়লাভেই যত্ন করিতেন। শিবজী আদেশ করি-
লেন, “আমাদের কার্য সিদ্ধ হইয়াছে, ভীক
সায়েস্তা খাঁ আর আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবে
না, এক্ষণে দ্রুতবেগে সিংহগড়ের দিকে চল।”

অন্ধকার-রজনীতে শিবজী অনারাদে
পুনা হইতে বহির্গত হইয়া সিংহগড়ের দিকে
ধাবমান হইলেন। প্রায় দুই ক্রোশ আসিয়া
মশাল আলিবার আদেশ দিলেন। বহুসংখ্যক
মশাল জলিল। পুনা হইতে সায়েস্তা খাঁ
দেখিতে পাইলেন, মহারাষ্ট্র-সেনা নিরাপদে
সিংহগড়ে উঠিল।

পরদিন প্রাতে ক্রুদ্ধ যোগলগণ সিংহ-
গড় আক্রমণ করিতে আসিল, কিন্তু গড়ের
কামানের গোলায় ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন
করিল। কর্ত্তাণী গুজর ও তাঁহার অধীনস্থ
মহারাষ্ট্রীয় অধাঃোহিগণ বহুদূর পর্য্যন্ত
পশ্চাচ্চাবন করিয়া গেল।

অল্প বিপদে সাহসী যোদ্ধার আরও যুদ্ধ-
পিপাসা বৃদ্ধি হয়, কিন্তু সায়েস্তা খাঁ সেরূপ
যোদ্ধা ছিলেন না। তিনি আরজীবকে এক-
খানি পত্র লিখিলেন; তাহাতে নিম্ন সৈন্তের
যথেষ্ট নিশা করিলেন ও বশোবস্ত অর্থে
বন্দীভূত হইয়া শিবজীর পক্ষাচরণ করিতেছে,
এইরূপ জানাইলেন। আরজীব দুই জনকেই
অকর্ণ্য বিবেচনা করিয়া ডাকাইয়া পাঠাই-
লেন এবং নিম্ন পুত্র সুলতান মোরাজীকে
দক্ষিণে পাঠাইলেন, পরে তাঁহার সহায়তা

করিবার জন্য বশোবস্তকে পুনর্বার পাঠাইলেন ।

ইহার পর এক বৎসরের মধ্যে বিশেষ কোন যুদ্ধকার্য্য হইল না । ১৬৬৪ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভেই শিবজীর পিতা শাহজীর কাল হওয়ায় শিবজী সিংহগড়েই আত্মাঙ্গী সমাপন করিয়া পরে রায়গড়ে যাইয়া রাজা উপাধি গ্রহণ করিলেন ও নিজ নামে মুদ্রা অঙ্কিত করিতে লাগিলেন । আমরা এখন এই নব-ভূপতির নিকট বিদায় লইব ।

পাঠক ! বহুবিস হইল, তোরণ-দুর্গ হইতে আসিয়াছি ; চল, এই অবসরে একবার সেই দুর্গে কি হইতেছে, দেখি ।

দশম পরিচ্ছেদ ।

আশা ।

হৃদি পোড়া অগ্নি বসি রসালের তলে,
ভ্রান্তিমদে মাতি ভাবি পাইব সমরে
পাদপদ্ম । কাপে হিয়া তরু তরু করি
শুনি যদি পদশব্দ ।

মধুসূদন দত্ত ।

যে দিন রঘুনাথ তোরণদুর্গে আসিয়াছিলেন, যে দিন তাহার হৃদয় উৎকণ্ঠ হইয়াছিল, সেই দিন প্রথম-প্রেমের আনন্দময়ী লহরীতে একটি বালিকা-হৃদয় ভাসিয়া গিয়াছিল । উচ্চানে সন্ধ্যার সময় যখন সরযুর দুটি সহসা সেই তরুণ স্বদেশীয় যোদ্ধার উপর পতিত হইল, বালিকা সহসা চমকিত হইলেন । আবার চাহিলেন, আবার সেই উদার বদনমণ্ডল, সেই উন্নত তরুণ যুদ্ধবেশধারী অবয়ব দেখিলেন, পরে ধীরে ধীরে গৃহের ভিতর যাইলেন ।

রজনীতে সরযু সেই স্বদেশীয় তরুণ যোদ্ধাকে ভোজন করাইতে যাইলেন, পাঁচ

দণ্ডারমান হইয়া দেববিনিমিত্ত অবরবেদ্য দিকে চাহিয়া রহিলেন । যখন চারি চক্ষুর মিলন হইল, তখন লজ্জারুতবদনা ধীরে ধীরে সরিয়া আসিলেন ।

সরিয়া আসিলেন, কিন্তু হৃদয়ে একটি নূতন ভাবের উদয় হইল । রঘুনাথ তাহার দিকে দোবেগ দৃষ্টি করিলেন কেন ? রঘুনাথ কি স্বদেশীয় বালিকার প্রতি একটু স্নেহের সহিত নরনক্কেপ করিয়াছেন ? তরুণ যোদ্ধার কি সরযুর প্রতি একটু মমতা ভ্রমিয়াছে ?

পরদিন আবার সেই তরুণ যোদ্ধাকে দেখিলেন, আবার হৃদয় একটু উত্ত্বিগ্ন হইল । পরে যখন রঘুনাথের আনন্দনয়ী বাক্যগুলি শুনিলেন, রঘুনাথ যখন সরযুর গলায় কণ্ঠমালা পরাইয়া দিলেন, বালিকার শরীর শিহরিয়া উঠিল, হৃদয় আনন্দ ও উবেগে প্রাবীত হইল । যখন বিদায় লইয়া যোদ্ধা অস্বারুঢ় হইয়া চলিয়া গেলেন, সরযু গবাক্ষপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন ।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বালিকা গরাক্ষপার্শ্বে দণ্ডারমান রহিলেন । অশ্রু ও অশ্রুরোহী অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু বালিকা নিম্পন্দে সেই দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন । দিবালোকে পর্কটমালা অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে, তাহার উপর বতদূর দেখা যায়, পর্কটযুক্ত সমুদ্রের লহরীর মত বাহুতে ভুলিতেছে । উপর পর্কটযুক্ত হইতে স্থানে স্থানে জলপ্রপাত পতিত হইতেছে, সেই স্বচ্ছ জল একটিনীরূপে বহিয়া যাইতেছে । নীচে সুন্দর উপত্যকার গ্রামের কুটার দেখা যাইতেছে, সুন্দর হরিদবর্ণ ক্ষেত্র সমস্ত দেখা যাইতেছে, তাহার মধ্যে দিয়া পর্কটকত্তা ভরদ্বীপী ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে ও মেঘবিবর্জিত সূর্য্য এই সুন্দর দৃশ্যের উপর দিয়া আপন আলোক-হিলোল আনন্দে গড়াইয়া দিতেছে ;

কিন্তু সরযু এ সমস্ত দেখিতেছিলেন না, মম এ সমস্ত দৃষ্টে ভ্রান্ত ছিল না।

সরযু অন্য সমস্ত দিন একটু অস্ত্রমনস্ক রহিলেন। সাংকালে পিতার ভোজনের সময় নিকটে বসিলেন, বহুতে পিতার শব্দা রচনা করিয়া দিলেন, পরে ধীরে ধীরে আপন শব্দ-নাগারে বাইলেন। নিত্যক রজনীতে সরযু উঠিয়া ধীরে ধীরে সেই গবাক্ষপার্শ্বে বাইয়া নিঃশব্দে উপবেশন করিয়া চন্দ্রালোক দেখিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—:—

চিন্তা।

এস তুমি, এস বাথ, রথ পরিহারি
কেলি হুয়ে বর্ষ, চর্ষ, অসি, তুণ, বহুঃ,
ভ্যাজ রথ পদব্রজে এস ঘোর পাশে।
বহুব্রহ্মদত্ত।

জনार्দন স্বভাবতই সরলস্বভাব লোক ছিলেন, সমস্ত দিন শাস্ত্রাভ্যাসীন বা দেবপূজার রত থাকিতেন, প্রভাতে সাংকালে কিল্লা-দ্বারের নিকট সাক্ষাৎ করিতে বাইতেন, কদাচ বাটীতে থাকিতেন। পালিতকল্পাকে অতিশয় ভালবাসিতেন, ভোজনের সময় কল্পাকে নিকটে না দেখিলে তাঁহার আহ্বান হইত না, রজনীতে কখন কখন শাস্ত্রের গল্প বলিতেন, সরযু বসিয়া শুনিতেন। এতদ্বিধি প্রায়ই আপন কার্যে রত থাকিতেন, বালিকার মনে একদিন একটি নতুন ভাব উদয় হইল, বুদ্ধ জনार्দন কেমন করিয়া জানিবেন?

বালিকার হৃদয়ে একদিন সহসা যে ভাব উদয় হয়, তাহা অনেক দিন স্থায়ী হয় না, একদিন সন্ধ্যাকালে সরযুর হৃদয়ে সহসা যে ভাবের উদ্রেক হইল, তাহা দুই চারি দিবসের

মধ্যে অনেকটা হ্রাস প্রাপ্ত হইল। তথাপি হৃদয়ে এরূপ ভাব একেবারে লীন হয় না, মধ্যে মধ্যে সেই তরুণ যোদ্ধার কথা সরযুর হৃদয়ে জাগরিত হইত। বিশেষ সরযু জন্মাবধি একাকিনী, জনार्দন ভিন্ন তিনি ভালবাসিবার লোক কাহাকেও কখন দেখেন নাই, কাহাকেও জানিতেন না, সুতরাং বাল্যকাল অবধিই ধীর, শান্ত, চিন্তাশীল। প্রথম-বোবনে যেরূপ দেখিয়া একদিন সরযুর হৃদয় আলো-ভিত হইল, সাংকালে, প্রভাতে ও গভীর রজনীতে সেই রূপটি সময়ে সময়ে সরযুর হৃদয়ে জাগরিত হইত।

কল্পনা মায়াবিনী! সরযু যখন দিনান্তে একাকিনী গবাক্ষপার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন, অথবা নিশীথে চন্দ্রালোকে সেই পুন্শোদ্যানে বিচরণ করিতেন, তখন কতকল্প কল্পনা তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত হইত। সেই তরুণ যোদ্ধা এতদিনে যুদ্ধের উল্লাসে মগ্ন হইয়াছেন, দুর্গ হস্তগত করিয়াছেন, শত্রু ধ্বংস করিতে-ছেন, সরযুর কথা কি এক একবার তাঁহার মনে জাগরিত হয়? পুরুষের মন, নানা কার্য্য, নানা চিন্তা, নানা শোক, নানা উল্লাসে সর্বদাই পরিপূর্ণ থাকে। জীবন আশাপূর্ণ, নানা আশায় অতিবাহিত হয়, আশাফলবতী, হউক আর নাই হউক, জীবন সর্বদা উল্লাস-পূর্ণ থাকে। রাজদ্বারে, যুদ্ধক্ষেত্রে, শৌকগৃহে বা নাট্যশালায়, নানা কার্য্যে নানা চিন্তায় পূর্ণ থাকে, তাহারা কি এক চিন্তা চিরকাল হৃদয়ে ধারণ করে? তথাপি মায়াবিনী আশা সরযুকে কানে কানে বলিয়া দিত, বোধ হয়, কখনও কখনও সরযুর কথা তরুণ যোদ্ধার হৃদয়ে জাগরিত হয়।

আবার চিন্তা আসিত;—তরুণ যোদ্ধা কি এখনও এ ভোরণ-দুর্গের কথা ভাবেন? এ কালে, এ বয়সে কি তাঁহার মন স্থির

আছে ? হায় ! নবীর জন্ম পাবহ
পুষ্পটিকে লইয়া কণকাল খেলা করে,
পুষ্প আমাকে নাচিয়া উঠে, তাহার পর
উর্ধ্ব কোণার চলিয়া যায়, পুষ্পটি শুকাইয়া
যায় ; কিন্তু জল আর করে না ! তথাপি
মায়াবিনী আশা সরযুর কানে কানে বলিয়া
দিত— বোধ হয়, একদিন সেই তরুণ বোদ্ধা
তোরণ-ভূর্গে কিরিয়া আসিবেন।

নিশীথে যখন সেই উন্নত ভূর্গ ও চারি-
দিকে পর্বতমালা চক্ষের স্রাবাকরণে নিম্নকে
সুপ্ত হইত, তখন নীল আকাশ ও শুভ্র
চক্ষের দিকে চাহিতে চাহিতে বালিকার
হৃদয়ে কত কল্পনা উদয় হইত, কে বলিবে ?
বোধ হইত যেন, সেই পর্বত-পথ দিয়া এক-
জন নবীন অধারোহী আসিতেছেন, অথ
বেতবর্ণ, আরোহীর গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ ললাট
ও নয়ন জীবৎ আবৃত করিয়াছে। যেন
ভূর্গে আসিয়া অধারোহী অবতরণ করিলেন,
যেন তাঁহার মস্তকে সুবর্ণ-খচিত শিরদ্বাগ,
বলিষ্ঠ সুগোল বাহতে সুবর্ণের বাজু, দাক্ষিণ-
হস্তে দীর্ঘ বর্শ। যেন বোদ্ধা আবার আহা
করিতে বসিলেন, সরযু তাঁহাকে ভোজন
করাইতেছেন। অথবা রজনীতে সেই ছাদে
সরযু সেই বোদ্ধার নিকট সলজ্জ হইয়া
দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, বোদ্ধাও যেন আন-
ন্দে সহিত সরযুর নিকট যুক্ত-কথা বর্ণনা
করিতেছেন।

কল্পনার শেষ নাই, অগাধ সমুদ্র-
হিল্লোলের স্থায় একটির পর একটি
আইসে, তাহার পর আর একটি। সরযু
আবার ভাবিলেন, যেন যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে,
তরুণ সেনাপতি বহু খ্যাতিলাভ করিয়াছেন,
বড় উপাধি পাইয়াছেন, কিন্তু সরযুকে
ভুলেন নাই। যেন পিতা তাহার সহিত
সরযুর বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন, যেন ঘর

লোকে পরিশুভ, চারিদিকে লীল অনিতেছে,
বাধা বাকিতেছে, গীত হইতেছে, আর কত
কি হইতেছে, সরযু জানেন না, ভাল দেখিতে
পাইতেছেন না। যেন সরযু অবগুণ্ঠনবতী
হইয়া সেই দেব-প্রতিমূর্তির নিকট বসিলেন,
যেন যুবকের হস্তে আপন বোদ্ধা কলিত
হস্তটি রাখিলেন, যেন রজনীতে সেই
জীবিতেশ্বরকে পাইলেন। আনন্দে বালিকা-
হৃদয় ক্ষীত হইল। সরযু! সরযু! পাগলিনী
হইও না।

আবার কল্পনা আসিল। রঘুনাথ
খ্যাতিাপন্ন হন নাই, রঘুনাথ উপাধি প্রাপ্ত
হন নাই, রঘুনাথ দরিদ্র, কিন্তু সরযুকে
বিবাহ করিয়াছেন। পর্বতের নীচে ঐ
বে স্মন্দর উপত্যকা দেখা বাইতেছে,
যেখানে শান্তপ্রবাণী নদী চক্ষালোকে ধীরে
ধীরে বহিয়া বাইতেছে, যেখানে হরিশর্প
স্মন্দর বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র চক্ষালোকে সুপ্ত রহি-
রাছে, ঐ রমণীয় স্থানে অনেকগুলি কুটারের
মধ্যে যেন একটি ক্ষুদ্র কুটার সরযুর, যেন
দিবাবসানে সরযু স্বহস্তে রজন্য সমাপন
করিয়াছেন, যেন বহু পূর্বক জীবিতনাথের
জন্ত অন্ন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, কুটার-
সম্মুখে স্মন্দর দুর্বার উপর বসিয়া রহিয়া-
ছেন, যেন দুর্গ-ক্ষেত্রের দিকে চাহিয়াছেন,
যেন সেই দিক হইতেই সমস্ত দিনের পরি-
ভ্রমের পর একজন দীর্ঘকায় পুরুষ কুটারভি-
মুখে আসিতেছেন। সরযুর হৃদয় নৃত্য করিয়া
উঠিল, যেন সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ আসিয়া সরযুকে
একটি নূতন কণ্ঠমালা পরাইয়া দিলেন।
পুলকে বালিকার হৃদয় আবার ক্ষীত হইল।
সরযু! সরযু! পাগলিনী হইও না।

এইরূপে এক মাস, দুই মাস, তিন মাস
অতি হইল, বৎসর অভিবাহিত হইল, কিন্তু
সরযুর কল্পনালহরী শেষ হইল না। যে

স্বদেশীয় তরুণ বোদ্ধাকে সরসু এই বিদেশে একদিন সবচেয়ে খাওয়াইয়াছিলেন, তাঁহার কমনীয় মুখখানি কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে সময়ে সময়ে বালিকার মনে জাগরিত হইত । যে নীর্থকার পুরুষ সবচেয়ে সরসুবালার গলায় প্রিয় কণ্ঠহার পরাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার আনন্দনীর রূপ ও দেবতুল্য আকৃতি কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই সরসুর হৃদয়ে উদ্ভিত হইত । কল্পনা কি মায়াবিনী ?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

পুনর্জন্ম ।

—চেতন পাইয়া

মিলি হবে অঁাধি দেখি তোমায় সমুদ্রে ।

বধূহৃদয় দত্ত ।

কল্পনা, মায়াবিনী নহে, সরসুবালার চিন্তা মিথ্যাবাদিনী নহে, বালিকার আশা বিশ্বাস-ঘাতিনী নহে ।

একদিন সন্ধ্যার সময় সরসু পুনরায় সেই পুষ্পোদ্যানের পুষ্প তুলিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে কি মনে করিয়া হৃদয়ের সেই কণ্ঠহারের দিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন । সরসুর রূপ পূর্ববৎ স্নিগ্ধ ও আনন্দীয়, সরসুর মুখমণ্ডল পূর্ববৎ কমনীয় ও শান্ত । তথাপি এক বৎসরে সে রূপের কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে, নব আশা ও উল্লাসে সে মুখমণ্ডল অধিকতর কমনীয় কান্তি ধারণ করিয়াছে । নূতন জ্যোতিতে সে চন্দ্রবর্ষ আলোকিত হইয়াছে, নূতন উষ্মেগ ও নূতন জীবনোৎসাহে সে শরীর টলমল করিতেছে, সরসুর হৃদয়, মন, দেহ পরিবর্তিত হইয়াছে, সরসু বালিকা নহেন, প্রথম যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন । রূপবতী, চিন্তাবতী, যৌবন-সম্পন্ন সরসুবালা পুষ্প

তুলিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে সেই কণ্ঠহারের দিকে দেখিয়া কি চিন্তা করিতেছেন, এরূপ সময়ে বারমধ্যে একজন তরুণ রাজপুত্র বোদ্ধা অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন । পুষ্প তুলিতে তুলিতে রাজপুত্রকুমারী সেই দিকে চাহিলেন,—সহসা শিহরিয়া উঠিলেন, সে দিক হইতে আর নয়ন ফিরাইতে পারিলেন না ।

রাজপুত্র বোদ্ধাও সেই পুষ্পোদ্যানে সেই রাজপুত্র বালাকে পুনরায় দেখিতে পাইলেন । একদিন নিশীথে বাহার রূপ দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন, একদিন প্রভাতে বাহার পবিত্র কণ্ঠে প্রিয় কণ্ঠমালা পরাইয়া দিয়াছিলেন, যুদ্ধে ও সঙ্কটে, শিবিরে ও সৈন্তমধ্যে বাহার চিন্তা মধ্যে মধ্যে বোদ্ধার হৃদয়ে জাগরিত হইয়াছে, নিশীথে স্বপ্নযোগে বাহার কমনীয় লজ্জারঞ্জিত মুখখানি সর্বদাই বোদ্ধার সম্মুখে হৃদয় হইয়াছে, অগ্নি বহদিন পর সেই আনন্দনীর রূপলাবণ্য, সেই লজ্জারঞ্জিত মুখখানি দেখিয়া রঘুনাথ কণেক, বাক্যশূন্য ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন ।

চন্দ্রবর্ষ রঘুনাথ ও সরসুর উপর স্খলিত প্রণয় কর, তুমি নিশীথে জাগরণ করিয়া মকল দেখিতে পাত, কিন্তু জগতে এরূপ দৃশ্য আর দেখি নাই । তরুণ-বয়সে যখন মন প্রথম প্রণয়োন্মাদে উৎক্লিষ্ট হয়, যখন নবজাত চন্দ্রকরের স্তায় নবজাত প্রণয়ের আনন্দ-হিলোল মানস-জগতে গড়াইতে থাকে, যখন যৌবনের প্রথম-প্রণয়ে সমস্ত জগৎ সিক্ত করে, আকাশ ও মেদিনী প্রাবীণ্য করে, তখনই যেন এ জগতে ইন্দ্রপুত্রী অবতীর্ণ হয় ! কণেক পর সরসুবালা অবনতমুখী হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ও পিতাকে এই রঘুনাথজীর আগমনের সংবাদ দিলেন । জনাৰ্দ্দনদেবও বহু সম্মান সহকারে শিবজীর হৃৎকে আহ্বান করিলেন ।

সন্ধ্যার সময় রঘুনাথ পুরোহিতের সম্মুখে উপবেশন করিয়া সমস্ত সমাচার জ্ঞাত করাইলেন। সন্ধ্যের পূর্বেই পুরাতন হইয়া দিল্লী-প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, শিবজী রাজগড়ে বাইরা রাজ-উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন, দেশশাসনের সুন্দর বন্দোবস্ত করিতেছেন। কিন্তু দিল্লীর শিবজীকে জয় করিবার জন্য অশ্বরাধিপতি মহাপরাক্রান্ত রাজা জয়সিংহকে প্রেরণ করিতেছেন, তাহা শুনিয়া মহারাষ্ট্ররাজ চিন্তিত হইয়াছেন। মহারাষ্ট্ররাজ সম্ভবতঃ রাজা জয়সিংহের সহিত সন্ধি স্থাপন করিবেন এবং সেই কার্য্য-সম্পাদনার্থ অশ্বরাজ্যে শাস্ত্রজ্ঞ জনার্দনদেবকে অরণ করিয়াছেন। রাজার আজ্ঞায় রঘুনাথ পুরোহিতকে লইতে আসিয়াছেন, শিবজী প্রস্তুত আছে। যদি পুরোহিত-মহাশয়ের সুবিধা হয়, দুই চারি দিনের মধ্যেই রাজগড় গমন করিলে ভাল হয়, রাজা এইরূপ আজ্ঞা দিয়াছেন।

ঘরের একপার্শ্বে সরযুবালা আহারের আয়োজন করিতেছিলেন, পাঠককে বলা বাহুল্য যে, এ কথাগুলি সমস্ত সরযুর কানে উঠিল। পিতা রাজধানীতে বাইবেন? রাজ্যদেশে এই তরুণ বোদ্ধা আমাদিগকে লইতে আসিয়াছেন—সরযুর হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল, হস্ত হইতে জলের পাত্র পড়িয়া গেল, লজ্জাবনতমুখী পুনর্জাগ্রত সরযুবালা ঘর হইতে নিস্ত্রান্ত হইল।

তখন রঘুনাথ অনেকক্ষণ ধরিয়া ধীরে ধীরে জনার্দনের সহিত কি কথা কহিতে লাগিলেন। আপনার দেশের কথা কহিলেন, জাতিগুলির পরিচয় দিলেন, পিতামাতার পরিচয় দিলেন, জনার্দনকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। জনার্দনও রঘুনাথের উন্নত কুলের পরিচয় পাইয়া এবং যুদ্ধের বীর্য্য, সৌন্দর্য্য ও বিনয় আলো-

চনা করিয়া তুষ্ট হইলেন এবং রঘুনাথকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিলেন। রঘুনাথের আহারের সময় হইয়াছে, সরযু সমস্ত প্রস্তুত করিয়াছেন। বুদ্ধ জনার্দন গাজোথান করিয়া স্তম্ভচিত্তে রঘুনাথকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “বৎস রঘুনাথ, এখন আহার করিতে বসি। আজ তোমার পরিচয় পাইয়া বড় তুষ্ট হইলাম, তোমার বংশ আমার অপরিচিত নহে, তোমার গুণও বংশোচিত। আর সরযুকে আমি কন্যা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তোমাকেও আজ পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলাম। আর যদি ভগবান করেন, এই যুদ্ধ-শেষে তোমার স্ত্রীর উপযুক্ত পাতে সরযুকে সমর্পণ করিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চিন্ত হইয়া এই মানবলীলা সংবরণ করিব। জগদীশ্বর তোমাকে ও মা সরযুকে সুখে রাখুন।”

এই কথা শুনিয়া রঘুনাথের চক্ষুতে জল আসিল, ধীরে ধীরে পুরোহিতের চরণতলে প্রণত হইয়া কহিলেন, “পিতা, আশীর্বাদ করুন যেন, এ দরিদ্র সৈনিক আপনার অভিশাপ পূর্ণ করিতে পারে। রঘুনাথ দরিদ্র হাবিলদার মাত্র, এক্ষণে তাহার নাম নাই, অর্থ নাই, পদ নাই; কিন্তু জগদীশ্বর সহায় হউন, পিতা আশীর্বাদ করুন, রঘুনাথ এ অমূল্য রত্ন লাভ করিতে যত্নবান হইবে।”

এ আনন্দময়ী কথা সরযুবার কানে পৌছিল, বায়ু-তাড়িত পত্রের স্তায় তাহার দেহলতা কম্পিত হইতেছিল।

সে দিন রঘুনাথ কিছুই আহার করিতে পারিলেন না, আরক্তমুখী সরযুও ভাল করিয়া আহার করাইতে পারিলেন না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

রাজগড়-যাত্রা।

দেখিব প্রেমের স্বপ্ন লাগি হে হৃদয়ে।

যশস্বদন দত্ত।

যাত্রার আয়োজন করিতে পাঁচ সাত দিন বিলম্ব হইল। রঘুনাথ পুরোহিতের আলয়েই অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে এ সন্ধ্যার সময় সরযুকে উদ্ভানে কুল তুলিতে দেখিতেন, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে সরযুর প্রিয় হস্ত হইতে আহার গ্রহণ করিতেন। এ পাঁচ সাত দিনের মধ্যে রঘুনাথ সাহস করিয়া সরযুর সঙ্গে কথা কহিতে পারিলেন না। সরযুকে দেখিলেই রঘুনাথের হৃদয় সজোরে আঘাত করিত, কুমারীও অবগুষ্ঠন টানিয়া সরিয়া যাইতেন।

তোরণ-দুর্গ হইতে রাজগড়-যাত্রাকালে সরযুর শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে একজন অস্বারোহী চালিত, পর্কত-পথে বা জঙ্গলে, বৃক্ষ-শূন্ত ময়দানে বা নদীতীরে সে অস্বারোহী মুহুর্তের জন্তও শিবিকা হইতে দূরে যাইত না। নিশীথে যখন সরযু সহচরীর সহিত সামান্য কোন মন্দিরে, দোকানে বা ভজ-গৃহে আশ্রয়গ্রহণ করিতেন, রজনীতে সময়ে সময়ে একজন অনিদ্র বোদ্ধা বর্শা-হস্তে তথায় পদচারণ করিত।

নারীমাজেই এ সকল বিষয় বুঝিতে পারে, এ সকল বিষয় দেখিতে পারে। পুরুষের যন্ত্র, পুরুষের আগ্রহ, পুরুষের হৃদয়ের আবেগ নারীর চক্ষুতে গোপন থাকে না। সরযু শিবিকার ভিতর হইতে সেই অবিজ্ঞান অস্বারোহীকে দেখতেন, নিশিতে সেই অনিদ্র বোদ্ধাকে দেখিতেন। সেই দেবনির্ধিত আকৃতি দেখিতে দেখিতে সরযুর নয়ন কল-

সিত হইল, সেই হৃদমনীর আগ্রহচিহ্ন দেখিয়া সরযুর হৃদয় আনন্দ, প্রেয় ও উষেগে প্রাবিত হইল।

সন্ধ্যার সময় যখন সরযু সেই বোদ্ধাকে ভোজন করাইতে আসিতেন, মৌনাবলম্বী বোদ্ধার দর্শনে সরযু অবনতমুখী হইতেন, ভাল করিয়া আহার করাইতে পারিতেন না। প্রাতঃকালে শিবিকার আরোহণের সময় যখন সরযু সেই বোদ্ধাকে অশ্বপুটে উপবিষ্ট দেখিতেন, তাঁহার ম্লান মুখমণ্ডল হইতে সরযু সহজে নয়ন ফিরাইতে পারিতেন না।

কয়েক দিন এইরূপে ভ্রমণানন্তর সকলে রাজগড়ে উপস্থিত হইলেন। জনার্দন সন্ধ্যার সময় দুর্গের নীচে একটি গ্রামে উপস্থিত হইয়া মহারাষ্ট্র-রাজের নিকট সমাচার পাঠাইলেন, রাজার অশ্রুমতি হইলে পরদিবস দুর্গে প্রবেশ করিবেন।

সেই দিন রজনীতে আহারাদি শ্রান্ত করিতে কিছু বিলম্ব হইল। জনার্দন কিছু জলযোগ করিয়া শয়ন করিতে যাইলেন, রাত্রি এক প্রহরের সময় সরযুবাম্বুনাথকে ভোজন করাইলেন।

ভোজনান্তে রঘুনাথ অঙ্গমিনে স্নান পূর্ব হইতে বহিষ্কৃত হইলেন না, ক্রমেক ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর যেখানে সরযু একাকী বসিয়া ছিলেন, তথায় দীয়ে দীয়ে বাইরা নতশিরে দণ্ডায়মান হইলেন; হৃদয়ের উষেগ দমন করিয়া স্থিরস্থরে কহিলেন, “দেবি, এক্ষণে আমাকে বিদায় দিন।”

রঘুনাথের উচ্চারিত এই কথাগুলি যেন তৃষিতে পক্ষে বারিধারার স্রাব সরযুর কানে লাগিল। সরযুর হৃদয় নাচিয়া উঠিল, সরযু আরক্তমুখ নত করিয়া ক্রমেক দণ্ডায়মান হইলেন।

রঘুনাথ পুনরায় বলিলেন, “দেবি, বিদায়

দিন, কল্যা আপনারা রাজপ্রাসাদে বাইবেন, এ দরিদ্র সৈনিক পুনরায় নিজকার্যে বাইতে বাসনা করে।”

এই কথা শুনিয়া সরযু লজ্জা বিস্তৃত হইলেন, নয়নধরের জল মুছিয়া নারীর মমতা-পূর্ণ স্বরে বলিলেন, “আপনি আমারিগের কন্ত যে বস্ত্র করিগাছেন, পিতার জন্ত, আমার জন্ত যে পরিত্রম করিগাছেন, তাহার জন্য ভগবান আপনাকে যুদ্ধে জয়ী করুন, আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করুন। আমরা সে বস্ত্রের কি প্রতিদান করিতে পারি?”

রঘুনাথ বিনীতস্বরে উত্তর দিলেন, “রাজা-দেবে আপনাদিগকে রাজগড়ে নিরাপদে আনিতে পারিয়াছি, এটি আমার পরম ভাগ্য, ইহাতে আমার কিছু গুণ নাই। তথাপি দরিদ্র সৈনিকের বস্ত্রে যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে,— তবে—এ দরিদ্র সৈনিককে বিস্তৃত হইবেন না।”

কথাটি সরযু বুঝিলেন, মুখখানি অবনত করিলেন। রঘুনাথ তখন সাংস পাইয়া লজ্জা বিস্তরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, “এ দরিদ্র সৈনিক যদি উচ্চ আশা করিয়া থাকে, আপনি অপরাধ লইবেন না। আপনার পিতা প্রসন্ন-চক্ষে আমার প্রতি দৃষ্টি করিগাছেন, ভরসা করি, আপনিও আমার প্রতি অগ্রসর হইবেন না। যদি ভগবান আমার মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ করেন, যদি জীবনের চেষ্টা ও আশা ফলবতী হয়, তবে একদিন মনের কথা বলিব, সে পর্য্যন্ত এ দরিদ্র সৈনিককে এক একবার স্বরণপথে স্থান দিবেন।”

বিনীতভাবে বিদায় লইয়া রঘুনাথ চলিয়া গেলেন। সরযু একদণ্ড কাল সেই পথ চাহিয়া রহিলেন, মনে মনে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন; দ্বিপ্রহর রজনীর সময় একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে

বলিলেন, “সৈনিকজ্যেষ্ঠ! তুমি চিরকাল এ দাসীর স্বরণপথে আগরিত থাকিবে, ভগবান সাক্ষী থাকিবেন।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

রাজা জয়সিংহ ।

মরহুমোক্ত ভূমি—

বিদ্যা বুদ্ধি বাহুবলে অতুল অগতে ।

মহাবীর দত্ত ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আরংজীব সায়েস্তা খাঁ ও বশোবস্ত সিংহ উভয়কেই অকস্মাৎ বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন ও নিজ পুত্র মুলতান মোরাজীমকে দক্ষিণে প্রেরণ করেন এবং তাঁহার সহায়তার জন্য বশো-বস্তকে পুনরায় প্রেরণ করেন। তাঁহারাও বিশেষ ফললাভ করিতে না পারায় সম্রাট অবশেষে তাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত করিয়া অম্বরাধিপতি প্রসিদ্ধনামা রাজা জয়সিংহ ও তাঁহার সহিত দিলওয়ার খাঁ নামক একজন বিক্রমশালী আফগান সেনাপতিকে দক্ষিণে প্রেরণ করিলেন। ১৬৬৫ খৃঃ অব্দের চৈত্র-মাসের শেষযোগে জয়সিংহ পুনরায় উপস্থিত হইবেন। সায়েস্তা খাঁর ন্যায় নিকরুংসাহ হইয়া পসিরা না থাকিয়া তিনি দিলওয়ার খাঁকে পুরন্দর-দুর্গ আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন এবং স্বয়ং সিংহগড় বেটন করিয়া রাজগড় পর্য্যন্ত সৈন্যে অগ্রসর হইলেন।

শিবজী হিন্দু-সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে পরাজিত, বিশেষ জয়সিংহের নাম, সৈন্যসংখ্যা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দোদীর্ঘপ্রতাপ তাঁহার নিকট অবদিত ছিল না। সেনাপ

পরাক্রান্ত সেনাপতি বোধ হয় সম্রাট আরাজ্যের আর কেহই ছিলেন না। তাৎকালিক ফরাসী জয়কারী বের্ণায়ে লিথিয়া গিয়াছেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষে জয়সিংহের স্তায় চিত্রকর্ণ, বুদ্ধিমান, দূরদর্শী লোক আর একজনও ছিলেন না। শিবজী প্রথম হইতেই ভয়োদ্ভম হইলেন ও বার বার জয়সিংহের নিকট সন্ধিপ্রস্তাব পাঠাইতে লাগিলেন, কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি জয়সিংহ প্রথমে এ সমস্ত প্রস্তাব বিশ্বাস করিলেন না। অবশেষে শিবজীর বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথপুত্র জ্ঞানেশ্বরী দূতবেশে জয়সিংহের নিকট আসিলেন ও রাজাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইলেন যে, শিবজী রাজা জয়সিংহের সহিত চতুঃতা করিতেছেন না। তিনিও ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়োচিত সম্মান তিনি জানেন। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের এই সত্যবাক্য রাজা জয়সিংহ বিশ্বাস করিলেন, তখন ব্রাহ্মণের হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, “ঈজ্বর, আপনার বাক্যে আমি আশ্বস্ত হইলাম। রাজা শিবজীকে জানাইবেন যে, দিল্লীর সম্রাট তাঁহার বিদ্রোহাচরণ মার্জনা কারবেন, পরন্তু তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান কারবেন, সেজন্য আমি বাক্যদান করিতেছি। আপনার প্রভুকে বলিবেন, আমি রাজপুত্র, রাজপুত্রের বাক্য অমূল্য হয় না।”

ইহার কয়েক দিন পর বর্ষাকালে রাজা জয়সিংহ আপন শিবিরে সভার মধ্যে বসিয়া রহিয়াছেন, একজন প্রহরী আসিয়া সংবাদ দিল, “মহারাজের জয় হউক! রাজা শিবজী স্বয়ং বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছেন।”

সভাসভ সকলে বিস্মিত হইলেন, রাজা জয়সিংহ স্বয়ং শিবজীকে আহ্বান করিতে

শিবিরের বাহিরে বাইলেন; কহ সম্রাট পূর্বেক তাঁহাকে আহ্বান ও আলিঙ্গন করিয়া শিবিরান্তরে আনিলেন ও রাজগদিতে আপনার দক্ষিণদিকে বসাইলেন।

শিবজীও এইরূপ সম্রাটর পাইয়া যথেষ্ট সম্মানিত হইলেন। রাজা জয়সিংহ কণেক মিঠালাপ করিয়া অবশেষে বলিলেন, “রাজন! আপনি আমার শিবিরে আসিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন, এই শিবির আপনার গৃহের স্তায় বিবেচনা করিবেন।”

শিবজী। রাজন! এ দাস কবে আপনার আজ্ঞাপালনে বিষুৎ? রঘুনাথপুত্র দ্বারা আপনি দাসকে আসিতে আদেশ করিয়াছিলেন, দাস উপস্থিত হইয়াছে। আপনার মহৎ আচরণে আমিই সম্মানিত হইয়াছি।

জয়সিংহ। হাঁ, রঘুনাথ জ্ঞানেশ্বরীকে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ আছে, রাজন! আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা করিব, দিল্লীর আপনার বিদ্রোহাচরণ মার্জনা করিবেন, আপনাকে রক্ষা করিবেন, আপনাকে যথেষ্ট সম্মান করিবেন। এ বিষয়ে আমি বাক্যদান করিয়াছি, রাজপুত্রের কথা অমূল্য হয় না।

এইরূপে কণেক কথোপকথনের পর সভাভঙ্গ হইল, শিবিরে শিবজী ও জয়সিংহ ভিন্ন আর কেহই রহিল না। তখন শিবজী কপট আনন্দ-চিহ্ন ত্যাগ করিলেন, হস্ত গণ্ডহস্ত স্থাপন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, জয়সিংহ দেখিলেন, তাঁহার চক্ষে জল।

জয়সিংহ। রাজন! আপনি যদি আত্মদমর্পণ করিয়া ক্ষুর হইয়া থাকেন, সে খেদ নিশ্চরোজন। আপনি বিশ্বাস

করিয়া আমার নিকটে আসিয়াছেন, রাজ-
পুত্র বিশ্বস্তের উপর হস্তক্ষেপ করিব না।
অন্তই রজনীতে আমার অর্থশালা হইতে অর্থ
বাছিয়া লউন, পুনরায় গ্রহণ করুন।
আপনি নিরাপদে আসিয়াছেন, নিরাপদে
বাইবেন, আমার আদেশে কোনও রাজপুত্র
আপনার উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। পরে
যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারি ভাল, না পারি,
কতি নাই, কিন্তু কল্লিয়ধ্বং কদাচ বিশ্বস্ত
হইব না।

শিবজী। মহারাজ! ভবাদৃশ লোকের
নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া আত্মসমর্পণ
করিয়াছি, তাহাতে খেদ নাই। বাল্যকাল
অবধি যে হিন্দুধর্মের জন্ত, যে হিন্দুগৌরবের
জন্ত চেষ্টা করিয়াছি, সে মহৎ উত্তম, সে
উন্নত উদ্দেশ্য শেষ হইল, সেই চিন্তার জ্বলন্ত
বিদীর্ণ হইতেছে। কিন্তু সে বিষয়েও মন
হির করিয়াই আপনার শিবিরে আসিয়া-
ছিলাম, সেজন্যও এখন খেদ করিতেছি
না।

জয়সিংহ। তবে কি জন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন?

শিবজী। বাল্যকাল হইতে আপনাদের
গৌরব-গীত গাহিতে ভালবাদিতাম, অস্ত
দেখিলাম, সে গীত মিথ্যা নহে, জগতে যদি
মাহাত্ম্য, সত্য, ধর্ম থাকে, তবে রাজপুত্র-
শরীরে আছে। এ রাজপুত্র কি যবনের
অধীনতা স্বীকার করিবেন? মহারাজা জয়-
সিংহ কি যবন আরজুীবের সেনাপতি?

জয়সিংহ। কল্লিয়রাজ! সেটি প্রকৃত
দুঃখের কারণ। কিন্তু রাজপুত্রেরা সহজে
অধীনতা স্বীকার করে নাই, বত দিন সাধ্য,
দিল্লীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, বিধির নির্বন্ধে
পর্যবসিত হইয়াছে। মেওয়ারের বীরপ্রবর
প্রাচ্যঃসরগীর প্রতাপ অসাধ্য-সাধনেও ব্যর্থ
করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সন্ততিও

দিল্লীর করগ্রস্ত, এ সমস্ত বোধ হয় মহাপুত্র
অবগত আছেন।

শিবজী। আহি, সেই জন্তই জিজ্ঞাসা
করিতেছি, বাহাদুরের সহিত আপনাদিগের
এত দিনের বৈরতাব্দ, তাহাদের কার্যে
আপনি এরূপ বস্তুশীল কি জন্ত?

জয়সিংহ। যখন দিল্লীখবরের সেনা-
পতিত্ব গ্রহণ করিয়াছি, তখন তাহার
কার্যসিদ্ধির জন্ত সত্যদান করিয়াছি।
যে বিষয়ে সত্যদান করিয়াছি, তাহা
করিব।

শিবজী। সকলের নিকট সকল সময়
কি সত্য পালনীয়? বাহারা আমাদের
দেশের শত্রু, ধর্মের বিরুদ্ধাচারী, তাহাদের
সহিত সত্য-সম্বন্ধ কি?

জয়সিংহ। আপনি কল্লিয় হইয়া
এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? রাজপুত্রকে
এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? রাজপুত্রের
ইতিহাস পাঠ করুন, তাহার বহুশত বৎসর
মুসলমানদিগের সহিত 'যুদ্ধ' করিয়াছে,
কখনও সত্য লঙ্ঘন করে নাই। কখনও
জয়লাভ করিয়াছে, অনেক সময়ে পরাস্ত
হইয়াছে, কিন্তু জয়ে পরাজয়ে, সম্পদ্বিপদে
সর্বদা সত্যপালন করিয়াছে। এখন আমা-
দের সে গৌরবের স্বাধীনতা নাই, কিন্তু
সত্যপালনের গৌরব আছে। দেশে,
বিদেশে, শত্রুমধ্যে, শত্রুমধ্যে, রাজপুত্রের
নাম গৌরবান্বিত। কল্লিয়রাজ টোডরমল্ল
বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন, যানসিংহ
কাবুল হইতে উড়িষ্যা পর্যন্ত দিল্লীখবরের
বিজয়পতাকা উড়াইয়াছিলেন, কেহ কখনও
জন্ত বিধাসের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই,
মুসলমান সম্রাটের নিকট বাহা সত্য করিয়া-
ছিলেন, তাহা পালন করিতে ক্রটি করেন
নাই। মহারাজ্জীবন! রাজপুত্রের কথাই

ক্ষপত্র, অনেক সন্ধিপত্র লঙ্ঘন হইয়াছে, রাজপুত্রের কথা লঙ্ঘন হয় নাই।

শিবজী! মহারাজ যশোবন্ত সিংহ হিন্দু-ধর্মের একজন প্রধান প্রেরী, তিনি মুসলমানের ভক্ত হিন্দুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন।

জয়সিংহ। যশোবন্ত বীরশ্রেষ্ঠ, যশোবন্ত হিন্দু-ধর্মের প্রেরী সন্দেহ নাই। তাঁহার মাড়ওয়ারদেশ মরুভূমি, তাঁহার মাড়ওয়ার-সেনা অপেক্ষা কঠোর জাতি ও সাহসী সেনা জগতে নাই। যদি যশোবন্ত সেই মরুভূমিতে বেষ্টিত হইয়া, সেই সেনার সাহায্যে হিন্দু-স্বাধীনতা-রক্ষার বস্ত্র করিতেন, আমি তাঁহাকে সাধুবাদ করিতাম। যদি জরী হইয়া আরাজীবকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীতে হিন্দুপতাকা উড্ডীন করিতেন, আমি তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া সম্মান করিতাম অথবা যদি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, স্বদেশ ও স্বধর্মরক্ষার্থে সেই মরুভূমে প্রাণত্যাগ করিতেন, আমি তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতাম। কিন্তু যে দিন তিনি দিল্লীখবরের সেনাপতি হইয়াছেন, সেই দিন তিনি মুসলমানের কার্যসাধনে ত্রুটি হইয়াছেন। ত্রুত গ্রহণ করিয়া, তাহা লঙ্ঘন করা ক্ষত্রোচিত কার্য হয় নাই, যশের কলঙ্কে আপন যশোরশি জ্ঞান করিয়াছেন। তিনি সিপ্রানদীতীরে আরাজীবের নিকট পরাস্ত হইয়া অবধি আরাজীবের অতিশয় বিদ্বেষী, নচেৎ তিনি এ গহিত কার্য করিতেন না।

চতুর্থ শিবজী দেখিলেন, জয়সিংহ যশোবন্ত সিংহ নহেন। ক্ষণেক পর আবার বলিলেন, “হিন্দুধর্মের উন্নতি-চেষ্টা কি গহিত কার্য? হিন্দুকে ভ্রাতা মনে করিয়া সহায়তা করা কি গহিত কার্য?”

জয়সিংহ। আমি তাহা বলি নাই।

যশোবন্ত কেন আরাজীবের কার্য ত্যাগ করিয়া জগতের সাক্ষাতে, ভগবানের সাক্ষাতে আপনার সহিত যোগ দিলেন না? আপনি যেরূপ স্বাধীনতার চেষ্টা করিতেছেন, তিনি সেইরূপ করিলেন না কি ভক্ত? সম্রাটের কার্যে থাকিয়া গোপনে বিরুদ্ধাচরণ করা কপটাচরণ। ক্ষত্রিয়রাজ! কপটাচরণক্ষেত্রোচিত কার্য নহে।

শিবজী। তিনি আমার সহিত প্রকৃত্তে যোগ দিলে দিল্লীখবর অস্ত্র সেনাপতি পাঠাইতেন, সম্ভবতঃ আমরা উভয়ে পরাস্ত ও হত হইতাম।

জয়সিংহ। যুদ্ধে মরণ ক্ষত্রিয়ের সৌভাগ্য, কপটাচরণ ক্ষত্রিয়ের অবমাননা।

শিবজীর মুখ আরক্ত হইল, তিনি বলিলেন, “রাজপুত মহারাজীরেয়াও মৃত্যু-ভয় করেন না, যদি এই ঐকিঞ্চিংকর জীবন-দান করিলে আমার উদ্দেশ্য-সাধন হয়, হিন্দু-স্বাধীনতা, হিন্দু-গৌরব পুনঃস্থাপিত হয়, তবে ভবানীর সাক্ষাতে এই মুহূর্ত্তে এই বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতে পারি অথবা রাজপুত, আপন অব্যর্থ বর্শা ধারণ করুন, এই ক্ষুদ্রে আঘাত করুন, সহাস্ত্রবদনে প্রাণত্যাগ করি। কিন্তু যে হিন্দু-গৌরবের বিষয় বাল্যকালে শ্রবণে দেখিতাম, বাহার ক্ষত্র শতযুদ্ধ স্থিরলাম, শত শত্রুকে পরাস্ত করিলাম, এই বিশ বৎসর পর্বতে, উপত্যকায়, শিবিরে, শত্রুমধ্যে, দিবসে, সায়ংকালে, পতীর নিম্নে চিন্তা করিয়াছি, সে গৌরব ও স্বাধীনতার আশা ত্যাগ করিতে ক্ষুদ্রে ব্যথা লাগে। যুদ্ধে প্রাণ দিলে কি সে স্বাধীনতা রক্ষা হইবে?”

জয়সিংহ শিবজীর তেজস্বী কথাগুলি শ্রবণ করিলেন, চক্ষুতে জল দেখিলেন; কিন্তু পূর্ব-বৎ স্থিরভাবে উত্তর করিলেন, “সত্যপালনে যদি সনাতন হিন্দুধর্মের রক্ষা না হয়, সত্য-

লক্ষ্যে হইবে ? বীরের শোণিতে যদি আমি
নভা-বীজ অঙ্কুরিত না হয়, তবে বীরের
চাতুরীতে কি হইবে ?”

শিবজী পরাত হইলেন ; অনেককণ পর
পুনরায় ধীরে ধীরে বলিলেন, “মহারাজ !
আমি আপনাকে পিতৃত্ব জ্ঞান করি, আপ-
নার জায় ধর্মজ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি বোদ্ধা আমি কখনও
দেখি নাই, আমি আপনার পুত্রত্ব, একটি
কথা জিজ্ঞাসা করিব, আপনি পিতৃত্ব, সং-
পরামর্শ দিন । আমি বাল্যকালে যখন কঙ্কণ-
প্রদেশের অসংখ্য পক্ষিত ও উপত্যকায় ভ্রমণ
করিতাম, আমার দৃশ্যে চিত্তা আসিত, স্বপ্ন
উদিত হইত । ভাবিতাম, যেন সাক্ষাৎ ভবানী
আমাকে স্বাধীনতা-স্থাপনের জন্ত আদেশ
করিতেছেন, যেন দেবালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি
করিতে, ব্রাহ্মণদিগের সন্মান বৃদ্ধি করিতে,
গোবৎসাদি রক্ষা করিতে, ধর্মবিরোধী মুসল-
মানদিগকে দূর করিতে দেবী সাক্ষাৎ উদ্ভে-
জনা করিতেছেন । আমি বালক ছিলাম,
সেই স্বপ্নে ভুলিলাম, সর্বপে খজা গ্রহণ করি-
লাম, বীরশ্রেষ্ঠদিগকে জড় করিলাম, দুর্গ
অধিকার করিতে লাগিলাম । যৌবনেও
সেই স্বপ্ন দেখিয়াছি, হিন্দু নামের গোরব,
হিন্দুধর্মের প্রাধাত্য, হিন্দুস্বাধীনতা-সংস্থাপন ।
সেই স্বপ্নবলে দেশ জয় করিয়াছি, শত্রু জয়
করিয়াছি, রাজ্য বিজ্ঞার করিয়াছি, দেবালয়
স্থাপন করিয়াছি । ক্ষত্রিয়রাজ ! আমার এ
উদ্দেশ্য কি মন্দ ? স্বপ্ন কি অলীক স্বপ্নমাত্র ?
আপনি পুত্রকে উপদেশ দিন ।”

বহুদূরদর্শী ধর্মপরায়ণ রাজা জয়সিংহ
কণেক নিম্ন হইয়া রহিলেন, পরে গভীর-
স্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন, “রাজন্ ! আপ-
নার উদ্দেশ্য অপেক্ষা বহুতর উদ্দেশ্য আমি
জানি না, আপনার স্বপ্ন অপেক্ষা প্রকৃত আর
কিছুই আমি জানি না । শিবজী ! আপনার

মহৎ উদ্দেশ্য আমার নিকটে অবিস্মৃত নাই,
আমি শত্রুর নিকট আপনার উদ্দেশ্যের প্রশংসা
করিয়াছি, পুত্র রামসিংহকে আপনার উদ্য-
হরণ দেখাইয়া শিক্ষা দিয়াছি, রাজপুত্র স্বাধী-
নতার গোরব এখনও বিস্তৃত হয় নাই । আর
শিবজী ! আপনার স্বপ্নও স্বপ্ন নহে, চারি-
দিকে ষত দেখি, মনে মনে চিন্তা করি, বোধ
হয়, মোগল-রাজ্য আর থাকে না । স্বপ্ন,
চেষ্টা সকলই বিফল । মুসলমান-রাজ্য কলঙ্ক-
রাশিতে পূর্ণ হইয়াছে, বিশাসপ্রিয়তার কঙ্ক-
রিত হইয়াছে, হিন্দুর প্রতি অত্যাচারে শাপ-
গ্রস্ত হইয়াছে, পতনোন্মুখ গৃহের জায় আর
দাঁড়াইতে পারে না । শীঘ্র কি বিলম্বে এই
প্রাসাদত্ব মোগল-রাজ্য বোধ হয়, ধূলি-
সাৎ হইবে, তাহার পর পুনরায় হিন্দুর
প্রাধাত্য । মহারাজীর জীবন অঙ্কুরিত হই-
তেছে, মহারাজীয় যৌবন-তেজে বোধ হয়,
ভারতবর্ষ প্রাবৃত হইবে । শিবজী ! আপ-
নার স্বপ্ন স্বপ্ন নহে, ভবানী আপনাকে মিথ্যা
উদ্ভেজনা করেন নাই ।”

উৎসাহে, আনন্দে শিবজীর শরীর কঁক-
কিত হইয়া উঠিল । তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা
করিলেন, “তবে ভবানুশ মঙ্গল্য সেই
পতনোন্মুখ মোগল-প্রাসাদের একমাত্র ভিত্ত-
স্বরূপ রহিয়াছেন কি জন্ত ?”

জয়সিংহ । সত্যপালন ক্ষত্রিয়ধর্ম, বাহা
সত্য করিয়াছি, তাহা পালন করিব । কিন্তু
অসাধা-সাধন হয় না, পতনোন্মুখ গৃহ পতিত
হইবে ।

শিবজী । ভাল, সত্যপালন করুন, কপটা-
চারী আরংজীবের নিকটেও আপনার ধর্ম-
চরণ দেখিয়া দেবতারাত্ত বিস্মিত হইয়া আপ-
নার শাশুবাদ করিবেন । কিন্তু আমি আরং-
জীবের নিকট কখনও সত্য করি নাই, আমি
যদি বুদ্ধিবলে স্বদেশের উন্নতি-সাধনের প্রয়াস

পাই, আরংজীবকে পরাস্ত করিতে পারি, তাহা কি নিশ্চয় ?

জয়সিংহ। ক্ষত্রিয়রাজ ! চাতুরী বোঝার পক্ষে সকল সময়ে নিশ্চয়, বিশেষতঃ মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনে চাতুরী অধিকতর নিশ্চয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের গৌরববৃদ্ধি অনিবার্য, বোধ হয়, তাহাদের বাহুবল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে, বোধ হয়, তাহারা ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইবে। কিন্তু শিবজী ! অত আপনি যে শিক্ষা দিতেছেন, সে শিক্ষা কদাচ তুলিবে না। আমার কথায় দোষ গ্রহণ করিবেন না, অত আপান নগর লুণ্ঠন করিতে শিখাইতেছেন, তথা তাহারা ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিবে, অত আপনি চতুরতা দ্বারা জয়লাভ করিতে শিখাইতেছেন, পরে তাহারা সমুদ্রযুদ্ধ কখনই শিখিবে না। যে জাতি অচিরে ভারতের অধীশ্বর হইবে, আপনি সেই জাতির বাল্যগুরু, গুরুর দ্বার ধর্ম-শিক্ষা দিন। অত আপনি মন্বশিক্ষা দিলে শতবর্ষ পর্যন্ত দেশে দেশে সেই শিক্ষার ফল দৃষ্ট হইবে। বৃদ্ধ বহুদর্শী রাজপুত্রের কথা গ্রহণ করুন, মহারাষ্ট্রীয়দিগকে সমুদ্রযুদ্ধশিক্ষা দিন, চতুরতা বিস্তৃত হইতে বসুন। আপনি হিন্দুশ্রেষ্ঠ, আপনার মহৎ উদ্দেশ্যে আমি শতবার ধন্যবাদ করিয়াছি, আপনি এই উন্নত শিক্ষা না দিলে কে দিবে ? মহারাষ্ট্রের শিক্ষাগুরু ! সাবধান ! আপনার প্রত্যেক কার্যের ফল বহুকাল-ব্যাপী, বহুদেশব্যাপী হইবে।

এই মহৎব্যাক্ত শুনিয়া শিবজী কণেক স্তম্ভিত রহিলেন, শেষে বলিলেন, “আপনি গুরুর গুরু, আপনার উপদেশগুলি শিরোধার্য। কিন্তু অত আমি আরংজীবের অধীনতা স্বীকার করিলাম, শিক্ষা কেবল দিব ?”

জয়সিংহ। জয়-পরাজয়ের স্থিরতা নাই।

অত আমার জয় হইল, কল্য আপনার জয়

হইতে পারে। অত আপনি আরংজীবের অধীন হইলেন, ঘটনাক্রমে কল্য স্বাধীন হইতে পারেন।

শিবজী। জগদীশ্বর তাহাই করুন, কিন্তু আপনি আরংজীবের সেনাপতি থাকিতে আমার স্বাধীন হওয়ার আশা বুধা। অরং ভবানী হিন্দু-সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে নিবেদন করিয়াছেন।

জয়সিংহ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “শরীর ক্ষণভঙ্গুর, এ বৃদ্ধ শরীর কত দিন থাকিবে ? কিন্তু বত দিন থাকিবে, সত্যপালনে বিরত হইবে না।”

শিবজী। আপনি দীর্ঘজীবী হউন।

জয়সিংহ। শিবজী ! এক্ষণে বিদায় দিন, আমি আরংজীবের পিতার নিকট কার্য করিয়াছি, এক্ষণে আরংজীবের অধীনে কার্য করিতেছি, বত দিন জীবিত থাকিবে, দিল্লীর এ বৃদ্ধ সেনা বিজ্রোহাচরণ করিবে না। কিন্তু ক্ষত্রিয়প্রবর ! নিশ্চিন্ত থাকুন, মহারাষ্ট্রের গৌরব ও হিন্দুর প্রাধান্য অনিবার্য। বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য করুন, মোগলরাজ্য আর থাকে না, হিন্দু-তেজ আর নিবারণ হয় না। অচিরে দেশে দেশে হিন্দুর গৌরব নাম, আপনার গৌরবনাম প্রতিধ্বনিত হইবে।

শিবজী অশ্রুপূর্ণলোচনে জয়সিংহকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “ধর্মাত্মন ! আপনার মুখে পুষ্পচন্দন পড়ুক, আপনার কথাই যেন সার্থক হয়। আপনার সহিত যুদ্ধ করিব না, আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছি, কিন্তু যদি ঘটনাক্রমে পুনরায় স্বাধীন হইতে পারি, তবে ক্ষত্রিয়প্রবর ! আর একদিন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব, আর একদিন পিতার চরণোপাস্তে বসিয়া উপদেশ গ্রহণ করিব।”

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

দুর্গবিজয় ।

তৌদিকে এবে সময়তরঙ্গ

উথলিল দিল্ল বধা যশি বায়ু সহ নিধৌষে ।

মধুসূদন যত্ন ।

শিবজী সন্ধি-স্থাপন হইল । শিবজী যোগল-
দিগের নিকট হইতে যে যে দুর্গ জয় করিয়া-
ছিলেন, তাহা ফিরাইয়া দিলেন, বিপুল আহ-
ম্মদনগর-রাজ্যের মধ্যে যে স্বাক্ষিংশঃ দুর্গ
অধিকার বা নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার
মধ্যেও বিংশটি ফিরাইয়া দিলেন, অবশিষ্ট
দ্বাদশটিমাত্র আরম্ভজীবের অধীনে জায়গীর-
স্বরূপ রাখিলেন । যে প্রদেশ তিনি সম্রাটকে
দিলেন, তাহার বিনিময়ে বিজয়পুর-রাজ্যের
অধীনস্থ কতক প্রদেশ সম্রাট শিবজীকে
দান করিলেন ও শিবজীর অষ্টমবর্ষীয় বালক
শম্ভুজী পাঁচ-হাজারী মসাবদার পদ প্রাপ্ত
হইলেন ।

শিবজীর সহিত যুদ্ধসমাপ্তির পর রাজা
জয়সিংহ বিজয়পুরের রাজ্য ধ্বংস করিয়া
সেই প্রদেশ দিল্লীখণ্ডের অধীনে আনিবার
যত্ন করিতে লাগিলেন । শিবজীর পিতা
বিজয়পুরের সহিত শিবজীর যে সন্ধিস্থাপন
করিয়াছিলেন, শিবজীর বিপদকালে বিজয়-
পুরের সুলতান সন্ধি বিস্তৃত হইয়া শিবজীর
রাজ্য আক্রমণ করিতে সঙ্কচিত হন নাই ।
সুতরাং শিবজী এক্ষণে জয়সিংহের পক্ষা-
লম্বন করিয়া বিজয়পুরের সুলতান আলী
আদিলশাহের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন এবং
আপন মাউলী সৈন্ত দ্বারা বহুসংখ্যক দুর্গ
হস্তগত করিলেন ।

জয়সিংহের সহিত শিবজীর সম্ভাব উত্ত-
রোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং পরস্পরের

যথোচিতশয় ঘেহ জয়িল । উভয়ে সর্বদাই
একত্র থাকিতেন ও যুদ্ধে পরস্পরের সহা-
য়তা করতেন । বলা বাহুল্য যে, শিবজীর
একজন তরুণ হাবিলদার সর্বদাই জয়সিংহের
একজন পুরোহিত-সমনে বাইতেন । নাম
বলিবার কি আবশ্যক আছে ?

সরলস্বভাব পুরোহিত জনার্দন ক্রমে
রঘুনাথকে পুত্রবৎ দেখিতে লাগিলেন, সর্ব-
দাই গৃহে আহ্বান করিতেন । রঘুনাথও
অবসর পাইলেই সেই সরল-স্বভাব পুরো-
হিতের নিকট আসিতেন, তাহার নিকট
রাজস্থানের সংবাদ পাইতেন, রাজা জয়-
সিংহের কথা শুনিতেন, স্বদেশের কথা শুনি-
তেন । কখন কখন বা রজনী দ্বিপ্রহর পর্যন্ত
বসিয়া যুদ্ধের কথা কহিতেন, পর্ত্তদুর্গ
আক্রমণের কথা, শত্রু-শিবির আক্রমণের
কথা, জঙ্গল বা গিরিচূড়ায় ভীষণ যুদ্ধের কথা
বর্ণনা করিতেন । এ সকল কথা বলিতে
বলিতে যোদ্ধার নয়ন প্রজ্জ্বলিত হইত, শর
কম্পিত হইত, মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিত ।

যুদ্ধ জনার্দন ভয়ে যুদ্ধবাক্তা শুনিতেন,
পার্শ্বের ঘরে নীরবে বসিয়া সরযুবালা সেই
জলন্ত কথাগুলি শুনিতেন, নীরবে অশ্রুজল
ত্যাগ করিতেন, নীরবে ভগবানের নিকট
সেই তরুণ যোদ্ধাকে রক্ষা করিবার জন্য
প্রার্থনা করিতেন । রজনী দ্বিপ্রহরের সময়
কথা সাক্ষ হইত, সরযুবালা আহার আনিয়া
দিতেন । যতক্ষণ রঘুনাথ আহার করিতেন,
সরযু নীরবে সেই দেবমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া
চাহিয়া ভূপ্তিলাভ করিতেন না । ভোজনান্তে
যদি যোদ্ধা যুদ্ধস্থলে বিদায় চাহিতেন বা অন্য
দুই একটি কথা কহিতেন, বেগমুখবতী উষ্মা
সরযুবালা তাহার উত্তর দিতে পারিতেন
না । লজ্জায় তাহার গণ্ডস্থল আরক্তবর্ণ হইত,
নয়ন দুইটি মূদিত হইত, অবগুষ্ঠনটনির

সরসু সরিয়া যাইতেন, লহচরীকে দিয়া উত্তর পাঠাইয়া দিতেন।

কিন্তু উত্তরের আবশ্যক কি? সরসু নরনের ভাব। রঘুনাথ বসিতেন, রঘুনাথের নরনের ভাব। সরসু বসিতেন। উত্তরের জীবন, মন, প্রাণ, প্রথম-প্রণয়ের অনির্বচনীয় আনন্দ-লহরীতে প্রাবৃত হইতেছিল, উত্তরের হৃদয় প্রথম-প্রণয়ের উদ্বেগে উৎক্লিপ্ত হইতেছিল।

অন্নদিনমধ্যে বিজয়পুরের অধীনস্থ অনেকগুলি দুর্গ হস্তগত করিয়া শিবজী অবশেষে একটি অতিশয় দুর্গম পর্বত-দুর্গ লইবার মানস করিলেন। তিনি কবে কোন্ দুর্গ আক্রমণ করিবেন, পূর্বে কাহাকেও তাহার সংবাদ দিতেন না, নিজের সৈন্তেরাও পূর্বে কিছুমাত্র জানিতে পারিত না। দিবাভাগে সেই দুর্গ হইতে ৫৬ কোশ দূরে জয়সিংহের শিবিরের নিকটেই তাহার শিবির ছিল, সায়ংকালে এক সহস্র মাউলী ও মহারাষ্ট্রীয় সেনাকে প্রস্তুত হইতে কহিলেন, এক প্রহর রজনীর সময় গভীর অন্ধকারে প্রকাশ করিলেন যে, রক্তমণ্ডল-দুর্গ আক্রমণ করিবেন। নিঃশব্দে সেই এক সহস্র সেনাসঙ্গে তর্গাভিযুগে গমন করিলেন।

অন্ধকার নিম্নে নিঃশব্দে দুর্গতলে উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে সমভূমি, তাহার মধ্যে একটি উচ্চ পর্বতশৃঙ্গের উপর রক্তমণ্ডল-দুর্গ নির্মিত হইয়াছে। পর্বতে উঠিবার একমাত্র পথ আছে, এক্ষণে যুদ্ধকালে সেই পথ রুদ্ধ হইয়াছে। অস্ত্রাশ্রয় দিকে উঠা অতিশয় কষ্টসাধ্য, পথ নাই, কেবল জঙ্গল ও শিলা-রাশি-পরিপূর্ণ। শিবজী সেই কঠোর দুর্গম স্থান দিয়া সেনাগণকে পর্বত আরোহণ করিতে আদেশ দিলেন, তাহার মাউলী ও মহারাষ্ট্রীয় সেনা যেন পর্বত-বিড়ালের ভায়

বুদ্ধ বীরের শৈল হইতে শৈলাভরে লক্ষ দিতে বিতে পর্বত আরোহণ করিতে লাগিল। কোন স্থানে দাঁড়াইয়া, কোন স্থানে বসিয়া, কোথাও বৃকের ডাল ধরিয়া লম্বমান হইয়া, কোথাও লক্ষ দিয়া সৈন্তগণ অগ্রসর হইতে লাগিল, মহারাষ্ট্রীয় সেনা ভিন্ন আর কোন জাতীয় সৈন্ত এক্ষণ পর্বত আরোহণে সমর্থ কি না সন্দেহ।

অন্ধক পথ উঠিলে পর শিবজী সহসা দেখিলেন, উপরে দুর্গপ্রাচীরের উপর কতকগুলি মশালের আলোক জ্বলিল। চিন্তাকুল হইয়া কণেক দণ্ডায়মান রহিলেন, শত্রুরা কি তাহার আগমন-বার্তা শুনিতে পাইয়াছে? নচেৎ প্রাচীরের উপর এক্ষণ আলোক জ্বলি কেন? আলোকের কিরণ দুর্গের নীচে পর্য্যন্ত পতিত হইয়াছে, যেন দুর্গবাসিগণ শত্রুকে প্রতীক্ষা করিয়াই এই আলোক জ্বলিয়াছে, যেন অন্ধকারে আবৃত হইয়া কেহ দুর্গ আক্রমণ করিতে না পারে। শিবজী নিজ সৈন্তগণকে আরও সতর্কভাবে বুদ্ধ ও শৈলরাশির অন্তরাল দিয়া ধীরে ধীরে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন। নিঃশব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণ সেই পর্বতে আরোহণ করিতে লাগিল, যেখানে বড় বৃক্ষ, যেখানে কোপ, যেখানে শৈলরাশি, সেট সেই স্থান দিয়া বৃকে হাঁটিয়া উঠিতে লাগিল। শঙ্কমাত্র নাই, অন্ধকারে নিঃশব্দে শিবজী সেই পর্বতে উঠিতে লাগিলেন।

কণেক পর মহারাষ্ট্রীয়গণ একটি পরিষ্কার স্থানের নিকট আসিয়া পড়িল, উপর হইতে আলোক তথার স্পষ্টরূপে পতিত হইয়াছে, সে স্থান দিয়া সৈন্য যাইলে উপর হইতে দেখা যাইবার অতিশয় সম্ভাবনা। শিবজী পুনরায় দণ্ডায়মান হইলেন, বৃকের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া এদিকে ওদিকে

দেখিতে লাগিলেন। শয্যে দেখিলেন, আর শত-হস্ত-পরিমাণ স্থানে বুকঝাঁ নাই, পরে পুনরায় বুকশ্রেণী রহিয়াছে। এই শত হস্ত কিরূপে বাওয়া যায়? পার্শ্বে দেখিলেন, বাইবার কোন উপায় নাই, নীচে দেখিলেন, অনেক দূর আসিয়াছেন, পুনরায় নীচে বাইয়া অস্ত পথ অবলম্বন করিলে দুর্গে আসিবার পক্ষেই প্রাতঃকাল হইতে পারে। শিবজী ক্ষণেক নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে বলাকালের স্বহৃৎ বিধাসী মাউলী বোদ্ধা তন্নজী-মালশ্রীকে ডাকাইলেন, দুই জনে সেই বৃকের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষণেক অতি মুদুস্থের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পর তন্নজী চলিয়া যাইল, শিবজী অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, তাহার সমস্ত সৈন্ত নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে তন্নজী ফিরিয়া আসিল; শিবজীর নিকট আসিয়া অতি মুদুস্থের কি কহিল। শিবজী ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া বলিলেন, “তাহাই হউক, অস্ত উপায় নাই।”

বৃষ্টির জল অবতরণে এক স্থান ধোত ও ক্ষত হইয়া প্রণালীর স্তায় হইয়ছিল। দুই পার্শ্বে উচ্চ, মধ্যস্থল গভীর, সেই প্রণালী বৃকে হাঁটিয়া যাইলে সম্ভবতঃ দুই পার্শ্বে পাকৃ থাকায় শত্রুরা দেখিতে পাইবে; এই পরামর্শ স্থির হইল। সমস্ত সৈন্ত ধীরে ধীরে সেই প্রণালীর মধ্য দিয়া পক্ষত আরোহণ করিতে লাগিল। শত শত শিলাথণ্ডের উপর দিয়া নিস্তর অন্ধকার রজনীতে সহস্র সেনা নিঃশব্দে পক্ষত আরোহণ করিতে লাগিল। অচিরে উপরিস্থ বুকশ্রেণীর মধ্যে বাইয়া প্রবেশ করিল, শিবজী মনে মনে ভবানীকে ধন্যবাদ করিলেন।

সহস্রা তাহার পার্শ্বস্থ একজন সেনা

পতিত হইল। শিবজী দেখিলেন, তাহার বক্ষঃস্থলে তীর লাগিয়াছে। আর একটি তীর, আর একটি, আরও বহুসংখ্যক তীর। শত্রুগণ আগরিত হইয়া রহিয়াছে, শিবজীর সৈন্ত প্রণালী দিয়া আরোহণ করিবার সময় তাহারা দেখিতে পাইয়াছে এবং সেই দিকে তীর নিক্ষেপ করিয়াছে।

শিবজীর সমস্ত সৈন্ত বৃকের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইল, তীরনিক্ষেপ থামিয়া গেল; কিন্তু শিবজী বুঝিলেন, শত্রুরা তাহার আগমন জানিতে পারিয়াছে। তিনি দুর্গদিকে চাহিয়া দেখিলেন, এখন অনেকগুলি আলোক প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, সময়ে সময়ে প্রহরিগণ এদিক্ ওদিক্ বাইতেছে। তখন তিনি দুর্গপ্রাচীর হইতে কেবলমাত্র পক্ষাশ হস্ত দূরে। বুঝিলেন, সৈন্তগণ সতর্ক হইয়াছে, জীবন যুক্ত বিনা অস্ত দুর্গ হস্তগত হইবার নহে।

শিবজীর চিরসহচর তন্নজী এ সমস্ত দেখিল; ধীরে ধীরে বলিল, “রাজন্! এখনও নামিয়া বাইবার সময় আছে, অস্ত দুর্গ হস্তগত না হয়, কল্যা হইবে, কিন্তু অস্ত চেষ্টা করিলে সকলের বিনাশ হইবার সম্ভাবনা।” শিবজী গম্ভীরস্বরে বলিলেন, “জয়-সিংহের নিকট যাহা বলিয়াছি, তাহা করিব, অস্ত কদ্রমণ্ডল লইব, অথবা এই বৃক্ষে প্রাণ-ত্যাগ করিব।”

শিবজী নিতুকে সেই বুকশ্রেণীর ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শত্রুকে ভুলাইবার জন্য একশত সৈন্তকে দুর্গের অপর পার্শ্বে বাইয়া গোল করিতে আদেশ করিলেন। অস্তক্ষেপের মধ্যে দুর্গের অপর পার্শ্বে বন্দুকের শব্দ শুনা গেল, সেই দিক্ হইতে শিবজী দুর্গ আক্রমণ করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া দুর্গস্থ প্রহরী ও সৈন্ত-সকল

সেই দিকে ধাবমান হইল, এদিকে প্রাচীরোপরি বে আলোক জলিতেছিল, তাহা নিবিয়া বাইল। তখন শিবজী বলিলেন, “মহারাজীরগণ! শত যুদ্ধে ভোমরা আপন বিক্রমের পরিচয় দিয়াছ, শিবজীর নাম রাখিয়াছ, অস্ত্র আর একবার সেই পরিচয় দাও। তরঙ্গী! বালাকালের সৌন্দর্য্যের পরিচয় অস্ত্র প্রদান কর।”

প্রভুবাক্যে সকলের হৃদয় সাহসে পরিপূর্ণিত হইল, নিঃশব্দে সেই গভীর অন্ধকারে সকলে অগ্রসর হইল, অচিরে দুর্গ-প্রাচীরের নিকট পৌছিল। রজনী ঘিগ্রহর অতীত হইয়াছে, আকাশে আলোক নাই, অগতে শব্দ নাই, কেবল রহিয়া রহিয়া নৈশ বায়ু সেই পর্ব্বত-বৃক্ষের ভিতর দিয়া মর্দরশব্দে প্রবাহিত হইতেছে।

কুদ্রমণ্ডলের প্রাচীর হইতে শিবজী বিংশ হস্ত দূরে আছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, প্রাচীরের উপর একজন প্রহরী; বৃক্ষের ভিতর শব্দ শ্রবণ করিয়া প্রহরী পুনরায় এই দিকে আসিয়াছে। একজন মাউলী নিঃশব্দে একটি তীর নিক্ষেপ করিল, হতভাগ্য প্রহরীর মৃত-শরীর প্রাচীরের বাহিরে পতিত হইল।

সেই শব্দ শুনিয়া আর এক জন, দুই জন, দশ জন, শত জন, ক্রমে দুই তিন শত জন সৈনিক প্রাচীরের উপর ও নীচে জড় হইল। শিবজী রোষে ওষ্ঠের উপর দস্ত স্থাপন করিলেন; আর লুকায়িত থাকিবার উপায় দেখিলেন না, সৈন্যকে অগ্রসর হইবার আদেশ দিলেন।

তৎক্ষণাৎ মহারাজীর্ঘদিগের “হর হর মহাদেও” যুদ্ধনাদ গগনে উখিত হইল, একদল প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবার জন্ত দৌড়িয়া গেল, আর একদল বৃক্ষের ভিতর

থাকিয়াই ক্ষিপ্রহস্তে প্রাচীরোহী মুসলমানদিগকে তীর দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল। মুসলমানেরাও শত্রুর আগমনে কিছুমাত্র ভীত না লইয়া “আল্লাহ আকবর” শব্দে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিল, কেহ বা প্রাচীরের উপর হইতে তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কেহ বা উৎসাহ-পরিপূর্ণ হইয়া প্রাচীর হইতে লক্ষ দিয়া আসিয়া বৃক্ষমধ্যেই মহারাজীর্ঘদিগকে আক্রমণ করিল।

শীঘ্রই সেই প্রাচীরতলে ও বৃক্ষমধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রাচীরতলের উপরিস্থ মুসলমানেরা বর্ষাচালনে আক্রমণকারীদিগকে হত করিতে লাগিল, তাহারাও অব্যর্থ তীরসঞ্চালনে মুসলমানদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। রাশি রাশি মৃতদেহে প্রাচীরপার্শ্ব পরিপূর্ণ হইল, বোমরা সেই মৃতদেহের উপর দণ্ডায়মান হইয়া বর্ষাচালন করিতে লাগিল। শত মুসলমান বৃক্ষের ভিতর পর্য্যন্ত গিয়াছিল, শিবজীর মাউলীগণ একেবারে ব্যাঘ্রের জায় লক্ষ দিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, প্রবলপ্রতাপ আক্রমণেরাও যুদ্ধে অপটু নহে, রক্তশ্রোত সেই পর্ব্বত দিয়া বহিয়া পড়িতে লাগিল। বৃক্ষের অন্তরালে, কোণের ভিতর, শিলারাশির পার্শ্বে, শত শত মহারাজীর্ঘগণ দণ্ডায়মান হইয়া অব্যর্থ তীরসঞ্চালন করিতে লাগিল, বৃক্ষপত্র ও বৃক্ষশাখার ভিতর দিয়া সেই অব্যর্থ তীরশ্রেণী মুসলমান-সংখ্যা ক্ষীণতর করিতে লাগিল।

সহসা এ সমস্ত শব্দকে ডুবাইয়া প্রাচীর হইতে “শিবজীকি জয়” এইরূপ বজ্রনাদ উখিত হইল, মুহুর্তের জন্ত সকলেই সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, শত্রুসৈন্য ভেদ করিয়া রক্তাপ্লুত বর্ষার উপর ভর

মহারাজী জীবন প্রভাত ।

দিয়া, একজন রাজপুত্র যোদ্ধা এক লক্ষ
সহস্রগুলের প্রাচীরের উপর উঠিয়াছেন।
তথায় পাঠানদিগের পতাকা পদাঘাতে
কেলিয়া দিয়াছেন। পতাকাধারী গ্রহরীকে
খড়্গচালনে হত করিয়াছেন, প্রাচীরোপরি
দণ্ডায়মান হইয়া সেই অপূর্ব যোদ্ধা বজ্রনাদে
“শিবজীকি জয়” শব্দ করিয়াছিল। সেই
যোদ্ধা রঘুনাথের হাবিলদার।

হিন্দু ও মুসলমান এক মহুর্ন্তের জন্ত যুদ্ধে
লাজ হইয়া বিশ্বাসাত্মক লাতনে তারকা-
লোকে সেই দীর্ঘযুদ্ধের প্রতি দৃষ্টি করিল।
যোদ্ধার লৌহনির্মিত শিরস্ত্রাণ তারকালোকে
চক্ চক্ করিতেছে, হস্ত ও বাহুদ্বয় রক্তে
আগ্নুত, বিশাল বক্ষের উপর দুই একটি
তীর লাগিয়া রহিয়াছে, দীর্ঘহস্তে রক্তাশ্রুত
দীর্ঘ বর্শা, উজ্জল নয়ন গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশে
আবৃত। পোতের সম্মুখে উর্ধ্বাশিরি জার
শক্ররা এই যোদ্ধার দুই পার্শ্বে মহুর্ন্তের জন্ত
সচকিত হইয়া সরিয়া গেল, মহুর্ন্তের জন্ত
বোধ হইল, যেন স্বয়ং রণদেব দীর্ঘ বর্শা-হস্তে
আকাশ হইতে প্রাচীরোপরি অবতীর্ণ
হইয়াছেন।

ক্ষণকালমাত্র সকলে নিস্তব্ধ রহিল, পরে
আকগানগণ শব্দ প্রাচীরে উঠিয়াছে
দেখিয়া, চারিদিক্ হইতে বেগে আসিতে
লাগিল, রঘুনাথকে চারিদিকে শত্রুদল কক্ষ-
মেঘের ভ্রায় আসিয়া বেঁটন করিল। রঘু-
নাথ খড়া ও বর্শা-চালনে অদ্বিতীয়, কিন্তু
শত লোকের সহিত যুদ্ধ অসম্ভব, রঘুনাথের
জীবন-সংশয়।

তখন মাউলীগণ রঘুনাথের বিক্রম
দেখিয়া উৎসাহিত হইয়া সেই প্রাচীরের
দিকে ধাবমান হইল, ব্যাঘ্রের ভ্রায় লক্ষ দিয়া
প্রাচীরে উঠিল, রঘুনাথের চারিদিকে বেঁটন
করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। দশ, পঞ্চাশ,

দুই তিন শত জন সেই প্রাচীরের
উত্তর পার্শ্বে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়া
খড়াধাড়ে পাঠানদিগের সারি ছিন্ন-ভিন্ন
করিয়া পথ পরিষ্কার করিল, মহানাদে হুগ
পরিপূরিত করিল। সহস্র মহারাষ্ট্রীয়ের
সহিত দুই তিন শত পাঠানের যুদ্ধ করা
সম্ভব নহে, তাহার মহারাষ্ট্রীয়ের গতিরোধ
করিতে পারিল না।

তখন শিবজী ও তরলী প্রাচীর হইতে
লক্ষ দিয়া হুগের ভিতরদিকে ধাবমান
হইতেছেন; সৈন্তগণ বুঝিল, আর এ স্থানে
যুদ্ধের আবশ্যক নাই, সকলেই প্রভুর পত্যাং
পত্যাং হুগের ভিতরদিকে ধাবমান হইল।

শিবজী বিচ্যুৎগতিতে কিল্লাদারের
প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। সে প্রাসাদ অতি-
শয় কঠিন ও সুরক্ষিত। শিবজীর আদেশ
অমুসারে মহারাষ্ট্রীয়েরা সেই প্রাসাদ বেঁটন
করিল ও বাহিরের গ্রহরী সকলকে হত
করিল। শিবজী তখন বজ্রনাদে কিল্লাদারকে
বলিলেন, “দার খুলিয়া দাও, নচেৎ প্রাসাদ
নাহ করিব।” নিভৌক পাঠান উত্তর করি-
লেন, “অগ্নিতে দাহ হইব, কিন্তু কাকেরের
সম্মুখে দার খুলিব না।”

তৎক্ষণাৎ মহারাজী যুগল মশাল আনিয়া
দ্বারে জানালায় অগ্নিদান করিতে লাগিল।
উপর হইতে কিল্লাদার ও তাহার সঙ্গিগণ
তীরনিষ্ক্ষেপ দ্বারা প্রাসাদে অগ্নিদান-নিবারণ
করিবার চেষ্টা পাইলেন। অনেক মহারাষ্ট্রীয়
মশাল-হস্তে ভূতলশায়ী হইল, কিন্তু অগ্নি
জলিল।

প্রথমে দার, গবাক, পরে কড়িকাঠ, পরে
সেই বিস্তীর্ণ প্রাসাদ সমস্ত অগ্নিতে জলিয়া
উঠিল। সেই প্রচণ্ড আলোক ভীষণনাদে
আকাশের দিকে উখিত হইল ও রাজনীর
অন্ধকারকে আলোকময় করিল। বহুদূর

পর্বত পর্বতে ও উপত্যকা হইতে সেই আলোক দৃষ্ট হইল, সেই দাতের শব্দ শ্রুত হইল, সকলে জানিল, শিবজীর দুর্জয়নীর ও অপ্রতিহত সেনা মুসলমান-দুর্গ জয় করিয়াছে।

বীরের সাহা সাধ্য, পাঠান-কিল্লাদার রহমৎ খাঁ তাহা করিয়াছিলেন, এক্ষণে বীরের স্তায় মরিতে বাকী ছিল। যখন গৃহ অগ্নিপূর্ণ হইল, রহমৎ খাঁ ও সঙ্গিগণ লক্ষ দিয়া ছাদ হইতে ভূমিতে অবতরণ করিলেন। এক একজন এক এক মহাবীরের স্তায় খড়্গচালনা করিতে লাগিলেন, সেই খড়্গচালনায় বহু মহারাষ্ট্রীয় হত হইল।

সকলে সেই মুসলমানদিগকে বেঠেন করিল, তাহারা শত্রুর মধ্যে একে একে হত হইতে লাগিল। একজন, দুইজন, দশজন হত হইল। রহমৎ খাঁ আহত ও ক্ষীণ, কিন্তু তখনও সিংহবীর্যের সজ্জিত যুদ্ধ করিতেছেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁহাকে চারিদিকে বেঠেন করিয়াছেন, চারিদিকে খড়্গা উত্তোলিত হইয়াছে, তাঁহার জীবনের আশা নাই, এক্ষণ সময় উচ্চৈঃস্বরে শিবজীর আদেশ শ্রুত হইল, “কিল্লাদারকে বন্দী কর, বীরের প্রাণ-সংহার করিও না।” ক্ষীণ আহত আফগানের হস্ত হইতে শিবজীর সেনাগণ খড়্গা কাড়িয়া লইল, তাঁহার হস্তবন্ধন করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিল।

মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রাসাদের অগ্নি নির্ঝাঁপ করিতেছে, এমন সময়ে শিবজী দেখিলেন, দুর্গের অপর দিকে কৃষ্ণবর্ণ মেঘের স্তায় প্রায় পাঁচশত আফগান-সৈন্য সম্ভ্রুত হইয়া পর্বতে উঠিতেছে। শিবজী দুর্গপ্রাচীর আক্রমণ করিবার পূর্বে যে একশত সেনাকে অপর পার্শ্বে পাঠাইয়া দিচ্ছিলেন, তাহারা সেই দিকে গোল করাতে দুর্গের অধিকাংশ

সেনা সেই দিকেই গিয়াছিল। হুঁতুর মহা রাষ্ট্রীয়গণ ক্ষণেক বৃক্ষের অন্তরাল হইতে যুদ্ধ করিয়া ক্রমে ক্রমে পলায়ন করিতে লাগিল, তাহাতে মুসলমানেরা উৎসাহিত হইয়া পর্বতের সেই একশত মহারাষ্ট্রীয়ের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, অপরদিকে শিবজী আক্রমণ করিয়া যে দুর্গ হস্তগত করিয়াছিলেন, তাহা তাহারা কিছুই জানিতে পারে নাই।

পরে যখন প্রাসাদের আলোকে ক্ষেত্র, গ্রাম, পর্বত ও উপত্যকা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, তখন সেই অধিকাংশ মুসলমানগণ আপনাদিগের ভ্রম জামতে পারিয়া পুনরায় দুর্গারোহণ করিয়া শত্রু বিনাশ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইল। শিবজী অল্পসংখ্যক সেনাকে পরাস্ত করিয়া দুর্গজয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে দেখিলেন, পাঁচশত যোদ্ধা দ্রুতবেগে সেই পর্বতদুর্গ আরোহণ করিতেছে। দেখিয়া তাঁহার মূখ গম্ভীর হইল।

সুতীক্ষ্ণ-নয়নে দেখিলেন, চারি বধ্য কিল্লাদারের প্রাসাদই সর্বাঙ্গেক্ষণে মন্থন। চারিদিকে প্রস্তরময় প্রাচীর, অগ্নিতে সে প্রাচীরের কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় নাই। প্রাসাদের দ্বার গবাক্স জলিয়া গিয়াছে, কোথাও বা ঘর পড়িয়া প্রস্তর স্তুপাকার হইয়াছে। তীক্ষ্ণনয়ন শিবজী মুহূর্তের মধ্যে দেখিলেন, অধিকসংখ্যক সৈন্যের বিকক্ষে যুদ্ধ করিবার স্থল ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আর হইতে পারে না।

মুহূর্তমধ্যে মনে সমস্ত ধারণা করিলেন। তন্নজীও হুঁশত সেনাকে সেই প্রাসাদে সন্নিবেশিত করিলেন, প্রাচীরের পার্শ্বে তীরক্ষাজ রাখিলেন, দ্বার ও গবাক্সের পার্শ্বে তীরক্ষাজ রাখিলেন, ছাদের উপর বর্শাধারী বোদ্ধগণকে সন্নিবেশিত করিলেন। কোথাও

প্রস্তর পরিষ্কার করিলেন, কোথাও অধিক প্রস্তর একত্র করিলেন, মুহূর্তমধ্যে সমস্ত প্রস্তর । তখন হাস্ত করিয়া তরঙ্গীকে কহিলেন, “তরঙ্গী, শত্রুরা যদি এই প্রাসাদ আক্রমণ করে, তুমি ইহা রক্ষা করিতে পারিবে । কিন্তু শত্রুকে এই স্থানে আসিতে দিবার পূর্বেই বোধ হয়, পরাস্ত করা বাইতে পারে, তাহারা এখনও পর্বত আরোহণ করিতেছে, এই সময়ে আক্রমণ করা উচিত । তরঙ্গী, দুই শত সৈন্য সহিত এই স্থানে অবস্থিতি কর, আমি একবার উদ্বেগ করিয়া দেখি ।”

তরঙ্গী । তরঙ্গী এ স্থানে অবস্থিতি করিবে না, একজন মহারাজীরও এ স্থানে অবস্থিতি করিবে না । ক্ষত্রিয়রাজ ! আপনি এই প্রাসাদ রক্ষা করুন, সমস্ত সুশৃঙ্খলা করুন, আগন্তুক শত্রুদিগকে তাড়াইয়া দিতে আপনার ভৃত্যেরা কি সক্ষম নহে ?

শিবজী ঈষৎ হাস্ত করিয়া বলিলেন, “তরঙ্গী ! তোমার কথাই ঠিক ! আমি সম্মুখে শত্রু দেখিয়া যুদ্ধ-লুক্ হইয়াছিলাম, কিন্তু তোমার পরামর্শই উৎকৃষ্ট, এই স্থানেই আমার থাকা কর্তব্য । আমার হাবিলদারদিগের মধ্যে কে দুই শত মাত্র সেনা লইয়া ঐ আফগানদিগকে অঙ্ককারে সহসা আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিতে পারিবে ?”

পাঁচ, সাত, দশ জন হাবিলদার একেবারে দণ্ডায়মান হইলেন, সকলে গোল করিয়া উঠিল । রঘুনাথ তাহাদের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না, নিঃশব্দে যুগ্মিকার দিকে চাহিয়া রহিলেন ।

শিবজী ধীরে ধীরে সকলের দিকে চাহিয়া পরে রঘুনাথকে দেখিয়া বলিলেন, “হাবিলদার ! তুমি ইহাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ, কিন্তু ঐ বাহতে তুমি অশ্রুযবীৰ্য্য ধারণ কর, অস্ত্র

ভোবার বিক্রম দেখিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছি । রঘুনাথ তুমি অস্ত্র দুর্গ বিজয় আরম্ভ করিয়াছ, তুমিই শেষ কর ।”

রঘুনাথ নিঃশব্দে তুমি পরাস্ত শির নামাইয়া দুই শত সেনার সহিত বিদ্রোহগতিতে ন্যূনের বহির্গত হইলেন । শিবজী তরঙ্গীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “ঐ হাবিলদার রাজপুতজাতীয়, উহার বৃথমূল ও আচরণ দেখিলে কোন উন্নত বীরবংশোদ্ভব বলিয়া বোধ হয় । কিন্তু হাবিলদার কখনও বংশের বিষয় একটি কথাও বলে না, আপন অসাধারণ সাহস-সম্বন্ধে একটি গর্ভিত বাঁকাও উচ্চারণ করেন না । একদিন পুনরায় রঘুনাথ আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, অতঃপর রঘুনাথই দুর্গবিজয়ে অগ্রসর হইয়াছিল । আমি এ পর্য্যন্ত কোমও পুরস্কার দিই নাই, কল্যা রাজসভায় রাজা জরসিংহের সম্মুখে রাজপুত হাবিলদারকে উচিত পুরস্কার দিব ।”

রঘুনাথজী যে কার্যের ভার লইলেন, তাহা সম্পন্ন করিলেন । আফগানগণ এখনও পর্বত আরোহণ করিতেছে, এমন সময়ে প্রাচীরের উপর হইতে মহারাজীরগণ বর্শা নিক্ষেপ করিল, পরে “হর”হর মহাবেণ্ড” ভীষণনাদে যুদ্ধের উপক্রম করিল । সে যুদ্ধ হইল না । প্রাচীরের উপর মশালের আলোকে অসংখ্যক শত্রু দেখিয়া আফগানগণ দুর্গ উদ্ধার করা হুঃসাধ্য জানিয়া পুনরায় পর্বত অবতরণ করিয়া পলাইল । মাউলীগণ পশ্চাৎদাবন করিল, উন্নত মাউলীদিগের অব্যবহিত ছুরিকা ও খড়্গাঘাতে আফগানগণ নিপতিত হইতে লাগিল ।

রঘুনাথ তখন উচ্চৈঃস্বরে আদেশ দিলেন, “পলাতককে বাইতে দাও, হস্তা করিও না, শিবজীর আদেশ পালন কর ।”

বৃদ্ধ শেষ হইল, আকস্মিকপৰ্ণ পৰ্ণিত অবতরণ করিয়া পলাইল।

তখন রঘুনাথ দুর্গের প্রাচীরের স্থানে স্থানে প্রহরী সংস্থাপন করিলেন, গোলা, বাক্স ও অস্ত্রশস্ত্রের যবে আপন প্রহরী সন্নিবেশিত করিলেন, দুর্গের সমস্ত ঘর, সমস্ত স্থান হস্তগত করিয়া সুরক্ষার আদেশ দিয়া শিবজীকে নিকট বাইরা শির নামাইয়া সমস্ত সমাচার নিবেদন করিলেন।

যখন উবার রক্তমাচ্ছটা পূর্বদিকে দৃষ্ট হইল, প্রাতঃকালের সূর্য্যমণ্ডল বায়ু বহিতে লাগিল, তখন সমস্ত দুর্গ লক্ষ্যন্য, নিস্তর। যেন এই সূর্য্যর শাস্ত পাদপমণ্ডিত পৰ্ণিত-শেখর যোগী-ঋষির আশ্রয়, যেন যুদ্ধের পৈশাচিক রব কখনও এ স্থানে শ্রুত হয় নাই।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ।

বিজ্ঞতার পুরস্কার ।

ছিন্ন ডুবাদের ন্যায়, বাল্য-বাক্য হুঁত যায়,
ভাষনক জীবনের স্বপ্ন-বায়ু-প্রহাৰে ।
পাণ্ডে থাকে দূরগত, জীর্ণ অভিল্যব বত,
ছিন্ন পতাকার মত ভয় দুর্গপ্রাকারে ॥

কেবলম্ব বক্ষোপাধায় ।

পরদিন অপরাহ্নে সেই দুর্গোপরি অপ-
রূপ সভা সন্নিবেশিত হইল। রৌপ্য-বিনির্মিত
চারি স্তম্ভের উপর রক্তবর্ণের চক্রাতপ,
নীচেও রক্তবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত রাজগুণীর উপর
রাজা জয়সিংহ ও রাজা শিবজী উপবেশন
করিয়া আছেন। চারি পার্শ্বে সৈন্যগণ
বন্দুক লইয়া জ্যেষ্ঠবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহি-
রাছে, সেই বন্দুকের কিরীচ হইতে রক্তবর্ণের
পতাকা অপরাহ্নের বায়ুচল্লোলে নৃত্য করি-
তেছে। চারিদিকে শত শত লোক দিল্লী-

ধরয়, জয়সিংহের ও শিবজীর জয়নাদ
করিতেছে।

জয়সিংহ সহাস্ত্রবদনে শিবজীকে বলি-
লেন, “আপনি দিল্লীধরুর পক্ষাবলম্বন
করিয়া অবধি তাঁহার দক্ষিণহস্তরূপ
হইয়াছেন। এ উপকার দিল্লীধর কখনই
বিস্মৃত হইবেন না, আপনার সকল চেষ্টার
ফল হইয়াছে।”

শিবজী। যেখানে জয়সিংহ, সেইখানেই
জয় ।

জয়সিংহ। বোধ করি, আমরা শীঘ্রই
বিজয়পুর হস্তগত করিতে পারিব, আপনি
এক রাজ্যের মধ্যে এই দুর্গ অধিকার
করিবেন, তাহা আমি কখনই আশা করি
নাই।

শিবজী। মহারাজ ! দুর্গ-বিজয়
বাল্যকাল হইতে শিক্ষা করিয়াছি। তথাপি
যে রূপ অনায়াসে দুর্গ লইব বিবেচনা করিয়া-
ছিলাম, সেরূপ পারি নাই।

জয়সিংহ। কেন ?

শিবজী। মুসলমানদিগকে সুস্থ পাইব
বিবেচনা করিয়াছিলাম, দেখিলাম একলে
জাগ্রত ও সসজ্জ। পূর্বে কখন দুর্গ জয়
করিতে আমার এত সৈন্য হত হয় নাই।

জয়সিংহ। বোধ করি এক্ষণ যুদ্ধের
সময় বলিয়া রজনীতে সর্কদাই শত্রুরা সসজ্জ
থাকে।

শিবজী। সত্য, কিন্তু এত দুর্গ জয়
করিয়াছি, কোথাও সৈন্যগণকে একরূপ প্রস্তুত
দেখি নাই।

জয়সিংহ। শিক্ষা পাইয়া ক্রমেই সতর্ক
হইতেছে। কিন্তু সতর্কই থাকুক আর নাই
থাকুক, রাজা শিবজীর গতিবোধ করা
অসাধ্য, শিবজীর জয় অনিবার্য।

শিবজী। মহারাজের প্রসাদে দুর্গজয়

হইয়াছে বটে, কিন্তু কল্যা রজদীর কতি
জীবনে পূরণ হইবে না। সহস্র আক্রমণ-
কারীর মধ্যে দুই তিনি শত জনকে আমি
আর এ জীবনে দেখিব না, সেসকল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ
বিরত সেনা বোধ হয় আর পাইব না।

শিবজী কণেক শোকাবুল হইয়া রহি-
লেন; পরে বন্ধিগণকে আনিবনের আদেশ
করিলেন।

রহমৎ খাঁর অধীনে সহস্র সেনা সেই
দুর্গম দুর্গ রক্ষা করিত, কল্যকার যুদ্ধের
পর কেবল দুই এক শত বন্দীরূপে আছে,
অল্প সময় হত বা পলায়ন করিয়াছে।
বন্দীদিগের হস্তদ্বয় পক্ষাঙ্গিকে বদ্ধ, তাহারা
সভাসম্মুখে উপস্থিত হইল।

শিবজী আদেশ করিলেন, “সকলের
হস্ত খুলিয়া দাও। আক্রমণ সেনাগণ।
তোমরা বীরের নাম রাখিয়াছ, তোমাদের
আচরণে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমরা
স্বাধীন। ইচ্ছা হয়, দিল্লীখরের কার্যে নিযুক্ত
হও, নচেৎ আপন প্রভু বিজয়পুরের সুল-
তানের নিকট চলিয়া যাও, আমার আদেশে
কেহ তোমাদের কেশাগ্র স্পর্শ করিবে না।”

শিবজীর এই সদাচরণ দেখিয়া কেহই
বিস্মিত হইল না। সকল যুদ্ধে সকল দুর্গ-
বিজয়ের পর তিনি বিধিভঙ্গিগেব প্রতি
যথেষ্ট দয়াপ্রকাশ ও সদাচরণ করিতেন,
তাহার বন্ধুগণ কখন কখন তাহাকে এজ্ঞ
দোষ দিতেন, কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করিতেন
না। শিবজীর সদাচরণে বিস্মিত হইয়া
আক্রমণগণ অনেকেই দিল্লীখরের বেতন-
ভোগী হইতে স্বীকার করিল।

পরে শিবজী কিল্লাদার রহমৎ খাঁকে
আনিবার আদেশ দিলেন। তাহারও
হস্তদ্বয় পক্ষাঙ্গিকে বদ্ধ, তাহার ললাটে
খড়্গের আঘাত, বাহতে ভীর বিদ্ধ হইয়া

বদ্ধ হইয়াছে। বীর সর্পে সভ্য-সম্মুখে
দণ্ডায়মান হইলেন, সর্পে শিবজীর দিকে
চাহিলেন।

শিবজী সেই বীরশ্রেষ্ঠকে দেখিয়া
বহু আসন-ভাগ করিয়া খড়্গের দ্বারা
হস্তের রক্ত কাটিয়া ফেলিলেন, পরে বীরে
বীরে বলিলেন, “বীরবৎ! যুদ্ধের নিয়মা-
নুসারে আপনার হস্ত বদ্ধ হইয়াছিল,
আপনি এক রাজনী বন্দীরূপে ছিলেন,
আমার দোষ স্বীকার করুন। আপনি
একপে স্বাধীন। জয়-পরাজয় ভাগ্যক্রমে
ঘটে, কিন্তু আপনার জ্ঞান বোদ্ধার সহিত
বুদ্ধ করিয়া আমিই সম্মানিত হইয়াছি।”

রহমৎ খাঁ প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রত্যাশা
করিতেছিলেন, তাহাতেও তাহার স্থির
পারিত নয়নের একটি পত্রও কম্পিত হয়
নাই, কিন্তু শিবজীর এই অসাধারণ ভক্ততা
দেখিয়া তাহার হৃদয় বিচলিত হইল। যুদ্ধ-
সময়ে শত্রুমধ্যে কেহ কখনও রহমৎ খাঁর
কাতরতা-চিহ্ন দেখেন নাই, অজ্ঞ যুদ্ধের দুই
উজ্জল চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু পতিত
হইল। রহমৎ খাঁ মুখ ফিরাইয়া তাহা মোচন
করিলেন, বীরে বীরে বলিলেন, “কন্নিয়রাজ!
কল্যা নিশীথে আপনার বাহুবলে পরাস্ত
হইয়াছিলাম, অজ্ঞ আপনার ভ্রাতাচরণে তদ-
ধিক পরাস্ত হইলাম। যিনি হিন্দু ও মুসল-
মানদিগের অধীশ্বর, যিনি বাদশাহের উপর
বাদশাহ, জমীন ও আশমানের সুলতান,
তিনি এই জ্ঞাত আপনাকে নূতন রাজ্যবিস্তা-
রের ক্রমতা দিয়াছেন।”

জয়সিংহ। পাঠান-সেনাপতি, আপ-
নারও উচ্চগদের বোগাতা আপনি গ্রাম্য
করিয়াছেন। দিল্লীখর আপনার জ্ঞান সেনা
পাইলে আরও পরবুদ্ধি করিবেন সন্দেহ
নাই। দিল্লীখরকে কি লিখিতে পারি যে,

আপনার জায় বীরশ্রেষ্ঠ তাঁহার সৈন্তের একজন প্রধান কণ্ঠচ্যারী হইতে সম্মত হইরাছেন ?

রহমৎ খাঁ। মহারাজ ! আপনার প্রজ্ঞাবে আমি যথেষ্ট সম্মানিত হইলাম, কিন্তু আজীবন যাতার কাণ্ড করিয়াছি, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব না। বত দিন এ হস্ত খড়্গ ধরিতে পারিবে, বিজয়পুরের কল্প ধরিবে।

শিবজী। তাহাই হউক। আপনি অশ্ব রাতি বিজ্ঞান করুন, কল্যাণ প্রাতে আমার একদল সেনা আপনাকে বিজয়পুর পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছাইয়া দিবে।

রহমৎ খাঁ। ক্ষত্রিয়প্রবর ! আপনি আমার সহিত ভদ্রাচরণ করিয়াছেন, আমি অভদ্রাচরণ করিব না, আপনার নিকট কোন বিষয় গোপন রাখিব না ; আপনার সেনার মধ্যে বিশেষ অগ্নিসন্ধান করিয়া দেখুন, সকলে প্রভুভক্ত নহে। কল্যাণ দুর্গাক্রমণের গোপনাসন্ধান আমি পূর্বেরই প্রাপ্ত হইরাছিলাম, সেই জন্যই সমস্ত সেনা সমস্ত রাত্রি সজ্জ ও প্রস্তুত ছিল। অগ্নিসন্ধানদ্বারা আপনারই একজন সেনা। ইহার অধিক বিলিতে পারি না, সত্যলজ্জ করিব না।

এই বলিয়া রহমৎ খাঁ ধীরে ধীরে প্রহরীগণের সহিত প্রাসাদভিমুখে চলিয়া গেলেন। রোষে শিবজীর মুখমণ্ডল একেবারে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল, নয়ন হইতে অগ্নিকলিষ বাতির তইতে লাগিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার বহুগণ বুঝলেন, এক্ষণে পরামর্শ দেওয়া বুঝা, তাঁহার সৈন্তগণ ব্যতীল, অশ্ব প্রমাদ উপস্থিত।

জয়সিংহ শিবজীকে এতদবস্থায় দেখিয়া, তাঁহাকে কথাকথ শান্ত করিয়া, পরে সৈন্তদলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “এই দুর্গ আক্রমণ করা হইবে, তোমরা কখন জানিয়াছিলে ?”

সৈন্তগণ উত্তর দিল, “এক প্রহর রক্ষণীতে।”

জয়সিংহ। তাহার পূর্বে কেহই এ কথা জানিতে না ?

সৈন্তগণ। রত্ননীতে কোন একটা দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে জানিতাম ; এই দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে, তাহা জানিতাম না।

জয়সিংহ। ভাল, কোন সময়ে তোমরা দুর্গে পৌঁছিয়াছিলে ?

সৈন্তগণ। অস্থান দেড় প্রহর রজনীর সময়।

জয়সিংহ। উত্তম, এক প্রহর হইতে দেড় প্রহরমধ্যে তোমরা সকলেই কি একত্র ছিলে ? কেহ অল্পপস্থিত ছিল না ? যদি হইয়া থাকে, প্রকাশ কর। একজনের দোষের জন্য সহস্র জনের রানি অহুচিহ্ন। তোমরা দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে রাজা শিবজীর অধীনে যুদ্ধ করিয়াছ, রাজা তোমাদিগকে বিশ্বাস করেন, তোমরাও এরূপ প্রভু কখনও পাইবে না। আপনাদিগকে বিশ্বাসের যোগ্য প্রমাণ কর, যদি কেহ বিদ্রোহী থাকে, তাহাকেও আনিয়া দাও। যদি সে কল্যাণ রজনীর যুদ্ধে মরিয়া থাকে, তাহার নাম কর, অন্যর সম্মুখে কেন সকলের নাম কলুবিত হইতেছে ?

সৈন্তগণ তখন কলাকার কথা শ্রবণ করিতে লাগিল। পরস্পরে কথা কহিতে লাগিল, শিবজীর ক্রোধ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল। স্তব্ধ হইয়া শিবজী বলিলেন, “মহারাজ ! অম্বা যদি সেই রূপট বোঝাকে বাহির করিয়া দিতে পারেন, আমি তিরকাল আপনার নিকট স্তম্ভী থাকিব।”

চন্দ্রাও নামে একজন জুমলাদার অগ্রসর হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “রাজন ! কল্যাণ এক প্রহর রজনীর সময় এখন আমরা

যুদ্ধযাত্রা করি, তখন আমার অধীনস্থ একজন হাবিলদারকে অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই। বখন হুর্গতলে পৌঁছিলাম, তখন তিনি আমাদের সহিত বোগ দিলেন।”

শিবজী। সে কে, এখনও জীবিত আছে?

বিদ্রোহীর নাম শুনিবার জন্য সকলে নিস্তব্ধ! শিবজীর ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দ শুনা বাইতেছে, সভাতলে একটি সূচিকা পড়িলে বোধ হয়, তাহার শব্দ শুনা যায়। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে চম্ভরাও ধীরে ধীরে বলিলেন, “রঘুনাথজী হাবিলদার।”

সকলে নির্বাক, বিষমস্তব্ধ!

চম্ভরাও একজন প্রসিদ্ধ বোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু রঘুনাথের আগমনাবধি সকলে চম্ভরাওয়ের নাম ও বিক্রম বিস্মৃত হইয়াছিলেন। মানবপ্রকৃতিতে ঈর্ষার ভ্রায় ভীষণ বলবতী প্রবৃত্তি আর নাই।

শিবজীর মুখমণ্ডল পুনরায় ক্রুদ্ধবর্ণ হইয়া উঠিল, ওষ্ঠে দন্তস্থাপন করিয়া চম্ভরাওকে লক্ষ্য করিয়া সরোবে বলিলেন, “রে কপটাচারিন্! বুধা এ কপট অভিযোগ করিতে-ছি! তোর নিন্দা রঘুনাথের বশোরাশি স্পর্শ করিবে না, রঘুনাথের আচরণ আমি সচক্ষে দেখিয়াছি। কিন্তু মিথ্যা নিম্নকের শাস্তি সৈন্তেরা দেখুক।”

সেই বজ্রহস্তে শিবজী লোহবর্ণী উস্তোলন করিয়াছেন, সহসা রঘুনাথ সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, “মহারাজ! প্রভু চম্ভরাওয়ের প্রাণসংহার করিবেন না, তিনি মিথ্যাবাদী নহেন, আমার হুর্গতলে আমিহে বিলম্ব হইয়াছি।”

আবার সভাস্থল নিস্তব্ধ, সকলে নির্বাক, বিষমস্তব্ধ!

শিবজী কখনকাল প্রভুর-প্রতিবৃদ্ধির ভ্রায়

নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে ললাটের স্বেদবিন্দু মোচন করিয়া বলিলেন,

“আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? তুমি, রঘুনাথ, তুমি এই কার্য্য করিয়াছ? তুমি যে প্রাচীর-লঙ্ঘনের সময় একাকী হৃদয়মনীয় ভেজে অগ্রসর হইয়াছিলে, তুমি যে দুই শত মাত্র . . . না লইয়া পাঁচশত আকগানকে হুর্গের নীচে পর্য্যন্ত হটাইয়া দিয়াছিলে,—তুমি বিদ্রোহাচরণ করিয়া কিল্লাদারকে পূর্বে আক্রমণ-সংবাদ দিয়াছিলে?”

রঘুনাথ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, “প্রভু, আমি সে দোষে নির্দোষ।”

দীর্ঘকায় নির্ভীক তরুণ বোদ্ধা শিবজীর অগ্নিদৃষ্টির সম্মুখে নিষ্কম্প হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, চক্ষের পলক পড়িতেছে না, একটি পত্র পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছে না। সভাস্থ সকলে এবং চারিদিকে অসংখ্য লোক রঘুনাথের দিকে তীব্রদৃষ্টি করিতেছে, রঘুনাথজী স্থির, অবিচলিত, অকম্পিত, তাহার বিশাল বক্ষঃস্থল কেবল গভীর নিশ্বাসে স্ফীত হইতেছে। কল্যা যেরূপ অসংখ্য শক্রমধ্যে প্রাচীরোপরি একাকী দণ্ডায়মান হইয়া-ছিলেন, অত্র তদপেক্ষা অধিক সঙ্কট-মধ্যে বোদ্ধা সেইরূপ ধীর, সেইরূপ অবিচলিত।

শিবজী তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, “তবে কি জন্ত আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া এক গ্রহর রজনীর সময় অত্ৰুপস্থিত ছিলে?”

রঘুনাথের ওষ্ঠ ঈর্ষং কম্পিত হইল, কিন্তু তিনি কোন উত্তর না করিয়া ভূমির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রঘুনাথকে নির্বাক দেখিয়া শিবজীর সন্বেহ বৃদ্ধি হইল, নয়নবহর পুনরায় রক্তবর্ণ হইল, ক্রোধকম্পিতবরে বলিলেন, “কপটাচারিন! এই জন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া

ছিলে? কিন্তু কক্ষণে শিবজীর নিকট
ছলনা-চেষ্টা করিয়াছিলে।”

রঘুনাথ সেইরূপ ধীর অকম্পিতভাবে
বলিলেন, “রাক্ষস! ছলনা ও কপটাচরণ
আমার বংশের রীতি নহে, বোধ হয়, প্রভু
চন্দ্ররায়ও তাহা জানিতে পারেন।”

রঘুনাথের স্থিরভাব শিবজীর ক্রোধে
আততিশয়রূপ হইল, তিনি কর্কশভাবে বলি-
লেন, “পাপিষ্ঠ! পরিত্রাণ-চেষ্টা বৃথা; ক্ষুধার্ত
সিংহের গ্রাসে পড়িয়া পলায়ন করিতে
পার, কিন্তু শিবজীর জলন্ত ক্রোধ হইতে
পরিত্রাণ নাই।”

রঘুনাথ পূর্ববৎ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,
“আমি মহারাজের নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা
করি না, মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি
না, জগদীশ্বর আমার দোষ মার্জনা করুন।”

ক্ষিপ্তপ্রায় শিবজী বর্শা উত্তোলন করিয়া
বজ্রনাথে আদেশ করিলেন, “বিদ্রোহাচরণের
শাস্তি প্রাণদণ্ড।”

রঘুনাথ সেই বজ্রমুষ্টিতে ভীক্স বর্শা
দেখিলেন, তখনও সেই অবিকলিতভাবে
বলিলেন, “যোদ্ধা মরণে প্রস্তুত আছে,
বিদ্রোহাচরণ সে করে নাই।”

শিবজী আর সহ্য করিতে পারিলেন না,
অব্যর্থ মুষ্টিতে সেই বর্শা কম্পিত হইতেছে,
এরূপ সময়ে রাজা জয়সিংহ তাঁহার হস্তধারণ
করিলেন।

তখন শিবজীর মুখমণ্ডল ক্রোধে বিকৃত
হইয়াছিল, শরীর কম্পিত হইতেছিল, তিনি
জয়সিংহের প্রতিও সমুচিত সম্মান বিস্মৃত
হইয়া কর্কশভাবে কহিলেন, “হস্ত ত্যাগ
করুন, রাজপুত্রদিগের কি নিয়ম, জানি না,
জানিতে চাহি না, মহারাত্রীরদিগের সনাতন
নিয়ম, বিদ্রোহীর শাস্তি প্রাণদণ্ড। শিবজী
সেই নিয়ম পালন করিবে।”

জয়সিংহ কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ না হইয়া ধীরে
ধীরে বলিলেন, “কত্রিররাজ! অস্ত্র বাহা
করিবেন, কল্যা তাহা অন্তথা করিতে পারি-
বেন না। এষ্ট যোদ্ধার অস্ত্র প্রাণদণ্ড করিলে
চিরকাল সেজন্ত অসুখতাপ করিবেন। যুদ্ধ-
ব্যবসায়ের আহার কেশ শুক্ক হইয়াছে, আমার
মত গ্রহণ করুন, এ যোদ্ধা বিদ্রোহী নহে।
কিন্তু সে বিচার এক্ষণে আবশ্যক নাই,
আপনি আমার সুহৃদ, সুহৃদদের নিকট আমি
এই রাজপুত্র-যোদ্ধার প্রাণভিক্ষা করিতেছি,
আমাকে ভিক্ষা দান করুন।”

শিবজী জয়সিংহের ভক্ততা দেখিয়া ঈষৎ
অপ্রতিভ হইলেন; কহিলেন, “তাত! আমার
পুরুষবাক্য মর্জনা করুন, আপনাদিগের কথা
কখনও অবহেলা করিব না, কিন্তু শিবজী
বিদ্রোহীকে ক্ষমা করিবে, তাহা কখনও মনে
ভাবে নাই। হাবিলদার! রাজা জয়সিংহ
তোমার জীবনরক্ষা করিলেন, কিন্তু আমার
সম্মুখ হইতে দূর হও, শিবজী বিদ্রোহীর মুখ
দর্শন করিতে চাহে না।”

রঘুনাথ সভাঙ্গল ত্যাগ করিবার উপক্রম
করিতেছেন, এমন সময় শিবজী পুনরায়
বলিলেন, “অপেক্ষা কর। চুই বৎসর হস্ত,
তোমার ঐ কোবের অসি আমিই তোমাকে
দিয়াছিলাম, বিদ্রোহীর হস্তে আমার অসির
অবমাননা হইবে না। প্রহরিগণ! অসি
কাড়িয়া লও, পরে বিদ্রোহীকে ছুগ হইতে
নিজ্জান্ত করিয়া দাও।”

রঘুনাথের যখন প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়া-
ছিল, রঘুনাথ সে সময় অবিকলিত ছিলেন;
কিন্তু প্রহরিগণ যখন অসি কাড়িয়া লইতে-
ছিলেন, তখন তাঁহার শরীর কম্পিত হইল,
নয়নবর্ষ আরক্ত হইল। কিন্তু তিনি সে
উদ্বেগ সংযত করিলেন, শিবজীর দিকে
একবার চাহিয়া মুস্তিকা পর্যন্ত শির

নাহাইরা নিঃশব্দে দুর্গ হইতে প্রস্থান করিলেন ।

সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হইয়া জগৎ আবৃত করিতেছে, একজন পথিক একাকী নিঃশব্দে পৰ্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রান্তরাভিমুখে গমন করিলেন, প্রান্তর পার হইলেন, একাকী গ্রামে উপস্থিত হইলেন, সেটি পার হইয়া আর একটি প্রান্তরে আসিলেন । অন্ধকার গভীরতর হইল, রহিয়া রহিয়া নৈশ বায়ু বহিয়া যাইতেছে, তাহার পর আর কেহ সে পথিককে দেখিতে পাইল না ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ।

—০—

চন্দ্রাও জুমলাদার ।

আমি চাইতে অন্ত যদি কেহ
অধিক গৌরব ধরে দহে বেন দেহ ;
কদে জলে হলাহল । —

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

চন্দ্রাও জুমলাদারের সহিত আমাদের এই প্রথম পরিচয়, তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি, অসাধারণ বীৰ্য্য, অসাধারণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, তাঁহার বয়স্ রঘুনাথ অপেক্ষা ৫১৬ বৎসর অধিক মাত্র, কিন্তু দূর হইতে দেখিলে সহসা তাঁহাকে ৪০ বৎসরের লোক বলিয়া বোধ হয় । প্রশস্ত স্লামটে এই বয়সেই দুই একটি চিন্তার গভীর রেখা অঙ্কিত রহিয়াছে, মস্তকের কেশ দুই একটি শুষ্ক । নরন ক্ষুদ্র ও অতিশয় উজ্জ্বল । চন্দ্রাওকে বাঁহারা বিশেষ করিয়া জানিতেন, তাঁহারা বলিতেন যে, চন্দ্রাওয়ের তেজ ও সাহস বেরূপ দুর্দমনীয়, গভীর দূরদর্শী চিন্তা এবং ভীষণ অনিবার্য্য স্থিরপ্রতিজ্ঞাও সেইরূপ । সমস্ত যুগ্মগুলে এই

হুইটি ডাব বিশেষরূপে ব্যক্ত হইত । বেহ বেহ লৌহনির্ধিত । বাঁহারা চন্দ্রাওয়ের অসীম পরাক্রম, বিজাতীয় কোপ, গভীর বুদ্ধি ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বিষয় জ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারা কখনই সে অসমতাবী স্থিরপ্রতিজ্ঞা জুমলাদারের সহিত বিবাদ করিতেন না । এ সমস্ত ভিন্ন চন্দ্রাওয়ের আর একটি গুণ বা দোষ ছিল, তাহা কেহই বিশেষরূপে জানিত না । বিজাতীয় উচ্চাভিলাষে তাঁহার জ্বর দিবারাত্র জ্বলিত । অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন তিনি আশ্চর্য্যপ্রতির পথ আবিষ্কার করিতেন, অতুল দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত সেই পথ অবলম্বন করিতেন, খড়সহতে সেই পথ পরিষ্কার করিতেন । শত্রু হউক, মিত্র হউক, দোষী হউক, নির্দোষী হউক, অপরাধী হউক, পরম উপকারী হউক, সে পথের সম্মুখে যিনি পড়িতেন, উচ্চাভিলাষী চন্দ্রাও নিঃসঙ্কোচে পতঙ্গবৎ তাঁহাকে পদদলিত করিয়া নিজ পথ পরিষ্কার করিতেন । অস্ত্র বালক রঘুনাথ ঘটনাবশতঃ সেই পথের সম্মুখে পড়িয়াছিলেন, তাঁহাকে পতঙ্গবৎ দলিত করিয়া জুমলাদার পথ পরিষ্কার করিলেন । এরূপ অসাধারণ পুরুষের পূর্নবৃত্তান্ত জানা আবশ্যক । সবে সবে রঘুনাথের বংশবৃত্তান্তও কিছু কিছু জানিতে পারিব ।

চন্দ্রাও তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেন না । রাজা বশোবন্ত সিংহের একজন প্রধান সেনানী গজপতিসিংহ চন্দ্রাওকে বাল্যকালে লালনপালন করিয়াছিলেন । অনাথ বালক গজপতির গৃহের কার্য্য করিত, গজপতির পুত্রকঙ্কাকে বস্ত্র করিত অথবা গজপতির সহিত যুদ্ধে যুদ্ধে করিত ।

যখন চন্দ্রাওয়ের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর, তখন গজপতি তাঁহার গভীর চিন্তা, দুর্দমনীয় তেজ এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখিয়া

আনন্দিত হইলেন, নিজপুত্র রঘুনাতনের জায় চন্দ্রাওকে ভালবাসিতেন ও এই কোমল বয়সেই আপন অধীনে সৈনিককার্যে নিযুক্ত করেন।

সৈনিকের প্রত্যাশ করিয়া অবধিই চন্দ্রাও দিন দিন যে বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া প্রাচীন যোদ্ধ-গণও বিস্মিত হইল। যুদ্ধে যে স্থানে অতিশয় বিপদ যে স্থানে শত্রু ও মিত্রের শর রানীকৃত হইতেছে, যে স্থানে ধূলি ও ধূমে গগন আচ্ছাদিত হইতেছে, যে স্থানে বিজেতার হুকারে ও আন্তের আর্ন্তনাদে কর্ণ বিদীর্ণ হইতেছে, তথায় অন্বেষণ কর, পঞ্চদশ বর্ষের অল্পভাবী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বালককে তথায় পাইবে। যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে যে স্থানে যুদ্ধজয়ী সেনাগণ একত্র হইয়া রাজনীতে গীত-বাণ্য করিতেছে, হাস্ত ও আমোদ করিতেছে, চন্দ্রাও তথায় নাই। অল্পভাবী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বালক শিবিরে অন্ধকারে একাকী বসিয়া রহিয়াছে অথবা কৃষিত-ললাটে প্রান্তরে বা নদীতীরে একাকী সায়ংকালে পদচারণ করিতেছে। চন্দ্রাওয়ের উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে সাধিত হইল, তিনি এক্ষণে অজ্ঞাত রাজপুত্র-শিশু নহেন। তাঁহার পদ-বুদ্ধি হইয়াছে, গজপতিসিংহের অধীনস্থ সমস্ত সেনার মধ্যে চন্দ্রাও এক্ষণে একজন অসাধারণ তেজস্বী বীর বলিয়া পরিচিত। মর্যাদা-বৃদ্ধির সহিত চন্দ্রাওয়ের উচ্চাভিলাষ ও পক্ষ অধিকতর বৃদ্ধি পাইল।

একদিন একটি যুদ্ধে চন্দ্রাও গজপতিকে পরম বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। গজপতি যুদ্ধের পর চন্দ্রাওকে নিকটে ডাকিয়া সকলের সম্মুখে যথোচিত সম্মান করিয়া বলিলেন, “চন্দ্রাও! অল্প তোমার সাহসেই আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে;

ইহার পুরস্কার তোমাকে কি দিতে পারি?”

চন্দ্রাও মুখ অবনত করিয়া বিনীতভাবে রহিলেন।

গজপতি সম্মুখে বলিলেন, “মনে ভাবিয়া দেখ, যাগ ইচ্ছা হয়, প্রকাশ করিয়া বল। অর্থ, ক্ষমতা, পদবুদ্ধি, চন্দ্রাও! তোমাকে কিছুই আদ্যের নাই।”

তখন চন্দ্রাও ধীরে ধীরে নয়ন উঠাইয়া বলিলেন, “রাজপুত্র বীর কখনও অকীকার অগ্রথা করেন না, জগতে বিদিত আছে। বীরশ্রেষ্ঠ, আপনায় কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে আমার সহিত বিবাহ দিন।”

সভাস্থ সকলে নির্বাক, নিস্তব্ধ! গজপতির মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, ক্রোধে তাঁহার শরীর কম্পিত হইল, ধোঁষ হইতে অসি অর্ধেক নিষ্কোষিত হইল। কিন্তু সেই ক্রোধ কথঞ্চিৎ সংযত করিয়া গজপতি উচ্চহাস্ত করিয়া কহিলেন, “অকীকার-পালনে যৌকৃত আছি, কিন্তু তোমার মহারাষ্ট্রদেশে জন্ম, রাজপুত্রত্বহিতাদিগের মহারাষ্ট্রীয় দস্যুর সহিত পর্বতকন্দরে ও জঙ্গলমধ্যে থাকিবার অভ্যাস নাই। অত্র লক্ষ্মীর উপযুক্ত বাসস্থান নির্মাণ কর, জঙ্গল-কুটীরের পরিবর্তে দুর্গ প্রস্তুত কর, দস্যুর পরিবর্তে বোদ্ধার নাম গ্রহণ কর, তৎপরে রাজপুত্রত্বহিতার বিবাহ-কামনা জানাইও। এখন অল্প কোন যাক্সা আছে?”

চন্দ্রাও ধীরে ধীরে বলিলেন, “অল্প কোন যাক্সা এক্ষণে নাই, যখন থাকিবে, প্রভুকে জানাইব।”

সভাভঙ্গ হইল, সকলে নিজ নিজ শিবিরে গমন করিল, উদ্যতচেতা গজপতি চন্দ্রাওয়ের প্রতি ক্রোধ অচিরেই বিস্মৃত হইলেন, সেই দিনকার কথা বিস্মৃত হইলেন।

চন্দ্রাও সে কথা বিশ্বস্ত হইলেন না, সেইদিন সন্ধ্যার সময় ধীরে ধীরে আপনি শিবিরে পদচারণ করিতে লাগিলেন। শিবির অন্ধকার, কিন্তু তাহা আপেক্ষা দুর্বল অন্ধকার চন্দ্রাওয়ের স্বপ্ন ও লগাটে বিরাজ করিতেছিল।

দুই সপ্তাহের পর চন্দ্রাও একটি দীপ জালিলেন, একখানি পুস্তকে সন্ধ্যা কি লিখিলেন; পুস্তকখানি বন্ধ করিলেন, আবার খুলিলেন, আবার দেখিলেন, আবার বন্ধ করিলেন। ঐক্য বিকট হান্ত মুখমণ্ডলে দেখা গেল। তাঁহার একজন বন্ধু ইতিমধ্যে শিবিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “চন্দ্র, কি লিখিতেছ?” চন্দ্রাও সহজ অবিচলিত স্বরে বলিলেন, “কিছু নহে, হিসাব লিখিয়া রাখিতেছি, আমি কাহার নিকট কি ধারি, তাহাই লিখিতেছি।”

বন্ধু চলিয়া গেল, চন্দ্রাও পুনরায় পুস্তকখানি খুলিলেন। সেটি যথার্থই হিসাবের পুস্তক, চন্দ্রাও একটি স্বপ্নের কথাই লিখিয়াছিলেন। পুনরায় পুস্তক বন্ধ করিয়া দীপ নির্বাণ করিলেন।

এই ঘটনার এক বৎসর পরে আরং-জীবের সহিত যশোবন্তের উজ্জয়িনী-সন্নিধানে মহাযুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে গজপতি-সিংহ হত হন, “মাধবীকঙ্কণ” নামক উপজ্ঞাসের পাঠক তাহা অবগত আছেন।

গজপতির অনাধ বালক ও বালিকা মাড়ওয়ার হইতে পুনরায় মেওয়ার প্রদেশে সূর্য্যমহল নামক জুর্গে বাইতেছিল। রঘুনাথের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ, লক্ষ্মীর নয় বৎসর মাত্র, সঙ্গে কেবল একমাত্র পুরাতন ভৃত্য। পথিমধ্যে একদল দস্যু সেই ভৃত্যকে হত্যা করিয়া বালক-বালিকাকে মহারাষ্ট্রদেশে লইয়া যাইল। বালক অল্পবয়সেই তেজস্বী,

রজনীবোণে দস্যুদিগের শিবির হইতে পলায়ন করিল, বালিকাকে লম্বাপতি বন্ধু পূরক বিবাহ করিলেন। তিনি চন্দ্রাও।

ভৌতিক চন্দ্রাওয়ের মনোরথ কঙ্কণ পরিমাণে পূর্ণ হইল। গজপতির সংসার হইতে কিছু অর্থ আনিরাহিলেন, বিত্তীয় জায়গীর কিনিলেন, মহারাষ্ট্র-দেশে একজন সমাদৃত সম্রাট হোক হইলেন। চন্দ্রাওয়ের বংশ এক পুরাতন রাজপুতবংশ হইতে উদ্ভূত, এ কথা কেহ অবিদ্যাস করিল না, তিনি প্রসিদ্ধনামা রাজপুত গজপতি-সিংহের একমাত্র ছহিতাকে বিবাহ করিয়াছেন, সকলে দেখিতে পাইল। তাঁহার সাহস ও বিক্রম দেখিয়া শিবজী তাঁহাকে জুমলাদারের পদ দিলেন, তাঁহার বিপুল অর্থ ও জায়গীর দেখিয়া সকলে তাঁহাকে সমাদর করিলেন। দিনে দিনে চন্দ্রাওয়ের বংশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এমন সময় কুক্ষে বালক রঘুনাথ তাঁহার উন্নতির পথে আসিয়া পড়িল। জুমলাদার অচিরে পথ পার্শ্বকার করিয়া লইলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

লক্ষ্মীবাই।

দামী বনিতার পতি, দামী বনিতার পতি,
দামী বনিতার বে বিধাতা।
দামী বনিতার ধন, দামী বিনা অগ্রজন,
কেহ নহে সুখ-বোধদাতা।
বুদ্ধদাম চক্রবর্তী।

দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় রঘুনাথ দস্যুবৈদ্য চন্দ্রাও দ্বারা আক্রান্ত হইয়া রাজস্থান হইতে মহারাষ্ট্রদেশে নীত হইয়াছিলেন। একদিন রজনীবোণে তিনি পলায়ন করেন, পরীতকন্ডরে, বনমধ্যে, প্রান্তরে বা গৃহস্থের

বাটীতে কয়েক দিন-লুঙ্কারিত থাকেন, সুন্দর অনাথ অন্নবয়স্ক বালককে দেখিয়া কেহই কৃষ্টিভিক্ষা দিতে পরাশ্রয় হইত না।

তাহার পর পাঁচ ছয় বৎসর রঘুনাথ নানা স্থানে নানা কষ্টে অতিবাহিত করিল। সংসারশূন্য অনন্ত সাগরে অনাথ বালক একাকী ভাসিতে লাগিল। নানা দেশে পৰ্যটন করিল, নানা লোকের নিকট ভিক্ষা বা দাসত্ববৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন-যাপন করিল। পূৰ্ব-সৌরবের কথা, পিতার বীরত্ব ও সম্মানের কথা বালকের মনে সৰ্বদাই জাগরিত হইত, কিন্তু অভিমানী বালক সে কথা, সে দুঃখ কাহাকেও বলিত না। কখন কখন দুঃখভার সহ্য করিতে না পারিলে নিঃশব্দে প্রান্তরে বা পৰ্ব্বতশৃঙ্গো-পরি উপবেশন করিয়া একাকী প্রাণ ত্যাগী রোদন করিত, পুনরায় চক্ষের জল মোচন করিয়া স্বকাষে যাইত।

বয়োবৃদ্ধির সহিত বংশোচিত ভাব হৃদয়ে বেন আপনাই জাগরিত হইতে লাগিল। অন্নবয়স্ক ভৃত্য গোপনে কখন কখন প্রভুর শিরদ্বার মন্তকে ধারণ করিত, প্রভুর অসি কোষে স্কুলাইত, সন্ধ্যার সময় প্রান্তরে বসিয়া দেশীয় চারণদিগের গান উঠেঃস্বরে গাইত, নৈশ পথিকেরা পৰ্ব্বতগুহার সংগ্রাম-সিংহ বা প্রতাপের গীত শুনিয়া চমকিত হইত। যখন অষ্টাদশ বৎসর বয়স, তখন রঘুনাথ শিবজীর কীৰ্ত্তি, শিবজীর উদ্দেশ্য, শিবজীর বীর্যের কথা চিন্তা করিতেন। রাজধানের স্তায় মহারাষ্ট্রদেশ স্বাধীন হইবে, শিবজী দক্ষিণদেশে হিন্দুরাজ্য বিস্তার করিবেন, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বালকের হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইল, তিনি শিবজীর নিকট যাইয়া একটি সামান্ত সেনার কার্য প্রার্থনা করিলেন।

শিবজী লোক চিনিতে অধীতর, কয়েক দিনের মধ্যে রঘুনাথকে চিনিলেন, একটি হাবিলদারী-পদে নিযুক্ত করিলেন ও তাহার কয়েক দিবস পরেই ভোরণদ্রুগে পাঠা-লেন। পথে রঘুনাথের সহিত আমাদিগের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহার পুত্র নাম রঘুনাথ সিংহ; কিন্তু মহারাষ্ট্রদেশে হাবিলদারী কার্য পাওয়া অবধি সকলে তাঁহাকে রঘুনাথজী হাবিলদার বলিয়া ডাকিত।

রঘুনাথ হাবিলদারী পদ পাইয়াছিলেন বলা হইয়াছে। রঘুনাথের শিবজীর নিকট আগমনের সময় চন্দ্রাও জুমলাদারের অধীনে একজন হাবিলদারের মৃত্যু হয়, তাহারই পদ রঘুনাথ প্রাপ্ত হন। রঘুনাথ চন্দ্রাওকে পিতার পুরাতন ভৃত্য ও আপন বাল্য-সুহৃৎ বলিয়া চিনিলেন, তাঁহাকে দস্তা বা গির্নাই পতি বলিয়া জানিতেন না, সুতরাং তিনি মানন্দে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে যাইলেন। চন্দ্রাও রঘুনাথকে অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু অন্নভাষী জুমলাদারের ললাট অগ্ন পুনরায় কুঞ্চিত হইল।

দিনে দিনে রঘুনাথজীর সাহস ও বিক্র-মের যশ অধিক বিস্তার হইতে লাগিল, চন্দ্রাওয়ের চিন্তা গভীরতর হইল। চন্দ্রাওয়ের স্থিরপ্রতিজ্ঞা কখনও বিচলিত হইত না, গভীর মহাণা কখনও ব্যর্থ হইত না। অন্ত রঘুনাথজী দৈবযোগে প্রাণে রক্ষা পাইলেন, কিন্তু বিদ্রোহী কপটাচারী বলিয়া শিবজীর কার্য হইতে দূরীকৃত হইলেন।

চন্দ্রাও শিবজীর নিকট কয়েক দিনের বিদায় গ্রহণ করিয়া বাটী যাইলেন। পাঠক! চল, আমরাও একবার বড়লোকের বাটী সভরে প্রবেশ করি।

জুমলাদার বাটী আসিলে, বহির্দ্বারে নহবৎ বাজিতে লাগিল, অসংখ্য দাস-দাসী

সম্মুখে আসিল, অনেক প্রতিবেশী সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, অচিরে চম্ভরাওয়ের আগমনবার্তা সমগ্র দেশে রাষ্ট্র হইয়া। জুমলাদারের বাটীর অন্তঃপুরে ধুমধার পড়িয়া গেল, সেই ধুমধামের মধ্যে শান্তনয়না ক্ষীণাক্ষী লক্ষ্মীবাই নীরবে স্বামীর অভ্যর্থনায় আগ্রহ-জন করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মীবাই যথার্থ লক্ষ্মীস্বরূপা, শান্ত, ধীর, বুদ্ধিমতী, পতিভ্রতা; বালাকালে পিতার আদরের কথা ছিলেন, কিন্তু কোমল-বয়সে বিদেশে অপরিচিত লোকের মধ্যে অল্পভাবী কঠোরস্বভাব স্বামীর হস্তে পড়িলেন, বৃদ্ধ হইতে উৎপাটিত কোমল-পুষ্পের ত্রায় দিন দিন শুক হইতে লাগিলেন। নয় বৎসরের বালিকার জীবন শোকাচ্ছন্ন হইল, কিন্তু সে শোক কাহাকে জানাইবে? কে-দুটা কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিবে? বালিকা পূর্বকথা শ্রবণ করিত, পিতার কথা শ্রবণ করিত, প্রাণের সহোদরের কথা শ্রবণ করিত, আর গোপনে অশ্রুবর্ষণ করিত।

শোকে পড়িলে, কষ্টে পড়িলে, আমাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়, আমাদের হৃদয় ও মন সহিষ্ণু হয়। বালিকা দুই এক বৎসরের মধ্যেই সংসারের কার্য করিতে লাগিলেন, স্বামীর সেবার রত হইলেন। হিন্দু-রমণীর পতি ভিন্ন আর কি গতি আছে? স্বামী যদি সজ্জন ও সদয় হন, নারী আনন্দে ভাসিয়া তাঁহার সেবা করেন, স্বামী নির্দয় ও বিমুখ হইলেও নারীর পতিসেবা ভিন্ন আর কি উপায় আছে? কিন্তু যদিও চম্ভরাওয়ের হৃদয়ে অভিমান, জিহাংসা ও উচ্চাভিলাষ বিরাজ করিত, তথাপি তিনি অসহায় নারীর প্রতি নির্দয় ছিলেন না। নবমুখী নবহৃদয়া লক্ষ্মীবাইয়ের পরিচর্যা চম্ভরাও তুষ্ট হইতেন; যুদ্ধবিগ্রহ শেষ হইলে পতিপরায়ণা

লক্ষ্মীবাইয়ের নিকটে আসিয়া শান্তিলাভ করিতেন; লক্ষ্মীবাইয়ের স্নিগ্ধ কথাগুলি শুনিয়া তাঁহাকে সাদরে হৃদয়ে ধারণ করিতেন। লক্ষ্মীবাই তখন জগতের মধ্যে আপনাকে ভাগ্যবতী মনে করিতেন, স্বামীর সামান্য বস্ত্রে তিনি পুলকিত হইতেন, স্বামীর একটি মিষ্টকথার তাঁহার হৃদয় প্রাবল্য হইত। যে পুষ্পচারাটিকে উদ্ভাটন হইতে আনিয়া গৃহমধ্যে অন্ধকারে রাখা যায়, সে চারাটি গৃহমধ্যস্থ একটি আলোকরেখার নিকে কত পুষ্পের সহিত ধায়!

এইরূপে সংসার-কার্য ও পতিসেবার এক বৎসরের পর আর এক বৎসর অভি-বাহিত হইতে লাগিল, ধীর শান্ত লক্ষ্মী যৌবন প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু সে যৌবন কি শান্ত, নিরুদ্বেগ! লক্ষ্মী পূর্বের কথা প্রায় ভুলিয়া গেলেন অথবা যদি সায়ংকালে কখন রাজস্থানের কথা মনে উদয় হইত, বালাকালের স্মৃতি, বালাকালের ক্রীড়া ও প্রাণের ভ্রাতা রঘুনাদের কথা মনে হইত, যদি নিঃশব্দে দুই এক বিন্দু অশ্রু সেই হৃদয়ের রক্তশূন্য গওস্থল দিয়া গড়াইয়া বাইত, লক্ষ্মী সে অশ্রুবিন্দু মোচন করিয়া পুনরায় গৃহ-কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন।

অন্ত চম্ভরাও আঁহারে বসিয়াছেন, লক্ষ্মীবাই পাশ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ব্যজন করিতেছেন। লক্ষ্মীবাইয়ের বয়ঃক্রম একশে সপ্তদশ বর্ষ। অবয়ব কোমল, উজ্জল ও লাবণ্যময়, কিন্তু ঈষৎ ক্ষীণ। জয়গল কি হৃদয় ও সুচিকণ, যেন সেই পরিষ্কার শান্ত লগাটে তুলি দ্বারা অঙ্কিত। শান্ত, কোমল কৃষ্ণ-নয়ন ছটিতে যেন চিন্তা আপ-নার আবাসস্থান করিয়াছে। গওস্থল হৃদয়ের সুচিকণ, কিন্তু ঈষৎ পাতুবর্ণ; সমস্ত শরীর শান্ত ও ক্ষীণ। যৌবনের অপকল্প

সৌন্দর্য্য বিকশিত রহিয়াছে, কিন্তু যৌবনের
প্রকৃতি, উন্নততা কৈ? আহা! রাজস্থানের
এই অপূর্ণ পুন্সটি মহারাষ্ট্রে সৌন্দর্য্য ও
সম্রাণ বিস্তরণ করিতেছে, কিন্তু জীবনাভাবে
ঐক্য নহে। লক্ষ্মীবাইয়ের চাক্র নয়ন,
সুদীর্ঘ কেশভার, কোমল বাহুদ্বয় ও কোমল
বেহুলতার মুক্তার লাবণ্য আছে, কিন্তু
হীরকের উজ্জ্বল কিরণ নাই।

একদিন চন্দ্রাও লক্ষ্মীকে জানাইয়া-
ছিলেন যে, তোমার ভ্রাতা আমার অধীনে
লাবিলদার হইয়াছে ও বশোলাভ করিয়াছে।
কথাটি সাদ্র হইলে চন্দ্রাওয়ের ললাট
মেঘচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া লক্ষ্মীর
মনে সন্দেহ হইয়াছিল।

আর একদিন স্বামীর দুই একটি মিষ্ট-
বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া লক্ষ্মী স্বামীর
পদযুগলের নিকট বসিয়া বলিলেন, “দাসীর
একটি নিবেদন আছে, কিন্তু বলিতে ভয় করে।”

চন্দ্রাও শয়ন করিয়া তাখুল চর্ষণ
করিতেছিলেন, নম্রমুখকে সম্মুখে চুপন
করিয়া বলিলেন, “কি বল না। তোমার
নিকট আমার অন্দের কি আছে?”

লক্ষ্মী বলিলেন, “আমার ভ্রাতা বালক,
অজ্ঞান।”

চন্দ্রাওয়ের মুখ গভীর হইল।

লক্ষ্মী। সে আপনার ভৃত্য, আপনারই
অধীন।

চন্দ্রাও। না, সে আমা অপেক্ষাও
সাহসী বলিয়া পরিচিত।

বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী বুঝতে পারিলেন, তিনি
যাহা ভয় করিতেছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে।
চন্দ্রাও রঘুনাথের উপর গৎপেরোনাগি
কৃত। ভয়ে কম্পিত হইয়া বলিলেন,
“বালক যদিও দোষ করে, আপনি না মার্জন
করিলে কে করিবে?”

চন্দ্রাওয়ের ললাটে আবার সেই
মেঘচ্ছায়া দেখা গেল। লক্ষ্মী স্বামীকে
জানিতেন, সে কথা আর উল্লেখ করিলেন
না।

তাহার পর চন্দ্রাও অত্য প্রথমে বাটী
আসিয়াছেন। রঘুনাথের বাহা খটিয়াছে,
লক্ষ্মী তাহা জানেন না, কিন্তু তাহার হৃদয়
চিন্তাগুলি। তিনি মুখ ফুটিয়া কোন কথা
জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না, রজনীতে স্বামী
নিদ্রিত হইলে ভৃত্যদিগের নিকট ভ্রাতার
সংবাদ লইবেন, মনে স্থির করিয়াছিলেন।

চন্দ্রাওয়ের আহার সমাপ্ত হইল, তিনি
শয়নাগারে যাইলেন, লক্ষ্মী তাখুল হস্তে
তথায় যাইলেন;—দেখিলেন, স্বামীর ললাট
চিন্তাযুক্ত। লক্ষ্মী তাখুল দিয়া ধীরে ধীরে
ঘর হইতে বাহিরে যাইলেন, চন্দ্রাও সতর্ক-
ভাবে দ্বার রুদ্ধ করিলেন?

ধীরে ধীরে একটি গুপ্তস্থান হইতে
চন্দ্রাও একটি বাস্র বাহির করিলেন, সেটি
খুলিলেন, একখানি পুস্তক বাহির করিলেন,
দেখিতে হিসাবের পুস্তক। প্রায় দশ বৎসর
পূর্বে গজপতি কর্তৃক যে দিন সভায় তা-
মানিত হইয়াছিলেন, সে দিন সেই পুস্তকে
একটি ঋণের কথা লিখিয়াছিলেন, সেই
পাতা খুলিলেন, সুন্দর স্পষ্ট হস্তাক্ষর সেইরূপ
দেদীপ্যমান রহিয়াছে;—

“মহাজন.....গজপতি,

ঋণ.....অবমাননা;

পরিশোধ.....তাহার শোণিতে,

তাহার বংশের অবমাননায়।”

একবার, দুইবার এই অক্ষরগুলি পড়ি-
লেন, ঐক্য হস্ত সেই বিকট মুখমণ্ডলে
দেখা দিল, সেই স্থানে লিখিত, “অন্ত
পরিশোধ হইল।” তারিখ দিয়া পুস্তক বন্ধ
করিলেন।

মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত ।

বার উদ্ঘাটন করিয়া লক্ষ্মীকে ডাকিলেন, লক্ষ্মী ভক্তিভাবে স্বামীর নিকটে আসিলেন। চন্দ্রাও লক্ষ্মীর হস্তধারণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “অনেক দিনের একটি ধূপ অস্ত পরিশোধ করিয়াছি।”

লক্ষ্মী শিহরিয়া উঠিলেন।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ ।

ঈশানী-মন্দিরে ।

কেরলা অধূরে

রোবর, কুলে তাঃ চতীর দেউল।

মধুসূদন দত্ত।

পরাক্রান্ত জায়গীরদার ও জুমলাদার চন্দ্রাওয়ের বাটী হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে ঈশানীর একটি মন্দির ছিল। অনতি-উচ্চ একটি পর্বতশ্রেণী সেই মন্দির অতি প্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মন্দির-সম্মুখে প্রস্তররাশি সোপানরূপে খোদিত ছিল, নীচে একটি পর্বত-তরঙ্গিণী কুল-কুল শব্দ করিয়া সেই সোপানের পদ-প্রকালন করিয়া বহিয়া যাইত। পুরা-কাল হইতে অসংখ্য যাত্রী ও উপাসক এই পুণ্যজলে স্নাত হইয়া সোপানারোহণ পূর্বক ঈশানীর পূজা দিত, অদ্য পর্যন্তও মন্দিরের গোরব বা যাত্রিসংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। মন্দিরের পশ্চাতে পর্বতের পৃষ্ঠদেশে বহু পুরাতন বৃক্ষ দ্বারা আবৃত, চূড়া হইতে নীচে সমতলভূমি পর্যন্ত সেই বৃক্ষশ্রেণী ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইত না। দিবাতাগেও সেই বিশাল বৃক্ষশ্রেণী ঈষৎ অন্ধকার করিত, সেই সুস্নিগ্ধ ছায়াতে ঈশানী-মন্দিরের পূজক ও ব্রাহ্মণেরা নিজ নিজ কুটীরে বাস করিত। সেই পুণ্য-

ময় সুস্নিগ্ধ ছায়া দেখিলেই বোধ হইত। তথায় শান্তিরস ভিন্ন অন্য কোন ভাব উদ্ভূত হয় নাই, ভারতবর্ষের পবিত্র পুণ্য-কথা বা বেদমন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন শব্দ সেই পুরাতন পাদপবন শ্রবণ করে নাই। বহু বৃক্ষ ও আহবে মহারাষ্ট্রদেশ ব্যতিব্যস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইতেছিল, কিন্তু হিন্দু কি মুসল-মান কেহই এই ক্ষুদ্র প্রদেশ পর্বতমন্দির বিগ্রহের রবে কলুষিত করে নাই।

রজনী এক প্রহরের সময় একজন পথিক একাকী সেই শান্ত কাননের মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। পথিকের হৃদয় উদ্বেগ-পরিপূর্ণ, প্রশস্ত ললাট কৃষ্ণিত, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, নয়ন হইতে উন্মত্ততার অশ্রুতাবিক জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছিল। রোষে, ক্রিহা-বায়, বিবাদে অদ্য রঘুনাথের হৃদয় একেবারে দগ্ধ হইতেছিল।

অনেকক্ষণ পদচারণ করিতে লাগিলেন, শরীর একেবারে অবসন্ন হইয়াছে, তথাপি হৃদয়ের উদ্বেগ নিবারণ হয় না। রঘুনাথ উন্মত্তপ্রায়। এ ভীষণ চিন্তার আশু উপশম না হইলে রঘুনাথের বিবেচনাশক্তি বিচলিত বা লুপ্ত হইবে। প্রকৃতি ভীষণ চিকিৎসক! এই বিষম সংসারে শেলসম যে হৃৎক্লমের বিদীর্ণ করে, অগ্নিসম যে চিন্তা শরীর শোষণ ও দাহ করে, যে মানসিক রোগের ঔষধ নাই, চিকিৎসা নাই, প্রকৃতি চিন্তাশক্তি লোপ করিয়া তাহার উপশম করে। উন্মত্ততাই কত শত হতভাগার আরোগ্য! কত সহস্র হতভাগা এই আরোগ্য দিবানিশি প্রার্থনা করে, কিন্তু প্রাপ্ত হয় না!

সেই পাদপের অনতিদূরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ পুরাণপাঠ করিতেছিলেন। আহা! সেই সমীতপূর্ণ পুণ্যকথা যেন শান্ত নিমীখে শান্ত কাননে অমৃত বর্ষণ করিতেছিল, নক্ষত্র-

বিভূষিত নৈশ-পল্লব-মণ্ডলে ধীরে ধীরে উদ্ভিত হইতেছিল। সেই পুণ্যকথা শাস্ত্র নৈশ কাননে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, অচেতন পাশপক্ষে যেন সচেতন করিতে লাগিল। শাখাপত্র যেন সেই গীত কুতুহলে পান করিতে লাগিল, বায়ু সেই গীত বিস্তার করিতে লাগিল, মানব-হৃদয় শান্তিরসে বিগলিত হইতে লাগিল।

কত সহস্র বৎসর হইতে এই পুণ্যকথা ভারতবর্ষে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। স্বন্দর বঙ্গদেশে, তুষারপূর্ণ পর্বতবেষ্টিত কান্দোরে, বীরপ্রসূ রাজস্থান ও মহারাষ্ট্র-ভূমিতে, সাগর-প্রক্ষালিত কর্ণাট ও ড্রাবিড়ে কত সহস্র বৎসর অবধি এই গীত ধ্বনিত হয়, আমরা যেন এ শিক্ষা কখনই বিস্মৃত না হই। গৌরবের দিনে এই অনন্ত গীত আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল, হস্তিনা, অযোধ্যা, মিথিলা, কানৌ, মগধ, উজ্জয়িনী প্রভৃতি দেশ বীরবে ও যশে প্রাবিত করিয়াছিল। হৃদ্দিনে এই গীত গাইয়া সময়সিংহ, সংগ্রামসিংহ, প্রতাপসিংহ বর্ষাকার্ষ্য হৃদয়ের শোণিত দিরাছিলেন, এই মহামন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া শিবজী পুনরায় পুরাকালের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। অদ্য ক্ষীণ দুর্বল হিন্দুদিগের আশ্বাসের স্থল এই পূর্বগীত মাত্র। যেন বিপদে, বিবাদে, দুর্বলতায় আমরা পূর্বকথা বিস্মৃত না হই, যত দিন জাতীয় জীবন থাকে, যেন হৃদয়-বস্ত্র এই গীতের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হইতে থাকে।

নব্য পাঠক! তুমি ইলিয়দ ও ইনিয়দ পাঠ করিয়াছ, দাস্তে ও সেজপীরর, গেটে ও ইউগো পাঠ করিয়াছ, সানী ও ফরদৌসী পাঠ করিয়াছ; কিন্তু হৃদয় অধোবণ কর, হৃদয়ের অন্তরে কোন কথাগুলি সঙ্গভাবপূর্ণ বোধ

হয়? হৃদয় কোন কথার অধিকতর আলো-
চিত, প্রোৎসাহিত বা মুগ্ধ হয়? ভীষ্মাচার্যের অপূর্ণ বীরকথা, দুঃখিনী সীতার অপূর্ণ পাতিত্ব-কথা, হিন্দুমাত্রেরই হৃদয়ের স্তরে স্তরে গ্রথিত রহিয়াছে, এ কথা যেন হিন্দু-
জাতি কখনও বিস্মৃত না হয়।

পাঠক! একত্র বসিয়া এক একবার দেশীয় গৌরবের কথা গাইব, আধুনিক ও প্রাচীন সময়ের বীরবীর কথা স্মরণ করিব, কেবল এই উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করিছি। যদি সেই কথা স্মরণ করাই সক্ষম হইয়া থাকি, তবেই যত্ন সফল হইছে, নচেৎ আমার পুস্তকগুলি দূরে নিক্ষেপ কর, লেখক তাহাতে ক্ষুব্ধ হইবে না।

শাস্ত্রকাননে পবিত্র পুরাণকথা ও সম্ভূত রঘুনাথের উত্তম ললাটে বারিবর্ষণ করিতে লাগিল, উদ্ভিন্ন হৃদয়ে শাস্ত্র সেচন করিতে লাগিল। হতভাগার উন্নততা ক্রমে হ্রাস পাইল, সেই মহৎকথার নিকট আপনার শোক ও দুঃখ কি অকিঞ্চিৎকর বোধ হইল। আপনার মহৎ উদ্দেশ্য ও বীরত্ব কি ক্ষুদ্র বোধ হইল! ক্রমে চিন্তাহারিণী নিজা রঘুনাথকে অন্ধে গ্রহণ করিলেন। রঘুনাথের শাস্ত্র অবসর শরীর সেই বৃক্ষমূলে শায়িত হইল।

রঘুনাথ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। আজি কিসের স্বপ্ন? আজি কি গৌরবের স্বপ্ন দেখিতেছেন? দিন দিন পদোন্নতি, দিন দিন যশোবিস্তারের স্বপ্ন দেখিতেছেন? হায়! রঘুনাথের জীবনের সে স্বপ্ন ভগ্ন হইয়াছে, সে চিন্তা শেষ হইয়াছে, মরীচিকা-পূর্ণ সংসারের সে মরীচিকা বিলুপ্ত হইয়াছে।

রঘুনাথ কি যুদ্ধক্ষেত্রের স্বপ্ন দেখিতেছেন? শত্রুকে বিনাশ করিতেছেন? দুর্গজয় করিতেছেন? যোদ্ধার কার্য্য করিতেছেন?

বুনাথের সে উদ্যম শেষ হইয়াছে, সে স্বপ্নও লুপ্ত হইয়াছে ।

একে একে যৌবনের উদ্যমগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে, আশাপ্রদীপ নিকীর্ণ হইয়াছে এই মঙ্গলকার রজনীতে শ্রান্ত বন্ধুহীন যুবকের হৃদয়ের কথা পূর্বজীবনের স্মৃতির ভ্রার আগরিত হইয়াছে । শোকভারে হৃদয় আক্রান্ত হইলে, আশা ও সুখ আশাদের নিকট বিদায় লইলে বন্ধুহীন ভ্রনের যে কথা স্মরণ হয়, রঘুনাথ সেই স্বপ্ন দেখিতেছিলেন । স্নেহময়ী মাতার স্নেহসিক্ত মুখখানি মনে আগরিত হইল, পিতার দীর্ঘ অবরব ও প্রশস্ত ললাট মনে হইল, বাল্যকালে সেই দূর সূর্য্য-মহলে ক্রীড়া করিতেন, হস্ত-ধ্বনিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিতেন, সেই কথা স্মরণ হইল, সঙ্গে সঙ্গে বাল্যকালের সহচরী, শাস্ত্র, ধীর প্রাণের ভগিনী লক্ষ্মীকে মনে পড়িল । আহা ! সে স্নেহময়ী ভগিনীকে কি আর জীবনে দেখিতে পাইবেন ? আজি সে সোনার সংসার কোথায়, সে প্রফুল্ল সুখের জগৎ কোথায়, সে হৃদয়ের সহোদরা কোথায় ? নিদ্রিতের মুদিত নয়ন হইতে এক বিন্দু অশ্রু ভূমিতে গড়াইয়া পড়িল ।

নিদ্রিত রঘুনাথ সেই স্নেহময়ীর মুখখানি চিন্তা করিতে করিতে নয়ন উন্মীলিত করিলেন । কি দেখিলেন ? বোধ হইল যেন, লক্ষ্মী স্বয়ং ভ্রাতার শিরোদেশে আপন অঙ্কে স্থাপন করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, কোমল শীতলহস্ত ভ্রাতার উচ্চ ললাটে স্থাপন করিয়া হৃদয়ের উদ্বেগ দূর করিতেছেন, সহোদরা স্নেহপূর্ণ-নয়নে যেন সহোদরের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন । আহা ! বোধ হইল যেন, শোকে বা চিন্তায় লক্ষ্মীর প্রফুল্ল মুখখানি ঈষৎ শুষ্ক হইয়াছে, নয়ন দুইটি

সেইরূপ স্থির, প্রশস্ত, মিষ্ট, কিন্তু চিন্তার আবাসস্থান ।

নয়ন মুদিত করিলেন, আর এক বিন্দু অশ্রুবর্ষণ করিলেন, — “ভগবান্, অনেক সহ্য করিয়াছি, কেন যুগা আশায় হৃদয় বাধিত করিতেছ ? আমি যেন উন্মত্ত না হই ।”

যেন কোমল হস্তে রঘুনাথের অশ্রুবিন্দু বিমুক্ত হইল । রঘুনাথ পুনরায় নয়ন উন্মীলিত করিলেন । এ স্বপ্ন নহে, তাঁহার প্রাণের সহোদরাই তাঁহার মস্তক অঙ্কে ধারণ করিয়া সেই বৃক্ষমূলে বসিয়া রহিয়াছেন ।

রঘুনাথের হৃদয় আলোড়িত হইল ; তিনি লক্ষ্মীর হাত দুইটি আপন তপ্ত হৃদয়ে স্থাপন করিয়া সেই স্নেহপূর্ণ মুখের দিকে চাহিলেন, তাঁহার বাক্যকৃষ্টি হইল না, নয়ন হইতে দ্রববিগলিত ধারা বহিতে লাগিল । অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া সেই তরুণ বোদ্ধা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, “লক্ষ্মি ! লক্ষ্মি ! তুমাকে কি এ জীবনে আবার দেখিতে পাইলাম ? অল্প সুখ দূর হউক, অল্প আশা দূর হউক, লক্ষ্মি ! তোমার হতভাগা ভ্রাতাকে নিকটে স্থান দিও, সে এ জীবনে আর কিছু চাহে না ।”

লক্ষ্মীও শোক সংবরণ করিতে পারিলেন না, ভ্রাতার হৃদয়ে আপন মুখ লুকাইয়া একবার ঞ্চপ ভরিয়া কাঁদিলেন । আহা ! এ ক্রন্দনে যে সুখ, জগতে কি রহ্ন আছে, স্বর্গে কি সুখ আছে, বাহা অভাগাগণ সে সুখের নিকট তুচ্ছ জ্ঞান না করে ?

পরস্পরকে বহুদিন পর পাইয়া পরস্পরে অনেককণ বাকশূন্ত হইয়া রহিলেন । বহু দিনের কথা রহিয়া রহিয়া হৃদয়ে আগরিত হইতে লাগিল, সুখের লহরীর সহিত শোকের লহরী মিশ্রিত হইয়া হৃদয়ে উথলিতে লাগিল, থাকিয়া থাকিয়া দ্রববিগলিত ধারার উভয়ের

হৃদয় ভাগিনা বাইতে লাগিল। ভগিনীর জ্ঞান
এ জগতে আর স্নেহময়ী কে আছে ? ভ্রাতৃ-
স্নেহের জ্ঞান আর পবিত্র স্নেহ কি আছে ?
আমরা সে ভালবাসা বর্ণন করিতে অশক্ত,
পট্টিক, কমা কর।

অনেকক্ষণ পরে দুই জনের হৃদয় শীতল
হইল। তখন লক্ষী আপন অঞ্চল দিয়া
ভ্রাতার মরনের জল মোচন করিয়া বলিলেন,
“ভ্রাতার ইচ্ছার কত অসুস্থত্বের পর
আজ তোমাকে দেখিতে পাইলাম। আহা !
আমার কি পরম সুখ, ভ্রাতার কপালে কি
এত সুখ ছিল ? ভাই, এ শীতল বাতাসে
আর থাকিলে তোমার অসুখ হইবে, চল,
মন্দিরের ভিতর বাই, আমি আর অধিকক্ষণ
থাকিতে পারিব না।”

ভ্রাতা-ভগিনী মন্দির-অভ্যন্তরে আসি-
লেন, লক্ষী একটি স্তম্ভের পাশে উপবেশন
করিলেন, ভ্রাতা রঘুনাথ পূর্ববৎ লক্ষীর অঙ্গে
মস্তকস্থাপন করিয়া শয়ন করিলেন, যুদ্ধের
উত্তরে গভীর অন্ধকার রজনীতে পূর্বকথা
কহিতে লাগিলেন।

ধীরে ধীরে ভ্রাতার ললাটে ও দেহে হস্ত
বুলাইয়া লক্ষী কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে
লাগিলেন। রঘুনাথ তাহার উত্তর করিতে
লাগিলেন। দম্ভ-হস্ত হইতে পলায়ন করিয়া
অনাথ বালক কোন্ কোন্ দেশে বিচরণ
করিয়াছিলেন, কোথায় কি অবস্থার ছিলেন,
তাহাই বলিতে লাগিলেন। কখন মহারাজার
কৃষকদিগের সহিত চাষ করিতেন, কখন
গো-বৎস বা মেঘপাল রক্ষা করিতেন, যেহেতু
সঙ্গে সঙ্গে পরীতে, উপত্যকায় বিস্তারিত প্রান্তর
ভ্রমণ করিতেন বা নির্জনে বসিয়া চারু-
দিগের গীত গাইতেন। কখন সাগরকূলে
নদীকূলে একাকী বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে সেই
গীত গাইয়া হৃদয়কে শান্ত করিয়াছেন, কখন

প্রভাতে অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া, পূর্বকথা
স্মরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে-রোদন করিয়াছেন।
শরতসমুদয় কল্লণ-প্রদেশে কয়েক বৎসর
অবস্থিতি করিয়াছেন, অবশেষে একজন
মহারাজার সেনানীর অধীনে কার্য্য করিয়া-
ছেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন যুদ্ধ-
ক্ষেত্রে বাইতেন। বরোবুদ্ধির সহিত রঘু-
নাথের যুদ্ধব্যবসারে উৎসাহ বুদ্ধি পাইয়া-
ছিল, অবশেষে মহাহুতব শিবজীর নিকট
উপস্থিত হইয়া তিনি সৈনিকের পদ
গ্রহণ করেন। আজি তিন বৎসর হইল,
সেই কার্য্য করিয়াছেন, জগদীশ্বর জানেন,
তিনি কার্য্যে ক্রটি করেন নাই, কিন্তু প্রভু
শিবজীর অথবা সন্দেহে অপমানিত হইয়া
বেশে বেশে নিরাশ্রয়রূপে ভ্রমণ করিতে-
ছেন। এক্ষণে জীবনে তাঁহার উদ্দেশ্য নাই,
পিতার জ্ঞান যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া অসার
জগৎ পরিত্যাগ করিবেন।

ভ্রাতার হৃৎকান্দনো শুনিলে শুনিলে
স্নেহময়ী ভগিনী নিঃশব্দে অব্যবহিত অশ্রু-
বর্ষণ করিতেছিলেন। তিনি নিজের শোক
সহ্য করিতে পারেন, ভ্রাতার হৃৎকান্দন
বাহারে ব্যাকুল হইলেন। যখন সে কথা শেষ
হইল, কথঞ্চিৎ শোক সংবরণ করিয়া আপ-
নার কি পরিচয় দিবেন, তাহা চিন্তা করিতে
লাগিলেন। চন্দ্রাণ্ডয়ের নাম করিলেন না,
ধীরে ধীরে অশ্রুজল মোচন করিয়া বলিলেন,
“মহারাজ্যে আসিবার অনতিকাল পরেই
একজন সম্রাট মহারাজ্য জয়গীরদার
তাঁহাকে বিবাহ করেন। নারী স্বামীর নাম
করে না, কি গগনের শশধরের নামই তাঁহার
স্বামীর নাম, গগনের শশধরের জ্ঞান তাঁহার
ক্ষমতা ও গৌরবজ্যোতিঃ চারিদিকে বিকীর্ণ
হইতেছে। তাঁহার বিপুল সংসারে লক্ষী
সুখে আছেন, প্রভুও দাসীর উপর অহুগ্রহ

করেন, সে অহুগ্রহে দাসী সুখে
 আছেন। এ জীবনে তাঁহার আর কোন
 বাসনা নাই, কেবল প্রাণের ভাইকে সুখে
 থাকিতে দেখিলেই তাঁহার জীবন সার্থক
 হয়। রঘুনাথের সংবাদ তিনি মধ্যে মধ্যে
 পাইতেন, তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্ত
 কত দিন চেষ্টা করিতেছেন। অস্ত্র সেই কাম-
 নায় মন্দিরে পূজা দিতে আদিয়াছিলেন,
 সহসা মন্দিরপার্শ্বে বৃক্ষমূলে প্রাণের ভাইকে
 পুনরায় পাইলেন।

এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়া লক্ষ্মী ভ্রাতার
 হৃদয়ের শেলসম দুঃখ উৎপাটন করিতে যত্ন
 করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী দুঃখিনী, দুঃখের
 কথা জানিতেন; লক্ষ্মী নারী, দুঃখ সাহুনা
 করিতে জানিতেন। সঙ্ক্ষুব্ধ হইয়া নিজ
 দুঃখ সখ করা, সাহুনা দিয়া পরের দুঃখ দূর
 করা, এই নারীর ধর্ম।

অনেক প্রকার প্রবোধবাক্য দিয়া লক্ষ্মী
 ভ্রাতার মন শান্ত করিতে লাগিলেন; বলি-
 লেন, “আমাদিগের জীবনই এইরূপ,
 সকল দিন সমান থাকে না! ভগবান্
 যে সুখ দেন, তাহা আমরা ভোগ করি, যদি
 একদিন দুঃখ পাই, তাহা কি সখ করিতে
 বিমুখ হইব? মানবজন্মই দুঃখময়, যদি
 আমরা দুঃখ সখ না করিব, তবে কে
 করিবে? সুদিন দুর্দিন সকলেরই আছে,
 দুর্দিনে যেন আমরা সেই বিধাতার নাম
 করিয়া নিজ শোক বিস্মৃত হই। তিনিই
 একদিন পিত্রালায়ে আমাদের সুখ দিয়া-
 ছিলেন, তিনিই অস্ত্র কষ্ট দিয়াছেন, তিনিই
 পুনরায় সে কষ্ট মোচন করিবেন। ভাই! এ
 কৈরাণী দূর কর, এরূপ অবস্থার থাকিলে
 শরীর কত দিন থাকিবে? আহার-নিদ্রা
 ভাগ করিলে মনুষ্য জীবন কত দিন থাকে?”

রঘুনাথ! থাকিবার আবশ্যক কি? যে

দিন বিক্রোহী বলিয়া সৈনিকের নামে কলঙ্ক
 পড়িল, সেই দিন সৈনিকের জীবন গেল না
 কি জন্ত?

লক্ষ্মী। তোমার ভগিনী লক্ষ্মীকে
 চিরদুঃখিনী করিবে, এই কি ইচ্ছা? দেখ
 ভাই, আমার আর এ জগতে কে আছে?
 পিতা নাই, মাতা নাই, জগৎ-সংসারে কেহ
 নাই। তুমিও কি চাঃখিনী লক্ষ্মীর প্রতি
 সমস্ত মমতা ভুলিলে? বিধাতা কি এ
 হতভাগিনীর উপর একেবারে বিমুখ হই-
 লেন?

রঘুনাথ। লক্ষ্মী! তুমি আমাকে
 ভালবাস, তাহা জানি, তোমাকে যে দিন কষ্ট
 দিব, সে দিন যেন ঈশ্বর আমার প্রতি বিমুখ
 হন। কিন্তু ভগিনী! এ জীবনে আর
 আমার সুখ নাই, তুমি স্ত্রীলোক, সৈনিকের
 শোক বুঝিবে কিরূপে? জীবন অপেক্ষা
 আমাদের স্নানাম প্রিয়, মৃত্যু অপেক্ষা
 আমাদের স্নানাম প্রিয়, মৃত্যু অপেক্ষা
 কলঙ্ক ও অপবন সহস্রগুণে কষ্টকর। সেই
 কলঙ্কে রঘুনাথের নাম কলঙ্কিত হইয়াছে।

লক্ষ্মী। তবে সেই কলঙ্ক দূর করার
 চেষ্টায় কেন বিমুখ হও? মাহাত্ম্যব শিব
 জীর নিকট যাও, তাঁহার ক্রোধ দূর হইলে
 তিনি অবশ্যই তোমার কথা শুনিবেন,
 তোমার দোষ নাই বুঝিবেন।

রঘুনাথ উত্তর করিলেন না কিন্তু তাঁহার
 মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, চক্ষু হইতে
 অশ্রুিকণা বহির্গত হইতে লাগিল। বুদ্ধিমতী
 লক্ষ্মী বুঝিলেন, পিতার অভিমান, পিতার
 দর্প পুত্রে বর্ধমান। তিনি প্রাণ থাকিতে
 এরূপ আবেদন করিবেন না। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-
 মতী লক্ষ্মী ভ্রাতার অন্তরের ভাব বুঝিয়া
 পুনরায় বলিলেন, “মার্জনা কর, আমি
 স্ত্রীলোক, সমস্ত বুঝি না। কিন্তু যদি শিবজীর
 নিকটে বাইতে অসম্মত হও, কাঁচা ছায়া

কেন আপন বল হ্রাস কর না? পিতা বলিতেন, “সেনার সাহস ও প্রকৃতি-কার্য্যে প্রকাশ হয়।” যদি বিদ্রোহী বলিয়া তোমা-কে কেহ সম্বোধন করিয়া থাকে, অসি-হস্তে কেন সে সম্বোধন কর না?”

উৎসাহে রঘুনাথের নয়ন প্রজলিত হইল। তিনি অজ্ঞাসা করিলেন, “কি-রূপে?”

লক্ষ্মী। শুনিয়াছি, শিবজী দিল্লী বাইতে-ছেন, তথায় সহস্র ঘটনা ঘটিতে পারে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সৈনিকের আত্মপরিচয় দিবার সহস্র উপায় থাকিতে পারে। আমি স্ত্রীলোক, আমি কি জানি বল? তোমার পিতার হ্রায় সাংল, তাঁহারই হ্রায় বীর-প্রতিজ্ঞা করিলে তোমার কোন্ উদ্দেশ্য না সকল হইতে পারে?

রঘুনাথের যদি অল্প চিন্তার সময় থাকিত, তবে বুঝিতেন, কনিষ্ঠা লক্ষ্মী মানবহৃদয়-শাস্ত্রে নিতান্ত অনভিজ্ঞা নহেন। যে ঔষধি আঁধার রঘুনাথের হৃদয়ে ঢালিয়া দিলেন, তাহাতে মুহূর্ত্তমধ্যে শোকসম্ভাপ দূর হইল, সৈনিকের হৃদয় পূর্ব্বরূপে উৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিল।

রঘুনাথ অনেককণ চিন্তা করিলেন, তাঁহার নয়ন ও মুখমণ্ডল সহসা নব-গৌরব ধারণ করিল; অনেককণ পরে বলিলেন, “লক্ষ্মী! তুমি স্ত্রীলোক, কিন্তু তোমার কথা শুনিতে শুনিতে আমার মনে নূতন ভাবের উদয় হইল। আমার হৃদয় উৎসাহশূন্য নহে, ভগবান্ সহায় হউন, রঘুনাথ বিদ্রোহী নহে, ভীকু নহে, একথা এখনও প্রচার হইবে। কিন্তু তুমি বাণিকা, তোমার নিকট এ সমস্ত কিং কহ কেন, তুমি আমার হৃদয়ের ভাব কি বুঝিবে?”

লক্ষ্মী ইহা হাসিলেন; ভাবিলেন, “রোগ নির্ণয় করিলাম আমি, ঔষধ দিলাম

আমি, তথাপি কিছু বুঝি না?” প্রকাশে বলিলেন, “ভাই, তোমার উৎসাহ দেখিয়া আমার প্রাণ জুড়াইল। তোমার মহৎ উদ্দেশ্য আমি কি-রূপে বুঝিব? কিন্তু বাহাই হউক, তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী যত দিন বাঁচিবে, তুমি পূর্ব্বমনোরথ হও, ভগদীপের নিকট এই প্রার্থনা করিবে।”

রঘুনাথ। আর লক্ষ্মী! আমি যত দিন বাঁচিব, তোমার স্নেহ, তোমার ভালবাসা কখনও বিস্মৃত হইব না।

অনেককণ পরে লক্ষ্মী অধোবদনে ধীরে ধীরে কহিলেন, “আমার আর একটি কথা আছে, কিন্তু কহিতে ভয় হইতেছে।”

রঘুনাথ। লক্ষ্মী! আমার নিকট তোমার কি কথা বলিতে ভয় হয়? আমি তোমার সহোদর, সহোদরের নিকট কি ভয়?

লক্ষ্মী। চন্দ্রাও নামে একজন জুলাদার বোধ হয়, তোমার অপকার করিয়াছেন।

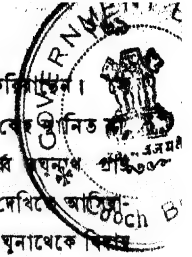
রঘুনাথের হস্ত দূর হইল, মুখ রক্তবর্ণ হইল; কিন্তু সে উবেগ দমন করিয়া রঘুনাথ কহিলেন, “চন্দ্রাও রাজার নিকটে যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা অযথার্থ নহে। তিনি আমার অল্প কোন অপকার করিয়াছেন কি না, তাহা আমি জানি না।”

লক্ষ্মী। তিনি বাহাই করিয়া থাকেন, ভাই, অস্বীকার কর, তাঁহার অনিষ্ট করিবে না।

রঘুনাথ নিরুত্তর হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী পুনরায় বলিলেন, “ব্রাতার নিকট পূর্বে কখনও আমি কোন ভিক্ষা করি নাই, একটি কথা বলিলাম, ভাই, আমাকে যদি ভালবাস, এ কথাটি রাখিও।”

সে অস্বরোধে রঘুনাথের হৃদয় গলিয়া

বহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত।



শব্দ। তিনি ভগিনীর হাত দুইটি ধরিয়া
লগিলেন, “লক্ষ্মি, আমার মনে মনে সশ্বেছ
চন্দ্র, চন্দ্রারওই আমার সর্বনাশ করিয়া-
ছেন। কিন্তু তোমাকে অদেয় কিছুই নাট।
এই ঈশানী-মন্দিরে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, চন্দ্র-
ণওয়ার কোন অনিষ্ট করিব না। আমি
তাহার দোষ মার্জনা করিলাম, জগদীশ্বর
তাহাকে মার্জনা করুন।”

লক্ষ্মী হৃদয়ের সহিত বলিলেন, “জগদী-
শ্বর তাহাকে মার্জনা করুন।”

পূর্বদিকে প্রভাতের আলোকজুটা দেখা
যাইল। লক্ষ্মী তখন অনেক অশ্রুবর্ষণ করিয়া
সন্নেহে ভ্রাতার নিকট বিদায় লইলেন;
বলিলেন, “আমার সঙ্গে বাটার অস্ত্র লোক
মন্দিরে আসিয়াছে। এখনও সকলে নিদ্রিত
আছে, এইক্ষণে আমি না বাইলে জানিতে
পারিবে; এখন চলিলাম, পরমেশ্বর তোমার
মনোরথ পূর্ণ করুন।”

“পরমেশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন,” এই
বলিয়া সন্নেহে লক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইয়া
রঘুনাথও মন্দির হইতে নিষ্কান্ত হইলেন।
লক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইলাম, পাঠক! চল,
আমরা হতভাগিনী সরযু নিকট বিদায়
লইয়া আসি।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

সীতাপতি গোস্বামী।

বাও যুদ্ধে, তোমা অদ্য করি অভিষেক,
বাও বশোবিশতিত হইয়া অ'বার
এইরূপে আসি পুনঃ পাঁড়াও সাক্ষাতে।
হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

কৃত্তমণ্ডল-দুর্গ আক্রমণদিনে রঘুনাথের
বাইতে কি অস্ত্র বিলম্ব হইয়াছিল, পাঠক-

বহাশর অবশ্রই উপলব্ধি করিয়াছেন।

দিন যুদ্ধে কে রক্ষা পাইবে, বোধ হইল
যুদ্ধে গমন করিবার পূর্বে রঘুনাথ
ভরিয়া একবার সরযুকে দেখিতে আসি-
ছিলেন, সাক্ষরনয়নে সরযু রঘুনাথকে বিদায়
দিয়াছিলেন।

একদিন, দুই দিন অতিবাহিত হইল,
রঘুনাথের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।
আশা প্রথমে কানে কানে বলিতে, লাগিল,
“রঘুনাথ যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছেন, রঘুনাথ
রাজ-সম্মানিত হইয়াছেন, বিজয়ী রঘুনাথ
ঈশ্র উল্লাসিত-হৃদয়ে আবার আসিতেছেন,
পরম কুতূহলের সহিত পিতার নিকট যুদ্ধ-
কথা কহিবেন।” কিন্তু রঘুনাথ আর
আসিলেন না, সেদিনকার যুদ্ধকথা বর্ণনা
করিলেন না।

সচসা বজ্রের স্তার সংবাদ আসিল, রঘু-
নাথ বিদ্রোহী, বিদ্রোহাচরণ জন্ত অবমানিত
হইয়া দূরীকৃত হইয়াছেন। প্রথমমুহুর্তে
সরযু চকিতের স্তার রহিলেন, কথার অর্থ
তাহার বোধগম্য হইল না। ক্রমে লগাট রক্ত-
বর্ণ চইয়া উঠিল, বক্তোচ্ছ্বাসে মুখমণ্ডল রঞ্জিত
হইল, শরীর কাঁপিতে লাগিল, নয়ন হইতে
অগ্নিকণা বহির্গত হইতে লাগিল। দাসীকে
বলিলেন, “কি বলিলি, রঘুনাথ বিদ্রোহী?
রঘুনাথ মুসলমানগিরের সহিত যোগ দিয়া-
ছিলেন? কিন্তু তুই নির্বোধ, তাকে কি
বলিব, সম্মুখ হইতে দূর হ।”

ক্রমে যুদ্ধ হইতে একে একে অনেক
সৈন্য আসিতে লাগিল, সকলে বলিতে
লাগিল, “রঘুনাথ বিদ্রোহী।” সরযুর সখা-
গণ সরযুকে এই কথা বলিলেন; বৃদ্ধ জনা-
র্জনও সাক্ষলোচনে বলিতে লাগিলেন, “কে
জানে, সেই সুলভ উদারমুখি বালকের মনে
একপাকুরতা ছিল? সরযু সমস্ত গুলিলেন,

কোন উত্তর করিলেন না। অগৎভুক্ত লোকে
রঘুনাথকে বিদ্রোহী বলিতেছে, সরযু হ্রদ
কহিল, অগৎ মিথ্যাবাদী, রঘুনাথের চরিত্রে
সৌন্দর্য নাই।

এইরূপে করেক দিন অভিযাহিত হইলে
পর, একদিন সন্ধ্যার সময় সরযু সরোবরতীরে
বাইলেন, দেখিলেন, সরোবরের কূলে সেই
নৈশ অন্ধকারে জটাজুটধারী দীর্ঘকায় এক-
জন গোশ্বামী বসিয়া রহিয়াছেন। সরযু দৈবৎ
বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইলেন, বত গোশ্বামীর
দিকে দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার
ভক্তঃপূর্ণ অবয়ব দেখিয়া সরযুর হৃদয়ে
ভক্তির আবির্ভাব হইতে লাগিল।

গোশ্বামী সরযুর দিকে চাহিলেন, কণেক
স্থবভাবে দেখিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, “ভদ্রে!
এ গোশ্বামীর নিকট কি তোমার কোনও
প্রয়োজন আছে? কোনও বিশেষ অভীষ্টে
আমার নিকট আসিয়াছ? রমণি! তোমার
ললাটে দুঃখচিহ্ন দেখিতেছি কেন? চক্ষুতে
তল কেন?”

সরযু উত্তর করিতে পারিলেন না।
গোশ্বামী পুনরায় বলিলেন, “বোধ হয়, আমি
তোমার উদ্দেশ্য অবগত আছি। বোধ হয়, কোন
বন্ধুর বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছ।”

সরযু তখন কম্পিতস্বরে বলিলেন,
“ভগবান্! আপনার শক্তি অসাধারণ, যদি
অমুগ্ধ করিয়া আরও কিছু বলেন, তবে
বাধিত হই। সেই বন্ধু বিপর হইয়াছেন,
তাঁহার কুললতাও জিজ্ঞাসা করিতে আসি-
য়াছি।”

গোশ্বামী। অগতে সকলে তাঁহাকে
বিদ্রোহী বলিয়া কনে।

সরযু। প্রভুর অজ্ঞাত কিছুই নাই।

গোশ্বামী। মহারাজ শিবজী তাঁহাকে
বিদ্রোহী জানিয়াই দূর করিয়া দিয়াছেন।

সরযুর মুখ রক্তবর্ণ হইল, আরক্তনয়নে
কহিলেন, “তপস্যা প্রবন্ধনা বিশ্বাস করিব,
কিন্তু রঘুনাথ বিদ্রোহী বিশ্বাস করিব না।
গোশ্বামিন, আমি বিদায় হই।”

গোশ্বামীর নয়ন জলপূর্ণ হইল, তিনি
ধীরে ধীরে বলিলেন, “আমার আর কিছু
বক্তব্য আছে।”

সরযু। নিবেদন করুন।

গোশ্বামী। মহাবাহুদয় অবগত হওয়া
মহাবাগণনার অসাধ্য, রঘুনাথের হৃদয়ে কি
ছিল, জানিবার একমাত্র উপায় আছে। প্রণ-
য়িনীর হৃদয় প্রণয়ীর হৃদয়ের দর্পণস্বরূপ।
যদি রঘুনাথের যথার্থ প্রণয়িনী কেহ থাকে,
তাঁহার নিকট গমন কর, তাঁহার হৃদয়ের
ভাব কি, জিজ্ঞাসা কর, তাঁহার হৃদয়ের চিত্রা
মিথ্যাবাদিনী নহে।

সরযু আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন,
“জগদীশ্বর, তোমাকে ধন্যবাদ করি, তুমি
আমার হৃদয়ে এতকণে শান্তিদান করিলে।
সেই উন্নতচরিত্র বোদ্ধার প্রণয়িনী হইবার
যে আশা করে, জীবন থাকিতে রঘুনাথের
সত্যতার তাহার স্থিরবিশ্বাস বিচলিত হইবে
না।”

কণেক পর গোশ্বামী আবার বলিলেন,
“ভদ্রে! তোমার কথা শুনিয়া বোধ হই-
তেছে যে, তুমিই সেই বোদ্ধার প্রকৃত প্রণ-
য়িনী। আমি দেশে দেশে পর্যটন করি,
সম্ভবতঃ রঘুনাথের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ
হইতে পারে, তাঁহাকে কিছু বক্তব্য আছে?
আমার নিকট লজ্জার কারণ নাই, আমি
সংসারের বহির্ভূত।”

সরযু দৈবৎ লজ্জিত হইলেন, ধীরে ধীরে
বলিলেন, “প্রভুর সহিত তাঁহার সস্ত্রাতি
সাক্ষাৎ হইয়াছিল?”

গোশ্বামী। কল্য রজনীতে দৈশানী-

মান্দ্রে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনিই আনাকে
তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন।

সরযু। তিনি আপাততঃ কি করিবার
তজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা কি বলিয়া-
ছেন?

গোস্বামী। নিজ বাহুবলে, নিজ কার্য-
ক্ষেপে, অস্ত্রের অপব্যব তিরোহিত করিবেন
অথবা সেই চেষ্টায় প্রাণদান করিবেন।

সরযু। ধন্ত বীর প্রতিজ্ঞা! যদি তাঁহার
সহিত পুনরায় আপনার সাক্ষাৎ হয়, বলি-
বেন, সরযু রাজপুত্র-বালা, জীবন অপেক্ষা যশ
অধিক জ্ঞান। বলিবেন, সরযু যত দিন
জীবিত থাকিবে, রঘুনাথকে কলঙ্কপূত্র বীর
বলিয়া তাঁহার যশোগীত গাইবে। ভগবান্
অবশ্যই রঘুনাথের যত সন্মান করিবেন।

গোস্বামী। ভগবান্ তাহাই করুন,
কিন্তু ভদ্রে! সত্যের সর্বদা জয় হয় না।
বিশেষতঃ রঘুনাথ যে দুঃস্থ উদ্ভমে প্রবৃত্ত
হইতেছেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণসংস্কারও
আছে।

সরযু। রাজপুত্রের সেই কথা। আপনি
তাঁহাকে জানাইবেন, যদি কর্তব্যসাধনে
তাঁহার প্রাণবিরোগ হয়, সরযুবালা তাঁহার
যশোগীত গাইতে গাইতে উল্লাসে নিজ প্রাণ
বিসর্জন দিবে।

উভয়ে ক্ষণেক নিস্তর হইয়া রহিলেন।
অনেকক্ষণ পরে সরযু জিজ্ঞাসা করিলেন,
“রঘুনাথ আর কিছু আপনার নিকট বলিয়া-
ছিলেন?”

গোস্বামী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন,
“আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বিদ্রোহী
বলিয়া জগৎ তাঁহাকে ঘৃণা করিবে, আপনি
কি তাঁহাকে হৃদয়ে স্থান দিবেন? জনং
বাহার নাম উচ্চারণ করিবে না, আপনি
কি তাঁহার নাম স্মরণ করিবেন? দ্বিপিত,

অবমানিত, দূরীকৃত রঘুনাথকে কি সরযুবালা
মনে রাখিবেন?”

সরযু বলিলেন, “প্রভু! তাঁহাকে জানাই
বেন, সরযু রাজপুত্রবালা, অবিখ্যাসিনী নহে।”

গোস্বামী। জগদীশ্বর! তবে আর
তাঁহার হৃদয়ে কষ্ট নাই। লোকে যদি মন্দ
বলে, তিনি জানিবেন, একজন এখনও রঘু-
নাথকে বিশ্বাস করে। এক্ষণে বিদায় দিন,
আমি এই কথাগুলি বলিলে রঘুনাথের হৃদয়ে
শান্তিসেচন হইবে।

সজলনয়নে সরযু বলিলেন, “তাঁহাকে
আরও বলিবেন, তিনি অসিহস্তে যশের পথ
পরিষ্কার করুন, যিনি জগতের আদিপুরুষ,
তিনি তাঁহার সহায় হইবেন।”

উভয়ে পুনরায় নীরব হইয়া রহিলেন।
সরযু বলিলেন, “প্রভু! আমার হৃদয় শান্ত
করিয়াছেন, প্রভুর নাম জিজ্ঞাসা করিতে
পারি?”

গোস্বামী বলিলেন, “সীতাপতি
গোস্বামী।”

রজনী জগতে গভীরতর অন্ধকার
ঢালিতে লাগিল। সেই অন্ধকারে একজন
গোস্বামী একাকী রায়গড়-ভূগতিমুখে গমন
করিতেছেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

রায়গড়-ভূগতি।

বিক সেব, সুগাম্ভীর্য, অকৃত কবর,
এত দিন আর এই অশ্রুতমপুরে,
দেবদ, বীরদ, বীরা, সর্ব তেরাপিয়া,
দাসদের কলহেতে ললাট উজ্জ্বলি?

হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

পূর্বোক্ত ঘটনার কয়েক দিল পর, শিব-
জীর তদানীন্তন রাজধানী রায়গড়ে রজনী

শিবজীর সময় একটি সভা সন্নিবেশিত হইয়াছে। শিবজীর প্রধান প্রধান সেনাপতি, বক্সী, কর্মচারী, পুরোহিত ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ সভার উপস্থিত হইয়াছেন। পরাক্রান্ত বোজা, ধীশক্তিসম্পন্ন মন্ত্রী, শীর্ণভ্রু, শুক্লকেশ, বহুদর্শী কায়শাস্ত্রী সভাতল সুশোভিত করিয়াছেন। বুদ্ধব্যবসারে বুদ্ধিসঙ্গালনে বা বিজ্ঞাবলে ইহারাই শিবজীর চিরসহায়তা করিয়াছেন; শিবজীর তার ইহাদেরও জয় স্বদেশাশুরাগে পূর্ণ। কিন্তু অল্প সভাস্থল নীরব, শিবজী নীরব, মহারাষ্ট্রীয় বীরগণ অথ মহারাষ্ট্রীয়-গৌরব-লক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইবার অস্থ সমবেত হইয়াছেন।

অনেকক্ষণ পর শিবজী মুরেখরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “পেশওয়ারাজী! আপনি তবে এই পরামর্শ দিতেছেন, সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়াছি, তাঁহার অধীন আর-স্বীয়দার হইয়া থাকিব?”

মুরেখর। মহুযোর বাহা সাধা, আপনি তাহা করিয়াছেন, বিধির নির্বন্ধ কে লঙ্ঘন করিতে পারে?

শিবজী। স্বর্গদেব! যখন আপনি আমার আদেশে এই সুন্দর প্রশস্ত রাজগড়-দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তখন ইহা রাজার রাজধানীস্বরূপ নির্মাণ করেন, না জার-স্বীয়দারের আবাসস্থান বলিয়া নির্মাণ করেন?

আবাজী স্বর্গদেব ক্ষুরধরে উত্তর করিলেন, “কব্রিররাজ! ভবানীর আদেশে একদিন স্বাধীনতা আকাজ্ঞা করিয়াছিলেন, ভবানীর আদেশে সে চেষ্টা হইতে নিরস্ত হইয়াছেন, তাহাতে আক্ষেপ অধিধের। ঈশানী স্বয়ং হিন্দুসেনাপতির সহিত বুদ্ধ নিবেদ্য করিয়াছেন।”

অরজী দস্তও কহিলেন, “বাহা অনিবার্য,

তাহা হইয়াছে, অথবা আপনার দিল্লীগমনের কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা করুন।”

শিবজী। অরজী! আপনার কথা সভ্য, কিন্তু যে আশা, যে চেষ্টা জয়ে বহুকালাবধি স্থান পাইয়াছে, তাহা সহজে উৎপাটিত হয় না। ঐ যে উন্নত পর্বত শ্রেণী চন্দ্রালোকে দৃষ্ট হইতেছে, বাল্যকালে ঐ পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিতে করিতে বা উপত্যকার ভ্রমণ করিতে করিতে জয় কত স্বপ্নের আবির্ভাব হইত। পুনরায় মহারাষ্ট্রদেশ স্বাধীন হইবে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে, পুনরায় হিন্দুরাজ্য হিমালয় হইতে সাগরতুল পর্য্যন্ত সমগ্রদেশ শাসন করিবেন। ঈশানী! যদি এ আশা অলীক স্বপ্নমাত্র, তবে এরূপ স্বপ্নে কেন বালকের জয় চঞ্চল করিয়াছিলে?

এই কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলে নীরব, সভার শব্দবাহু নাই। সেই নিশ্চক্ৰতার মধ্যে ঘরের একপ্রান্তে ঈষৎ অন্ধকার স্থান হইতে একটি গম্ভীর স্বর ক্ষত হইল,— “ঈশানী প্রবন্ধনা করেন না। মহুযোর যদি অধ্যবসায় ও বীরত্ব থাকে, ঈশানী সহায়তাদানে কুণীত হইবেন না।”

চকিত হইয়া শিবজী চাহিয়া দেখিলেন, নবীন গোষাম্বী সীতাপতি।

উৎসাহে শিবজীর নয়ন জ্বলিতে লাগিল, বলিলেন, “গৌসাইজি! তুমি আমার জয়ে বাল্য উৎসাহের পুনরুজ্জ্বল করিতেছ, বাল্যকথা পুনরায় স্মরণ করাইতেছ, তাত, দাদাজী কানাইদেব যত্না-শয্যার শারিত হইয়া আমাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন, ‘বৎস! তুমি যে চেষ্টা করিতেছ, তদপেক্ষা মহত্তর চেষ্টা আর নাই। এই উন্নত পথ অনুসরণ কর, দেশের স্বাধীনতা-সাধন কর, ব্রাহ্মণ,

গোবৎসাদি ও কৃষিগণকে রক্ষা কর, দেবালয়-কল্মষিতকারীকে শাস্তি প্রদান কর, ইশানী যে উন্নত পথ তোমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, সেই পথ অহুধাবন কর ।’ বিংশতি বৎসর পরে অজ্ঞ দাদাজীর গভীরস্বর আমার কর্ণকূহরে শব্দিত হইতেছে। দাদাজী কি প্রবঞ্চনাবাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন ?”

পুনরায় সেই গোস্থামী সেই গভীরস্বরে বলিলেন, “কানাইদেব প্রবঞ্চনাবাক্য উচ্চারণ করেন নাই, উন্নত পথ অহুসরণ করিলে অবশ্যই উন্নত ফললাভ হইবে। পথিমধ্যে যদি আমরা ভয়েৎসাহ হইয়া নিরন্ত হই, সে কি দাদাজী কানাইদেবের প্রবঞ্চনা, না আমাদের ভীৰুতা ?”

“ভীৰুতা” শব্দ উচ্চারণমাত্র সভাতে গোলযোগ উপস্থিত হইল, বীরদিগের কোষে অসি ঝন্ঝনা শব্দ করিল।

গোস্থামী পুনরায় গভীরস্বরে বলিলেন, “রাজন্! গোস্থামীর বাচালতা ক্ষমা করুন, যদি অজ্ঞায় কথা উচ্চারণ করিয়া থাকি, ক্ষমা করুন। কিন্তু মদীয় উপদেশ সত্য কি অলীক, ক্ষত্রিয়রাজ, আপন বীররুদয়কে জিজ্ঞাসা করুন। যিনি জায়গীদারের পদবী হইতে রাজপদবী গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি অসিহস্তে স্বাধীনতার পথ পরিষ্কার করিয়াছেন, যিনি পরীতে, উপত্যকায়, গ্রামে, অটবীতে বীরত্বের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছেন, তিনি কি সে বীরত্ব বিস্মরণ হইবেন ? সে স্বাধীনতার জলাঞ্জলি দিবেন ? বালস্বর্ঘ্যের জ্ঞায় যে হিন্দু-রাজ্যের জ্যোতিঃ চারিদিকে অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া বিস্তৃত হইতেছে, সে সূর্য্য কি অকালে অস্ত যাইবে ? রাজন্! হিন্দু গৌরব লক্ষ্মী আপনাকে বরণ করিয়াছেন, আপনি খেচ্ছা-পূর্ব্বক তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন ? আমি ধর্ম্মব্যবসায়ী মাত্র, আমার পরামর্শ

দিবার অধিকার নাই, স্বয়ং বিবেচনা করুন।”

সভাস্থ সকলে নীরব, শিবজী নীরব, কিন্তু তাঁহার নয়ন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে শিবজী গোস্থামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “গোস্থামিন্! আপনায় সহিত অল্পদিনই আমার পরিচয় হইয়াছে, আপনি দেব কি মনুষ্য, জানি না, কিন্তু দৈব-বাণী হইতেও আপনার কথা জুদয়ে গভীরতর অঙ্কিত হইতেছে। একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, হিন্দু-সেনাপতির তুমুল প্রতাপ, তীক্ষ্ণ রণ-কৌশল, অসংখ্য রাজসেনা, তাহার সহিত যুদ্ধ করে, একপ সৈন্ত আমাদের কোথায় ?”

সীতাপতি। রাজপুতগণ বীরাগ্রগণ্য, কিন্তু মহারাজীরগণও দুর্ব্বল হস্তে অসিধারণ করেন না। জয়দিংহ রণপণ্ডিত, কিন্তু শিব-জীও ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পরাজয় আশঙ্কা করিলেই পরাজয় হয়। পুরুষসিংহ! বিপদ তুচ্ছ করিয়া, দৈবকে সংহার করিয়া, কার্য্যসাধন করুন, ভারতবর্ষে একপ হিন্দু নাই যে, আপনার যশোগান না করিবে, আকাশে এমন দেবতা নাই, যিনি আপনার সহায়তা না করিবেন।

শিবজী। মানিলাম, কিন্তু হিন্দুতে হিন্দুতে যুদ্ধ করিয়া কৃষির-স্রোতে দেশ প্রাণিত করিবে, সে কি মঙ্গল, সে কি পুণ্যকর্ম্ম ?

সীতাপতি। সে পাপে কে পাতকী ? যিনি স্বজাতির জন্ত, স্বধর্ম্মের জন্ত যুদ্ধ করেন, তিনি, না যিনি মুসলমানদিগের অর্থভুক্ হইয়া স্বজাতির বৈরাচরণ করেন, তিনি ?

শিবজী পুনরায় নীরব হইয়া রহিলেন, প্রায় একদণ্ড কাল নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাঁহার বিশাল হৃদয় বত ভীষণ চিন্তালহরীতে আলোড়িত হইতেছিল, কে বলিবে ? একদণ্ড কাল পর ধীরে ধীরে

বড়ক-উঠাইয়া গভীরস্থরে বলিলেন, “সীতাপতি ! অস্ত্র আমিস্বয়ং, মহারাষ্ট্রদেশ এখনও বীরশূন্য হয় নাই। এখনও পরাধীন হইবে না। পুনরায় যুদ্ধ হইবে, সে যুদ্ধের দিনে আপনাকে অপেক্ষা বিচক্ষণ যজ্ঞ বা সাহসী সহযোগী আমি আকাঙ্ক্ষা করি না। কিন্তু সে যুদ্ধের দিন এখনও আইসে নাই। আমি পরাজয় আশঙ্কা করিতেছি না, বৃথা-নাশ আশঙ্কা করিতেছি না, অস্ত্র একটি কারণে আপাততঃ যুদ্ধে বিমুখ হইতেছি, শ্রবণ করুন।

বে মহৎ ব্রত ধারণ করিয়াছি, তাহা সাধনার্থ অনেক বড় যন্ত্র, অনেক গুপ্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছি। স্নেহগুণ আনার সহিত সন্ধিবাক্য রাখে নাই, আমিও তাহাদিগের সহিত সন্ধি রাখি নাই।

অস্ত্র হিন্দুধর্মের অবলম্বনরূপ, হিন্দু-প্রতাপের প্রতিমূর্তিরূপ, সত্যনিষ্ঠ জয়সিংহের সহিত সন্ধি করিয়াছি, শিবজী সে সন্ধিলঙ্ঘন করিতে অপারগ। মহামুভব রাজপুত্রের সহিত যে সন্ধি করিয়াছি, শিবজী জীবন থাকিতে তাহা লঙ্ঘন করিবে না।

ধর্মাত্মা একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, ‘সত্যপালনে যদি সনাতন হিন্দুধর্মের রক্ষা না হয়, সত্যলঙ্ঘনে হইবে।’ সে কথা অত্যাঁপি আমি বিশ্বাস হই নাই, সে কথা অস্ত্র বিশ্বরণ হইবে না।

সীতাপতি ! চতুর আরঞ্জীব যদি আমাদের সন্ধির কথা লঙ্ঘন করেন, তখন আপনায় পরামর্শ গ্রহণ করিব, তখন শিবজী চূর্ণল হস্তে ধ্বংস করিবে না। কিন্তু সত্যপনায় জয়সিংহের সহিত এই সন্ধি লঙ্ঘন করিতে শিবজী অপারগ।”

সত্যসদৃশ সকলে নীরব হইয়া রহিলেন। কণেক পর অন্নজী বলিলেন, “মহারাজ !

আর একটি কথা আছে ; আপনি কি দিল্লী বাওয়া স্থির করিয়াছেন ?”

শিবজী। সে বিষয়েও আমি জয়সিংহকে বাক্য দান করিয়াছি।

অন্নজী। মহারাজ ! আরঞ্জীবের চতুরতা জানেন, তাহার কথা বিশ্বাস করিবেন ? তিনি আপনাকে কি মনোরথে আহ্বান করিয়াছেন, তাহা কি আপনি অনুভব করিতে পারেন না ?

শিবজী। অন্নজী ! জয়সিংহ অল্প বাক্যদান করিয়াছেন যে, দিল্লীগমন আমার কোনরূপ অনিষ্ট ঘটবে না।

অন্নজী। কপটাগারী আরঞ্জীব যদি আপনাকে বন্দী করেন বা মৃত্যু করেন, তখন জয়সিংহ কিরূপে আপনাকে রক্ষা করিবেন ?

শিবজী। সন্ধিলঙ্ঘনের ফলে আরঞ্জীব অবশ্যই ভোগ করিবেন। দত্তজী ! মহারাষ্ট্রভূমি বীরপ্রসবিনী, আরঞ্জীবের উপর আচরণ করিলে মহারাষ্ট্রদেশে যে যুদ্ধাঙ্গ প্রজ্জ্বলিত হইবে, সাগরের জলে তাহা নিমজিত হইবে না, আরঞ্জীব ও সমস্ত দিল্লীর সাম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া যাইবে। পাপের ফল নিশ্চয়ই কলিবে।

শিবজীকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ দেখিয়া আর কেহ নিবেদন করিলেন না। কণেক পর শিবজী বলিলেন, “পেশোরাঙ্গী মুরেখর ! আবাজী স্বর্গদেব ! অন্নজী দত্ত ! আপনাদিগের ত্রায় কার্য্যক্ষম বিচক্ষণ পণ্ডিত মহারাষ্ট্রদেশে বিরল। আমার অবর্তমানে মহারাষ্ট্রদেশ আপনাদিগের তিন জনে শাসন করিবেন, আপনাদিগের আদেশ আমার আদেশের ত্রায় সকলে পালন করিবে, একরূপ আজ্ঞা দিয়া যাইবে।” মুরেখর, স্বর্গদেব ও অন্নজী শাসনভার গ্রহণ করিলেন। মালভূমি তখন বলিলেন,

“কবিরাজ! আমার একটি আবেদন আছে। বাল্যকাল হইতে আপনার সঙ্গ ত্যাগ করি নাই, অহুমতি করুন, আপনার সহিত দিল্লী যাত্রা করি।”

সজল-নয়নে শিবজী বলিলেন, “মানস্রী! তোমার নিকট আমার অবেদ্য কিছুই নাই, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।”

নীতাপতি কণেক পর বলিলেন, “রাজন! তবে আমাকে বিদায় দিন, আমাকে ব্রতসাধ-নার্থ বহু তীর্থে ঘাইতে হইবে। জগদীশ্বর আপনাকে নিরাপদে রাখুন।”

শিবজী। নবীন গোষ্ঠাগ্নি! কুশলে তীর্থযাত্রা করুন। যুদ্ধের সময় আপনাকে পুনরায় স্মরণ করিব, আপনা অপেক্ষা প্রকৃত বন্ধু আমি দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করি না। আপনার মত অল্প বয়সেই এরূপ ভেজঃ, সাহস ও বীরত্ব আমি আর কাহারও দেখি নাই।

পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অক্ষুণ্ণবরে বলিলেন, “কেবল আর এক জনকে দেখিয়াছিলাম।”

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ।

চাঁদ করিব গীত ।

চলেছে চাহিয়া দেখ,
যোদ্ধা, যোদ্ধা এক এক
কাল পরাজয় করি দেবমূর্তি ধরিয়া ।

জন্মিবে পুরুষগণ
বীর যোদ্ধা অগণন,
রাখিবে ভারত নাম স্মৃতিপৃষ্ঠে আঁকিয়া ।
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

১৬৬৬ খ্রীঃ অব্দে বসন্তকালে পঞ্চশত
অখারোহী ও এক সহস্র পদাতিক লইয়া

শিবজী দিল্লীর নিকট উপস্থিত হইলেন নগরের প্রায় ছয় কোশ দক্ষিণে শিবির সংস্থাপিত করিয়াছেন, সেনাগণ বিজ্ঞান করিতেছে, শিবজী চিন্তিত-মনে এদিক ওদিক পরিভ্রমণ করিতেছেন। দিল্লী আসিয়া কি ভাল করিয়াছেন? মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করা কি বীরোচিত কার্য হইয়াছে? এখনও কি প্রত্যাবর্তনের উপায় নাই? এই-রূপ সহস্র চিন্তা শিবজীর মনঃস্থান আলো-ড়িত করিতেছে। যোদ্ধার মুখমণ্ডল ও ললাট চিন্তারেখায় অরিত, বিপদকালে ও দুঃকালে কেহ শিবজীর মুখমণ্ডল এরূপ চিন্তাক্রান্ত দেখে নাই।

শিবজীর সঙ্গে সঙ্গে কেবল তাঁহার ভেজাখী উগ্রপ্রভাব নয় বৎসরের বালক শম্ভুজী ভ্রমণ করিতেছেন, এক একবার পিতার গভীর মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, পিতার হৃদয়ের ভাব কতক কতক বুঝিতে পারিতেছেন। রঘুনাথপুত্র জায়শাস্ত্রী নামক শিবজীর পুরাতন মন্ত্রী কিছু পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছিলেন।

অনেককণের পর শিবজী মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “জায়শাস্ত্রী, আপনি কখনও দিল্লীতে আসিয়াছিলেন?

জায়শাস্ত্রী। বাল্যকালে দিল্লীনগর দেখিয়াছিলাম।

শিবজী। দূরে ঐ বহুবিভীর্ণ প্রাচীরের জায় কি দেখা যাইতেছে, বলিতে পারেন? আপনি অনন্তমনা হইয়া ঐ দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন কি জন্ত?

জায়শাস্ত্রী। মহারাজ! দিল্লীর শেষ হিন্দু-রাজা পৃথুরারের তুর্গপ্রাচীর দেখা যাইতেছে।

শিবজী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “এই সে পৃথুরারের তুর্গ? এই স্থানে তাঁহার রাজ-ধানী ছিল? এই স্থানে দিল্লীর শেষ হিন্দু-

রাজা রাজ্যশাসন করিতেন ? ভায়শাস্ত্রী, যথেষ্ট ভায় দে দিন গত হইয়াছে ! দিবসের আলোক গত হইয়াছে, পুনরায় দিবস আইসে, শীতকালে বিলুপ্তপত্র কুমুম বসন্তে আবার দেখা যায়। আমায় গৌরবদিন কি আর দেখা দিবে না ?”

ভায়শাস্ত্রী। ভগবানের প্রসাদে সকলই হইতে পারে। ভগবান করুন, আপনার বাহুবলে যেন আমরা পুনরায় গৌরবলাভ করিতে পারি।

শিবজী। ভায়শাস্ত্রী ! বাল্যকালে কঙ্কণ-প্রদেশের কথকদিগের যে কথা শুনিতাম, চাঁদ করিব যে গীত শুনিতাম, তাহা কি আপনার মনে পড়ে ? ঐ ভগ্ন ভূগ প্রাসাদপূর্ণ ও বহুজনাশীর্ণ ছিল, পতাকা ও তোরণ-শোভিত একটি বিস্তীর্ণ নগর ছিল। রাজ্য-সভার যোদ্ধা বর্গবেষ্টিত হইয়া রাজা বসিয়া আছেন, বাহিরে যতদূর দেখা যায়, পথে, খাটে, বাটীতে, প্রাঙ্গণে ও নলীতীরে নাগ-মুকগণ আনন্দে উৎসব করিতেছে। বহু বিস্তীর্ণ বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হইতেছে, উজানে লোকে আনন্দে নৃত্যগীত করিতেছে, সরো-বর হইতে ললনাগণ কলস করিয়া জল লইয়া বাইতেছে, প্রাসাদ-সম্মুখে সেনাগণ সসজ্জা দণ্ডায়মান রহিয়াছে ; বাতকর সানন্দে বাত করিতেছে। প্রভাতের সূর্য্য এই অপরূপ দৃশ্যের উপর সুন্দর রশ্মি বর্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে মহম্মদ ঘোরীর দূত রাজ্যসভায় প্রবেশ করিল। সে কথা কি আপনার মনে পড়ে ?

ভায়শাস্ত্রী। রাজনু ! চাঁদ কবির কথা মনে আছে, কিন্তু আপনি আর একবার সে কথা বলুন। আপনার মুখে সে কথা বড় মিষ্ট লাগিতেছে।

শিবজী। মুসলমান-দূত পৃথুরায়কে

বলিল, “মহারাজ ! মহম্মদ ঘোরী আপনার রাজ্যের অধীশ্বরমাত্র লইয়া সন্ধিস্থাপন করিতে সম্মত আছেন, তাহাতে আপনার কি মত ?”

মহামুভব পৃথুরায় উত্তর করিলেন, “যবে সূর্য্যদেব আকাশে অস্ত্র একটি সূর্য্যকে স্থান দিবেন, পৃথুরায় সেই দিন স্বীয় রাজ্যে অস্ত্র রাজাকে স্থান দিবেন।”

মুসলমান-দূত পুনরায় বলিল, “মহারাজ ! আপনার স্বস্তর মহাশয় মহম্মদ ঘোরীর সহিত সন্ধি করিয়াছেন, আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমান ও রাঠোর সৈন্য একত্রিত দেখিতে পাইবেন।”

পৃথুরায় উত্তর করিলেন, “স্বস্তর মহা-শয়কে প্রণাম জানাইবেন ও বলিবেন, আমিও স্বয়ং যাইতেছি, অবিলম্বে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিবা।”

অবিলম্বে চোহান-সৈন্য ঐ প্রশস্ত ভূগ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, তিরোহীর যুদ্ধে যবন ও রাঠোর সৈন্য পৃথুরায়ের সম্মুখে বাহু-তাড়িত ধূলিবৎ উড়িয়া গেল, আহত ঘোরী কষ্টে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিল !

রঘুনাথ ! সে দিন গিয়াছে, এক্ষণে চাঁদ করিব গীত কে গাইবে, কে শ্রবণ করিবে ? তথাপি এ স্থানে দণ্ডায়মান হইলে, আমা-দিগের পূর্বপুরুষদিগের অবিনশ্বর কীর্তি স্মরণ করিলে, যথেষ্ট ভায় নব নব আশা মনে উদয় হয়। এই বিশাল কীর্তিক্ষেত্রে চিরদিন তিমিরাবৃত থাকিবে না, ভারতের গৌরবের দিন এখনও উদিত হইবে। জগদীশ্বর রুদ্রকে আরোগ্যদান করেন, দুর্বলকে বলবান করেন, জীর্ণ পদদলিত ভারত-সন্তানকে তিনি এখনও উন্নত করিতে পারেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ।

—*—
রামসিংহ ।

বাগের নদীর বীর সন্ধান সম্বন্ধ ।

কাশীনাথ দাস ।

শিবজী ও তাঁহার পুত্র শম্ভুজী শিবিরে উপবেশন করিয়া আছেন, এমনত সময় একজন প্রহরী আসিয়া বলিল, “মহারাজ ! রামসিংহের পুত্র রামসিংহ অস্ত্র একজন সৈনিকের সহিত সম্রাট-আদেশে মহারাজকে দিল্লীতে আহ্বান করিতে আসিয়াছেন । উভয়ে দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন ।”

শিবজী । সাধরে লইয়া আইস ।

উগ্রস্বভাব শম্ভুজী বলিলেন, “পিতা ! আপনাকে আহ্বান করিতে আরংজীব কেবল দুই জন মাত্র দূত পাঠাইয়াছেন ?”

শিবজী আরংজীবকৃত এই অবমাননার মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু সে ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না । কণেক পরেই রামসিংহ শিবিরে প্রবেশ করিলেন । রাজপুত্র যুবক পিতার স্তায় তেজস্বী ও বীর, পিতার স্তায় ধর্মপরায়ণ ও সত্যপ্রিয় । ভীতবুদ্ধি শিবজী যুবকের মুখমণ্ডল দেখিয়াই তাঁহার উদার ও অকপট চরিত্র বুঝিলেন, তথাপি আরংজীবের কোন কু-অভিসন্ধি আছে কি না, দিল্লী-প্রদেশে বিপদ আছে কি না, কথাক্ষলে জানিবার প্রয়াস করিলেন । রামসিংহ পিতার নিকট শিবজীর বোধ্য ও প্রতাপের কথা অনেক শুনিয়াছিলেন, সবিস্ময়নয়নে মহারাজ্ঞী-বীরপুরুষের দিকে অবলোকন করিলেন । শিবজী রামসিংহকে আলিঙ্গন ও যথোচিত সম্মানপূরসর অভ্যর্থনা করিলেন ।

কণেক পর রামসিংহ করিলেন, “মহারাজাকে পূর্বে আমি কখন দেখি নাই, কিন্তু

পিতার নিকট আপনার যশোবার্তা বিস্তর শুনিয়াছি, অস্ত্র আপনার স্তায় যশোবীর ধর্মপরায়ণ বীরপুরুষকে দেখিয়া আমার নয়ন সার্থক হইল ।”

শিবজী । আমারও অস্ত্র পরম সৌভাগ্য ।

আপনার পিতার তুল্য বিচক্ষণ ধর্মপরায়ণ সত্যপ্রিয় বীরপুরুষ রাজত্বানুগে বিরল । দিল্লী আগমনের সময় যে তাঁহার পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল, ইহা মূলকণ সন্দেহ নাই ।

রামসিংহ । রাজনু ! দিল্লী আগমন করিতেছেন শুনিয়াই সম্রাট অত্যাচারে আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছেন, কখন নগর-প্রবেশ করিতে অভিলাস করেন ?

শিবজী । প্রবেশ-সম্বন্ধে আপনি কি পরামর্শ দেন ?

অকপটবরে রামসিংহ উত্তর করিলেন, “আমার বিবেচনার এইকণ্ঠেই প্রবেশ করা বিধেয়, বিলম্ব হইলে বাহু উত্তপ্ত হইবে, গ্রীষ্ম দুঃসহনীয় হইবে ।”

রামসিংহের সরল উত্তর শুনিয়া শিবজী হাস্ত করিয়া বলিলেন, “শে কথ্য জিজ্ঞাসা করি নাই । আপনি দিল্লীতে অধুনা বাস করিতেছেন, আপনার নিকট কোনও সংবাদ অবিস্তিত নাই । আমার পক্ষে দিল্লীপ্রবেশ কতদূর বুদ্ধির কার্য্য, তাহা আপনি অবশ্যই জানেন ।”

উদারচেতা রামসিংহ শিবজীর মনোগত ভাব বুঝিয়া দ্বিগুণ হাস্ত করিয়া বলিলেন, “কমা করুন, আমি আপনার উদ্বেগ পূর্বে বুঝিতে পারি নাই । আমি আপনার অকৃৎসন হইলে চিরকাল পর্তুতে বাস করিতাম, নিজের অমির উপর নির্ভর করিতাম, অসির তুল্য প্রকৃত বন্ধু আর নাই । কিন্তু এ বিষয়ে আমি অজ্ঞমাত্র, পিতা আপনাকে বখান দিল্লী আসিতে পরামর্শ দিয়াছেন, তখন আপনি

“যদিও তুমিই জাররাছেন। তিনি অবি-
তীয় পণ্ডিত, তাহার পরামর্শ কখন ব্যর্থ
হয় না।”

শিবজী বুলিলেন, দিল্লীতে তাঁহাকে রক্ষা
করিবার জন্য কোনও কল্পনা হয় নাই অথবা
যদি হইয়া থাকে, রামসিংহ তাহা জানেন
না। তখন পুনরায় বলিলেন, “হাঁ, আপ-
নার পিতাই আমাকে আসিতে পরামর্শ
দিরাছেন, আমার আদিবার সময় তিনি
আরও বাক্যদান করিয়াছেন, তাহাও বোধ
হয় অবগত আছেন।”

রামসিংহ। আচ্ছ, দিল্লী আগমনে
আপনার কোন বিপদ হইবে না, কোনও
অনিষ্ট হইবে না, সে বিষয়ে তিনি আপ-
নাকে বাক্যদান করিয়াছেন, সে বিষয়ে
তিনি আমাকেও আদেশ করিয়াছেন।

শিব। তাহাতে আপনার মত কি?

রামসিংহ। পিতার আদেশ অবশ্য পাল-
নীয়, রাজপুতের বাবা লজ্বন হয় না। পিতার
বাক্য বাহাতে লজ্বন না হয়, আপনি নিরা-
পদে স্বদেশে বাইতে পারেন, সে বিষয়ে
দাসের বক্তব্য কোনও ক্রটি হইবে না।

শিবজীর মন নিরুবেগ হইল, আর
সন্দেহ না করিয়া ঈশৎ হাসিয়া বলিলেন,
“তবে আপনারই পরামর্শ গ্রহণ করিব।
বিলম্ব করিলে বাবু উত্তপ্ত হইবে। চলুন,
এইক্ষণেই দিল্লী প্রবেশ করি।”

অচিরে সকলে দিল্লীর অভিমুখে
চলিলেন।

সমস্ত পথ পুরাতন মুসলমান-প্রাসাদের
ভরাবশেষে পরিপূর্ণ। প্রথম মুসলমানেরা
দিল্লী জয় করিয়া পৃথুরারের পুরাতন দুর্গের
নিকট আপনারাঙ্গের রাজধানী নির্মাণ
করিয়াছিলেন, সুতরাং প্রথম সম্রাটদিগের
মসজিদ, প্রাসাদ ও সমাধিমন্দিরের ভরাবশিষ্ট

সেই স্থানে দৃষ্ট হয়, জগদ্বিখ্যাত কুতুবমিনার
এই স্থানে নির্মিত। কালক্রমে নতুন
নতুন সম্রাট আরও উত্তরে নতুন নতুন
প্রাসাদ ও রাজবাটী নির্মাণ করিতে
লাগিলেন, ক্রমে নগর উত্তরাভিমুখে চলিল।
শিবজী বাইতে বাইতে কত প্রাসাদ, কত
মসজিদ ও মিনার, কত স্তম্ভ ও সমাধিমন্দি-
রের ভরাবশেষ দেখিলেন, গণনা করিতে
পারিলেন না। রামসিংহ শিবজী সবে
সবে বাইতে লাগিলেন ও নানাস্থানের পরি-
চয় দিতে লাগিলেন, উত্তরে উত্তরের গুপের
পরিচয় পাইলেন, উত্তরের মধ্যে বিশেষ
সৌন্দর্য জন্মিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিবজী স্থির
করিলেন, যদি দিল্লীতে কোনও বিপদ হয়,
একজন প্রকৃত বন্ধু পাইব।

পশ্চিমধ্যে লোদীবলীর সম্রাটদিগের
প্রকাণ্ড সমাধিমন্দির-সকল দৃষ্ট হইল, প্রত্যেক
রাজার কবরের উপর এক একটি গম্বুজ ও
অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছে। আকগানদিগের
গৌরবস্বৰ্ণা যখন অন্তর্মিত হয়, তখন এই
স্থানে দিল্লী ছিল, পরে আরও উত্তরে সরিরা
গিয়াছে।

তাহার পর হুমায়ূনের প্রকাণ্ড সমাধি
মন্দির। তাহার পরে “চৌবট্ থবা,”
অর্থাৎ খেত-প্রান্তর-বিনির্মিত চতুঃষষ্টিস্তম্ভযুক্ত
প্রকাণ্ড হৃদয় অট্টালিকা। তাহার পশ্চাতে
অসংখ্য গোরস্থান। পৃথুরারের দুর্গ হইতে
আধুনিক দিল্লী পর্যন্ত আসিতে আসিতে
শিবজীর বোধ হইল যেন, সেই পথেই
ভারতবর্ষের ইতিহাস অঙ্কিত হইয়াছে।
একটি প্রাসাদ ও অট্টালিকা সেই ইতিহাসের
এক একটি পাত, এক একটি গোরস্থান এক
একটি অক্ষর, করাল কাল সেই ইতিহাস-
লেখক, নচেৎ এক্ষণ অক্ষরে ইতিহাস কেন
লিখিত হইবে?

শিবজী আরও আসিতে লাগিলেন।
দিল্লীর প্রাচীরের নিকট আসিলে রামসিংহ
সগর্বে একটি মন্দির দেখাইয়া বলিলেন,
“রাজন! এই যে মন্দির দেখিতেছেন, পিতা
জ্যোতিষগণনার্থ ঐ মন্দির নির্মাণ করিয়া-
ছেন। বহুদেশের পণ্ডিতেরা ঐ মন্দিরে
আসিয়া রজনীতে নক্ষত্র গণনা করেন।

শিবজী। আপনার পিতা বেরূপ বীর,
সেইরূপ বিজ্ঞ, জগতে এইরূপ সৰ্ব্বগুণসম্পন্ন
লোক অতি বিরল। শুনিয়াছি, পুণ্য কাশী-
ধামেও তিনি ঐরূপ মান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত
করিয়াছেন।

দিল্লীর প্রাচীরের ভিতর প্রবেশ করিবার
সময় শিবজীর দ্বেষ হৃৎকম্প হইল, তিনি
অস্থ থামাইলেন; একবার পশ্চাদ্ধিকে
চাহিলেন, একবার মনে চিন্তার উদয় হইল
বে, এখনও স্বাধীন আছি, পরক্ষণেই বন্দী
হইতে পারি। তৎক্ষণাৎ ধর্মপরায়ণ জয়-
সিংহের নিকট যে বাক্যদান করিয়াছিলেন,
তাহা স্মরণ হইল, জয়সিংহের পুত্রের উদার
মুখমণ্ডল দেখিলেন, নিজ কোবে “ভবানী”
অসির দিকে দর্শন করিয়া দিল্লীস্থার প্রবেশ
করিলেন।

স্বাধীন মহারাজার বোকা সেই মুহূর্তে
বন্দী হইলেন।

মহারাজা জীবন প্রত্যাহ।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

দিল্লীনগরী।

যশে যশে রাজিছে রাজন,
নাটিছে নর্তকীকুল গাইছে সুভানে
গায়ক।

যশে যশে বেলে মালা গাঁথা কলমুল;
গৃহাঞ্জে উড়িছে লম্বা, বাতায়বে বাতী।
জনশ্রোতঃ রাজপথে বহিছে কলোলে।

মহুৎসব দত্ত।

দিল্লী অস্ত্র মনোহর শোভা ধারণ করি-
য়াছে। আরংজীব স্বয়ং জাঁকজমকপ্রিয়
ছিলেন না, কিন্তু রাজকার্য-সাধনার্থ সময়ে
সময়ে জাঁকজমক আবশ্যক, তাহা বিশেষরূপে
জানিতেন। অস্ত্র শিবজী দরিদ্র মহারাজ-
দেশ হইতে বিপুল অর্থশালী মোগল-রাজ-
ধানীতে আসিয়াছেন; মোগলদিগের ক্ষমতা,
সম্পত্তি ও অর্থের প্রাচুর্য দেখিলে শিবজী
আপন হীনতা বুঝিতে পারিবেন, মোগল-
দিগের সহিত যুদ্ধের অসম্ভাবিতা বুঝিতে
পারিবেন, এই উদ্দেশ্যে আরংজীব অস্ত্র প্রচুর
জাঁকজমকের আদেশ দিয়াছিলেন। সম্রাটের
আদেশে দিল্লীনগরী-উৎসবের দিনে কুল-
ললনার ভায় অপূর্ববেশ ধারণ করিয়াছে।

শিবজী ও রামসিংহ একত্রে রাজপথ
অতিবাহন করিতে লাগিলেন। পথ দিয়া
অসংখ্য অস্বারোহী ও পদাতিক গমনাগমন
করিতেছে, নগর লোকারণ্য হইয়াছে।
বণিকগণ বাজারে দোকানে বহুমূল্য পণ্য-
দ্রব্য রাখি করিয়া রাখিয়াছে, উৎকৃষ্ট বস্ত্র,
বহুমূল্য স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার, অপূর্ব
খাদ্যসামগ্রী ও অপৰ্যাপ্ত গৃহস্থকরণদ্রব্য
দেখিতে দেখিতে শিবজী রাজপথ অতি-

বাহন করিতে আসিলেন। কোথাও বুকের উপর নিশান উড়িতেছে, কোথাও সুপরিচ্ছন্ন গৃহস্থেরা বারান্দার বসিরা বহিরাছে, কোথাও বা গবাদি দিয়া কলকামিনীগণ এলিঙ্গ মহারাত্রি-যোদ্ধাকে দেখিতেছে। পথে অসংখ্য শকট, শিবিকা, হস্তী ও অশ্ব, রাজা, মন্ত্রবান, সেনা, আর্মির ও ওমরাহগণ সর্বদা গমনাগমন করিতেছে। অঝোরোহিণী তীব্রবেগে যেন নগর কাঁপাইয়া বাইতেছে; সুন্দর অলঙ্কার ও রক্তবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া শুভ নাড়িতে নাড়িতে গজেন্দ্রগমনে গজেন্দ্রগণ চলিয়া বাইতেছে; শিবিকাবাহকগণ হুঙ্কার শব্দে যেন আরোহীর পদমর্যাদা প্রচার করিয়া চলিয়া বাইতেছে। শিবজী এরূপ নগর কখনও দেখেন নাই, কোথায় পুনা বা দ্বারগড়।

বাইতে বাইতে রামসিংহ দুই তিনটি খেত গম্বুজ দেখাইয়া বলিলেন, “ঐ দেখুন, জুমা মসজিদ। সৈয়দ শাজিহান জগতের অর্থ একত্র করিয়া ঐ উন্নত প্রশস্ত মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, ওরূপ মসজিদ জগতে আর নাই।”

শিবজী বিশ্বমোহন-লোচনে দেখিলেন, রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্মিত মসজিদের প্রাচীর বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া শোভা পাইতেছে, তাহার উপর সুন্দর খেতপ্রস্তর-বিনির্মিত তিনটি গম্বুজ ও দুই দিকে দুই মিনার যেন গমন ভেদ করিয়া উঠিয়াছে।

এই অপরূপ মসজিদের সম্মুখেই রাজ-প্রাসাদ ও দুর্গের বিস্তীর্ণ রক্তবর্ণ প্রস্তর-বিনির্মিত প্রাচীর দৃষ্ট হইল। দুর্গের পশ্চাতে যমুনা নদী, সম্মুখে বিস্তীর্ণ রাজপথ শব্দপূর্ণ ও লোকারণ্য। সেই স্থানের ভ্রাম্য সমারোহপূর্ণ আর একটি স্থানও ভারতবর্ষে ছিল না, জগতে ছিল কি না, সন্দেহ।

দুর্গের প্রাচীরের উপর শত শত নিশান বায়ুপথে উড়িতেছে, যেন জগতে যোগল-সম্রাটের ক্ষমতা ও গৌরব প্রকাশ করিতেছে। দুর্গদ্বারের একজন প্রধান মন্ত্রবদারের প্রশস্ত শিবির, মন্ত্রবদার দুর্গদ্বার রক্ষা করিতেছেন। দুর্গের বাহিরে সেনা রেখায় রেখায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বন্দুকের ক্রীড়ালীলায় সূর্যালোককে ঝকঝক করিতেছে, প্রত্যেক ক্রীড়া হইতে রক্তবস্ত্রের নিশান বায়ুমাগে উড়িতেছে। দুর্গসম্মুখে অসংখ্য লোক অসংখ্য প্রকার দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় করিতে আসিয়াছে, দুর্গ-প্রাচীর হইতে মসজিদ-প্রাচীর পর্যন্ত সমস্ত পথ শব্দপূর্ণ ও লোকপূর্ণ। অঝোরোহী, গজারোহী ও শিবিকারোহী, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান পদাভিযুক্ত পুরুষগণ, বহুলোকে সমন্বিত হইয়া বহু সমারোহে সর্বদাই দুর্গদ্বারের ভিতর বাইতেছেন বা বাহিরে আসিতেছেন। তাঁহাদিগের পরিচ্ছন্ন-শোভায় নয়ন ঝলসিত হইতেছে, লোকের কলরবে কর্ণ বিদীর্ণ হইতেছে। সকল শব্দকে নিমগ্ন করিয়া মধ্যে মধ্যে দুর্গের মধ্য হইতে কামানের শব্দ বাক্য কল্পিত করিতেছে ও রাজাধিরাজ মঙ্গল-গীর অর্থাৎ জগতের অধিপতির ক্ষমতাবান্ধা জগৎসংসারে প্রচার করিতেছে। বিশ্বমোহন ফুললোচনে অনেকক্ষণ এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া অবশেষে শিবজী রামসিংহের সহিত দুর্গদ্বার অতিক্রম করিয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন।

প্রবেশ করিয়া শিবজী বাহা দেখিলেন, তাহাতে আরও বিস্মিত হইলেন। চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ “কারখানার” অসংখ্য শিল্প-করাগণ রাজ-ব্যবহার্য্য নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে; অপূর্ণ সুবর্ণ ও রৌপ্য-খচিত বস্ত্র, মলমল, মসজিন বা ছিট;

বহুলা গালিচা, চত্ৰাতপ, তাম্বু বা পর্দা ; সুন্দর পরিধের উকীষ, শাল বা গাজাবরণ ; অপরূপ স্বর্ণ ও মণিমাণিক্যের বেগম-পরিধের অলঙ্কার ; সুন্দর চিত্র, সুন্দর কারুকার্য, সুন্দর বেত-প্রস্তরের গৃহাঙ্করণ দ্রব্য, রাশি রাশি নীল, পীত, রক্তবর্ণ বা হরিষ্র প্রস্তরের নানারূপ খেলনা-দ্রব্য ;—কত বর্ণনা করিব ! ভারতবর্ষে বত অপূর্ব শিল্পকার ছিল, সম্রাট-আদেশে তাহার মালিক বেতন পাইয়া প্রতিদিন হুর্গে কার্য করিতে আসিত। সম্রাট রাজ-কার্যার্থ বা নিজ প্রয়োজনের জন্য যে কোন বস্তু আবশ্যক বোধ করিতেন, বিলাসপ্রিয়া বেগমগণ যতরূপ অপূর্ব দ্রব্য আদেশ করিতেন, প্রাসাদবাসীদিগের বত প্রকার সামগ্রী প্রয়োজন হইত, তৎসমস্তই এই স্থানে প্রাপ্ত হইত।

শিবজী এ সমস্ত দেখিবার সময় পাইলেন না। অসংখ্য লোকের মধ্য দিয়া “দেওয়ান আম” নামক উন্নত প্রশস্ত রক্ত-বর্ণ-প্রস্তর-নির্মিত প্রাসাদের নিকট আসিলেন। সম্রাট সচরাচর এই স্থানে সভা অধিবেশন করিতেন, কিন্তু অল্প যেন শিবজীকে প্রাসাদের সমস্ত গোরব দেখাইবার জন্তই সুন্দর বেত-প্রস্তরনির্মিত নানারূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত এবং জগতে অতুল্য “দেওয়ান খাস” নামক প্রাসাদে সভা অধিবেশন করিয়াছিলেন। শিবজী সেই স্থানে যাইয়া দেখিলেন, প্রাসাদের ভিতর রক্ত-মাণিক্য-বিনির্মিত সূর্য্যারম্ভ-প্রতিমাতী ময়ূর-সিংহাসনের উপর সম্রাট আরংজীব উপবেশন করিয়া আছেন। সম্রাটের চারিদিকে রৌপ্যবিনির্মিত রেল, রেলের বাহিরে ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য রাজা, মল্লবার, ওমরাহ ও সেনাপতিগণ নিঃশেষে দণ্ডায়মান

রহিয়াছেন। রায়সিংহ শিবজীর পরিচয়-দান করিয়া রাজ-সভনে উপস্থিত হইলেন।

শিবজী অর্থাৎ দিল্লীনগরীর অসাধারণ শোভা দেখিয়াই আরংজীবের উদ্দেশ্য অনুমান করিয়াছিলেন, এক্ষণে রাজসদনে আসিয়া সেই বিবর আরও স্পষ্ট বৃত্তিতে পারিলেন। যিনি বিংশতি বৎসর যুদ্ধ করিয়া আপনায় ও স্বজাতির স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি সম্রাট সম্রাটের স্বাধীনতা-স্বীকার করিয়া মুখে বর্ধেই সহায়তা করিয়াছিলেন, যিনি মহারাষ্ট্রদেশ হইতে সম্রাটকে দর্শন করিতে দিল্লী পর্য্যন্ত আসিয়াছেন, সম্রাট তাঁহাকে কিরূপ আহ্বান করিলেন ? শিবজী অর্থাৎ একজন সামান্য কর্মচারীর ন্যায় নম্রভাবে রাজসদনে দণ্ডায়মান। শিবজীর ধমনীতে উচ্চ শোণিত বহিতে লাগিল, কিন্তু এক্ষণে তিনি নিরুপায়, সামান্য রাজকর্মচারীর ন্যায় সম্রাটকে “তসলীম” করিয়া রীতিমত “নজর” দান করিলেন। আরংজীবের দূর-উদ্দেশ্য-সাধন হইল। জগৎ-সংসার জানিল, শিবজী জানিল, শিবজী ও আরংজীব সমকক্ষ নহেন, দাসের প্রভুর সহিত, স্বীণের বলিষ্ঠের সহিত যুদ্ধ করা মূর্থতা !

এই উদ্দেশ্যসাধনার্থ আরংজীব “নজর” গ্রহণ করিয়া, কোনও বিশেষ সমাদর না করিয়া শিবজীকে “পাঁচহাজারী” অর্থাৎ পঞ্চ সহস্র সেনার সেনাপতিদিগের মধ্যে স্থান দিলেন। শিবজীর নয়ন তখন অগ্নিবৎ প্রজ্জ্বলিত হইল, শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি ওষ্ঠের উপর দন্তস্থাপন করিয়া অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, “শিবজী পাঁচহাজারী ? সম্রাট যখন মহারাষ্ট্রে যাইবেন, দেখিবেন, শিবজীর অধীনে কত জন পাঁচ-

হাস্য্যারী আছে। দেখিবেন, তাহারা দুর্বল হতে অসিধারণ করেন।”

আবশ্যকীয় কার্য-সম্পাদন হইলে সভা-ভঙ্গ হইল। সম্রাট্ গোত্রোপাধান করিয়া পার্শ্বস্থ উচ্চ শ্রেষ্ঠ-প্রস্তর-বিনির্মিত বেগমবহলে বাইলেন। তখন স্বরীয় স্রোতের ন্যায় ভূগ হইতে অসংখ্য লোকস্রোত নির্গত হইতে লাগিল। যে বাহার আবাসস্থানে বাইল, সাগরের ন্যায় বিস্তীর্ণ দিল্লীনগরে অচিরে লোকস্রোত লীন হইয়া গেল।

শিবজীর আবাসের জন্য একটি বাটী নির্দিষ্ট হইয়াছিল। রোবে, অভিমানে সন্ধ্যার সময় শিবজী সেই বাটীতে আসিলেন, একাকী বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কণেক পর রাজসদন হইতে সংবাদ আসিল যে, অত্য সম্রাটের সম্মুখে শিবজী রুট হইয়া যে কথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সম্রাট তাহা শুনিয়াছেন। সম্রাট শিবজীকে নশু দিতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু ভবিষ্যতে শিবজী রাজসাক্ষাৎ পাইবেন না, রাজসভায় স্থান পাইবেন না।

শিবজী বুলিলেন, ভবিষ্যৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইতেছে! ব্যাধ যেরূপ সিংহকে ধরিবার জন্ত জাল পাতে, কুকুর ছুটবুদ্ধি আরং-জীব সেইরূপ ধীরে ধীরে শিবজীকে বন্দী করিবার জন্ত মন্ত্রগাজাল পাতিতেছেন। শিবজী মনে মনে ভাবিলেন, “এ জাল বিদীর্ণ করিয়া কি পুনরায় স্বাধীনতালাভ করিতে পারিব? হা সীতাগতি গোশ্বামিন্! চির-যুদ্ধের পরামর্শ তুমিই দিয়াছিলে, তোমার গরীয়সী কথা এখনও আমার কর্ণে শব্দিত হইতেছে। আরংজীব! সাবধান! শিবজী এ পর্যন্ত তোমার নিকট সত্যপালন করিয়াছে, তাহার সহিত চতুরতা করিও না, কেন না, শিবজীও সে বিদ্যায় শিশু নহেন।

যদি কর, ডাবানী সাক্ষী থাকুন, মহারাষ্ট্রদেশে যে সময়ালম প্রজালিত করিব, তাহাতে এই সুন্দর দিল্লীনগর, এই বিপুল মুসলমান-সাম্রাজ্য একেবারে নশ্ব হইয়া যাইবে।”

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ।

নিশীথে আগন্তুক ।

কে তুমি—

বিকৃতি-ভূষিত অন্ন ।

বধূমদন মতা ।

কয়েক দিনের মধ্যে শিবজী আরংজীবের উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। শিবজী আর স্বদেশে না যাইতে পারেন, চিরকাল দিল্লীতে বন্দী হইয়া থাকেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা আর কখনও স্বাধীন না হন, এই আরংজীবের উদ্দেশ্য। শিবজী সম্রাটের এই কপটচরণে যৎপরোনাস্তি রুট হইলেন, কিন্তু রোষ গোপন করিয়া দিল্লী হইতে প্রস্থানের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

শিবজীর চিরবিষমত মন্ত্রী রামনাথপহ্ন জায়শাস্ত্রী সর্বদা শিবজীর সহিত এই বিষয় আলোচনা করিতেন ও নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতেন। অনেক যুক্তি করিয়া উভয়ে স্থির করিলেন যে, প্রথমে দেশপ্রত্যা-গমনের জন্ত সম্রাটের নিকট অশ্রুমতি প্রার্থনা করা বিধেয়, অশ্রুমতি না দিলে অস্ত্র উপায় উদ্ভাবন করা যাইবে।

জায়শাস্ত্রী পণ্ডিতপ্রবর ও বাক্পটুতার অগ্রগণ্য। তিনি শিবজীর আবেদন রাজসদনে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন। আবেদনপত্রে শিবজী যে যে কারণে দিল্লীতে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা বিস্তারিতরূপে লিখিত

হইল! শিবজী যোগল-সৈন্তের সহায়তা করিয়া যে যে কার্যসাধন করিয়াছিলেন, আরজীব যে যে বিষয় অস্বীকার করিয়া শিবজীকে দিল্লীতে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাও স্পষ্টাক্ষরে দর্শিত হইল। তাহার পর শিবজী প্রার্থনা করিলেন যে, “আমি যে কার্য সাধন করিতে অস্বীকার করিয়াছি, তাহা এখনও সাধন করিতে প্রস্তুত আছি, বিজয়পুর ও গলখন্দ-রাজ্য সম্রাটের অধীনে আনিতে বতদূর সাধ্য সাহায্য করিব। অথবা যদি সম্রাট আমার সহায়তা গ্রহণ করেন, অসুখমতি দিলে আমি নিজের জায়গীরে প্রত্যা-বর্তন করি, কেন না, হিন্দুস্থানের জলবায়ু আমার পক্ষে, আমার সজিগণ ও আমার সৈন্তগণের পক্ষে যৎপরোনাস্তি অস্বাস্থ্যকর, এ দেশে আমাদের থাকা সম্ভব নহে।”

রঘুনাথ ঠায়শাস্ত্রী এইরূপ আবেদনপত্র সম্রাট-সদনে উপস্থিত করিলেন। সম্রাট উত্তর পাঠাইলেন, সে উত্তরে নানা কথা লিখিত আছে; কিন্তু শিবজীর প্রত্যাগমনের অসুখমতি নাই। শিবজী স্পষ্ট বুঝিলেন, তাহাকে চিরবন্দী করাই সম্রাটের একমাত্র উদ্দেশ্য। তখন দিন দিন পলায়নের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

উপরি-উক্ত ঘটনার কয়েক দিন পর এক-দিন সন্ধ্যার সময় শিবজী গবাক্ষপার্শ্বে চিন্তিত-ভাবে উপবেশন করিয়া আছেন। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, কিন্তু এখনও অন্ধকার হয় নাই, রাজপথ দিয়া লোকের স্রোত এখনও অবি-রত বহিয়া যাইতেছে। কত দেশের লোক কতরূপ পরিচ্ছদে কত কার্যে এই রাজধানীতে আসিয়াছে। কখন কখন দুই একজন খেতাব যোগল সদর্পে চলিয়া যাইতেছে, অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ শত শত দেশীয় হিন্দু বা মুসলমান লবঙ্গদাই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে এবং

দুই একজন কৃষ্ণবর্ণ কাক্রীও কখন কখন দেখা যাইতেছে। পারস্ত, আরব, তাতার ও তুরক দেশ হইতে বণিক বা মসাকের এই সমৃদ্ধ নগরীতে গমনাগমন করিতেছে, মুসলমান বা হিন্দু সেনাপতি রাজা বা মল্লব-দার বহলোক সম্বিষ্ট হইয়া মহাসমারোহে হস্তী বা অশ্ব বা শিবিকায় আরোহণ করিয়া যাইতেছে। সৈনিক পুরুষগণ হস্ত-কোতুক করিতে করিতে লব্ধ অতিবাহন করিতেছে, বিক্রেতাগণ আপন আপন পণ্যদ্রব্য মস্তকে লইয়া চীৎকার করিয়া যাইতেছে। এতদ্বির অস্তান্ত সহস্র লোক সহস্র কার্যে জলের স্রায় ষাতায়াত করিতেছে।

ক্রমে জনস্রোত হ্রাস পাইতে লাগিল। দিল্লীর অসংখ্য দোকানদার আপন আপন দোকান বন্ধ করিতে লাগিল। নগরের অনন্ত-কলরব ক্রমে ক্রমে ধামিয়া গেল, দুই একটি বাতীর গবাক্ষভিতর হইতে দীপশিখা দেখা যাইতে লাগিল, দূরস্থ অট্টালিকাগুলি ক্রমে অন্ধকারে আবৃত হইতে লাগিল। আকাশে দুই একটি তারা দেখা দিল, পশ্চিমদিকে রক্তিমচ্ছটা আর নাই। শিবজী পূর্বদিকে চাহিলেন; দেখিলেন, শাস্ত্র বিস্তীর্ণ দিগন্তপ্রবাহিণী যমুনানদী সায়াংকালে নিম্নরু-তায় অনন্ত সাগরাভিমুখে যাত্রা করিতেছে।

সেই নিম্নরুতার মধ্যে জুড়া মসজীদ হইতে আজানের পবিত্র শব্দ উথিত হইল, যেন গম্ভীরশব্দ ধীরে ধীরে চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল, যেন ধীরে ধীরে মানবের মন আকর্ষণ করিয়া গগনে উথিত হইতে লাগিল। শিবজী মুহূর্তের জন্ত স্তব্ধ হইয়া সেই সায়াংকালীন সুদূর-উচ্চারিত গম্ভীর শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অন্ধ-কারে পুনরায় চাহিলেন, কেবল জুড়া মস-জীদেব খেত-প্রস্তর-বিনির্দিষ্ট গম্বুজগুলি

সুনীল আকাশপটে অল্পই দেখা যাইতেছে, কেবল প্রাণীদের রক্তবর্ণ উন্নত প্রাচীর দূরে পর্বতশ্রেণীর মত দৃষ্ট হইতেছে। এতদ্বির সমস্ত নগরী অন্ধকারে আচ্ছাদিত, নৈশ নিস্তরতার স্তর ।

রজনী গভীর হইল, কিন্তু শিবজীর চিন্তা-মূত্র এখনও ছিন্ন হইল না, কেন না, অল্প পূর্বকথা একে একে হৃদয়ে জাগরিত হইতেছিল। বালাকালের সুহৃৎ, বালাকালের আশা, ভরসা, উত্তম, সাহসী ও উন্নতচরিত্র পিতা শাহজী, পিতৃতুল্য বালাসুহৃৎ দাদাজী কানাইদেব, গরীয়সী মাতা জীজী ! সেই বীরমাতা শিশু শিবজীকে মহারাত্রের জয়ের কথা বলিয়াছিলেন, সেই বীরমাতা বালক শিবজীকে বীরকার্যে ব্রতী করিয়াছিলেন, সেই বীরমাতা শিবজীকে বিপদে আশ্বাস দিয়াছেন, আহবে উৎসাহ দিয়াছেন ।

তাহার পর যৌবনের উন্নত আশা, উন্নত কার্যাপরম্পরা, দুর্গ-বিজয়, দেশ-বিজয়, রাজ্য-বিজয়, বিপদের পর বিপদ, যুদ্ধের পর যুদ্ধ, অপূর্ণ জয়লাভ, দোঁড়িও প্রতাপ, হৃদমণীয় উজ্জাভিলাষ ! শিবজী বিংশ বৎসর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন, প্রতিবৎসরই অপূর্ণ বিজয়ে বা অসমসাহসী কার্যে অন্ধিত ও সমুজ্জল !

সে কার্যাপরম্পরা কি বার্থ ? সে আশা কি মায়াবিনী ? না, এখনও ভবিষ্যৎ আকাশে গৌরব-নক্ষত্র লীন রহিয়াছে, এখনও ভারত-বর্ষে মূলমান-রাজ্যের অবসান হইবে, হিন্দু রাজতন্ত্রবর্তীর মস্তকের উপর রাজচ্ছত্র উন্নত হইবে ?

শিবজী এই প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন, এরূপ সময় এক প্রহর রজনীর ঘণ্টা বাজিল, রাজপ্রাণীদের নাগরাধানা হইতে সে শব্দ উথিত হইয়া সমস্ত বিস্তীর্ণ নগর পরিব্যাপ্ত

হইল, নৈশ নিস্তরতার গভীর শব্দ বহুদূর পর্য্যন্ত ঐত হইল। আকাশপটে সে শব্দ এখনও লীন হয় নাই, এরূপ সময়ে শিবজী উন্নীলিত গবাক্ষধারে একটি দীর্ঘ মম্ব্যমূর্তি দেখিতে পাইলেন। কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার আকাশপটে যেন একটি দীর্ঘ নিশেই প্রতিকৃতি ।

বিস্মিত হইয়া শিবজী দণ্ডায়মান হইলেন, সেই প্রতিকৃতির প্রতি তীব্রদৃষ্টি করিলেন, কোষ হইতে অসি অর্ধেক বহির্গত করিলেন। অপরিচিত আগন্তুক তাহা গ্রাহ না করিয়া ধীরে ধীরে গবাক্ষভিতর দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, ধীরে ধীরে ফ্লাট ও জয়ুগলের উপর নৈশ শিশির যোচন করিলেন ।

শিবজী তীক্ষ্ণনয়নে দেখিলেন, আগন্তুকের মস্তকে জটাভূট, শরীরে বিভূতি, হস্তে বা কোবে অসি বা ছুরিকা, কোন প্রকার অস্ত্র নাই। তবে আগন্তুক শিবজীকে হত্যা করিবার জন্য সন্ধান প্রেরিত চর নহে। তবে আগন্তুক কে ?

তীক্ষ্ণনয়নে অন্ধকার ঘরের ভিতর শিবজীকে লক্ষ্য করিয়া আগন্তুক বলিলেন, “মহারাজের জয় হউক !”

অন্ধকারে আগন্তুকের আকৃতি দেখিয়া শিবজী তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠশব্দ শ্রবণমাত্র চিনিতে পারিলেন। জগতে প্রকৃত বন্ধু অতি বিরল। বিপদের সময় এরূপ বন্ধুকে পাইলে হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠে। শিবজী সীতাপতি গোষ্ঠামীকে প্রণাম ও সন্তোষে আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বসাইলেন, একটি দীপ জালিলেন, পরে ঔৎসুক্য সহ জিজ্ঞাসা করিলেন, “বন্ধু প্রবর ! রায়গড়ের সংবাদ কি ? আপনি তথা হইতে কবে কিরূপে আসিলেন ? এতদূরেই বা কি প্রয়োজনে আসিলেন ? অল্প নিবীধে গবাক্ষধার দিয়া আমার নিকট আসিবারই বা অর্থ কি ?

সীতাপতি । মহারাজ ! রায়গড়ের সংবাদ সমস্ত কুশল । আপনি যে সচিব-প্রবরের হস্তে রাজ্যভার স্তম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই । কিন্তু এ বিষয় আমি বিশেষ জানি না, কেন না, আপনি রায়গড় পরিত্যাগ করিবার পরে অধিক কাল আমি তথায় ছিলাম না । পূর্বেই আপনাকে বলিয়াছিলাম, আমার ব্রতসাধনার্থে আমাকে দেশে দেশে পর্যটন করিতে হয়, সেই প্রয়োজনেই যথুরা প্রভৃতি তীর্থস্থান-দর্শনার্থ দিল্লী আসিয়াছি । প্রভুর সহিত যখন সাক্ষাৎ করি, তখনই আমার সৌভাগ্য, দিবাট কি, নিশাই কি ?

শিবজী । তথাপি কোন বিশেষ কারণ না থাকিলে গবাক্ষ দিয়া নিশীথে আসিতেন না । কি কারণ, প্রকাশ করিয়া বলুন ।

সীতাপতি । নিবেদন করিতেছি, কিন্তু পূর্বে জিজ্ঞাসা করি, প্রভু আসিয়া অবধি কুশলে আছেন ?

শিবজী । শারীরিক কুশলে আছি, শত্রু-মধ্যে মনের কুশল কোথায় ?

সীতাপতি । প্রভুর সহিত ত সম্রাটের সন্ধি আছে, আপনার শত্রু কোথায় ?

শিবজী । সপের সহিত ভেকের সন্ধি কতক্ষণ স্থায়ী ? সীতাপতি ! আপনি অবশ্যই সমস্ত অবগত আছেন, আর আমাকে লজ্জা দিবেন না । যদি রায়গড়ে আপনার পরামর্শ শুনিতাম, তাহা হইলে কঙ্কদেশের পর্বত ও উপত্যকার মধ্যে অত্যাপি স্বাধীন থাকিতে পারিতাম, খল সম্রাটের কথায় বিশ্বাস করিয়া দিল্লীনগরীতে বন্দী হইতাম না ।

সীতাপতি । প্রভু, আশ্চর্য্যভরিত্তার করিবেন না, মহুখ্যামাজেই ভ্রান্তির অধীন, এ জগৎ ত্রয়-পরিপূর্ণ । বিশেষ এ বিষয়ে আপনার

দোষমাজ নাই, আপনি সন্ধিবাক্যে বিশ্বাস করিয়া, সম্রাটের প্রদর্শন করিয়া এ স্থানে আসিয়াছেন, যিনি অসম্রাটের ও কপটাচরণে সোঁতী, জগদীশ্বর অবশ্য তাঁহাকেই দণ্ড দিবেন । প্রভু ! খলতার জন্ম নাই, অজ্ঞ আরংজীব যে পাপ করিয়া আপনাকে রুদ্ধ করিয়াছেন, সেই পাপে সবংশে নিধন হইবেন । মহারাজ ! আপনি রায়গড়ে যে কথা বলিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রদেশে সে কথা এখনও কেহ বিশ্বাস হয় নাই ; আরংজীব যদি কপটাচরণ করেন, তবে মহারাষ্ট্রদেশে যে যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত হইবে, সমস্ত মোগল-সাম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া যাইবে ।

উৎসাহে, উল্লাসে শিবজীর নয়ন জলিতে লাগিল, তিনি বলিলেন, “সীতাপতি ! সে ভরসা এখনও লোপ পায় নাই । এখনও আরংজীব দেখিবেন, মহারাষ্ট্র জীবন লোপ পায় নাই ! কিন্তু হায় ! যে সময়ে আমার বীর্যগ্রগণা সৈন্তেরা মোগলদিগের সহিত, তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হইবে, সে সময়ে আমি কি দূর-দিল্লীনগরে নিশ্চেষ্ট বন্দীশ্লব্দ থাকিব ?”

সীতাপতি । যবে গগনসঙ্ঘারিবাযুকে আরংজীব জালমধ্যে রুদ্ধ করিতে পারিবেন, তখন আপনাকে দিল্লীর প্রাচীরমধ্যে বন্দী রাখিতে পারিবেন, তাহার পূর্বে নহে ।

শিবজী ঈষৎ হাস্ত করিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, “তবে বোধ করি, আপনি কোন পলায়নের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাই বলিবার অঙ্গ এক্ষণে শুণ্ডভাবে অচ্চ রত্ননীতে আমার গৃহে আসিয়াছেন ।”

সীতাপতি । প্রভু তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রভুর নিকট কিছুই গোপন রাখিতে পারি, এক্ষণ সম্ভাবনা নাই ।

শিবজী । সে উপায় কি ?

সীতাপতি। অল্পকাল রজনীতে প্রভু অনারাগে ছদ্মবেশে গৃহ হইতে বাহির হইতে পারেন। দিল্লীর চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, কিন্তু পূর্বদিকে এক স্থানে সেই প্রাচীরে লৌহশলাকা স্থাপিত হইয়াছে, তদুপরা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করা মহারাজীর বীরের অসাধ্য নহে; অপরপার্শ্বে ক্ষুদ্র তরীতে আটজন মাল্লা আছে, নিমেষমধ্যে মথুরায় পৌছিবেন। তথায় প্রভুর অনেক বন্ধু আছেন, অনেক হিন্দু-দেবালয়ে অনেক ধর্ম্মাশ্রয় পুরোহিত আছেন, তথা হইতে প্রভু অনারাগে স্বদেশে যাইতে পারিবেন।

শিবজী। আমি আপনার উদ্ভোগে তুষ্ট হইলাম, আপনি যে প্রকৃত বন্ধু, তাহার আর একটি নিদর্শন পাইলাম; কিন্তু প্রাচীর উল্লঙ্ঘনের সময় যদি কেহ আমাকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে পলায়ন দুঃসাধ্য, আরং-জীবের হস্তে মৃত্যু নিশ্চয়।

সীতাপতি। প্রাচীরের যে স্থানে লৌহ-শলাকা দেওয়া আছে, তাহার অনতিদূরে আপনার সেনার মধ্যে দশ জন তীরন্দাজ ছদ্মবেশে লুক্কায়িত আছে। যদি কেহ প্রভুকে দেখিতে পায় বা গতিরোধ করে, তাহার মৃত্যু নিশ্চয়।

শিবজী। ভাল, নৌকায় গমনকালে তীরস্থ কোন প্রহরী যদি সন্দেহ-প্রযুক্ত নৌকা ধরিতে চাহে?

সীতাপতি। অষ্টজন ছদ্মবেশী নৌকা-বাহক আপনারই অষ্টজন ঘোড়া। তাহা-দিগের শরীর বর্ণাচ্ছাদিত, তুণ পরিপূর্ণ। সহসা নৌকা কেহ সোধ করিতে পারে, তাহার সম্ভাবনা নাই।

শিবজী। মথুরা পৌছিয়া যদি প্রকৃত বন্ধু না পাই?

সীতাপতি। আপনার পেশওয়ার

ভগিনীপতি মথুরায় আছেন, তিনি আপনার চির-পরিচিত ও বিশ্বস্ত, তাহা আপনি জানেন। আমি অত্র তাঁহার নিকট হইতে আসিতেছি। তিনি সমস্ত প্রস্তুত রাখিয়াছেন, তাঁহার পত্র পাঠ করুন।

বস্ত্রের ভিতর হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া সীতাপতি, শিবজীর হস্তে দিলেন। শিবজী ঈষৎ হাস্ত করিয়া পত্র ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, “আপনি পাঠ করিয়া শুনান।”

সীতাপতি লজ্জিত হইলেন, তাঁহার তখন স্মরণ হইল যে, শিবজী আপনার নাম লিখিতেও জানিতেন না, কখনও পাপড়া শিখেন নাই।

সীতাপতি পত্র পাঠ করিয়া শুনা গেল। বাহা বাহা আবশ্যক, মুরেশ্বরের কুটুম্ব সমস্ত স্থির করিয়াছেন, পত্রে বিস্তীর্ণ লেখা আছে।

শিবজী বলিলেন, “গোস্থামিন্! আপ-নার সমস্ত জীবন বাগযজ্ঞে অতিবাহিত হইয়াছে, কখনই বোধ হয় না। শিবজীর প্রধান মন্ত্রীও আপনা অপেক্ষা স্তম্ভ উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিত না। কিন্তু এখনও একটি কথা আছে। আমি জানাইলে আমার পুত্র কোথায় থাকিবে, আমার বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথপন্থ ও প্রিয়হৃদ্য তন্নজী মালতী কোথায় থাকিবে? আমার বিশ্বস্ত সৈন্তগণই বা কিরূপে আরংজীবের কোপ হইতে পরিগ্রাণ পাইবে?”

সীতাপতি। আপনার পুত্র, প্রিয়হৃদ্য ও মন্ত্রিবর আপনার সন্তিত অল্প রজনীতেই যাইতে পারে। আপনার সেনাগণ দিল্লীতে থাকিলে হানি নাই, আরংজীব তাহাদিগকে লইয়া কি করিবেন, অগত্যা ছাড়িয়া দিবেন।

শিবজী। সীতাপতি! আপনি আরং-জীবকে জানেন না; তিনি ভ্রাতৃদিগকে

৭৫ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন।

সীতাপতি। যদি আপনার সেনাগণের উপর কঠোর আদেশ দেন, কোন্ মহারাজী-সেনা আপনার নিরাপদ-বার্তা প্রবণ করিয়া উল্লাসের সহিত প্রাণবিসর্জন না করিবে?

শিবজী ক্ষণেক নীরবে চিন্তা করিলেন, পরে মহামুগ্ধব দীরে দীরে বলিলেন, “গোস্বামিন্! আমি আপনার চেষ্টা, আপনার উদ্‌যোগের জন্ত আপনার নিকট চির-বাধিত রহিলাম, কিন্তু শিবজী তাহার বিশ্বস্ত ও চিরপালিত ভৃত্যদিগকে বিপদে রাখিয়া আপনার উদ্ধার চাহে না, এরূপ ভীকৃতার কার্য কখনও করিবে না। সীতাপতি! অস্ত্র উপায় উদ্ভাবন করুন, নচেৎ চেষ্টা ত্যাগ করুন।”

সীতাপতি। অস্ত্র উপায় নাই।

শিবজী। তবে সময় দিন, শিবজীর এই প্রথম বিপদ নহে, উপায় উদ্ভাবনে শিবজী কখনও পরাশ্রয় হয় নাই।

সীতাপতি। সময় নাই। অস্ত্র রজনীতে প্রভু পলায়ন করুন, নতুবা কল্যাণ আপনার পলায়ন নিষিদ্ধ।

শিবজী। আপনি কোন্ বোগবলে এরূপ জানিলেন, জানি না, কিন্তু আপনার কথা যদি যথার্থই হয়, তথাপি শিবজীর অস্ত্র উত্তর নাই। শিবজী আশ্রিত প্রতিপালিত লোককে বিপদে রাখিয়া আত্মপরিজ্ঞাপ করিবে না। গোস্বামিন্! এ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নহে।

সীতাপতি। প্রভু! বিশ্বাসঘাতকের শাস্তিদান করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, আরাজীবকে শাস্তিদান করুন। সেই দূর-মহারাজীদেশে প্রত্যাবর্তন করুন, তথা হইতে সাগরতরঙ্গের স্রাব সমরতরঙ্গ প্রবাহিত করুন। অচিরে

আরাজীবের অধঃপতন হইবে, অচিরে এই পাপপূর্ণ সাম্রাজ্য অতুল জলে মগ্ন হইবে।

শিবজী। সীতাপতি! বিনি ব্রহ্মাণ্ডের রাজা, তিনি বিশ্বাসঘাতকতার শাস্ত দিবেন, আমার কথা অবধারণা করুন, তাহার অধিক বিলম্ব নাই। শিবজী আশ্রিতকে ত্যাগ করিবে না।

সীতাপতি। প্রভু! এখনও এ প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করুন, এখনও বিবেচনা করিয়া আদেশ করুন, কল্যাণ বিবেচনার সময় থাকিবে না, কল্যাণ আপনি বন্দী।

শিবজী। তাহাই হউক। শিবজী আশ্রিতকে ত্যাগ করিবে না, শিবজীর এ প্রতিজ্ঞা অবিচলিত।

সীতাপতি নীরব হইয়া রহিলেন। শিবজী চাহিয়া দেখিলেন, তাহার নয়নে জল-বিন্দু। তখন সন্ধ্যা সীতাপতির হস্ত ধরিয়া বলিলেন, “গোস্বামিন্! তব গ্রহণ করিবেন না। আপনার বস্তু, আপনার চেষ্টা, আপনার ভালবাসা আমি জীবন থাকিতে তুলিব না। রায়গড়ে আপনার বীরপরামর্শ ও দিল্লীতে আমার উদ্ধারার্থে আপনার এতদূর উদ্‌যোগ চিরকাল আমার হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে। আপনি আমার সহিত অবস্থান করুন, আপনার পরামর্শে শীঘ্র সূকলেরই উদ্ধারসাধন করিব।”

সীতাপতি। প্রভু! আপনার মিষ্টবাক্যে যথোচিত পুরস্কৃত হইলাম, অগরীশ্বর জানেন, আপনার সঙ্গে থাকা ভিন্ন আমার আর অস্ত্র অভিলাষ নাই। কিন্তু আমার ব্রত অলঙ্ঘনীয়, ব্রতসাধনের জন্ত নানা স্থানে নানা কার্যে বাইতে হয়, এখানে অবস্থিতি অসম্ভব।

শিবজী। এ কি অসাধারণ ব্রত, জানি না, সীতাপতি! এ কি কঠোর ব্রতধারণা করিয়াছেন?

সীতাপতি। সমস্ত এক্ষণে কিরূপে বিস্তার করিয়া বলিব, সাধনের একটি অঙ্গ এই যে, নিবসে গাজদর্শন নিবন্ধ।

শিবজী। ভাল, এত্রেত কি উদ্দেশ্যে ধারণ করিয়াছেন?

কণেক চিন্তা করিয়া সীতাপতি বলিলেন, “আমার ললাটে একটি অমঙ্গল লিখিত আছে, আমার ইষ্টদেবতা, বাহাকে আমি বালাকাল হইতে পূজা করিয়াছি, বাহার নাম জপ করিয়া জীবনধারণ করিয়াছি, বিধির নির্বন্ধে তিনি আমার উপর বিমুখ। সেই অমঙ্গলখণ্ডনার্থ ব্রত-ধারণ করিয়াছি।”

শিবজী। এ অমঙ্গল কে গণনা করিয়া আপনাকে জানাইল? কেই বা আপনাকে অমঙ্গলখণ্ডনার্থ এ বিবম ব্রত ধারণ করিতে বলিল?

সীতাপতি। কার্যবশতঃ আমি স্বয়ংই এটি জানিতে পারিলাম, কেশানী-মন্দিরে একজন আমাকে এই ব্রত ধারণ করিবার আদেশ করিয়াছেন। যদি সকল হই, সমস্ত আপনার নিকট নিবেদন করিব, যদি অকৃতার্থ হই, তবে এ অকিঞ্চিৎকর জীবন ত্যাগ করিব। বাহার পূজার্থ জীবনধারণ করিতেছি, তিনি বিমুখ হইলে এ জীবনে আবশ্যক কি?

শিবজী। সীতাপতি! বাহা বলিলেন, বধার্থ। বাহার জন্ত প্রাণপণ করি, বাহার জন্ত আত্মসমর্পণ করি, তাহার অসন্তোষ অপেক্ষা জগতে মর্ষভেদী দুঃখ আর নাই।

সীতাপতি। প্রভু! আপনি কি এ বাতনা কখনও ভোগ করিয়াছেন?

শিবজী। জগদীশ্বর আমাকে মার্কনা করুন, আমি একজন নির্দোষী বীরপুরুষকে এই বাতনা দিয়াছি। সে বালকের কথা

মনে হইলে এখনও আমার সময়ে সময়ে হৃদয়ে বেদনা হয়।

সীতাপতি। সে হতভাগার নাম কি? শিবজী বলিলেন, “রঘুনাথজী হাবিলদার!”

ঘরের দীপ সহসা নির্বাণ হইল। শিবজী, প্রদীপ জালিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় সীতাপতি বলিলেন, “দীপ অনাবশ্যক, বলুন, শ্রবণ করিতেছি।”

শিবজী। আর কি বলিব! তিন বৎসর অতীত হইয়াছে, সেই বালকবৎসী বীরপুরুষ আমার নিকট আইসে ও সৈনিকের কার্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহার বদনমণ্ডল উদার। সীতাপতি। আপনারই স্ত্রায় তাহার উন্নত ললাট ও উজ্জ্বল নয়ন ছিল। বালকের বয়স আপনা অপেক্ষা অল্প, আপনার স্ত্রায় তাহার বুদ্ধির প্রখরতা ছিল না, কিন্তু সেই উন্নত হৃদয়ে আপনার স্ত্রায়ই দুর্দমনীয় বীরত্ব ও সাহস সর্বদা বিরাজ করিত। আপনার বলিষ্ঠ উন্নত দেহ বখন দেখি, আপনার পরিষ্কার কণ্ঠস্বর যখন শুনি, আপনার বীরোচিত বিক্রম যখন আলোচনা করি, সেই বালকের কথা সর্বদাই হৃদয়ে জাগরিত হয়।

সীতাপতি। তাহার পর?

শিবজী। সেই বালককে যে দিন প্রথম দেখিলাম, সেই দিন প্রকৃত বীর বলিয়া চিনিলাম, সে দিন আমার নিজের একখানি অসি তাহাকে দান করিলাম, রঘুনাথ সে অসির অবমাননা করে নাই। বিপদের সময় সর্বদা আমার ছায়ার স্ত্রায় আমার নিকটে থাকিত, যুদ্ধের সময় দুর্দমনীয় তেজে শত্রু-রেণা ভেদ করিয়া অগ্রসর হইত। এখনও বোধ হয়, তাহার সেই বীর আকৃতি, সেই গুহু গুহু কৃকাকেশ, সেই উজ্জ্বল নয়ন আমি দেখিতে পাইতেছি।

সীতাপতি । তাহার পর ?

শিবজী । সেই বালক এক যুদ্ধে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিল, অস্ত্র এক যুদ্ধে তাহারই বিক্রমে হৃগ্জন হইয়াছিল, অনেক যুদ্ধে সে আপন অসাধারণ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল ।

সীতাপতি । তাহার পর ?

শিবজী । আর জিজ্ঞাসা করেন কি জন্ত ? আমি একদিন ভ্রমে পতিত হইয়া সেই চির-বিবাসী অশুচিরকে অবমাননা করিয়া কার্য্য হইতে দূর করিয়া দিলাম । শেষ পর্য্যন্তও রঘুনাথ একটিও কর্কশ কথা উচ্চারণ করে নাই, বাইবার সময়ও আমার দিকে মন্তক নত করিয়া চলিয়া গেল ।

শিবজীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, নয়ন দিয়া অশ্রু বহিয়া পড়িতে লাগিল । অনেকক্ষণ কেহ কথা কহিতে পারিলেন না । অনেকক্ষণ পরে সীতাপতি বলিলেন, “তাহাতে আক্ষেপের কারণ কি ? দোষীর দণ্ডই রাজধর্ম্ম ।”

শিবজী । দোষী ? রঘুনাথের উন্নত চরিত্রে দোষ স্পর্শে না, আমি কি কৃষ্ণে ভ্রান্ত হইলাম, জানি না । রঘুনাথের যুদ্ধস্থানে আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল, আমি তাহাকে বিজ্রোহী মনে করিলাম । মহাহতভব জয়সিংহ পরে এ বিষয় অহুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে, তাঁহার একজন পুরোহিতের নিকট রঘুনাথ যুদ্ধপূর্বে আশীর্বাদ লইতে গিয়াছিল, সেই জন্তই বিলম্ব হইয়াছিল । নির্দোষীকে আমি অবমাননা করিয়াছিলাম, শুনিয়াছি, সেই অবমাননার রঘুনাথ প্রাণত্যাগ করিয়াছে । যুদ্ধে সে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, আমি তাহার প্রাণবিনাশ করিয়াছি ।

শিবজীর কথা সমাপ্ত হইল, তাহার বাকশক্তি রুদ্ধ হইল, তিনি অনেকক্ষণ নীরব

হইয়া রহিলেন । অনেকক্ষণ পরে ডাকিলেন,

“সীতাপতি !”

কোনও উত্তর পাইলেন না । কিঞ্চিৎ বিন্মিত হইয়া প্রাণীপ জাগিলেন ; দেখিলেন, সীতাপতি ঘরের মধ্যে নাই ।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ ।

—*—
আরংজীব ।

সর্ব্বশাস্ত্র পড়ি বেটা হলি হতমূর্খ ।

বল্লি কথা বুঝিস্ নাই এই বড় দুঃখ ॥

কতিবাস ওঝা

পরদিন প্রায় এক প্রহর বেলায় সময় শিবজীর নিজাভঙ্গ হইল । তিনি জাগরিত হইয়াই রাজপথে একটি গোলযোগ শুনি-লেন ; উঠিয়া গবাক্ষ দিয়া নিরাসিকে চাহিলেন, বাহা দেখিলেন, তাহাতে চকিত ও স্তম্ভিত হইলেন ।

দেখিলেন, বাটীর পক্ষাতে, দুই পাশে সমুখদ্বারে অস্ত্রহস্তে প্রহরীগণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে । বিশেষ পরিচয় না পাইলে প্রহরিগণ বাহিরের লোককে গৃহে প্রবেশ করিতে দিতেছে না, গৃহের লোককে বাহিরে বাইতে দিতেছে না । দেখিয়া সীতাপতির কথা স্মরণ হইল—কল্যাণ শিবজী পলাইতে পারিতেন, অস্ত্র তিনি আরংজীবের বন্দী !

তখন শিবজী বিশেষ অহুসন্ধান করিতে লাগিলেন ; জানিলেন যে, তিনি সম্রাটের নিকট স্বদেশে বাইবার প্রার্থনা করিয়া অবধি আরংজীবের মনে সন্দেহের উল্লেখ হইয়াছিল এবং সেই সন্দেহ প্রযুক্ত সত্ৰাই নগরের কোতোয়ালকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, শিবজীর বাটীর চতুর্দিকে দিবা-রাজ প্রহরী থাকিবে, শিবজী বাটী হইতে

কোথাও যাইলে সেই লোক সঙ্গে সঙ্গে যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিবে। শিবজী তখন বুঝিতে পারিলেন যে, সীতাপতি গোলামী আরংজীবের এই আদেশের কথা জানিতে পারিয়া পূর্বেই শিবজীর পলায়নের সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন এবং রজনী দ্বিপ্রহরের সময় সংবাদ দিতে আসিয়াছেন। শিবজী মনে মনে সীতাপতিকে সহস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

আরংজীবের কপটচারিতা এতদিনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। সম্রাট প্রথমে শিবজীকে বহু সমাদর পূর্বক পত্র লিখিয়া দিল্লীতে আহ্বান করিলেন, শিবজী আসিলে তাঁহাকে রাজসভার অবমাননা করিলেন, পরে রাজসভার যাইতে নিবেদন করিলেন, তৎপরে দেশে প্রত্যাগমন করি নিবেদন করিলেন, তৎপরে প্রকৃত বন্দী করিলেন। কোন কোন সর্প গোমহিষাদি ভক্ষণ করিবার পূর্বে যেরূপ আপন দীর্ঘ শরীর ভক্ষার চতুর্দিকে জড়াইয়া জড়াইয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করে, পরে ক্রমে চুষিতে চুষিতে ধীরে ধীরে উদরস্থ করে, ক্রুর আরংজীবও সেইরূপ কপটতাজালে শিবজীকে ক্রমে সম্পূর্ণ অধীন করিয়া পরে ধীরে ধীরে বিনাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। মানসচক্ষে অতীত ও বর্তমান সমুদায় ঘটনা যুহুর্ভ্রমধ্যে দৃষ্টি করিয়া শিবজী শত্রুর নিগূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন, বুঝিয়া রোষে গজিয়া উঠিলেন। ক্ষতপদবিক্ষেপে সেই গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অধরোষ্ঠের উপর দস্ত স্থাপিত রহিয়াছে, নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। অনেকক্ষণ পর অর্দ্ধক্ষুট-স্থরে বলিলেন, “আরংজীব! শিবজীকে এখনও জান না, চতুরভায় আপনাকে অবিভীয় মনে

কর, কিন্তু শিবজীও সে বিচার বালক নহে এই ঋণ এক দিন পরিশোধ করিব, সে দিন দাক্ষিণাত্য হইতে হিন্দুস্থান পর্যন্ত সময়ায়ি প্রজ্জলিত হইবে।”

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া শিবজী বিবৃন্ত মন্ত্রী রঘুনাথপন্থকে ডাকাইলেন। প্রাচীন ছায়শাস্ত্রী উপস্থিত হইলেন, নিঃশব্দে সম্মুখে উপবেশন করিলেন। শিবজী বলিলেন, “পণ্ডিতশ্রবর! আপনি আরংজীবের খেলা দেখিতেছেন, এই খেলা আমাদেরও খেলিতে হইবে, আপনার প্রসাদে শিবজী এ খেলার অপরিপক্ব নহে। অদ্য আমরা বন্দী হইব, আমি কলা রজনীতে ইহার সংবাদ পাইয়াছিলাম; কিন্তু অমুচরবর্গকে পূর্বে পরিত্রাণ না করিয়া আমার আত্মপরিত্রাণের ইচ্ছা নাই, সেই বিষয়ে আপনার উপদেশ কি?”

ছায়শাস্ত্রী অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, “আপনার অমুচরদিগের স্বদেশগমনের জন্য সম্রাটের নিকট অহুমতি প্রার্থনা করুন। এক্ষণে আপনাকে বন্দী করিয়াছেন, আপনার অমুচরসংখ্যা যত হ্রাস হয়, তাহাতে সম্রাট আত্মদ্রোহিত ভিন্ন দুঃখিত হইবে না। আমি বিবেচনা করি, অহুমতি চাহিলেই পাইবেন।”

শিবজী। মন্ত্রিবর, আপনার পরামর্শই শ্রেয়ঃ, আমারও বোধ হয়, ধৃত আরংজীব এ বিষয়ে আপত্তি করিবে না।

সেই মর্মে একখানি আবেদন-পত্র প্রস্তুত হইল। শিবজী বাহা মনে করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল, শিবজীর অমুচরসকল দিল্লা হইতে প্রস্থান করিবে শুনিয়া সম্রাট আত্মদ্রোহিত হইয়া তাহাদিগের যাইবার জন্য এক একখানি অহুমতিপত্র দান করিলেন। শিবজী কয়েকদিনমধ্যে সেই সমস্ত অহুমতিপত্র প্রাপ্ত হইলেন; মনে মনে বলিলেন

“মুখ! শিবজীকে বন্দী রাখিবে? এখন একজন অহুচরের বেশ ধরিয়া ইহার মধ্যে একখানি অহুমতিপত্র লইয়া দিল্লীত্যাগ করিলে কি করিতে পার? বাহা ইউক, অহুচরবর্গ এখন নিরাপদে যাউক, শিবজী আপনার জন্ত উপায় উদ্ভাবন করিতে সক্ষম।”

পাঠক! যিনি অসাধারণ চতুরতা, বুদ্ধি-কোশল ও রণনৈপুণ্যে ভ্রাতৃগণকে পরাস্ত করিয়া, বুদ্ধ পিতাকে বন্দী করিয়া, দিল্লীর ময়রসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, যিনি কাশ্মীর হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত সমস্ত আর্য্যাবর্তের অধিপতি হইয়াও পুনরায় দাক্ষিণাত্য-দেশ জয় পূর্বক সমগ্র ভারতের একাধীশ্বর হইবার মহৎ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যিনি অসামান্য চতুরতা দ্বারা মহাবীর শূচতুর শিবজীকেও বন্দী করিয়াছিলেন, চল, একবার সেই কপটাচারী, অদূরদর্শী আরংজীবের প্রাসাদান্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মনের ভাবগুলি নিরীক্ষণ কর।

রাজকার্য্য সমাধা হইয়াছে, আরংজীব “গোসলখানা” নামক একটি ঘরে উপবেশন করিয়া আছেন। সেটি মন্ত্রীদিগের সহিত গুপ্ত পরামর্শের স্থল, কিন্তু অতঃ আরংজীব একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। কখন তাঁহার ললাটে গভীর চিন্তার রেখা দেখা যাইতেছে, কখন বা উজ্জ্বল নয়নে রোষ বা অভিমান বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞার লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, কখন বা মন্ত্রণাসফলতা-জনিত সন্তোষে তাঁহার ওষ্ঠ-প্রান্ত হান্তরেখার অঙ্কিত হইতেছে। সম্রাট্ কি করিতেছেন? আপন বুদ্ধিবলে সমস্ত হিন্দুস্থানের একাধীশ্বর হইয়াছেন, সেই কথা স্মরণ করিতেছেন? হিন্দুধর্মের আরও অবমাননা অথবা রাজপুত বা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আরও পদদলিত করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন? শিবজীকে বন্দী করিয়া মনে মনে

উল্লাসিত হইতেছেন? জানি না, সম্রাট্ কি চিন্তা, তাঁহার সভার মধ্যে, ভারতবর্ষের মধ্যে কোনও মন্ত্রীকে সন্দেহমনা আরংজীব কখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না, মনের ভাব বলিতেন না। নিজের বুদ্ধিপ্ৰার্থ্যে সকলকে পুস্তলিকার স্বায় চালাইবেন, সমগ্র দেশ সুন্দর শাসন করিবেন, আরংজীবের এই উদ্দেশ্য। বাস্তবিক যেক্ষণ নিজের মস্তকে এই জগৎ ধারণ করিতেছেন, বিশ্রাম চাহেন না, কাহারও সহায়তা চাহেন না, আরংজীব নিজের অসাধারণ মানসিক বলে সম্রাজ্যের শাসনকার্য্য একাকী বহন করিবার মানস করিয়াছিলেন, কাহারও পরামর্শ চাহিতেন না।

অনেকক্ষণ উপবেশন করিয়াছিলেন এরূপ সময় একজন সৈনিক তসলীম করিয়া বলিল, “সম্রাট্‌র জয় ইউক! জীচাপনা! দানেশমন্দ্ নামক আপনার সভাসদ আপনার সাক্ষাৎ-অভিলাষী, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন।” সম্রাট্ দানেশমন্দ্কে আসিতে আজ্ঞা দিলেন, চিন্তা-রেখাগুলি ললাটে হইতে অপমৃত করিলেন, মুখে সুন্দর হাস্য ধারণ করিলেন।

দানেশমন্দ্ আরংজীবের মন্ত্রী ছিলেন না, রাজকার্য্যে পরামর্শ দিতে সাহস করিতেন না, তবে তিনি পারস্য ও আরবী ভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত, সুতরাং সম্রাট্ তাঁহাকে অতিশয় সম্মান করিতেন, কখন কখন কোন কোন কথায় বাক্যচ্ছলে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। উদারচেতা দানেশমন্দ্ প্রায়ই উদার সরল পরামর্শ দিতেন, এমন কি, আরংজীবের জ্যেষ্ঠ দারাবখন বন্দী হন, দানেশমন্দ্ তাঁহার প্রাণরক্ষার পরামর্শই দিয়াছিলেন। এবং বিধি পরামর্শ কুটিল আরংজীবের মনোগত হইত না, আরংজীব তাঁহাকে

অরুণাচল ও অমরনাথ পাহাড়া মনে করিতেন, তথাপি তাঁহার বিজ্ঞা, ধন ও পদমর্যাদায় জন্ত সম্যক্ আদর করিতেন। সরলস্বভাব বুদ্ধ দানেশমন্দ্ সন্মুখক অভিবাদন করিয়া উপবেশন করিলেন।

দানেশমন্দ্। এ সময়ে জাঁহাপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসা দাসের ধৃষ্টতা, কেন না, এ সময় সম্রাট, রাজকাৰ্য্যের পর বিশ্রাম করেন। তবে যে আসিয়াছি, কেবল আপনি অগ্রগ্রহ করেন এই নিমিত্ত। পারস্ত-কবি সুলতান লিখিয়াছেন, সূর্য্যের দিকে জগতের সকল প্রাণী সকল সময়ে চাহিয়া দেখে, সূর্য্য কি তাহাতে বিরক্ত বা ক্রিগদানে বিরত হন?

সম্রাট সন্তোষবদনে বলিলেন, “দানেশমন্দ্! অস্তুর সম্বন্ধে বাহাই হউক, আপনি সর্ব্বসময়েই সমাদরের পাত্র।”

কণেক এইরূপ মিষ্টালাপ হইলে পর দানেশমন্দ্ অত্র কথা আনিলেন, বলিলেন, জাঁহাপনা! আলমগীর নাম সার্থক করিবেন! সমস্ত হিন্দুস্থান আপনার পদতলে রহিয়াছে, এক্ষণে দাক্ষিণাত্য জয় করিতেও বড় বিলম্ব নাই।”

ঈষৎ হাস্ত করিয়া আরংজীব বলিলেন, “কেন, সে বিষয়ে আমার কি উত্তোগ দেখিলেন?”

দানেশমন্দ্। দক্ষিণদেশের প্রধান শত্রু আপনার পদতলে।

আরংজীব। শিবজীর কথা বলিতেছেন? হাঁ, ইন্দুর কলে পড়িয়াছে।

তৎক্ষণাৎ আপন মন্তব্য গোপনার্থে বলিলেন, “দানেশমন্দ্! আপনি আমাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই জানেন, দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে সর্ব্বদাই সম্মান করা আমার উদ্দেশ্য। শিবজী ধৃষ্ট ও বিদ্রোহী হউক, যোদ্ধা বটে,

তাহাকে সম্মানার্থই দিল্লীতে আনিয়াছিলাম, রাজসভায় সমুচিত সম্মান করিয়া তাহাকে বিদায় দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সে একরূপ মূর্থ যে, রাজসভায় অসদাচরণ করিয়াছিল। আমি তাহাকে বন্দী করিতে বা তাহার প্রাণ লইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, সুতরাং অত্র শাস্তি না দিয়া কেবল রাজসভায় আশিতে নিবেদন করিয়াছিলাম। এখন শুনিতেছি যে, দিল্লীর মধ্যেই সে অনেক সম্রাসী ও বিদ্রোহীর সহিত পরামর্শ করে, সুতরাং কোনও রূপ অনিষ্ট করিতে না পারে, এই জন্তই কোতোয়ালকে দৃষ্টি রাখিতে কহিয়াছি, কয়েকদিন পর সম্মান পূর্ব্বক বিদায় দিব।”

দানেশমন্দ্। সম্রাটের এ আদেশ শুনিয়া আহলাদিত হইলাম।

আরংজীব। কেন?

উদারচেতা দানেশমন্দ্ বলিলেন, “সম্রাটকে পরামর্শ দিই, আমার কি সাধ্য, কিন্তু জাঁহাপনা! যদি শিবজীর প্রতি দয়াসু আচরণ না করিতেন, যদি তাহাকে চিরকালের জন্ত বন্দী করিতেন, তাহা হইলে মন্দ লোকে নানারূপ অধ্যাত্তি করিত, বলিত যে, শিবজীকে আহ্বান করিয়া বন্ধ করা সম্ভবত নয়।”

আরংজীব ঈষৎ কোপ সঙ্কোচন করিয়া সেইরূপ ভাস্তবদনে বলিলেন, “দানেশমন্দ্! মন্দলোকের কথায় দিল্লীধরের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, তবে সুবিচার ও দয়া সিংহাসনের শোভন, সুবিচার করিয়া শিবজীর দোষের জন্ত তাহাকে সতর্ক করিয়া দিব, পরে দয়া প্রকাশে তাহাকে সম্মান বিদায় দিচ্ছি।”

দানেশমন্দ্। একরূপ সদাচারণেই জাঁহাপনার প্রেপিতামহ আকবরশাহ দেশ-শাসন করিয়াছিলেন, একরূপ সদাচরণে আপনারও ধ্যাত্তি ও ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে।

আরাজীব। সে কিরূপ ?

দানেশমন্। সম্রাটের অগোচর কিছুই নাই। সেখান, আব্বাস শাহ বখশ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন সমস্ত সাম্রাজ্য শত্রুশত্রু ছিল; রাজস্থানে, বিহারে, দাক্ষিণাত্যে, সর্বস্থানেই বিদ্রোহী ছিল, দিল্লীর সন্নিকট স্থানও শত্রুশত্রু ছিল না। তাঁহার মৃত্যুকালে সমস্ত সাম্রাজ্য নিঃশত্রু ও নিরীক-রোধ হইয়াছিল, বাহারা পূর্বে পরম শত্রু ছিল, সেই রাজপুতেরাই বাদশাহের অধীনতা-স্বীকার করিয়া কাবুল হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত দিল্লীররের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করে। জয়সাধন কিরূপে হইয়াছিল ? কেবল বাহ-বলে ? কেবল সাহসে ? তৈমুরের বংশে কাহারও সাহব বা বাহবলের অভাব নাই, তবে আর কেহ একরূপ জয়সাধন করিতে পারেন নাই কি জন্ত ? না, জাঁহাপনা ! কেবল সদাচরণেই একরূপ জয়লাভ হইয়াছিল। তিনি শত্রুদিগের প্রতি সদাচরণ করিতেন, অধীন হিন্দুদিগকে বিশ্বাস করিতেন, হিন্দু-রাও এবং বিধ সম্রাটের বিশ্বাসভাজন হইবার চেষ্টা করিত। মানসিংহ, টোডরমল্ল, বীরবল প্রভৃতি হিন্দুগণই মুসলমান-সাম্রাজ্যের স্তম্ভ-স্বরূপ হইয়াছিলেন। উত্তম ব্যক্তিকেও অবিশ্বাস করিলে সে ক্রমে অধম হইয়া যায়, অধম কাকেরের প্রতিও সদাচরণ ও বিশ্বাস করিলে তাহারা ক্রমে বিশ্বাসযোগ্য হয়, মানবের এই প্রকৃতি, শাস্ত্রের এই লিখন। আমাদের দক্ষিণদেশের মুক্কে শিবজী অনেক সহায়তা করিয়াছেন, জাঁহাপনা ! তাঁহাকে সম্মান করিলে তিনি ৩০ দিন জীবিত থাকি-বেন, দক্ষিণদেশে মোগল-সাম্রাজ্যের স্তম্ভ-স্বরূপ থাকিবেন।

দানেশমন্। কি জন্ত সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, পাঠক বোধ

হয় এক্ষণে বুঝিয়াছেন। দিল্লীর শিবজীকে আহ্বান করিয়া বন্দী করার জ্ঞানী ও সমা-চারী মুসলমান সভাসদ্যাজ্ঞাই লক্ষিত হইয়া-ছিলেন। দানেশমন্কে সম্রাট সম্মান করিতেন, তিনি কোমরপে কথাগুলো সম্রা-টের কুপ্রভৃতি ও মন্ড উদ্দেশ্য তাঁহাকে বেধা-ইয়া দিবার জন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন। শিব-জীর প্রতি উদ্যচরণ করিয়া সম্রাট, তাঁহাকে স্বদেশে বাইতে দেন, দানেশমন্ এই উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন। দানেশমন্ জানিতেন না যে, হস্ত দ্বারা একাও ভূধরকে বিচালিত করা সম্ভব, কিন্তু পরামর্শ দ্বারা আরাজীবের দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা ও গভীর উদ্দেশ্যগুলি বিচালিত করা অসম্ভব।

দানেশমন্দের উপর সারগর্ভ কথাগুলি কুটিল আরাজীবের নিকট অতিশয় নির্দো-ধের কথা হইয়া বোধ হইল। তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, “হাঁ, দানেশমন্ যেরূপ শাস্ত্রবিদ্যার, মানবজন্মেরও সেইরূপ পাঠ করিয়াছেন দেখিতেছি। দক্ষিণদেশে শিবজী স্তম্ভ স্থাপিত করিবে, রাজস্থানে ত বিদ্রোহিগণ স্তম্ভস্থাপন পূর্বেই করিয়াছে। কাশ্মীর পুনরায় স্বাধীন করিয়া দিব ও বঙ্গ দেশে পাঠানদিগকে পুনরায় সমাদর পূর্বক আহ্বান করিব। এই চতুঃস্থলের উপর মোগলসাম্রাজ্য সুন্দর ও সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত হইবে।”

দানেশমন্দের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল, তিনি বীরে বসিলেন, “সম্রাটের পিতা দাসকে অহুগ্রহ করিতেন, সম্রাটও বখেটে অহুগ্রহ করেন, সেই জন্ত কখন কখন মনের কথা বলি, নচেৎ জাঁহাপনাকে পরামর্শ দিই, একরূপ বিস্তাবৃদ্ধি নাই।”

আরাজীব দানেশমন্কে নির্দোষ সরল ব্যক্তি জানিয়াও তাঁহার সেই সরলতার জন্ত

তাঁহাকে ভালবাসিতেন, তাঁহাকে কষ্ট দিয়া ছেন দেখিয়া বলিলেন, “দানেশমন্দ্ ! আমার কথায় নোব গ্রহণ করিও না। অকি-বরশাহ বুদ্ধিমান ছিলেন সন্দেহ নাই ; কিন্তু কাকের ও মূল্যমান সমানতক্কে দেখিয়া তিনি কি ধর্মসঙ্গত আচরণ করিয়াছিলেন ? আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, আমাদের সামাজ্য দৈনিক কার্য্য-সম্পাদনকালে দেখিতে পাই যে, আপনি করিলে যেরূপ হয়, পরের হস্তে সেরূপ হয় না। এরূপ বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যশাসনকার্য্যও সেইরূপ পরের উপর বিশ্বাস না করিয়া স্বয়ং সম্পাদন করিলে কি ভাল হয়ট্টনা ? নিজ বাহবলে যদি সমগ্র ভারতবর্ষ শাসন করিতে সমর্থ হই, কি অল্প যুগিত কাকেরদিগের সহায়তা গ্রহণ করিব ? আরংজীব বালাকানাবদি নিজ অসির উপর নির্ভর করিয়াছে, নিজ অসি দ্বারা সিংহাসনের পথ পরিষ্কার করিয়াছে ও নিজ অসি দ্বারা দেশশাসন করিবে, কাহারও সহায়তা চাহিবে না, কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না।”

দানেশমন্দ্, জাঁহাঙ্গনা ! স্বহস্তে দৈনিক কার্য্য নির্বাহ করা যায়, কিন্তু এরূপ সাম্রাজ্য-শাসন কি সহায়তা ভিন্ন সম্পাদিত হয় ? বঙ্গদেশ, দক্ষিণদেশ প্রভৃতি স্থানে কি সর্ব-সময়ে আপনি বর্তমান থাকিতে পারেন ? অল্প কাহাকেও নিযুক্ত না করিলে কার্য্য কিরূপে সম্পাদিত হইবে ?

আরংজীব। অবশ্য ভৃত্য নিযুক্ত করিব, কিন্তু তাঁহারা চিরকাল ভৃত্যের স্থায় থাকিবে, যেন প্রভু হইতে না চাহে। অন্য আমি তাঁহাকে অধিক ক্ষমতা দিব, কল্য সে সেই ক্ষমতা আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে পারে, অন্য যাঁহাকে অধিক বিশ্বাস করিব, কল্য সে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে !

এ অবস্থায় ক্ষমতা ও বিশ্বাস অল্পে-ন্যস্ত না করিয়া আপনাতে রাখাই ভাল। দানেশমন্দ্, তুমি যখন অশ্ব ! আরোহণ কর, অশ্বকে বলগা ও গুণের দ্বারা সম্পূর্ণ বশীভূত কর, যে দিকে কিরাও, সেই দিকে যাইতে বাধ্য হয়। সম্রাটের সেইরূপ শাসন করা উচিত ! কাহাকেও বিশ্বাস করিও না, কাহারও হস্তে ক্ষমতা ন্যস্ত করিও না। সমস্ত ক্ষমতা নিজ হস্তে রাখিবে, কর্তৃচর্য্য ও সেবাদিগকে সর্বস্বরূপে বশীভূত করিয়া তাঁহাদিগের নিকট কার্য্য গ্রহণ করিবে।

দানেশমন্দ্, প্রভু ! মহায্য ত অশ্ব নহে, তাঁহাদিগের মহত্ব আছে, নিজ নিজ সম্মান-জ্ঞান আছে।

আরংজীব। মহায্য অশ্ব নহে, তাঁহা জানি, সেই জন্তই অশ্বকে বলগা দ্বারা চালাই। মহা-ব্যাকে উন্নতির আশা ও শান্তির ভয়ের দ্বারা চালাই। যে উত্তম কার্য্য করিবে, তাঁহাকে পুরস্কার দিব। যে অধম কার্য্য করিবে, তাঁহাকে শাস্তি দিব। পুরস্কার আশা ও শাস্তি-ভয়ে সকল কার্য্য করিবে ; ক্ষমতা, বিশ্বাস, সম্রাণ আরংজীব নিজহৃদয়ে ও নিজ বাহবলে ন্যস্ত রাখিবে।

দানেশমন্দ্, প্রভু ! পুরস্কার আশা ও শাস্তি-ভয় ভিন্ন মহায্য-হৃদয়ে ত অন্য ভাবও আছে। মহায্যের মহত্ব আছে, উচ্চাভিলাষ আছে, নিজ সম্মানজ্ঞান আছে। যে শাস্তিভয়ে কার্য্য করে, সে কোনরূপে কেবল কার্য্য সমাপ্ত করিয়া নিরন্ত থাকে ; কিন্তু যাঁহাকে আপনি সম্মান করেন, সমাদর করেন, ক্ষমতা দিয়া বিশ্বাস করেন, সে আপনাকে সেই সমাদর ও বিশ্বাসের উপযোগী প্রমাণ করি-বার জন্য প্রভুকার্য্যে নিজের ধন, মান, প্রাণ পর্য্যন্ত দান করিয়াছে, এরূপ উদাহরণও শাস্ত্রে দেখা যায়।

আরংজীব। দানেশমন্। আমি তোমার
স্বয়ং শাস্ত্রজ্ঞ নহি; কবিতার বাহা লিখে,
তাহা বিশ্বাস করি না। মানবপ্রকৃতি আমার
শাস্ত্র। মানবের মহত্ব আমি অল্প দেখিয়াছি।
শঠতা, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা অনেক
দেখিয়াছি, সেই শাস্ত্র পাঠ করিয়া আমি
নিজহস্তে ক্ষমতা রাখিতে শিখিয়াছি। সেই
জন্ত কাকেরদিগের উপর জিজিয়া কর স্থাপন
করিব, বিজোহানুধ রাজপুতদিগের উপর
কঠোর শাসন করিব, মহারাষ্ট্রদেশ নিঃশত্রু
করিব, বিজয়পুর ও গলধন্দ জয় করিব,
হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত একাকী শাসন
করিব। কাহারও সহায়তা লইব না, আলম-
গীর নিজের নাম সার্থক করিবে।

উৎসাহে সম্রাটের নয়ন উজ্জ্বল হইয়া-
ছিল। তিনি মনের গভীর অভীষ্ট কখন
কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না,
অন্ত কথায় কথায় অনেকটা হঠাৎ প্রকাশ
করিয়া ফেলিয়াছেন। এতদ্বির তিনি দানেশ-
মন্দের উদারচরিত্র জানিতেন, তাহার নিকট
চুই একটি কথা কহিলে কোনও হানি নাই,
জানিতেন।

কণেক পর ঈষৎ হাস্য করিয়া আরং-
জীব বলিলেন, “সরলস্বভাব বন্ধু! অজ্ঞ
আমার অভীষ্ট ও মন্ত্রণা কিছু কিছু বুঝিতে
পারিলে?”

তীক্ষ্ণবুদ্ধি আরংজীব যদি আপনার গভীর
মন্ত্রণা কিয়দংশ ত্যাগ করিয়া সেই দিন সরল
দানেশমন্দের সরল পরামর্শ গ্রহণ করিতেন,
তাহা হইলে ভারতবর্ষে মুসলমান-সাম্রাজ্য
বোধ হয়, এত শীঘ্র ধ্বংস প্রাপ্ত হইত না।

এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন,
এমন সময়ে সৈনিক পুনরায় আসিয়া সংবাদ
দিল, “রামসিংহ জাঁহাপনার সহিত সাক্ষাৎ
অভিলাষী, দারদেশে দণ্ডায়মান আছেন।”

সম্রাট, আদেশ করিলেন, “আসিতে
দাও।”

কণেক পর রাজা অরসিংহের পুত্র রাজ-
সমানে উপস্থিত হইলেন।

রামসিংহ। সম্রাটকে এক্রপ সময়ে সাক্ষাৎ
করামাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে অবিধেয়, কিন্তু
পিতার নিকট হইতে অতিশয় গুরু সংবাদ
আসিয়াছে, প্রত্যেকে জানাইতে আসিলাম।

আরংজীব। আপনার পিতার নিকট
হইতে আঘাত ও অজ্ঞ পত্র পাইয়াছি ও সমস্ত
সংবাদ অবগত আছি।

রামসিংহ। তবে সম্রাট অবগত আছেন
যে, পিতা সমস্ত শত্রু পরাজিত করিয়া শত্রু-
দেশ বিদূর্ণ করিয়া রাজধানী বিজয়পুর
আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের সৈন্তের
অল্পতাবশতঃ সে নগর এ পর্য্যন্ত হস্তগত
করিতে পারেন নাই, বিশেষতঃ গলধন্দের
মুলতান বিজয়পুরের সাহায্যার্থ নেকনাম
খাঁ নামক সেনাপতিকে বহুসংখ্যক সৈন্য
সমেত প্রেরণ করিয়াছেন।

আরংজীব। সমস্ত অবগত হইয়াছি।

রামসিংহ। চতুর্দিকে শত্রুবেষ্টিত হইয়া
পিতা সম্রাটের আদেশে এখনও যুদ্ধ করিতে-
ছেন, কিন্তু এ যুদ্ধে জয় অসম্ভব, প্রত্যুর নিকট
আর অল্পসংখ্যক সৈন্তের জন্ত প্রার্থনা
করিয়াছেন।

আরংজীব। আপনার পিতা বীক্সগ্রগণ্য,
তিনি নিজে সৈন্তে বিজয়পুর হস্তগত
করিতে পারিলেন না।

রামসিংহ। মহারাজার বাহা সাধ্য, পিতা
তাহা করিবেন। শিবজী পূর্বে পরাস্ত হন
নাই, পিতা তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছেন।
বিজয়পুর পূর্বে আক্রান্ত হয় নাই, পিতা
সেই নগর আক্রমণ করিয়াছেন; এখন
আপনার নিকট অল্পমাত্র সৈন্ত-সহায়তা

প্রার্থনা করিতেছেন। তাহা হইলেই সমস্ত কার্য শেষ হয়, দক্ষিণদেশে যোগল-সাম্রাজ্য বিস্তৃত ও দৃঢ়ীভূত হয়।

এরূপ অবস্থার অন্ত কোন সম্রাট্ সেই সহায়তা প্রেরণ করিয়া দাক্ষিণাত্যদেশবিজয়-কার্য সাধন করিতেন। আরঞ্জীর আপনাকে বহুদর্শী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি মনে করিতেন, তিনি সে সহায়তা প্রেরণ করিলেন না; বলিলেন, “রামসিংহ! আপনার পিতা আমাদের সুহৃদ-প্রবর, তাহার বিপদের কথা শুনিয়া যৎপর্বোনাতি শোকাবুল হইলাম। তাহাকে পত্র লিখিবেন যে, তিনি নিজের অসাধারণ বাহুবলে জয়সাধন করিবেন, সম্রাট্ দিবা-নিশি এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন। কিন্তু এখন দিল্লীকে সেনাসংখ্যা অতি অল্প, আমি সহায়তা প্রেরণ করিতে অক্ষম।”

রামসিংহ কাতরস্বরে বলিলেন, “জাহাপনা! পিতা দিল্লীখরের পুরাতন দাস, আপনার কালে, আপনার পিতার কালে অসংখ্যক যুদ্ধ য়িয়াছেন, অনেক কার্যসাধন করিয়াছেন, দিল্লীখরের কার্যসাধন ভিন্ন তাহার জীবনের অন্ত উদ্দেশ্য নাই। এই ঘোর বিপদে আপনি কিঞ্চিৎ সাহায্য দান না করিলে তিনি বোধ হয়, সসৈন্তে নিধনপ্রাপ্ত হইবেন।”

বালক জানিত না যে, তাহার কাতর-স্বরে ও অশ্রুজলে আরঞ্জীবের গভীর উদ্বেগ, গৃচমন্ত্রণা বিচলিত হয় না। সে উদ্বেগ, সে মন্ত্রণা কি? রাজা জয়সিংহ অতিশয় ক্ষমতাশালী প্রতাপাশিত সেনাপতি, তাহার অসংখ্য সৈন্ত, বিজ্ঞীর্ণ যশ, অনন্ত প্রতাপ। আজীবন তিনি নিকলক্ষে দিল্লীখরের কার্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু এত ক্ষমতা কোনও সেনাপতির বিধের নহে; সম্রাট্ জয়সিংহকে এতদূর বিশ্বাস করিতে পারেন না। এ যুদ্ধে জয়-

সিংহ সার্থকতা লাভ করিতে না পারিবে যদি অবমানিত হন, তবে সে প্রতাপ ও যশের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইবে। যদি সসৈন্ত বিজয়পুর-সম্মুখে নষ্ট হন, দিল্লীখরের হৃদয়ের একটি কণ্টক-উদ্ধার হইবে। উর্গনাভের জালের স্থায় আরঞ্জীবের উদ্বেগ-গুলি বহুবিস্তীর্ণ ও অব্যর্থ, অন্ত জয়সিংহ-কীট তাহাতে পড়িয়াছেন, উদ্ধার নাই।

জয়সিংহ বহুকালাবধি দিল্লী-কার্যে জীবন পণ করিয়াছেন বটে, সে জ্ঞাত কি যুদ্ধ মন্ত্রজাল অন্ত ব্যর্থ হইবে?

জয়সিংহের উদারচিত্ত পুত্র সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া রোদিন করিতেছেন বটে, বালকের রোদিনের জন্ত কি দূরদর্শী সম্রাট্ উদ্বেগ ত্যাগ করিবেন?

দয়া মায়া প্রভৃতি সুহৃদার মনোবৃত্তি-সমূহে আরঞ্জীব বিশ্বাস করিতেন না, নিজ হৃদয়ে তা স্থান দিতেন না। আত্মপথ-পরিষ্কারার্থ অন্ত একটি পত্রক সরাইয়া ফেলিলেন, কল্যা একজন সহোদর ভ্রাতাকে হনন করিলেন, উভয় কার্য একইরূপ দীর নিরু-বেগ হৃদয়ে করিতেন। একদিন পিতা, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, আজীব্যবর্গ সেই উন্নতি-পথে পড়িয়াছিলেন, ধীরে ধীরে তাহাদিগকে সরাইয়া দিয়াছিলেন। পিতাকে মারাবশতঃ জীবিত রাখেন নাই, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারাকে ক্রোধবশতঃ হত্যা করেন নাই, সে সমস্ত বালকোচিত মনোবৃত্তি তাহার ছিন্ন নাই। পিতা জীবিত থাকিলে ভবিষ্যতে বিপদের সম্ভাবনা নাই, আপন উদ্বেগ-সাধনে কোনও প্রতিবন্ধক হইবে না, তিনি জীবিত থাকুন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা জীবিত থাকিলে উদ্বেগসাধনে প্রতিবন্ধক হইতে পারে। জ্ঞানদ, তাহাকে সরাইয়া সম্রাট্ আলমগীরের পথ পরিষ্কার করিয়া দাও।

মন্ত্রণাসাধনের অস্ত্র অস্ত্র আবশ্যক যে, জরসিংহ সৈন্যে হত হইবেন। তিনি ভাল কি মন্দ, বিশ্বাসী কি বিদ্রোহী, অসুস্থকালে আবশ্যক নাই, তিনি সৈন্যে মরিবেন। এই পরিচ্ছেদবিবৃত সময়ের পর করেক মাসের মধ্যেই দিল্লীতে সংবাদ আসিল, অবমানিত, অকৃতার্থ জরসিংহ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তখনকার ইতিহাস-লেখক কেহ কেহ সন্দেহ করিয়াছে, সম্রাটের আদেশে বিষপ্রয়োগে জরসিংহের মৃত্যু হয়।

অনেকক্ষণ পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রামসিংহ বলিলেন, “প্রভু! আমার একটি বাজ্ঞা আছে।”

আরংজীব। নিবেদন করুন।

রামসিংহ। শিবজী যখন দিল্লী আগমন করিয়াছিলেন, পিতা তাঁহাকে বাক্যদান করিয়াছিলেন যে, দিল্লীতে শিবজীর কোনও আপদ ঘটবে না।

আরংজীব। আপনার পিতা সে কথা আমাদের অবগত করাইয়াছেন।

রামসিংহ। রাজপুতদিগের মধ্যে বাক্যদান করিয়া তাহা লঙ্ঘন হইলে অতিশয় নিন্দার বিষয়। পিতার প্রার্থনা ও দাসের প্রার্থনা যে, শিবজীর যে কোনও দোষ হইয়া থাকে, প্রভু ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিন।

আরংজীব ক্রোধ সংবরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “সম্রাটের বাহা উচিত কার্য, সম্রাট তাহা করিবেন, সে বিষয়ে আপনি চিন্তিত হইবেন না।”

শিবজী নামে দ্বিতীয় একটি কৌট সম্রাটের সেই বিতীর্ণ মন্ত্রণাজালে পতিত হইয়াছেন, দানেশমন্ ও রামসিংহ তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারিলেন না।

জরসিংহের যে ঘোষ, শিবজীরও সেই

ঘোষ। শিবজীও সন্ধিহাপনাবধি প্রাণপণে দিল্লীর কার্য করিয়াছেন, নিজ সৈন্য দ্বারা অনেক দুর্গ দিল্লীর অধীনে আনিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারও বিপুল ক্ষমতা। আরংজীব কোনও ভৃত্যের উপর বিপুল ক্ষমতা প্রদত্ত করিতে পারেন না, কাহাকেও বিশ্বাস করেন না।

বাহাদিগকে অবিশ্বাস করা যায়, তাহার ক্রমে অবিশ্বাসের ষোণ্য হয়। আরংজীবের জীবিতকালের মধ্যেই মহারাষ্ট্র-ঘেরা ও রাজপুতেরা দিল্লীর বিরুদ্ধে যে ভীষণ যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিল, যোগল-সম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া গেল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ।

পীড়া।

দূরে গেল জটাজুট।

মধুসূদন দত্ত।

শিবজীর অতিশয় সঙ্কটজনক এক পীড়া হইয়াছে, সমগ্র দিল্লীনগরীতে এ সংবাদ প্রচারিত হইল। দিবানিশি শিবজীর গৃহের গবাক্ষ ও দ্বার রুদ্ধ, দিবানিশি চিকিৎসক আসিতেছেন। এ ভীষণ রোগের উপশম সন্দেহহীন, অস্ত্র যেরূপ রোগবৃদ্ধি হইয়াছে, কল্যাণ পর্যন্ত জীবিত থাকার সম্ভাব্য। কখন কখন বা সংবাদ রাষ্ট্র হইতেছে যে, শিবজী আর নাই। রাজপুত দিয়া বহু-সংখ্যক লোক গমনাগমন করিত ও সেই রুদ্ধ গবাক্ষের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিত। অঝারোহী সৈনিক ও সেনাপতিগণ কণেক অথ বামাইয়া গ্রহরীদিগের নিকট শিবজীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন। শিবিকারোহী

রাজা বা মল্লধার শিবজীর গৃহের সম্মুখে আসিয়া একবার উঠিয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন। শিবজী ক্রুরপ আছেন, তিনি উদ্ধার পাইবেন কি না, তিনি কল্যাণ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবেন কি না, এরূপ নানা কথা নগরবাসী সকলেই বাজারে, পথে, ঘাটে, সর্ব্বসময়ে আন্দোলন করিত। আরংজীব সর্ব্বদাই শিবজীর রোগের সমাচার জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেন, তথাপি গৃহের চারিদিকে যে প্রহরী সন্নিবেশিত ছিল, তাহা পূর্য্যমত রাখিলেন। লোকের নিকট শিবজীর রোগের বিষয়ে অক্ষেপ প্রকাশ করিতেন, মনে মনে ভাবিতেন, যদি এই রোগেই শিবজীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমার বিশেষ কোন নিশ্চয় না হইয়াই অনারাসে কটকোদ্ধার হইবে।

সন্ধ্যাকাল সমাগত, এরূপ সময়ে একজন প্রাচীন সন্ধ্যা মুসলমান হাকিম শিবজীর গৃহদ্বারের নিকট অবতীর্ণ হইলেন। প্রহরিগণ জিজ্ঞাসা করিল, “কি উদ্দেশ্যে শিবজীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন?” হাকিম উত্তর করিলেন, “সম্রাটের আদেশ অনুসারে রোগীর চিকিৎসা করিতে আসিয়াছি।” সম্মুখান প্রহরিগণ পথ ছাড়িয়া দিল।

শিবজী শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার ভৃত্য সংবাদ দিল যে, সম্রাট একজন হাকিম পাঠাইয়া দিয়াছেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিবজী তৎক্ষণাৎ বিবেচনা করিলেন, কোনরূপ বিবপ্ররোগের ভয় সম্রাট এ কাণ্ড করিতেছেন। তিনি ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, “হাকিমকে আমার সেলাম জানাইও ও বলিও, হিন্দু-কবিরাজে আমার চিকিৎসা করিতেছে; আমি হিন্দু, অজ্ঞরূপ চিকিৎসা ইচ্ছা করি না। সম্রাটের এই অগ্রহের ভয় আমার কোটি কোটি ধনবান জানাইবে।”

ভৃত্য এই আদেশ লইয়া ঘর হইতে বহির্গত হইবার পূর্বেই হাকিম অনাহত হইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। শিবজীর হৃদয়ে জোখসঞ্চার হইল, কিন্তু তাহা সঙ্কোচন করিয়া তিনি অতি ক্ষীণ মুহূর্ত্তে হাকিমকে অভ্যর্থনা করিলেন ও শয্যাপার্শ্বে বসিতে আদেশ দিলেন। হাকিম উপবেশন করিলেন।

আকৃতি দেখিলে হাকিমের প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ হইতে পারে না। বরস অনেক হইয়াছে, অতি গুরু শ্রম লব্ধ হইয়া উরস্বল আবৃত করিয়াছে, মস্তকোপরি প্রকাণ্ড উকীষ, হাকিমের স্বর ধীর ও গম্ভীর।

হাকিম বলিলেন, “মহারাজ! ভৃত্যকে যে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়াছি, আপনি আমার চিকিৎসা ইচ্ছা করেন না। তথাপি মানবজীবন রক্ষা করা আমাদের ধর্ম্ম, আমি স্বধর্ম্মসাধন করিব।”

শিবজী মনে মনে আরও ক্রুদ্ধ হইলেন, ভাবিলেন, এ বিপদ কোথা হইতে আসিল? কিছু বলিলেন না।

হামি। আপনাদ পীড়া কি?

কাতরস্বরে শিবজী বলিলেন, “জানি না, এ কি ভীষণ পীড়া! শরীর সর্ব্বদাই অগ্নিবৎ জ্বলিতেছে, হৃদয়ে বেদনা, সর্ব্বস্থানে বেদনা!”

হাকিম গম্ভীরস্বরে বলিলেন, “পীড়া অপেক্ষা জিঘাংসার শরীর অধিক জ্বলে, হৃদয়ের বেদনা অনেক সময় মানসিক ক্লেশ-সম্ভাত। আপনার কি সেই পীড়া?”

বিস্মিত ও ভীত হইয়া শিবজী এই অপ-রূপ হাকিমের দিকে চাহিলেন। বুৎ সেইরূপ গম্ভীর, কোন ভাব-বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইল না। শিবজী নিকন্তর হইয়া রহিলেন।

হাকিম তাহার হস্ত ও শরীর দেখিতে চাহিলেন। শিবজী আরও ভীত হইলেন, অগত্যা হস্ত ও শরীর দেখাইলেন।

অনেকক্ষণ অতিশয় মনোনিবেশপূৰ্ব্বক দৃষ্টি করিয়া হাকিম উত্তর করিলেন, “আপনার বচন যেরূপ ক্ষীণ, নাড়ী সেরূপ ক্ষীণ নহে, ধমনীতে শোণিত সজোরে সঞ্চালিত হইতেছে, পেশীগুলি পূৰ্ব্ববৎ দৃঢ়বদ্ধ। আপনার এ সমস্ত কি প্রবন্ধনামাত্র ?”

পুনরায় বিস্মিত হইয়া শিবজী এই অপূৰ্ব চিকিৎসকের দিকে চাহিলেন, চিকিৎসকের মুখমণ্ডল গম্ভীর ও অকম্পিত, কোন কপট ভাব লক্ষিত হইল না। শিবজীর শরীরে ক্রমে উষ্ণ শোণিত সঞ্চারিত হইতে লাগিল, কিন্তু ক্রোধসংবরণ করিয়া পুনরায় ক্ষীণস্বরে বলিলেন, “আপনি যেরূপ আদেশ করিতেছেন, অস্তান্ত চিকিৎসকগণও সেইরূপ বলেন। এ মতঃ পীড়া বাহুলক্ষণশূন্য, কিন্তু দিনে দিনে তিল তিল করিয়া আমার জীবননাশ করিতেছে।”

হাকিম ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, “আলফ্ লায়লা ও লায়লুন” নামক আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্র আছে, তাহাতে এক সহস্র এক পীড়ার বিষয় নির্দেশ আছে, তাহার মধ্যে কয়েকটি বাহুলক্ষণশূন্য পীড়ার চিকিৎসার কথা লিখিত আছে। একটির চিকিৎসা ‘বক্সতনে আসিরী ইশারাৎ কর্দ।’ কয়েদিগণ কাজ না করিবার জন্য যে পীড়া ভাণ করে, তাহার চিকিৎসা শিরশ্ছেদন। আর একটি পীড়ার নাম ‘দিগরান দোজখ্’ অর্থতঃ ‘স্বপ্ন’। যুবকগণ এই পীড়ার ভাণ করিয়া নরক-পথগামী হয়, তাহার ঔষধি পাড়কা প্রহার। তৃতীয় এক প্রকার বাহুলক্ষণশূন্য পীড়া আছে, তাহার নাম ‘আরে-বহা বরণেরেস্তা জেরেবগল।’ প্রবন্ধকগণ

নিজ প্রবন্ধনা খোপনার্থ এই পীড়া ভাণ করে। তাহারও ঔষধ নির্দেশ আছে, আমি সেই ঔষধ আপনাকে দিতেছি।”

শিবজী এ সমস্ত শাস্ত্রকথা বিশেষ বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু হাকিম তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চতুর; শিবজীর মনের ভাব বুঝিয়াছেন, তাহা শিবজী বুঝিতে পারিলেন। ইতি-কর্তব্যবিমূঢ় হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে ঔষধ কি ?”

হাকিম উত্তর করিলেন, “সে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধিও বটে, উৎকট বিষও বটে। ‘রকুল আলমিনার’ নাম লইয়া তাহাই আপনাকে দিব, যদি রোগ বর্ধাৎ হয়, অব্যর্থ ঔষধিতে তৎক্ষণাৎ পীড়া আরোগ্য হইবে, যদি প্রতারণা হয়, অব্যর্থ বিষে তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশ হইবে।”

শিবজীর দৃষ্টি হইল, ললাট হইতে স্বৈদবিন্দু পড়িতে লাগিল। ঔষধিসেবনে অস্বীকৃত হইলে তাহার প্রতারণা প্রচারিত হইবে, সেবন করিলে নিশ্চয় মৃত্যু!

হাকিম ঔষধি গুলুস্ত করিয়া আনিলেন, শিবজী বলিলেন, “মুসলমানের স্পৃষ্ট পানীয় আমি পান করিব না।”

শিবজী সাজোরে হস্ত-সঞ্চালনে পাত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন। হাকিম কিছুমাত্র রুষ্ট হইলেন না, ধীরে ধীরে বলিলেন, “এরূপ সজোরে হস্ত-সঞ্চালন ক্ষীণতার লক্ষণ নহে।”

শিবজী অনেকক্ষণ অতিকষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিয়াছিলেন, আর পারিলেন না, সহসা উঠিয়া বাসিলেন, “রোগীকে উপহাস করিবার এই শাস্তি” এই বলিয়া এক চপেটাঘাত করিলেন ও হাকিমের গুরুশ্রদ্ধা সজোরে আকর্ষণ করিলেন। বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, সেই বিখ্যাত শাস্ত্র সমস্ত ধসিয়া আসিল।

চপেটাঘাতে উজ্জীষ হুয়ে নিকিল হইল, তাঁহার বাল্যসুহৃৎ তন্নজী মালতী বিলু বিলু করিয়া হাস্ত করিয়া উঠিলেন।

তন্নজী অনেককণ পরে হাস্ত সংবরণ করিয়া ধরের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। পরে শিবজীর নিকটে আসিয়া উপবেশন করিয়া বলিলেন, "প্রভু কি সর্বদাই চিকিৎসককে এইরূপ পারিতোষিক দিয়া থাকেন? তাহা হইলে রোগীর হুত্বার পূর্বে দেশের চিকিৎসক নিঃশেষিত হইবে। বজ্রসম চপেটাঘাতে এখনও মস্তক বিঘূর্ণিত হইতেছে।"

শিবজী সহাস্তে বলিলেন, "বজ্র, ব্যাঘ্রের সহিত খেলা করিলে, কখন কখন আহত হইতে হয়। যাহা হউক, তোমাকে দেখিয়া কতদূর আশ্চর্যমিত হইলাম, বলিতে পারি না, এ করদীনই তোমাকে প্রত্যাশা করিতে-ছিলাম। এখন সংবাদ কি বল।"

তন্নজী। প্রভুর সমস্ত আদেশ সম্পাদিত করিয়াছি, একে একে নিবেদন করিতেছি। সম্রাট্ বে অল্পবয়সিগত হইয়াছিলেন, তদ্বারা আপনার অহুচরবর্গ সকলেই নিরাপদে দিল্লী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে।

শিবজী। সে জন্ত জগদীশ্বরকে ধন্তবাদ প্রদান করি। এখন আমার মন শান্ত হইল, আমি আপনার পলারনের জন্ত তত তাবি না। গগনবিহারী পক্ষী সামান্ত পিজরে বদ্ধ হইয়া থাকে না।

তন্নজী। সেই সমস্ত অহুচর দিল্লী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গোবামীর বেশ ধরিয়া মথুরা ও বৃন্দাবনে অবস্থিত করিতেছে, মথুরায় অনেক দেবালয়ের পুরোহিতগণও প্রতাহ আপনাকে প্রতীক্ষা করিতেছে। আমি দিল্লী হইতে মথুরার পথ বিত্ৰম্বরূপে দৃষ্টি করিয়া, যে যে স্থানে লোক সন্নিবেশিত করিবার আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাও করিয়াছি।

শিবজী। চিরবন্ধ! তুমি যেরূপ কার্য্য-দক্ষ, অবশ্যই আমরা নিরাপদে স্বদেশে বাইতে পারিব।

তন্নজী। দিল্লীর প্রাচীরের বাহিরে আপনি যেরূপ একটি তীব্রগতি অশ্ব রাধিতে বলিয়াছিলেন, তাহাও রাধিয়াছি। যে দিন স্থির করিবেন, সেই দিনে সমস্ত প্রস্তুত থাকিবে।

শিবজী। ভাল।

তন্নজী। রাজা জয়সিংহের পুত্র রামসিংহের নিকট গিয়াছিলাম, তাঁহার পিতা আপনাকে যে বাক্যদান করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলাম। রামসিংহ পিতার স্তায় সত্যপ্রিয় ও উদারচেতা, শুনিয়াছি, স্বয়ং সম্রাটের নিকট বাইয়া আপনার জন্ত সাক্ষরনয়নে আবেদন করিয়াছিলেন।

শিবজী। সম্রাট্ কি বলিলেন?

তন্নজী। বলিলেন, সম্রাটের যাহা কর্তব্য, তাহা করিবেন।

শিবজী। বিশ্বাসঘাতক! কপটচারা! এখনও একদিন শিবজী ইহার প্রতিশোধ দিবে।

তন্নজী। রামসিংহ সে বিষয়ে নিঃফল-প্রবৃত্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু হুবে সুরোষে আমার নিকট বলিলেন যে, রাজপুতের বাক্য অন্তথা হয় না। অর্ধ দ্বারা, সৈন্ত দ্বারা যেরূপে পায়ন, তিনি আপনার সহায়তা করিবেন, তাহাতে যদি তাঁহার প্রাণ যায়, তাহাতে স্বীকৃত আছেন।

শিবজী। পিতার উপযুক্ত পুত্র। কিন্তু আমি তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করিতে চাহি না। আমি পলারনের যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি, তাহা তুমি তাঁহাকে জানাইয়াছ?

তন্নজী। জানাইয়াছি, তিনি জানিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং আপনার সম্পূর্ণ সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

শিবজী । ভাল ।

তন্নজী । এ হুদ্রি দানেশমন্ প্রভুতি
দাবতীর আরংজীবের সহরকে মিষ্ট কথা
বা অর্থ দ্বারা আপনার পক্ষবর্তী করিয়াছি ।
দিল্লীতে হিন্দু কি মুসলমান, একপ বড়লোক
কেহ নাই, যিনি আপনার পক্ষবর্তী নহেন ।
কিন্তু আরংজীব কাহারও পরামর্শ গ্রাহ
করেন না ।

শিবজী । তবে সমস্ত প্রস্তুত । আমি
আরোগ্যলাভ করিতে পারি ?

সহাস্ত্রে তন্নজী বলিলেন, “আমার ভায়
বিজ্ঞ হাকিম যখন আপনার পীড়ার
চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছে, তখন পীড়া কি
ধাকিতে পারে ? কিন্তু আপনার পানের
জন্ত মিষ্ট সুন্দর সরবৎ প্রস্তুত করিয়াছিলাম,
সমস্তটা নষ্ট করিলেন ?”

শিবজী আর একপাত্র প্রস্তুত করিতে
বলিলেন । তন্নজী সেই পাত্র লইয়া পুনরায়
সরবৎ প্রস্তুত করিলেন, শিবজী তাহা পান
করিয়া সহাস্ত্রে বলিলেন, “চিকিৎসক ! আপ-
নার ঔষধ বৈষ্ণব মিষ্ট, সেইরূপ ফলদারী ।
আমার পীড়া একেবারে আরাম হইয়াছে ।”

শিবজীকে সন্তোষে আলিঙ্গন করিয়া
পুনরায় উকীষ ও আশ্র ধারণ করিয়া তন্নজী
গৃহ হইতে নিস্তান্ত হইলেন ।

দ্বারদেশে প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল,
“পীড়া কিরূপ দেখিলেন ?”

হাকিম উত্তর করিলেন, “পীড়া অতিশয়
সঙ্কটজনক, কিন্তু আমার অব্যর্থ ঔষধিতে
অনেক উপশম হইয়াছে । বোধ করি, অল্প-
দিনের মধ্যেই শিবজী এ ক্লেশ হইতে সম্পূর্ণ
আরোগ্যলাভ করিবেন ।”

হাকিম শিবিকাবাগে চলিয়া গেলেন ।
একজন প্রহরী অন্ধকে বলিল, “হাকিম বড়
ভাল, এত বৈজ্ঞে যে পীড়া আরাম করিতে

পারিল না, হাকিম একদিনে তাহা আরাম
করিলেন কিরূপে ?”

দ্বিতীয় প্রহরী উত্তর করিল, “হবে না
কেম, এ যে রাজবাতির হাকিম ।”

অফোবিংশ পরিচ্ছেদ ।

—:—

আরোগ্য ।

এত দিন উত্তর কণেক শুভ হয়ে ।

কহিতে পারিল পুনঃ প্রণাম করিয়ে ।

হে বীর, কমলচক্রে কর পরিহার ।

অজ্ঞানের অপরাধ কমিবা আমার ।

কালীদাস দাস ।

উপরি-উক্ত ঘটনার কয়েক দিন পর
নগরে সংবাদ প্রচারিত হইল যে, শিবজীর
পীড়ার কিছু উপশম হইয়াছে । নগরে পুন-
রায় ধুমধাম পড়িয়া গেল, সকলেই সেই কথা
কহিতে লাগিল । হিন্দুযাজেই এ কথা
শুনিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিল,
মহাশয় মুসলমানগণ এই সংবাদ পাইয়া
সুখী হইলেন । পথে, ঘাটে, দোকানে,
মসজিদে সকলেই এই কথা কহিতে লাগিল,
আরংজীব এ সংবাদ শুনিয়া যথোচিত
সন্তোষ প্রকাশ করিলেন ।

নগরে ধুমধাম পড়িয়া গেল । শিবজী
ব্রাহ্মণদিগকে রাশি রাশি মূদ্রা দান করিতে
লাগিলেন, দেবালয়ে পূজা পাঠাইতে লাগি-
লেন, চিকিৎসক সকলকে অর্থদানে সন্তুষ্ট
করিলেন । বাজারে আর মিষ্টান্ন রহিল না,
শিবজী রাশি রাশি মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া দিল্লীর
সমস্ত বড়লোকের বাটীতে পাঠাইতে লাগি-
লেন । পরিচিত সমস্ত লোকের নিকট
ভেট পাঠাইতে লাগিলেন, এমন কি, প্রতি

সদ্বীর্ষ ও ককিরপণের সেবার্থ প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন পাঠাইতে লাগিলেন। সম্রাটের মনে যাহাই থাকুক, অস্ত্র সকলেই শিবজীর এই বাদান্ততা ও সদাচরণে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। “দিল্লীর লাজু” ছড়াছড়ি হইতে লাগিল, তাহাতে আর কেহ পন্থিয়াছিলেন কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু আরংজীব অতি শীঘ্রই পন্থিয়াছিলেন।

শিবজী কেবল মিষ্টান্ন প্রেরণ করিয়া সন্তুষ্ট হইতেন না, মিষ্টান্ন ক্রয় করাইয়া নিজের গৃহে আনিতেন ও অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আধার সমস্ত নিৰ্মাণ করাইয়া স্বয়ং মিষ্টান্ন লাজুইয়া প্রেরণ করিতেন। সে আধার কখন কখন তিন চারি হাত দীর্ঘ হইত, আট কি দশ জন লোক বহিয়া লইয়া বাইত। করেকদিন এইরূপে মিষ্টান্ন বিতরিত হইতে লাগিল।

একদিন সম্রাটের সময় এইরূপ দুইটি প্রকাণ্ড মিষ্টান্নের আধার শিবজীর গৃহ হইতে বাহির হইল। প্রহরিগণ জিজ্ঞাসা করিল, “এ কাহার বাটীতে যাইবে?” বাহকেরা উত্তর করিল, “রাজা জয়সিংহসদনে।”

প্রহরিগণ। তোমাদের প্রভু আর কত দিন মিষ্টান্ন পাঠাইবেন?

বাহকেরা। অদ্যই শেষ।

মিষ্টান্নের ভার লইয়া বাহকগণ চলিয়া গেল।

কতক পথ যাইয়া বাহকেরা একটি অতি সন্দেশন স্থানে সম্রাটের অন্ধকারে সেই দুই আধার নামাইল। বাহকগণ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, জনমাত্র নাই, কেবল সম্রাটের বায়ু রহিয়া রহিয়া যাইতেছে। বাহকেরা একটি ইঙ্গিত করিল, একটি আধার হইতে শিবজী, অপরটি হইতে শজুজী বাহির

হইলেন। উভয়ে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

বিলম্ব না করিয়া উভয়ে ছদ্মবেশে দিল্লীর প্রাচীরভিত্তিতে যাইলেন। সম্রাটের সময় লোক অতি অল্প, তথাপি রাজপথে দুই এক জন লোক যখন নিকট দিয়া যায়, শজুজীর হৃদয় ভরে ও উদ্বেগে কম্পিত হইয়া উঠে। শিবজীর চিরজীবন এইরূপ বিপদপূর্ণ, তাহার পক্ষে এ বিপদ কিছু নূতন নহে, তথাপি তাহার হৃদয় উদ্বেগশূন্য ছিল না।

উভয়ে কম্পিত হৃদয়ে প্রাচীর পার হইলেন। একজন প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, “কে যায়?”

শিবজী উত্তর করিলেন, “গোশ্বামী। হরেনরাম হরেনরাম হরেনরাম কেবলম্।”

প্রহরী। কোথায় যাইতে?

শিবজী। মথুরা তীর্থস্থানে। কলৌ নাস্তোব নাস্তোব নাস্তোব গণিষ্ঠা।

উভয়ে প্রাচীর পার হইলেন।

প্রাচীরের বাহিরেও অনেক মাঠা ও উচ্চপদাভিষিক্ত লোক বাস করিতেন। সে সকল দুই পার্শ্বে রাখিয়া শিবজী ও শজুজী অরাস পথ অভিবাহন করিতে চলিলেন।

দূরে একটি বৃক্ষতলে একটি অশ্ব বদ্ধ রহিয়াছে দেখিলেন। অতি সতর্কভাবে সেই দিকে যাইলেন, দেখিলেন, তরজা-বর্ণিত অশ্বই বটে। জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাই অশ্বরক্ষক! তোমার নাম কি?”

রক্ষক। জানকীনাথ।

শিবজী। কোথায় যাইবে?

রক্ষক। মথুরা।

শিবজী বলিলেন, “হাঁ, এই অশ্ববটে।”

শিবজী অশ্ব আয়োজন করিলেন, পশ্চাতে শজুজীকে উঠাইয়া লইলেন, মথুরার দিকে চলিলেন। অশ্বরক্ষক পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে চলিতে লাগিল।

অন্ধকার নিশীথে পল্লী বা গ্রামের দিরা নির্বাক হইয়া শিবজী পলায়ন করিতেছেন। আকাশে নীলকণ্ঠশ মিট্ মিট্ করিতেছে, অন্ন অন্ন ঘেষ এক একবার গগন আচ্ছাদিত করিতেছে, বর্ষাকালে পূর্ণকলেশবরা যমুন। প্রবলবেগে বহিয়া বাইতেছে, পথ-ঘাট কর্দ্ধম বা জলপূর্ণ। শিবজী উবেগপূর্ণ-হৃদয়ে পলায়ন করিতেছেন।

দূর হইতে অশ্বের পদশব্দ শ্রুত হইল। শিবজী কাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে স্থানে বৃক্ষ বা কুটার নাই, অগত্যা পূর্ববৎ গমন করিতে লাগিলেন।

তিন জন অশ্বারোহী বেগে দিল্লী-অভিমুখে আসিতেছেন, তাঁহাদের কোষে অসি। দূর হইতে শিবজীর অশ্ব দেখিতে পাইয়া তাঁহারা সেই দিকে অশ্ব প্রধাবিত করিলেন। শিবজীর হৃদয় উবেগে দ্রুত দ্রুত করিতে লাগিল। নিকটে আসিয়া একজন অশ্বারোহী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে বার?”

শিবজী। গোস্বামী।

অশ্বারোহী। কোথা হইতে আসিতেছ?

শিবজী। দিল্লীনগরী হইতে।

অশ্বারোহী। আমরা দিল্লীনগরীতে বাইব, কিন্তু পথ হারাইয়াছি, আমাদের সঙ্গে আসিয়া পথ দেখাইয়া দেও, পরে তুমি মথুরায় বাইও।

শিবজীর মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। দিল্লী বাইতে অশ্বীকার করিলে সৈনিকেরা বলপ্রকাশ করিবে, বিবাদের সময় সহসা শিবজীকে চিনিলেও চিনিতে পারে, কেন না, দিল্লীতে এরূপ সৈনিক ছিল না যে, শিবজীকে দেখে নাই। আর দিল্লীতে পুনর্গমন করিলে সহস্র বিপদ! ইতিকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একজন অশ্বারোহী সমুখে আসিয়া শিবজীর সহিত কথা করিয়াছিল, অপর দুই জন অশ্বারোহী পরামর্শ করিতেছিল। কি পরামর্শ?

একজন বলিল, “এ শ্বর আমি জানি, আমি দক্ষিণদেশে সারেন্তা খাঁর অধীনে অনেক দিন যুদ্ধ করিয়াছি, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, পথিক গোস্বামী নহে।”

অপরজন বলিল, “তবে কে?”

প্রথম। আমি সন্দেহ করি, এ শ্বর শিবজী। দুই জন মহাশয়ের কণ্ঠস্থ শব্দ এক-রূপ হয় না।

দ্বিতীয়। দূর মুখ! শিবজী দিল্লীতে বন্দী হইয়াছে।

প্রথম। সেইরূপ আমরাও মনে করিয়া-ছিলাম যে, শিবজী সিংহগড় দুর্গে আছে, সহসা একদিন রক্তনীযোগে পুনা ধ্বংস করিয়া গিয়াছিল।

দ্বিতীয়। ভাল, যুদ্ধের বস্ত তুলিয়া দেখিলেই সমস্ত সন্দেহ দূর হইবে।

সহসা একজন অশ্বারোহী আসিয়া শিবজীর উকীষ দূরে নিক্ষেপ করিলেন, শিবজী তাঁহাকে চিনিলেন, তিনি সারেন্তা খাঁর অধীনস্থ একজন প্রধান সেনানী।

যদি হস্তে কোনরূপ অস্ত্র থাকিত, শিবজী একাকী তিন জনকে হত করিবার চেষ্টা করিতেন। রিক্তহস্তেও একজনকে মৃষ্টি-আঘাতে অচেতন করিলেন, এমন সময় আর দুই জন অসিহস্তে নিকটে আসিয়া শিবজীকে ধরিয়া ভূতলশায়ী করিল।

শিবজী ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন, আবার বন্দী হইলেন, বিদেশে বন্ধুশূন্য হইয়া আরজীব কর্তৃক হত হইবেন, এই চিন্তা করিতেছিলেন। শত্রুজীর দিকে নয়ন পড়িল, চক্ষু জলে আর্দ্র হইল।

সহসা একটি শব্দ হইল। শিবজী দেখিলেন, একজন অস্বাভাবিক তীরবিদ্ধ হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। আর একটি তীর, আর একটি তীর; শিবজীর তিন জন শত্রুই ভূতলশায়ী! তিন জনই গত-জীবন!

শিবজী পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া উঠিয়া দেখিলেন, পশ্চাৎ হইতে সেই অশ্বরক্ষক জানকীনাথ তীর নিক্ষেপ করিতেছিল। বিস্মিত হইয়া জানকীনাথকে নিকটে ডাকিয়া জীবন-রক্ষার জন্য শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। সে নিকটে আসিলে শিবজী আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, সে অশ্বরক্ষক নহে, অশ্বরক্ষকবেশে সীতাপতি গোস্বামী!

তখন সহস্রবার গোস্বামীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, “সীতাপতি! আপনি ভিন্ন শিবজীর বিপদের সময় প্রকৃত বন্ধু আর কে আছে? আপনাকে অশ্বরক্ষক মনে করিয়া তুচ্ছ করিয়াছিলাম, ক্ষমা করুন। আপনার এ কার্যের জন্য আমি কি উপযুক্ত পুরস্কার দিতে পারি?”

সীতাপতি শিবজীর সম্মুখে জাহ্নু গাড়িয়া করবোড়ে বলিলেন, “রাজন! ছদ্মবেশ ক্ষমা করুন, আমি আপনার পুরাতন ভৃত্য রঘুনাথজী হাবিলদার! জান হইয়া অবধি আপনার সেবা করিয়াছি, আজীবন-কাল আপনার সেবা করিব, ইহা ভিন্ন অস্ত্র কামনা নাই, অস্ত্র পুরস্কার চাহি না। প্রভুর কাছে যদি না জানিয়া কখন কোন দোষ করিয়া থাকি, প্রভু নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, দোষ ক্ষমা করুন।”

শিবজী চকিত হইয়া সেই বালক রঘুনাথের দিকে চাহিলেন, হৃদয়ের উদ্বেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না; সজল-নয়নে

রঘুনাথকে বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন, “রঘুনাথ! রঘুনাথ! তোমার নিকট শিবজী শত অপরাধে অপরাধী, কিন্তু এই মহৎ আচরণে আমাকে যথেষ্ট দণ্ড দিয়াছে। তোমাকে সনেহ করিয়াছিলাম, তোমার অবমাননা করিয়াছিলাম, অরণ করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। শিবজী যত দিন জীবিত থাকিবে, তোমার গুণ বিস্তৃত হইবে না, প্রণয় ও যত্নে যদি সে মহৎ গুণ পরিশোধ করা যায়, তবে পরিশোধ করিবার চেষ্টা করিবে।”

শাস্ত্র নিস্তক রজনীতে উভয়ে পরস্পরের আলিঙ্গনস্থখে বিযুক্ত হইলেন। রঘুনাথের ব্রত অদ্য শেষ হইল, শিবজীর হৃদয়বেদনা অদ্য দূর হইল, বালকের দ্বারা উভয়ে অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

উনত্রিশ পরিচ্ছেদ।

প্রাসাদে।

কি দারুণ বুকের ব্যথা।
সে দেশে বাইবে দেশে না শুনি
পাপ পিরীতের কথা।
সই। কে বলে পিরীত ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া
কাদিয়া জনম গেল।
কুলবতী হইয়া কুলে দাঁড়াইয়া
বেধনী পিরীত করে।
তুষের অনল যেন সাজাইয়া
এমতি পুড়িয়া মরে।
হায় বিদোদিনি, এ ছুঃখে দুঃখিনী,
প্রেমে হল ছল ছল আঁধি।
চণ্ডিদাস কহে, সে গতি হইয়া,
পরায় সংসার দেখি।
চণ্ডিদাস।

নিশীথে সীতাপতি গোস্বামীর নিকট বিদায় লইয়া রাজপুতবালা গৃহে আসিলেন, কিন্তু গৃহে আসিয়া সরসু দেখিলেন,

হৃদয় শূন্য ! বে বদেবীর বোঁদাকে প্রথম দর্শন করিয়াই সরযু চকিত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন, বাঁহাকে কয়েক মাস অবধি সরযু হৃদয়েবঁর বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন, বাঁহাকে রক্ত জনার্দিন বিবাহের বাক্যদান করিয়াছিলেন, সে রঘুনাথের আদর্শনে আজি সরযুর হৃদয় শূন্য !

সে দিন গেল, সপ্তাহ গত হইল, মাস অতিবাহিত হইল, সরযু হৃদয়ের ধন আর কিরিয়া পাইলেন না। অন্ধকার নিশীথে কখন কখন বালিকা একাকী গবাক-পার্শ্বে উপবেশন করিয়া সন্ধ্যা হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, দ্বিপ্রহর হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত চিন্তা করিতেন। দিবসে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নীরবে সেই গবাক দিয়া পথ-পানে চাহিয়া থাকিতেন, সে পথ দিয়া রঘুনাথ আর আসিলেন না !

কখন বা অপরাহ্নে এককী সরযু আশ্রয়-কাননে ভ্রমণ করিতেন, ভ্রমণ করিতে করিতে কত কথা হৃদয়ে জাগরিত হইত ! তোরণ-দুর্গের কথা, কঠমালার কথা, রায়গড়ে আগমনের কথা, বিদায়ের কথা। নীরবে সরযুর গণ্ডস্থল দিয়া এক এক বিন্দু অশ্রু বহিত, কখন কখন রক্তনীতে সহসা হৃদয়ের দ্বার উন্মোচিত হইত, ভাদ্রসাসের নদীর স্রায় শোকপারাবার উথলিয়া উঠিত। তখন কেহ দেখিবার নাই, সরযু প্রাণ ভরে কাঁদিতেন, আঁচন মাদের ধারার স্রায় নয়ন হইতে অজস্র বারিধারা বহিতে থাকিল। রক্তনী-প্রভাত হইত, প্রাতঃকালের রক্তমাচ্ছটা পূর্বেদিকে দেখা দিত। বালিকা তখনও স্নোকে বিবশা হইয়া নুর্গত থাকিত !

প্রাতঃকালে পুষ্পচয়ন করিতে উঠানে বাইতেন, প্রফুল্ল পুষ্পগুলি একে একে চয়ন করিতেন, হৃদয়ে স্থাপন করিতেন, আর কি

চিন্তা করিতেন, কে বলিবে ? চিন্তা করিতে করিতে পুনরায় পুষ্পের দিকে চাহিতেন, পুষ্পদলগত প্রাতঃশিরিষবিন্দুর সহিত দুই একটি পরিষ্কার স্বচ্ছ অশ্রুবিন্দু মিশাইয়া যাইত। সারংকালে বীণা হস্তে করিয়া কখন কখন গীত গাইতেন, আলা ! সে শোকের গীত শুনিয়া শ্রোতৃদিগের নয়নেও জল আসিত। এক্ষণ চিন্তায় ক্রমে সরযুর শরীর শুষ্ক হইতে লাগিল, মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল, নয়ন কালিমাযেষ্টিত হইল। সরলস্বভাব জনার্দিন এখনও সরযুর হৃদয়ের কথা কিছু জানেন না, কিন্তু সরযুর শরীরের অবস্থা দেখিয়া বৎপরোনাস্তি চিন্তিত হইলেন, কারণ অমূলসন্ধান করিতে লাগিলেন।

নারীর নিকট নারীর মনের কথা গুপ্ত থাকে না, সরযু অনেক যত্নে শোক সন্মোচন করিলেও তাঁহার সখী ও দাসীগণ তাঁহার গুপ্তকথা কিছু অজ্ঞান করিয়াছিল। তাহারা কথাগুলো রক্ত জনার্দিনকে বলিল, “সরযুর বয়স হইয়াছে, বিবাহ স্থির করুন।” সরযুর কানে এ কথা উঠিল। সরযু বলিয়া পাঠাইলেন, “পিতাকে বলিও, আমার বিবাহে রুচি নাই, চিরকাল অবিবাহিতা থাকিয়া তাঁহারই পদসেবা করিব।”

জনার্দিন সে কথা মানিলেন না, বিবাহের পাত্র স্থির করিতে লাগিলেন। রাজপুত্রো-হিত দ্বারা পালিত ভদ্র ক্ষত্রিয়কুলার পাত্রের অভাব ছিল না, অবশেষে রাজা জয়সিংহের একজন প্রধান সেনাপতির সহিত বিবাহ স্থির হইল। সরযুর কানে এ কথা উঠিল, সরযু শিহরিয়া উঠিলেন। লজ্জার মাথা খাইয়া পিতাকে বলিয়া পাঠাইলেন, “পিতাকে বলিও, তিনি অল্প একজন সেনা-নীকে বাক্যদান করিয়াছিলেন, তিনিই

আমার বাগ্গজ পতি। অহ কাগ্যরও সহিত
বিবাহ হইলে ব্যক্তিগত-দোষ ঘটবে।”

জনার্দিন এ কথা শুনিয়া রুষ্ট হইলেন,
সরযুকে কতক তিরস্কার করিলেন, আবার
নিজের স্বপ্নে গিয়া মনের দুঃখে কাঁদিলেন।
অবশেষে কস্তার আপত্তি গ্রাহ্য না করিয়া
বিবাহের দিন স্থির করিলেন, জয়সিংহকে
জানাইলেন। সরযু তানে এ কথা উঠিল।
সরযু তখন নিজে পিতার পদে দৃষ্টিত হইয়া
উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া বলিলেন, “পিতা,
কমা করুন, এ বিষয়ে দ্বন্দ্ব হউন, নচেৎ
আপনার চিরপালিতা এই অভাগিনী
কস্তাকে জন্মের মত হারাইবেন।” জনার্দিন
কস্তাকে বৃকে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কিন্তু কস্তার কথা কে গ্রাহ্য করে, পাঁচ
জন ভদ্রলোকে যেরূপ পরামর্শ দেয়, সমাজে
থাকিলে সেইরূপ কাজ করিতে হয়। বিবাহের
দিন নিকটে আসিতে লাগিল, জনার্দিন
অনেক বুঝাইলেন, অনেক কাঁদিলেন, অনেক
তিরস্কার করিলেন। অবশেষে আর সহ্য
করিতে না পারিয়া বিবাহের পূর্বদিন সর-
যুকে বলিলেন, “পাপীয়াসি, তোমার জন্ত কি
আমি এই বৃদ্ধবয়সে অবমানিত হইব? তুই
তোর পিতার নিঙ্কল কুলে কলঙ্ক দিবি?”

ধীরে ধীরে অশ্রুপূর্ণ-নমনে সরযু উত্তর
করিলেন, “পিতঃ! আমি অবোধ, যদি
আপনার নিকট দোষ করিয়া থাকি,
মার্জনা করুন। কিন্তু জগদীশ্বর আমার সহায়
হউন, আমা হইতে আপনার অবমাননা
হইবে না।”

এ কথার অর্থ তখন জনার্দিন বুঝিলেন
না, এ কথার অর্থ তাহার পরদিন বৃদ্ধ
বুঝিতে পারিলেন। বিবাহের দিন কন্যাকে
কেহ দেখিতে পাইল না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কুটীরে।

হুঃশে হুঃশে বুলনা শরৎকাল ভাবে।
আধিনে আসিবেন এত দেবীর উৎসবে।
কার্তিক মাসেতে হইল হিমের একাধ।
গৃহে নাহি প্রাণনাথ করি বনবাস।

মুহুরাম জন্মভূমি।

শরৎকালের প্রাতের কমনীর আলোকে
বেগবতী নীরানদী বহিয়া বাইতেছে, সূর্য্য-
কিরণে জলের হিল্লোল হাস্ত করিতে করিতে
বাইতেছে। সেই সুন্দর নদীর উত্তর পার্শ্বে
সুন্দর শতক্ষেত্র বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহি-
য়াছে, কৃষকের পূজার যেন সম্ভট হইয়া
যেদিনো সে হরিৎ পরিচ্ছদে হাস্ত করি-
তেছে। উত্তর ও পূর্বদিকে সেইরূপ শ্রামবর্ণ
ক্ষেত্র অথবা সুদূরে দুই একটি গ্রাম দৃষ্ট হই-
তেছে, দক্ষিণ ও পশ্চিমে পর্বতরাশির পর
পর্বতরাশি বাল-সূর্য্যাকিরণে অপরূপ শোভা
ধারণ করিতেছে।

সেই নদীকূলে শ্রামলক্ষেত্রবেষ্টিত এনটি
সুন্দর গ্রাম সন্নিবোধিত ছিল। গ্রামে এক
প্রান্তে একটি কৃষকের কুটীরের নিকট একটি
বালিকা নদীকূলে খেলা করিতেছে, নিকটে
একজন দাসী দণ্ডারমান রহিয়াছে। কৃষক-
পত্নী গৃহকার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছে।

গৃহ দেখিলে কৃষককে সম্ভ্রান্ত বলিয়াই
বোধ হয়। প্রাঙ্গণে দুই একটি গোলাঘর
রহিয়াছে, পার্শ্বে চারি পাঁচটি গরু বাধা
রহিয়াছে, বাটীর ভিতর তিন চারিখানি ঘর,
বাহিরে এনখানি বড় ঘর। দেখিলেই বোধ
হয়, গৃহস্বামী কৃষক হইলেও গ্রামের মধ্যে
একজন মাতঙ্গর লোক, ব্যবসা ও মহাজনী-
কার্য্যও কিছু কিছু করিয়া থাকে।

বালিকা সপ্তমবর্ষীয়া ও ভ্রামবর্ণী, চকল, প্রফুল্ল ও উজ্জলনরনা। একবার নদীকূলে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, একবার মাতা বে বরে রন্ধন করিতেছে, তথায় দৌড়াইয়া বাইতেছে, এক একবার দাসীর নিকট আসিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া কোন কথা কহিতেছে।

বালিকা বলিল, “দিদি, আর না, কাপড়ের মত ঘাটে বাই, কাপড় দিয়া মাছ ধুব।”

দাসী। হুনা দিদি, মা বারণ করেছেন, ঘাটে যেও না।

বালিকা। মা টের পাবে না।

দাসী। না, ছি। মা যা বারণ করেন, তা কর্তে নাই, মার কথা কি অন্যথা করে ?

বালিকা। আচ্ছা দিদি, মা কি তোরাও মা হয় ?

দাসী। হয় বৈ কি।

বালিকা। না, সত্য ক’রে বল।

দাসী। সত্যই মা হয়।

বালিকা। না দিদি, তুই যে রাজপুত্রের মেয়ে, আমরা ত রাজপুত্র নাই।

দাসী বালিকাকে চুখন করিল; বলিল, “তবে জিজ্ঞাসা কর কেন ?”

বালিকা। জিজ্ঞাসা করি, তবে তুই মাঝে মাঝে বলিস কেন ?

দাসী। যিনি আমাকে খেতে পবৃত্তে দিতেছেন, যিনি আমাকে থাকবার স্থান দিয়েছেন, যিনি আমাকে মেয়ের মত লালন-পালন করেন, তাঁকে মা বলব না ত কি বলব ? এ জগতে আমার অন্য স্থান নাই, মা আমাকে জগতে স্থান দিয়াছেন।

বালিকা। ছি দিদি, তোরা চকল কেন, তুই কথায় কথায় কাঁদিস কেন দিদি ?

দাসী। না দিদি, কাঁদব কেন ?

বালিকা। তোরা চাক জল দেখলে আমার চক্ষে জল আসে।

দাসী বালিকাকে পুনরায় চুখন করিয়া বলিল, “তুমি যে আমাকে ভালবাস।”

বালিকা। আর তুই আমাকে ভালবাসিস ?

দাসী। বাসি বৈ কি।

বালিকা। বরাবর ভালবাসবে, কখনও আমাকে ভুলবিন ?

দাসী। না। তুমি, দিদি, তুমি আমাকে ভালবাসবে, কখনও ভুলবে না ?

বালিকা। না।

দাসী। হাঁ, তুমি আমাকে একদিন ভুলবে।

বালিকা। কবে ?

দাসী। যবে তোমার বর আসবে।

বালিকা। সে কবে ?

দাসী। আর তুই এক বৎসরের মধ্যেই।

বালিকা। না দিদি, কখনও তোকে ভুলব না, বরের চেয়ে তোকে অধিক ভালবাসব। আর তুই দিদি, তোরা বধন বর আসবে, তখন আমাকে ভুলবিন ?

দাসী চক্রে পুনরায় জল আদিল, সে বলিল, “না, কখনও ভুলব না।”

বালিকা। বরের চেয়ে আমাকে অধিক ভালবাসবি ?

দাসী। হাত্ত করিয়া বলিল, “সমান সমান।”

বালিকা। তোরা বর কবে আসবে, দিদি ?

দাসী। ভগবান জানেন। ছাড়, রাত্রার বেলা হয়েছে, আমি বাই।

পাঠককে বলা অনাবশ্যক যে, অনাধিনী সরস্বালা জগতে আর স্থান না পাইয়া একজন কৃষকের বাগীতে দাসীত্ব বিচার

করিয়ছিলেন। কৃষকের কিছু সম্পত্তি ছিল, মহাজনী ছিল, নাম গোকর্ণনাথ। গোকর্ণের অন্তঃকরণ সরল ও স্নেহমূলক, নিরাশ্রয় রাজপুতকন্তাকে নিজের বাটীতে আশ্রয় দিতে স্বীকার করিলেন। গোকর্ণের গৃহিণীও স্বামীর উপযুক্ত, নিরাশ্রয় ভদ্র রাজপুতকন্তাকে দেখিয়া অবধি নিজের কন্টার ক্তার লালন-পালন করিতেন, সরস্ব ও কৃতজ্ঞ হইয়া গোকর্ণ ও তাঁহার স্ত্রীর যথোচিত সমাদর করিতেন, নিজে দুই বেলা অন্ন প্রস্তুত করিতেন, বালিকার তত্ত্বাবধারণ করিতেন, স্নতরাং কৃষক ও কৃষকস্ত্রীর কার্যের অনেক লাঘব হইল, তাঁহারাও দিন দিন সরস্বর উপর অধিক প্রসন্ন হইতে লাগিলেন।

রঘুনাথের অবস্ৰ্ত্তমানে যদি সরস্বর কোথাও স্নর্ধের সম্ভাবনা থাকিত, তবে উদারস্বভাব গোকর্ণনাথ ও তাঁহার সরলা গৃহিণীর বাটীতে থাকিয়া সরস্ব পরম সুখলাভ করিতে পারিতেন। গোকর্ণের বয়ঃক্রম ৪৫ বৎসর হইবে, কিন্তু চিরকাল নিয়মিত পরিশ্রম করিতেন বলিয়া এখনও শরীর সুবদ্ধ ও বলিষ্ঠ। গোকর্ণের একটি পুত্র শিবজীর সৈনিক, বহুদিন অবধি বাটা ত্যাগ করিয়াছে। শেষে যে একটি কন্তা হইয়াছিল, পিতামাতা উভয়েই তাহাকে ভালবাসিতেন। প্রাতঃকালে গোকর্ণ কৃষিকার্যে বা অস্ত্র কার্যে বাহির হইয়া যাইতেন, সরস্ব গৃহের সমস্ত কার্য নিরূহ করিতেন। গৃহিণী অনেক সময় বলিতেন, “বাছা, তুমি ভদ্রলোকের মেয়ে, এরূপ পরিশ্রম করিলে তোমার শরীর থাকিবে কেন? তোমার করিতে হইবে না, আমিই করিব।” সরস্ব সন্নেহে উত্তর করিতেন, “মা, তুমি আমাকে যে বস্ত্র কর, তোমার কাজ করিতে পরিশ্রম হয় না, আমি জন্ম জন্ম তোমার সেবা

করিব, তুমি আমাকে এইরূপ স্নেহ করিও।” স্নেহবাক্যে সরল-স্বভাবা বুদ্ধ গৃহিণীর নয়নে জল আসিত, চক্ষুর জল মুছিয়া বলিতেন, “সরস্ব! বাছা, তোমার মত আমাদের জাতির একটি মেয়ে পাই, তবে আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিই।” পুত্র অনেক দিন গৃহত্যাগ করিয়াছে, সে কথা স্মরণ করিয়া প্রাচীনা ক্ষণেক রোদন করিলেন।

এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল। একদিন সায়ংকালে গোকর্ণনাথ গৃহীণীর নিকট বসিয়া আছেন, একপাশে সরস্ব বালিকাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, এরূপ সময়ে গোকর্ণ বলিলেন, “গৃহিণি, শাস্ত্র হও, আজ সুসংবাদ আছে।” গৃহিণী। আহা, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক, বাছা ভীমজীর কোন সংবাদ পেরেছ?”

গোকর্ণ। শীঘ্রই পাব। পুত্র শিবজীর সহিত দিল্লী গিয়াছিল, অস্ত্র শুনিলাম, শিবজী দুষ্ট বাদশাহের হস্ত হইতে পলাইয়াছেন, দেশে আসিতেছেন। আমাদের ভীমজী অবশ্য তাঁহার সঙ্গে আসিবে।

গৃহিণী। আহা, ভগবান্ তাহাই করুন, প্রায় এক বৎসর হইল, বাছাকে না দেখিয়া যেমন কি অবস্থায় আছে, তা ভগবান্ই জানেন।

গোকর্ণ। ভীমজী অবশ্যই আসিবে, সে রঘুনাথজী হাবিলদারের অধীনে কার্য করিত, রঘুনাথজীরও সংবাদ পাইয়াছি।

সরস্বর হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল, উৎসেগে খাস রক্ত করিয়া তিনি গোকর্ণের কথা শুনিতে লাগিলেন। গোকর্ণ বলিতে লাগিলেন, “যে দিন রঘুনাথকে বিদ্রোহী বলিয়া শিবজী দূর করিয়া দেন, সে দিন পুত্র আমাদের কি বলিয়াছিল, মনে আছে?”

সুহৃদী । আমি বেরেয়াছ, আমার কি
অত মনে থাকে ?

গোকর্ণ । পুত্র বলিয়াছিল, “সিতা,
আমি হাবিলদারকে চিনি, তাঁহার স্ত্রীর বীর
শিবজীর সৈন্তে আর নাই । কি প্রয়ে পতিত
হইয়া রাজা তাঁহার অবমাননা করিলেন,
পশ্চাৎ জানিবেন, তখন তিনি রঘুনাথের
গুণ জানিতে পারিবেন ।” পুত্রের কথা এত
দিনে সত্য হইল ।

সরযুর স্বয়ং উল্লাসে, উৎসেগে ছক্ ছক্
করিতে লাগিল, তাঁহার মস্তক হইতে খেদ-
বিন্দু বহির্গত হইতে লাগিল ।

গোকর্ণনাথ বলিতে লাগিলেন, “রঘু-
নাথজী ছদ্মবেশে রাজার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী
গিয়াছিলেন, আপন বুদ্ধিকোশলে রাজাকে
উদ্ধার করিয়াছেন, সম্পূর্ণরূপে আপন নির্যো-
বিভা প্রমাণ করিয়াছেন । শুনিয়াছি,
শিবজী রঘুনাথের নিকট আপন দোষের
ক্ষমা চাহিয়াছেন, রঘুনাথকে ভ্রাতা বলিয়া
আলিঙ্গন করিয়াছেন ; হাবিলদারের পদ
হইতে একেবারে পাঁচহাজারী করিয়া দিয়া-
ছেন । সহরে অস্ত্র কথা নাই, হাটে বাজারে
অস্ত্র কথা নাই, গ্রামে অস্ত্র কথা নাই, কেবল
রঘুনাথের বীরত্বকথা শুনিয়া সকলে জয়
জয় নাদে ধ্বজবাদ দিতেছে ।”

আনন্দে, উল্লাসে, সরযু উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন
করিয়া ঝুম্ভিত হইয়া ঝুম্ভিতে পতিত
হইলেন !

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

—৪—

স্বপ্নদর্শন ।

ইহু কি আর বলিব আমি ।

সরণে জীবনে জননে, জনমে আগ্রাস হও ভূমি ।
ভোমার চরণে আমার পরাগে, বাহিলদার প্রেমেব ক'সী ।
সব সর্বাঙ্গী, একমন হইয়া, নিশ্চর হইলাম দাসী ।
ভাবিয়া দেখিলাম, এতিনতুধনে, আর কেহ মোর আছে ।
রাখা বলি কেহ হুণাইতে নাই ঠাঁড়ার কাহার কাত ।
একলে শুকলে গোহুতে দুহলে আপনার বলিব কার ।
শীতল বলিয়া শরণ লইলাম ও দুটি কবল-পায় ।

চণ্ডিমালা ।

সেই দিন অবধি সরযুর আকৃতি কিরিল ।
বহদিন পর আশা, আনন্দ ও উল্লাস আবার
সেই স্বয়ং হান পাইল । নয়ন দুইটি আবার
হাসিল, গুঠ দুইটি আবার প্রস্ফুটিত পুষ্পের
স্তায় পরিমল ধারণ করিল, ললাট ও হৃদয়
গুণ্ডুলে আবার লবণা জুটিল, রেশম-বিন-
লিত কেশগুলি আবার সেই সুন্দর, মধুময়,
লাবণ্যময় মুখখানিকে লইয়া খেলা করিতে
লাগিল । প্রাতঃকালের স্নানর সমীরণের
সহিত দুরবুদ্ধ হইতে কোকিল-রব আসিলে
সরযু উল্লাসিত-স্বয়ং সেই রব শুনিতে ন;
অপরাত্নে গৃহকার্য্য সমাপন করিয়া নদীকূলে
দণ্ডায়মান হইয়া নয়ন দুইটি স্বর্বা-উত্তাপ
হইতে হস্ত দ্বারা আবরণ করিয়া নদীর অপর
পার্শ্বে বহুদূর পর্য্যন্ত চাহিয়া থাকিতেন ।
আবার সন্ধ্যার সময় দূরে বংশীধ্বনি হইলে
চকিত যুগের স্তায় সহসা চমকিয়া উঠিতেন ।

গোকর্ণের কথা পর্য্যন্ত সরযুর এই পরি-
বর্তন দেখিতে পাইল । একদিন সন্ধ্যার সময়
নদীর ঘাটে বাইবার সময় কস্তা জিজ্ঞাসা
করিল, “দাদি, দিন দিন তোমার রূপ কেমন
হুটে বেরুচ্ছে ।”

“রম ! কে বলে ?

বালিকা। বলবে কে? আমি বুঝি দেখতে পাই না?

সরযু। না, ও তোমার দেখবার ভুল।

বালিকা। হাঁ, ভুল বৈ কি? আর আগে মাথার কিছু থাকত না, এখন মধ্যে মধ্যে চুলের ভিতর ভুল পোঁজা হয়, তা বুঝি দেখতে পাই না?

সরযু। দূর।

বালিকা। আর লুকিয়ে লুকিয়ে গলার একটি কর্ণমালা পরা হয়, তাতে ছুটা ক'রে মুক্তা, একটি ক'রে পলা, তা বুঝি আমি দেখতে পাই না?

সরযু। দূর।

বালিকা। আর নদীর তীরে অনেকক্ষণ ধরে স্নানর মুখখানি জলে দেখা হয়, তা বুঝি আমি দেখি না?

সরযু। মিথ্যাকথা বলো না।

বালিকা। আর গাছতলার লুকিয়ে মধ্যে মধ্যে কুহু করে গান করা হয়, তা বুঝি আমি শুনি না?

সরযু। এবার আসিয়া বালিকার মুখ চাপিয়া ধরিল।

বালিকা হাসিতে হাসিতে বলিল, “আমি এ সব কথা থাকে বলে দিব।”

সরযু। না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, বলো না।

বালিকা। তবে একটা কথা লিজাসা করি, বলিবে?

সরযু। বলব।

বালিকা। এর অর্থ কি? এ পুষ্প, এ কর্ণমালা, এ গীত কার জন্ত? তোর চক্ষু ছুটা যে সদাই হাসছে, তোর গুঠ ছুটা যে রক্তে কেটে পড়ছে, তোর সমস্ত শরীর বে লাষণ্যে ঢল ঢল করছে, এ কার জন্ত?

সরযু। তোমার মা তোমার বোঁপা বেঁধে দেন, গহনা পরিয়ে দেন, সে কার জন্ত?

বালিকা এবার একটু লজ্জিত হইল; বলিল, “মা বলেছেন, অ গামো বৎসর আমার বিবাহ হবে, আমার বর আসবে।”

সরযু। আমারও বর আসবে।”

বালিকা। সত্য?

সরযুর সহিত বালিকার কথা হইতেছিল, একদা সময় একজন দীর্ঘায় সরযু। “হর হর মহাদেও” শব্দ উচ্চারণ করি নদীতীরে উপনীত হইলেন। সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে তাঁহার বিভূতি-ভূষিত দীর্ঘ শরীর বড় সুন্দর দেখাইল। বালিকা ভয়ে পলায়ন করিল। সরযু তাঁহুদৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, সন্ধ্যাসী সীতাপতি গোস্বামী।

সরযুর স্বপ্নের সহসা কল্পিত হইল, মনের আবেগে সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু সরযু সে আবেগ সংবম করিয়া লজ্জা বা ভয় তাগ করিয়া ধীরে ধীরে সন্ধ্যাসীর নিকট যাইয়া প্রণাম করিয়া স্থিরভাবে বলিলেন, “প্রভু, আপনি যে অভাগিনীকে এক দিন জনার্দনের প্রাণদে দেখিয়াছিলেন, তাহাকে অত এই কটীবে দাসীকার্যে নিযুক্ত দেখিতেছেন। পিতা কলঙ্কিনী বলিয়া আমাকে দূরীকৃত করিয়াছেন, কিন্তু ভগবান জানেন, আমি বাগ্‌দত্ত পতির অনুচারণী, ইহা ভিন্ন আমার অঙ্গ দোষ নাই।”

সন্ধ্যাসীর নয়ন জলে পূর্ণ হইল, ধীরে ধীরে বলিলেন, “রঘুনাথের জন্ত এত কষ্ট সহ করিয়াছ?”

সরযু। নারী বৎ দিন পতির নাম জপিতে পারে, তত দিন কষ্টকে কষ্ট বলিয়া বোধ করে না।

সন্ধ্যাসীর বক্ষঃস্থল ক্ষীত হইতে লাগিল।

সরযু আবার বলিলেন, “প্রভুর সহিত কি সেই দেবপুরুষের সাক্ষাৎ হইয়াছিল ?”

গোস্বামী । হইয়াছিল ।

সরযু । প্রভু তাঁহাকে দাসীর কথা জানাইয়াছিলেন ?

গোস্বামী । জানাইয়াছিলাম ।

সরযু । কি জানাইয়াছিলেন ?

গোস্বামী । আপনার একটি বাক্য, একটি অক্ষরও বিস্মৃত হই নাই । আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, “সরযু রাজপুতবাণী, জীবন অপেক্ষা বশ অধিক জ্ঞান করে । সরযু যত দিন জীবিত থাকিবে, রঘুনাথকে কলঙ্কশূন্য বীর বলিয়া তাঁহারই বশোগীত গাইবে ।”

সরযু । ভাল ।

গোস্বামী । আমি তাঁহাকে আরও জানাইয়াছিলাম, যদি কর্তব্য-সাধনে তাঁহার প্রাণবিরোগ হয়, সরযু তাঁহার বশোগীত গাহিতে গাহিতে উল্লাসে নিজ প্রাণ বিসর্জন দিবে ।

সরযু । ভাল ।

গোস্বামী । আমি আরও তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, সরযু তাঁহার উন্নত উদ্দেশ্য প্রতিরোধ করিবে না । রঘুনাথ অসিহস্তে যশের পথ পরিষ্কার করুন, যিনি জগতের আদিপুরুষ, তিনি তাঁহার সহায় হইবেন ।

উৎসব-গঙ্গদগদগদে সরযু জিজ্ঞাসা করিলেন, “তিনি কি উত্তর প্রদান করিয়াছেন ?”

অলস-বরে গোস্বামী উত্তর করিলেন, “রঘুনাথ উত্তর দান করেন নাই, কেবল আপনার কথাগুলি হৃদয়ে বারংবার আপনাকে অসাধ্যসাধন করিয়াছেন, অসিহস্তে যশের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন ।”

সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে গোস্বামীর নরন-ধক ধক করিয়া জলিতেছিল, সেই নদীতীরে

ও বৃক্ষমধ্যে গোস্বামীর অলস বাক্যগুলি বার বার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল ।

“যিনি জগতের আদিপুরুষ, তাঁহাকে প্রণাম করি এই বলিয়া সরযুবালা আকাশের দিকে লক্ষ্য করিয়া ষোড়শকোণে প্রণাম করিলেন । গোস্বামীও জগতের আদিপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া প্রণাম করিলেন ।

অনেকক্ষণ উভয়ে নিমন্ত হইয়া রহিলেন, সন্ধ্যার সুশীতল সমীরণে উভয়ের শরীর শীতল হইল, নরনের অল শুকাইয়া গেল ।

অনেকক্ষণ পর গোস্বামী কহিলেন, “দেবতার প্রসাদে কার্য্যসিদ্ধি করিবার পর রঘুনাথ একটি কথা আমার দ্বারা আপনার নিকট বলিয়া পাঠাইয়াছেন ।”

সরযু উৎকর্ষিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে কি ?”

গোস্বামী । তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এতদিন সরযু তাঁহার দাসকে মনে রাখিবেন ? আমি বাইলে সরযু আমাকে চিনিতে পারিবেন ?

সরযু । এ জীবনে কি আমি তাঁহাকে ভুলিতে পারি ?

গোস্বামী । আপনার ভালবাসা তিনি জানেন, তথাপি নারীর মন সর্বদাই চপল, কি জানি, যদি ভুলিয়া গিয়া থাকেন ।

গোস্বামীর চপল ও দ্বৈব হস্ত দেখিয়া সরযু কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন, কহিলেন, “নারীর মন চপল, তাহা আমি জানিতাম না ।”

গোস্বামী । আমিও জানিতাম না, কিন্তু অদ্য দেখিতেছি ।

সরযু । কিসে দেখিলেন ?

গোস্বামী । যিনি আমার বাৎস্তা বধু, তিনি আমাকে অস্ত্র ভুলিয়াছেন, দেখিয়াও আমাকে চিনিতে পারেন নাই ।

সরযু! সে কোন্ হস্তভাগিনী?

গোপ্যবতী। তিনি সেই ভাগ্যবতী, যাহাকে তোরণদ্বর্গে জনাঙ্গনের গৃহের ছায়ে প্রথম দর্শন করিয়া আমি মন-প্রাণ হারাইয়া-ছিলাম। তিনি সেই ভাগ্যবতী, যাহার কণ্ঠে একদিন মুক্তমালা পরাইয়া দিয়া আমি জীবন চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলাম। তিনি সেই ভাগ্যবতী, যিনি তোরণদ্বর্গে জয়সিংহের শিবিরে, যুদ্ধের সময় ও সন্ধির সময়, সর্বদাই আমার নয়নের মণির স্থায় ছিলেন। তিনি সেই ভাগ্যবতী, যাহার দর্শন আমার নয়নে সূর্যালোক, যাহার শব্দ আমার কর্ণে সংগীত, যাহার স্পর্শ আমার শরীরে চন্দন-প্রলেপ, যাহার প্রীতি আমার জীবনের জীবন! তিনি সেই ভাগ্যবতী, যাহার নাম স্মরণ করিয়া, যাহার জলন্ত উৎসাহবাক্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া, আমি দিল্লীযাত্রা করিয়া-ছিলাম, যশের পথ পরিষ্কার করিয়াছি, জলন্ত বিপদ-সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছি। বহদিন পর, বহু বিপদ পার হইয়া, অতঃ সেই ভাগ্যবতীর চরণোপাঙ্গে উপস্থিত হইয়াছি, তিনি কি আজ আমাকে চিনিতে পারিবেন?

সেই কোকিল-বিনিম্বিত স্বর সরযুর হৃদয় মহন করিল, তারকালোকে ছন্দবেশ-ধারী সেই দীর্ঘকার পুরুষশ্রেষ্ঠকে সরযু চিনিতে পারিলেন। সরযু হৃদয়ের আবেগ আর সংবরণ করিতে পারিলেন না, তাঁহার মস্তক ঘুরিতেছিল, নয়ন মুদিত হইয়াছিল। “রঘুনাথ! ক্ষমা কর।”—এইমাত্র কহিয়া সরযু রঘুনাথের দিকে হস্তপ্রসারণ করিলেন। পতনোন্মুখ প্রিয় দেহ রঘুনাথ নিজ অঙ্গে ধারণ করিলেন, সেই উদ্বেগপূর্ণ হৃদয় আপন হৃদয়ে স্থাপন করিলেন।

কণ্ঠে পর চৈতন্ত-লাভ করিয়া সরযু নয়ন উন্মীলিত করিলেন। কি দেখিলেন?

হৃদয়নাথ অভাগিনীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া-ছেন, চির-প্রার্থিত পতি আজ সরযুনাথকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়াছেন।

বহদিন পর আজ সরযুর তপ্ত হৃদয় রঘুনাথের প্রশান্ত হৃদয়-স্পর্শে শীতল হইল; সরযুর ঘনশ্বাস রঘুনাথের নিশ্বাসে মিশ্রিত হইল, সরযুর কম্পিত রক্তবর্ণ ওষ্ঠদ্বয় জীবনের মধ্যে প্রথমবার রঘুনাথের ওষ্ঠ স্পর্শ করিল।

সে সংস্পর্শে বালিকা শিহরিয়া উঠিল। সেই প্রিয় প্রগাঢ় আলিঙ্গনে, সেই বারংবার ঘন চুষনে বালিকা কাঁপিতে লাগিল।

এ কি প্রকৃত, না স্বপ্ন?

বায়ুতাড়িত পত্রের স্থায় কাঁপিতে কাঁপিতে সরযু মনে মনে বলিলেন, “জগদী-শ্বর! এ যদি স্বপ্ন হয়, যেন হৃৎনিদ্রা হইতে কখনও না জাগ্রিত হই।”

— — —

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

— — —

জীবন-নির্ব্বাণ।

হাসিয়া বলেন ভীষ্ম গুহর রাজন।

যথা বর্ধ তথা জয় অবশ্য ঘটন।

বর্ধ অতঃসারে জয় ইশ্বর-বচন।

কান্দিয়াব দাস।

মহারাষ্ট্রদেশে মহাসমারোহ আরম্ভ হইল। শিবজী প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, পুনরায় আরম্ভজীবের সহিত যুদ্ধ করিবেন, স্নেহমিগকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিবেন, হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করিবেন। নগরে, গ্রামে, পথে, ঘাটে এই জনরব হইতে লাগিল।

একদা রাজা জয়সিংহ বিজয়পুর নগর আক্রমণ করিয়াও সে স্থান হস্তগত করিতে পারিলেন না। তিনি বার বার দিল্লীর সম্রাটের

নিকট সহায়তার জন্য যে আবেদন করেছিলেন, তাহাও বিফল হইল, অবশেষে তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন যে, তাঁহার সৈন্তসম্মত বিনাশ ভিন্ন আরংজীবের অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। তখন তিনি বিজয়পুর পরিত্যাগ করিয়া আরঙ্গাবাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

শেষ পর্য্যন্ত আরংজীবের বিষয় অল্পচরের দ্বারা কার্য্য করিলেন; আরংজীব তাঁহার প্রতি অভ্যস্ত আচরণ করিয়াছেন বলিয়া মুহুর্তের জন্যও সম্রাটের কার্য্যে ঔদাস্য প্রকাশ করিলেন না। যখন নিশ্চয় দেখিলেন, মহারাষ্ট্রদেশ ত্যাগ করিয়া বাইতে হইবে, তখন পর্য্যন্ত যত দূর সাধ্য সম্রাটের ক্ষমতারক্ষার চেষ্টা করিলেন। লৌহগড়, সিংহগড়, পুরন্দর প্রভৃতি স্থানে সম্রাটের সেনা সন্নিবেশিত করিলেন, তত্ত্বিৎ যে যে দুর্গ অধিকারে রাখিবার সম্ভাবনা ছিল না, সে সমস্ত একেবারে চূর্ণ করিয়া দিলেন, যেন আর শত্রুরা ব্যবহার করিতে না পারে।

কিন্তু এ জগতে একুপ বিপুল কার্য্যের পুরস্কার নাই। জয়সিংহ অকৃতকার্য্য হইয়াছেন শুনিয়া আরংজীব ব্যংগপেরোনাতি সন্তুষ্ট হইলেন, আরও অবমানিত করিবার জন্য তাঁহাকে দক্ষিণদেশের সেনাপতিত্ব হইতে অপসৃত করিয়া দিল্লীতে তলব করিলেন; যশোবন্ত সিংহকে তাঁহার স্থলে পাঠাইয়া দিলেন।

বুদ্ধ সেনাপতি আজীবন সাধ্যমতে দিল্লীর কার্য্যসাধন করিয়াছিলেন, শেষদশায় এ অবমাননার তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইল, তিনি পূর্বেই মৃত্যুশয্যা শায়িত হইলেন।

অবমানিত, পীড়িত, বৃদ্ধ জয়সিংহ মৃত্যুশয্যা শায়িত রহিয়াছেন, একুপ সময় একজন দূত সংবাদ দিলেন, “মহারাজ, একজন মহারাজীর-সেনানী আপনার দর্শনাভিলাষী, তিনি আপনার চরণোপান্তে বসিয়া একদিন

উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর একবার উপদেশ পাইবার জন্য আসিয়াছেন।”

রাজা উত্তর করিলেন, “সম্মানপূর্ব্বক লইয়া আইস। যে মহাপুরুষ আসিয়াছেন, আমি তাঁহাকে বিশেষরূপে জানি। তিনি আশুন, আমি তাঁহাকে নির্ভর দিতেছি।”

কণেক পর একজন মহারাষ্ট্র ছদ্মবেশে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাজা তাঁহার দিকে না চাহিয়াই বলিলেন, “সুহৃদ শিবজী, মৃত্যুর পূর্বে আর একবার আপনার সহিত দেখা হইল, চরিতার্থ হইলাম। উত্তীর্ণা অভ্যর্থনা করিবার ক্ষমতা নাই, দোষ গ্রহণ করিবেন না।”

সজলনয়নে শিবজী বলিলেন, “পিতঃ! যখন শেষ আপনার নিকট বিদায় লইরা ছিলাম, তখন আপনাকে এত শীঘ্র এরূপ অবস্থায় দেখিব, কখনও মনে করি নাই।”

জয়সিংহ। রাজনু! মৃত্যুবাগদেহ ক্ষণভঙ্গুর, ইহাতে বিস্ময় কি? শিবজী, আমাদের শেষ যখন সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আপনি মোগল-সাম্রাজ্যের গৌরব দেখিয়াছিলেন, এখন কি দেখিতেছেন?

শিবজী। মহারাজ সেই সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন, আপনাকে যখন এ অবস্থায় দেখিতেছি, তখন মোগলসাম্রাজ্যের আর আশা নাই।

জয়সিংহ। বৎস! তাহা নহে। রাজ-স্থানভূমি বীরপ্রসবিনী, জয়সিংহ মরিলে অল্প জয়সিংহ হইবে, জয়সিংহের দ্বার শত বোদ্ধা এখনও বর্তমান আছেন। মানুষ একজন লোকের মৃত্যুতে সাম্রাজ্যের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

শিবজী। আপনার অমঙ্গল অপেক্ষা সাম্রাজ্যের আর অধিক কি অনিষ্ট হইতে পারে?

জয়সিংহ। শিবজী! একজন বোদ্ধা

বাইলে অস্ত্র বোঝা হয়, কিন্তু পাণ বে
করনাথন করে, তাহার পুনঃসংস্কার হয় না।
আমি পূর্বেই বলিয়াছিলাম, বখার পাণ ও
কপটাচারিতা, তখার অবনতি ও বৃত্তা।
একণে প্রত্যক্ষ তাহা অবলোকন করুন।

শিবজী! নিবেদন করুন।

জয়সিংহ! যখন আপনাকে আমি দিল্লী
পাঠাইয়াছিলাম, তখন আপনার হৃদয়ও
দিল্লীখরের দিকে আকৃষ্ট হইরাছিল, আপ-
নার স্থির-সঙ্কল্প ছিল, দিল্লীখর যত দিন আপ-
নাকে বিশ্বাস করিবেন, আপনি তত দিন
বিশ্বাসবাক্যকতা করিবেন না। আপনার
প্রতি সদাচরণ করিলে, সম্রাটের দক্ষিণদেশে
একজন পরাক্রান্ত বহু থাকিত, কপটাচরণ-
বশতঃ সেই স্থানে একজন দুর্দমনীয় শত্রু
হইরাছে।

শিবজী! মহারাজ! আপনার বুদ্ধি
অসাধারণ ও বহুদূরদর্শী, অগতে সকলে বখা-
বাই জয়সিংহকে বিজ্ঞ বলিয়া জানে।

জয়সিংহ! আমি আরঞ্জীবের পিতার
সময় হইতে দিল্লীর কার্য্য করিয়াছি।
বিপদে, যুদ্ধসময়ে, যতদূর সাধ্য, দিল্লীখরের
উপকার করিয়াছি। স্বজাতি বিজ্ঞাতি
বিবেচনা করি নাই, আত্মপর বিবেচনা
করি নাই, যাহার কার্য্যে ত্রুটি হইরাছি,
জীবন পণ করিয়া তাহার কার্য্যসাধন করি-
য়াছি। বৃদ্ধকালে সম্রাট আমার প্রতি
প্রথমে অসদাচরণ করিলেন, পরে অবমাননা
করিলেন। তথাপি ঈশ্বরের আশ্রয়
কার্য্যে বৈলক্ষ্য্য ঘটে নাই, আমি যে সমস্ত
সৈন্য প্রধান প্রধান চূর্ণে রাখিয়া বাইলাম,
শিবজী, তাহারা বিনা যুদ্ধে আপনাকে চূর্ণ
হস্তগত করিতে দিবে না। কিন্তু এ আচরণে
আরঞ্জীব স্বয়ং কতিপয় হইলেন। অধরাধি-
পের দিল্লীখরের চিরবিষম অহুচর ও সহায়,

অধরের ভবিষ্যৎ রাজগণ দিল্লীর প্রধান শত্রু
হইবে।

শিবজী! আপনি প্রকৃত কথাই বলিয়া-
ছেন। আরঞ্জীব আপন অসদাচরণে
অধর ও মহারাষ্ট্র এই দুইটি দেশকে তাহার
শত্রু করিয়াছেন।

জয়সিংহ! দুইটি উদাহরণ দিলাম,
মহারাষ্ট্রদেশ ও অধরদেশ। সমস্ত ভারত-
বর্ষ এইরূপ। শিবজী! আরঞ্জীব সমস্ত
ভারতবর্ষের বিখ্যাত অহুচরের অবমাননা
করিতেছেন, মিত্রদিগকে শত্রু করিতেছেন।
বারাণসী-মন্দির বিনষ্ট করিয়া তখার মসজিদ
নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন, রাজস্থানে হিন্দুদিগের
অবমাননা করিতেছেন, সমস্ত দেশ হিন্দু-
দিগের উপর জিজিয়া দিয়া স্থাপন
করিতেছেন।

কণেক পরে নয়ন মুদিত করিয়া জয়-
সিংহ অতি গভীরস্বরে পুনরায় কহিতে
লাগিলেন, যেন মৃত্যুশয্যায় মহাত্মার দিবা
চক্ষু উন্মীলিত হইল, সেই চক্ষুতে ভবিষ্যৎ
দেখিয়াই যেন রাজর্ষি কহিতে লাগিলেন,
“শিবজী! আমি দেখিতেছি যে, এই
কপটাচারিতার চারিদিকে যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত
হইল, রাজস্থানে অনল জলিল, মহারাষ্ট্রদেশে
অনল জলিল, পূর্বাধিকে অনল জলিল!
আরঞ্জীব বিংশতি বৎসর যত্ন করিয়া সে
অনল নির্মাণ করিতে পারিলেন না।
তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তাঁহার অসামান্য কৌশল,
তাঁহার অসাধারণ সাহস ব্যর্থ হইল; বৃদ্ধ-
বয়সে পশ্চাত্তাপ করিয়া দিল্লীখর প্রাণত্যাগ
করিলেন। অনল আরও প্রবলবেগে জলি-
তেছে, চারিদিক হইতে ধূ ধূ শব্দে আগ্রসর
হইতেছে, সেই অনলে যোগল-সাম্রাজ্য দগ্ধ
হইয়া গেল। তাহার পর? তাহার পর,
মহারাষ্ট্র জাতির লক্ষ্য উন্নতিশীল, মহারাষ্ট্র-র-

৭। অগ্রসর হও, দিল্লীর শূত্র সিংহাসনে
টপবেশন কর ।”

রাজার বচনরোধ হইল। চিকিৎস-
করা পার্বে ছিলেন, তাঁহারা নানারূপ
সন্দেহ করিতে লাগিলেন, গোপনে অস্ত্র-
বরে রোগের প্রকৃত কারণ অনুভব করিতে
লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পর যুদ্ধেরে জরসিংহ বলি-
লেন, “কপটাচারী আপনাকেই শাস্তিদান
করে, সত্যমেব জয়তি ।”

খাসরোধ হইল, শরীর হইতে প্রাণ বহি-
গত হইল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

—

মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত ।

ধর্ম্মের আছে বত, দাজ শীত্র করি
চতুরঙ্গে রণরঙ্গে ভুলিব এ আলা—
এ বিবম আলা যদি পারি রে ভুলিতে ।

বধুস্বদন দত্ত ।

রজনী এক প্রহর মাত্র আছে, এরূপ
সময়ে শিবজী রাজপুত্র-শিবির ত্যাগ করি-
লেন। প্রাতঃকালের পূর্বেই প্রধান প্রধান
সেনানী ও অমাত্যদিগকে একত্র করিলেন,
কণেক পরামর্শ করিলেন, পরে শিবিরের
বাহিরে আসিয়া আপনার সমস্ত সৈন্ত
আহ্বান করিয়া বলিলেন, “বন্ধুগণ! প্রায় এক
বৎসর হইল, আমরা আরংজীবের সহিত
সন্ধিস্থাপন করিতেছিলাম, আরংজীবের
নিজের দোষে ও কপটাচারিতায় সে সন্ধি-
খণ্ডন হইয়াছে। অতঃপর আমরা সে কপট
আচরণের প্রতিশোধ দিব, মুসলমানদিগের
সহিত পুনরায় যুদ্ধ করিব।

যিনি আরংজীবের প্রধান সেনাপতি
ছিলেন, ঈশানীদেবী বাহার সহিত যুদ্ধ-
নিবেধ করিয়াছিলেন, বাহার নিকট শিবজী
বিনা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন, কল্যা
নিশীথে সেই মহাত্মা রাজা জরসিংহ আরং-
জীবের অসদাচরণে প্রাণবিসর্জন করিয়া-
ছেন। সৈন্তগণ! দিল্লীতে আমার কারা-
রোধ, হিন্দুদের জরসিংহের মৃত্যু, এ সমস্ত
একণে আমরা পরিশোধ করিব।

মৃত্যুশয্যায় রাজা জরসিংহের দিবাচকু
উন্নীলিত হইয়াছিল, তিনি দেখিলেন,
মোগলদিগের ভাগ্যানকজ অবনতিশীল,
মহারাষ্ট্রদিগের ভাগ্য-নকজ উন্নতিশীল,
দিল্লীর সিংহাসন দ্বার শূত্র। বন্ধুগণ!
অগ্রসর হও, পৃথ্বীরের সিংহাসন আমরা
অধিকার করিব।

“পূর্বদিকে রক্তমাছটা দোথতে পাই-
তেছ, ও প্রভাতের রক্তমাছটা। কিন্তু
উঃ! আমাদের পক্ষে সামান্য প্রভাত নহে—
মহারাষ্ট্রগণ! অতঃপর আমাদের জীবন-
প্রভাত ।”

সমস্ত সেনানী ও সৈন্তগণ এই মহৎ বাক্য
শুনিয়া গজিয়া উঠিল, “অতঃপর আমাদের
জীবন-প্রভাত ।”

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ :

বিচার ।

পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হইল উচিত ।

কাশীনাথ দাস ।

সেই দিবস সন্ধ্যার সময় রঘুনাথ একাকী
নদীতীরে পদচারণ করিতেছিলেন। আপ-

নার পদোন্নতি, সন্তান সহিত পুনর্জন্ম, মুসলমানদিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধ, হিন্দু-দিগের ভাবী স্বাধীনতা, এরূপ নতন নতন বিষয়ের চিন্তার তাঁহার হৃদয় উৎক্ল হইতেছিল। সহসা পক্ষাৎ হইতে একজন ডাকিলেন, “রঘুনাথ।”

রঘুনাথ পক্ষাদিকে চাহিয়া দেখিলেন, চন্দ্রাও জ্বলাদার। রোষে তাঁহার শরীর কাঁপিতেছিল, কিন্তু কেশানী-মন্দিরের প্রতিজ্ঞা তিনি বিস্মৃত হন নাই।

চন্দ্রাও বলিলেন, “রঘুনাথ! এ জগতে তোমার ও আমার উভয়ের স্থান নাই। একজন মরিব।”

রঘুনাথ রোষ সংবরণ করিয়া ধীরস্বরে বলিলেন, “চন্দ্রাও! কপটাচারী মিত্র-হত্যা চন্দ্রাও! তোমার উপযুক্ত শাস্তি শিরচ্ছেদন, কিন্তু রঘুনাথ তোমাকে ক্ষমা করিলেন, জগদীশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।”

চন্দ্রাও। বালকের ক্ষমা গ্রহণ করা আমার অভ্যাস নাই। তোমার আর অধিক জীবিত থাকিবার সময় নাই, মন দিয়া আমার কথাগুলি শুন। জন্ম অবধি তুমি আমার পরম শত্রু, আমি তোমার পরম শত্রু। বাল্যকালে তোমাতে আমি বিষ-চক্ষুতে দেখিতাম, সহস্রবার প্রস্তরের উপর তোমার মস্তক আঘাত করিবার সঙ্কল্প মনে উদয় হইয়াছে। তাহা করি নাই, কিন্তু তোমার বিষয় নাশ করিয়াছি, তোমাকে দেশভ্যাগী করিয়াছি, তোমাকে বিদ্রোহী বলিয়া অপমানিত ও দূরীকৃত করিয়াছি। চন্দ্রাওয়ের ভীষণ জিহাংসা তাহাতে কিয়ৎ-পরিমাণে শান্ত হইয়াছিল। তোমার ভাগ্য মন্দ, পুনরায় উন্নত-পদ লাভ করিয়া দৈন্ত-মধ্যে আসিরাছ। চন্দ্রাওয়ের স্থিরপ্রতিজ্ঞা

জীবনে কখন নিফল হয় নাই, এখনও হইবে না। অস্ত্র উপায় ত্যাগ করিলাম, এই অসি দ্বারা তোমার হৃদয় বিদ্ধ করিব, হৃদয়ের শোণিতপান করিয়া এ ভীষণ পিপাসা নিরূপণ করিব। ভীক! অস্ত্র আমার হস্তে রক্ষা নাই।

রোষে রঘুনাথের নয়ন অগ্নিবৎ জ্বলিতেছিল, ক্షিপিতস্বরে বলিলেন, “পামর! সমুদ্র হইতে দূর হ, নচেৎ আমি পবিত্র প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইব, তোর পাপের দণ্ড দিব।”

চন্দ্রাও। ভীক! এখনও যুদ্ধে পরাধুত? তবে আরও শোন। উজ্জয়িনীর যুদ্ধে যে তীরে তোর পিতার হৃদয় বিদ্ধ হইয়াছিল, সে শত্রুনিষ্কিপ্ত নহে, চন্দ্রাও তোর গিড়-হস্তা।

রঘুনাথ আর নয়নে কিছু দেখিতে পাইলেন না, কর্ণে শুনিতে পাইলেন না, রোষে অসি নিক্ষেপিত করিয়া চন্দ্রাওকে আক্রমণ করিলেন। চন্দ্রাও ক্ষীণহস্তে অসিধারণ করেন নাই, অনেকক্ষণ যুদ্ধ হইল, উভয়ের অসিতে উভয়ের-চাল ক্ষত হইল, শরীরও ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল, বর্ষার ধারার স্রাব উভয়ের শরীর দিয়া রক্ত বহিতে লাগিল। চন্দ্রাও বলে ন্যূন নহেন, কিন্তু রঘুনাথ দিল্লীতে চমৎকার অসিযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর তিনি চন্দ্রাওকে পরাস্ত করিলেন, তাঁহাকে ভূমিতে পাতিত করিয়া তাঁহার বক্ষস্থলে জাহ্নুস্থাপন করিলেন, পরে বলিলেন, “পামর! অস্ত্র তোর পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত হইল, পিতার মৃত্যুর পরিশোধ হইল।”

মৃত্যুর সময়েও চন্দ্রাও নিভীক, তিনি বিকট হাস্ত হাসিয়া বলিলেন, “আর তোর ভগিনী বিধবা হইল, সে চিন্তা করিয়া স্মৃতে প্রাণবিসর্জন করিব।”

বিদ্যাতের স্তায় সমস্ত কথা তখন রঘুনাথের মনে উপলব্ধি হইল। এই অস্ত্র লক্ষী বামীর নাম করে নাই, এ অস্ত্র চন্দ্রাওয়ের অনিষ্ট না হয়, প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পিতৃ-হত্যা রক্তপিণ্ড চন্দ্রাও বলপূর্বক প্রাপের লক্ষ্যকে বিবাহ করিয়াছে। রোষে রঘুনাথের নরন দিয়া অগ্নি বহির্গত হইতে লাগিল, কিন্তু তাহার উন্নত অসি চন্দ্রাওয়ের হৃদয়ে স্থাপিত হইল না। তিনি ধীরে ধীরে চন্দ্রাওকে ছাড়িয়া দিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

উভয় যোদ্ধা পরস্পরের দিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া রোষে প্রজ্জ্বলিত হৃদাশনের স্তায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। চন্দ্রাও অসিযুদ্ধে পরাজিত হইয়া ধূলি ও কর্দমে ধূসরিত হইয়া বিকট অনুরের স্তায় আরক্ত-নয়নে রঘুনাথের দিকে চাহিতে লাগিলেন। রঘুনাথ পিতার হত্যা-কথা ও ভগিনীর অবমাননা-কথা স্মরণ করিয়া রোষে, অভিমানে ও জিহ্বাংসার বিদগ্ধচেতা, অথচ শান্তিদানে অপারগ হইয়া চিত্তার্পিত ব্রতহস্তার স্তায় দণ্ডায়মান রহিলেন। এমন সময় বৃক্ষের অন্তরাল হইতে সহসা একজন যোদ্ধা নিষ্ক্রান্ত হইলেন। উভয়ে সভয়ে দেখিলেন—শিবজী!

শিবজী কোন কথা কহিলেন না, কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, আপনার সহচর চারিজন সৈন্যকে ইঙ্গিত করিলেন। সেই চারিজন সৈনিক নিম্নত্রে চন্দ্রাওয়ের নিকট আসিয়া তাহার হস্ত হইতে অসি ও চর্ম কাড়িয়া লইয়া, তাহার হস্তের পশ্চাতে বদ্ধ করিয়া বন্দী করিয়া লইয়া গেল। শিবজী অদৃষ্ট হইলেন, রঘুনাথ চকিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

পরদিন প্রাতে চন্দ্রাওয়ের বিচার। তিনি রঘুনাথের পিতাকে হনন করিয়াছিলেন, সে দোষের বিচার নহে; রঘুনাথকে

কল্যা আক্রমণ করিয়াছিলেন, সে দোষের বিচার নহে। রুদ্রমণ্ডল-দুর্গ আক্রমণের পূর্বে শত্রু রহমৎ খাঁকে চন্দ্রাওই সংবাদ দিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অদ্য তাহারই বিচার।

পূর্বে বলা হইয়াছে, আকপান সেনাপতি রহমৎ খাঁ রুদ্রমণ্ডলে বন্দী হইলে পর শিবজী তাঁহাকে ভদ্রাচরণ পূর্বক ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, রহমৎ খাঁ স্বাধীনতা-প্রাপ্ত হইয়া আপন প্রভু বিজয়পুরের সুলতানের নিকট গমন করিয়াছিলেন। জয়সিংহ যখন বিজয়পুর আক্রমণ করেন, তখন রহমৎ খাঁ আপন নৈসর্গিক সাহসের সহিত যুদ্ধ করেন, একটি যুদ্ধে অতিশয় আহত হইয়া জয়সিংহের বন্দী হন। জয়সিংহ তাঁহাকে আপন শিবিরে আনাইয়া অনেক বহু ও শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে রোগ আরাম হইল না, তাহাতেই রহমৎ খাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর পূর্বদিন জয়সিংহ রহমৎ খাঁকে বলিলেন, “খাঁ সাহেব! আপনার আর অধিক পরমায়ু নাই, আমার সমস্ত বৃত্ত ও চিকিৎসা বুঝা হইল। এক্ষণে যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে, তবে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।”

রহমৎ খাঁ বলিলেন, “আমার মরণের জন্ত আক্ষেপ নাই, কিন্তু আপনি শত্রু হইয়া আমার প্রতি বৈরূপ সদাচরণ করিয়াছেন, তাহার পরিশোধ করিতে পারিলাম না, এই আক্ষেপ রহিল। কি জিজ্ঞাসা করিবেন, করুন, আপনার নিকট আমার অবজ্ঞা কিছুই নাই।”

জয়সিংহ। রুদ্রমণ্ডল আক্রমণের পূর্বে একজন শিবজীর সেনানী আপনাকে সংবাদ দিয়াছিল। সে কে, আমরা জানি না, আমাদের বোধ হয়, একজন অস্তায়রূপে দণ্ডিত হইয়াছে।

রহস্য। আমি জীবিত থাকিতে সে নাথ প্রকাশ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। রাজপুত্র! আপনার ভ্রাতারূপে আমি অতিশয় সম্মানিত হইয়াছি, কিন্তু পাঠান প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে অশক্ত।

জয়সিংহ। বোঝা! আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে আমি বলিতেছি না, কিন্তু যদি কোন নিদর্শন থাকে, তাহা আমাকে দিতে আপত্তি আছে?

রহস্য। প্রতিজ্ঞা করুন, সে নিদর্শন আমার মৃত্যুর পূর্বে পাঠ করিবেন না?

জয়সিংহ তাহাই প্রতিজ্ঞা করিলেন, তখন রহস্য ণী তাঁহাকে কতকগুলি কাগজ দিলেন। রহস্যের মৃত্যুর পরে রাজা জয়সিংহ সেই সমস্ত পত্রাদি পাঠ করিয়া দেখিলেন, বিদ্রোহী চন্দ্রাও।

চন্দ্রাও রহস্য বাঁকে স্বহস্তলিখিত, পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা রাজা পড়িলেন, সে সময়ে সমস্ত যে যে কাগজ ছিল, তাহাও পাঠ করিলেন, চন্দ্রাও পাঠানদিগের নিকট যে পারিতোষিক পাইয়াছিলেন, তাহার প্রাপ্তিস্বীকার পর্যন্ত রাজা জয়সিংহ দেখিলেন। জয়সিংহের মৃত্যুর দিনে তাঁহার মন্ত্রী সেই সমস্ত কাগজ শিবজীকে দিয়াছিলেন।

বিচারকার্যে অধিক সময় আবশ্যক হইল না। শিবজীর চিরবিষমস্ত্র মন্ত্রী রঘুনাথ নারশাহী একে একে সেই পত্রগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন। যখন পাঠ সমাধা হইল, তখন রোষে সমস্ত সেনানীগণ গর্জন করিয়া উঠিলেন। চন্দ্রাও বিদ্রোহী, স্বয়ং শত্রুদিগকে সংবাদ দিয়া পারিতোষিক গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দোষে নির্দোষী নিরাক্রম বীর রঘুনাথের প্রাণদণ্ডের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এ কথা সকলে জানিতে পারিয়া রোষে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন।

তখন শিবজী বলিলেন, “পাণাচারী বিদ্রোহী, তোর মৃত্যু নিকট, তোর কিছু বলিবার আছে?”

মৃত্যুসময়েও চন্দ্রাও নির্ভীক, তাঁহার দুর্দমনীয় দর্প ও অভিমান এখনও পূর্ববৎ। বলিলেন, “আমি আর কি বলিব? আপনার বিচার-কমতা প্রসিদ্ধ। একদিন এ দোষে রঘুনাথকে দণ্ড দিয়াছিলেন, অদ্য আমাকে দণ্ড দিতেছেন, আমার মৃত্যুর পর আর একদিন আর একজনকে দণ্ড দিবেন, তখন জানিবেন, চন্দ্রাও এ বিষয়ের বিন্দু-বিসর্গও জানে না, এ সমস্ত প্রমাণ জাল।”

এই বিজ্ঞপ্তি শিবজী শুক জুড় হইয়া আদেশ করিলেন,—“জ্ঞাদ, চন্দ্রাওয়ের দুই হস্ত ছেদন কর, তাহা হইলে আর ঘৃণা লইতে পারিবে না। তাহার পর তপ্ত লৌহ দ্বারা ললাটে ‘বিশ্বাসঘাতক’ অঙ্কিত করিয়া দাও, তাহা হইলে আর কেহ বিশ্বাস করিবে না।”

জ্ঞাদ এই নৃশংস আদেশ পালন করিতে বাইতেছিল, এরূপ সময় রঘুনাথ দণ্ডারমান হইয়া কহিলেন,—“মহারাজ! আমার একটি নিবেদন আছে।”

শিবজী। রঘুনাথ! এ বিষয়ে তোমার নিবেদন আমার অবশ্য শুনিব; কেন না, এই পামর তোমারই প্রাণনাশের যত্ন করিয়াছিল; তাহার কি প্রতিহিংসা লইতে ইচ্ছা কর, নিবেদন কর।

রঘুনাথ। মহারাজের অঙ্গীকার অলঙ্ঘ্য। আমি এই প্রতিহিংসা যাচা করি যে, চন্দ্রাওয়ের কেশাগ্রও কেহ স্পর্শ না করে,—অগ্রগ্রহ করিয়া বিনা দণ্ডে মুক্তি দিন।

সভাস্থ সকলে বিস্মিত ও শুক!

শিবজী ক্রোধ সংবরণ করিয়া কহিলেন, “তোমার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিল,

মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত ।

তোবার অহুরোধে এই চন্দ্রাণ্ডকে কমা করিলাম । রাজবিজ্ঞোহাচরণের শান্তি দিবার অধিকারী রাজা । সে শান্তির আদেশ করি-
রাছি, জন্মান, আপন কার্য্য কর ।”

রঘুনাথ । মহারাষ্ট্রের বিচার অনিশ্চয়, কিন্তু দাস প্রভুর নিকট ভিক্ষা চাহিতেছে, চন্দ্রাণ্ডকে বিনা দণ্ডে মুক্তিদান করুন ।

শিবজী । এ ভিক্ষাদানে আমি অসমর্থ, রঘুনাথ, তোমাকে এবার কমা করিলাম, অত্বে এতদূর কমা করিতাম না । শিবজীর আদেশের উপর কথা কহিও না ।

রঘুনাথ । প্রভু, দুই একটি মুহুর্তে এ দাস প্রভুর কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিল, প্রভুও দাসকে অভিলষিত পুরস্কার দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন । অদ্য সেই পুরস্কার চাহিতেছি, চন্দ্রাণ্ডকে বিনা দণ্ডে মুক্ত করুন ।

রোধে শিবজীর নয়ন হইতে অশ্রিকণা বাহির হইতেছিল ; গর্জন করিয়া বলিলেন, “রঘুনাথ ! রঘুনাথ ! কখন কখন আমাদের উপকার করিয়াছিলে বলিয়া অদ্য আমা-
দিগের বিচার অত্থা করিতে চাহ ? রাজ-
আদেশ অত্থা হয় না ; তুমিও আপনার বীরত্বের কথা আপনি বলিতে কাস্ত হও ।”

এ তিরস্কার-বাক্যে রঘুনাথের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল । তিনি ধীরে ধীরে কম্পিতস্বরে উত্তর করিলেন, “প্রভু ! পুরস্কার চাহা দাসের অভ্যাস নাই । অদ্য জীবনের যথো প্রথমবার পুরস্কার চাহিয়াছি । প্রভু যদি এ পুরস্কারদানে অসম্মত হয়েন, এ দাস দ্বিতীয়-
বার চাহিবে না । দাসের কেবল এইমাত্র ভিক্ষা, প্রভু সদয় হইয়া তাহাকে বিদায় দিন । রঘুনাথ সৈনিকের ব্রত ত্যাগ করিবে, পুনরায় গোস্বামী হইয়া দেশে দেশে ভিক্ষা করিতে থাকিবে ।”

শিবজী কণেক নিমুহ ও নিম্পন্দ হইয়া

রহিলেন । তখন একজন অমাত্য নিকটে আসিয়া কানে কানে জানাইল, চন্দ্রাণ্ড রঘু-
নাথের ভগিনীপতি, সেই ভ্রাতৃ রঘুনাথ ভগিনীপতির প্রাণতিকা করিতেছেন ।

তখন বিষয়পূর্ণ হইয়া শিবজী চন্দ্রাণ্ডকে থালাস দিবার আদেশ করিলেন । শেষে বজ্রদণ্ডে বলিলেন, “বাও চন্দ্রাণ্ড, শিব-
জীর রাজ্য হইতে বহিস্কৃত হও । অত্বে দেশে যাও, অত্বে আত্মীয়-বুট্টকে বধ কর, অত্বে মিত্রের সর্বনাশ-সাধন কর, শত্রুর নিকটে উৎকোচ গ্রহণ, ষড়্‌ব্যয় ও বিজ্ঞোহাচরণ করিতে করিতে পাণজীবনের অবশিষ্ট ভাগ সমাপ্ত কর ।”

চন্দ্রাণ্ড ভীক নহেন । ধীরে ধীরে ক্রোধ-জর্জরিত শরীরে রঘুনাথের নিকট বাইয়া বলিলেন,—“বালক ! তোর দয়া আমি চাহি না, তোর দেওয়া জীবন আমি তুচ্ছ করি !” পরক্ষণেই আপন ছুরিকা নিজ বক্ষস্থলে স্থাপন করিয়া অভিমাত্রী ভীষণ-
প্রতিজ্ঞা চন্দ্রাণ্ড জুহুলাদার আপনার চির-
নিষ্কৃতি-সাধন করিলেন । জীবনশূন্য দেহ সভাস্থলে পতিত হইল ।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

ভ্রাতা ভগিনী ।

হৃত পরিবার,
কেবা বল কার,
যেমন বৃক্ষের ছায়া ।
জলবিধ-প্রায়,
সকল মিছাময়,
কেবল ভবের মায়া ।

কুতিবাস ভবা ।

আমাদের আধ্যাতিক । শেষ হইয়াছে ;
একধে উপস্তাস-লিখিত ব্যক্তিদগের বিবরণ
দুই একটি কথা বলিয়া বিদায় লইব ।

বুদ্ধ জনাৰ্দ্দন পান্ডিত-কঙ্কাকে হারাইয়া বাতুলের স্থান হইয়াছিলেন, পুনরায় সরযুকে পাইয়া আনন্দাত্ম বর্ণন করিতে লাগিলেন। তিনি পুনরুক্ত-জনরে রঘুনাথকে আত্মান করিলেন, সানন্দজনরে শুভদিনে কঙ্কাদান করিলেন, সরযুর অর্থ কে বর্ণনা করিবে? চারি বৎসর যে দেবকান্তির জপ করিয়াছিলেন, সেই পুঙ্খবদেব যখন সরযুকে কোমল জনরে ধারণ করিলেন, সরযুর ওষ্ঠে উক ওষ্ঠ স্থাপন করিলেন, তখন সরযু উন্মাদিনী হইলেন।

আর রঘুনাথ?—রঘুনাথ তোরণদুর্গে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা সার্থক হইল। সেই প্রিয় কণ্ঠমালা বার বার সরযুর হৃদয়ে দোলাইয়া দিলেন, সেই পুষ্পবিনিমিত্ত দেহ হৃদয়ে ধারণ করিলেন, সেই বিশাল মেহপূর্ণ নয়নের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অগৎ-বিস্মৃত হইলেন।

সরযু তাঁহার সম্ভবমবীয়া “দিদি”কে বিস্মৃত হইলেন না। রঘুনাথের অল্পরোধে শিবজী গোকর্ণকে একটি জারগীর দান করিলেন ও গোকর্ণের পুত্র ভীমজীকে উন্নীত করিয়া হাবিলদার-পদে নিযুক্ত করিলেন।

সরযু দিদির সর্বদাই আপন গৃহে রাখিতেন ও বরের সহিত “সমান সমান” ভাণ্ডাসিঙেন, এবং কয়েক বৎসর পরে একটি সম্বন্ধীয় সূচরিত্র পাত্র দেখিয়া দিদির বিবাহ দিলেন। বিবাহদিবসে সরযু ও রঘুনাথ অগৎ উপস্থিত রহিলেন। সরযু কঙ্কার কানে কানে বলিলেন,—“দেখিও দিদি! বাহা বলিয়াছিলে, সে কথা যবে রাখিও, বরের চেয়ে আমাকে ভালবাসিবে।”

রঘুনাথ আধ্যাতিকাবিবৃত সময়ের পর জরোদন বৎসর পর্য্যন্ত সুখ্যাতি ও সম্মানের সহিত শিবজীর অধীনে কাৰ্য্য করিতে লাগিলেন। বশোদন সিংহ যখন জানিতে পারি-

লেন যে, রঘুনাথ তাঁহারই প্রিয় অল্পচর গজপতি সিংহের পুত্র, তখন রঘুনাথকে বদশে আত্মান করিলেন। কিন্তু শিবজী রঘুনাথকে দেশে বাইতে দিলেন না, যত দিন জীবিত ছিলেন, রঘুনাথকে নিকটে রাখিলেন। পরে যখন ১৬৮০ খৃঃ অব্দের চৈত্র মাসে শিবজীর মৃত্যু হয়, তখন শিবজীর অযোগ্য পুত্র শঙ্কুজী পিতার পুরাতন ভৃত্যদিগকে একে একে অপমানিত বা কারকরূপ করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ আর মহারাষ্ট্রে থাকিলে উপকার নাই দেখিয়া সরযু ও জনাৰ্দ্দনের সতি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। স্বদেশে পুরাতন দুর্গে তিলকসিংহের প্রপৌত্র প্রবেশ করিলেন।

পাঠক! ইচ্ছা, এই স্থানেই আপনার নিকট বিদায় লই, কিন্তু আর একজনের কথা বলিতে বাকী আছে, শাস্ত চিরসফিফু লক্ষ্মী-রূপিণী লক্ষ্মীর কথা বলিতে বাকী আছে।

যে দিন চন্দ্ররাও আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, রঘুনাথ সেই দিনই ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাইলেন। বাঁহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় শুভিত হইল। দেখিলেন, শবের পার্শ্বে লক্ষ্মী আনুলায়িতকেশে গড়াগড়ি দিতেছেন, ঘন ঘন মোহ হাইতেছেন, সময়ে সময়ে হৃদয়বিদারক আৰ্ত্তনাদে ঘর পরিপূরিত করিতেছেন। হিন্দুধর্মীয় পতির মৃত্যুতে যে ভীষণ ব্যতনা হয়, তাহা বর্ণন করিতে পারে? অল্প লক্ষ্মীর মৃত্যুর আলোক নির্মল হইয়াছে, হৃদয় পুত্র হইয়াছে, অগৎ অন্ধকারময় হইয়াছে। সেদিন বিবাহে, নৈরাত্রে, নব-বৈধবের হৃদয় ব্যতনার বিধবা ঘন ঘন আত্মহত্যা করিতেছে।

রঘুনাথ সাধনা করিবার চেষ্টা করিলেন। সাধনা দূরে থাকুক, লক্ষ্মী প্রাণের প্রান্তকে চিনিতেও পারিলেন না। সরযুর কণ্ঠ

অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে রঘুনাথ গৃহ হইতে নিজান্ত হইলেন ।

সন্ধ্যার সময় রঘুনাথ পুনরায় ভগিনীকে দেখিতে আসিলেন, লক্ষ্মীর ভাবগরিবর্তন দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন । দেখিলেন, লক্ষ্মীর নরনে জল নাই, ধীরে ধীরে স্বামীর মৃতদেহ স্মরণে অঙ্গুষ্ঠ পুষ্প দিয়া সাজাইতেছেন । বালিকা বেক্সপ মনোনিবেশ করিয়া পুতলি সাজায়, লক্ষ্মী সেইরূপ মনোনিবেশ পূর্বক মৃতদেহ সাজাইতেছেন ।

রঘুনাথ গৃহে আসিলে, লক্ষ্মী ধীরে ধীরে রঘুনাথের নিকটে আসিলেন, অতি মৃদু-পদ-বিক্ষেপে আসিলেন যে, শব্দ হইলে স্বামীর নিজান্ত হইবে ! অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, “ভাই রঘুনাথ ! তোমার সঙ্গে যে আর একবার দেখা হইল, আমার পরম ভাগ্য, এখন আর আমার মনে কোন কষ্ট থাকিল না ।”

শাস্ত্রনয়নে রঘুনাথ বলিলেন, “প্রাণের ভগিনী লক্ষ্মি, আমি তোমার সঙ্গে এ সময়ে দেখা না করিয়া কি থাকিতে পারি ?”

লক্ষ্মী অকল দিয়া রঘুনাথের চক্ষের জল মোচন করিয়া বলিলেন, “সত্য ভাই, তোমার দরার শরীর, তুমি হৃদয়েবরের অস্ত্র রাজার নিকট যে আবেদন করিয়াছিলে, তুমিরাছি । আমার ভাগ্যে বাহা ছিল, তাহা হইয়াছে, জগদীশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন ।”

রঘুনাথ : লক্ষ্মি ! তুমি বুদ্ধিমতী, আমি ভিন্নকালেই আমি, এ সমস্ত শোক কথঞ্চিৎ সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়া ছুটি হইলাম । মৃত্যুর বীড়ন ভাবিয়া, তোমার কপালে বাহা ছিল, লক্ষ্মি, সে শোক সহিষ্ণু হইয়া বহন কর । আইস, আমার গৃহে আইস, ভ্রাতার জলধালা, ভ্রাতার ঘরে যদি সন্তোষ দান করিতে পারে, লক্ষ্মি, আমি ক্রটি করিব না ।

লক্ষ্মী একটু হাসিলেন । সে হস্ত দেথিয়া

রঘুনাথের প্রাণ শুকাইয়া গেল । ঈষৎ হাসিয়া লক্ষ্মী বলিলেন, “ভাই, তোমার দরার শরীর, কিন্তু লক্ষ্মীকে জগদীশ্বরই স্বয়ং সান্নিধ্য করিয়াছেন, শাস্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, তিনি জীবদশার দাসীকে অতিশয় ভাল-বাসিতেন, দাসী জীবনে তাঁহার প্রণয়িনী ছিল, মরণে তাঁহার সঙ্গিনী হইবে ।”

রঘুনাথের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল । তখন তিনি লক্ষ্মীর ভাব-পরিবর্তনের কারণ বুঝিতে পারিলেন, লক্ষ্মীর শান্তভাবে হেতু বুঝিতে পারিলেন । লক্ষ্মী সহমরণে স্থির-সংকল্প হইয়াছেন ।

তখন রঘুনাথ অনেককণ অবধি লক্ষ্মীর প্রতিজ্ঞাভঙ্গের চেষ্টা করিলেন, অনেক বুঝাইলেন, অনেক ক্রন্দন করিলেন, এক প্রহর রজনী পর্যন্ত লক্ষ্মীর সহিত তর্ক করিলেন । ধীর শান্ত লক্ষ্মীর একই উত্তর,—“হৃদয়েবর আমাকে বড় ভালবাসিতেন, আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না ।”

অবশেষে রঘুনাথ সজলনয়নে বলিলেন, “লক্ষ্মি ! একদিন আমার জীবন নৈরাশ্রে পূর্ণ হইয়াছিল, আমি জীবনত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিলাম । ভগিনী, তোমার প্রবেশে, তোমার স্নেহময় কথার সে সঙ্কল্প ছাড়িলাম, পুনরায় কার্যজগতে প্রবেশ করিলাম । লক্ষ্মি, তুমি কি ভ্রাতার কথা রাখিবে না ? তুমি কি ভ্রাতাকে ভালবাস না ?”

লক্ষ্মী পূর্ববৎ শান্তভাবে উত্তর করিলেন, “ভাই, সে কথা আমি বিস্মৃত হই নাই, তুমি লক্ষ্মীকে ভালবাস, লক্ষ্মীর কথা তুমি রাখিলে, তাহা বিস্মৃত হই নাই । কিন্তু ভাবিয়া দেখ, পুরুষের অনেক আশা, অনেক উদ্দেশ্য, অনেক অবলম্বন, একটি বাইলে অসংখ্য থাকে, একটি চেষ্টা নিফল হইলে দ্বিতীয়টি সফল হয় । ভাই, তুমি সে দিন ভবিষ্যত

কথাটি রাখিয়াছিলে, অতঃ তোমার কলঙ্ক দূরীভূত হইয়াছে, কুমতী-বৃদ্ধি হইয়াছে, সুবশ দেশ-দেশান্তরে বিস্তৃত হইয়াছে। কিন্তু অভাগিনী নারীর কি আছে? অতঃ আমি যে নরনের মণিটি হারাইয়াছি, তাহা কি জীবনে আর পাইব? যে মহাত্মা দাসীকে এত ভালবাসিতেন, এত অঙ্গগ্রহ করিতেন, জীবিত থাকিলে তাঁহাকে কি আর পাইব? ভাই! তুমি লক্ষ্মীকে বালাকাল হইতে বড় ভালবাসিয়াছ, অতঃ সদয় হও। লক্ষ্মীর একমাত্র সুখের পথে কটক হইও না, যিনি দাসীকে এত ভালবাসিতেন, তাঁহার সহিত যাইতে দাও।”

রঘুনাথ নিরন্ত হইলেন, স্নেহময়ী ভগিনীর অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া বাগকের স্তায় স্বল্প অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এ অসার কপট সংসারে ভ্রাতা-ভগিনীর অখণ্ডনীয় প্রণয়ের স্তায় পরিভ্রান্ত ব্রিদ্ধ প্রণয় আর কি আছে? স্নেহময়ী ভগিনীর স্তায় অমূল্য রত্ন এ বিস্তীর্ণ জগতে আর কোথায় যাইলে পাইব?

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় চিতা প্রস্তুত হইল। চন্দ্ররাওয়ের শব তাহার উপর স্থাপিত হইল। হস্তাবদনা লক্ষ্মী স্নান পটবস্ত্র ও অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়া একে একে সকলের নিকট বিদায় লইলেন।

লক্ষ্মী চিতাপার্শ্বে আসিলেন, দাসীদিগকে অলঙ্কার, রত্ন, মুক্তা বিতরণ করিতে লাগিলেন, স্বহস্তে তাহাদিগের নয়নের জল মোচন করিয়া মধুর-বাক্যে সাঙ্গুনা করিতে লাগিলেন। জ্ঞাতি কুটুম্বিনীদিগের নিকট বিদায় লইলেন, গুরুদিগের পদধূলি লইলেন। সকলের নয়নের জল অঞ্চল দিয়া মুছাইয়া দিলেন, মধুময় বাক্য দ্বারা সকলকে প্রবোধ দিলেন।

শেষে লক্ষ্মী রঘুনাথের নিকট আসিলেন,

বলিলেন, “ভাই! বালাকাল অবধি তোমার লক্ষ্মীকে বড় ভালবাসিতে, অতঃ লক্ষ্মী ভাগ্যবতী, অতঃ চিরসুখিনী হইবে, এববার ভালবাসার কাজ কর, সন্নেহে কনিষ্ঠ ভগিনীকে বিদায় দাও, তোমার লক্ষ্মীকে বিদায় দাও।”

রঘুনাথ আর সঙ্ক করিতে পারিলেন না, লক্ষ্মীর দুটি হাত ধরিয়া বাগকের স্তায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। লক্ষ্মীরও চক্ষুতে জল আসিল।

সন্নেহে ভ্রাতার চক্ষুর জল মুছাইয়া লক্ষ্মী বলিতে লাগিলেন, “ছি ভাই, শুভকার্যে চক্ষুর জল ফেল কি জন্ত? পিতার স্তায় তোমার সাহস, পিতার স্তায় তোমার মহৎ অন্তঃকরণ, জগদীশ্বর তোমার আরও সম্মান বৃদ্ধি করিবেন, জগৎ তোমার বশে পূর্ণ হইবে। লক্ষ্মীর শেষ বাসনা এই, জগদীশ্বর যেন রঘুনাথকে সুখে রাখেন! ভাই, বিদায় দাও, দাসীর জন্ত স্বামী অপেক্ষা করিতেছেন।”

কাতরস্বরে রঘুনাথ বলিলেন, “লক্ষ্মি, তোমা বিনা জগৎ তুচ্ছ জ্ঞান হইতেছে, জগতে আর রঘুনাথের কি আছে? প্রাণের লক্ষ্মি! তোকে কিরূপে বিদায় দিব, তোকে কিভাবে আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব?”— আর্তনাদ করিয়া রঘুনাথ ভূমিতে পতিত হইলেন।

অনেক যত্ন করিয়া লক্ষ্মী রঘুনাথকে উঠাইলেন, পুনরায় চক্ষুর জল মুছিয়া দিলেন : অনেক সাঙ্গুনা করিলেন, অনেক বুঝাইলেন, বলিলেন, “ভাই, তুমি বীরশ্রেষ্ঠ, পুরুষের বাহা ধর্ম, তাহা তুমি পালন করিতেছ, তোমার লক্ষ্মীকে নারীর ধর্ম পালন করিতে দাও। আর বিলম্ব করিও না, বাধা দিও না। ঐ দেখ, পূর্বদিকে আকাশ রক্তবর্ণ হইয়াছে, তোমার লক্ষ্মীকে বিদায় দাও।”

মহারাজু জীবন প্রভাত।

গদগদস্বরে রত্ননাথ বলিলেন, “লক্ষ্মি, প্রাণের লক্ষ্মি, এ জগতে তোমাকে বিদায় দিলাম; ঐ আকাশে, ঐ পুণ্যধামে আর একবার তোমাকে পাইব; সে পর্য্যন্ত জীবন্যুত হইয়া রহিলাম।”

ব্রাতার চরণধূলি লইয়া লক্ষ্মী চিতাপাশে যাইলেন, স্বামীর পদদ্বয়ে মস্তকস্থাপন করিয়া বলিলেন, “হৃদয়েশ্বর! জীবনে তুমি বড় ভালবাসিতে, এখন অনুগ্রহ কর, যেন তোমার পদপ্রান্তে বসিয়া তোমার সঙ্গে যাইতে পারি। জন্ম জন্ম যেন তোমাকে স্বামী পাই, জন্ম জন্ম যেন লক্ষ্মী তোমার পদসেবা করিতে পার।”

ধীরে ধীরে লক্ষ্মী চিতা আরোহণ করিলেন; স্বামীর পদপ্রান্তে বসিলেন, পদদ্বয় ভক্তিভাবে অঙ্কের উপর উঠাইয়া লইলেন। নরন মুদিত করিলেন. বোধ হইল যেন, সেই মুহূর্ত্তেই লক্ষ্মীর আত্মা স্বর্গে প্রবেশ করিল।

অগ্নি জলিল; অভিশয় দ্বত থাকায় শীঘ্র অগ্নি ধূ ধূ শব্দে জলিয়া উঠিল। প্রথমে অগ্নিজিহ্বা লক্ষ্মীর পবিত্র শরীর লেহন করিতে লাগিল, শীঘ্রই সত্যে চারিদিক বেঠেন করিয়া লক্ষ্মীর মস্তকের উপর উঠিল, নৈশ গগনের দিকে মহাশব্দে ধাবমান হইল। লক্ষ্মীর একটি অঙ্গ নড়িল না, একটি কেশ কম্পিত হইল না।

উপহার ।

স্বদেশপ্রিয়, আনন্দিক, উদারচরিত্র,

জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত ।

প্রিয় ভ্রাতঃ !

এই সংসার-স্বরূপ ভীষণ কার্যক্ষেত্রে তোমার স্নেহ, তোমার ভালবাসা, আমার জীবনের শান্তিস্বরূপ হইয়াছে। শৈশবে ঐ স্নেহে আমি পুষ্ট হইয়াছিলাম, বাল্যকালে ঐ ভালবাসায় আমি শিষ্ট ও প্রফুল্ল হইয়াছিলাম। এখনও জীবনের নানা আকাজক্ষায় বখন ক্লান্ত হই, বহুদূরে প্রবাসে জীবনের অনন্ত চেষ্টা-পরম্পরায় বখন আঁশ্রিত হই, প্রণয়ের অলীকতায় বা সংসারের বাহাড়ম্বরে বখন বিরক্ত হই, তখন ঐ আদর্শরূপ নির্মল চরিত্র, ঐ অকৃত্রিম আনন্দিক স্নেহের কথা চিন্তা করি, আমার হৃদয় শীতল হয়, আমি শান্তি লাভ করি।

জগৎ এ সমস্ত কথা জানে না, এ কথা কাহাকে বলিব, কে বুঝিবে? জগতে নানা আকাজক্ষার কথা শুনিতে পাই, ধন, মান, খ্যাতি, ক্ষমতার জন্য অনন্ত চেষ্টা ও উত্তম দেখিতে পাই, এই চেষ্টার ভ্রাতাকে ভ্রাতা ঠেলিয়া বাইতেছে, পিতাকে পুত্র ঠেলিয়া বাইতেছে। এ ভীষণ কার্যক্ষেত্রে তোমার ন্যায় ঋণিতুল্য আনন্দিক লোক অলঙ্কিত, অপরিচিত, অনাদৃত !

শৈশব ও বাল্যকালের একমাত্র সহচর! জীবনের প্রথম প্রিয়তম সহৃদ! ত্রিংশ বৎসর যে তোমার অতুল স্নেহে প্রফুল্লতা ও শান্তি লাভ করিয়াছে, অচ্ছ সে তোমাকে এই সামান্য উপহার দান করিয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিল।

ত্রিপুরা,

১২৮৫ বঙ্গাব্দ ।

তোমার চিরস্নেহাভিলাষী

শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত ।

রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

আহেরিয়া ।

ভুবঃ কল্পবিব অনয়তা চরণশব্দেন, কর্ণক্ঠৈল্যানাঞ্চ
বদকলকুর-কাবিন-কঠকুজিতকলেন
শরদিকরবর্ণিণাং ধনুবাং বিনাদেন * *
এচলিতবিব তদরণামভবৎ ।

কাদম্বরী ।

১৫৭৬ খৃঃ অব্দের কান্তনমাসের প্রথম
দিবসে মেওয়ার-প্রদেশের অভ্যন্তরে সূর্য্য-
মহল নামক পর্ব্বত-দুর্গে মহাকোলাহল শ্রুত
হইল । একটি উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গে এই দুর্গ
নির্ম্মিত, দুর্গের চারিদিকে কেবল পাদপপূর্ণ
পর্ব্বতশ্রেণী বা বৃক্ষাচ্ছাদিত উপত্যকা বহুদূর
পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে । প্রাতঃকালের বাল-
সূর্য্য-কিরণ এই অনন্ত পর্ব্বত ও উপত্যকাকে
সুবর্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে এবং প্রাতঃ-
কালের মন্দ মন্দ বায়ুচিল্লোনে সেই অনন্ত
পাদপশ্রেণী হইতে স্মন্দ মন্দরশব্দ নিঃসৃত
হইতেছে । পরে পরে শিশিরবিন্দু মুক্তা-
সৌন্দর্য্য অমুকরণ করিতেছে, বসন্তের পক্ষি-
গণ ডালে ডালে গান করিতেছে এবং সেই
প্রাচীর হইতে বতদূর দেখা যায়, পর্ব্বত ও
উপত্যকা সূর্য্যকিরণে নবন্বাত হইয়া শোভা
পাইতেছে । বনুঝনা শব্দে দুর্গের দ্বার উদ্ঘা-
টিত হইল, শত অঝারোহী বর্শা লইয়া দুর্গ

হইতে বহির্গত হইলেন । ধীরে ধীরে সেই
অঝারোহিণ সেই দুর্গের পর্ব্বত অধিরোহণ
করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের শাগিত বর্শা-
কলক সূর্য্যকিরণে স্বকৃৎ করিতে লাগিল,
অম্বদুরাহত শিলাখণ্ড হইতে অগ্নিকণা বহি-
র্গত হইতে লাগিল । অচিরে অঝারোহিণ
পর্ব্বততলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, একটি
বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ।

অন্য আহেরিয়া, অর্থাৎ বসন্ত-প্রারম্ভে
বাৎসরিক যুগযাত্রা দিন । অন্ত্যকার যুগযাত্র
কলাকল দ্বারা বৎসরের যুদ্ধের কলাকল পরি-
গণিত হইবে, যুতগ্রাং সূর্য্যমহলের দুর্গবর
দুর্জয়সিংহ শত অঝারোহী সমভিযাহারে
যুগযাত্র বহিষ্কৃত হইয়াছেন । মেওয়ারপ্রদেশে
চন্দাওয়াংকুল আহবে ও বিপদে অগ্রগামী,
সেই প্রসিদ্ধ বংশমধ্যে দুর্জয়সিংহ অপেক্ষা
দুর্দমনীয় বোদ্ধা বা ভীষণপ্রতিজ্ঞ সেনানী
কেহ ছিল না । দেখিলে বয়স জিৎশং বৎসর
বলিয়া বোধ হয়, আকৃতি দীর্ঘ নয়নদ্বয় অলস্ত
অগ্নির স্তায় উজ্জ্বল, শরীর অসুর-বলে বলিষ্ঠ ।
বোদ্ধা দক্ষিণ-হস্তে দীর্ঘ বর্শা ধারণ করিয়া
রহিয়াছেন, তাঁহার প্রত্যেক পেশী স্কীত ও
বেন দৌহনির্ম্মিত । দুর্জয়সিংহের সহচরগণও
সেই চন্দাওয়াং-বংশোদ্ভূত এবং দুর্জয়সিংহের
অযোগ্য সহচর নহে ।

দুর্গ হইতে অধিরোহণ করিয়া অঝা-
রোহিণ একটি নিবিড় বনের মধ্যে আসিয়া

পস্থিত হইলেন। কয়েকজন পাইককে পশুর সন্ধানে এই স্থানে পাঠান হইরাছিল। পাইকগণ একে একে আসিয়া বনচর পশুর কোন অল্পসন্ধান না পাওয়ার সংবাদ দিল, কিন্তু বোদ্ধগণ তাহাতে ভয়োৎসাহ না হইয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। সে বনের সৌন্দর্য্য অতিশয় মনোহর। কোথায় বা সূর্য্যকর পত্রের ভিতর দিয়া আসিয়া বন-পুষ্প বা দূর্য্যর সহিত ক্রীড়া করিতেছে, কোথায় বা বন একরূপ নিবিড় যে, দিবাভাগেই অন্ধকারের স্তায় বোধ হইতেছে। কখন পর্বত বা শিলাখণ্ডের উপর দিয়া, কখন সুন্দর স্বর্ণাণার পার্শ্ব দিয়া, কখন ঝোপের নিকট দিয়া বোদ্ধগণ নিঃশেষে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বসন্তকালের প্রারম্ভে ক্ষেত্র, বৃক্ষ, পর্বত ও উপত্যকা সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে। বোদ্ধগণও জীবনের বসন্তকালের উদ্বেগ ও বীরমদে মত্ত হইয়া বাহির হইয়াছেন। সকলই উৎসাহে পূর্ণ, সকলই গর্জিত, সকলই আনন্দময়। যুগয়ার স্তায় উৎসাহপূর্ণ ব্যবসার রাজ্যস্থানে আর নাই, আহেরিয়ার স্তায় আনন্দময় দিন আর নাই।

কতক্ষণ বনের ভিতর বিচরণ করিয়া বোদ্ধগণ একটি প্রান্তরে পড়িলেন, সেই প্রান্তরের সম্মুখে একটি পর্বতদুর্গ প্রায় বৃক্ষ-রত রহিয়াছে। দুর্জয়সিংহ অমাত্যকে সপোষন করিয়া বলিলেন, “এ না পাহাড়জী ভূমিয়ার দুর্গ দেখা যায়?”

অমাত্য বলিলেন, “হাঁ, একরূপ দুর্গ যদি নিকট ভূমিয়ারিগের হস্তে না থাকিয়া প্রকৃত বোদ্ধাদিগের হস্তে থাকিত, তাহা হইলে মহারাণা এই যুদ্ধকালে অধিক সহায়তা পাইতেন।”

দুর্জয়। ভূমিয়ার গণশিক্ষা করে নাই বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে আপন দুর্গ ও

আবাসস্থল শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিতে যথোচিত সাহস প্রকাশ করে।

অমাত্য। সত্য, কিন্তু বর্শাচালন অপেক্ষা লাঙ্গলচালনে অধিক তৎপর।

সকলেই উচ্চহাস্ত করিয়া উঠিলেন। আর একজন যোদ্ধা কহিলেন, “ভূমিয়া দুর্গ-রক্ষা হইতে ভূমিরক্ষার অধিক তৎপর। বোদ্ধা কখন কখন আপন দুর্গচ্যুত হন, কিন্তু ভূমিয়ার ভূমি পুরুষাভুক্রমে তাহার সন্তান-সন্ততি ভোগ করে; শত্রুতেও লইতে পারে না, রাণাও লইতে পারেন না।”

অমাত্য। ইন্দুর মুক্তিকার একবার প্রবেশ করিলে তাহাকে বাহির করা দুঃসাধ্য।

পুনরায় সকলে হাস্ত করিয়া উঠিলেন। বোদ্ধদল অনেকক্ষণ বিচরণ করিলেন। জঙ্গল, ঝোপ, পর্বত, গহ্বর, সমস্ত অন্বেষণ করিলেন; যে যে স্থানে পূর্ববৎসরে বরাহ দেখা গিয়াছিল, সমস্ত দৃষ্টি করিলেন। নিবিড় অন্ধকারময় বন, সুন্দর পর্বত-তরঙ্গিণী-তীর। শান্ত শস্যশূভ্র প্রান্তর, সমস্ত বিচরণ করিলেন।

প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছে, কিন্তু কোন বনচর পশুর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পাইকগণ নিবিড় জঙ্গলের ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কেহই একটিও পশু দেখিতে পায় নাই। সূর্য্যের উত্থাপ ক্রমে বুদ্ধি পাইয়াছে, বোদ্ধগণ লগাটের স্বেদমোচন করিয়া পরস্পরের দিকে চাহিতেছেন। অস্ত্র বন কি বরাহশূভ্র? একটি যুগও দেখিতে পাইলাম না! এ বৎসর কি সূর্য্যমহলের অমকলের জন্ত? এইরূপ নানা কথা হইতে লাগিল। কণেক চিন্তা করিয়া দুর্জয়সিংহ কহিলেন, “বুদ্ধগণ! আমাদের অবশ্য শাস্ত হইয়াছে, আমরাও শাস্ত হইরাছি, এক্ষণে আর বৃথা অন্বেষণে আবদ্ধক নাই, চল,

অধঃগণকে বিশ্রাম দিই, আমরাও বিশ্রাম করি । পরে যদি এই প্রশস্ত বনপ্রদেশে একটি বরাহ লুক্রান্ত থাকে, দুর্জয়সিংহ তাহা হনন করিবে, নচেৎ আর বর্ষা ধারণ করিবে না ।” সকলেই সেই কথায় সম্মতি প্রকাশ করিয়া একটি নিবিড় নিকুঞ্জবনের দিকে গমন করিলেন ।

সে স্থলটি অতিশয় রমণীয় । পাদপশ্রেণী একরূপ নিবিড় পত্রপুঞ্জে আবৃত রহিয়াছে যে, দ্বিপ্রহরের সূর্য্যরশ্মি তাহা ভেদ করিতে পারিতেছে না ; কেবল স্থানে স্থানে পত্রাশির মধ্য দিয়া সূর্য্যরশ্মি যেন একটি স্তব্ধবর্ণের ধার ভূমি পর্য্যন্ত লম্বিত রহিয়াছে । ভূমি পরিকৃত হইয়াছে, নবদুর্কাদল সেই শ্রামল স্তম্ভি ছায়াতে অতিশয় কমনীয় রূপ ধারণ করিয়াছে । সেই নিবিড় বনে শব্দমাত্র নাই, দ্বিপ্রহর দিবার সেই নিকুঞ্জবন শান্ত, শব্দশূন্য, নিস্তব্ধ । একরূপ নিস্তব্ধ যে, বৃক্ষ হইতে দুই একটি শুষ্কপত্র পতিত হইলে তাহার শব্দ শুনা যাইতেছে, দুই একটি বনবিচক্ষিনীর দ্বিপ্রহরের স্তিমিত রব শুনা যাইতেছে এবং অদূরে একটি নিরুঝিরী সূন্দর সঙ্গীত ধীরে ধীরে কর্ণে পতিত হইতেছে । শ্রামল যোদ্ধা-গণ কণেক নিস্তব্ধ হইয়া সেই স্থানের শোভা সন্দর্শন করিলেন । বোধ হইল যেন, কোন বনদেবীর পূজার জন্ত প্রকৃতি অনন্ত স্তম্ভসার-স্বরূপ পাদপশ্রেণী দ্বারা এই শান্ত হরিষর্ষ মন্দির প্রস্তুত করিয়াছেন, নিরুঝিরী স্বয়ং বীণাবাদ্য করিতেছেন ।

যোদ্ধাগণ অস্থ হইতে অবরোহণ করিয়া সেই শ্রামল দুর্কাদলের উপর উপবেশন করিলেন । কণেক শ্রমদূর করিয়া নিরুঝির জলে হস্ত-মুখ প্রক্ষালন করিলেন । কিছু কলমুলের আয়োজন করা হইয়াছিল, দুর্গেশ্বর ও তাহার যোদ্ধাগণ আনন্দে তাহা

আহার করিতে বসিলেন । পুরাতন রীতি অনুসারে দুর্গেশ্বর সহসা যোদ্ধাদিগকে “গোনা” অর্থাৎ আপন পাত্ৰ হইতে আহার পাঠাইলেন, তাহারাই এই সম্মানচিহ্ন সাধরে গ্রহণ করিলেন । নানারূপ কথা ও হান্ত-ধ্বনিতে বন ধ্বনিত হইল ; পূর্বদটনার, পূর্বযুদ্ধের কথা হইতে লাগিল । কিরূপে উপস্থিত যোদ্ধাগণ দুর্গপ্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, কিরূপে শত্রুকে হনন করিয়াছিলেন, সালুস্বরাপতির প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, স্বয়ং রাণার সাধুবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সমস্ত কথা হইতে লাগিল । এবার মেওয়ার-প্রদেশের বহু শত্রু, স্বয়ং দিল্লীশ্বর আসিতে-ছেন । মাড়ওয়ার, অম্বর, বিকানীর ও বৃন্দিস্বর রাজগণ স্বেচ্ছের সহিত যোগ দিয়া মেওয়ার আক্রমণে আসিতেছেন । কিন্তু রাণার অবশ্য জয় হইবে । অথবা যদি পরাজয় হয়, চন্দাও-রংকুল সেই যুদ্ধভূমিতে প্রাণবান করিবে, চন্দাওরংকুল পলায়ন জানে না । দুর্জয়সিংহ এ কথা বলিতে না বলিতে যোদ্ধারা উৎসাহে ও উল্লাসে সাধুবাদ করিলেন ।

দুর্জয়সিংহ বলিলেন, “আট বৎসর পূর্বে যখন এই আক্বের শাহ চিতোর হস্তগত করেন, রাণা উদয়সিংহ দুর্গত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু সালুস্বরাপতি সাহীদাস দুর্গত্যাগ করেন নাই, চন্দাওরংকুলের সাহীদাস দুর্গত্যাগ করেন নাই । চারগদেব ! সেদিনকার কথা একবার যোদ্ধাগণকে শুনাও, চন্দাওরংকুল কিরূপে যুদ্ধ করে, একবার শ্রবণ করি ।”

আগেরিয়ার দিনে চারগদেব অল্পপণ্ডিত থাকেন না । দুর্গেশ্বরের অভিপ্রায়মতে চারগদেব সাহীদাসের বীরত্ব-গীত আরম্ভ করিলেন । চিতোর-ধ্বংসের সময় দুর্জয়সিংহ ও তাহার যোদ্ধাগণ সেই দুর্গে উপস্থিত ছিলেন, চারগদেবের গীত শুনিতে শুনিতে

সেনিনকার কথা তাঁহাদের ক্রমে জাগরিত হইতে লাগিল।

গীত।

“যোদ্ধগণ! আপনারা সেনিনকার যুদ্ধ দেখিয়াছেন, দুর্জয়সিংহ সালুমত্রাপতির দক্ষিণ-হস্ত ছিলেন, তিনি সাহীদাসের বীরত্ব দেখিয়াছেন। চিতোরের সূর্য্যদ্বারই চন্দাওয়ংকুলের রণস্থল, সেই সূর্য্যদ্বার সাহীদাস সে দিন ত্যাগ করেন নাই, সেই সূর্য্যদ্বার চন্দাওয়ংকুল ত্যাগ করেন নাই।

বায়ু-তাড়িত হইয়া উদয়সাগরের ক্ষিপ্ত তরঙ্গ যখন কূলে আঘাত করে, তাহা দেখি রাছি। তুর্কাদিগের অগণ্য সৈন্য সেইরূপ সূর্য্যদ্বারে বার বার আঘাত করিতে লাগিল, ভীষণরবে সেই সৈন্যতরঙ্গ দুর্গের দিকে ধাবমান হইল, কিন্তু চন্দাওয়ংকুলের আহত হইয়া বার বার প্রতিহত হইল। চিতোরের সূর্য্যদ্বারই চন্দাওয়ংকুলের রণস্থল, চন্দাওয়ং সে দ্বার ত্যাগ করে নাই, সালুমত্রাপতি সে দ্বার ত্যাগ করেন নাই।

বনে অগ্নি লাগিলে কিরূপে গেলিহমান অগ্নিভিহ্না আকাশপথে আরোহণ করে, তাহা দেখিয়াছ। তুর্কাদিগের সৈন্য সেইরূপে দুর্গকে পরিবেষ্টন করিয়া সেইরূপ বার বার দুর্গোপরি ধাবমান হইতে লাগিল। চন্দাওয়ং অল্পসংখ্যক, কিন্তু চন্দাওয়ং হীনবল নহে, বার বার ভীষণ আক্রমণকারীদিগকে প্রতিহত করল সূর্য্যদ্বার ত্যাগ করিল না। সূর্য্যদ্বারই চন্দাওয়ংকুলের রণস্থল, চন্দাওয়ং সে দ্বার ত্যাগ করে নাই, সালুমত্রাপতি সে দ্বার ত্যাগ করেন নাই।

বর্ষাকালের মেঘরাশি অপেক্ষা তুর্কাদিগের সৈন্য অধিক। রাশি রাশি হত হইল, পুনরায় রাশি রাশি সেই দ্বার বন্ধ-

নাদে আক্রমণ করিল। চন্দাওয়ংকুল অশ্রুরবীর্ষ্য প্রকাশ করিয়া সেই পর্ব্বতচূড়ায় চিরনিদ্রায় শায়িত হইল, কিন্তু চন্দাওয়ংকুল প্রতিহত হইল না। সাহীদাস তখনও একাকী শতের সহিত যুদ্ধিতে ছিলেন, সাহীদাস চিতোরের জন্ত যুদ্ধের শেষ রক্তবিন্দু দান করিয়া ছিন্নতরুর ন্যায় পতিত হইলেন। দুর্জয়সিংহ সাহীদিগের রক্ষার্থ যুদ্ধিতেছিলেন, আহত ও অচেতন হইয়া পতিত হইলেন। যোদ্ধগণ! দুর্জয়সিংহের ললাটে তুর্কীয় খড়্গ-অস্ত্র এখনও দেখিতে পাইতেছ, চন্দাওয়ংকুল সমস্ত হত বা আহত হইল, কিন্তু দুর্জয়সিংহ সেই সূর্য্যদ্বার ত্যাগ করেন নাই। চিতোরের সূর্য্যদ্বার চন্দাওয়ংকুলের রণস্থল, চন্দাওয়ংকুল সে দ্বার ত্যাগ করে নাই, সালুমত্রাপতি সে দ্বার ত্যাগ করেন নাই।”

এই গীত হইতে হইতে চন্দাওয়ং যোদ্ধাদিগের নয়ন হইতে অশ্রুকণা বহির্গত হইতেছিল। গীত শেষ হইলে সকলে হৃৎকারনাদে বন পরিপূরিত করিলেন। তন্মধ্যে দুর্জয়সিংহ ভীষণনাদে কহিলেন, “যোদ্ধগণ! অজ্ঞ আমাদিগের চারিদিকে বিপদাশ, কিন্তু চন্দাওয়ংকুল বিপদে অপরিচিত নহে। অজ্ঞ আমাদিগের চিতোর নাই, কিন্তু সহস্র পর্ব্বতশেখর ও পর্ব্বতগহ্বর শিশোদীয়ার হস্ত হইতে কে লইতে পারে? মহারাণা উদয়সিংহ গম্ভীর হইয়াছেন, কিন্তু মহারাণা প্রতাপসিংহ দুর্জয়হস্তে অসিধারণ করেন না। মহারাণা প্রতাপসিংহের জয় হউক, শিশোদীয়া-জাতির জয় হউক, চন্দাওয়ংকুলের জয় হউক।”

ভীষণনাদে শত বোদ্ধা এই কথা উচ্চারণ করিলেন, সে শব্দ বন অতিক্রম করিয়া মেওয়ারের অনন্ত পর্ব্বতে প্রতিধ্বনিত

ইল ! দুর্জয়সিংহ পুনরায় বলিলেন, “চারণ-
ব ! আমরা এক্ষণে পুনরায় যুগ্মরায় বাইব,
কটি আহেরিয়ার গীত শুনাও, বেন অস্ত
রামাদিগের আহেরিয়া নিফল না হয়।”
চারণদেব পুনরায় বীণা লইলেন, উর্দ্ধদিকে
গাহিয়া কণ্ঠে চিত্তাকরিলেন, পরে গীত
সমাপ্ত করিলেন ।

গীত ।

“যোদ্ধা গণ ! আট বৎসর হইল, দিল্লীর
চিতোর লইয়াছেন, কিন্তু দিল্লী ও শিশো-
দায়ার এই প্রথম বিবাদ নহে । প্রায় তিন
শত বৎসর পূর্বে আর একজন দিল্লীর
আলা-উদ্দীন আর একবার চিতোর লইয়া-
ছিলেন, কিন্তু চিতোর শিশোদায়ার কর্তৃক
চিতোর তুর্কী-হস্তে কত দিন থাকে ? সেবার
হামির এই কর্তৃত্ব তুর্কীদিগের হস্ত হইতে
কাড়িয়া লইয়াছেন ; এবার প্রতাপসিংহ
লইবেন । হামিরের জন্মকথা শ্রবণ
আহেরিয়ার একটি গীত শ্রবণ কর ।

সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র উরুসিংহ ।

উরুসিংহ দুর্গরক্ষার জন্ত প্রাণদান

তাহা শিশোদায়ার মধ্যে কে

জানে ? চিতোর-আক্রমণে

সর পূর্বে এট উরুসিংহ এর

বহির্গত হইয়াছিলেন, শ

সঙ্গে সঙ্গে যুগ্মরায় বহি

আহেরিয়ার তুল্য রা

অনন্দ আছে ?

“আন্দাওয়া-তানন

নাদে প্রতিধ্বনিত হই

হের পশ্চাদ্ধাবন ক

ও নিরন্তর উত্তীর্ণ

হইল, মহানাদে যো

আহেরিয়ার তুল্য

অনন্দ আছে ?

“অনেকক্ষণ পর সেই বরাহ এক শত
ক্ষেত্রের ভিতর লুকাইল, শত দ্বাদশ হস্ত
উচ্চ, বরাহ আর দেখা গেল না । একজন
মাত্র দরিদ্রমণী একটি মকে দণ্ডায়মান
হইয়া শত্রুর করিতেছিলেন । রমণী বীর-
দিগের নৈরাশ্রি দেখিয়া বলিলেন, ‘সংবরণ
করুন, আমি বংশশতক্ষেত্র হইতে বাহির
করিয়া দিতেছি ।’

“এ কি মায়া না নগ্ন
যক্ষিনী ? নারী-বাহিনী
নারী-জন্মের কি এ
একটি বৃক্ষ উৎস
স্মৃতির
বর্ষ

রমেশচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ।

৩৩২

পারিলেন, কিছুমাত্র ভীত না হইয়া, দ্রুত
মন্তক হইতে না নামাইয়া, কেবল একটি
মহিষীকে অথের শরীরের উপর ঠেলিয়া
দিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে অর্ধ অশ্বারোহী
জ্বমিসাৎ হইল।

“উরুসিংহ অল্পসন্ধানে নিলেন যে, সে
কুমারী চোহানজাতির সন্ধানবংশের এক
দরিদ্রলোকের কন্যা। উরুসিংহ সেই
সাহ করি, সেই কন্যার পুত্র

আলা-উদদীন যখন
করেন, তখন সুবরাজ

করেন, পরে

সিংহ প্রাণ-

মির

দিকে ধাবমান হইলেন। অবশ্য যেন সেই
ভূখণ্ড পদতরে কাঁপাইয়া ছুটিল, পথের মধ্যে
উন্নত শিলাখণ্ড বা পর্বততরঙ্গিণী লক্ষ্য দিয়া
অতিক্রম করিল, কণ্টকময় ঝোপ বা বৃক্ষ
অগ্রাহ্য করিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া ছুটিল।
অশ্বারোহীদিগের অলস্তু নয়ন সেই বরাহের
দিকে স্থিরীকৃত রহিয়াছে, তাঁহাদিগের উন্নত
দক্ষিণ-হস্ত শূন্যে বর্শা ধারণা করিয়া রহিয়াছে,
তাঁহাদিগের হৃদয় উল্লাসে, উৎসাহে উৎক্লিষ্ট
রহিয়াছে।

বরাহ ক্ষণেক দৌড়াইয়া দেখিল, অশ্ব-
রোহিণী নিকটে আসিতেছে। একবার
স্থির হইয়া যেন তাহাদিগকে আক্রমণ করি-
বার চিন্তা করিল, কিন্তু শত যোদ্ধার হস্তে
শত বর্শার শাপিত ফলা দেখিয়া সম্মুখ-
রণচিন্তা ত্যাগ করিল, লক্ষ্য দিয়া একটি
বিবিড় ও বিস্তীর্ণ ঝোপের ভিতর প্রবেশ
করিল। নিমেষমধ্যে শত অশ্বারোহী সেই
৭ চারিদিকে পরিবেষ্টন করিলেন; উচ্চ
চরিয়া বরাহকে ঝোপ হইতে বাহির
প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু বরাহ প্রাণ-
নাশে, বাহির হইবে না। কেহ
নিক্ষেপ করিলেন, কেহ বা
পেপের কোন অংশে পত্রের
মান করিয়া বর্শা নিক্ষেপ
ক্ষণ সময় নষ্ট হইল,
হইল, বরাহ ঝোপ হইতে

হ বলিলেন, “বন্ধুগণ,
যামে আবশ্যক কি?
সম্মাছেন, আর অধিক
যে সকলে পদব্রজে
হও। বরাহ এই
আমরা চারিদিক
হইলে বরাহ অবশ্য

একদিক্ হইতে পালাইবার চেষ্টা করিবে, অথবা মধ্যদেশেই মরিবে।”

যোদ্ধগণ ইহা ভিন্ন উপায় দেখিলেন না। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সকলে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; তীক্ষ্ণহস্তে বর্শা ধারণ করিয়া রহিলেন, তীক্ষ্ণনয়নে দেখিতে লাগিলেন। এবার বরাহ অবশ্যই বাহির হইবে, সহসা আক্রমণ করিতে না পারে, এ জন্ত সকলে সতর্কভাবে সম্মুখে ও চারিদিকে দেখিতে দেখিতে ঝোপের ভিতর অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বরাহ বোধ হয়, অশ্বারোহীদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল। সহসা লক্ষ দিয়া একদিক্ হইতে বাহির হইল; বিদ্যুৎবেগে নিকটস্থ যোদ্ধার পদ বিদীর্ণ করিল, নিমেষমধ্যে দূরে পলাইল।

দুই একজন যোদ্ধা আহতের সেবার জন্ত রহিলেন, অবশিষ্ট সকলে অশ্বারোহণ করিয়া পুনরায় বরাহের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। পুনরায় ভূমি ও শিলাখণ্ড কম্পিত করিতে লাগিলেন, বায়ুবেগে কণ্টক ও তরঙ্গিত অতিক্রম করিতে লাগিলেন, মহা-নাদে বন পরিপূরিত করিতে লাগিলেন। দুর্জয়সিংহ উন্নতের জায় অশ্ব ছুটাইলেন, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ বর্শা কম্পিত হইতেছিল।

পুনরায় বরাহ লুকাইল, পুনরায় বাহির হইয়া পলাইল, আবার লুকাইল। দিবা অবসান হইল, সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হইতে লাগিল, অশ্বারোহিণ প্রৌণ্ড হইয়া ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। কেহ নিকটে, কেহ দূরে, কেহ প্রান্তরে, কেহ নিবিড় বনে বরাহ অন্বেষণ করিতেছেন।

দুর্জয়সিংহ একাকী একটি বনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার অশ্বের শরীর

ফেনময়, তাঁহার ললাট হইতে স্বর্ণ পড়িতেছে, কিন্তু তাঁহার নয়ন স্থির, শত যোদ্ধা-মধ্যে তিনিই কেবল বরাহের গতি অবিচলিত নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। অন্ধকারে বরাহ সকলের পক্ষে নিরুদ্দেশ হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে হয় নাই। তিনি যে জঙ্গলের দিকে স্থির নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, বাস্তবিক তথায় বরাহ নিহিত ছিল।

এবার বরাহ রুট হইল। অচ্য এক-প্রহর কাল জঙ্গল হইতে জঙ্গলে, গহবর হইতে গহবরে লুকাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে, তথাপি একজন যোদ্ধা অব্যর্থ-নয়নে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে। সন্ধ্যার সময় ঝোপের ভিতর লুকাইয়াছে, সেই একজন যোদ্ধা তাহাকে হনন করিবার জন্ত দণ্ডায়মান আছে। একেবারে বিদ্যুতের জ্বাশ গতিতে বরাহ দুর্জয়সিংহকে আক্রমণ করিতে আসিল।

দুর্জয়সিংহ বামহস্তে ললাটের স্বেদ মোচন করিয়া লম্বমান কেশ সরাইলেন, তীব্রদৃষ্টি করিয়া দক্ষিণ হস্তের কম্পমান বর্শা ছাড়িলেন। শ্রান্তিবশতঃ বা অন্ধকার বশতঃ সে বর্শা ব্যর্থ হইল। একটি বৃহৎ শিলাখণ্ডে লাগিয়া সে শিলাখণ্ড চূর্ণ করিল, বরাহ নিমেষমধ্যে অশ্বের উদর বিদীর্ণ করিল।

প্রত্যুৎপন্নমতি দুর্জয়সিংহ পতনশীল অশ্ব হইতে লক্ষ দিয়া দশ হস্ত দূরে পড়িলেন। বরাহ মৃত অশ্বকে ভ্যাগ করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। মৃত্যু অনিবার্য্য! রাজপুত যোদ্ধা অকম্পিত-নয়নে মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মৃত্যু আসিল না।

অদৃষ্ট-হস্ত-নিকপ্ত একটি বর্শা আসিল, বরাহের মুখের উপর লাগাতে দস্ত চূর্ণ

হইয়া রক্তধারা বাহির হইল, সে আঘাতে বরাহ মরিগ না, কিন্তু দুর্জয়সিংহকে তাগ করিয়া একেবারে জঙ্গলের মধ্যে পলাইল, রক্তনীর অন্ধকারে আর বরাহকে দেখা গেল না।

রক্তনীর অন্ধকারে দুর্জয়সিংহ দেখিলেন, পক্ষিত হইতে একজন দীর্ঘাকার যুবক অবতরণ করিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তেজসিংহ।

দশরুণাং কিমাত্মকৃতসংসর্গো বহুহৃৎসুখসজ্জা
+ অস্মিন্ কাননে দূরীকৃতকলঙ্কো বসামি।

দশকুমারচরিতম্।

অুধেরিয়ার দিন বরাহ পলায়ন করিল, দুর্জয়সিংহের হস্ত-নিষ্কিপ্ত বর্শা ব্যর্থ হইল, অপরের সাহায্যে অস্ত্র দুর্জয়সিংহের জীবন-রক্ষা হইল, এইরূপ শত চিন্তা দুর্জয়সিংহকে দংশন করিতে লাগিল। দুর্জয়সিংহ রোবে, অভিমানে তাঁহার প্রাণরক্ষাকারীকে ধন্যবাদ দিতে বিম্বত হইলেন, ঈষৎ কৰ্কশ-স্বরে কহিলেন, “আমি আপনাকে চিনি না, বোধ করি, আপনি আমার জীবন-রক্ষা করিয়াছেন।”

অপরিচিত যুবক ধীরে ধীরে বলিলেন, “মহুয্যামাত্রেই মহুয্যের জীবন রক্ষা করার চেষ্টা করে। দুর্জয়সিংহের জীবনরক্ষা করা রাজপুত্রের বিশেষ কর্তব্য, কেন না, তিনি যোদ্ধা, মেওয়ারের এই বিপদকালে তিনি স্বজাতির উপকার করিতে পারেন।”

সামান্য-পরিচ্ছদধারী অপরিচিত লোকের নিকট এইরূপ সত্য কথা কহিয়া দুর্জয়সিংহ ঈষৎ

বিস্মিত হইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি?”

যুবক বলিলেন, “পরে জানিবেন, এক্ষণে শ্রান্ত হইয়াছেন, কুটীরে আসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করুন।”

দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ যুবক ধীরে ধীরে অগ্রে বাইতে লাগিলেন, দুর্জয়সিংহ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অন্ধকার রক্তনীতে বনপথের ভিতর দিয়া দুই জন যোদ্ধা নিশ্চক্রে বাইতে লাগিলেন।

দুর্জয়সিংহ দুর্বল পুরুষ ছিলেন না, কিন্তু অপরিচিতের দীর্ঘ ও ঋজু অবয়ব, বিশাল বক্ষঃস্থল, দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ বাহু এবং ধীরগম্বীর পদবিক্ষেপ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। একপ উন্নতকায় পুরুষ তিনি দেখেন নাই, অথবা আট বৎসর পূর্বে কেবল এক জনকে দেখিয়াছিলেন।

ক্ষণেক পর যুবা সহসা দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, “এক্ষণে আমার একটি অনুরোধ আছে, কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন না। আপনার উষ্ণীয় দিয়া আপনার নয়ন স্নান করুন, পরে আমি আপনার স্তম্ভধারণ করিয়া লইয়া বাইব। যদি অস্বীকৃত হন, এই স্থানে বিদায় হইলাম।”

দুর্জয়সিংহ আরও বিস্মিত হইলেন কিন্তু যুবকের মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলেন, অস্বীকার করা বৃথা। বিবেচনা করিলেন, যুবক কখনই আমার অনিষ্ট করিবেন না, এইক্ষণেই আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। যুবকের সহায়তা ভিন্নও এই নিবিড় বন হইতে বাহির হইবার উপায় নাই। ক্ষণেক এইরূপ চিন্তা করিয়া উষ্ণীয় খুলিয়া নিঃশঙ্কে যুবকের হস্তে দিলেন, নিঃশঙ্কে যুবক দুর্জয়সিংহের নয়ন বন্ধন করিলেন।

তাঁহার পব যবক দুর্জয়সিংহের হস্ত

ধরিয়া প্রায় এককোশ পথ লইয়া বাইলেন, এই পথের মধ্যে দুইজনের একটি কথাও হইল না। দুর্জয়সিংহ কোন দিকে বাইতে-ছেন, কিছুই জানিলেন না, কেবল বৃক্ষ-পত্রের মর্ম্মরশদ শুনিতে লাগিলেন এবং একটি পর্ব্বত আরোহণ করিতেছেন, বুঝিতে পারিলেন, শেষে 'যুবক সাহসে দণ্ডায়মান হইলেন; দুর্জয়সিংহও দাঁড়াইলেন। যুবক তাঁহার চক্ষুর বস্ত্র উন্মোচন করিয়া দিলেন, দুর্জয়সিংহ বিস্মিত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

রজনী এক প্রহরের সময় দুর্জয়সিংহ আপনাকে এক অন্ধকারময় পর্ব্বতগহ্বরে অপরিচিত লোক দ্বারা গৃহীত দেখিলেন। গহ্বরে একটিমাত্র দীপ জলিতেছে, সেই দীপালোকে দুর্জয়সিংহ আপনার চতুর্দিকে কেবল অসভ্য ভীলজাতীয় লোক দেখিতে পাইলেন। তাহারা পরস্পরে কি কথা কহিতেছে, দুর্জয়সিংহ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তাহারা কখন গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, পরস্পরেই বাহিরে যাইতেছে, তাহার কারণও জানিতে পারিলেন না। তিনি রাজপুত-ভাষায় কথা কহিলেন, পার্শ্বস্থ যুবক ভিন্ন কেহ সে কথা বুঝিতে পারিল না। যুবক তাঁহার প্রাণ বাঁচাইয়াছেন, যুবক তাঁহাকে বিশ্রামের জন্ত এই গুহায় আনিয়াছেন, যুবক এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে সন্ধানের সহিত ব্যবহার করিয়াছেন, তথাপি দুর্জয়সিংহ সেই যুবকের দিকে চাহিতে সঙ্কচিত হইতেছেন কি জন্ত? দুর্জয়সিংহ জানেন না; কিন্তু সেই অন্ধকার গুহা, সেই ভীলবোদ্ধা, সেই অল্পভাবী যুবকের দিকে বত দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার মনে সন্দেহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

একজন দাস একটি বরণা হইতে জল

আনিয়া দিল, দুর্জয়সিংহ তাহাতে হস্তপদ-প্রক্ষালন করিলেন। পরে সেই ভৃত্য কন্তক ওলি ফলমূল ও আহারীয় সামগ্রী দুর্জয়সিংহের সম্মুখে স্থাপন করিল। দুর্জয়সিংহের সন্দেহ দূরীভূত হইল; তিনি ধীরে ধীরে চারিদিকে চাহিলেন, সে যুবক নাই। ঈষৎ জুড় হইয়া বলিলেন, "আমি সেই রাজপুত যুবকের অতিথি হইয়াছি, অতিথির সম্মুখে স্বয়ং আহারপাত্র স্থাপন করা রাজপুতের ধর্ম্ম। বিবেচনা করি, ভীলদিগের মধ্যে থাকিয়া যুবক রাজপুতধর্ম্ম বিশ্বত হইয়াছেন।"

এ কর্কশ বাক্যে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া ভৃত্য স্থিরভাবে উত্তর করিল, "প্রভু রাজপুতধর্ম্ম বিশ্বত হন নাই; কিন্তু কোন ব্রতবশতঃ আপাততঃ চন্দাওরংকুলের সহিত তাঁহার আহার নিষিদ্ধ, এই জন্ত এইকণ আসিতে পারেন নাই।"

দুর্জয়সিংহের সন্দেহ দূরীভূত হইল। অস্পষ্ট আহার ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে দণ্ডায়মান হইলেন। ক্ষণেক পর সেই অপরিচিত যুবক পুনরায় দর্শন দিলেন ও ধীরে ধীরে বলিলেন, "আতিথের ধর্ম্ম অশস্ত্র হইয়াছি, তাহার কারণ ভৃত্য নিবেদন করিয়াছে; যদি আপনার আহারে রুচি না হয়, বিশ্রাম করুন; আপনার বিশ্রামের জন্ত শয্যা রচনা করা হইয়াছে।"

দুর্জয়সিংহ চারিদিকে চাহিলেন। একে একে বহুসংখ্যক ভীলবোদ্ধা একবার গুহায় প্রবেশ করিতেছে, একবার বাহির হইতেছে। সকলের হস্তে ধনুর্ধ্বাণ, সকলে নিস্ত্রক, সকলে অপরিচিত রাজপুত যুবকের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, যেন রাজপুত একটি আজ্ঞা দিলে, একটি ইঙ্গিত করিলে, তাহারা দুর্জয়সিংহের প্রাণনাশ করিতে প্রস্তুত! রাজপুত সে ইঙ্গিত করিলেন না।

দুর্জয়সিংহ সাহসী, যুদ্ধ বা বিপদকালে তাঁহার অপেক্ষা সাহসী কেহ ছিল না, কিন্তু এই অপূর্ণস্থানে অসংখ্য অসভ্য বোদ্ধা-দিগের মধ্যে আপনাকে অসহায় দেখিয়া তাঁহার হৃদয় একবার স্তম্ভিত হইল। তিনি এই পরীক্ষণস্থানে একাকী ও নিরস্ত, তাঁহার চারিদিকে শত বোদ্ধা বেটন করিয়া আছে; সকলে ভীতনয়নে অপরিচিত রাজপুত্রের দিকে চাহিতেছে, সকলে নিস্তব্ধ। দুর্জয়সিংহ সেই অপরিচিত রাজপুত্রের দিকে পুনরায় চাহিলেন, তাঁহার গম্ভীর মুখ-মণ্ডল ও হিরনয়ন দেখিয়া তাঁহার উদ্বেগ কিছুই বৃদ্ধিতে পারিলেন না।

যুবক পুনরায় বলিলেন, “শব্দা রচনা হইয়াছে।”

যুবক দুর্জয়সিংহের মিত্র না শত্রু? যদি শত্রু হন, তবে অত্ৰ বিপদের সময় দুর্জয়সিংহের প্রাণ বাচাইলেন কেন, শ্রান্তির সময় আপন আবাসস্থলে আশ্রয় করিলেন কেন, ফলমূল ও আহারীয় দান করিলেন কেন, এই বহুসংখ্য ধর্ম্মের ভীল হইতে এখনও তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন কেন? দুর্জয়সিংহ কি জন্ত মিথ্যা সন্দেহ করিতেছেন? অবশ্যই যুবক কোন বিপদগ্রস্ত উন্নতবংশীয় রাজপুত্র হইবেন, স্বস্থানচ্যুত হইয়া ভীল-দিগের আশ্রয় লইয়াছেন, অত্ৰ রাজপুত্রধর্ম্ম অনুসারে দুর্জয়সিংহের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন, দুর্জয়সিংহ কেন তাঁহার প্রতি সন্দেহ করিতেছেন?

দুর্জয়সিংহ জানেন না; কিন্তু বধন সেই উন্নত-কলেবর, সেই হিরনয়ন, সেই অন্নভাবী বোদ্ধার দিকে নিরীক্ষণ করেন, তখনই তাঁহার মনে সন্দেহ হয়। আহব-ক্ষেত্রে শত শত্রুমধ্যে বাঁহার হৃদয় বিচলিত হয় নাই, অত্ৰ এই যুবককে দেখিয়া কি

জন্ত সে বীরহৃদয় বিচলিত হইতেছে? সালুগ্রাধিপতি ও স্বয়ং মহারাণার নহনের দিকে যে বোদ্ধা হিরনয়নে চাহিয়াছিলেন, অত্ৰ একজন বস্ত্র যুবকের দিকে কি জন্ত তিনি চাহিতে অক্ষম?

আপনার প্রতি ঘৃণা করিয়া, সন্দেহ দূর করিয়া, দুর্জয়সিংহ যুবকের সহিত একবার সহজভাবে বাক্যালাপ করিবার চেষ্টা করিলেন,—বলিলেন, “যুবক! এ পর্য্যন্ত আমি এই অপরূপ গুহা ও আপনার অপরূপ সঙ্গী দেখিয়া বিস্মিত হইয়া রহিয়াছি, আপনি আমার যে মহৎ উপকার করিয়াছেন, তাহার জন্ত একবার ধন্যবাদ দিতেও বিস্মৃত হইয়াছি।”

যুবক। ধন্যবাদ আবশ্যক নাই, আমি স্বদেশের প্রতি কর্তব্যমাত্র সাধন করিয়াছি।

দুর্জয়। তথাপি এ ঋণ কিরূপে পরি-শোধ করিতে পারি?

যুবক। আপনাকে অত্ৰ বৈরূপ অসহায় অবস্থায় দেখিয়াছিলাম, সেইরূপ অসহায় পাইয়া কোন পতিহীন নারীর প্রতি বা কোন পিতাহীন বালকের প্রতি যদি কখন অত্যাচার করিয়া থাকেন, তাহাদের গ্রাণ্ড এখন ধর্ম্মাচরণ করুন, তাহা হইলেই আমি পরিতৃপ্ত হইব। আমার নিজের কোন বাচ্চা নাই।

দুর্জয়সিংহ চকিত হইলেন। যুবক কি পূর্বকথা জানেন? অত্ৰ কি শত ভীল বোদ্ধার দ্বারা পূর্ব-অত্যাচারের প্রতিকূল লইবেন? সভয়ে সেই ভীলবোদ্ধাদিগের দিকে দেখিলেন, সকলের হস্তে ধর্ম্মরূপ প্রস্ত ১। সভয়ে যুবকের দিকে চাহিলেন, যুবক সেইরূপ গম্ভীর, নিশ্চেষ্ট। দুর্জয়সিংহের অসমসাহসিক হৃদয়ে অত্ৰ প্রথম ভয়ের সঞ্চার হইল, এ যুবক কে?

যুবক পুনরায় বলিলেন, “শয্যা রচনা হইয়াছে ।”

দুর্জয়সিংহ হৃদয়ের উদ্বেগ দমন করিয়া সমর্পণ উত্তর দিলেন, “অন্তই স্বর্য্যমহলে প্রত্যাগমন করিব, অন্তের আবাসে বাস করা দুর্জয়সিংহের অভ্যাস নাই ।”

যুবক । ঘেরূপ কুচি হয়, সেইরূপ করিতে পারেন, কিন্তু আমার বোধ ছিল, অন্তের আবাসস্থলে বাস করা আপনার অভ্যাস আছে ।

দুর্জয় । আপনি কে জানি না, ইচ্ছা হয়, এই অসভ্য যোদ্ধা দ্বারা দুর্জয়সিংহকে হনন করিতে পারেন, কিন্তু দুর্জয়সিংহ মিথ্যা অপবাদ সহ্য করিবে না । রাঠোর তিলকসিংহের সহিত আমার বংশানুগত বিরোধ, সেই বিরোধের বশবর্তী হইয়া আমি সম্মুখসমরে তাঁহার স্বর্য্যমহল-দুর্গ কাড়িয়া লইয়াছি, এ ক্ষত্রধর্ম্মমাত্র ।

যুবক । সম্মুখসমরে আপনি সুপটু, সন্দেহ নাই, সেই জন্যই তিলকসিংহের মৃত্যু হইলে পর আপনি তাঁহার নিরাশ্রয় বিধবার সহিত সম্মুখরণে বীরত্বপ্রকাশ করিয়া নারীকে হত্যা করিয়াছিলেন । আপনি ক্ষত্রধর্ম্মজ্ঞ, তাহাতে সন্দেহ নাই ।

একেবারে শত বৃষ্টিকদম্বশনের জ্বায় এই কথায় দুর্জয়সিংহকে ক্রিপ্ত করিয়া তুলিল, রোষে তাঁহার বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল, নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, মৃত্যু হইতে পদ পর্য্যন্ত কাঁপিতে লাগিল । অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া, দেশকাল বিস্মৃত হইয়া, লক্ষ দিয়া অপরিচিত যুবকের গলদেশ ধারণ করিলেন ।

তৎক্ষণাৎ শত ভীলযোদ্ধা ধমুকে ভীর সংযোজন করিল । অপরিচিত যুবক বাম-হস্তে তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন, দক্ষিণ-

হস্তে ধীরে ধীরে দুর্জয়সিংহকে শূন্তে উঠাইয়া অস্ত্রবীর্ঘ্যের সহিত দশহস্ত দূরে নিক্ষেপ করিলেন ।

দুর্জয়সিংহ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, যুবকের দিকে চাহিলেন, যুবক অবিচলিত ও নিঃশব্দ । যুবকের কোষে অগ্নি রহিয়াছে, যুবক তাহা স্পর্শ করেন নাই । পূর্ব্ববৎ স্থির অবিচলিত স্বরে কহিলেন, “শয্যা রচনা হইয়াছে ।”

দুর্জয়সিংহ নতশিরে কহিলেন, “অন্তই স্বর্য্যমহলে যাইব ।”

তখন যুবক দুর্জয়সিংহের নিকটে আসিলেন, পুনরায় উন্মীষ দিয়া নয়নবদর আবৃত করিলেন ও স্বয়ং অতিথির হস্তধারণ করিয়া গুচা হইতে বাহির হইলেন । এক ক্রোশ দুই জনে পর্ব্বত নামিতে লাগিলেন, একটি কথামাত্র নাই । নৈশ বায়ুতে বৃক্ষপত্র মর্ম্মরশব্দ করিতেছে, স্থানে স্থানে জলপ্রপাতের শব্দ শুনা যাইতেছে, সময়ে সময়ে দূরত্ব শূণ্য বা বস্ত্রপত্রের শব্দ পথিকের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে । সে নৈশ বায়ুতে দুর্জয়সিংহের জলন্ত ললাট শীতল হইল না, সে নিশ্চিন্ততার তাঁহার হৃদয়ের উদ্বেগ স্তব্ধ হইল না ।

এক ক্রোশ পথ আসিয়া যুবক দুর্জয়সিংহের নয়নের বস্তু খুলিয়া দিলেন, দুর্জয়সিংহ দেখিলেন, যে স্থানে যুবক তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, এ সেই স্থান । যুবক এই স্থানে দুর্জয়সিংহের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণে তাঁহার মুখ পুনরায় আরক্ত হইল । কিন্তু তিনি কোন কথা উচ্চারণ না করিয়া সেই অন্ধকারময় জঙ্গলের ভিতর দিয়া একাকী দুর্গাভিমুখে চলিলেন ।

প্রাতঃকালের রক্তমাছটা পূর্ব্বদিকে দেখা দিয়াছে, একপ সমর দুর্জয়সিংহ স্বর্য্যমহলে প্রবেশ করিলেন । তিনি এতক্ষণ

আইসেন নাই বলিয়া দুর্গে সকলেই উৎকর্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার আগমনে সকলেই দোড়াইয়া আসিল, দুর্জয়সিংহের মুখের ভঙ্গী ও রক্তিমাবর্ণ দেখিয়া সকলে নিঃশব্দে সরিয়া গেল। দুর্জয়সিংহকে তাহারা চিনিত।

দুর্জয়সিংহ একাকী একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বাইয়া প্রধান অর্থাৎ মন্ত্রীকে ডাকাইলেন। শনি যুদ্ধে দুর্জয়সিংহের জ্ঞান সাহসী, মন্ত্রণায় অভূত। দুর্জয়সিংহ ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহাকে বসিতে আদেশ করিয়া অর্কক্ষুটস্থরে কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

দুর্জয়। এ দুর্গ যখন অধিকার করি, সে কথা আরণ আছে ?

প্রধান। সে কেবল আট বৎসরের কথা। অবশ্য স্মরণ আছে।

দুর্জয়। তিলকসিংহের বিধবা হত হইলে পুত্রের কি হইয়াছিল ?

প্রধান। এই দুর্গ হইতে নিম্নস্থ হ্রদে পড়িয়া বালক প্রাণ হারাইয়াছে।

দুর্জয়। তিলকসিংহের পুত্র অদ্যাবধি জীবিত আছে।

প্রধান। তিলকসিংহের পুত্র ?

দুর্জয়। তিলকসিংহের পুত্র।

প্রধান। বালক তেজসিংহ ?

দুর্জয়। তেজসিংহ : কিন্তু সে অজ্ঞ বালক নহে।

প্রধান। প্রভু ব্রাহ্ম হইয়াছেন, এ দুর্গ হইতে হ্রদে পতিত হইলে মৃত্যু বাঁচেনা, বালকের কথা কি ?

দুর্জয় উত্তর করিলেন না, কিন্তু মন্ত্রী দেখিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডলে ক্রোধলক্ষণ স্ফূর্ত হইতেছে।

প্রধান। আপনি কিরূপে চিনিলেন ? বাহ্যকে দশম বৎসরের বালক অবস্থায় এক-

বার দেখিয়াছিলেন, তাহার মুখ দেখিয়া চেনা-দুঃসাধ্য।

দুর্জয়। তাহার মুখ দেখিয়া চিনি নাই, তাহার কথায় চিনিয়াছি, আরও একটি উপায়ে চিনিয়াছি।

প্রধান। সে কি ?

দুর্জয়। তিলকের সহিত আমি একবার বাহ্যকুর করিয়াছিলাম, তাহার অনুরবীর্ষ মেওয়ারের আর কেহ ধারণ করিত না। তাহার একটি বিশেষ যুদ্ধকৌশল মেওয়ারে আর কেহ জানিত না। তেজসিংহ পিতার অনুরবীর্ষ ধারণ করে, তেজসিংহ পিতার কৌশল জানে।

দুই জনে ক্ষণেক নিস্তব্ধ রহিলেন। প্রধান প্রকাশ্যে বলিতে সাহস করিলেন না, কিন্তু মনে মনে প্রভুর কথা বিশ্বাস করিলেন না। বিবেচনা করিলেন, রজনীতে অন্য কাহারও অনুরবীর্ষ দেখিয়া দুর্জয়সিংহের ভ্রম হইয়াছে। দুর্জয়সিংহ ক্ষণেক পর কহিলেন, “আরও একটি কথা আছে।”

প্রধান। কি ?

দুর্জয়। তেজসিংহ অদ্য আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে।

ঘরের দ্বার উন্মোচিত হইল। দুর্জয়সিংহ একাকী ছাদে পদচারণ করিতেছেন, অদ্য তাঁহার মুখের ভঙ্গী দেখিলে তাঁহার যোদ্ধা গণও চমকিত হইত।

রাজপুত জীবন সন্ধ্যা। অর্থ পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পুলশোক।

ভীতেষণি প্রভাষণঃ ক্রীতিঃ পরেষণি ধৈর্যণে
বিনীতেষণি উদ্ধতাঃ দয়া পরেষণি নির্দয়াঃ ক্রীষণি
শ্রুতঃ ভূতোষণি ক্রমাঃ দীনেষণি দাক্ষাণঃ।

কাদম্বরী।

প্রাতঃকাল হইলে সূর্য্যমহলের সৈন্ত-
সামন্ত সমজ্ঞ হইতে লাগিল। পূর্বদিক্
হইতে নবভাত সূর্য্যরশ্মি সৈন্তদিগের বর্শ
খণ্ড ও ধ্বংসের উপর প্রতিকলিত হই-
লাগিল, সৈন্তগণ উৎসাহ ও আনন্দে না ?
করিয়া দুর্গসম্মুখে একত্রিত হইল।
দুর্জয়সিংহ সৈন্তদিগের আনন্দ ত করিয়া
ছাদ হইতে অবতরণ করিয়া করিলেন।
সজ্জা করিলেন ও অচিরে হইতে সৈন্তগণ
করিয়া সৈন্তগণের মধ্যে অ
সৈন্তের জয়নাদে সেই প
হইল।

আনন্দময় বসন্তের চারণ করিল না, ধীরে
পর্বত, উপত্যকা ও দিকে চাহিল, পরে ধীরে
গমন করিতে লাগি অত্যাচারী দুর্জয়সিংহের
এখনও গান করি
শিশিরবিন্দু এখন পরে গোকুলদাস কহিল,
যাইতেছে, 'তোকে ধন্যবাদ দিতেছি।
পতাকা লইয়া বিস্তরণ হইয়াছিলাম, সে কথা
উপর পর্বত চারণ করিয়া দিলি—একদিন
রীর স্তায় সে দিব।'

বোদ্ধগণ এ

লাগিলেন,

সমরবাদ্য

বৃহত্তের জন

সার দৃষ্ট

হইতে অব

প্রবেশ করিল,

নিমন্তক।

বনের অ সালুম্ব্রা।

রোহীদিগে

বনের ভি
গমিবেনমপশ্চব্।

না, অ

বাসবদত্তা।

তেছে

অন্ত সালুম্ব্রার পর্বত-দুর্গ কি মনোহর
পা চারণ করিয়াছে! পর্বতশৃঙ্গ হইতে

চন্দ্রাওয়ারকুলের উন্নত পতাকা আকাশমার্গে
উজ্জীন হইয়াছে, দুর্গের স্থানে স্থানে অসংখ্য

পতাকা উড়িতেছে, অসংখ্য তোরণ নির্মিত
ও সুশোভিত হইয়াছে। চন্দ্রাওয়ারকুলের বত

সেনানী আছেন, তাঁহারা সালুম্ব্রায় উপনীত
হইয়াছেন; কেহ দিশত, কেহ পঞ্চশত, কেহ

সহস্র সৈন্ত লইয়া চন্দ্রাওয়ারকুলাধিপতি রাও-
রং কৃষ্ণসিংহের সদনে আসিয়াছেন। সেনানী-

গণ প্রাসাদে রাজসাক্ষাৎ অপেক্ষা করিতে-
ছেন, সৈন্তগণ পর্বতের নীচে সমতল ক্ষেত্রে

অসংখ্য শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছে। শিবি-
রের উপর হইতে চন্দ্রাওয়ার-পতাকা উড়ি-

তেছে, শিবিরের চারিদিক্ হইতে চন্দ্রাওয়ার-
কুলের বিজয়বাত বাজিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে

যোদ্ধাদিগের হাস্তধ্বনি ও উল্লাসরব শ্রুত হই-
তেছে। প্রাতঃকালের সূর্য্যরশ্মি সেই শিবি-

রের উপর পতিত হইতেছে, প্রাতঃকালের
নীতল বায়ু সেই অসংখ্য চন্দ্রাওয়ার-পতাকা

লইয়া খেলা করিতেছে, অথবা চন্দ্রাওয়ার-রণ-
বাত চারিদিকে ক্ষেত্রে, গৃহে, উপত্যকার

বা পর্বতশৃঙ্গে বিস্তার করিতেছে। চন্দ্রাওয়ার-
কুলের রণবাত ভারতক্ষেত্রে ইহার পূর্বেই

অনেকবার শব্দিত হইয়াছে, অনেক পর্বতে,
অনেক উপত্যকার, অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু

হৃদয় স্তম্ভিত করিয়াছে।

আইসেন নাই বলিয়া দুর্গে রমেশচন্দ্রের প্রহাবলী।

হইয়াছিল। তাঁহার আদিগকে রক্ষা পথের দৃশ্য কি দুর্গের অবীথর? এই দৃশ্য বিকটাকরণ করিলে কি আমাদের ‘স্বাধীন-ধর্মের’ কোন ক্ষতি আছে? আমাদের ‘বাপতা’ (পৈতৃক ভূমিতে প্রজার অক্ষর স্বত্ব) আমরা ত দুর্জয়সিংহের নিকট বিক্রয় করি নাই। তিলকসিংহের উত্তরাধিকারী আমরা, আমরা তাঁহার বশী, অন্য কাহারও নহি।”

দুর্জয়সিংহ একাকী একটি তাহার প্রাকোষ্ঠে বসিয়া প্রধান অর্থাৎ করিয়া ডাকাইলেন। তিনি যুদ্ধে দুর্জয়সিংহের স্ত্রীর সাহসী, মন্ত্রণায় অভূলা। দুর্জয়সিংহ ইচ্ছিত দ্বারা তাঁহাকে বসিতে আদেশ করিয়া অর্দ্ধক্ষুণ্টক কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

দুর্জয়। এ দুর্গ যখন অধিকার করি, সে কথা স্মরণ আছে?

প্রধান। সে কেবল অষ্ট বৎসরের কথা। অবশ্য স্মরণ আছে।

দুর্জয়। তিলকসিংহের বিধবা হত হইলে পুত্রের কি হইয়াছিল?

প্রধান। এই দুর্গ হইতে নিয়ন্ত্র হুদে পড়িয়া বালক প্রাণ হারাইয়াছে।

দুর্জয়। তিলকসিংহের পুত্র অন্ত্যাবধি জীবিত আছে।

প্রধান। তিলকসিংহের পুত্র?

দুর্জয়। তিলকসিংহের পুত্র।

প্রধান। বালক তেজসিংহ?

দুর্জয়। তেজসিংহ; কিন্তু সে অত্যন্ত বালক নহে।

প্রধান। প্রভু ভ্রাতৃ হইয়াছেন, এ দুর্গ হইতে হুদে পতিত হইলে মৃত্যু বাঁচেন না, বালকের কথা কি?

দুর্জয় উত্তর করিলেন না, কিন্তু যন্ত্রী দেখিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডলে ক্রোধলক্ষণ সঞ্চার হইতেছে।

প্রধান। আপনি কিরূপে চিনিলেন? বাহ্যিক দর্শন বৎসরের বালক অবস্থায় এক-

গ্রামের লোকের মধ্যে এইরূপ ভাব ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ত্রুড় দুর্জয়সিংহ দ্বাদশের এই বিদ্রোহভাব দেখিয়া আরও ক্রোধিত হইলেন, প্রজাদিগকে উচিত হইদবার জন্য প্রধান প্রধান কয়েক প্রকাশ্যে দুর্গে ধরিয়া আনাইলেন। মনে মনে বিচার করিয়া সমস্ত প্রজার বিবেচনা এবং সদ্ধার গোষ্ঠীসমূহের অন্তরবোধ দেখা বিদ্রোহিতাণ্যে প্রাণ-রাছে। দুর্জয়,

“আরও একটি কাণ্ডের পর অতঃ দুর্জয়-প্রধান। কি? এই গ্রামের ভিতর দুর্জয়। তেজসিংহ বাইতে বাইতে রক্ষা করিয়াছে। একজন দীর্ঘকায়

ঘরের দ্বার উল্কাটন। গোলন্দাসকে একাকী ছাদে পদচারণা আসা করিলেন, তাঁহার মুখের ভঙ্গী দেখিলে চট্টা করিতে-গণও চমকিত হইত। আর কুমন্ত্রণা

দূরে দণ্ডায়-
প তিরস্কৃত
বন্ধে দাস
কে প্রণাম

র পূর্বোক্ত
হের কথার
শ্রিত হইল,

তথাপি বৃদ্ধ ধীরে ধীরে কেবলমাত্র বলিল,
“ঐহু, কুমন্ত্রণা আমাদের বংশের অভ্যাস
নহে।”

দুর্জয়। তবে ভীক শৃঙ্গালের বংশে কুম-
ন্ত্রণা অভ্যাস কত দিন হইয়াছে? বনৌ দাস-
বংশ-সাধু আচরণ কত দিন শিখিয়াছে?

গোকুলদাস। ঐহু, আমাদের হুভাগ্য-
বশতঃ আমরা বনৌ বটে, কিন্তু দাসত্বের
সহিত এখনও ভীকতা অভ্যাস করি নাই,
আমরা রাজপুত্র।

অন্তান্ত অখারোহিগণ দেখিলেন, নির্ঝোখ
গোকুলদাস আপনি আপনার মৃত্যু ঘটাই-
তেছে। দুর্জয়সিংহ ক্রুদ্ধবরে কহিলেন, “রে
বৃদ্ধ, পুত্রের প্রাণদণ্ড হইয়াছে, তথাপি এখ-
নও রাজার প্রতি আচরণ শিখিলি না?
দুর্জয়সিংহ এইরূপে দাসকে আচরণ শিখায়।”
এই বলিয়া ক্রুদ্ধ দুর্জয়সিংহ পদাবত করিয়া
বৃদ্ধ গোকুলদাসকে ভূতলশায়ী করিলেন।
নির্ঝোখ হইয়া সে স্থান হইতে সৈন্তগণ
চলিয়া গেল।

খেতশ্রম দীর্ঘাকার বৃদ্ধ গাজোখান
করিল। রাজপুত্রের পক্ষে এই অসহ্য অব-
মাননার একটি শব্দ উচ্চারণ করিল না, ধীরে
ধীরে নভোমণ্ডলের দিকে চাহিল, পরে ধীরে
ধীরে সেই বিষম অত্যাচারী দুর্জয়সিংহের
দিকে চাহিল।

অনেকক্ষণ পরে গোকুলদাস কহিল,
“দুর্জয়সিংহ, তোকে ধন্যবাদ দিতেছি।
পুত্রশাকে প্রায় বিশ্বরণ হইয়াছিলাম, সে কথা
তুই আমায় স্মরণ করিয়া দিলি—একদিন
ইহার ঐতিফল দিব।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সালুম্ভা।

ক্রয়মাণত্বরগত্রেবাশতং বাসামানবিশ্রামচকাশতপুঙ্কঃ
* * * সেনাসম্মিবেশবপশ্রম্।

বাসবদত্তা।

অন্ত সালুম্ভার পক্ষত-দুর্গ কি মনোহর
রূপ ধারণ করিয়াছে! পক্ষতশৃঙ্গ হইতে
চন্দাওরংকুলের উন্নত পতাকা আকাশমার্গে
উজ্জ্বল হইয়াছে, দুর্গের স্থানে স্থানে অসংখ্য
পতাকা উড়িতেছে, অসংখ্য তোরণ নির্মিত
ও সুশোভিত হইয়াছে। চন্দাওরংকুলের বহু
সেনানী আছেন, তাঁহারা সালুম্ভার উপনীত
হইয়াছেন; কেহ দিশত, কেহ পঞ্চশত, কেহ
সহস্র সৈন্ত লইয়া চন্দাওরংকুলাধিপতি রাও-
রং কৃষ্ণসিংহের সদনে আসিয়াছেন। সেনানী-
গণ প্রাসাদে রাজসাক্ষাৎ অপেক্ষা করিতে-
ছেন, সৈন্তগণ পক্ষতের নীচে সৈমতল ক্ষেত্রে
অসংখ্য শিবির সম্মিবেশিত করিয়াছে। শিবি-
রের উপর হইতে চন্দাওরং-পতাকা উড়ি-
তেছে, শিবিরের চারিদিক হইতে চন্দাওরং-
কুলের বিজয়বাণ্য বাজিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে
যোদ্ধাদিগের হাস্তধ্বনি ও উল্লাসব শব্দ হই-
তেছে। প্রাতঃকালের সূর্য্যরশ্মি সেই শিবি-
রের উপর পতিত হইতেছে, প্রাতঃকালের
নীতল বায়ু সেই অসংখ্য চন্দাওরং-পতাকা
লইয়া খেলা করিতেছে, অথবা চন্দাওরং-রণ-
বাণ্য চারিদিকে ক্ষেত্রে, গৃহে, উপত্যকার
বা পক্ষতশৃঙ্গে বিস্তার করিতেছে। চন্দাওরং-
কুলের রণবাণ্য ভারতক্ষেত্রে ইহার পূর্বেই
অনেকবার শব্দিত হইয়াছে, অনেক পক্ষতে,
অনেক উপত্যকার, অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে শব্দ-
ভর্য্য সজ্জিত করিয়াছে।

রণবাণের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র বাজও শ্রুত হইতেছে। কাস্তনমাস হোলৌর মাস; পথে, ঘাটে, গৃহঘারে নাগরিকগণ দলে দলে গীত গাহিতেছে, একে অস্ত্রের দিকে আবার নিক্ষেপ করিতেছে, উল্লাসে ও আনন্দে মেওয়ারের আসন্নবিপদ বিস্মৃত হইতেছে। উৎসব-দিনেব প্রভাবে অস্ত্র নানারূপ অস্ত্রাস্ত্র গীতও হইতেছে, নানারূপ অশ্রাব্য কুৎসিত কোতুকে নাগরিকগণ বিমোহিত হইতেছে। সে কোতুক, সে আত্ম-নিক্ষেপ হইতে অস্ত্র কাহারও পরিজ্ঞান নাই। উৎসবের দিনে নীচ ও উচ্চ সকলই সমান, সালুস্ত্রার প্রধান সেনানী বা প্রধান ময়ীও পথ অতিবাহন-কালে নাগরিকদিগের আবারে রঞ্জিত ও বাতিবাস্ত হইলেন; নাগরিকদিগের কোতুকে বিরক্ত হইলেন না। অস্ত্র কাহারও পরিজ্ঞান নাই। অন্নবরষ বালকগণ বৃদ্ধের স্তেতশ্রম রক্তবর্ণ করিতেছিল, বৃদ্ধ প্রহার করিতে আসিলে বালকগণ তাহার নয়নে আবার দিয়া কঁরতালি দ্বারা অন্ধকে উপহাস করিতে লাগিল। অস্ত্র কাহারও পরিজ্ঞান নাই। কৃষ্ণসিংহের প্রাসাদ হইতে দরিরের কুটার পর্য্যন্ত রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইল, দলে দলে বালক ও বৃদ্ধগণ পথে পদচারণ করিতে লাগিল, দলে-দলে ললনাগণ পথে, ঘাটে, গৃহঘারে কায়দেবের কমনীর গীত উচ্চারণ করিতে লাগিল।

বেলা দুই তিন দণ্ডের সময় রাওরং কৃষ্ণসিংহ দরীশালার অর্থাৎ সভাগৃহে আসিলেন, কৃষ্ণসিংহের সম্মুখে গারক চন্দাওরং-কুলের গৌরবগান গাইতে গাইতে গৃহে প্রবেশ করিলেন। সভাগৃহে দুর্জয়সিংহ প্রভৃতি অধীনস্থ বোদ্ধগণ ভক্তিতাবে দণ্ডায়মান হইয়া “মহারাজ দীর্ঘজীবী হউন” বলিয়া অভিবাদন করিলেন। কৃষ্ণসিংহ যন্তক

নত করিয়া যন্ত্রলেখু বোদ্ধাঙ্গিরের সম্মান করিলেন।

রাওরং কৃষ্ণসিংহ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন; তাহার দক্ষিণে ও বাম-দিকে বোদ্ধগণ দণ্ডায়মান রমিয়াছেন, সকলেই হস্তে খড়্গ ও ঢাল। বীরদিগের উপর সানন্দে নয়নক্ষেপ করিয়া কৃষ্ণসিংহ তাঁহা-দিগকে বসিবার আদেশ করিলেন, বোদ্ধগণ নিজ নিজ স্থানে বসিলেন, ঢালের সহিত ঢালের সজ্জবর্ণ-শব্দ সেই প্রশস্ত সভামন্দিরে প্রতিধ্বনিত হইল।

সকলে উপবেশন করিলে পর প্রাচীন কৃষ্ণসিংহ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, “বীরগণ! অস্ত্র সমবেত হইবার কারণ আপনারা অবগত আছেন। চিতোর তুর্কীদিগের হস্তে, মেওয়ারের উর্কর ক্ষেত্রচর ও সমস্ত সমতল ভূমি তুর্কীদিগের হস্তে; কেবল পর্বত ও জঙ্গল-পরিপূর্ণ প্রদেশখণ্ডে মেওয়ারের স্বাধীনতা-লক্ষ্মী লুক্কায়িত রহিয়াছেন, তথা হইতে তাঁহাকে হরণ করিতে স্বেচ্ছদিগের ইচ্ছা।

উত্তরে কমলমার হইতে দক্ষিণে রক্তনাথ পর্য্যন্ত পর্বতপ্রদেশমাত্র মহারাণার অধীন, অবশিষ্ট সমস্ত প্রশস্ত ভূমি মোগলের করকবলিত। কিন্তু এই প্রশস্ত ভূমি চইতে মোগলের কোন লাভ নাই। মহারাণার আদেশে এ মোগল-করকবলিত প্রদেশ জনশূন্য অরণ্য। এ স্থানে এক্ষণে কৃষক চাষ করে না, গোরক্ষক গোরক্ষা করে না, মদ্রম্বা বাস করে না; মহারাণার আদেশে এ প্রদেশের সমস্ত অধিবাসী পর্বতপ্রদেশের মধ্যে আসিয়া বাস করিতেছে, বুনাগ ও রবানদীর তীরে উর্কর ক্ষেত্রচর এক্ষণে জঙ্গলময় ও হিংস্রক পশুর আবাসস্থল হইয়াছে, আরাবলীপর্বতের পূর্বদিকস্থ সমস্ত মেওয়ার-প্রদেশ প্রায়শূন্য।

মহারাণার আদেশ কে লঙ্ঘন করিতে পারে? মহারাণা স্বয়ং সতত এই প্রদেশ দর্শন করিতে বান, সালুম্ভ্রা সতত মহরাজের সঙ্গে গিয়াছে। সমস্ত প্রদেশে অরণ্যের নিষ্কলতা দর্শন করিয়াছি, অরণ্যের নিস্তব্ধতা প্রবণ করিয়াছি, শস্ত্রের স্থানে উচ্চ তৃণক্ষেত্র দর্শন করিয়াছি, গমনাগমনের পথে কণ্টক-ময় বাবুল-বৃক্ষ ও নিবিড় জঙ্গল দেখিয়াছি, মানবগৃহে হিংস্রক পশুকে বাস করিতে দেখিয়াছি। একজন ছাগরক্ষক বুনাঙ্গ-নদী-তীরে নিভুতে ছাগরক্ষা করিতেছিল, তাহার যতদেহ এখনও বৃক্ষে লম্বমান রহিয়াছে। অল্প কেষ্ট মহরাজের আত্মা লঙ্ঘন করে নাই।

মোগলগণ ব্রিবিবে, মেওয়ারের উজ্জান-থও এক্ষণে অরণ্য ও অফলপ্রদ। তাহারা জানিবে, মহারাণার সাহিত যুদ্ধ করিতে হইলে এক্ষণে অরণ্য পার হইতে হইবে, তথায় মনুষ্য নাই, সৈন্তের খাণ্ড নাই, আবাস-স্থল নাই। তাহারা আরও জানিবে, সুরাট প্রভৃতি পশ্চিম-সাগরের বন্দরের সহিত দিল্লীর যে বাণিজ্য ছিল, তাহা এক্ষণে নিষিদ্ধ। এক্ষণে অরণ্যের ভিতর দিয়া তথায় যাইতে হইবে, গমনের সময় আমরা সুস্থ থাকিব না।

বীরগণ! এইরূপে আমরা মেওয়ারের বহির্দ্বার রক্ষা করিয়াছি। পর্বতপ্রদেশের ভিতরে প্রতি দুর্গে, প্রতি উপত্যকায় সৈন্ত আছে। চন্দাওয়ংকুল শীঘ্রই মহারাণার নিকট উপস্থিত হইবে, অস্ত্রাস্ত্র বোদ্ধকুল চারিদিক হইতে আসিতেছে, সমুদ্র-পেরে জন্ত মহারাণার সৈন্তের অপ্রতুলতা হইবে না। ভূমিমাগণ যুদ্ধ জানে না, তাহারা নিজ নিজ উপত্যকা ও নিজ নিজ আবাসপর্বত রক্ষা করিবে। বহুজাতিগণও ধ্বংসহস্তে

যুদ্ধ দান করিবে। দক্ষিণে ভীলগণ, পূর্বে বীরগণ, পশ্চিমে মীনাগণ তুর্কীদিগকে সমর-উৎসবে আহ্বান করিবে। শুনিয়াছি, মহারাজ মানসিংহ দিল্লীখবরের পুত্রের সহিত বড় ধুমধামে আসিতেছেন, আমরাও তাঁহাকে আহ্বান করিতে প্রস্তুত আছি।

বীরগণ! এক্ষণে হোলীর সময়, নাগ-রিকগণ তইতে আপনাদিগেরও পরিজ্ঞান নাই, আমারও পরিজ্ঞান নাই। আপনাদিগের মস্তকে, বক্ষে, বাহুতে, পরিচ্ছদে আবার দেখিতেছি, দুই নাগরিকগণ আমারও শুক্লকেশ ও ধ্বজাশ্রু রক্তবর্ণ করিয়া দিয়াছে। প্রাসাদ, কুটার, পথ, ঘাট সমস্ত রক্তবর্ণ করিয়া দিয়াছে। আর এক হোলীর দিন আসিতেছে, সে যোদ্ধার প্রকৃত আনন্দের দিন। যোদ্ধার মস্তক ও বক্ষ অস্ত্র প্রকারে রঞ্জিত হইবে, এই পর্বত-সঙ্কুল প্রদেশের প্রত্যেক গিরি ও উপত্যকা মনুষ্য-শোণিতে রঞ্জিত হইবে। এই নাগরিকদিগের গীত ও বাণ্ড শুনিতেছ, সেদিন মেওয়ারে অস্বরূপ বাণ্ড হইবে, অস্বরূপ গীত গগনে উথিত হইবে। সেই আনন্দের দিনের জন্য আমার যোদ্ধগণ প্রস্তুত হও।

সালুম্ভ্রাধিপতির এই উৎসাহ-বাক্যে যোদ্ধগণ বীরমদে হৃৎকার করিয়া উঠিল, ঝনঝনাবে কোষ হইতে অসি বহির্গত হইল। সে শব্দ, সে হৃৎকার সভামন্দিরে প্রতিধ্বনিত হইল, সালুম্ভ্রার পর্বতশিখর অতিক্রম করিয়া গগনে উথিত হইল। এই উল্লাসরব ধামিতে ধামিতেই সেই প্রশস্ত সভাগৃহে উন্নত গীতধ্বনি শ্রুত হইল, সালুম্ভ্রার বৃদ্ধ চারুগদ্যে পূর্বকালের গীত আরম্ভ করিয়াছেন।

গীত।

“যোদ্ধগণ! আপনারা যুবক, আপনা-

দিগের দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে আপনাদিগের আশা, উৎসাহ, প্রতিজ্ঞা ভবিষ্যতের দিকে ধাবমান হয়। বৃক্ষের দৃষ্টি অতীত। সেই অতীতকাল রক্তবর্ণ মেঘমালায় স্নায় আমার মানসচক্ৰ আচ্ছাদন করিতেছে, আমি বহিজগৎ দেখিতেছি না। সেই মেঘমালায় মধ্যে অন্ত একটি জগৎ দেখিতেছি, অন্ত বীর আকৃতি দেখিতেছি, শ্রবণ করুন।

অন্ত আমাদের মহারাণা চিত্তোরে নাই, মহারাণা পর্বত-কন্দরে বাস করেন, মহারাণা বৃক্ষতলে শিশুদিগকে লালন-পালন করেন, লব্ধশূন্য নিবিড় জঙ্গল মহারাণার শুদ্ধান্তঃপুর। বালাকালে আমি আর একজনকে এইরূপ দেখিয়াছিলাম, তিনিও পর্বতগহ্বরে বাস করিতেন, পর্বতশিখর তাঁহার উন্নত প্রাসাদ ছিল। সুদূর-শ্রুত সঙ্গীতের স্নায় পূর্বকথা হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে, হৃদয় আলোড়িত করিতেছে, সে কথা শ্রবণ করুন।

সেই বালক একদিন স্নাতার সহিত চারগীদেবীর পর্বতে গিয়াছিলেন; নির্ভীক বালক অন্ত আসন ত্যাগ করিয়া সিংহচর্খের উপর বসিলেন। চারগীদেবী শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, ‘যিনি সিংহচর্খের উপর বসিলেন, একদিন তিনি সিংহাসনে বসিবেন।’ রোবে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালককে আক্রমণ করিল, কেন না, উভয়েই রাজপুত্র। বালক আঘাতে জর্জরিত-কলেবর হইয়া এক চক্ৰ অঙ্ক হইয়া পলাইল। কোথায় পলাইল?

ছাগরক্ষকদিগের নিকট অন্বেষণ কর। তাহাদিগের ঐ মলিন-বেশধারী অঞ্চল ভেজঃপূর্ণ ভূতাতীকে? ছাগরক্ষকগণ জানে না, জানিলে কি ছাগরক্ষণে

অপটু বলিষ্ঠ বালককে অবমাননা করিয়া দূর করিয়া দিত? অবমানিত, দূরীকৃত বালক কোথায় বাইল?

জঙ্গলের ভিতর অন্বেষণ কর।

শ্রীনগরে বীর করিমটাদের একজন সামান্য সেনা পরিশ্রান্ত হইয়া কি স্থখে নিজা বাইতেছে। বটবৃক্ষই তাঁহার চক্রা-তল, তৃণই তাঁহার শয্যা, খড়গই তাঁহার উপাধান। বৈকালিক সূর্য্যকিরণ সেই পত্ররাশি ভেদ করিয়া বালকের মুখের উপর পড়িয়াছে, একটি বৃহৎ সর্প চক্র বিস্তার করিয়া সেই রৌদ্র নিবারণ করিতেছে। করিমটাদের সামান্য সেনার জন্ত কি সর্প চক্র বিস্তার করিয়াছে? এ সামান্য সেনা নহে, এ বালক গুপ্তবেশে রাজপুত্র, সর্প বালকের রাজচ্ছত্রধারী।

দিন গেল, মাস অতীত হইল, বৎসর অতিবাহিত হইল, সেই বালক সিংহাসনে বসিলেন, রাজচ্ছত্রধারী তাঁহার উপর ছত্র ধরিল। ঐ শুন বজ্রনাদ, ঐ দেখ, সংগ্রামসিংহের অগ্নীতি সহস্র পাখা-রোহী যেদিনী কম্পিত করিতেছে। ঐ দেখ, তাঁহার অসংখ্যক জয়তাকায আকাশ রক্তবর্ণ হইতেছে; ঐ দেখ, শতজ হইতে বিক্ষাটল পর্য্যন্ত ও সিদ্ধ হইতে বম্বনা পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছে, অষ্টাদশ যুদ্ধে জয়ী হইয়া তিনি এ রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন। পুনরায় কি পৃথীরাজের স্নায় আঘাবর্ত্ত একচ্ছত্র করিবেন? কিন্তু ভারতবর্ষের পশ্চিম-দিকে নেঘরাশি জড় হইতেছে, সে ঝটিকা ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িল, নূতন আগন্তক বাবরের মোগল-সৈন্য ভারত-ক্ষেত্র আচ্ছন্ন করিল! সিংহবল প্রকাশ করিয়াও সংগ্রামসিংহ বাবরের নিকট

পরাস্ত হইলেন। কিন্তু বীরের বীর-প্রতিজ্ঞা প্রবণ কর—যত দিন বাবরকে পরাস্ত না করিব, তত দিন চিতোর-প্রবেশ করিব না; মরুভূমি আমার শয্যা, আকাশ আমার চম্ভাতপ! সংগ্রামসিংহ প্রতিজ্ঞা-সম্মত করে না। পৃথুরাজের সিংহাসনে কি আবার হিন্দুরাজ্য উপবেশন করিবেন? আমি বুদ্ধ হইয়াছি, আর দেখিতে পাই না, সংগ্রামসিংহ কোথায় গেলেন? তাঁহার অধীনস্থ বোদ্ধল রাজা ও শতাধিক রাওর ও রাওরল কোথায় গেলেন? পঞ্চশত হস্তী, অশ্বাতি সহস্র অশ্বারোহী কোথায় গেল? সে আলোক নির্ভাণ হইয়াছে! সে মহাতেজ চিরকালের জন্ত লীন হইয়াছে!

লীন হয় নাই! বোদ্ধগণ, সবল হস্তে খড়্গ ধারণ কর, তীক্ষ্ণ বর্শা মস্তকের উপর উত্তোলন কর, হুকার-রবে যুদ্ধে ধাবমান হও, বায়ু-ছাড়িত তৃণবৎ তুর্কী-দিগকে দূরে তাড়াইয়া দাও, চিতোরনগর জয় জয় নামে পরিপূরিত কর। বৃদ্ধের পূর্ন-স্মৃতি কেবল স্বপ্ন নহে, মেওয়ারের পূর্নদিন আসিবে। পূর্ন-কন্দর ও নিবিড় বন ভাগ করিয়া সংগ্রামসিংহের ত্রায় প্রতাপ-সিংহও সিংহাসনে আরোহণ করিবেন, সংগ্রামসিংহের ত্রায় প্রতাপসিংহের নামও দিল্লীর দ্বার পর্য্যন্ত, সমুদ্রের তীর পর্য্যন্ত, হিমাচলের তুষারাবৃত উন্নত শেখর পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইবে।”

বুদ্ধ নীরব হইল। কণমাত্র সভাস্থল নীরব, সহসা শত বোদ্ধার বজ্রনাদ ও হুকার-শব্দে সালুস্ত্রার পূর্নত কম্পিত হইল। পূর্নভের নীচে সৈন্তগণ সে শব্দ শুনি, শতগুণ উচ্চরবে সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত করিল।

চারুণ্যদেব নিজ স্থানে উপবেশন করিলে পর সালুস্ত্রাধিপতি বোদ্ধাধিপতির দিকে চাহিয়া গভীর-স্বরে বলিলেন, “বীরগণ, বৃদ্ধের অধিক বিলম্ব নাই। যুদ্ধসময়ে সালুস্ত্রা সর্বদাই রাণার দক্ষিণে থাকেন, আমি কেবল সৈন্তগণের করিবার জন্ত এখানে আসিয়াছি। চম্ভাওরংকুলের প্রধান প্রধান বীরগণ সৈন্তে উপস্থিত হইয়াছেন, চল, কলাই আমরা মহারাণার আধুনিক রাজধানী কমলমীরাভিমুখে বাজা করি। বীরগণ, আমাদের সভাভঙ্গ হইল। বজ্রগণ, অস্ত্র হোলীর দিন, চল, একবার বাৎসরিক আনন্দে মগ্ন হই। আগামী বৎসরে পুনরায় হোলী দেখিব, কে বলিতে পারে?”

প্রাসাদের সম্মুখে প্রশস্ত ছাদে বোদ্ধাগণ অশ্বারোহণে হোলী দেখিতে লাগিলেন, অশ্বচালনে ও আবারনিক্ষেপে নিপুণতা দেখাইতে লাগিলেন। পরস্পরের কুহুমে পরস্পরের মস্তক, দেহ ও অশ্বদেহ রঞ্জিত হইল, অশ্বের পদশব্দ ও বোদ্ধা-দিগের আনন্দরব চারিদিকে শ্রুত হইল, অশ্বগণ কখন তীব্রগতিতে যাইতেছে, কখন সহসা দণ্ডায়মান হইতেছে, কখন লক্ষ দিয়া পলাইতেছে, যেন তাহারাও এই ক্রীড়ার উন্নত। অশ্বারোহিগণ অসাধারণ নিপুণতার সহিত অশ্বচালনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষা ও অপরের উপর আবার নিক্ষেপ করিতেছেন। নীচে সৈন্তগণ, মগরে নাগরিকগণ এই ক্রীড়ার লিপ্ত হইল, সাংবৎসরিক আনন্দ-রবে সালুস্ত্রা-পূর্নত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেনানী ও সৈন্তগণের মধ্যে কয়জন পরবৎসরে পুনরায় এই ক্রীড়া করিবে? আর কত সহস্র জন তাহার পূর্বে হলদীবাটার ভীষণ পূর্নতভলে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইবে?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রতাপসিংহ।

হতো বা প্রাপ্যসিদ্ধি স্বর্গ

দ্বিরা বা ভোকারে মহীম্।

ভগবৎগীতা।

কয়েক দিবসমধ্যে চন্দাওয়ারকুলেশ্বর শালুগ্রাধিপতি সমস্ত চন্দাওয়ারকুলের সৈন্ত লইয়া কমলমীরে মহারাণার সহিত যোগ দিলেন। অস্ত্রান্ত কুলের যোদ্ধাগণ দলে দলে আসিতে লাগিল। দেবগড় হইতে চন্দাওয়ারকুলেশ্বর বিসহস্র সৈন্ত লইয়া আসিলেন, তাহারও চন্দাওয়ারকুলের এক শাখামাত্র। বেদনোরের মৈত্রীকুলেশ্বরগণ বহুসংখ্যক সৈন্ত লইয়া আসিলেন, তাহার রাঠোরবংশীয়, মেওয়ারে তাহারিগের অপেক্ষা সাহসী বোঝা ছিল না। এই বংশের জয়মল্লই আক্বের কর্তৃক চিতোর আক্রমণকালে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া স্বয়ং আক্বের-হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রেরা এখনও সে কথা বিশ্বাস হন নাই, পিতার বীরত্ব অমূল্য করিতে করিতেই মহারাণার নিকট আসিয়াছেন। কৈলওয়া হইতে জগাওয়ারকুল বহুসংখ্যক সৈন্ত লইয়া কমলমীরে আসিলেন, তাঁহারও চন্দাওয়ারকুলের শাখা মাত্র। এই জগাওয়ারকুলোদ্ভব পত্তনামক বীরশ্রেষ্ঠ চিতোরধ্বংসকালে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। শালুগ্রাধিপতির মৃত্যুর পর যোড়শবর্ষীয় পত্তন চিতোরধার রক্ষা করেন, অকম্পিত-হৃদয়ে সমুখবৃদ্ধে নিজ মাতা ও বনিতার মৃত্যু দেখেন, অকম্পিত-হৃদয়ে সেই দারদ্র্যে সমুখবৃদ্ধে প্রাণদান করেন। তাঁহারই জাতি-বদ্ধ এক্ষণে জগাওয়ারকুলেশ্বর, জগাওয়ারকুলের নাম রাখিতে

কৈলওয়া হইতে আসিয়া এক্ষণে মহারাণার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। কৈলওয়ারা হইতে আলাকুল, বৈদলা ও কোটারি হইতে চোহানকুল, বিজলী হইতে প্রমারকুল, অস্ত্রান্ত স্থান হইতে অস্ত্রান্ত কুলের বোদ্ধাগণ মেঘ-রাশির দ্বার বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহের চতুর্দিকে জড় হইতে লাগিল। অচিরে বাবিশং সহস্র সৈন্ত কমলমীরে উপস্থিত হইল, সমগ্র ভারতক্ষেত্রে এরূপ বাবিশং সহস্র বীরাগ্রগণ্য দেশাচরাণী বোদ্ধা আর ছিল না।

অল্প কালীনমাসের শেষ দিন, বসন্তোৎসবের শেষ দিন, স্মরণ্য রজনী দ্বিপ্রহরে সেনাগণ এই উৎসবে মত্ত রহিয়াছে। পর্ত-শিখরে, উপত্যকার, নগরের পথে, গৃহস্থের বাটীতে, অসংখ্য অগ্নিকুণ্ড দেখা যাইতেছে; রজনীর অন্ধকারকে প্রদীপ্ত করিতেছে, সেই কৃষ্ণ পর্তরাশিকে উদ্দীপ্ত করিতেছে। সেই অগ্নিকুণ্ডে সেনাগণ আবীর ও অস্ত্রান্ত দ্রব্য নিক্ষেপ করিতেছে, হোলীকে দগ্ধ করিতেছে, গীতরবে ও হাস্যধ্বনিত নৈশ নিস্তরতা বিদ্রুপিত করিতেছে। পর্তশিখর হইতে সেই অন্ধকারময় উপত্যকা যত দূর দেখা যায়, বুদ্ধরাশির ভিতর দিয়া এইরূপ অগ্নিও দৃষ্ট হইতেছে, এইরূপ আনন্দরব শ্রুত হইতেছে। কল্ক কল্ক রবে পর্ত-নদী সেই উপত্যকার মধ্যে দিয়া বহিয়া যাইতেছে, আপন স্বচ্ছবক্ষে এই অসংখ্য অগ্নিশিখার প্রতিবিম্ব ধারণ করিতেছে। বসন্ত-গীতের মধ্যে মধ্যে চারণ-দিগের যুদ্ধবর্ণনা স্থানে স্থানে শ্রুত হইতেছে, মেওয়ারের পূর্বগৌরব, মেওয়ারের বিপদ-রাশি, মেওয়ারের আশ্রয়বিজয়, এই সমস্ত বিষয়ের গীত সৈন্যগণলীকে প্রোৎসাহিত করিতেছে, আনন্দ-গীতের সঙ্গে সঙ্গে সেই গীত নৈশ গগনে উদ্ভিত হইতেছে।

সমস্ত উৎসবব্যাপার হইতে বহুদূরে

একটি অন্ধকারময় পর্কতস্থলীর উপর একজন বোকা একাকী পদচারণ করিতে-
ছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে সহসা দস্তারমান
হইরাছিলেন, কিন্তু উৎসবের গীত শুনিবার
অন্ত নাই। মধ্যে মধ্যে সেই উপত্যকার
মধ্যে বতদূর দেখা যায়, দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে-
ছিলেন, কিন্তু উৎসবের অধিভূক্ত দেখি-
বার অস্ত্র নহে। কখন কখন কমলমীরের
অপূর্ণ শৈল-ভূগর্গের উপর নয়ননিক্ষেপ
করিতেছিলেন, কখন অসংখ্য সৈন্যের দিকে
চাহিতেছিলেন, কখন বা আপন হৃদয়ে হস্ত
স্থাপন করিয়া সেই নক্ষত্রবিভূষিত অন্ধকার-
ময় নভোমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে-
ছিলেন। ইনি মহারাণা প্রতাপসিংহ।

প্রতাপসিংহের কোষে অসি লম্বমান
রহিয়াছে, নিকটে বৃক্ষতলে তৃণশয্যা রচিত
হইয়াছে, চিতোর পুনরায় হস্তগত না করিয়া
বোকা অস্ত্রশয্যার শয়ন করিবেন না, প্রতিজ্ঞা
করিয়াছিলেন। সেই ব্রত যত দিন না সিদ্ধ
হয়, তত দিন সুবর্ণ-রৌপ্য স্পর্শ করিবেন না।
জট-শ্রুঙ্গ বিমোচন করিবেন না; বৃক্ষপত্র
ভিন্ন অস্ত্র পাতে ভোজন করিবেন না; বেশ-
ভূষা সামান্ত দ্রব্য ভিন্ন অস্ত্র কিছু স্পর্শ
করিবেন না। প্রাচীন ভারতবর্ষের ঋষিগণও
ইষ্টসাধনার্থ প্রতাপসিংহ অপেক্ষা কঠোর ব্রত
ধারণ করেন নাই, জগতের বীরাগ্রগণ্য-
গণও অভীষ্টসাধনার্থ প্রতাপসিংহ অপেক্ষা
জীবনব্যাপী উত্তম করেন নাই।

সমগ্র ভারতভূমির ঐশ্বর্য, বীরত্ব, বুদ্ধি-
বল, বাহুবল, অস্ত্রবল প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে
একত্রিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে রাজস্থানের
অসাধারণ বীরত্ব, মাড়ওয়ার, অম্বর, বিকানীর,
বুন্দী প্রভৃতি প্রদেশের যুদ্ধবল একত্রিত হই-
য়াছে। ঐ নির্জন পর্কতস্থলীতে যে বোকা
অন্ধকারে দস্তারমান রহিয়াছেন, উনি সমগ্র

ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে একাকী যুঝিবেন
প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, অথবা স্বদেশ ও স্বাধীন-
তার জন্য শেষ রণস্থলে, মেওয়ারের শেষ
উপত্যকার বা পর্কত-কঙ্করে হৃদয়ের শোণিত-
দিবেন হিরসম্বল করিয়াছেন।

রজনী যিপ্রহরের পর মহারাণার কয়েক-
জন প্রধান সেনানী সেই স্থানে উপস্থিত হই-
লেন। মহারাণা তাঁহাদিগের জন্য অপেক্ষা
করিতেছিলেন। তাঁহাদিগকে আনিতে
দেখিয়া রাণার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল, তিনি
সাদরে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন।

সেই পর্কতস্থলীতে সকলে উপবেশন
করিলেন। প্রতাপসিংহ বলিলেন, “বীরগণ!
আপনাদিগের সাহস, আপনাদিগের উৎসাহ
দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি, এই শিখর
হইতে এই অসংখ্য সৈন্য দেখিয়া আমি
উল্লাসিত হইয়াছি, সেইজন্য আপনাদিগকে
ধন্যবাদ দিতে এই নির্জন স্থানে আহ্বান
করিয়াছি।”

সালুস্ত্রাধিপতি রাওয়ৎ কৃষ্ণসিংহ রাণার
দক্ষিণদিকে বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন,
“মহারাণা! যুদ্ধের সময়, বিপদের সময় কেবে
মেওয়ারের বোকাগণ মেওয়ারের মহারাণার
পার্শ্বতাগ করে? ঐ যে অসংখ্য সৈন্য
দেখিতেছেন, উহাদের হৃদয়ের শোণিত,
আমাদের হৃদয়ের শোণিত মহারাণার।
আজ্ঞা করুন, সে শোণিত বহিবে।”

প্রতাপ। কৃষ্ণসিংহ, আপনার ঋণ আমি
কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না। যে
দিন পিতার মৃত্যু হয়, যে দিন ভ্রাতা বোগমত
সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, সে দিন সভার
মধ্যে আপনিই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,
“মহারাণা! আপনার ভ্রম হইয়াছে, ঐ
স্থান আপনার ভ্রাতার।” সেই দিন
আপনিই আমার কোষে এই অসি বুলাইয়া

দিয়াছিলেন; যতক্ষণ আমি আমার হস্তে থাকিবে, ততক্ষণ সালুস্ত্রাধিপতি আমার দক্ষিণে থাকিবেন।

কৃষ্ণসিংহ। সালুস্ত্রা ইহা ভিন্ন অন্য পুরুষার চাহে না। আমিধর্মই সালুস্ত্রার পুরুষাভুগত ধর্ম, আমিধর্মই সালুস্ত্রার পুরুষাভুগত পুরুষার।

পরে রাঠোরবংশীয় জয়মল ও জগাওরংবংশীয় পন্তের সন্ততি ও আত্মীয়গণকে আহ্বান করিয়া মহারাণা বলিলেন, “চিতোর-ধ্বংসের সময় জয়মল ও পন্ত জীবনদান করিয়া যে বশ ক্রয় করিয়াছেন, পুনরায় চিতোর অধিকার করিয়া আপনারাও কি সেই বশ ক্রয় করিতে অভিলাষ করেন?”

তাহারা উত্তর করিলেন, “সাধন জগদীশ্বরের হস্তে, চেষ্টার বোদ্ধাগণের ক্রটি হইবে না।”

পরে কোটারির চোহানকুলেশ্বরকে সন্ধান করিয়া মহারাণা কহিলেন, “পিতা যখন হত্যাকারক রণবীরের কল্লকবল হইতে গোপনে আনীত হইয়া এই কমলমীরে গোপনে বাস করিতেছিলেন, যখন পিতাকে সকলে সন্দেহ করিয়াছিলেন, চোহানকুলেশ্বরই তাহার সহিত আহার করিয়া সন্দেহভঞ্জন করেন। চোহানকুল সে আমিধর্ম এখনও বিস্মৃত হন নাই।”

চোহান। চোহানকুল আমিধর্ম কখনও বিস্মৃত হয় না।

প্রতাপ। বিজলীপতি! আপনার পিতাই পিতার সেই দুরবস্থার তাঁহাকে কষ্টদান করিয়াছেন। মাতুল! আপনি প্রতাপের প্রতি ষড় ভুলিবেন না, এই আসন্ন যুদ্ধে প্রতাপের নাম ও প্রতাপের গৌরবরক্ষা করিবেন।

উল্লাসে বিজলীপতি বলিলেন, “সে

গৌরবরক্ষার্থ প্রমত্তকুল সানন্দে জীবনদান করিবে।”

পরে দৈলওয়ারার স্বাধীশ্বরের দিকে চাহিয়া মহারাণা কহিলেন, “ঝালাকুল মেওয়ারের শুভস্বরূপ, আসন্ন বিপদে তাঁহারাই আমাদিগের প্রহরিস্বরূপ।”

দৈলওয়ারাপতি উত্তর করিলেন, “ঝালা আমিধর্ম জানে, যুদ্ধকালে মহারাণার পার্শ্ব-ত্যাগ করে না।”

এইরূপে সকল বোদ্ধার সহিত ক্ষণেক কথোপকথন হইলে পর মহারাণা কহিলেন, “বীরগণ! আপনাদিগকে আহ্বান করিবার কারণ আপনাদিগের নিকটে অজ্ঞাত নাই। সমগ্র ভারতক্ষেত্রে সৈন্তবল মেঘরাশির স্তায় একত্রিত হইতেছে, বর্ষাকালের প্রারম্ভেই মেওয়ারভূমির উপর আসিয়া পড়িবে। শত্রুগণ আমাদিগকেও সূক্ষ্ম দেখিবে না। তাহার। মেওয়ারের উর্বরা-ক্ষেত্র জঙ্গলময় দেখিবে; মেওয়ারের পর্বত-বেষ্টিত প্রদেশে তাহাদিগের প্রবেশ নাই।

ঝালা রাওয়ের বংশ কি বিদেশীয়দিগের নিকট শির নত করিবে? সমরসিংহ ও সংগ্রামসিংহের সন্তানগণ কি তুর্কীর দাস হইবে? তাহা অপেক্ষা জগৎ হইতে শিশোদীয়কুল একবারে বিলুপ্ত হউক, সুন্দর মেওয়ার-দেশের পর্বত ও উপত্যকা সাগরজলে মগ্ন হউক।

প্রতাপসিংহ মাতুলের উজ্জল করিবে, প্রতাপসিংহ তুর্কীদিগের সহিত যুদ্ধিবে, পূর্ব-পুরুষদিগের বাহবল এ বাহতে আছে কি না, দেখিবে। বোদ্ধাগণ! আমরা কন্দরে ও পর্বতগুহার বাস করিব, ঝালা রাওয়ের কুল স্বাধীন রাখিব, সমরসিংহ ও সংগ্রামসিংহের সন্ততিগণ দাসত্ব জানে না, কখনও জানিবে না।

উৎসবের দিন অল্প শেষ হইল, আমা-
দিগের কার্যের দিবস উদয় হইতেছে ।
বোকাগণ! পে কার্যো ব্রতী হও, দৃঢ়হস্তে
অসি ধারণ কর, এখনও মানসিংহ ও আকবর
শাহ দেখিবেন, মেওয়ারের রাজপুত-গৌরব
বিনশ্ত হয় নাই ।”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

—০—

মানসিংহ ।

যেনাত্তাদিতেন চন্দ্রমিতকাস্তিঃ রবৌ তন্তু তে ।
ব্রজ্যতে প্রতিকর্ষ্মেব ন পুনন্তুৈব পাদগ্রহঃ ॥

কাব্যপ্রকাশ ।

পূর্বোক্ত ঘটনার পর দুই তিন মাস
অতিবাহিত হইল। এই কয়েক মাস
প্রতাপসিংহ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি
যে পর্তত-বেষ্টিত প্রদেপথও রক্ষা করিবার
মানস করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে প্রত্যেক
দুর্গ, প্রত্যেক উপত্যকা, প্রত্যেক পর্ততকন্দের
বার বার দর্শন করিলেন। দুর্গে খাণ্ড সঞ্চয়
করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন, সৈন্তগণকে ও
সমস্ত মেওয়ারবাসিগণকে উৎসাহিত করি-
লেন। দুর্গেখরগণ সসৈন্তে রাণার সহিত
যোগ দিলেন। ভূমিমাগণ সমুখ-রণ জানে
না, কিন্তু নিজ নিজ ভূমিরক্ষার্থ প্রাণ দিতে
প্রস্তুত হইল। মেওয়ারের অসভ্য জাতিগণও
মহারাণার উৎসাহে উৎসাহিত হইল;
দক্ষিণে ভীলগণ, পূর্বে মৌরগণ, পশ্চিমে মৌনা-
গণ বহুর্ভাগহস্তে আসিয়া রাজপুত বোকা-
দিগের সহিত যোগ দিল। সমস্ত প্রদেশ
রণরঙ্গে উন্নত হইল।

সর্বদাই মহারাণা অল্পসংখ্যক সৈন্ত
লইয়া পর্ততপ্রবেশ হইতে নির্গত হইতেন।

দেখিতেন, তাঁহার আদেশ অনুসারে মেও-
রারের সমভূমি ও উদ্যানস্থল এক্ষণে জনশূন্য
ও অরণ্যময়। লোকালয়ে হিংস্রক জীব বাস
করিতেছে, শত্রুক্ষেত্র অরণ্য হইয়াছে, বুনাস
ও রবীনদীর উপকূলে মহুয্যাকৃতি দৃষ্ট হয় না,
মহুয্যাব জ্ঞাত হয় না। প্রতাপের সৈন্ত
দেখিয়া অরণ্যবিচারী পক্ষী কুলার ছাড়িয়া
উচ্চশব্দে আকাশের দিকে উড়ান হইল,
অরণ্যবাসী জন্তগণ দূরে নিবিড় অরণ্যের
মধ্যে পলাইল। যতদূর দৃষ্টি হয়, যেন দৈব-
সম্পাতে এই মহুয্যের আবাসস্থল নির্জন
হইয়া গিয়াছে। কটকময় বাবুলবৃক্ষে ও
জঙ্গলে এই বিস্তীর্ণ জনপদ আচ্ছাদিত হই-
য়াছে। নিঃশব্দে এই বনবিচরণ করিয়া
প্রতাপসিংহ প্রত্যাবর্তন করিতেন; বলিতেন,
“সমগ্র মেওয়ারদেশ এইরূপ নির্জন অরণ্য-
ভূমি হউক, কিন্তু সে পবিত্রভূমি তুর্কীপদ-
বিক্ষেপে যেন কলঙ্কিত না হয়।”

রাণা সমস্ত দিন যুদ্ধের আয়োজনে অতি-
বাহিত করিয়া সন্ধ্যার সময় আপন পর্তত-
কন্দের প্রত্যাবর্তন করিতেন। দেখিতেন,
পাটেশ্বরী স্বহস্তে অগ্নি জালিয়া রন্ধন করি-
তেছেন, পুত্রগণ চারিদিকে হীনপরিচ্ছদে
ক্রীড়া করিতেছে। রাণা রণ-পরিচ্ছদ ত্যাগ
করিতে করিতে স্নেহে কহিতেন, “জগদী-
শ্বর! যেন অমরসিংহ ও অমরসিংহের মাতা
চিরকাল এই পর্ততকন্দের বাস করে, কিন্তু
তুর্কীর করপ্রদ হইয়া প্রাসাদে বাস না করে।”

এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত
হইল। অবশেষে সম্রাট আকবরের পুত্র যুং-
রাজ সলীম মানসিংহের সহিত অসংখ্য সৈন্ত
লইয়া মেওয়ার আক্রমণ করিতে আসিলেন।
সাগরতীরের দ্বার অসংখ্য সেনা মেওয়ারের
বহির্ভাগ অধিকার করিল, সতর্ক প্রতাপসিংহ
কোন প্রতিরোধ করিলেন না। ক্রমে

মোগলসৈন্ত সুসজ্জিত পর্বতপ্রদেশের নিকট আসিল; দেখিল, সে দুর্গম প্রদেশের দ্বার রুদ্ধ। সেই দ্বার, সেই একমাত্র প্রবেশস্থল— হলুদীবাঁটা। দাবিন্দ্র সহস্র রাজপুত সেই দ্বারের গ্রহরী। মানসিংহ চিন্তাকুল হইয়া নিকটে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন, সমগ্র মোগলসৈন্ত যুদ্ধার্থে একীভূত ও প্রস্তুত হইল।

পাঠক! যুদ্ধের প্রাকালে চল, আমরা একবার মোগল-শিবিরে প্রবেশ করি। যে মহাবীর অধরাধিপতি দিল্লীর দাসত্ব স্বীকার করিয়া দিল্লীর বিজয়-পতাকা বন্ধদেশ হইতে কাবুল পর্য্যন্ত উড্ডীন করিয়াছিলেন, সেই বীরাগ্রগণ্য মহারাজ মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করি। হায়! হায়! জাতিবিরোধের ভ্রাতা আর বিরোধ নাই। জাতিবিরোধের জন্ত অস্ত্র রাজপুতকুলতিলক মানসিংহ রাজপুতকুলতিলক প্রতাপসিংহের ভীষণ শত্রু।

রজনীতে বহুসংখ্যক মোগলশিবির সন্নিবেশিত হইয়াছে, শিবিরের আলোকে সেই অন্ধকারময় পর্বতপ্রদেশ উদ্ভীষ্ট হইয়াছে, স্থানে স্থানে সৈন্তগণ একত্র হইয়া কলরব করিতেছে। মেওয়ারীদিগের বেক্রপ প্রতিজ্ঞা, অবশ্যই ভীষণ যুদ্ধ হইবে, সে যুদ্ধ হইতে করজবন পুনরায় দূর-দিল্লীপ্রদেশে প্রত্যাবর্তন করিবে?

এই শিবিরশ্রেণীর মধ্যে রক্তবস্ত্র-মণ্ডিত অসংখ্য দীপ ও পতাকা-বিভূষিত যুবরাজের শিবির দৃষ্ট হইতেছে। প্রশস্ত শিবিরের মধ্যে যুবরাজ সলীম প্রকল্পচিন্তে গীত শুনিতেছেন। সম্মুখে সুরাপাত্র, নিকটে কলকণ্ঠী প্রৌঢ়-যৌবনা করেকজন গায়িকা। যুবরাজের অব্যব দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ, ললাট প্রশস্ত ও সূন্দর। কল্য যুদ্ধ হইবে, কিন্তু অস্ত্র সেই প্রশস্ত ললাট

চিন্তাশূন্য, সেই সুন্দর আনন নিরুদ্বেগ ও হান্তরঞ্জিত।

শিবির হইতে এখনও আনন্দের শব্দ উদ্ভিত হইতেছে, একপ সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, “জাহাপনা, রাজা মানসিংহ আসিয়াছেন। বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।”

যুবরাজ বুঝিলেন, রাজা যুদ্ধ-পরামর্শ করিতে আসিয়াছেন। গীত কান্ত হইল, যুবরাজ সকলকে বিদায় দিলেন। কণেক পর বীরশ্রেষ্ঠ অধরাধিপতি মানসিংহ শিবির-প্রবেশ করিয়া যুবরাজকে তসলীম করিলেন। সহান্ত্রবদনে সলীম তাঁহাকে আহ্বান পূর্বক দ্বার রুদ্ধ করিয়া ছই জনে নিঃশব্দে উপবেশন করিলেন।

মানসিংহ ও সলীম উভয়েই যুবক, উভয়েই সাহসী বোদ্ধা, উভয়েই যৌবনোচিত উৎসাহে উৎসাহী। কিন্তু সলীম সম্রাট-পুত্র, সূতরাং সুখপ্রিয় ও বিলাসী, তাঁহার ন্যায় বিলাসী কখনও দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। তাঁহার স্বভাব সরল ও উদার, যৌবনেই কার্যপ্রিয়তা অপেক্ষা সুখপ্রিয়তা প্রবল হইয়াছিল। পরে এই সুখপ্রিয়তা একরূপ প্রবল হয় যে, হুজুঁহান ঐ রাজ্য শাসন করেন, দিল্লীর জাহাজীর বন্ধু ও অমাত্য, রমণী ও মদিরা লইয়া কালব্যাপন করিতেন। মানসিংহ অসাধারণ ধীসম্পন্ন, অসাধারণ স্থির-প্রতিজ্ঞ ও কার্যপটু, অসাধারণ বোদ্ধা। দিল্লী হইতে নির্গত হইয়া অবধি মানসিংহ সমস্ত কার্য সম্পাদন করিতেন, সলীম মানসিংহের উপরেই নির্ভর করিতেন।

সলীম কহিলেন, “রাজন! শত্রুদিগের রণসজ্জা আপনি দেখিয়াছেন। কবে যুদ্ধ শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন?”

মানসিংহ। এ দাস কল্যই যুদ্ধসাল

উচ্চিৎ বিবেচনা করে। বর্ষাকালের বিলম্ব নাই, বত শীত দিল্লীধরের কার্য সমাধা হয়, ততই ভাল।

সলীম। আমারও সেই মত। দিল্লীধরের সেনার সম্মুখে এ পর্য্যন্ত যেওয়ারীগণ দণ্ডায়মান হইতে পারে নাই, কল্যাণ পারিবে না।

মানসিংহ। তাহার সম্বন্ধ নাই। তথাপি আজ্ঞা দিলে ইহাও নিবেদন করিবে, কল্যাণ প্রকৃত যুদ্ধ হইবে। এত দিন আমরা যে ভয় সহ করিয়াছি, কল্যাণের কার্যের সহিত ভুলনা করিলে যে কেবল বালাক্রীড়া মাত্র।

সলীম। প্রকৃত যুদ্ধ তৈমুরলঙ্গবংশীয়-দিগের রক্তক্ষয়, কিন্তু কতক্ষণ সে যুদ্ধ স্থায়ী? যুগ ও ব্যাঘ্রে কতক্ষণ যুদ্ধ সম্ভবে? পিতার সেনার সম্মুখে ভীরু প্রতাপ দূরে পলাইবে।

মানসিংহ। আপনার পিতার সেনার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে, এরূপ সেনা ভারত-ক্ষেত্রে নাই, তথাপি প্রতাপসিংহ সহসা পলাইবে না, এ দাস তাহাকে জানে—

সলীম। মানসিংহ! আপনি আরও কি বলিতেছিলেন, সহসা থামিলেন কেন? এই প্রতাপের সাহসের কথা আমিও শুনিয়াছি। তাহা ভিন্ন আর কি অবগত আছেন?

মানসিংহ। প্রতাপসিংহের সহিত পূর্বে একবার এ দাসের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেই ভক্তই বিশেষ করিয়া তাহাকে জানি।

সলীম। কি জানেন?

মানসিংহ। প্রতাপ ঘোর বিদ্রোহী, দিল্লীধরের বিরুদ্ধাচারী, কল্যাণ ভীষণ যুদ্ধ হইবে, কেবল এই কথা দাস নিবেদন করিতে আসিয়াছিল।

সলীম। সে কথা আমিও অবগত আছি,

আপনার কি আর কিছু বক্তব্য নাই? মানসিংহ! দিল্লী ত্যাগ করিয়া অবধি আপনি আমার নিকট হইতে বরূপ হইয়া রহিয়াছেন। আপনার উপর সকল কার্যের নির্ভর করিয়াছি, আপনার নিকট সকল কথা বক্ত করিয়াছি, আপনি কি আমার নিকট হইতে কোন পরামর্শ গোপন করিতে ইচ্ছা করেন?

মানসিংহ। প্রভুর নিকট কোন পরামর্শ এ দাস গোপন করে নাই; কেবল প্রতাপের নিকট আমার একটি ঋণ আছে, সেই কথা স্মরণ হওয়ার আমার সহসা বাক্য-রোধ হইয়াছিল।

সলীম। প্রতাপও হিন্দু, আপনিও হিন্দু, ঋণ ও সৌহৃদ্য থাকি সম্ভব। আপনি যদি সুস্থ-দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক হন, দূরে থাকিবেন, সলীম একাকী যুদ্ধদান করিবে, দেখিবে, প্রতাপ বাহুতে কত বল ধারণ করে।

মানসিংহের নয়ন অগ্নিবৎ প্রজ্জ্বলিত হইল। তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন, “প্রতাপের নিকট যে ঋণ আছে, তাহা তাহার স্বপ্নের শোণিতে পরিশোধ হইবে। আপনার নিকট গোপন করিবার আমার কিছুই নাই, পূর্বের অবমাননাকথাও গোপন করিব না। আপনার পিতার নিকট কহিয়াছি, আপনাকেও কহিব, শ্রবণ করুন।

যখন শোলাপুর হইতে আমি হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলাম, আমি মহারাণা প্রতাপসিংহের সাক্ষাৎ অভিলাষে মেওয়ারে আসিয়াছিলাম। মেওয়ারের রাণা সুর্য্যবংশীর এবং রাজপুতকুলের মধ্যে অগ্রগণ্য, সুতরাং রাজস্থানের সকল রাজার পূজনীয়। প্রতাপসিংহ সম্রাতি রাণা হইয়াছেন, এই ভক্ত আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম।

চিতোরক্ষেত্রের পর উদয়সিংহ উদয়পুরে

রাজধানী করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতাপ পিতার প্রাসাদ জ্যাগ করিয়া কমলমীরের পক্ষতর্পণে থাকেন। আমার আগমনবাক্তা শুনিয়া আমাকে অস্থান করিবার জন্ত তিনি কমলমীর হইতে উদয়সাগর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন।

উদয়সাগরের কূলে মহাসমারোহে ভোজনাদি প্রস্তুত হইল। আমি ভোজনে বসিলাম, কিন্তু রাণা দেখা দিলেন না। প্রতাপের পুত্র অমরসিংহ বলিলেন যে, তাঁহার পিতার শিরে বেদনা হইয়াছে, তিনি সেই হেতু আসিতে না পারিয়া আতিথেয় করিবার জন্ত সন্তানকে প্রেরণ করিয়াছেন, সে জন্ত আমি যেন দোষ গ্রহণ না করিয়া ভোজন আরম্ভ করি।

মানসিংহ জগৎ দেখিয়াছে, মানবচিহ্ন পাঠ করিয়াছে, এ শিরোবেদনার কারণ বুঝিল। দিল্লীশ্বরের সহিত কুটুম্বিতা করিয়াছি বলিয়া গর্হিত বিদ্রোহী প্রতাপসিংহ আমার আতিথেয় করিতে অস্বীকার করিলেন।” মানসিংহের স্বর ক্রোধে রুদ্ধ হইল।

সলীম। তাহার পর ?

মানসিংহ ক্রুদ্ধস্বরে কহিতে লাগিলেন, “আমি অমরকে বলিলাম, ‘রাণাকে জানাইবেন, আমি শিরোবেদনার কারণ অবগত আছি, বাহা হইয়াছে, তাহা খণ্ডাইবার উপায় নাই; সেজন্ত মহারাণা যদি আমার সম্মুখে পাত্র না দেন, কেঁ দিবেন?’

প্রতাপসিংহ আমার সে ভদ্র অভ্যর্থনার যে অভদ্র উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা মানসিংহ জীবনে ভুলিবে না; অথবা কল্য রণস্থলে ভুলিবে।

প্রতাপ বলিয়া পাঠাইলেন, ‘তুর্কীকে যিনি রাজপুত-ভগিনী সম্প্রদান করিয়াছেন,

সম্ভবতঃ তুর্কীর সহিত বাহার আহার হয়, তাঁহার সহিত রাণা খাইতে পারেন না।’

এই উত্তর পাইয়া আমি অস্পৃহ অন্ন রাখিয়া উঠিলাম; কেবল কয়েকটি দানা অন্নদেবের নাম করিয়া উকীষে রাখিলাম। সেই দিন পণ করিলাম, যদি সেই গর্হিতের গর্ভ নাশ না করি, আমার নাম মানসিংহ নহে। সেই অবমাননা-স্বপ্ন কল্য প্রতাপের হৃদয়ের শোণিতে পরিশোধ করিব।”

মানসিংহের সমস্ত শরীর কম্পিত হইতেছিল, নয়ন হইতে যেন জলন্ত অগ্নি বহির্ভূত হইতেছিল। সলীমও অবচলিত ছিলেন না, সরোষে বলিলেন, “বীরপ্রবর! আপনার যে অবমাননা করিয়াছে, সে আমাদের তদধিক অবমাননা করিয়াছে, সলীম তাহার প্রতিশোধ দিতে সক্ষম। আমাদের একই অবমাননা, একই পরিশোধ। কল্য একত্রে সেই অবমাননার পরিশোধ দিব, অজ্ঞ ব্যস্ত হইবেন না।”

সলীমের এই প্রতিজ্ঞার মানসিংহের হৃদয়ের জ্বালা কিঞ্চিৎ শান্ত হইল। চক্ষুতে এক বিন্দু জল আসিল, সলীমকে নিঃশব্দে আলিঙ্গন করিয়া নিঃশব্দে শিবির হইতে বহির্গত হইলেন।

সে রজনীতে যুবরাজের শিবিরে আর গীত বা বাস্তবধ্বনি বা আনন্দরব শুনা গেল না। প্রভাত হইতে না হইতেই অস্ত বাস্তব হইল, অস্ত রবে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

—*—

হলদীঘাটীর যুদ্ধ ।

স যোযঃ * *

নভঃ পৃথিবীকৈব তুমুলো হস্তনাদয়ন ।

ভগবদঙ্গীতা ।

তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল । একদিকে অসহ অবমাননার প্রতিশোধ-বাঞ্ছা, অপরদিকে শিশোদীয়কুলের চিরস্বাধীনতা-রক্ষার স্থির-প্রতিজ্ঞা । একদিকে মোগল ও অসহের অসংখ্য ও সুশিক্ষিত সৈন্য, অপরদিকে মেওয়ারের অতুল ও অপরিসীম বীরত্ব ।

হলদীঘাটীর উপত্যকার ও উভয়-পার্শ্বের পর্বতের উপর দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত সজ্জিত রহিয়াছে, দলে দলে যোদ্ধাগণ আপন আপন কুলাধিপতির চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া অপূর্ব রণ দিতেছে ; কখনও বা দূর হইতে তীর বা বর্শা নিক্ষেপ করিতেছে, কখনও বা কুলাধিপতির ইচ্ছিতে বর্ষাকালের তরঙ্গের ন্যায় দুর্দমনীয় তেজে শত্রু সৈন্যের মধ্যে পড়িয়া ছারখার করিতেছে ।

পর্বত-শিখরের উপর অসভ্য-জাতিগণ ধ্বংসগহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বর্ষার বৃষ্টির ন্যায় তীর নিক্ষেপ করিতেছে অথবা সুবিধা পাইলেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড শত্রুসৈন্যের উপর গড়াইয়া দিতেছে ।

অন্ত তুমুল উৎসবের দিন, সে উৎসবে কেহ পরামুখ হইল না । চোহান ও রাঠোর, ঝালা, চন্দাওর ও গাওর, সকল কুলের যোদ্ধাগণ ভীষণভাবে শত্রুর উপর পড়িতে লাগিল । একদল হত হয়, অন্য দল অগ্রসর হয় ; অসংখ্য সৈন্যের শবরাশির উপর দিয়া অসংখ্য সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল ।

কিন্তু দিল্লীর অসংখ্য সৈন্যের বিরুদ্ধে এ বীরত্ব কি করিবে ? দিল্লীর ভীষণ কামান-শ্রেণী হইতে ঘন ঘন মৃত্যুর আদেশ বহির্গত হইতে লাগিল, দলে দলে রাজপুতগণ আসিয়া জীবনদান করিল ।

এই বিঘোর উৎসবে প্রতাপসিংহ পশ্চাতে ছিলেন না । যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে অধরাধিপতির দিকে তিনি দ্বাবমান হইলেন, কিন্তু দিল্লীর অসংখ্য সৈন্য ভেদ করিয়া তথায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না ।

তৎপরে প্রতাপসিংহ সলীম যথায় হস্তী আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই দিকে নিজ অশ্ব ধাবমান করিলেন । এবার ভীষণভাবে রাজপুতগণ মোগলসৈন্য বিদীর্ণ করিয়া অগ্রসর হইল । স্তরে স্তরে মোগলসৈন্য সজ্জিত ছিল, কিন্তু বর্ষাকালের পর্বততরঙ্গের ন্যায় সমস্ত প্রতিবন্ধক ভেদ করিয়া প্রতাপসিংহ ও তাঁহার সৈন্যগণ অগ্রসর হইলেন, বর্শা ও অশ্বির আঘাতে মোগলদিগের সৈন্যরেখা লণ্ডভণ্ড করিয়া অগ্রসর হইলেন । সলীম ও প্রতাপসিংহ সম্মুখীন হইলেন ।

দুই পক্ষের প্রসিদ্ধ যোদ্ধাগণ নিজ নিজ প্রভুর রক্ষার্থে অগ্রসর হইলেন । অচিরে যে তুমুল হত্যাকাণ্ড, যে গগনভেদী জরনাদ ও আর্ত্তনাদ আরম্ভ হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না । রাজপুত ও মোগলদিগের বিভিন্নতা রহিল না, শত্রু ও मित्रের বিভিন্নতা রহিল না । দুই পক্ষের পতাকাই চারিদিকে শব রাসীকৃত হইল ।

প্রতাপের অব্যর্থ খড়্গাঘাতে সলীমের রক্তকগণ ভূতলশায়ী হইল । তখন প্রতাপ সলীমকে লক্ষ্য করিয়া দীর্ঘ বর্শা নিক্ষেপ করিলেন, হাওয়ার লোহে সেই বর্শা প্রতিবন্ধ হওয়ার সলীম সে দিন জীবনরক্ষা পাইলেন না ।

রোবে তর্কন করিয়া প্রতাপ অথ বাবমান
করাইলেন, অথবর চৈতক ও প্রতাপের যোগ্য
লক্ষ দিয়া হস্তীর শরীরের উপর সমুখ-পদ
স্থাপন করিল। প্রতাপের অব্যর্থ আঘাতে
হস্তীর মাহত হত হইল। হস্তী তখন প্রভুর
বিপদ্ আনিয়াই যেন সলীমকে লইয়া পলায়ন
করিল। তুমুল শব্দে দুর্দমনীর প্রতাপসিংহ
ও তাঁহার সক্তিগণ পশ্চাদ্ভাবন করিলেন।
মোগলসৈন্যের শ্রেণী বিদীর্ণ করিয়া ভিতরে
প্রবেশ করিলেন। প্রতাপসিংহের সে
অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়া হিন্দুগণ অর্জুনের
কথা স্মরণ করিল, মুসলমানগণ মুহুর্তের
জন্ত মনে মনে প্রমাদ গণিল।

তখন মুসলমানগণ নিজের বিপদ্ দেখিয়া
ক্লিষ্টপ্রায় হইল। মুসলমান-যোদ্ধাগণ ভীক
নহে, পঞ্চশতবৎসর ভারতবর্ষ শাসন করি-
রাছে, অত্ হিন্দুর নিকট অবমাননা স্বীকার
করিবে না। একবার “আল্লাহ আক্বর”
শব্দে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিয়া
প্রতাপকে চারিদিকে বেঠেন করিল। রাজ-
পুতগণ পলায়ন জানে না, প্রভুর চারিদিকে
হত হইতে লাগিল। শরীরের সপ্তস্থানে
আহত হইয়াও প্রতাপ বিপদ্ জানেন না,
তখনও অগ্রসর হইতেছেন।

পশ্চাৎ হইতে কয়েকজন রাজপুত-যোদ্ধা
মহারাজার বিপদ্ দেখিলেন এবং হস্তাশ্ব
করিয়া শিশোদীরের পাতাকা লইয়া অগ্রসর
হইলেন। পাতাকা দেখিয়া সৈন্যগণ অগ্রসর
হইল, প্রতাপ যে স্থানে বৃদ্ধ করিতেছিলেন,
তথায় বাইরা উপস্থিত হইল, সবলে প্রভুকে
সেই নিশ্চয়মৃত্যু হইতে সরাইয়া আনিল।
সে উত্তমে শত রাজপুত প্রাণদান করিল।

পুনরায় প্রতাপসিংহ বৃদ্ধমদে সংজ্ঞা
হারািয়া যোগলরেখার ভিতর প্রবেশ করি-
লেন। পুনরায় তাঁহার রাজচ্ছত্র শত্রুবেষ্টিত

দেখিয়া রাজপুতগণ পশ্চাৎ হইতে অগ্রসর
হইয়া সমরোন্মত্ত বীরকে নিশ্চয়-মৃত্যুর কবল
হইতে সবলে উদ্ধার করিয়া আনিল।

কিন্তু প্রতাপসিংহ অত্ ক্লিষ্ট—উন্মত্ত !
জ্ঞানশূন্য হইয়া তৃতীয়বার যোগলসৈন্য-
রেখার ভিতর প্রবেশ করিলেন। এবার
যোগলগণ ক্লিষ্টপ্রায় হইল, রোবে হস্তাশ্ব
করিয়া শত শত সেনা প্রতাপকে বেঠেন
করিল, প্রতাপের বহির্গমনের পথ রাখিল
না। এবার যোগলগণ এই কাকের বীরকে
হত করিয়া দিল্লীধরের হৃদয়ের কটকোদ্ধার
করিবে, মানসিংহের অবমাননার প্রতিশোধ
দিবে।

পশ্চাতে রাজপুতগণ মহারাজার বিপদ্
দেখিয়া বার বার তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা
করিল। কিন্তু যোগল-সৈন্য অসংখ্য, রাজ-
পুতদিগের প্রধান প্রধান বীর হত হইয়াছে,
রাজপুতগণ হীববল হইয়াছে, এবার প্রভুর
উদ্ধার অসম্ভব।

বার বার দলে দলে রাজপুতগণ প্রভুর
উদ্ধার-চেষ্টা করিল, দলে দলে কেবল অসংখ্য
শত্রু বিনাশ করিয়া আপনারা বিনষ্ট হইল,
যোগলরেখা অতিক্রম করিতে পারিল না,
এবার প্রভুর উদ্ধার করিতে পারিল না।

দূর হইতে দৈলওয়ারার অধিপতি এই
ব্যাপার দেখিলেন। মুহুর্তের জন্য ইষ্টদেবতা
স্মরণ করিলেন, পরে আপনায় খালাবংশীর
যোদ্ধা লইয়া সমুখে বাবমান হইলেন।
মেওয়ারের কেতন সুবর্ণহর্য্য একজন সৈনি-
কের হস্ত হইতে আপনি লইলেন এবং মহা-
কোলাহলে সেই কেতন লইয়া কালাকুলের
সহিত অগ্রসর হইলেন।

সে তেজ যোগলগণ প্রতিরোধ করিতে
পারিল না, বীর দৈলওয়ারাপতি শত্রুরেখা
বিদীর্ণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে খালাকুল,

বধায় প্রতাপ উন্নত রণকৃষ্ণের স্থায় যুদ্ধ করিতেছিলেন, তথায় উল্লাসরবে উপস্থিত হইল । সবলে প্রভুকে রক্ষা করিলেন, প্রতাপকে সেই শত্রুের্থা হইতে উদ্ধার করিয়া আনিলেন ও সেই উত্তমে সমুৎকরণে আপনায় প্রাণদান করিলেন ।

পতনশীল দেহের দিকে চাহিয়া মহাত্মভব প্রতাপ বলিলেন, “দৈলওয়ারা ! অত আপনায় জীবন দিয়া আমার জীবনরক্ষা করি-
রাছ ।” দৈলওয়ারা ক্রীণবরে উত্তর করিলেন,
“ঝালা স্বামীধর্ম জানে ; বিপদকালে মহা-
রাণার পার্শ্বতাগ করে না ।”

প্রতাপসিংহ স্মরণ করিলেন, ফাস্তন-
মাসের শেষদিন রজনীতে দৈলওয়ারাপতি
এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন । দৈলওয়ারা-
পতির জীবনশ্রুত দেহ ভূতলে পড়িল ।

ষাণ্মাসে সহস্র রাজপুত-যোদ্ধার মধ্যে
চতুর্দশ সহস্র সেদিন ভূতলশায়ী হইল, অব-
শিষ্ট আট সহস্রমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে ত্যাগ করিল ।
প্রতাপসিংহ অগত্যা হলদীঘাটায় যুদ্ধক্ষেত্রে
ত্যাগ করিলেন । যোগলগণ জয়লাভ করিল ;
কিন্তু সে যুদ্ধকথা সহসা বিস্মৃত হইল না । বহু
বৎসর পরে দিল্লীতে, দাক্ষিণাত্যে বা বঙ্গদেশে
প্রাচীন যোগলযোদ্ধাগণ যুবক সেনাদিগের
নিকট হলদীঘাটা ও প্রতাপসিংহের বিস্ময়কর
গল্প বলিয়া রজনী অতিবাহিত করিত ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

ভ্রাতৃত্ব ।

দিল্লির কুলচন্দ্র চন্দ্রসেতো সরভসমেহি পরিষদেখ ।

ভূহিনশকলশীতলৈত্তবাতৈঃ শব্দুপবাতু মহাপি

চিন্তাহঃ ।

উত্তরচরিত্রঃ ।

যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে প্রতাপ পলায়ন করি-
লেন, কিন্তু তখনও তাঁহার বিপদশাস্তি হয়

নাই ; দুইজন যোগল, একজন খোয়াসানী,
অপরজন মুলতানী, তাঁহার পশ্চাদ্ভাবন
করিতেছিলেন । প্রতাপের তেজস্বী অশ্ব চৈতক
লক্ষ দিয়া একটি পুরুতনদী পার হইয়া গেল,
যোগলগণের সেই নদী পার হইতে বিলম্ব
হইল । কিন্তু চৈতক আহত, প্রতাপও
আহত । পশ্চাদ্ভাবক সন্নিকটে আসিতেছে,
তাহাদিগের অশ্বের পদশব্দ সেই পুরুত-
রাশিতে শব্দিত হইতেছে, প্রতাপ স্তম্ভিতে
পাইলেন । এবার রক্ষা নাই জানিলেন, কিন্তু
বীরের স্থায় মরবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন ।

সহসা পশ্চাৎ হইতে স্বর শুনিলেন, “হো
নীলা ঘোড়ারা আসোয়ারা !” পশ্চাতে
চাহিয়া দেখিলেন, কেবল একজন অশ্ব-
রোহী । সেই অশ্বরোহী তাঁহার বিবম শত্রু
ও সহোদর ভ্রাতা শত্রু !”

রোষে প্রতাপসিংহ কহিলেন, “সংগ্রাম-
সিংহের পৌত্র হইয়া যোগলদের দাস হইয়াছ,
ইহাতেও যথেষ্ট কলঙ্ক হয় নাই ; এক্ষণে
ভ্রাতাকে বধ করিতে পশ্চাদ্ভাবন করিয়াছ ?
কুলকলঙ্ক ! প্রতাপসিংহ অত সংগ্রামসিংহের
বংশ নিষ্কলঙ্ক করিবে ।” শত্রু প্রতাপের
কথায় ভীত হইলেন না, ক্রুত হইলেন না,
ধীরে ধীরে প্রতাপের নিকট আসিয়া
বলিলেন, “ভ্রাতঃ ! একদিন তোমার প্রাণ-
নাশে ইচ্ছক হইয়াছিলাম, কিন্তু অত সে
ইচ্ছা তিরোহিত হইয়াছে । অত তোমার
বীরত্ব দেখিয়া মোহিত হইয়াছি, পুরুদোষ
ক্ষমা কর, ভ্রাতাকে আলিঙ্গনদান কর ।”

প্রতাপসিংহ দেখিলেন, শত্রুর নরনে
জল । বহুদিনের বৈরভাব দূরে গেল, ভ্রাতৃ-
স্নেহে উভয়ের হৃদয় উথলিল, উভয়ে উভয়কে
সম্মুখে আলিঙ্গন করিলেন ।

প্রতাপের মহত্ব ও প্রতাপের বীরত্ব
দেখিয়া অন্য শত্রুর বৈরভাব তিরোহিত

হইয়াছে, বহু বৎসরের ভ্রাতৃবিরোধ তিরো-
হিত হইয়াছে। ভ্রাতার নিকট ভ্রাতা কমা
বাঝা করিতেছে, প্রতাপ কি সেই স্নেহমানে
বিরত হইবেন? প্রতাপ পূর্বদোষ বিস্মৃত
হইলেন, সাক্ষনরনে হৃদয়ের ভ্রাতাকে হৃদয়ে
ধারণ করিলেন।

যে দুই জন যোগল প্রতাপের পশ্চা-
দ্বান করিয়াছিল, তাহারা কোথায়? শক্ত
দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিয়াছিলেন,
ভ্রাতার প্রশ্রয়প্রদানের সন্ধান দেখিয়া অব্যর্থ
বর্ষায় সে যোগলদিগের প্রশ্রয়প্রদান করিয়া-
ছেন।

সজ্জার চায়া সেই নির্জন উপত্যকার
অবতীর্ণ হইতে লাগিল, পর্বতের উপর
আরোহণ করিতে লাগিল, জগৎকে ব্যাপ্ত
করিতে লাগিল। সেই নির্জন নিঃশব্দ উপ-
ত্যকার দুই ভ্রাতা অনেক দিনের অপহৃত
ভ্রাতৃস্নেহ পাইলেন, অনেক দিনের হারাধন
পাইলেন। স্নেহ হৃদয়ে লীন হয়, একেবারে
গুহু হয় না, সেই লীন স্নেহধারা অল্প বীর-
ষয়ের হৃদয়কে প্রাবিত করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর প্রতাপসিংহ কহিলেন,
“ভাই শক্ত! আজি প্রতাপের পরাজয়ের দিন
নহে, আজি বিজয়ের দিন; আজি যে অপহৃত
ধন ফিরিয়া পাইলাম, যুদ্ধের পরাজয় তাহার
নিকট কি তুচ্ছ! ভাই! যেন আমরা পূর্বের
বিষেয় চিরকাল বিস্মৃত হই, যেন আমাদের
চিরকাল এইরূপ স্নেহ থাকে। ভাইয়ে
ভাইয়ে মিলিত হইয়া স্নেহের রক্ষা করিব,
বিরোধীয় শত্রুকে ভয় করিব না, দিল্লীর
মানসিংহকে ভয় করিব না।”

নবম পরিচ্ছেদ।

—

নাহারী মগরো।

অন্তর্ধে ব্যতরণে বুদ্ধবচনাৎ সংপীডা শিতীকৃত্তো,
বদ্যদ্বীকৃত্তশল্যাবৎ পরিদহনং স্তূপাশ্চিরং যঃ স্থিতঃ।
কুর্গাত্তেব স এষ সস্ত্রীতি যব স্তম্ভারভয়স্থিতেঃ,
কল্পাপারমহং প্রকীর্ণয়দঃ সিংহোরিবোক্ষানলঃ ॥

বীরচরিতং।

যে দিন রজনীতে তেজসিংহ দুর্জয়
সিংহের প্রশ্রয়প্রদান করিয়া আপন গহবরে
আশ্রয়দান করিয়াছিলেন, আমরা এক্ষণে
সেই দিনের কথা পুনরুত্থান করিব।

রজনী দ্বিপ্রহরে দুর্জয়সিংহের নিকট
বিদায় লইয়া তেজসিংহ গহবরাভিমুখে যাই-
লেন না; অন্ধকার নিম্নে কেবল তারকা-
লোকে নিশ্চল কানন ও তমসাক্ষর পর্বতপথ
একাকী অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

যাইতে যাইতে কখন কখন গভীরবনের
ভিতরে আসিয়া পড়িতেন। একে অন্ধকার-
ময় রজনী, তাহাতে পাদপঞ্জেরী অতিশয়
নিবিড়, স্তূপাশ্চিরং সে অন্ধকারে আপন হস্ত
দেখা যায় না। কিন্তু সে পার্বত্যদেশে
কোন স্থান, কোন গহবর, কোন উপ-
ত্যকা তেজসিংহের অজ্ঞাত ছিল না। অল্প
আট বৎসর অবধি গৃহচ্যুত হইয়া ভীলদিগের
সহিত পর্বতে বিচরণ করিতেন, গহবরে শয়ন
করিতেন, কাননে লুকাইয়া থাকিতেন। সেই
আলোকশূন্য, শব্দশূন্য, নৈশকানন একাকী
অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

কানন হইতে নিস্তান্ত হইয়া সম্মুখে উন্নত
পর্বতশ্রেণী দেখিতে পাইলেন। পর্বত-পথ
অতিশয় ছত্তর, কিন্তু পার্বত্যীয় বরাহ-
শাখীল ও তেজসিংহ অপেক্ষা পর্বত অতিক্রমে
সক্ষম নহে। তেজসিংহের দক্ষিণহস্তে সেই

দীর্ঘ বর্ষা ; সেই বর্ষাধারী দীর্ঘ উন্নত অব-
স্থ দেখিলে ভীষণ বস্ত্রজঙ্ঘ ও ধীরে ধীরে পথ
হইতে সরিয়া বাইত ।

প্রায় একগ্রহরকাল এইরূপে ভ্রমণ
করিয়া তেজসিংহ অবশেষে একটি পর্বত-
তলে উপস্থিত হইলেন । তখন মুহূর্তের জন্ত
দণ্ডায়মান হইলেন । ললাট হইতে দীর্ঘকেশ
পশ্চাতে নিক্ষেপ করিলেন, স্থিরনয়নে
আকাশের দিকে ক্রণেক নিরীক্ষণ করিলেন,
কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ধীরে ধীরে প্রণত
হইলেন, পরে পুনরায় নিঃশব্দে একাকী সেই
পর্বতে আরোহণ করিতে লাগিলেন ।

প্রায় একদণ্ডের মধ্যে সেই পর্বতচূড়ায়
আরোহণ করিলেন, চূড়ার অনতিদূরে একটি
গহ্বর ছিল, সেই গহ্বরমুখে উপস্থিত হইয়া
তেজসিংহ আর একবার দণ্ডায়মান হইলেন,
স্থিরনয়নে গগনের নক্ষত্রের দিকে ক্রণেক
নিরীক্ষণ করিলেন, পরে নিম্নে সেই আলোক-
শূন্য, শব্দশূন্য, স্রবশূন্য জগতের দিকে চাহিয়া
রহিলেন । তাঁহার মনে কি গভীর চিন্তার
উদ্বেগ হইতেছিল, কে বলিতে পারে ?
কতক্ষণ পরে চিন্তা সংবরণ করিয়া নিঃশব্দে
সেই গহ্বরে প্রবেশ করিলেন ।

গহ্বরে কবাট । তেজসিংহ সবলে সেই
কবাট নাড়িলেন, সে দীর্ঘ বাহুর অমাহুতিক
বলে কবাট বন্বননা শব্দ করিয়া উঠিল, কিন্তু
ভিতর হইতে কোন উত্তর পাইলেন না ।

পুনরায় শব্দ করিলেন, পুনরায়
প্রতিধ্বনি হইল ; কিন্তু কোন উত্তর নাই,
পুনরায় গহ্বরনিঃসৃত !

সেই নিস্তব্ধ রজনীতে সেই ভয়াতুল
পর্বতগহ্বরে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া
তেজসিংহ নির্ভয়ে তৃতীয়বার কবাটে শব্দ
করিলেন । সে বাহুর আঘাতে এবার কবাট
ও সমস্ত গহ্বরশব্দ কম্পিত হইল ।

এবার ভিতর হইতে একটি গভীর শব্দ
আসিল, “নিশীথে নাহায়া যগ রোতে কে ?”

যুবক উত্তর করিলেন, “তিলকসিংহের
পুত্র গহ্বরবাসী তেজসিংহ ।” বার উল্ঘাটিত
হইল ।

অন্ধকারে গহ্বরে প্রবেশ করিয়া তেজ-
সিংহ ক্রণেক নিস্তব্ধ দণ্ডায়মান রহিলেন,
গহ্বরের ভিতর আলোক নাই, শব্দ নাই,
কেবল বোধ হইতেছে যেন, পর্বতগর্ভে
একটি জল-প্রপাতের স্তিমিত শব্দ স্রুত হই-
তেছে । তেজসিংহ সেই অন্ধকারে দণ্ডায়মান
থাকিয়া সেই অনন্ত শব্দ শুনিতে লাগিলেন ।

কতক্ষণ পরে গহ্বরের অভ্যন্তরে একটি
দীপ দেখা বাইল ; ক্রমে আলোক নিকটে
আসিল । দীর্ঘকায়, শুক্লকেশী, চারুগীদেবী
তেজসিংহের নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন ও
অঙ্গুলীনির্দেশপূর্বক তেজসিংহকে একটি
ব্যাঘ্রচর্চের উপরঃবসিতে আদেশ করিলেন ।
তেজসিংহ উপবেশন করিলেন ও সেই শীর্ণ
দীর্ঘ অবয়বের দিকে সবিম্বয়ে চাহিয়া
রহিলেন ।

চারুগীদেবীর বয়ঃক্রম অশীতি বর্ষেরও
অধিক হইবে । শরীর শীর্ণ, দীর্ঘ ও
তেজঃপূর্ণ, মস্তকের সমস্ত কেশ শুক্ল, ললাট
চিন্তারেখার আক্লিত, নয়নদ্বয় স্থির ও দৃষ্টি-
হীন । সময়ে সময়ে সেই স্থিরনয়নে উর্দ্ধদিকে
চাহিত, সমস্ত শরীর নিশ্চেষ্ট হইত । তখন
বোধ হইত, যেন চারুগীদেবী এ জগতে থাকি-
তেন না, যেন এ জগৎ তাঁহার নিকটে অন্ধ-
কারময় হইলেও সেই দৃষ্টিহীন নয়ন ভবিষ্যৎ
জগৎ বিদীর্ণ করিতে পারিত, ক্ষুদ্র নখর
মানবজাতিসম্বন্ধে বিধির লিখন পাঠ করিতে
পারিত ! সবিম্বয়ে তেজসিংহ সেই দীর্ঘকায়
চারুগীদেবীর দিকে চাহিয়া রহিলেন ।

কতক্ষণ পরে চারুগীদেবী আদেশ করি-

লেন, “রাঠোরপ্রবর তিলকসিংহের নাম মেওয়ারে অবিলিভ নাই, তাঁহার পুত্র কি বাসনার চারগীর সাক্ষাৎ আকাঙ্ক্ষী?”

তেজসিংহ। তিলকসিংহের নাম চির-স্মরণীয়, কেমন না, চিতোর-রক্ষার্থ তিনি প্রাণদান করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে নামমাত্র অবশিষ্ট আছে। তাঁহার সূর্য্যমহলে চন্দাওয়ৎ-কুলের দুর্জয়সিংহ বাস করিতেছেন, তিলকসিংহের বিধবা হত, তিলকসিংহের পুত্র ভীলপালিত ও গহ্বরনিবাসী।

চারগী। চন্দাওয়ৎ ও রাঠোরকুলের বহুকাল-প্রচলিত “বৈরী” চারগীর অবিলিভ নাই। সূর্য্যমহল পূর্বে চন্দাওয়ৎদিগের ছিল, বালক! তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ মাড়ওয়ার হইতে অসিহন্তে আসিয়া সে দুর্গ কাড়িয়া লইয়াছিল। সেই অবধি দুই কুলে সে বিরোধ চলিতেছে, যত দিন রাজস্থানে বীরত্ব থাকিবে, ততদিন সে “বৈরী” নিক্ষেপ হইবে না। চন্দাওয়ৎগণ দুর্জয়সিংহে অসিধারণ করে না, তাহারা সহজে এ দুর্গ ত্যাগ করিবে না।

তেজসিংহ। দেবি! রাঠোরগণও দুর্জয়সিংহে অসিধারণ করে না। অল্পমতি দিন, একবার চন্দাওয়ৎ দুর্জয়সিংহের সহিত যুঝিব, যদি পরাস্ত হই, তবে সূর্য্যমহল আর চাহিব না, পুনরায় মাড়ওয়ারে প্রত্যাগমন করিব, অথবা চিরকাল বস্ত্র ভীলদিগের সহিত বাস করিব।

চারগী। মেওয়ার শিশোদীরবংশের আদিম স্থান, চন্দাওয়ৎকুল শিশোদীর শাখা; মেওয়ার সে কুলের আদিম স্থান। তিলকসিংহের পুত্র! তোমরা রাঠোর; মাড়ওয়ারে তোমাদিগের আদিম স্থান। কি অধিকারে অস্ত্র চন্দাওয়ৎদের শোণিতপাত করিতে চাহ, চন্দাওয়ৎদের দুর্গ অধিকার করিতে বাহ্য কর?

তেজসিংহ। যে অধিকারে ভীলদিগকে দূর করিয়া মাড়ওয়ারে রাঠোরগণ বাস করে, মেওয়ারে শিশোদীরগণ বাস করে, রাঠোরবংশ সেই অধিকারে সূর্য্যমহল অধিকার করিয়াছে। তিলকসিংহের পূর্ব্বপুরুষগণ অসিহন্তে মেওয়ারে আপনাদিগের স্থান পরিহার করিয়াছে, পরে পুরুষাত্মকে মেওয়ার-রক্ষার্থ নিজ প্রাণদান করিয়া নিজ অধিকার স্থিরীকৃত করিয়াছে। এক্ষণে মেওয়ার-ভূমিতে কি রাঠোর অপেক্ষা চন্দাওয়ৎদিগের প্রবলতর অধিকার আছে? মেওয়ার-রক্ষার্থ রাঠোর অপেক্ষা কোন্ চন্দাওয়ৎ বীর অধিক বীৰ্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন? আকবর কর্তৃক চিতোরক্ষণকালে রাঠোর জয়মল ও পিতা তিলকসিংহ অপেক্ষা কোন্ বীর অধিক সাহস প্রদর্শন করিয়াছেন? তাহারা সেঃ আহবে প্রাণ দিয়াছেন, তাহাদিগের শোণিতে মেওয়ারে রাঠোর-অধিকার স্থিরীকৃত হইয়াছে। রাঠোরবংশ অস্ত্র অধিকার জানে না, রাজস্থানে অনারূপ অধিকার বিদিত নাই।

সেই গহ্বরে তেজসিংহের উন্নত রব এখনও কম্পিত হইতেছে। এমন সময় পূর্ব্ববৎ ধীরেগন্তীরস্বরে চারগীদেবী উত্তর করিলেন, “বালক! ভীলদিগের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াও ক্ষত্রিয়ধর্ম তোমার নিকট অবিলিভ নাই; যথার্থই বীরদিগের ও নদীসমূহের আদি ও উৎপত্তি কেহ সন্ধান করে না। বীর্ঘ্যই তাহাদিগের ভূষণ, বীর্ঘ্যই তাহাদিগের অধিকার। সেই অধিকারে চন্দাওয়ৎ যদি সূর্য্যমহল পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তিলকসিংহের পুত্র তাহার প্রতি কষ্ট কেন?”

তেজসিংহ। বীর্ঘ্যবলে যদি দুর্জয়সিংহ সূর্য্যমহল পাইত, সে পরম শত্রু হইলেও তেজসিংহ তাহাকে ক্রমা করিত। কিন্তু নরায়ণ রাজধর্ম জানে না, পিতার মৃত্যুর পর

অনাথ বিধবার নিকট হইতে দুর্গ লইয়াছে, মাতার সহিতও হুঙ্কে অক্ষয় হইয়া তত্বের স্তার ভূর্গে প্রবেশ করিয়াছিল। সেই তত্বের মাতার প্রাণবধ করিয়াছে, সে জীবন পাতকের যদি শাস্তি থাকে, দেবি ! অচ্যুত দিন, তেজসিংহ নরাধমকে শাস্তিদান করিবে।

চারণী ! তিলকসিংহের বালক ! তোমার রোদের কারণ আমার নিকট অবিস্তিত নাই, রাঠোরের বীর্য আমার নিকট অবিস্তিত নাই, কিন্তু তুমি বালক, এইজন্য তোমার পরিণয় গ্রহণ করিতেছিলাম, এক্ষণে জানিলাম, তিলকসিংহের পুত্র তিলকসিংহের অযোগ্য নহে, রাঠোরবংশের অযোগ্য নহে। তোমার বাক্যে আমি রুষ্ট হই নাই, তোমার পিতাকে জানিতাম, তাঁহার পুত্রকে তাঁহার উপযুক্ত দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলাম। এক্ষণে তোমার কি প্রার্থনা, নিবেদন কর, তিলকসিংহের পুত্রকে চারণীর কিছুই অদেয় নাই।

তেজসিংহ ! দেবি ! ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, আপনার কিছুই অবিস্তিত নাই। বিধির নির্বন্ধ নখর মানবের নিকট লুকাইত, কিন্তু দেবীর দূরবিচারিণী দৃষ্টি হইতে বিধির লিখন লুকাইত নহে। একদিন বালক সংগ্রামসিংহ এই নাহার মগরোতে আপন লগাটের লিখন জানিতে আসিয়াছিলেন ; অন্ত তিলকসিংহের পুত্র, —দুর্গচাত, ভীলপালিত, অনাথ তেজসিংহ সেই নাহার মগরোতে আপন লগাটের লিখন জানিতে আসিয়াছে, মাতার হত্যা ও বংশের অবমাননার প্রতিহিংসার কতদিন বিলম্ব আছে, দেবীর চরণে তাহাই জানিতে আসিয়াছে। যদি আজ হয়, তবে সেই কথা বলিয়া এ তাপিত হৃদয়ে শান্তি দান করুন।

চারণী ! তিলকসিংহের বালক ! ভবিষ্যৎ

• নাহার মগরো অর্থাৎ ব্যাভ্রগর্ভত।

ভের ব্যবহিক উত্তোলন করিবার আকাঙ্ক্ষা করিও না, এ দুর্দ্বার ত্যাগ কর। নবম মাসের জীবন ক্রোশপরিপূর্ণ, চিন্তাপরিপূর্ণ, কিন্তু তথাপি হর্ষহীন নহে। কেন না, মিষ্টভাষিণী আশা সঙ্গে সঙ্গে আপন ঐক্সজালিক দীপ জালিয়া সম্মুখে নানা সুন্দর দ্রব্য পরিদর্শন করে। ক্রেশের শাস্তি, সুখের আবির্ভাব, এই সমস্ত মরীচিকা পরিদর্শন করিয়া হৃদয় শান্ত রাখে। তেজসিংহ ! ভবিষ্যৎ ব্যবহিক উত্তোলন করিও না, তাহা হইলে মায়াবিনী আশার দীপ নির্ঝাঁপ হইবে, সুন্দর মরীচিকা অদৃশ্য হইবে, জীবন আশাশূন্য, আলোকশূন্য, ভোগশূন্য হইবে। ভবিষ্যৎ জানিতে পারিলে কোন্ নম্বর এই দুঃখক্ষেত্রে জীবন বহন করিতে চাহিত ? বালক ! এখনও ক্ষান্ত হও, ভবিষ্যৎ জানিতে চাহিও না, বাচঞা থাকে, নিবেদন কর।

তেজসিংহ ! দেবি ! এই নাহার মগরোর চারণীদেবী সংগ্রামসিংহের ভবিষ্যৎ কহিয়া ছিলেন, সেই সংগ্রামসিংহ দেবীর আদেশে অবশেষে সিন্ধু নদ হইতে যমুনা পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। দেবী আদেশ করিলে তিলকসিংহের পুত্রের বস্তুও কি সফল হইতে পারে না ?

চারণী ! সংগ্রামসিংহের রাজ্যবিস্তার লগাটের লিখন, দেবীর আদেশের ফল নহে। দেবীর নিকট ভবিষ্যৎ জানিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ভ্রাতাকর্তৃক আহত ও একচক্ষু অন্ধ হইলেন, গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, বহুদিন অবধি সামান্য মেঘপালদিগের সহিত বাস করিয়া অসহ ক্রেশ সহ করিয়াছিলেন। বালক ! সংগ্রামসিংহের কথা শ্রবণ করিয়া লগাটের লিখন জানিবার উদ্ভয় হইতে নিরস্ত হও। তিলকসিংহের পুত্রের জন্য চারণী আর কি করিতে পারে, নিবেদন কর।

তেজসিংহ। অস্ত্রার সময়ে বাহার যাতা
হত হইয়াছেন, তবুও বাহার চূর্ণ কাড়িয়া
লইয়াছে, ভীলদিগের দয়ায় বাহার জীবন-
রক্ষা হইয়াছে, ভীলদিগের ভিকার যে
প্রতিপালিত, তাহার জীবনে আর কি
অসহ্য ক্লেশ হইতে পারে? দেবি! নিবেদ
করিবেন না, প্রতিহিংসা ভিন্ন এ দাসের
অস্ত্র আশা নাই, অস্ত্র সূত্র নাই, ভবিষ্যৎ
জানিলে কোন্ আশা, কোন্ সূত্র বিলুপ্ত
হইবে? দেবি! আপনাদের নিকট কিছুই
অবিদিত নাই, তথাপি যদি অনুমতি করেন,
একবার এ জীবনের কাহিনী নিবেদন করি।
সমস্ত শুনিয়া আজ্ঞা করুন, ভবিষ্যৎ জানিলে
আমার পক্ষে অধিক ক্লেশ কি হইতে পারে?

চারণী। জীবনের ভীষণ গণ্ডগোল
হইতে চারণী অপসৃত হইয়াছে, সে গণ্ড-
গোলের কথা শুনিলে এক্ষণে স্বপ্নের স্তায়
বোধ হয়। তথাপি তিলকসিংহের পুত্র
যাহা বলিতে চাহে, চারণী তাহা শুনিবে।

তেজসিংহ। দেবীর অনুমতি দ্বারা
চিরবাধিত হইলাম; শ্রবণ করুন।

তেজসিংহ পূর্বকথা বলিতে আরম্ভ
করিলেন। পূর্বকথা শ্রবণে তেজসিংহের
হৃদয় আলোড়িত হইল, রোষে বিবাদে ঘন
ঘন শ্বাস বহির্গত হইতে লাগিল। তেজ-
সিংহ কম্পিতস্বরে কাহিনী আরম্ভ করিলেন,
সেই স্বর সেই পর্বতগুহার প্রতিধ্বনিত
হইতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ ।

—০—

দেবার আদেশ।

অংসেত বদন্তঃ সদাঃ পরিভূতঃ বে গঠৈঃ।

বদানর্শপ্রতীকারভূজালবং ন লভয়েৎ ।

কিরাতাচ্ছবীরং।

“দেবি! আমি চিরকাল একরূপ ছিলাম
না, তেজসিংহের চিরদিন একরূপে বার নাই!
দিবস-যামিনী জিঘাংসা-চিন্তা ছিল না,
যশের চিন্তা, বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল।
ভীলদিগের ভিকারভোজী ছিলাম না, রাজ-
পুত্রদিগের মধ্যে রাজপুত্র ছিলাম।

রাঠোরকূলে তিলকসিংহের নাম কে না
শুনিয়াছে? স্বর্ধ্যমহলের গৌরব কে না
শুনিয়াছে? রাঠোরকূলেবর জয়মল্ল স্বয়ং
তিলকসিংহের দক্ষিণহস্তে স্থান দিতেন, স্বয়ং
স্বর্ধ্যমহলে আসিয়া তিলকসিংহের বীরত্বের
সাধুবাদ করিয়াছিলেন। দেবি! আমি তখন
অনাথ পর্বতবাসী ছিলাম না, আমি তখন
তিলকসিংহের পুত্র, স্বর্ধ্যমহলের যুবরাজ
ছিলাম।

চন্দাওরংকূলের দুর্জয়সিংহের পুত্র পুত্র-
দিগের সহিত রাঠোর তিলকসিংহের পুত্র-
পুত্রদিগের চিরকাল বিরোধ। বংশানুক্রমে
বৈরি চলিয়া আসিতেছে, বংশানুক্রমে
তুমুল সংগ্রাম হইয়া আসিতেছে। যত দিন
চন্দ্র-স্বর্ধ্য থাকিবে, তত দিন সে বিরোধ,
সে ক্রোধাগ্নি জীবিত থাকিবে। এই নির্কী-
সিতের শরীরে বংশানুগত রোষ দিব্যরাজ
জলিতেছে, দুর্জয়সিংহের হৃদয়-শোণিতে
সে অগ্নি নির্কীর্ণ হইবে।

রাঠোরদিগের নিবাসস্থল মাদোয়ার, সেই
স্থান হইতে তিলকসিংহের পুরুষগণ অসি-
হস্তে আসিয়া চন্দাওরংদিগের নিকট হইতে

সূর্য্যমহল কাঠিয়া লইয়াছে, বংশাশ্রমে তথায় বাস করিতেছে, তাহা দেবীর অবিত নাই। পুনরায় অসিহন্তে রাঠোরকুল সেই দুর্গ লইবে, চন্দাওরদিগকে হুঁরে তাড়াইয়া দিবে।

পিতা যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন দুর্জয়সিংহের সহিত বার বার মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, সিংহের আবাগে শৃগল কবে স্থান পাইয়াছে? যতবার সে পামর সূর্য্যমহল আক্রমণ করিয়াছিল, ততবার পিতা তাহাকে দূরে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

অন্ত আট বৎসর হইল, তিলকসিংহ রাঠোরপতি জয়মলের সহিত চিতোররক্ষার্থ গিয়াছিলেন। চিতোর রক্ষা হইল না, কিন্তু দেবি! জয়মল ও তিলকসিংহের বীরত্ব স্বয়ং আকবর শাহের নিকট অবিত নাই। কিরূপে সালুস্রাপতির মৃত্যুর পর তাহার চিতোর-বার রক্ষা করিয়াছিলেন, কিরূপে স্বয়ং দিল্লীখয়ের সহিত সমুখযুদ্ধে প্রাণদান করিয়াছেন, চারণগণ সে গীত এখনও দেশে দেশে গাইতেছে। সে গীত শুনিয়া সূর্য্যমহলে আমার বিধবা মাতার হৃদয় কণ্ঠিত হইল, এ বালকের হৃদয় কণ্ঠিত হইল। উল্লাসে মাতা কহিলেন, ‘হৃদয়েশ্বর সশরীরে স্বর্গধামে গিয়াছেন, দাসীগণ! চিতা প্রস্তুত কর, তিনি দাসীর জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন, কেন না, জীবনে এ দাসী তাহার বস্ত্র সোহাগিনী ছিল।’

সহসা তেজসিংহের স্বর রুদ্ধ হইল; নয়ন হইতে একবিন্দু জল সেই বিশাল বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। পুনরায় বলিতে লাগিলেন, ‘দেবি! কমা করুন, তেজসিংহ ক্রন্দন অনেক দিন ভুলিয়া গিয়াছে, অজ্ঞ স্নেহময়ী মাতার কথা শ্রবণ করিয়া সংবরণ করিতে পারিল না। এখন চিতারোহণে স্থিরসকল

হইলেন, তখন বাতীর সকলে আসিয়া নিবেশ করিল। আমাকে প্রতিপালন করিবে, সকলে এইরূপ বৃদ্ধি দেখাইতে লাগিলেন। মাতা তাহা শুনিলেন না, তিনি দ্বারীর অঙ্গ-বৃত্তা হইবার জন্ত স্থিরসকল হইরাছিলেন।

শেষে আমি আসিয়া বলিলাম, ‘মাতা, এখনও আমার হস্ত দুর্বল, ছুঁমি বাইলে সূর্য্যমহল কে রক্ষা করিবে? দুর্জয়সিংহের সহিত কে যুদ্ধদান করিবে?’ এবার তিনি স্থিরসকল ভুলিলেন বলিলেন দাসীগণ। আমার চিতারোহণে বিলম্ব আছে। শুনিয়াছি,—চিতোর-রক্ষার্থ পস্তের মাতা ও বনিতা না কি বহুতর যুদ্ধ করিয়াছিল। আর একজন রাজপুত-রমণী বহুতর যুঝিবে, সূর্য্যমহল রক্ষা করিবে।’

শিতার অঙ্গাগার অন্বেষণ করিলেন; তাহার বাবদ্বত একটি ছুরিকা পাইলেন, সেই অবধি ছুরিকা মাতার কণ্ঠমণি হইরাছিল।

দুর্জয়সিংহ মাতার এ পণ শুনিল, নারী-রক্ষিত দুর্গ আক্রমণ করিতে ত্রীক ভীত হইল। অর্ধবলে দুর্গের দ্বার উদ্বাটিত হইল, তক্ষরের দ্বার রজনীযোগে দুর্জয়সিংহ স্বর্ণে প্রবেশ করিল।

তথাপি বোদ্ধগণ বিনা যুদ্ধে দুর্গ ত্যাগ করে নাই। তোরণে, সিংহদ্বারে, গৃহের ভিতর সেই অন্ধকার রজনীতে তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। তক্ষরেরা বৃষ্টিগ, রাঠোরেরা মৃত্যুকে ভরে না, শত শতকৃত্য করিয়া উল্লাসে প্রাণদান করে।

হৃদের উপর যে গবাক্ষ আছে, মাতা তথায় দণ্ডায়মান ছিলেন, বাহুহস্তে আমাকে ধরিয়াছিলেন, দক্ষিণহস্তে সেই ছুরিকা।

ক্রমে আমাঙ্গিণের বোদ্ধগণ হত হইল। ক্রমে যুদ্ধতরঙ্গ ও যুদ্ধদান সে দিবে আসিতে লাগিল; শেষে সেই গৃহের কণা ভর হইল। চন্দাওরগণ সেই গৃহে মহ

কোলাহলে প্রবেশ করিল; সন্ধ্যায় রক্তা-
শুভ দুর্জয়সিংহ।

সেই কথিত কলেবর দেখিয়া মাতা
কম্পিত হইলেন না, সেই প্রচণ্ড যুদ্ধনাদ
শুনিয়া মাতা মনন হ্রদিত করেন নাই।
স্বর্গীয় স্বামীর নাম লইয়া মাতা ভীক
ছুরিকা উত্তোলন করিলেন; জলন্তনরনে
সেই নরাত্মের দিকে চাহিলেন। নারীর
ভীষ্মদৃষ্টির সম্মুখে ভীকর গতি সহসা রোধ
হইল, তব্বর সেই ছুরিকার অগ্রে স্তব্ধ হইয়া-
ছিল। মাতা সেই ছুরিকাহাতে দুর্জয়-
সিংহের দিকে বেগে ধাবমান হইলেন।
সেই মুহূর্ত্তে এই জগৎ হইতে সেই রাজ-
পুত্রকলর অন্তর্হিত হইত, কিন্তু তাহার
একজন সৈনিক আপন প্রাণ দিয়া প্রভুর
প্রাণ বাঁচাইল, মাতার ছুরিকা সৈনিকের
হৃদয়ের শোণিত পান করিল। তৎক্ষণাৎ
দশ জন সৈনিক অসহায়্য বিধবাকে হত্যা
করিল।”

তেজসিংহ ক্ষণেক স্তব্ধ হইলেন।
তাহার নয়ন হইতে অগ্নি বহিগত হইতে-
ছিল। ক্ষণেক আত্মসংবরণ করিয়া
কহিতে লাগিলেন, “আমি তখন দশ বর্ষের
বালকমাত্র, কিন্তু মাতার হস্ত হইতে সেই
ছুরিকা লইয়া দুর্জয়সিংহকে আক্রমণ করি-
বার চেষ্টা করিলাম। বালকের সম্মুখে
ভীক সরিয়া গেল, আর তাহাকে দেখিতে
পাইলাম না। তখন পদাঘাতে গবাক্ষ
ভাঙ্গিয়া লক্ষ দিয়া হৃদে পড়িলাম। সেই
ভীককে আর একদিন দেখিতে পাইব,
মাতার হত্যার পরিশোধ লইব, বংশের
কলঙ্ক অপনয়ন করিব, কেবল এই আশায়
সেই অবধি আটবৎসর জন্মে ও গহবরে
জীবনধারণ করিয়াছি।

দেবি! তাহার পর বিব্রন বনে ও

পর্যন্তকন্দরে বাস করিয়াছি, রাঠোর হইয়া
ভীকদিগের শরণাগত হইয়াছি, হৃদয়ের
দুঃস্বপ্ন জালায় জীবনধারণ করিয়াছি, কেবল
আর একদিন দুর্জয়সিংহের সহিত সাক্ষাৎ
হইবে, এইজন্ত। অহুমতি দিন, আর এক-
বার দুর্জয়সিংহের সহিত যুদ্ধিব—এবার
যদি সে পলাইতে পারে, তেজসিংহ আর
কিছু প্রার্থনা করিবে না।”

অনেকক্ষণ কেহ কথা কহিলেন না, তেজ-
সিংহের গভীর স্বর বার বার সেই গহবরে
প্রতিধ্বনিত হইয়া লীন হইয়া গেল, অনেক-
ক্ষণ সেই গহবর নিস্তব্ধ।

পরে চারগিদেবী শান্ত-ধীরস্বরে কহি-
লেন, “বংশাহরণ শত্রুতাও বৈরী রাজ-
পুত্রবধূ। তিলকসিংহ ও দুর্জয়সিংহের
বংশের মধ্যে ‘বৈরী’ নির্ধারিত হইবে
না। এই ক্রোধানলে তিলকসিংহের
পুত্রের হৃদয় জলিবে, তাহাতে বিশ্বাস নাই,
কিন্তু বিদেশীয় বোদ্ধার বর্তমান মেওয়ারে
গৃহ-কলহ ক্ষান্ত হয়, মেওয়ারের এই চির-
প্রথা। তিলকসিংহের পুত্র এই চিরপ্রথা
পালন করুন।”

তেজসিংহ। বিদেশীয় যুদ্ধক্ষেত্রে কি
পায়র দুর্জয়সিংহ তব্বরের জ্ঞান স্বর্যমহল
হস্তগত করে নাই?

চারগী। আকবর কর্তৃক চিতোরধ্বংসের
পর রাণা উদয়সিংহের সহিত তাহার যুদ্ধ
ক্ষান্ত হইয়াছিল; উদয়পুরে নূতন রাজ-
ধানী স্থাপন করিয়া রাণা নির্জিয়ে ছিলেন,
সেই সময়ে দুর্জয়সিংহ স্বর্যমহল হস্তগত
করিয়াছিলেন।

তেজসিংহ। এখনও কি যুদ্ধ ক্ষান্ত
হয় নাই? মানসিংহ রোবে দিল্লিতে গিয়া-
ছেন বটে, মহারাণা যুদ্ধের আয়োজন
করিতেছেন বটে, কিন্তু শত্রু কাথার?

চারণী। বর্ষাপ্রারম্ভে বালকে সেইরূপ জিজ্ঞাসা করে, মের কোথায়? বালক। বর্ষার মের অপেক্ষা অধিক সমারোহে লক্ষ্য আনিসেতেছে। যে বজা দ্বারা দুর্জয়সিংহের প্রাণবধ করিতে চাহ, সেই বজা-হস্তে হলদী-ঘাটার বাইর। উপস্থিত হও। চারণীর কথা গ্রাহ্য কর, হলদীঘাটার অচিরে অনেক বজা ও অনেক বীরের আবশ্যক হইবে, দুর্জয়-সিংহ ও তেজসিংহের আবশ্যক হইবে, বিদে-শীর যুদ্ধ বর্তমানে গৃহ-কলহ রাজস্থানের প্রথ মুগত নহে।

তেজসিংহ। দেবি! যেওয়ার-রক্ষার্থ যদি যুদ্ধ আবশ্যক হয়, বাঠোর সে যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকিবে না। কিন্তু সে পর্যন্ত যে পামর রাজপুত্র বিষ্মত হইয়াছে, তৎ-রের জায় দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে, অসহায় বিধবাকে হত্যা করিয়াছে, পিতার কুল কলঙ্কিত করিতেছে, সে রাজপুতকলঙ্ক জীবিত থাকিবে?

চারণী। বিদেশীর যুদ্ধ বর্তমানে গৃহকলহ নিষিদ্ধ।

উভয়ে অনেকক্ষণ নিমন্তক রহিলেন; অনেকক্ষণ চিন্তার পর উর্দ্ধনেত্রা চারণী অতি-শয় গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “বালক, অত তুমি সেই দুর্জয়সিংহের প্রাণরক্ষা করিয়াছ।

তেজসিংহ চমকিত হইলেন; কহিলেন, “দেবীর নিকট কিছুই অবিনীত নাই। স্বহস্তে সে পামরকে নিধন করিব, এই জন্ত বরাহের আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছি।”

চারণী। পরে দুর্জয়সিংহকে আপন আবাসস্থানে আশ্রয়দান করিয়াছিলে, তখনও তাহার প্রাণনাশ কর নাই।

তেজসিংহ। পরিশেষে সহিত যুদ্ধ রাজ-ধর্ম নহে; বিশেষ পৈতৃক দুর্গে তাহাকে

আক্রমণ করিয়া তাহার প্রাণনাশ করিব, আমার এই পন। অদ্যমতি দিন, সূর্য্যমহল আক্রমণ করিব, তৎপরের হত হইতে পৈতৃক দুর্গ কাড়িয়া লইব, সম্মুখ-আহবে সেই তৎপর দুর্জয়সিংহকে উচিত শাস্তি দিব।

চারণী। শত্রুকে বরাহ হইতে রক্ষা করিয়া রাজপুতধর্ম পালন করিয়াছ; পরি-শ্রান্তের সহিত যুদ্ধ না করিয়া রাজপুতধর্ম পালন করিয়াছ। ষাও, তেজসিংহ! বিদেশীর যুদ্ধের সময় গৃহকলহ বিষ্মরণ করিয়া রাজপুতধর্ম পালন কর। তিলক-সিংহের পুত্র। তিলকসিংহের বীরত্ব তোমার দেহে অঙ্কিত রহিয়াছে, বিজয়ের টীকা তোমার ললাটে শোভা পাইতেছে, তিলক-সিংহের জায় রাজপুত-ধর্ম পালন কর। দশ বৎসর মধ্যে বিদেশীর যুদ্ধ ক্ষান্ত হইবে, পরে সূর্য্যমহলে বাঠোর-সূর্য্য পুনরায় উদ্দীপ্ত হইবে।

সহসা গহ্বরে দীপ নির্বাণ হইল; অন্ধকারময় গহ্বরে চারণীর শেষ আদেশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

অন্ধকার গহ্বর হইতে তেজসিংহ নিশ্চিন্ত হইলেন; পরদিন মহারাণা প্রতাপ-সিংহের সৈন্তের সহিত যোগ দিলেন; পরে হলদীঘাটার যুদ্ধের দিনে বাঠোর-বজা নিশ্চেষ্ট ছিল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

ভীলপ্রদেশ ।

অথো বৌদ্ধধর্মসংঘাৎ জীবিতং, সাধুজন-বিগৃহী-
তকং তস্মিন্, তথাহি পুরুষগণিশিভোপহারে বর্ধবৃদ্ধিঃ,
আহারঃ সাধুজন-বিগৃহীতো বধুবাংসাংসিঃ, গ্রামো
বৃগয়া, নান্যং শিবাকৃত্যং, উপলব্ধোঃ বৌদ্ধিকাঃ ।

কাদম্বরী ।

হলুদীঘাটার বৃক্ষ হইয়া গিয়াছে, একদিন
অপরাজে তেজসিংহ একাকী ভীলপ্রদেশের
যথ্য দিয়া পথ অভিযান করিতেছিলেন ।

তেজসিংহ যদি নিজচিন্তায় অভিভূত না
থাকিতেন, তবে সেই নির্জন ভীলপ্রদেশের
শোভা সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইতেন ।
পথের উত্তরপার্শ্বে নিবিড় ক্রকবর্ণ সছল হস্ত
উচ্চ প্রাচীরের দ্বারা পর্কতরাশি উদ্ভিত
হইয়া বেন সেই নির্জন পথকে গোপনে রক্ষা
করিতেছে । পর্কতচূড়ায় ও পার্শ্বদেশে
অসংখ্য পর্কত-বৃক্ষ ও লতাগুল্প বাগুহিরোলে
জীড়া করিতেছে ও অপরাজের স্তিমিত
স্বৰ্ণ্যালোকে হাস্ত করিতেছে । সে স্বৰ্ণা-
লোক বহুর নীচস্থ পর্কতহলের পথ পর্যন্ত
পৌছিতেছে না । তেজসিংহ যে পথ দিয়া
যাইতেছিলেন, সে পথ অপরাজেই প্রায়
অন্ধকারময় । কোন কোন স্থলে উন্নত
পর্কতশিখর হইতে স্বৰ্ণ্যালোক প্রতিফলিত
হইয়া সেই পথের উপর ঈষৎ আলোক
বিতরণ করিতেছিল ; অস্ত্র স্থলে সেই বৃক্ষ-
জাদিত পথ একেবারে অন্ধকারময় । সেই
নির্জন পথের পার্শ্ব দিয়া একটি ক্ষুদ্র পর্কত-
নদী কল কল শব্দে শিলাশয্যার উপর দিয়া
ক্রান্তবেগে গমন করিতেছে, বেন পার্শ্বস্থ
গ্রহরী স্বরূপ উন্নত ও কঠোর পর্কতরাশিকে
উপহাস করিয়া কোন জীবাণুই বাসিকা

হাসিয়া হাসিয়া দৌড়িয়া বাইতেছে । স্থানে
স্থানে স্তিমিত দিবালোকে সেই নদীর
জল চকমক করিতেছে, অস্ত্র স্থানে সে নদীর
গতি কেবল শব্দমাত্রে অস্বমেয় । সেই উন্নত
পর্কতের কঠোর বৃক্ষ হইতে, কোন কোন
স্থানে ঝুঙ্ক ঝুঙ্ক দ্রোণাস্বরের দ্বারা নিব্বরিণী
বহিষ্কৃত হইয়া নীচস্থ সেই নদীর সহিত কল
কল শব্দে মিশিয়া যাইতেছে । ভীলপ্রদে-
শের বিষয়কর সৌন্দর্যের দ্বারা সৌন্দর্য
জগতের অল্পস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় ।
একজন আধুনিক করাসী ভ্রমণকারী মূর্ত-
কণ্ঠ স্বীকার করিয়াছেন, ইউরোপের সমস্ত
মনোহর স্থল অপেক্ষাও রাজস্থানের ভীল-
প্রদেশ হৃদয় ও বিষয়কর ।

তেজসিংহ এইরূপ নির্জন একাকী
অভিযান করিতেছিলেন । পর্কতচূড়ার
উপর স্থানে স্থানে ভীলদিগের “পাল”
অর্থাৎ নিবাসস্থান দৃষ্ট হইতো । নীচের পথ
হইতে দেখিলে বোধ হয় যে, মনুষ্যের
আবাস নহে, যেন জগল পক্ষ নিজ কঠোর
শাবকগুলিকে লালন-পালন করিবার জন্য
পর্কতচূড়ার কুলায় নির্মাণ করিয়াছে ।
প্রত্যেক পালের চতুর্দিকে বা নীচে অল্পমাত্র
ভূমি কবিত, সেই ভূমির উৎপন্ন ভীল-
দিগের আহারের অবলম্বন, দ্বিতীয় অবলম্বন
বংশাশ্রয়ত্ব দ্রব্যতা । স্থানে স্থানে সেই
পর্কতচূড়ার উপর, সায়ংকালীন গগনে
বিস্তৃত ভাননক প্রকৃতির দ্বারা এক এক
জন ক্রকবর্ণ শীর্ণকার কৌলীনধারী ভীল
ধমুর্কীগণহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহারা
এই নির্জন পথ ও ভীলপ্রদেশের গ্রহরী ।
তেজসিংহের বীরাকৃতি যদি প্রত্যেক ভীলের
পরিচিত না হইত, তাহা হইলে সেই
প্রত্যেক ধনুকে শর সংযোজিত হইত ।

সেই উপভাষা অভিক্রম করিয়া কতক-

দূর আসিতে আসিতে তেজসিংহ একটি রমণীর ও অতি বিস্তীর্ণ হ্রদের কূলে উপনীত হইলেন। পূর্ববর্ণিত পর্বত-নদী সেই স্বচ্ছ সুন্দর পর্বত-হ্রদে আসিয়া মিশিয়াছে। হ্রদের চতুর্দিকে বহুদূর মন্থরানয়নে দৃষ্ট হয়, কেবল পর্বতরাশির পর পর্বতরাশি পর্বত-বৃক্ষে আচ্ছাদিত হইয়া সারংকালীন গগনে বিষয়-কর চিত্রের স্থায় বিস্তৃত রহিয়াছে। হ্রদের কূলে ঘাইয়া তেজসিংহ একবার সমুখে অবলোকন করিলেন এবং সেই মনোহর প্রকৃতির শোভা দেখিয়া নিজের চিন্তা এক-বার ভুলিলেন।

সারংকালে লোহিত আলোক সেই হ্রদের জলের উপর পতিত হইয়া কি অপূর্ণ শোভা ধারণ করিয়াছে! জলের নিম্নতর বক্ষের উপর চারিদিকে উন্নত পর্বতের ছায়া কি সুন্দর পতিত হইয়াছে! এখানে শব্দ নাই, মন্থরার গমনাগমন নাই, জীব-আবাসের চিহ্নমাত্র নাই, যেন প্রকৃতি এই সুন্দর জগৎ রচয়িতার পুকার কন্ঠ এই উন্নত পর্বতবেষ্টিত, শান্ত, নির্জন, নিঃশব্দ হ্রদ প্রস্রুত করিয়া রাখিয়াছে। তেজসিংহ অনেকক্ষণ নিঃশব্দে সেই চিত্রখানি দেখিতে লাগিলেন। হ্রদের জলে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া তেজসিংহ একটা শিলাথণ্ডে উপ-বেশন করিলেন।

আমরা এই অবসরে সেই অপূর্ণ দেশ-বাসী ভীলদিগের বিষয়ে দুই একটি কথা বলিব।

ভারতবর্ষের যে সুন্দর প্রদেশে রাজপুত-গণ আসিয়া অসিহস্তে আপনাদিগের আবাস-স্থান পরিষ্কার করিয়া পরাক্রান্ত রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল, রাজপুতদিগের আগমনের পূর্বে সেই রাজস্থান ভীলদিগের আবাস-স্থান ছিল। যখন রাজপুতগণ আসিয়া

উৎসরাক্ষেত্র ও রম্য উপত্যকাগুলি কাড়িয়া লইল, তখন স্বাধীনতাপ্রিয় ভীলগণ বিক্ষা-চল ও আরাবলী পর্বতে বাইরা আপনা-দিগের স্থান ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে লাগিল। বোধ হয়, যুগের কয়েক কিছু পরেই এই সমস্ত ব্যাপার সম্ভটিত হইয়া-ছিল।

সেই অবধি ভীল ও রাজপুতদিগের মধ্যে এক অপূর্ণ মিত্রতা রহিল। ভীলগণ নামমাত্র রাজপুত-রাজাদিগের স্বাধীনতা স্বীকার করিল, কিন্তু কলে আপন আপন পর্বতস্থিত "পাল"-সমূহে বাস করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতে লাগিল এবং অব-সরমতে কি রাজপুত, কি মুসলমান, সকল-কেই লুণ্ঠন করিয়া জীবিকানির্ভাহ করিতে লাগিল। তথাপি রাজপুত-রাণাদিগের সিংহা-সন আরোহণের সময় একজন ভীলসদ্বীর রাজনিদর্শনগুলি রাণাকে অর্পণ করিত এবং রাজপুতদিগের যুদ্ধ ও বিপদের সময় ভীল-যোদ্ধগণ যথাসাধ্য রাজপুতদিগের সহায়তা করিত।

ভারতবর্ষের সমস্ত বর্ষারম্ভটিই হিন্দু-দিগের দুই একটি দেবকে আপন দেব বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং হিন্দু-দেব হইতে আপনাদিগের উৎপত্তি, এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত করিয়াছে। ভীলগণ কহে, "আমরা মহাদেবের তত্ত্বর, মহাদেব-উরসে আমাদের জন্ম। মহাদেব একটি অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একটি বগ্ন বালিকার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। সেই বালিকার গর্ভজাত একটি কৃষ্ণবর্ণ সন্তান কোন এক দিন মহাদেবের ব্যবহৃত তত্ত্বা করে এবং সেই অবধি শাপগ্রস্ত হইয়া ভীলনামে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে থাকে। আমরা ভীলগণ তাহারই সন্তান।"

পর্বতের শিখরে ভীলদিগের “পাল” বা গ্রাম নির্মিত হয়, পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। পালের মধ্যে প্রত্যেক ভীলের গৃহ, এক একটি চুর্ণের দ্বারা চারিদিকে কটক ও বুদ্ধ দ্বারা বেষ্টিত। এই পালসমূহ হইতে হিংস্রক পক্ষীর দ্বারা সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইয়া কৃষি ও বাণিজ্য-বাবসারী সভ্য-জাতি-দিগকে দূর্জন করিয়া ভীলগণ বহনতাকী অবস্থি জীবনধারণ করিয়াছে। শত্রুরা যদি কখন এই পাল আক্রমণ করে, তবে ভীল-নারী ও শিশুগণ গোমহিষাদি লইয়া নিকটস্থ নিমিড়, হুর্ভেড পর্বত ও জঙ্গলে যাইয়া লুকাইয়া থাকে, পুরুষগণ ধনুর্ধারণে বা প্রস্তর-নিষ্ক্ষেপ দ্বারা নিজ নিজ প্রাণ রক্ষা করে।

ভীলদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দল আছে, প্রত্যেক দল নিজ দলপতি বা সর্দারের অধীনে থাকিয়া কার্য্য করে। এই দলের মধ্যে সর্বদাই বিরোধ ও বিবাদ হয়; কিন্তু আবার যুদ্ধ বা বিপদকালে সকল দল একত্রিত হয়। তখন তাহাদিগের যুদ্ধরব প্রতি উপত্যকার শব্দিত হয়, পাল হইতে অন্ত পালে সংবাদ প্রেরিত হয়। নিশাকালে বায়্র-শৃগাল অথবা পক্ষীর রব অন্তর্য্য করিয়া ভীলগণ সঙ্কেত দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করে এবং অল্পসময়ের মধ্যে শত শত যোদ্ধা দলবদ্ধ হইয়া একান্তাবে শত্রুবিনাশের চেষ্টা করে। রাজস্থানে অন্ত্যাপি প্রায় বিশ লক্ষ ভীল বাস করে।

ভীলদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই। তাহারা দুই একটি হিন্দু-দেবকে ও নানারূপ পীড়াকে দেবতাস্থানে পূজা করে। মোয়া-বুদ্ধকে বিশেষ সমাদর করে এবং ঐ বুদ্ধ হইতে মদিরা প্রস্তুত করিয়া সেবন করে। পুরুষগণ মধ্যমারুতি, কুরুকায় এবং কার্গা-

গুণে অসাধারণ শারীরিক বল ও ক্রমতা লাভ করে। স্ত্রীলোকগণ পুরুষ অপেক্ষা উষ্ণ গোরবর্ণ ও হস্ত্রী এবং বস্ত্র দ্বারা কক্ষ ও একটি শুন আচ্ছাদন করে এবং হস্তপদে লাক্ষানির্মিত বলয় প্রভৃতি ধারণ করে। বিবাহের রীতি বড় সহজ। নির্দিষ্ট দিনে গ্রামের সমস্ত যুবক ও কস্তা একত্রিত হয়, পরে যুবকেরা আপন আপন মনোনীত এক একটি কস্তাকে বাছিয়া লইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া কয়েক দিন তথায় কালহরণ করে। পরে স্ত্রীপুরুষ গ্রামে ফিরিয়া আইসে।

বর্ষের ভীলদিগের দুইটি অসাধারণ গুণ লক্ষিত হয়। তাহাদের উপকার করিলে তাহারা কদাচ তাহা বিস্মৃত হয় না এবং তাহারা বাক্যদান করিলে কদাচ তাহা লঙ্ঘন করে না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

হৃদতটে ভীল-বালিকা।

কাউণ্ডতা ইথিআ জা ইমিণা পরিমাগমণা
অভ্যাজগং বিণোদেদি।
বিক্রমোর্কশী।

যে পর্বতের নীচে তেজসিংহ হৃদতটে এই নিম্নরূপ সাংকালে এখনও বসিয়া আছেন, সেই পর্বতের চূড়ায় ভীমচাঁদ নামক এক ভীল-সর্দারের পাল ছিল। সেই পালের নিকটে একটি পর্বতগহ্বর ছিল, পাঠক দুর্জয়সিংহের সহিত সেই গহ্বর একদিন দৃষ্ট করিয়াছিলেন।

হৃদের তটে একটি তুঙ্গ প্রস্তররাশির উপরে তেজসিংহ উপবেশন করিয়া আছেন।

সহসা একটি ভীলবালিকা করতালি দিয়া হাসিতে হাসিতে সেই স্থানে আসিয়া উপবেশন করিল এবং বাল্যোচিত চপলতার সহিত হৃদের জল লইয়া তেজসিংহের গায়ে ছিটাইয়া দিল। তেজসিংহ সে বালিকাকে চিনিতেন। বালিকার হাত ধরিয়া নিকটে বসাইলেন এবং অন্তমনস্ক হইয়া বালিকার কেশগুচ্ছ লইয়া খেলা করিতে লাগিলেন।

ভীলকন্তা ভীলদিগের স্ত্রায়ই কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু নয়নদুটি উজ্জ্বল, মুখকান্তি মন্দ ছিল না। চঞ্চলা ভীলবালিকা পর্ত্ত-আয়ো-হণে বস্ত্র-বিড়াল অপেক্ষাও পটু, আজয় অস্ত্রান্ত ভীলদিগের স্ত্রায় চতুরতা ও সতর্কতা শিখিয়াছিল। একটি শব্দ, একটি ছায়া, একটি স্থানান্তরিত বস্তু দেখিলেই কারণ অনুভব করিত। যত্নকে ক্রমকেশ সর্দদাই ছুলিতেছে, নয়ন দুইটি সর্দদাই চঞ্চল। বালিকা সর্দদাই চঞ্চল ও ক্রীড়া-পটু, কখন উপলব্ধ লইয়া খেলা করিত, কখন জল লইয়া ক্রীড়া করিত, কখন অপরের সর্দাদি ভিজাইয়া দিয়া খিল খিল করিয়া হাসিত। তথাপি তেজসিংহকে চিন্তাকুল দেখিলে আবার তাঁহার পার্শ্বে কখন কখন ছুই তিন দণ্ড পর্য্যন্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে ভালবাসিত। বালিকার কখন ধীর চিন্তাশীল ভাব, কখন অতিশয় চঞ্চলতা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইত। সকলেই বলিত, “যেয়েটি দেখিতে বলিকা, কিন্তু মনটি বালিকার মন নহে।”

তেজসিংহ কি চিন্তা করিতেছিলেন? বর্ষাগমে শক্রগণ মেঘমার ত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং তেজসিংহ বুদ্ধচিন্তা করিতেছিলেন না। বিদেশীয় শত্রু থাকিতে গৃহকলহ নিষিদ্ধ, সুতরাং তিনি পুণ্যমহলের চিন্তা

করিতেছিলেন না। তেজসিংহ কি চিন্তা করিতেছিলেন?

ভীলবালিকা অনেককণ নিশ্চেষ্ট হইয়া হৃদের জলে আপন হস্ত নিক্ষেপ করিতেছিল ও তেজসিংহের উক্কেদে মত্তক রাখিয়া তেজসিংহের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। অনেককণ তেজসিংহের মুখের দিকে চাহিয়া বালিকা মুহুর্ত্তে একটি গীত আরম্ভ করিল।

বাল্যকালের স্বপ্ন কখন কখন স্বপ্নের জাগরিত হয়, বাল্যকালের দৃষ্ট মুগ্ধাবি কখন কখন নয়ন-পথে আবির্ভূত হয়, বাল্যকালের প্রেম নিহিত অশ্রির স্রাব কখন কখন জলিয়া উঠে, এই মর্ম্মের একটি সরল গীত বালিকা গাইতে লাগিল।

তেজসিংহ সহসা চমকিত হইলেন। তিনি বাল্যকালের একটি স্বপ্ন চিন্তা করিতেছিলেন, ভীলবালিকা কি তাঁহার মনের কথা জানিল? বালিকার নাম ধরিয়া ডাকিলেন।

বালিকা জগৎখোলা ছাড়িয়া তেজসিংহের দিকে চাহিল। ঠেক, বালিকার মুখে ত কোন চিন্তার লক্ষণ নাই! তেজসিংহ বালিকার মুখ দেখিয়া বিচার করিলেন, “বালিকা আমার মনের কথা কি জানিবে? যে গীত জানে, আপনি মনে তাহাই গাইতেছে।”

বালিকা থিল থিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, তেজসিংহ সন্দেহমনা হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা, আমি বাল্যস্বপ্নের কথা ভাবিতেছিলাম, তোকে কে বলিল?”

হাসিয়া ভীলবালা বলিল, “এই ভূমি বলিলে, না হইলে আমি কিরূপে জানিব, ভূমি কি ভাবিতেছিলে? কি স্বপ্নের কথা ভাবিতেছিলে, পুন্সের?”

এবার তেজসিংহের মূর গভীর হইল।

কৃত্ত হইল, গভীরভাবে ভিজাসা করিলেন,
“আমি পুন্দের কথা ভাবিতেছিলাম, তোকে
কে বলিলাম?”

ভীলবালা বলোচিতি সরলতার সহিত
সত্রে তেজসিংহের দিকে চাহিয়া উত্তর
করিল, “তাহা আমি কি প্রকারে জানিব?
তবে বালাকালে লোকে কল-কুলের কথা
অল্প বেবে না ত আর কিসের স্বপ্ন দেখে?”

তেজসিংহ বালিকার সরল মুখখানি
দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন, “আমি মিথ্যা
সন্দেহ করিয়াছিলাম।” বলিলেন, “আমি
বালাকালে সত্য সত্যই পুন্দের স্বপ্ন দেখি-
তাম, তাহাই ভাবিয়াছিলাম; তুই বর্ধাই
সন্দেহ করিয়াছিলি।”

ভীলবালিকা। ভীল অনেক বিষয়
দেখিতে পায়, অনেক কথা শুনিতে পায়।
তুমি যদি ভীল হইতে।

তেজসিংহ। তাহা হইলে কি হইত?

তেজসিংহের হাতে বালিকার হাত ছিল,
বালিকা নিঃশব্দে তাহা দেখাইল।

তেজসিংহ পুনরায় ভিজাসা করিলেন,
“তাহা হইলে কি হইত?”

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ভীলবালা
কহিল, “তুমি কি অন্ধ? বিভিন্নতা দেখিতে
পাও না? তাহা হইলে তোমার হাত কি
বেত হইত, না আমার স্তায় কৃষ্ণবর্ণ হইত?”

ভীলবালা বর্ধাই বালিকা, গভীরভাবে
বর্ণবিভেদের কথা ভাবিতেছিল।

তেজসিংহ পুনরায় সত্রে কহিলেন,
“বালিকা, শত্রু বাড়াই বা; এইক্ষণেই বৃষ্টি
হইবে।”

বালিকা। আমি যাইব না।

তেজসিংহ। কেন?

বালিকা। আমি যে দেখিতে ভাল-
বাসি।

তেজসিংহ। কেন?

বালিকা। কেমন সাদা বিদ্যুতের সঙ্গে
কাল মেঘ একত্রে খেলা করে।

তেজসিংহ পুনরায় বালিকার দিকে
চাহিলেন, দেখিলেন, সারল্যের সহিত
বালিকা সাদা বিদ্যুৎ ও কৃষ্ণবর্ণ মেঘের দিকে
চাহিয়া রহিয়াছে।

অপ্পষ্টভাবে তেজসিংহ বলিলেন,
“বালিকা, তুই কি সরলা বালিকা, না চিত্তা-
শীলা নারী? আমি তোকে কখনই ভাল
করিয়া চিনিতে পারিলাম না।”

পরক্ষণে তেজসিংহ চাহিয়া দেখিলেন,
বালিকা নাই, পর্তুত ও শিলারশির মধ্যে
চকলা বালিকা অন্ধকারে লীন হইয়া
গিয়াছে। দূর হইতে খিল্ খিল্ হাস্তধ্বনি
শ্রুত হইল, বালিকা সত্যই বালিকা!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ভীলদিগের পালে।

অংশাবতারমির কৃতান্তস্ত সনোদরমিব পাপস্ত সার-
ধিমিব কলিকালস্ত, ভাষণমপি গভীরমিব উপলক্ষ্য-
মাগং অনতিভবনীয়াকৃতিং * শব্দসেনাপতিমপশ্যম্।
কাদম্বরী।

তখন তেজসিংহ সে হৃদ ত্যাগ করিয়া
পর্তুত আরোহণ করিয়া বালিকার পিতার
কুটীরে যাইলেন। ভীলসদস্যর ভীমচাঁদই
দশমবর্ষীয় বালক তেজসিংহকে আপন
পালের নিকটস্থ গহবরে লুকাইয়া তাঁহার
প্রাণরক্ষা করিয়াছিল; ভীমচাঁদের দয়া ও
প্রভুভক্তিগুণে অদ্য তেজসিংহ অষ্টাদশবর্ষীয়
যৌদ্ধ হইয়াছেন।

সন্ধ্যার সময় সেই পালের প্রতি কুটীরে ভীলনারীগণ আপন আপন গৃহকার্যে রত রহিয়াছে । সকলেরই শরীর বলিষ্ঠ ও উপরি-ভাগ অনাবৃত অথবা অর্ধাবৃত । কেহ কেহ গোবৎসকে আহার দিতেছে, কেহ বা শিশুকে স্তন দিতেছে, কেহ বা আহার প্রস্তুত করিতেছে, আবার কেহ বা এই বৃদ্ধের সময় পালের কটকবেষ্টনে আরও কটক রোপণ করিতেছে । পালের প্রত্যেক কুটীরে রন্ধনের অগ্নি জলিতেছে, অগ্নির চতুর্দিকের বা গৃহের বাহিরে উলঙ্গ বর্ষের শিশুগণ খেলা করিতেছে । মল্লব্যোর বাসস্থান হইতে বহুদূরে শিবরে, পর্বতের দুর্ভেদ্য জঙ্গল-আবৃত ও কটকবেষ্টিত এই তত্ত্বের উপনিবেশ কি বিস্ময়কর । সভ্য মল্লব্য তাহাদিগকে যুগা করে, সভ্য মল্লব্য তাহাদিগের উর্বরা ভূমি কাড়িয়া লইয়াছে, ভীলগণ তাহার প্রতিশোধ দিয়াছে । হিংস্রক পক্ষীর জায় এই পর্বত-বাসী ভীলগণ শতবার লোকালয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে, সভ্য মল্লব্যের লুণ্ঠিতধনে ভীলনারী ও ভীলশিশু পালিত হইয়াছে । ভীমচাঁদের কুটীরে অল্প সেই পালের সমস্ত মোছা আসিয়া জড় হইয়াছে এবং কুটীরের অগ্নিতে সেই ভীলদিগের বিকৃত মুখ ও বিকৃত অব-রব অধিকতর বিকৃত বোধ হইতেছে ।

ভীমচাঁদের সমস্ত শরীর প্রায় উলঙ্গ, কেবল মধ্যদেশ ও বক্ষঃস্থল বস্ত্রাবৃত, বাহ ও পদব্বর অনাবৃত ও সুবন্ধ পেণী-বিজড়িত । মুখমণ্ডল দেখিলে ভয় হয়, নয়নব্বর উজ্জ্বল, শরীর দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ, কিন্তু বাল্যকাল অবধি নৃশংস আচরণে মনের স্নানুসার কোমল প্রকৃতি সমস্ত শুকাইয়া গিয়াছে, সে পর্বত অপেক্ষাও ভীমচাঁদের হৃদয় কঠিন । তথাপি সেই কঠিন হৃদয়েও দুই একটি শুণের পরিচয় পাওয়া বাইত । বিপদের সময় ভীমচাঁদ যেরূপ

সাহসী, সেইরূপ উপায়-উদ্ভাবনে তৎপর, তাহার ভীক নয়ন বহুরূপ হইতে বিপদের চিহ্ন লক্ষ্য করিতে পারিত । ভীমচাঁদ স্বামী-ধর্ম জানিত, মিত্রের মধ্যে সত্যপালন করিত । একমাত্র হুহিতার জন্য সে কঠিন হৃদয়েও নরমতা ছিল ।

ভীমচাঁদের উত্তর পার্শ্বে অজ্ঞাত যে ভীল-গণ বাসিয়াছিল, তাহাদিগের শরীর অনাবৃত, কেবল একখানি কোপীন ভিন্ন অস্ত্র বস্ত্র ছিল না ।

সেই ভীলপালে অল্প দুই জন আশঙ্কক উপস্থিত ছিলেন। পাহাড়জী ভূমিয়া ও চঞ্জ-পুরের গোহুলদাস আজি ভীমচাঁদ ও তেজ-সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া-ছিলেন । পাহাড়জী জাতিতে ভূমিয়া, ভূমি-কর্মণ করা তাঁহার ব্যবসায় । নয়নে ও ললাটে বোদ্ধার দর্প নাই, কিন্তু শরীর বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমে দৃঢ়বদ্ধ । ভূমিমাগণ সন্মুখবৃদ্ধ জানে না, কিন্তু যুদ্ধকালে নিজ নিজ দুর্গ, নিজ নিজ ভূমি প্রাণপণে রক্ষা করিত, দেশের ভিতর শত্রুর গতিরোধ করিত । ফলতঃ যেওয়ারের ভূমিয়া রাজপুতগণ “মিলিশীয়া” বিশেষ ও অজ্ঞাত রাজপুতের ন্যায় বিদেশীয় আক্রমণ হইতে দেশরক্ষায় যৎপরোনাস্তি তৎপর থাকিত । গোহুলদাস একজন “বলী,” পাঠক পূর্বেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । অনেক বরসে অনেক ক্রেশে শরীর শীর্ণ হইয়াছে ; কিন্তু নয়নের উজ্জ্বলতা বা হৃদয়ের উত্তম ও উৎসাহ এখনও অপনীত হয় নাই । তাহার পুত্র হত হইয়াছে ; হত্যাকারীকেও দণ্ড দিবে, কেবল এই আশায় বৃদ্ধ জীবনধারণ করিয়াছে ।

ভীলকুটীরে অগ্নির আলোকের চতুর্দিকে এই সকল লোকসকল আসিয়া আছেন, এরূপ সময় প্রায় ৪৮ দণ্ড রজনীতে তেজসিংহ সেই

কূটরে প্রবেশ করিলেন। সকলে তাঁহাকে আহ্বান করিল।

পরস্পরে অনেক কথাবার্তা হইতে লাগিল। মহারাণা প্রতাপসিংহের কথা হইল, চন্দ্রদেবের কথা হইল, দুর্জয়-সিংহ ও সূর্য্যমহলের কথা হইল। পরে তেজসিংহ কবে সূর্য্যমহল আক্রমণ করিবেন, সকলে তাহাই জিজ্ঞাসা করিল। পাহাড়জী নিজ ভূমি-সমস্তসহিত, ভীমচাঁদ আপন ভীলদিগের সহিত, গোকুলদাস বশীদিগের সহিত তেজসিংহের সহায়তা করিবেন, তেজসিংহকে পিতার রাজগদীতে বসাইবেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন।

তেজসিংহ সকলকে ধন্যবাদ দিয়া ভীমচাঁদের বিশেষ স্নাত্যতি করিয়া কহিলেন, “লোকালয় ত্যাগ করিয়া দশম বৎসর অবধি তিলকসিংহের পুত্র পর্যন্তগহববে বাস করিতেছে। সর্দার ভীমচাঁদের অত্নগ্রহে সে দুর্জয়সিংহের বিজাতীয় ক্রোধ হইতে লুপ্ত-হিত রহিয়াছে, সর্দার ভীমচাঁদের অত্নগ্রহে সে এই আট বৎসর নিরালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছে। ভীমচাঁদের পিতা আমাদের মহারাণার পিতা রাণা উদয়সিংহকে বিপদের সময় রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা আপনারা অবগত আছেন; ভীমচাঁদ এক্ষণে আমাদিগের উপর সেই অত্নগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। ভীলগণ, শত যুদ্ধে শত বিপদে, রাজপুতদিগের সহযোগী ও প্রকৃত বন্ধু।”

ভীমচাঁদ কহিল, “আমি তিলকসিংহকে জানিতাম, সে রূপ রাজপুত আর দেখিব না। তিলকসিংহের পুত্রের জন্ম ভীমচাঁদের যাহা সাধা, তাহা করিবে, ভীমচাঁদের ভীলগণ ধর্ম্মাণ-হন্তে সূর্য্যমহল আক্রমণ করিবে। রাজপুত ভীলদিগের প্রভু, রাজপুতদিগের সহায়তা করা ভীলদিগের প্রধান ধর্ম্ম।

গৃহাগতদিগকে আশ্রয়দান করা ভীলদিগের জাতিধর্ম্ম।”

পাহাড়জী কহিল, “আমিও তিলকসিংহকে বিশেষ জানিতাম।”

পরে বৃদ্ধ গোকুলদাস কহিল, “দুর্জয়সিংহের অত্যাচারে যখন পাহাড়জী ভূমি-একরূপ ক্ষুদ্র হইয়াছেন, তখন ক্ষুদ্র বশীগণ কতদূর উৎপীড়িত হইবে, আপনারা বিবেচনা করিতে পারেন। চন্দ্রপুরে একরূপ বৎসর নাই, একরূপ মাস নাই, একরূপ সপ্তাহ নাই যে, দুর্জয়সিংহের অত্যাচারে প্রজাগণ উৎপীড়িত না হইতেছে। ‘বাহারা বশী, তাহাদের স্বাধীনতা নাই, তাহারা কি করিবে? কেবল অগাঁয় তিলকসিংহের কথা স্মরণ করে, তাঁহার পুত্র জীবিত আছেন কি না, জিজ্ঞাসা করে। পূর্বে আপনার জীবিত থাকার কথা তাহারা জানিত না, সম্ভ্রান্তি না কি দুর্জয়সিংহের সহিত আহেরীয়ার দিন আপনার দেখা হইয়াছিল, এইরূপ শুনিতে পায়। মনে মনে তাহারা দিন গণে, মাস গণে, কালে পিতার গদীতে আপনি বসিবেন, সর্দার সেই প্রার্থনা করে। তিলকসিংহের পুত্র! আদেশ করুন, চন্দ্রপুর প্রভৃতি জায়গার আবাল-বৃদ্ধ দুর্জয়সিংহের বিরুদ্ধে অসিধারণ করিবে। বৃদ্ধ আর কি বলিবে? তাহার নিজের উপর এ বৃদ্ধবয়সে যে অত্যাচার হইয়াছে, জগদীশ্বর তাহার বিচার করুন; কেবল চন্দ্রপুরের প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার আপনি নিবারণ করুন।”

বৃদ্ধের পুত্রহত্যার কথা সকলেই জানিতেন, সকলেই বৃদ্ধের কথা শুনিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন। তেজসিংহ কহিলেন, “পিতার পুরাতন ভৃত্য! তোমার হৃৎকণ্ডে কেবল জগদীশ্বরই সাধনা করিতে পারেন, কিন্তু আমি অস্বীকার করিলাম, পুনরায় পিতার গদী

পাইলৈ চন্দ্রপুর প্রভৃতি গ্রামের বন্দীদিগকে আমি মুখী করিব ।”

এইরূপ অনেক কথাবার্তার পর তেজসিংহ কহিলেন, “আর একটি কথা আছে, আমি আহেরীয়ার দিন নাহারা মগ্নরোতে গিয়াছিলাম ।”

সে ভয়ানক স্থলের নাম শুনিয়া সকলে নিস্তব্ধ হইলেন, চারগীদেবীর নিকট হইতে তেজসিংহ কি জানিয়াছেন, জানিবার জ্ঞাত সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন ।

তেজসিংহ কহিলেন, “চারগীদেবীর আদেশ, বিদেশীয় যুদ্ধ বর্তমানে মেওয়ারের গৃহকলহ ক্ষান্ত হয়, মেওয়ারের এই চিরপ্রথা । তিলকসিংহের পুত্র এই চিরপ্রথা পালন করুন ।”

অনেকক্ষণ পর যুদ্ধ গোহুলদাস বলিল, “ভগবান্ ভানেন, জিবাংসার এ যুদ্ধের শরীর দক্ষ হইতেছে, পুঞ্জশোক অপেক্ষা বিষম শোক এ সংসারে নাই ! তথাপি যুদ্ধের মতে চারগী মাতা যথার্থ আদেশ করিয়াছেন, বত দিন দিল্লীখরের সহিত মহারাণার যুদ্ধ হয়, তত দিন গৃহকলহ ক্ষান্ত হউক !”

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।

রাঠোর-দুর্গ ।

মহু কলভেন যুগপতেরহুতম্ ।

বালবিকারিষিষম্ ।

রজনী এক প্রহর হইয়াছে ; তেজসিংহ ভীল-কুটীর ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে রাঠোর-যোদ্ধা দেবীসিংহের ভীমগড়-দুর্গাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ।

তিলকসিংহের যাবতীয় যোদ্ধার মধ্যে দেবীসিংহ অপেক্ষা বিবাসী অহুচর বা সাহসী সহযোদ্ধা আর কেহ ছিল না । বহুকাল পূর্বে যখন তিলকসিংহের পূর্বপুরুষ স্বর্ধা-মহল প্রথম হস্তগত করিয়াছিলেন, দেবীসিংহের পূর্বপুরুষ তাঁহার দক্ষিণহস্তের স্ত্রীর সকল বিপদে সহায়তা করিয়াছিলেন । স্বর্ধা-মহলের বিজ্ঞেতা সম্ভট হইয়া নিকটস্থ একটি পর্বতে ভীমগড় নামক দুর্গ নির্মাণ করাইয়া অহুচরকে সেই দুর্গে প্রদান করিলেন ।

সেই অবধি পুরুষানুক্রমে ভীমগড়ের যোদ্ধাগণ স্বর্ধামহলের অধীশ্বরদিগের অধীনে যুদ্ধ করিত, শত আহবে আপনাদিগের শোণিতদান করিয়া “স্বামীধর্ম” প্রদর্শন করিয়াছিল ।

দুর্জয়সিংহ কর্তৃক স্বর্ধামহল অধিকার-সময়ে সেই নৈশ যুদ্ধে তিলকসিংহের অধিকাংশ সৈন্য হত হইয়াছিল, কিন্তু সকলে হত হয় নাই । যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারা সে দুর্গে তাগ করিয়া বহুদিন অবধি জঙ্গল ও পর্বতগুহায় বাস করিতে লাগিল, অবশেষে ভীমগড়ে দেবীসিংহের অধীনে কণ্ঠ করিতে লাগিল । তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বালক তেজসিংহকে সেই রজনীতে সম্ভরণ দ্বারা হৃদ পার হইতে দেখিয়াছিল, সুতরাং বালক এখনও জীবিত আছে, এইরূপ স্থিরনিশ্চয় করিয়াছিল । অনেক বৎসর বৃথা অনুসন্ধান করিয়া শেষে দুই একজন পুরাতন ভৃত্য ভীলবেশধারী তিলকসিংহের পুত্রকে চিনিল ; সানন্দে সেই দরিদ্র ভীল-ভিক্কাহারীকে প্রভু বলিয়া অভিবাধন করিল ।

তখন পুরাতন সৈন্যগণ একে একে তেজসিংহের চতুর্দিকে জড় হইতে লাগিল

ও বালককে পিতার হার বিক্রমশালী ও দীর্ঘাকার দেখিয়া আনন্দিত হইল। ক্রমে ক্রমে এ সংবাদ তিলকসিংহের হৃদয় অচ্ছন্ন-দিগের মধ্যে রাস্তা হইল। তাহার সকলে বালককে পুনরায় পাইয়া একবাক্যে কহিল, “আমরা তিলকসিংহের লবণ আবাদন করিয়াছি, আমাদের খণ্ড, আমাদের জীবন তিলকসিংহের পুত্রের। আদেশ করুন, পুনরায় সূর্য্যমহল অধিকার করিয়া আপনাকে পিতার গদীতে উপবেশন করাই।”

প্রাচীন যোদ্ধা দেবীসিংহ সানন্দে প্রভু-পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া ভীমগড়ে আসিয়া বাস করিবার অহুরোধ করিলেন। কিন্তু তেজসিংহ উত্তর করিলেন, “হৃদ্দিনে ভীলগণ আমাকে আশ্রয়দান করিয়াছেন, আমি বস্তু দিন সূর্য্যমহল জয় না করি, তত দিন ভীলকুটারেই থাকিব।”

অন্ত রজনীতে সেই রাঠোরগণ দুর্গের উপর একটি প্রশস্ত স্থানে উপবেশন করিয়া-ছিল। নিকটে বৃক্ষ বা ঘর নাই, পরিষ্কার অন্ধকার নীল আকাশ চন্দ্রাতপের হার সেই বীরমণ্ডলীর উপর লম্বিত রহিয়াছিল। পরিষ্কার আকাশে অসংখ্য তারা দেখা যাইতেছে, নীচে স্থানে স্থানে অগ্নি জ্বলিতেছে, এক এক অগ্নির চতুর্দিকে দুই চারি জন রাঠোর উপবেশন করিয়া অগ্নিসেবন করিতেছে। যোদ্ধাদিগের কথাবার্তা বা হাস্ত-ধ্বনি বা গীতরব সেই নিশার নিস্তব্ধতার বহুদূর পর্য্যন্ত ঞ্চত হইতেছে। স্থানে স্থানে দুই একজন যোদ্ধা অগ্নিপার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, স্থানে স্থানে কোন চারপকে মধ্যবর্তী করিয়া চারিদিকে রাঠোরগণ চার-পের গীত, রাঠোরের পূর্ব্বগৌরবগীত শুনিতেছে। তিলকসিংহের পুত্রকে সংসা দূর

হইতে দেখিয়া সকলে গাঝোখান করিল ও একেবারে পঞ্চশত রাঠোর উল্লাসে গর্জন করিয়া উঠিল। সে উৎসাহ দেখিয়া তেজসিংহ আনন্দিত হইলেন।

অগ্নির আলোক সেই প্রাচীন যোদ্ধা-দিগের লগাট ও মুখমণ্ডলের উপর পতিত হইয়াছে। বালাবস্থা হইতে যুদ্ধবাবসারে তাহাদিগের শরীর দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে, কাহারও লগাটে, কাহারও বদনমণ্ডলে, কাহারও বক্ষস্থলে বা বাহুতে খড়্গচিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। কেশপাশ কাহারও শুক্ল, কাহারও কৃষ্ণ ও শুক্ল, নয়ন সকলেরই উজ্জ্বল। সকলেই রাঠোরশ্রেষ্ঠ তিলকসিংহের অধীনে শতবার যুদ্ধ করিয়াছে, আক্কেবর কর্তৃক চিতোরধ্বংস স্বচক্ষে দেখিয়াছে, এক্ষণে তেজসিংহকে সেনাপতি করিয়া প্রথমে সূর্য্যমহল, তৎপরে চিতোর উদ্ধার করিবার জন্ত জীবন দিতে প্রস্তুত। তেজসিংহ যখন পিতার প্রাচীন সেনাদিগকে আপনার চতুর্দিকে দেখিলেন, তাহাদিগের উল্লাসরব ও আনন্দধ্বনি শুনিলেন, যখন সেই প্রাচীন রাঠোরদিগের যুদ্ধাঙ্কিত বদনে ও উজ্জ্বল নয়নে কেবল স্বামীধর্ম ও উৎসাহের লক্ষণ পাঠ করিলেন, তখন তাঁহার হৃদয় উৎসাহে প্রাবিত হইল, তিনি সজলনয়নে পিতার যোদ্ধাদিগকে একে একে আলিঙ্গন করিলেন। তিলকসিংহের পুত্রের এই নৌজন্ত দেখিয়া পুরাতন রাঠোরগণ পুনরায় উল্লাসে গর্জন করিয়া উঠিল।

তেজসিংহ বলিলেন, “বীরগণ! তোমরাই যথার্থ স্বামীধর্ম প্রদর্শন করিলে, রাঠোর-কুল তোমাদের স্বামীধর্মে গৌরবান্বিত হইবে, তেজসিংহ তোমাদের স্বামীধর্ম বিনশ্ত হইবে না।”

রাঠোরগণ উত্তর করিল, “আমরা স্বর্গীয় তিলকসিংহের প্রতিপালিত, আমা-

দিগের জীবন, আমাদের বয়স তেজ-
সিংহের ।”

প্রাচীন দেবীসিংহ বলিলেন, (ওর
কেশে তাঁহার প্রশস্ত ললাট আবরণ করি-
রাছে, কিন্তু নরনের দীপ্তি আবৃত করিতে
পারে নাই) — “এ দাস তিলকসিংহকে সূর্য্য-
মহলের গদীতে আরোহণ করিতে দেখি-
রাছে, যুদ্ধের পূর্বে তেজসিংহকে সেই
গদীতে বসাইবার বাসনা করে। যুদ্ধের
জীবনে অস্ত্র আকাঙ্ক্ষা নাই ।”

তেজসিংহ। দেবীসিংহ! পিতার
রাঠোরদিগের মধ্যে তোমার ভ্রাতৃ প্রাচীন
কেহই নাই, অথচ হল্লীঘাটার যুদ্ধে
রাঠোরদিগের মধ্যে তোমা অপেক্ষা বীর
কেহ ছিল না। তথাপি তোমার মনস্কামনা
পূর্ণ হইতে বিলম্ব আছে।

দেবীসিংহ। প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য,
কিন্তু প্রভু কি বিষয়ে সন্দেহ করেন? শুনি
রাছি, চন্দাওয়ার দুর্জয়সিংহের একসহস্র সেনা
আছে; পঞ্চশত রাঠোর কি একসহস্র
চন্দাওয়ারদিগের সহিত যুদ্ধদানে অসমর্থ?

তেজসিংহ। রাঠোরের বীরত্বে আমি
সন্দেহ করি না, বিশেষ পিতার অস্ত্রাভ
বন্ধু ও আমার সহায়তা করিতে প্রতিজ্ঞা
করিয়াছেন। পাহাড়জী ভূমিয়ার প্রায় এক
সহস্র ভূমিয়া আছে, ভীমটাদের প্রায় দ্বিশত
ধনুর্ধর ভীল বোদ্ধা আছে, চন্দ্রপুরে প্রায়
দ্বিশত বশী প্রজা আছে, তাহারা সকলেই
তিলকসিংহের পুত্রের জন্ত জীবনদানে
প্রস্তুত।

দেবীসিংহ। তবে যুদ্ধে বিলম্ব কি?

তেজসিংহ। সূর্য্যমহল আক্রমণ করিলে
বিজয়লাভ করিতে পারি, কিন্তু পিতার
যোদ্ধাগণ! তোমাদিগের অধিকাংশকে
হারাইব

দেবীসিংহ। প্রভুর জন্ত জীবনদান
ভিন্ন রাঠোরের আর কি গৌরব আছে?
রাঠোর কি যুদ্ধা ডরে?

তেজসিংহ। রাঠোর যুদ্ধা ডরে না—
পিতা চিতোর-রক্ষার্থে প্রাণ দিচ্ছিলেন।
কিন্তু সূর্য্যমহলে তোমরা প্রাণদান করিলে
পুনরায় হল্লীঘাটার কে যুগ্মবে? বীরগণ!
মাতার হত্যা ও কুলের অবমাননার কথা
তেজসিংহ বিস্মৃত হয় নাই, ধমনীতে যত দিন
শোণিত থাকিবে, তত দিন বিস্মৃত হইবে না,
কিন্তু বিদেশীয় যুদ্ধ বর্তমানে “বৈরি” নিষিদ্ধ।
রাজপুতগণ! রাজপুতধর্ম পালন কর।

প্রাচীন রাঠোর যোদ্ধাগণ সকলে নস্ত-
শির হইল। অনেককণ পর দেবীসিংহ
গম্ভীরস্বরে কহিলেন, “তিলকসিংহের পুত্র
বাহা স্থির করিয়াছেন, তাহাই রাঠোর-
মাজের শিরোধার্য্য, বিদেশীয় শত্রু বর্তমানে
রাঠোর চন্দাওয়ারের ভ্রাতা, চন্দাওয়ার
রাঠোরের ভ্রাতা, স্নেহ ভিন্ন রাজপুতের
আর শত্রু নাই। কিন্তু এ যুদ্ধের পরিণাম
পর্য্যন্ত যদি দেবীসিংহ জীবিত থাকে, চন্দা-
ওয়ার দুর্জয়সিংহ, সাবধান!”

সকল রাঠোর গর্জিয়া—উঠিল—“চন্দা-
ওয়ার দুর্জয়সিংহ, সাবধান!”

এইরূপ উৎসাহবাক্য চারিদিকে স্রব
হইতেছে, ইহার মধ্যে দেবীসিংহের চতুর্দশ
ববীয় পুত্র চন্দনসিংহ ধীরে ধীরে তেজ-
সিংহের সম্মুখে অগ্রসর হইল। বালকের
সুন্দর ললাটে গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশ নৃত্য
করিতেছে, কখনকখনে বাল্যের চপলতা
বিরাজ করিতেছে। বালকের মুখমণ্ডল
কোমল, গুঠ দুটি; রক্তবর্ণ কিন্তু অববব দীর্ঘ,
শরীর এই বয়সেই বলিষ্ঠ ও দৃঢ়বদ্ধ। বালক
ধীরে ধীরে তেজসিংহের সম্মুখে আসিয়া
নভশির হইল।

বালককে দেখিয়া তেজসিংহের পূর্ব-
কথা একবার স্মরণ হইল। একবিন্দু অজ-
মোচন করিয়া কহিলেন, “চন্দন! বালা-
কালে সূর্য্যমহলে তুমি আমার ক্রীড়ার সঙ্গী
ছিলে, তোমার কি মনে পড়ে? আমার
দেখানোষি ছরবৎসর কালের সময় তুমি
জীৱ ও বর্ণা নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিতে,
তাহা কি মনে পড়ে? পিতা একদিন
তোমার ললাট দেখিয়া কহিয়াছিলেন,
‘চন্দন দেবীসিংহের স্তার বীর হইবে,’ তাহা
কি মনে পড়ে?”

সকুতজ্ঞের চন্দন কহিলেন, “প্রভুই
আমার বালাগুরু ছিলেন, প্রভুই আমার
জ্যেষ্ঠ সহোদরের স্তার ছিলেন, তাহা কি
বিশ্বত হইতে পারি? প্রভুই আমাকে
প্রথম রণশিক্ষা দিয়াছেন, এক্ষণে এই তুর্কী-
দিগের সহিত যদি প্রভু আমাকে যুদ্ধবাজার
অমুমতি দান করেন, তবেই কৃতার্থ হই।”

তেজসিংহ। চন্দন! তোমার বরস
অল্প, এক্ষণে দুর্গে রণশিক্ষা কর, যথা-
সময়ে তোমার পিতা তোমাকে যুদ্ধে লইয়া
বাইবেন।

চন্দনসিংহ। চতুর্দশবর্ষীয় রাঠোর কি
তুর্কীদিগের সহিত যুদ্ধিতে সক্ষম নহে?

হাস্ত করিয়া তেজসিংহ কহিলেন,
“সিংহের ঔরসে সিংহশাবকই জন্মগ্রহণ
করে; দেবীসিংহের পুত্র কেন না যুদ্ধের
লজ্জা ব্যত হইবে? চন্দনসিংহ, অচিরেই
জীবণ যুদ্ধ হইবে, সম্ভবতঃ আমাদিগের
সকলেরই যুদ্ধ-সাধ মিটিবে। তোমার
পিতা সর্দার মহারাণার সহিত থাকিবেন,
তুমি এ স্থানে থাকিলে ভীমগড় কে
রক্ষা করিবে? বালক! এই অল্পবয়সেই
তুমি বীর; এই অল্পবয়সেই তোমাকে
আমি ভীমগড়-দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত করিলাম।

তোমার হস্তে রাঠোর-অগ্নির অবমাননা
হইবে না।”

বীরে বীরে চন্দনসিংহ কোঁচ হইতে
অসি বাহির করিল, সেই অসি স্পর্শ করিয়া
বীরে বীরে আকাশের দিকে চাহিয়া অল্প-
বয়স্ক বীর কহিল, “তাহাই হউক! চন্দন-
সিংহ প্রভুর আদেশে ভীমগড় অত্ন হইতে
রক্ষা করিবে; ভগবান সহায় হউন, বত-
ক্ষণ চন্দনসিংহ জীবিত থাকিবে, বতক্ষণ
দুর্গে একজন রাঠোর জীবিত থাকিবে, তত-
ক্ষণ এ দুর্গে তুর্কীর প্রবেশ নাই।”

বালকের এই পণ শুনিয়া রাঠোরমণ্ডলী
সাদুবাদ করিতে লাগিল, প্রাচীন দেবী-
সিংহের নরন হইতে আনন্দাশ্রু বহিতে
লাগিল। কিন্তু রাঠোরগণ জানে না, প্রাচীন
দেবীসিংহ জানে না, কিরূপ ভয়ানক শোণিত-
স্রোত ও অগ্নিরাশির মধ্যে এই বিবম পণ-
রক্ষা হইবে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

চন্দাওয়ৎ-দুর্গ।

অখাজিনাবাচবরঃ প্রগল্ভবাক্.

অলরিব ব্রহ্মময়ল তেজসা।

বিশেষ কচ্ছিত্তলম্ভশোবনঃ,

সরীরবতঃ প্রথমাশ্রমো যথা ॥

কুমারসম্ভবম্।

পাঠক! চল, আমরা ভীমগড় ত্যাগ
করিয়া একবার সূর্য্যমহলে গমন করি,
তথায় সূর্য্যমহলেবর দুর্জয়সিংহের সহিত
সাক্ষাৎ করি।

হলদীবাটার যুদ্ধান্তে দুর্জয়সিংহ সূর্য্য
মহলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। প্রাতঃ-

কালে স্বর্ধামহল-পর্বতচূড়া হইতে চন্দাও-
রং-পাতাকা উড়ত। হইতেছে ও চন্দাওরং-
রংবাণ চারিদিকে শবিত হইতেছে। “দয়ী-
শালার” অর্থাৎ সভাগৃহে দুর্জয়সিংহ উপ-
বেশন করিয়াছেন, উভয় পার্শ্বে তাঁহার
সহোদ্রাগণ ঢাল ও ধুলাহস্তে উপবেশন
করিয়াছেন। চতুর্দিকে দুর্জয়সিংহ দুর্গে-
ষরকে দেখিতে আসিয়াছে; নাগরিকগণ
পরস্পরে হলদীঘাটার ও তুর্কীদিগের বিবর
কথোপকথন করিতেছে; পুরনারীগণ সুহে-
লীয়া অর্থাৎ মঙ্গলগীত গাইয়া যুদ্ধপ্রভাবত
চন্দাওরং-বীরদিগকে আহ্বান করিতেছে।

সভাগৃহের ভিতর দুর্জয়সিংহের উভয়
পার্শ্বে তাঁহার বোদ্ধগণ বসিয়াছিলেন।
কয়েকমাস পূর্বে এই সভাস্থলে যে সমস্ত
বীর উপবেশন করিয়াছেন, হায়! তাঁহা-
দিগের মধ্যে অনেকে অস্ত্র আর এ জগতে
নাই! তাঁহাদিগের বীরত্ব ও অকালমৃত্যু
স্মরণ করিয়া সকলেই শত ধন্যবাদ করিতে
লাগিলেন; বীরগণ সেইরূপ সম্মুখযুদ্ধে স্বদে-
শের জন্ত প্রাণ দিতে পারেন, এই আকাঙ্ক্ষা
করিতে লাগিলেন। অতঃপর তাঁহারা সভায়
বর্তমান আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকে
শরীরে যুদ্ধাক বহন করিতেছিলেন, কাহা-
র পলট, কাহারও দীর্ঘ জাম্ব, কাহারও
বিশাল বক্ষঃস্থল, খড়্গ বা বর্শা বা গুলীর
অনপনের অঙ্কে অঙ্কিত হইয়াছে।

সভাগৃহের একপ্রান্তে দুর্জয়সিংহের
“গোলা” অর্থাৎ দাসগণ দণ্ডায়মান হইয়া-
ছিল। ইহারা যুদ্ধকালে প্রভুর পার্শ্ব কখনও
পরিভ্রাণ করে না। হলদীঘাটার যুদ্ধে দুর্জ-
য়ের সহিত প্রায় এক শত “গোলা” গমন
করিয়াছিল, তাহার মধ্যে পঞ্চাশ জনও
কিহিয়া আইসে নাই! গোলাগণ চিরদাস,
তাহাদিগের “গোলা” ভিন্ন অস্ত্র কাহারও

সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ, তাহাদিগের পুত্রকন্যাও
দাস-বানী। গোলাদিগের জীবন-মরণ প্রভুর
হস্তে, তাহারা প্রভুভক্তি ভিন্ন অন্য ধর্ম
জানিত না। গৃহপ্রান্তে দুর্জয়ের ত্রিংশ কি
চত্বাশিংশ “গোলা” বিনীতভাবে দণ্ডায়মান
রহিয়াছে, তাহাদিগের দক্ষিণ-পদে রোপা-
নির্ধিত বলয় শোভা পাইতেছে।

দুর্জয়সিংহ যুদ্ধের কথা কহিলেন।
বর্ষার শেষে যুবরাজ সলীম ও তুর্কীগণ কি
পুনরায় আসিবেন? রাজা মানসিংহ কি
যদেদশবাসাদিগের শোণিতপাতে এখনও ভুট
হন নাই? যদি না হইয়া থাকেন, মেও-
য়ারের শিশোদীয়গণ আরও শোণিতদানে
সম্মত আছেন, তুর্কীগণ পুনরায় আসিলে
শিশোদীয়গণও পুনরায় রণরঙ্গে তাহাদিগকে
আহ্বান করিবেন। যত দিন শিশোদী-
য়ের একজন বীর জীবিত থাকিবে, যত
দিন চন্দাওরং-ধমনীতে শোণিত প্রবাহিত
হইবে, তত দিন মেওয়ারভূমি পরাধীনতার
কলঙ্করেখা ললাটে ধারণ করিবেন না।

এইরূপ কথা হইতে হইতে চারণদেব
তথ্য উপস্থিত হইলেন। দুর্জয়সিংহের অমু-
মতিক্রমে চারণদেব হলদীঘাটার একটি গীত
আরম্ভ করিলেন। যুদ্ধ চারণ স্বয়ং সেই যুদ্ধ
অবলোলন করিয়াছিলেন, প্রতাপসিংহের
দুর্জয়নীর সাহস অবলোকন করিয়াছিলেন,
চন্দাওরংকুলের অপ্রতিহত বীর্য অবলোকন
করিয়াছিলেন, তাহাই গাইলেন। বাক্যসাধারণ
মহন করিয়া গম্ভীরভাষায় গম্ভীরস্বরে হলদী-
ঘাটার গম্ভীর গীত গাইলেন। সভা নিমন্ত্রণ ও
শব্দশূন্য, চারণের উচ্চগীত সভাগৃহে প্রতিধ্বনিত
হইতে লাগিল। শেষ যখন চারণদেব চন্দা-
ওরংদিগের বীরত্ব-কথা বলিতে লাগিলেন,
যখন বর্শাধারী রক্তাপ্রত দুর্জয়সিংহের ভীম-
মূর্তি ও দুর্জয়নীর বীরত্ব বর্ণনা করি। গীত

সমাপ্ত করিলেন, তখন একেবারে সভাগৃহ
যোদ্ধাদিগের উল্লাসরবে পরিপূর্ণ হইল ।

বৃদ্ধ চারণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটি বুঝা
চারণ সভাগৃহে আসিয়াছিল, সেও একটি
গীত গাইবার অহুমতি চাহিল ।

দুর্জয়সিংহের দিকে লক্ষ্য করিয়া সে
কহিল, “চন্দাওরবীর ! রাজচারণ যে গীত
গাইলেন, আমি সেইরূপ গাইব, এরূপ সাধ্য
নাই, তথাপি সভাস্থ সকলে যদি প্রসন্ন
হন, তবে আকবর কর্তৃক চিতোরদুর্গ অ-
পর্যবসায় একটি গীত গাইব । আকাশের যে
বৃষ্টিতে শাল, তমাল, অশ্বথ প্রভৃতি বৃহৎ
বৃক্ষ পুষ্ট হয়, তৃণদূর্বাও কি তাহাতে পুষ্ট
হয় না ? সাধুদিগের অহুমতি হইলে ক্ষুদ্র
কবিও একটি কবিতা রচনা করিতে সক্ষম ।
সাধুগণ কি সে অহুমতি দান করিবেন ?”

দুর্জয়সিংহ । চারণদেব ! তোমার বিনীত
ভাব দেখিয়া তুষ্ট হইলাম । তুমি আমাদের
অপরিত, কিন্তু বীর ও কবিদিগের গুণই
পরিচয় । গীত আরম্ভ কর :

তীব্রস্বরে কবি গীত আরম্ভ করিলেন,
সভাস্থ সকলে সবিস্ময়ে শ্রুতিতে লাগিলেন ।
গীত ।

“সে উন্নত দুর্গ কাহার ?

যাহারা বংশোদ্ভূতের রক্ষা করিয়াছে,
তাহাদিগের ? অথবা যাহারা তত্ত্বের স্তায়
অপহরণ করিয়াছে, তাহাদিগের ?

তত্ত্বের অবমাননা হইবে । তত্ত্বের
হৃদয়শোণিতে রাজপুত-খড়্গ রঞ্জিত হইবে ।

সে উন্নত দুর্গ কাহার ?

যে নারী দুর্গরক্ষার্থ বৃদ্ধ দান করে,
তাহার ? অথবা যে নারী-হত্যা করিয়া *
দুর্গ অধিকার করে, তাহার ?

*চিতোর-দুর্গ-বিজয়ের সময় পত্নের বাত ও বিনীত
বহবে বোধদিগের সহিত যুদ্ধদান করিয়া হত হন ।

নারী-হত্যাচারী অবমানিত হইবে,
নারীহত্যাচারীর হৃদয়-শোণিতে রাজপুত
খড়্গ রঞ্জিত হইবে ।

সে উন্নত দুর্গ কাহার ?

যে বালকের সম্পত্তি অপহরণ করে,
তাহার ? অথবা যে বীরবালক * অস্ত্র
পর্বতকন্দরে বাস করিতেছে, তাহার ?

বালক এখন খড়্গধারণ করিয়াছে,
হলদীবাটার যুদ্ধে যুদ্ধস্বাত হইয়াছে ! তত্ত্বের
হৃদয়-শোণিতে তাহার খড়্গ রঞ্জিত
হইবে !

সে উন্নত দুর্গ কাহার ?

দুর্গরক্ষার্থ যে বীরগণ হত হইয়াছে,
দুর্গচ্যুত হইয়া যাহারা পর্বতে বাস করি-
তেছে, দুর্গ তাহাদিগের ।

পুনরায় রাজপুত দুর্গ আক্রমণ
করিবে, শত্রুরক্তে রঞ্জিত করিয়া দুর্গ
অধিকার করিবে ।”

গীত ক্ষান্ত হইল ; যুবকের অগস্ত্য নয়ন
দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল । সকলে উচ্চৈঃ-
স্বরে কহিয়া উঠিল, “তুর্কীরক্তে অসি রঞ্জিত
করিয়া রাজপুতগণ চিতোর-দুর্গ অধিকার
করিবে !”

দুর্জয়সিংহ উৎসাহবাক্য দিলেন না,
দুর্জয়সিংহ সাধুবাদ করিলেন না, অকুটপূর্বক
ভূমির দিকে চাহিয়া রহিলেন ! ক্ষণেক পর
পুনরায় চারণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন,
চারণ সভাস্থলে নাই !

*চিতোর-বিজয়ের সময় এতাদৃশিগের পিতা
জীবিত ছিলেন, হতয়া এতাদৃশ যুবরাজ ছিলেন না ।
হলদীবাটার যুদ্ধের সময় এতাদৃশ পর্বতে ও কন্দরে
সপরিবারে বাস করিতেন ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ।

গায়ক কে ?

অলঙ্কারাশ্রিত জাহ্নবীকুলং যুবক ।

নিরীক্ষ্য কত্রিভুবনে নম যো ন পতো ভয়ক ।

বিহুপুত্রাশ্রয় ।

রজনী এক প্রহরের সময় দুর্জয়সিংহ ছাদে শয়ন করিয়া রহিলেন, তাঁহার মস্তক একজন গোলীয়ার অঙ্কে স্থাপিত, অস্ত্র একজন গোলী তাঁহার পদসেবা করিতেছে । উভয়ে প্রৌঢ়োবনসম্পন্ন ও রূপবতী, কিন্তু তাহাদের সেবায় অস্ত্র দুর্জয়সিংহের চিন্তা দূর হইতেছে না । *

দুর্জয়সিংহ অনেককণ চিন্তাকুল হইয়া শয়ন করিয়া রহিলেন, অবশেষে প্রধানকে ডাকাইবার আদেশ দিলেন । উঠিয়া ধীরে ধীরে ছাদে পদচারণ করিতে লাগিলেন, গোলীগণ গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেল ।

কণেক পর প্রধান অর্থাৎ মন্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন । দুর্জয়সিংহ কহিলেন, “আমি যুদ্ধবাজ্রাঙ্কালে যে আদেশ দিয়াছিলাম, তাহা সম্পন্ন হইয়াছে ?”

প্রধান । সেইকণেই আমি নানা দিকে চর পাঠাইয়াছি । কেহ কেহ ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহাদের পুনরায় পাঠাইয়াছি ।

* পাঠক জানেন, রাজস্থানের রাজ্যভ্রম অনেক অংশে ইউরোপের কিউডল রাজ্যভ্রমের সদৃশ । বহা-
রাণার অধীনে ভিন্ন ভিন্ন স্থানাবধি যোদ্ধা ছিলেন, তাঁহাদের অধীনে নিরস্ত্রশীল যোদ্ধা ছিলেন, প্রত্যেকের স্ব স্ব দুর্গ, ভূমি-সম্পত্তি ও প্রাণ ছিল, আবার সকলেই শ্রেণীকর্ত্তে বহারাণার অধীন । রাজস্থানের দুইপ্রকার দাস—“রনা” ও “গোলা ।” কিউডলসম্বন্ধের “Colioni” এবং “Slaves” দিগের সদৃশ । ভূমিরাগণ এক কুবিধাবী “Militia” সম্ভ্রমায় ।

কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ তিলকসিংহের পুত্রের কোন সন্ধান করিতে পারে নাই ।

দুর্জয়সিংহ । বস্ত্র ভীলদিগের মধ্যে, পুরুষ ও স্ত্রীসকলের মধ্যে বিশেষ অহুসন্ধান করিতে বলিয়াছিলেন ?

প্রধান । তাহাদিগের মধ্যেই বিশেষ অহুসন্ধান করিতেছে ।

দুর্জয়সিংহ অধোবদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ।

প্রধান । প্রভু, এরূপ চিন্তিত হইবেন না । যদি সেই তেজসিংহ এখন জীবিত থাকে, তাহা হইলে সে প্রভুর কি করিতে পারে ?

দুর্জয়সিংহ । যদি ? তেজসিংহের জীবিত থাকার বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে ?

প্রধান । প্রভু বলিয়াছিলেন, রজনীতে কেবল একদিনমাত্র দেখিয়াছিলেন, তাহাতে ভ্রম কি অসম্ভব নহে ? সে জীবিত থাকিলে আমাদের চর তাহাকে পায় না কি সস্ত্র ? সেই বা এতদিন নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেই কি সস্ত্র ? প্রভু, মিথ্যা চিন্তা করিবেন না, ঐ হৃদগর্ত্তে তেজসিংহ বহুদিন প্রাণত্যাগ করিয়াছে !

দুর্জয়সিংহ । প্রধান ! সেই একদিন নিশীথে দেখিলে সন্দেহ করিবার স্থান ছিল বটে, কিন্তু সেই বালককে দুইবার, বোধ করি, তিনবার দেখিয়াছি ।

প্রধান । কবে ?

দুর্জয়সিংহ । ভীলগণ বা ভূমিরাগণ কবে বর্ষা নিক্ষেপ করিতে জানে ? হল্লীঝাটার যুদ্ধের দিন এক দল ভীল ও ভূমিরাবোধী বর্ষা ও অসি-হস্তে মানসিংহের সেনাকে আক্রমণ করিয়াছিল ।

প্রধান । এ বথার্থ বিষয়ের কথা ।

দুর্জয়সিংহ । বিষয় কিছুমাত্র নাই, তাহার ভীল নহে । কয়েকজন রাঠোর-

যোদ্ধা ভীলবেশে আসিয়াছিল, তাহাদিগের সঙ্গারকে আমি চিনিরাছিলাম ; সে সেই যুবক ! চিতোরধ্বংসের সময় জয়মলের পার্শ্বে তিলকসিংহকে আমি যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি, অশ্রুবলে চিতোরের দ্বার রক্ষা করিতে দেখিয়াছি, তিলকসিংহের বালক পিতার অপেক্ষা যুদ্ধে নান নহে।

মন্ত্রী মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। দুর্জয়সিংহ আরও বলিতে লাগিলেন, “সেই হিন্দী-ঘাটার যুদ্ধের দিন বালককে দেখিয়া আমার হস্তের বর্শা কম্পিত হইয়াছিল, দুর্জয়সিংহের বর্শা মিথ্যা হয় না, এক আঘাতে জগৎ হইতে দুর্জয়সিংহের চির-শত্রুকে দূর করিবার অভিলাষ হইয়াছিল ! কিন্তু আহেরীয়ার দিন স্মরণ হইল, বর্শা আমার হস্তেই রহিল।”

প্রধান। আহেরীয়ার দিন বালক আপনার জীবনরক্ষা করিয়াছিল বলিয়া কি সে অবধ্য ?

দুর্জয়সিংহ। তাহা নহে; কিন্তু বিদেশী-শত্রু উপস্থিত আছে বলিয়া তেজসিংহ আহেরীয়ার দিন আমার সহায়তা করিয়াছিল, বিদেশী-শত্রু বর্তমান থাকিতে দুর্জয়সিংহ গৃহকলহে হস্ত কলুষিত করিবে না।

প্রধান। তবে অঘেষণ কি জন্ত ?

দুর্জয়সিংহ। যে দিন দিল্লীর সহিত যুদ্ধশেষ হইবে, সেই দিন দুর্জয়সিংহ হৃদয়ের কণ্টকোদ্ধার করিবে। সেই জন্ত পূর্বে হইতে তাহার আবাস জানা আবশ্যক।

প্রধান। অঘেষণে আমার ক্রটি নাই, কিন্তু এ পর্যন্ত কোন উদ্দেশ্য পাই নাই। প্রভু তৃতীয়বার তাহাকে কোথায় দেখিয়াছিলেন ?

দুর্জয়সিংহ অনেকক্ষণ পর্যন্ত এ প্রশ্নে উত্তর দিলেন না, তাহার মুখ ক্রমে অন্ধুটি

ধারণ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর দুর্জয়সিংহ ক্রোধকম্পিতস্বরে মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “অথ বে চারণের গীত শুনিলেন, তাহার অর্থ কি ?”

মন্ত্রী। চারণ চিতোর পুনরুদ্ধারের গীত গাইয়াছিল।

সরোবে দুর্জয়সিংহ উত্তর করিলেন, “যুধা মন্ত্রীস্বকর্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন। উঃ, সেই অবধি আমার মন সন্দেহ-পূর্ণ রহিয়াছে, কিন্তু সন্দেহের আর কারণ নাই। নয়নের ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু জিহ্বাংসাপূর্ণ হৃদয় ভ্রান্ত হয় না। সেই চারণকে দেখিয়া অবধি প্রজলিত হতাশনের স্রায় আমার জিহ্বাংসা উদ্দীপ্ত হইয়াছে। মন্ত্রিবর, সেই তীব্র গীত চিতোর-ধ্বংসবিষয়ক নহে, সে দুর্জয়সিংহ কর্তৃক সূর্য্যমহল-ধ্বংসবিষয়ক ! অটোজ্ঞানিত সেই জলন্ত নয়নধারী চারণ নহে, সেই তিলকসিংহের পুত্র তেজসিংহ।”

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

উদ্ধানের পুষ্ক।

অন্যাত্তং পুষ্কং কিণ্ডলয় মল্লং করুহৈ-
রনাবিভং রত্নং যধু নবনবাধাদিত্য।
অধত্তং পুণ্যাবাং কলমিব চ তত্ৰপ্লবনযং
নজনে ভোক্তারং রমিহ সপুণ্যাত্ততি বিধিঃ ॥
অভিজ্ঞানশত্ৰুত্বলম্।

পাঠক ! চল, দুর্জয়সিংহের প্রাসাদ হইতে অনতিদূরে সেই পর্ব্বতের উপর অত্র একটি স্থানে আমরা গমন করি। চন্দ্র উদিত হইয়াছে, বাইতে কষ্ট হইবে না। যদি পরিশ্রান্ত হইয়া থাক, স্নানর পুশোদ্ধানে কণেক বিশ্রাম করিব।

রজনী দ্বিপ্রহর হইয়াছে, কিন্তু এই নিঃশব্দ রজনীতে এখনও সূর্য্যমহল-পর্ব্বতের উপর একটি পুষ্পোত্থানে একজন রাজপুত্র-বালিকা একাকী পদচারণ করিতেছেন। উত্থানে জীব-মাত্র নাই, শব্দমাত্র নাই, বালিকা একাকী সেই স্নিগ্ধ চন্দ্রকরে পদচারণ করিতেছেন। কখন স্থির উজ্জ্বল-নয়নে সেই নীলনভোমণ্ডলের দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন, কখন ছুই একটি শিশিরসিক্ত পুষ্প তুলিতেছেন, কখন বা চিন্তাকুল হইয়া ছুই একটি গীতের অংশ-মাত্র মুহূৰ্ত্তের গাইতেছেন।

সেই দীর্ঘাকৃতি তম্বকীকে চন্দ্রকরে একাকিনী দেখিলে মানবী বলিয়া বোধ হয় না, চন্দ্রলোকবাসিনী উদ্যানবিচারিণী অপ্সরা বলিয়া ভ্রম হয়। বালিকার বয়ঃক্রম চতুর্দশবর্ষ হইবে। মুখমণ্ডল অতিশয় সূন্দর, ললাট পরিষ্কার, নয়ন দুটি উজ্জ্বল ও তেজঃপূর্ণ, মুখমণ্ডল ও শরীর লাবণ্যময় ও পুষ্প অপেক্ষা কোমল, বালিকার নাম পুষ্পকুমারী। মুখখানি ভাল করিয়া দেখিলে বোধ হয়, অল্পবয়সেই কোন কিস্তি সেই সূন্দর ললাটে আপন আবাসস্থল করিয়াছে। নয়ন দুটি ভাল করিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন, কোন অচিন্তনীয় শোক সেই সূন্দর নয়নে আশ্রয় লইয়াছে।

চন্দ্রলোক বৃক্ষপত্র ও পুষ্পের উপর রৌপ্যের ত্রায় পতিত হইয়াছে। নিশীথ-পুষ্প-গণ যেন নিজ বক্ষে আবরণ ত্যাগ করিয়া শীতল বায়ুতে শরীর জুড়াইতেছে। পুষ্প রজনীতে শিশিরাক্ত পুষ্প চয়ন করিতে বড় ভাল-বাসিতেন, সেই চন্দ্রকরোজ্জ্বল উত্থানে নীরবে পুষ্পচয়ন করিতে আসিয়াছিলেন।

সেই ললিত বাহর উপর, সেই অনাবৃত স্বর্গের উপর, সেই পরিষ্কার ললাটের উপর শীতল চন্দ্রকর পতিত হইয়াছে। গুচ্ছ গুচ্ছ কেশের মধ্যে চন্দ্রকর যেন নীরবে প্রবেশ

করিতেছে, যেন নীরবে সেই প্রশান্ত উজ্জ্বল নয়নদ্বয় চূষন করিতেছে।

এ কি প্রকৃত, না স্বপ্ন? এই চন্দ্রদেশ হইতে কি চন্দ্রসত্ত্ববা কোন অপ্সরা জগতের পুষ্প-চয়ন করিতে আসিয়াছেন? কল্পনাসক্তি কি অপূর্ণ সূন্দর নিশীথে একটি অপরূপ মায়াযুক্তি গঠন করিয়াছে? না জগতের কোন মানবীর এই ললিত বাহুগুল, এই স্বর্গোল ললাট ও গণ্ডস্থল, এই সূন্দর রক্তবর্ণ ও চন্দ্রকরোজ্জ্বল প্রশান্ত স্নেহগর্ভ নয়নদ্বয়। নিশীথের শীতল বায়ু ধীরে ধীরে গণ্ডস্থলের উপর ছুই একটি কেশ লইয়া ক্রোড়া করিতেছে, নিশীথের চন্দ্রকর নীরবে সেই বিছোঠের পরিমল পান করিতেছে।

সহসা সেই নিস্তব্ধ নিশীথে দূর হইতে একটি বীণাধ্বনি শ্রুত হইল, যেন স্বর্গীয় সঙ্গীতে মুহূৰ্ত্তের জন্ত জগৎ মোহিত করিল, আবার ধীরে ধীরে লয় প্রাপ্ত হইল।

সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত-বিনিমিত্ত্বের যেন একটি নাম উচ্চারিত হইল—“পুষ্প”!

নিস্তব্ধ রজনীতে এই মধুর শব্দ পুষ্পের কর্ণে আঘাত করিল, চকিতের ত্রায় পুষ্প ফিরিয়া দেখিলেন। সেই স্নিগ্ধ প্রশান্ত নয়ন ফিরাইয়া পুষ্প চাহিয়া দেখিলেন, গ্রীবা ঈষৎ বক্র, গুণ্ডদ্বয় ঈষৎ ভিন্ন, যেন সেই শব্দটি পুনরায় প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন।

পুনরায় সঙ্গীতশব্দ হইল, পুনরায় নাম উচ্চারিত হইল—“পুষ্প!”

যে দিক্ হইতে শব্দ আসিভেছিল, পুষ্প সে দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, প্রাচীরের বাহিরে একটি নির্জন বৃক্ষতলে বসিয়া একজন চারণ বীণা বাজাইয়া গীত আরম্ভ করিতেছে। পুষ্প চারণদিগের গীত বড় ভালবাসিতেন, ধীরে ধীরে চারণের নিকটে

আসিয়া একটি বৃক্ষের অন্তরাল হইতে গীত শুনিতে লাগিলেন।

গীত।

“রাজপুত কামিনীপণ, পুরাকালের একটি গীত শুন, সত্যপালনের একটি গীত শুন। সম্ভববর্ষা একটি বালিকা ও দশমবর্ষের একটি বালকের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, বালক-বালিকা পরস্পরকে বরণ করিল। বালিকা সত্য করিলেন, সেই বালক ভিন্ন আর কাহাকেও গ্রহণ করিবেন না। রাজপুত-বালিকা সত্যভঙ্গ করে না।

বিপদ-মেঘরাশির ভ্রায় গগন আচ্ছন্ন করিল। সে বালক কোথায় গেল? বৃক্ষে হত হইল বা জলে মগ্ন হইল, কে বলিবে, বালক কোথায় যাইল? জগৎ সে বালককে বিস্মৃত হইল, বালিকাও কি তাহাকে বিস্মৃত হইলেন? রাজপুত-বালিকা সত্যভঙ্গ করে না।

চন্দাওয়ংকুলের পরাক্রান্ত বীর সেই বালিকার পাণিগ্রহণে অভিলাষী হইলেন, সে বীরের ঐশ্বর্য অতুল, পরাক্রম অসীম, বশে দেশ পরিপূরিত হইয়াছে। বালিকা কি সে ঐশ্বর্য দেখিয়া সত্যকথা ভুলিলেন? রাজপুত-বালিকা সত্যভঙ্গ করে না।

চন্দাওয়ং লোভ প্রদর্শন করিলেন। বালিকা কহিলেন, ‘আমি রাঠোরকে সত্য দান করিয়াছি।’ চন্দাওয়ং ভয়-প্রদর্শন করিলেন, বালিকা কহিলেন, ‘আমি রাঠোরকে ঠুসাত্যদান কবিরাজি।’ চন্দাওয়ং বল পূর্বক বালিকার পাণিগ্রহণ করিতে চাহিলেন, বালিকা বলিলেন, “চন্দাওয়ং-বীর অপেক্ষা মৃত্যু বলবান্।” রাজপুত-বালিকা সত্যভঙ্গ করে না।

রাঠোর কোথায়? পূর্বতগন্ধরে বাস করিতেছে, ভিকাল-ক অন্ন ভোজন

করিতেছে, মহারাণার বৃক্ষ ঘূরিতেছে। রাজপুতনারী যদি সত্যবতী হন, রাজপুতবীর অবশ্য জরী হইবেন। রাজপুতনারী যদি সত্যবতী হন, রাঠোর সত্য ভঙ্গ করিবেন না। রাজপুত-বালিকা কখনও সত্যভঙ্গ করে না।”

পুষ্প এই গীত শ্রবণ করিয়া যেন স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। যতক্ষণ বায়ুতে সেই সঙ্গীতের মিষ্ট লীন না হইল, ততক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সে গীতে যেন বালিকার হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল, হৃদয়ের গুঢ় ভাব-সমূহের উদ্বেক হইল। পুষ্প ধীরে ধীরে বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বাহির হইলেন।

চারণদেব সেই লাবণ্যময়ীর দিকে একবার নেত্রপাত করিলেন, পুনরায় ভূমির দিকে নয়ন ফিরাইয়া কহিলেন, “এ নিশ্চয় রজনীতে কি আমার অকিঞ্চিৎকর গীতে কুমারী পুষ্পকে বিরক্ত করিলাম? কানন-বাসী চারণের শ্রোতা কেহ নাই, কুমারীও যদি বিরক্ত হইয়া থাকেন, আদেশ করিলে চারণ পুনরায় কাননে ফিরিয়া যাইয়া নিরঞ্জন বসিয়া আপনার গীত গাইবে।”

আহা! সঙ্গীত হইতেও চারণের এই নম্র কথাগুলি মিষ্ট! বলিতে বলিতে চারণ ধীরে ধীরে বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, চন্দ্রালোকে তাঁহার অবয়ব দেখিয়া পুষ্প আরও বিস্মৃত হইলেন। যৌবনের তেজঃপূর্ণ কান্তিতে সে উন্নত বপুঃ পূর্ণ রহিয়াছে, দীর্ঘ বাহুতে বীণা ঝলত রহিয়াছে, উন্নত ললাটে ও উজ্জল নয়নদ্বয়ে চম্কে পতিত হইয়াছে। তঁহাণি গেই ললাট ও নয়ন সেই পরিশ্রমে বা শোক ঈষৎ ঘন, ঈষৎ চিক্কাণীল। চারণ পুনরায় সেইরূপ ভূমির দিকে নয়ন ফিরাইয়া কহিলেন, ‘কুমারী আদেশ করিলে চারণ আপা

নির্জন কাননে প্রত্যাভর্তন করিবে! কুমারীর শ্রবণের উপযুক্ত গীত সে কোথায় পাইবে?”

পুষ্প আর সংবরণ করিতে পারিলেন না, অবশেষের ভিতর হইতে অক্ষুটস্বরে কহিলেন, “চারণদেব, এ গীত কোথায় শিখিলেন?”

পূর্ববৎ ধীরে ধীরে চারণদেব কহিলেন, “গহ্বরে ও কাননে কাহার বাস, গহ্বরে ও কাননে তাঁহার নিকট শিখিয়াছি।”

পুষ্প। গহ্বরে ও কাননে কাহার নিবাস?
চারণ। যিনি পৈতৃক দুর্গ হারাইয়াছেন, শিশুকাল অবধি বনে বনে বিচরণ করিতেছেন।

পুষ্প আর উদ্বেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না, এবার উচ্চতরস্বরে কহিলেন, “চারণদেব! একজন অভাগিনী রাজপুতবালার ধৃষ্টতা মার্জনা করুন, সে রাঠোরবীর কি জীবিত আছেন?”

চারণ। হলদীবাটার যুদ্ধে রাঠোরের খড়্গা দৃষ্ট হইয়াছিল; পুনরায় স্নেহগণ আসিলে পুনরায় রাঠোর-খড়্গা দৃষ্ট হইবে।

সাম্প্রদায়িক পুষ্পকুমারী কহিলেন, “জগদীশ্বর তাঁহাকে কুশলে রাখুন!”

চারণদেব তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেবি! যদি চারণের ধৃষ্টতা মার্জনা করেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, সে রাঠোরকে কি কখনও আপনি দেখিয়াছেন? বাহাকে জগৎ বিন্ধিত হইয়াছে, বাহাকে বহু-বান্ধব বিন্ধিত হইয়াছে, যে ভীল বা ভূমিয়ারদিগের ভিক্ষাহারী, নিবিড় কানন বা পর্বতকন্দরবাসী, এ জগতে কি একজনও তাহার চিন্তা করে?”

চারণের স্বর কম্পিত হইল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, অতি কষ্টে শেষে কহিলেন, “আমিও গহ্বরবাসী, সেই রাঠোরের সজিত

পুনরায় সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারে, কেবল এই জন্ত জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার নিকট কি কিছু বলিবার আছে?”

পুষ্প। কেবল একমাত্র বলিবার আছে, রাজপুতরমণী সত্যপালন করিতে জানে, রাজপুতবালী সত্যপালন করিবে।

চারণ। তবে কি সে রাঠোর দেবীর পূর্বপরিচিতি?

এবার পুষ্প লজ্জিতা হইলেন, ধীরে ধীরে কহিলেন, “সে বীর এ অভাগিনীর অপরিচিত নহেন।”

অনেকক্ষণ উভয়ে নিমন্ত রহিলেন, অনেকক্ষণ পর চারণ পুনরায় কহিলেন, “দেবি! যে দিন আমাকে তেজসিংহ এই গীত শিখাইয়াছিলেন, সেই দিন এই স্বর্ণ অঙ্গুরীয়টি আমাকে দেখাইয়া আজ্ঞা করিয়াছিলেন, ‘গীতোজ্জিহ্বিতা বীরনারীর সহিত যদি কখনও দেখা হয়, আমার সত্যের নিদর্শন-স্বরূপ এই অঙ্গুরীয়টি তাঁহাকে দিও।’ অতঃপর দেবীকে দেবিতা পাইলাম, যদি আদেশ করেন, যদি ধৃষ্টতা মার্জনা করেন, ঐ অঙ্গুরীতে অঙ্গুরীয়টি পরাইয়া দি।”

লজ্জাবতী পুষ্প সেই দেবনির্মিত তরুণ-বয়স্ক চারণের দিকে চাহিলেন, ঈষৎ কম্পিত হইয়া হস্ত প্রদারণ করিলেন। তাঁহার দেহ-লতা কাঁপিতেছিল—কি জন্ত?

চারণদেব ধীরে ধীরে সেই অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিলেন, সেই পুষ্পবিনির্মিত কোমল হস্ত অনেকক্ষণ আপনার হস্তে ধারণ করিয়া রাখিলেন। পুষ্প নয়ন মূণিত করিয়াছিলেন, পুষ্পের বোধ হইল যেন, চারণের দীর্ঘনিশ্বাস তাঁহার হস্তের উপর পড়িতেছে, যেন চারণের তপ্ত ওষ্ঠে সে একবার স্পর্শ করিল।

প্রকৃতই কি চারণদেব এই ধৃষ্টতা প্রকাশ করিলেন?—না, এ কেবল পুষ্পকুমারীর

কল্পনামাত্র? পুষ্প চাহিলেন, পুনরায় সেই দেবনির্মিত বসুণ্ড উদার মুখমণ্ডল দেখিলেন, সেই চক্ৰকরোজ্জ্বল বিশাল নরন দেখিলেন, ঐবৎ চেঁচা দ্বারা হস্ত ছাড়াইয়া লইলেন। মুহূর্ত্তের অন্ত পুষ্পের ললাট ও সমস্ত বদনমণ্ডল রক্তোজ্জ্বল রঞ্জিত হইল।

চিন্তাসংঘম করিয়া পুষ্প পূর্ববৎ অকম্পিত-ধরে কহিলেন, “চারণদেব! সে বীরপুরুষকে প্রতিদান করিতে পারি, এরূপ অলঙ্কার আমার নাই। কিন্তু যদি তাঁহার সহিত আপনায় সাক্ষাৎ হয়, অভাগিনীর নিদর্শনস্বরূপ এই পুষ্পটি তাঁহাকে দান করিবেন।”

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

বন্যপুষ্প।

গাঢ়োকঠাং গুরু দিবসেহ গচ্ছৎহু বাল্য।
জাতাং যনো শিশিরবধিতাং পত্রিনীং বাহুভ্রুগাম্।
বেদুভব।

রজনী শেষপ্রায়, এরূপ সময়ে তেজসিংহ সূর্য্যামল-পর্যন্ত হইতে অবতরণ করিয়া, চারপের বেশভ্যাগ করিয়া, ভীমচাঁদের পালের নিকট হইতে সেই পূর্ব্বহুদে প্রাভঃ-স্নান করিতে গমন করিলেন। নিকটে আসিয়াছেন, এরূপ সময়ে হৃদতট হইতে ভীল ভাবায় একটি গীত শুনিতে পাইলেন। এই নিমিত্ত রজনীতে কে গীত গাইতেছে? উৎসুক হইয়া তিনি হৃদপার্শ্বস্থ একটি ঝোপের ভিতর বাইলেন,—দেখিলেন, একটি তুচ্ছ প্রস্তররাশির উপর সেই চক্কালোকে একটি বালিকা বস্ত্র-ফুল চয়ন করিতেছে ও যথো

যথো গীত গাইতেছে। বিস্মিত হইয়া তিনি লেন, সে ভীমচাঁদের কন্যা।

তেজসিংহ কণেক পাড়াইয়া থাকিয়া ভাকিলেন, “বালিকা!”

বালিকা তাঁহার দিকে দেখিয়া হস্ত করিয়া বলিল, “আমি তোমার জন্ত বনের ফুল তুলিতেছি।”

তেজসিংহ। এ কি বালিকা! এ রাতে একাকী এ স্থানে ফুল তুলিতেছিস কেন? আমার সঙ্গে ঘরে আর।

বালিকা। এই তুমি ‘পুষ্প’ ভালবাস, তোমার জন্ত পুষ্প তুলিতেছি।

বালিকা হাসিয়া উঠিল। তেজসিংহ অকুটি করিলেন, কিছু বুঝিতে পারিলেন ন।

বালিকা পুনরায় হস্ত করিয়া কহিল, “আমার এ মালা লইবে না?”

তেজসিংহ। লইব বৈ কি, দে না।

বালিকা। আমি পরাইয়া দিব।

তেজসিংহ। দে, পরে বাড়ী আর।

বালিকা। ও কি, তোমার বুকে কি?

তেজসিংহ। একটি ফুল।

বালিকা। ফেলিয়া দাও।

তেজসিংহ। কেন?

বালিকা। ও যে বাগানের ফুল।

তেজসিংহ। তা হ’লট বা, আমি কেলিব না।

বালিকা। তবে আমি এ মালা পরাইব না।

তেজসিংহ। কেন?

বালিকা। মালা পরাইলে ‘পুষ্প’ রাগ করিবে।

চকিতধরে তেজসিংহ ভিজ্ঞাসা করিলেন, “কি?”

বালিকা। বাগানের ফুল বড় লোক, বনের ফুল ছোট লোক, বস্ত্র-ফুলের মালা

গলায় দেখিলে তোমার ঐ বাগানের ফুলটি
রাগ করিবে ।

তেজসিংহ কখনও বালিকার কথাই অর্থ
ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেন না ; জিজ্ঞাসা
করিলেন, “ফুল কি আবার রাগ করে ?”

বালিকা । করে না ? তবে তুমি ফুল
ফেলিয়া দিতে ভয় করিতেছ কেন ?

তেজসিংহ নিমন্তর হইলেন ।

বালিকা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, “এত
রাত্রি একাকী কোথায় গিয়েছিলে ?”

তেজসিংহ । কেন ?

বালিকা । পথে ভয় আছে ।

তেজসিংহ । কিসের ভয় ?

বালিকা । চোরের ।

তেজসিংহ । কৈ, আমি তাহা জানি না ।

বালিকা । তোমার কিছু চুরি করে নাই ?

তেজসিংহ । না ।

বালিকা তেজসিংহের আপাদমস্তক
দেখিয়া বলিল, “তোমার হাতের অঙ্গুরীয়টি
তবে কোথায় গেল ?”

এবার তেজসিংহ বর্ষাধি বিস্মিত হইলেন ।

“এই ভীলবালিকা কি সমস্ত জানে, সমস্ত
দেখিয়াছে ? বালিকা কি সঙ্গে সঙ্গে লুকাইয়া
গিয়াছিল ? অঙ্গুরীয়-দান কি লুকাইয়া দেখি-
য়াছে ? না, তাহা ত সম্ভব নহে, এইমাত্র
ত সে একটি প্রস্তররাশির উপর বসিয়া ফুল
ভুলিতেছিল ।”

তেজসিংহকে চিন্তিত দেখিয়া ভীলবালা
খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, “কেমন,
একটি জিনিস চুরি হইয়াছে কি না ?”

তেজসিংহ । না, চুরি হয় নাই, কোথাও
রাখিয়া আসিয়া থাকিব ।

বালিকা । আমি খুঁজিয়া দেখিব ?

তেজসিংহ । দেখিস্ ।

বালিকা । যদি পাই, তবে আবার ?

তেজসিংহ । হাঁ ।

বালিকা করতালি দিয়া হাস্য করিয়া
উঠিল ; শেষে বলিল, “আমার এ মালা
লইবে না ?”

তেজসিংহ । না, লইব না, তুই বাড়ী
আয় ।

বালিকা । আমি যাইব না ।

তেজসিংহ । কেন ?

বালিকা । এ চাঁদ দেখিয়া গান করিতে
ইচ্ছা হইতেছে ।

হৃদে স্নান সমাপন করিয়া তেজসিংহ
চলিয়া গেলেন, পশ্চাতে সেই বালিকাকর্তৃ-
নিঃসৃত গীতধ্বনি শুনিলেন । এবার সে
ধ্বনি পরিষ্কার ও স্পষ্টস্বরমিলিত, বোধ হইল
যেন, সেই অনন্ত পরম্পরায়িত্তিকে আকুল
করিয়া সে খেদনিঃসৃত গীত ধীরে ধীরে নৈশ
গগনে উথিত হইতে লাগিল । ভীলবালার
হৃদয়ের এই সরল গীতটি কিরূপে আমরা বঙ্গ-
ভাষায় অনুবাদ করিব ?

গীত ।

বস্ত্র-ফুলের পুষ্পমালা কে লভিতে চায় ।

ভীলবালার পুষ্পমালা ভূমিতে লুটায় !
উদ্ভানে সুগন্ধি ফুল, দে'খে ধায় অলিফুল,
গন্ধশূন্য ফুল বস্ত্র ভূমিতে লুটায় !

গন্ধ-পুষ্প মনোলাভা, হৃদয়নয়নশোভা,
কিবা গন্ধ, কিবা আভা হৃদে স্থান পায় !
নীরবেতে বার বার, বস্ত্রফুল চাহে সার,
জীবন বিহনে তার, জীবন শুকাই !

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

অন্ধকারে আলোকচ্ছটা।

ন পৃথগ্ জনবৎ ততো বশং

বসীনাযুক্তম গন্তবহঁস।

ক্রমসানুযত্যাং কিমন্তরং

যদি যারো বিত্তয়েহপি তেহঁচলা।

রঘুবংশঃ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, জীবনমাসের প্রারম্ভে হলদীঘাটার যুদ্ধে চতুর্দশ সহস্র রাজপুত স্বদেশের জন্য জীবন দান করিল। সে বৎসর বর্ষার কারণ মোগলেরা কিছু করিতে পারিল না, অগত্যা মেওয়ার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। প্রতাপসিংহ কয়েক মাসের অল্প বিশ্রাম পাইলেন।

মাঘমাসে শক্রগণ পুনরায় সসৈন্তে দেখা দিল। বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপও পুনরায় যুদ্ধদান করিলেন, কিন্তু বহুসংখ্যক মোগলের সহিত যুদ্ধ বৃথা চেষ্টা, পুনরায় পরাস্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন।

মোগল-সেনানী শাহাবাজ খাঁ কমলমীর-দুর্গ পরিবেষ্টন করিলেন। প্রতাপ উদয়-সিংহের প্রাসাদ তুচ্ছ করিয়া এই স্থলেই রাজধানী করিয়াছিলেন। মেওয়ার হইতে উত্তর-পশ্চিমদিকে মাড়োয়ারে ঘাইবার জন্য যে পর্বত-উপত্যকা ছিল, সেই উপত্যকার উপরই এ পর্বতদুর্গ নির্মিত। দুই পার্শ্বে উন্নত পর্বতরাশিমধ্যে পর্বততরঙ্গ ও প্রান্তররাশির উপর দিয়া অতি সংকীর্ণ পথ ছিল। এক্ষণে মাড়োয়ারও শক্রদলস্থ, সেই দিক্ হইতেই শক্রগণ আক্রমণ করিয়াছিল, সুতরাং সে ঘর রুদ্ধ করিবার জন্য প্রতাপসিংহ কমলমীরে রাজধানী করিয়াছিলেন। যত দিন সাধ্য, তত দিন এই পর্বত-

দুর্গ রক্ষা করিলেন, অবশেষে পানীর জল মন্দ হইল, সেনার পীড়া হইতে লাগিল, প্রতাপসিংহ অগত্যা সে দুর্গ মাড়ুলহস্তে অর্পণ করিয়া অল্প দুর্গ রক্ষা করিতে ঘাইলেন। প্রতাপসিংহের মাড়ুল বিজলীর প্রমরকুলাধিপতি, যুদ্ধপ্রারম্ভে মহারাণার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিলেন, গৌরব-রক্ষার্থ প্রমরকুল সানন্দে জীবনদান করিলেন। কমলমীর শত্রু-হস্তে পতিত হইল।

কমলমীর হইতে আসিয়া প্রতাপসিংহ মেওয়ারের দক্ষিণ-পশ্চিমের চাওয়ল-প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। এ প্রদেশ অতিশয় পর্বতময়, অতিশয় দুর্ভ্রাক্ষ্য, এক স্থানে কেবল পার্শ্বীয় ভীলগণ বাস করিত। এ বিপদের সময় ভীল রাজপুতদিগের পরম হিতকারী, প্রতাপ চাওয়লদুর্গে ভীল ও রাজপুত সৈন্য লইয়া অবস্থিত করিতে লাগিলেন।

এ দিকে শক্রগণও নিরস্ত রহিল না। কমলমীর হস্তগত করিবার পর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানসিংহ ধর্ম্মেতা ও গুপ্ত দুর্গ বেষ্টন করিলেন, মহাবৎ খাঁ উদয়পুর হস্তগত করিলেন, ফরিদ খাঁ প্রতাপের চাওয়ল-দুর্গের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপ চারিদিকে বেষ্টিত হইয়া অসংখ্য সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও প্রতাপসিংহ সাহস ও অধ্যবসায় হারাছিলেন না, যত দিন মেওয়ারদেশে একটি পর্বতদুর্গ বা উপত্যকা স্বাধীন থাকিবে, তত দিন সেই নির্ভীক বোদ্ধা পর্বতকন্দরে ভীলদিগের মধ্যে বাস করিয়া শিশোদীরের নাম রাখিবেন, স্থির করিলেন। পর্বতে পর্বতে রাজপুতসেনা লুক্কায়িত থাকিত; উপত্যকা ও কন্দরে প্রতাপসিংহের অল্পচরগণ প্রতাপসিংহের আদেশ

লইয়া বাইত। নিশীথে পৰ্বত চূড়ার দীপা-
লোকে দেখিলে প্রতাপের সেনাগণ তাহার
অৰ্ধ বৃত্তিত। এইরূপ ইন্ধিতে প্রতাপ নিজ
সৈন্য জড় করিতেন ও শত্রুদিগকে অজ্ঞাতে
সহসা আক্রমণ করিতেন। প্রতাপ দূরে
পলাইয়াছে বা লুকাইয়া আছে ভাবিয়া শত্রু-
গণ যখন নিশ্চিন্ত থাকিত, সহসা প্রতাপ
সম্মুখে দেখা দিতেন, শত্রুসেনা বিনাশ
করিতেন। চিতোর গিয়াছে, উদয়পুর
গিয়াছে, কমলমীর গিয়াছে, পৰ্বতভূগ
একে একে শত্রুহস্তগত হইতেছে, উপত্য-
কায় শত্রুসেনা রাশীকৃত হইতেছে, মান-
সিংহ, শাহবাজ খাঁ, ফরিদ খাঁ, মহবৎ খাঁ
চারিদিক্ হইতে অসংখ্য সেনা লইয়া
আসিতেছে, কিন্তু মেওয়ারের যোদ্ধা স্থির-
প্রতিজ্ঞ ও অবিচলিত। প্রতাপসিংহ শিশো-
দীয় নাম রাখিবেন, দেশের স্বাধীনতা
রক্ষা করিবেন।

ফরিদ খাঁ সম্মুখে চাওরদুর্গ হস্তগত
করিতে আসিতেছিলেন। উন্নত পৰ্বত-
সঙ্কুল প্রদেশ জয় করিয়া মুসলমান মহা
উল্লাসে প্রতাপকে বন্দী করিতে আসিতে-
ছিলেন, সহসা প্রতাপের আদেশ গোপনে
সেই পৰ্বতের চারিদিকে নীত হইল,
ইন্ধিতে প্রতাপের সেনাগণ প্রতাপের
উদ্দেশ্য বুঝিল। অবিলম্বে ফরিদ খাঁ চারি-
দিকে অবিপ্রান্ত রাজপুতসৈন্য দেখিলেন,
সেই গভীর পৰ্বত-গুহা হইতে ফরিদ খাঁ বা
তাঁহার একজন সৈন্য আর স্বদেশপ্রত্যা-
বৰ্ত্তন করিলেন না।

চারিদিকে মেঘমালায় স্তায় বিপদ বত
রাশীকৃত হইতে লাগিল, ভবিষ্যৎ গগন বত
অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল, অৰ্ধ,
সৈন্যসংখ্যা, দুর্গসংখ্যা বত হ্রাস পাইতে
লাগিল, নির্ভীক প্রতাপের সাহস ও অধ্য-

বসায় ততই দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে
লাগিল। সেই পৰ্বতসঙ্কুল প্রদেশ তিনি
জগতের বিরুদ্ধে একাকী খড়্গহস্তে রক্ষা
করিবেন, সেই পৰ্বতের প্রত্যেক শিলা-
খণ্ডে বীরত্বের নাম অঙ্কিত করিবেন।

ভবিষ্যৎগগন আরও মেঘাচ্ছন্ন হইতে
লাগিল, আরও অন্ধকারময় হইতে লাগিল।
সেই অন্ধকারের মধ্যে প্রতাপের সাহস
ও দৃঢ় অধ্যবসায় বিদ্যুৎলোকের স্তায়
উজ্জলতর চমকিত হইতে লাগিল। দিল্লীর
দার পর্যন্ত সে আলোকছটা দৃষ্ট হইল,
জগতের প্রান্ত পর্যন্ত সে আলোক চম-
কিত হইল।

পুনরায় বর্ষা আসিল, মানসিংহ ও
মোগলগণ ব্যর্থত্ব লইয়া সে বৎসরও মেও-
রার ত্যাগ করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

অস্থায়ী জগতে স্থায়িত্ব।

শাস্ত্রের রহস্য বদশকারহং ন ততঃ শাস্ত্রভূতায় কিণোতি।
রঘুবংশম্।

আবার বসন্তকাল আসিল। বসন্ত-
কালের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চপালের স্তায় শত্রু-
সৈন্য আসিল। কিন্তু প্রতাপসিংহ শিশো-
দীর নাম রাখিবেন, প্রতাপসিংহ স্বদে-
শের স্বাধীনতা রাখিবেন।

পুনরায় পৰ্বত ও উপত্যকা শত্রুগণ
আচ্ছাদিত করিল, পুনরায় পৰ্বতভূগ একে
একে হস্তগত করিতে লাগিল, পুনরায় পৰ্বত-
কন্দর ও নির্জন গুহা হইতে অল্পসংখ্যক
নির্ভীক রাজপুতদিগকে তড়িত করিতে
লাগিল। কিন্তু প্রতাপসিংহ শিশোদীর
নাম রাখিবেন, স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষা

করিবেন। সে বৎসর অতীত হইল, নূতন বৎসর আসিল, নূতন বৎসর অতিবাহিত হইল, পুনরায় আর এক বৎসর আসিল, অনন্ত যুদ্ধের অন্ত হইল না। মেওয়ার-বিজয় হইল না!

দিল্লী হইতে নূতন সৈন্য প্রেরিত হইল, বৎসরে বৎসরে অধিকতর সৈন্য মেওয়ার আক্রমণ করিল, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সেনানী প্রশিক্ষিত সৈন্যতরঙ্গের সহিত মেওয়ারের উপর প্রধাবিত হইল। নির্ভীক প্রতাপ রণে ভঙ্গ দিলেন না, মেওয়ার-বিজয় হইল না!

প্রতাপসিংহ অনেক সময়ে পর্বতকন্দরে ও নির্জন গহ্বরে বাস করিতেন, মেওয়ারের মহারাজা ও রাজপুত্র গহ্বরে হইতে গহ্বরান্তরে বাস করিতেন, শত্রুর আগমনে অনাহারে পর্বত হইতে পর্বতান্তরে পলায়ন করিতেন, কখন বজ্র ভীলের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, কখন বজ্র পশুর গহ্বরে লুকাইতেন। রাজপরিবার তাপসের ক্লেশ তুচ্ছ করিতেন; শীতে প্রীমে, ঘোর বর্ষায় পর্বত ভিন্ন অস্ত্র আশ্রয় পাইতেন না। কখন কখন ক্ষেত্রের দূরী ভিন্ন অস্ত্র খাদ্য পাইতেন না। এ কষ্ট সহ করিয়া প্রতাপ রণে ভঙ্গ দিলেন না, মেওয়ার-বিজয় হইল না!

প্রতাপসিংহের এ বীরত্বকথা দিল্লীতে প্রচলিত হইল, সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচলিত হইল, কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলে জয় জয় রব করিতে লাগিলেন, বাহারা প্রতাপসিংহের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, তাঁহারাও শত্রুর বীরত্ব দেখিয়া সাধুবাদ দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই।

মহাহুতব আকবর এই ক্ষত্রিয়ের বীরত্বকথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন, সম্রাটের পারিষদবর্গ চমৎকৃত হইলেন। দিল্লীর

মণিমাণিকা-বিভূষিত উন্নত সিংহাসনে দরিদ্র গহ্বরবাসী প্রতাপসিংহের সাধুবাদ হইতে লাগিল, সমগ্র ভারতবর্ষে জয় জয় শব্দ হইল!

প্রতাপসিংহের বীরত্ব আলোচনা করিলে প্রাচীন ভারতবর্ষের কথা মনে হয়, মহাভারতের বীরদিগের কথা মনে পড়ে। প্রতাপসিংহ সপ্তরথীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন নাই, সপ্তকোটি লোকের অধীশ্বর আকবরশাহের সহিত যুদ্ধাচ্ছিলেন। তিনি এক দিবস যুদ্ধ করেন নাই, পঞ্চবিংশ বৎসর পর্যন্ত দেশরক্ষা ও স্বাধীনতারক্ষা করিয়া ছিলেন। পঞ্চবিংশ বৎসর যুদ্ধের পর জীবনদান করিলেন, স্বাধীনতা দান করেন নাই।

প্রতাপসিংহের বীরত্বকথা উপভ্রাস অপেক্ষা বিশ্বাসকর, কিন্তু উপভ্রাস নহে। বিশ্বাস না হয়, নিম্নলিখিত কবিতাটি পাঠ কর। উহা আমাদের অসার লেখনী-নিঃসৃত নহে, প্রতাপসিংহের পরম শত্রু আকবরশাহের রাজসভার প্রধান সভাসদ খানখানান্ সেই দরিদ্র হিন্দুদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া উহা লিখিয়াছেন।

খানখানানের কবিতা।

“জগতে সমস্তই ক্ষণস্থায়ী,

“ভূমি ও সম্পত্তি নষ্ট হইবে,

“কেবল মহৎ নামের গৌরব নষ্ট হয় না।

“প্রতাপ ভূমি-সম্পত্তি বিসর্জন দিয়াছেন,

“প্রতাপ মস্তক মত করেন নাই,

“ভারতবর্ষের রাজাদিগের মধ্যে তিনিই একাকী স্বজাতির নাম রাখিয়াছেন।”

একবিংশ পরিচ্ছেদ ।

অপরিচিতা ।

কা শিববন্তনবতী !

অভিজ্ঞানশত্ৰুজয় !

দিনে দিনে, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে, এইরূপ ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। মেওয়ারের আকাশ মেঘচ্ছায়ার আরও আবৃত হইতে লাগিল। শত্রুগণ পক্ষপালের জায় নগর, গ্রাম ও পর্বত-উপত্যকা আচ্ছাদিত করিল, সমুদ্র দুর্গ একে একে হস্তগত করিল। কিন্তু কন্দরবাসী প্রতাপসিংহ রণে ভঙ্গ দিলেন না, মেওয়ার-বিজয় হইল না।

একদা সমস্ত দিন সংগ্রাম হইল। অসংখ্য মোগলসৈন্য প্রতাপকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়াছে, প্রতাপসিংহ এখন আনার-বেষ্টিত সিংহের জায় যুদ্ধ দান করিতেছেন, কখন বা পর্বত হইতে পর্বতান্তরে সরিয়া বাইতেছেন, পুনরায় নির্মল আকাশ হইতে বাজের জায় সহসা অন্ধকৃ হইতে শত্রুকে আক্রমণ করিতেছেন। সমস্ত দিবস এইরূপ যুদ্ধ হইল; রজনীর আগমনেও সে বিষম যুদ্ধ ক্রান্ত হইল না।

রজনী বিশ্রাহের পর বনের অন্ধকারের ভিতর দিয়া কতকগুলি ভীল অতি সতর্কতার সহিত একটি কাঠাধার লইয়া পর্বতে আরোহণ করিতেছিল। রজনীর অন্ধকারে মনুষ্য মনুষ্যকে দেখিতে পায় না, সেই দুর্ভেদ অন্ধকারে ভীমচাঁদের ভীলগণ ঝোপের ভিতর দিয়া সেই আধার ভীম-চাঁদের পালে আনিতেছিল। আকাশে তারা নাই, জগতে আলোক নাই, ভীল ভিন্ন আর কেহ সে অন্ধকার রজনীতে সে অজলাচ্ছাদিত পর্বত-

পথ দিয়া আসিতে পারিত না। ভীলদিগের পদশব্দ শ্রুত হইতেছে না, নিঃশব্দে সেই আধার পালের ভিতর প্রবেশ করিল। সেই পালের ভিতর একটি পর্বত-গহ্বর ছিল, পাঠক তাহা পূর্বেই দর্শন করিয়াছেন। আধার সেই গহ্বরে প্রবেশ করিল, ভীলগণ তথায় আধার রাখিয়া অদৃশ্য হইল।

সেই অন্ধকারময় নিম্নে সেই ভীল-বাহিত আধারে পাঠকের পূর্বপরিচিতা পুন্সুমারী গহ্বরে আনীতা হইলেন। এ অনন্ত যুদ্ধে সূর্য্যামহলে রাণীদিগেরও স্থান নাই, সুতরাং দুর্জয়সিংহের পরিবার পূর্বেই অস্ত্র দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছেন। অস্ত্র কোন অপরিচিত বোদ্ধার আদেশে পুন্সু সূর্য্যামহল হইতে এই গহ্বরে আনীতা হইলেন।

গহ্বরের ভিতরে একটি দীপ জ্বলিতে-ছিল। সেই দীপালোকে পুন্সু বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, তথায় আর একজন গরীয়সী রাজপুত্রমণী উপবিষ্টা রহিয়াছেন। রমণীর শরীর উন্নত, পরিষ্কার ললাটে একটি হারকণ্ঠ জ্বলিতেছে, নয়ন হইতে নির্মল উজ্জল জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে, কণ্ঠে একটি মুক্তাহার লব্ধি রহিয়াছে। উন্নত অবয়ব ও জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল দেখিলে রমণীকে উন্নতকুলসম্ভবা বলিয়া বোধ হয়, তথাপি পরিশ্রম বা ক্লেশ বা চিন্তায় সে বিশাল নয়ন আজি কালিমাযেষ্টিত, সে সুনয়ন ললাট আজি জ্যেৎবে রেখায় অঙ্কিত। গরীয়সী বামায় বয়ঃক্রম চত্বারিংশৎ বৎসর হইবে, তিনি পাঠকের অপরিচিতা, কিন্তু মেওয়ারে তিনি অপরিচিতা ছিলেন না।

সূর্য্যামহল ত্যাগ করিয়া অবধি পুন্সু অস্ত্র নারীর মুখ দেখেন নাই, অস্ত্র নারীর সহিত কথাবার্তা করেন নাই। ভীলদিগের আধারে

আসিয়া পুষ্প চকিত হইয়াছিলেন, ভীল-দিগের গহ্বরে আসিয়া ভীত হইয়াছিলেন। ক্রমে সেই গহ্বরে স্তিমিত দীপালোকে বধন আর একজন রাজপুত্ররমণীকে দেখিতে পাইলেন, যখন তাঁহার উজ্জল রূপলাবণ্য এবং মুখের কমলীয়তা ও মধুরতা দেখিতে পাইলেন, তখন পুষ্পের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। পুষ্প ধীরে ধীরে অপরিচিতা রমণীর নিকট আসিয়া তাঁহার চরণ দুইটি ধরিয়া প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, “দেবি! আমি কোথার আসিয়াছি, জানি না, কাত্যাকে আমার সম্মুখে দেখিতেছি, জানি না। বোধ হয়, আপনি কোন উন্নতবংশীয় রমণী হইবেন। বোধ হয়, এই যুদ্ধের সময় বিপদে পড়িয়া এই গহ্বরে আশ্রয় লইয়াছেন। বোধ হয়, আমার প্রতি দয়া করিয়া আমাকেও এই নিরাপদ স্থানে আনাইয়াছেন। আপনি বিনিই হউন, আমি আপনায় শরণাপন্ন হইলাম। আমাকে আশ্রয় দান করুন; পুষ্প-কুমারী আশ্রয়হীনা ও অভাগিনী।”

পুষ্পকুমারীর করুণস্বর ও নয়নজল দেখিয়া অপরিচিতা রমণী বাৎস্যল্যের সচিহ্ন তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া অনেক আশ্বাস দিয়া কহিলেন, “মা পুষ্প, অত তোমারও যে অবস্থা, আমারও সেই অবস্থা। এ গহ্বরে ভীলদিগের, ভীলগণ বিপদের সময় আমাদের আশ্রয়দান করিয়াছে। একজন রাজপুত্র যোদ্ধাও এই স্থানে বাস করেন, তিনিও আমাদের গহ্বরে বসবাস করিয়াছেন। তিনিই আমাকে শত্রু-হস্ত হইতে নিরাপদে রাখিবার জন্য কয়েক দিন হইল, এই স্থানে আনিয়াছেন, তিনিই তোমাকেও নিরাপদে রাখিবার জন্য অত এই স্থানে আনাইয়াছেন। যদি ইচ্ছা কর, তুমি আমারই নিকটে থাকিও, আমার

পুত্র-কন্যা যদি নিরাপদে থাকে, তুমিও নিরাপদে থাকিবে, ইহার অধিক আশ্বাস দিতে পারি না।”

এ বাৎস্যল্যপূর্ণ স্নেহের কথাগুলি কাহার? পুষ্প অনেক দিন হইতে এরূপ স্নেহের কথা শুনে নাই, বহুদিন পর স্নেহ-বাক্য শুনিয়া পুষ্পের হৃদয় দ্রবীভূত হইল; নিঃশব্দে দরবিগলিত-ধারায় পুষ্প রোদন করিতে লাগিল, দরবিগলিত-ধারায় অপরিচিতার পদযুগল সিক্ত করিয়া তাঁহার আশ্রয়গ্রহণ করিল।

অপরিচিতা অধিকতর অমুকম্পার সহিত পুষ্পকে আশ্বাস দান করিলেন ও কহিলেন, “শান্ত হও, আমার স্বামী মেওয়ারের অপরিচিত নহেন, এই ভীষণ যুদ্ধের অন্তে বোধ হয়, তিনি তোমাকে সহায়তা করিতে পারিবেন।”

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ।

তথ্যবিবরণ-বাণী ।

— — —

ধৃত্য ধারিত্রী তব বিক্রমণ
জ্যাগাংস্ত বীর্ঘ্যাস্তবৈর্জগৎকঃ ।
অন্তঃ প্রকর্ষায় বিধির্কোষেরঃ
প্রকর্ষতত্রা হি রণে জয়ন্তীঃ ॥

কিরাতার্কীলীল ॥

অপরিচিতা রমণী পুষ্পের সহিত কথা কহিতেছেন, এরূপ সময় নানারা মগরোর বৃদ্ধা চারণী দেবী সহসা সেই ভীল-গহ্বরে উপস্থিত হইলেন।

চারণী দেবী অগ্রসর হইয়া আপন দীর্ঘ ও গম্ভীরস্বরে অপরিচিতাকে বলিলেন, “দেবি! অত জানিলাম, এই অন্ধকারময় ভীমচাঁদের গহ্বরে পবিত্র ও আলোক-পূর্ণ,

সেই আলোক দর্শন করিতে আসিলাম। অবগুঠন যোগ করুন, মহারাজি! চারলী নিকট অবগুঠন অনাবশ্যক।"

তখন মহারাজী প্রতাপসিংহের মহিষী অবগুঠন ত্যাগ করিলেন, গরীয়সী বামার উজ্জ্বল মুখকান্তিতে সে পর্তগহরর আলোকপূর্ণ হইল। সেই উন্নত ললাটে একটি হীরকখণ্ড বস্কৃ করিতেছে, সেই উন্নত বস্কৃস্থলে এক ছড়া মুক্তাহার দোহুলায়মান রহিয়াছে। প্রতাপসিংহের মহারাজী তখন চারলীর সহিত কথা কহিতে লাগিলেন, শুদ্ধ হইয়া পুশ্ণ সেই কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন।

রাজী। চারলী মাতা, আজি তোমাকে দেখিয়া নিরুদ্ভিগ্ধ হইলাম, বিপদের দিনে ভূমি চিরকালই আমাদের সহায়। বিপদ ও সঙ্কট মহারাণার অপরিচিত নহে, আমার নিকটও অবদিত নহে, তথাপি এরূপ ঘোর বিপদ্রাশি পূর্বেও কখন বোধ হয়, মেওয়ার-প্রদেশে দেখা দেয় নাই। বহুদিন হইতে মহারাণার সাক্ষাৎলাভ করি নাই, অনন্ত যুদ্ধে ব্যাপ্ত থাকিয়া তিনি স্ত্রী-পুত্রকে দেখিবারও অবকাশ পান নাই। পুত্র-কন্তা লইয়া আমি দুর্গ হইতে দুর্গান্তরে আশ্রয় লইয়াছি। অবশেষে কয়েক দিন হইতে এই ভীলদিগের গহ্বরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছি। এখানেও আমরা নিরাপদ নহি, তুর্কীগণ বোধ হয়, আমাদের কোন সন্ধান পাইয়া এই দিকে আসিতেছে। ঐ দুঃ-উপত্যকার অগ্ন মহারাণার সহিত তুর্কীদিগের ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছে, সে যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই, তুর্কীদিগের যুদ্ধনাদ এখনও শুনা যাইতেছে। আমার ক্রুর চিন্তাকুল হইয়াছে, চারলী মাতা, মহারাণার কুশল-সংবাদ দিয়া চিন্তা দূর কর।

চারলী। মহারাজি! শান্ত হউন, চিন্তা করিবেন না। স্বয়ং দেশানী আপনার স্বামীকে রক্ষা করিতেছেন, তিনি কুশলে আছেন।

রাজী। মাতা, তোমার কথায় আমি আশস্ত হইলাম, তোমার মুখে পুশ্ণ-চন্দন পড়ুক। মেওয়ারের মহারাজী নিজের বিপদে ডরে না, সে বিপদ তুচ্ছ করিয়া, শত্রু-গণকে উপহাস করিয়া, শিশোদীর-ধর্ম্মহাসারে জীবনত্যাগ করিয়া আপন মানরক্ষা করিতে জানেন কিন্তু রাজা ও রাজ-শিশুগণের জ্ঞানই আমার চিন্তা। মেওয়ার-প্রদেশে রাজ-শিশুগণের মৃত্যু রাধিবার স্থান নাই, মেওয়ারের রাজশিশুগণ কি তুর্কীহস্তে পতিত হইবে? মেওয়ারের ইতিহাস কি অজ্ঞই শেষ হইল?

শিশুদিগের বিপদ স্বরণে সেই বীর-হৃদয় একবারে দ্রবীভূত হইল, সেই উজ্জ্বল নয়নদ্বয় একেবারে জলে পূর্ণ হইল। পুশ্ণ নিজের দুঃখ ও বিপদ ভুলিয়া গেলেন, সেই দেবীতুল্যা মহারাজীর দিকে তিনি ভক্তি-ভাবে একদৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন, মহারাজীর নয়নে জল দেখিয়া পুশ্ণের নয়নও শুদ্ধ ছিল না।

চারলী। শিশোদীরকূলে বহু দিন বীরত্ব আছে, মেওয়ারের ইতিহাস তত দিন সুপ্ত হইবে না। মহারাজি, শান্ত হউন, রাজশিশুদিগের এখনও নিরাপদ স্থান আছে। ভীলগণ শিশোদীরের চিরবিশ্বাসী, মহারাণা উদয়সিংহকে এই ভীল-সর্দার ভীমচাঁদের পিতা এই গহ্বরে স্থান দিয়া-ছিল, মহারাণা প্রতাপসিংহের পরিবারকে ভীমচাঁদ স্থান দিবে। মহারাজি! শান্ত হউন, এই গহ্বরের অনতিদূরে জাউরার ধনি আছে, জাউরার ধনির ভিতর স্বর্গ্য-

রক্ষি প্রবেশ করে না, আহবের শব্দ প্রবেশ করে না, মহারাণীর পরিবার ভণ্ডার নিরাপদে থাকিবেন। এ কাল-সময় লীড্রই অবসান হইবে।

রাজ্ঞী। চারপাি, তোমার বচনে আমি আশঙ্ক হইলাম। যুদ্ধে, বিপদে রাজপুত্রের হৃদয় বিচলিত হয় না, কিন্তু বৎসদিগের কথা স্মরণ করিয়া একবার নারীর মন ব্যাকুল হইয়াছিল। যদি শিশুগণ নিরাপদে থাকে, তবে এ যুদ্ধ যুগান্তরব্যাপী হউক, মেওয়ারের মহারাণা তাহাতে কাতর নহেন, মেওয়ারের রাজমহিষী তাহাতে কাতর নহে। এই ভীল-গহ্বর আমার প্রাসাদ-স্বরূপ হইবে।

চারপাি। এ স্থানে রাজপরিবার কোন ক্রেশ পাইবেন না, কেন না, এ গহ্বর এক্ষণে একজন প্রধান রাজপুত্র বোদ্ধার আশ্রয়-স্থান।

মহারাজ্ঞী। তাহাও শুনিয়াছি। সেই রাঠোর-বোদ্ধাই আমাদিগকে ভীমগড়ে বন্ধা করিয়াছিলেন, তিনিই আমাদের নিরাপদে রাখিবার জন্ত এই ভীলদিগের গহ্বরে আনাইরাছেন। বোদ্ধার বিশেষ পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করে, কি জন্ত সেই বীরাগ্রগণ্য আশৈশব লোকালয় ত্যাগ করিয়া ভীল-দিগের সঙ্গে এই গহ্বরে বাস করিতেছেন, কি মহাব্রত-সাধনার পূর্ত্ত ও অরণ্যবাসী হইরাছেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা করে। আমাদের এই সঙ্কট ও বিপদের মধ্যে তাঁহার বিশেষ পরিচয় লইবার অবকাশ পাই নাই, পরিচয় দান করিতেও তিনি বড় ইচ্ছুক নহেন। কিন্তু এই বিপদ্রাশি হইতে যদি উত্তীর্ণ হই, তাহা হইলে আমাদিগের হৃদ্বিনের বহুকে আমি বিশ্বিত হইব না, মহারাণাও বিশ্বিত হইবেন না।

উদ্বেগে পুষ্পের শরীর রোমাঙ্কিত হইল, তাঁহার নিখাস প্রায় রুদ্ধ হইল। মহারাণী কি সেই রাঠোর-বোদ্ধার কথা কহিতেছেন? সেই রাঠোর-বোদ্ধা পিতৃহৃগ-চ্যুত হইয়া অবধি কি এই ভীষণ গহ্বরে বাস করিতেছেন?

চারপাি। দেবি! সে বোদ্ধার দীর্ঘ ইতিহাস অল্প একদিন কহিব, অল্প কমা করুন। অল্প কেবল এইমাত্র কহিতেছি যে, ভীলপালিত তেজসিংহ আপেক্ষা দুর্দ্ধমনীয় বোদ্ধা এবং বিশ্বাসী অন্তরে মহারাণার আর কেহ নাই। তেজসিংহের হস্তে বত দিন খড়্গ আছে, তেজসিংহের ধমনীতে বত দিন শোণিত আছে, আপনাদিগের তত দিন বিপদ নাই।

পুষ্পের শরীর কণ্টকিত হইল, হৃদয় আনন্দে ও উল্লাসে নৃত্য করিয়া উঠিল।

রাজ্ঞী। আকাশের দেবগণ তেজসিংহের সহায়তা করুন। দেবি! আমি তাঁহার স্বামীভক্তির কি পুরস্কার দিতে পারি?

পুষ্পের হৃদয় পুনরায় উদ্বেগে হইল, তিনি খাস রুদ্ধ করিয়া চারপাির উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

চারপাি। মহারাণী! সেই তেজসিংহের নিরাস্রয়া বাগ্দস্তা পত্নী আপনার চরণতলে। বালিকা পুষ্পহুমারীকে আশ্রয়দান করুন, পুষ্প আপেক্ষা বিশ্বাসিনী সহচরী আপনি পাইবেন না। পুষ্প! অবগুষ্ঠন ত্যাগ কর, চারপাির নিকট সন্ধ্যাপনচেষ্টা বুঝ। যিনি শিশোনীর-জাতির একমাত্র পূজ্যা, যিনি মেওয়ার-প্রদেশের আশ্রয়ভূতা, অল্প সেই মহারাণীর আশ্রয় গ্রহণ কর।

বিস্ময় ও লজ্জা, আনন্দ ও উৎকণ্ঠার বিহ্বলা হইয়া পুষ্পহুমারী সাক্ষর্য্যরূপে মহা

রাজার চরণ ধরিতা ভূমিতে স্থিতি হইলেন, তাঁহার বাক্যকৃতি হইল না। মহারাজী অনেক আশাসবাক্য দিয়া পুষ্পকে উঠাইলেন, অবশেষে বলিলেন, “পুষ্প, তোমাকে পূর্বেই আমি বাক্যান্বিত করিয়াছি, তুমি আমার কস্তা, আমি তোমার মাতা; আমার অন্ত সন্তান যদি নিরাপদে থাকে, তুমিও নিরাপদে থাকিবে। মেওয়ারের রাজী অত ইহা অপেক্ষা অধিক আশাস দিতে পারে না।”

অস্তান্ত অনেক কথার পর মহারাজী চারণী দেবীকে পুনরায় যুদ্ধের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। চারণীদেবী উত্তর করিলেন, “মহারাজী, চিন্তা করিবেন না, মেওয়ারের আকাশ পরিকার হইতেছে, বীরত্ব ও অধ্যবসায়ের জয় অনিবার্য্য।”

রাজী। কিরূপে সে বিজয়সাধন হইবে, তাহা কি জানিতে পারি?

চারণী। রাজার বল—অস্ত্রে ও মন্ত্রণায়। অস্ত্রে বাহা সাধ্য, মহারাণা তাহা করিয়াছেন, এক্ষণে মন্ত্রী ভামাশাহ সহায়তা করুন। ভামাশাহের স্বাধীশ্বর্ষে মেওয়ারের বিজয়।

রাজী। দেবি! তোমার বাক্য আমার চিন্তিত-জ্ঞপ্তে শান্তি দান করিল, আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব।

চারণী। মহারাজী বাহা আদেশ করিবেন, চারণী তাহা সানন্দে পালন করিবে।

রাজী। চারণী দেবি! তোমাদিগের মুখে শুনিতে পাই। দিল্লীর সিংহাসন ও সমস্ত হিন্দুস্থান পূর্বে রাজপুতদিগের ছিল। রাণা পৃথ্বীরায় না কি পূর্বে দিল্লীর অধীশ্বর ছিলেন, ৫০ বৎসর হইল, রাণা সংগ্রামসিংহ না কি দিল্লী অধিকার করিবার জন্য যুদ্ধা-

ছিলেন। পুনরায় কি আমরা কখনও দিল্লী অধিকার করিব? হিন্দুস্থানের দূর-ভবি-
ষ্যতে কি আছে? তুর্কীর বিজয়, না শিশোদীর বিজয়?

চারণী দেবী অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, তাঁহার ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইল, ঐ স্থিতি হইল, দৃষ্টিহীন স্থিরনয়ন অনেকক্ষণ উর্দ্ধ-দিকে চাহিয়া রহিল; পরে পতীরবরে কহিলেন, “মহারাজী! আমার বয়স অধিক হইয়াছে, নয়ন ক্লীণ, ভবিষ্যৎ আকাশে আমি বহুদূর দেখিতে পাই না। অন্ধকারের পর নিবিড় অন্ধকার! রাজপুত বহাদুর তুর্কীর সহিত যুদ্ধিতেছে; তৎপরে রাজপুত দক্ষিণবাসী হিন্দুর সহিত যুদ্ধিতেছে; তাহার পর এ কি! মহাসমুদ্র হইতে খেত তরঙ্গের উপর খেত তরঙ্গ আসিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ প্রাণিত করিতেছে। বৃদ্ধার নয়ন ক্লীণ। সে আর কিছু দেখিতে পায় না।”

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

সূর্য্যমহল-ধ্বংস।

হাট্কার: সমস্তবৎ তত্র তত্র সমস্তঃ।

অস্তান্তঃ চিন্মাতং শত্রুহানিতো লোহিতে সতি ॥

মহাভারতম্।

কি জন্ত ও কি অবস্থার রাজ-পরিবার ভীল-গল্পের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা বর্ণনা করা আবশ্যক।

যোগলদিগের সহিত যুদ্ধেতু মহারাণা প্রতাপসিংহ সর্বদাই সপরিবারে কন্দরে ও পর্বতগুহার বাস করিতেন। মেওয়ারের মহারাজী স্বাধীর দ্বার স্বদেশপ্রিয়া ছিলেন, রেশ-বাতরা তুচ্ছ করিয়া প্রক্টরের উপর

রজনীকে শয়ন করিতেন, বহুতে রজনীদি
করিয়া শিতকে খাওয়াইতেন, বিপদের
সময়ে পর্ত্ত হইতে অস্ত্র পর্ত্ততে, কন্দর
হইতে অস্ত্র কন্দরে পলাইতেন, তথাপি
সন্ধিপ্রার্থনার জন্য স্বামীকে অহরোধ করি-
তেন না। হিংস্রক জন্তুর আবাসস্থানে
মহারাজী আশ্রয়গ্রহণ করিতেন, শীত-
কালে পাহাড়ের উপর অগ্নি জালিয়া
সন্ধানবিগের শীতনিবারণ করিতেন, বর্ষা-
কালে কখন কখন পর্ত্তকন্দর ভাসিয়া
ঘাইলে শিতবস্ত্রে সমস্ত রজনী শিতকোড়ে
দণ্ডায়মান থাকিতেন, তথাপি মোগলের
নিকট সন্ধিপ্রার্থনা করিতেন না। ক্ষেত্রের
দূরীক রুটী প্রস্তুত করিয়া শিতদিগকে
খাওয়াইতেন, কখন প্রস্তুত রুটী তাগ
করিয়া ক্ষুধার্ত্ত শিতদিগকে লইয়া শক্রভয়ে
এক স্থান হইতে অস্ত্র স্থানে, তথা হইতে
পুনরায় আর এক স্থানে পলায়ন করিতেন,
তথাপি মোগলের নিকট সন্ধিপ্রার্থনা
করিতেন না।

এইরূপ অসঙ্গ কষ্ট সহ করিয়াও মহা-
রাণা মোগলদিগের সহিত প্রতি বৎসর
যুদ্ধান করিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রায় সমস্ত
দুর্গ, সমস্ত পর্ত্ত, সমস্ত উপত্যকা
শক্রহস্তে পতিত হইল, প্রতাপসিংহ বিশাল
মেওয়ার-রাজ্যে মস্তক রাখিবার স্থানও
পাইলেন না। অবশেষে তিনি চন্দাওয়ার
দুর্জয়সিংহের স্বর্য্যমহলে আপন পরিবার
রাখিলেন, বরং আপন অন্নসংখ্যক সৈন্ত
লইয়া শক্রদিগকে নানাদিক্ হইতে বার বার
গোপনে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

দুর্জয়সিংহ সসম্মানে রাজপরিবারকে
আপন প্রাসাদ ছাড়িয়া দিলেন। অসংখ্য
মোগল শত্রু আসিয়া স্বর্য্যমহল বেটন
করিল। মেওয়ারের প্রধান বৌদ্ধগণ কেহ

প্রতাপসিংহের সঙ্গে রহিলেন, কেহ বা
স্বর্য্যমহল রক্ষা করিতে লাগিলেন।

তেজসিংহ স্বর্য্যমহলে রহিলেন : বিপ-
দের সময় রাজপুত রাজপুতের ভ্রাতা।
দুর্জয়সিংহ নিঃসকোচে তেজসিংহ ও তাঁহার
রাঠোরগণকে স্বর্য্যমহলে প্রবেশ করিতে
দিলেন, কেন না, তেজসিংহ রাজপুত, বিবাস-
ঘাতকতা জানেন না, রাজকার্য্য-সাধনাথ
দুর্গে প্রবেশ পাইয়া আপন অভীষ্ট
শিদ্ধ করিবেন না। তেজসিংহ নিঃসকোচে
শত্রুদুর্গে শত্রুসৈন্তের মধ্যে আসিয়া অন্ন সৈন্ত
লইয়া বাস করিতে লাগিলেন, কেন না,
দুর্জয়সিংহ রাজপুত, বিদেশীয় যুদ্ধের সময়
তেজসিংহের উপর কদাচ হস্তক্ষেপ করি-
বেন না।

তেজসিংহ ও দুর্জয়সিংহ উভয়েই
অসাধারণ সাহসী, কিন্তু এক্ষণে পরস্পরে
বর্ত্তমানে অধিকতর বীরত্ব প্রকাশ করিতে
লাগিলেন। যে স্থানে অতিশয় বিপদ্
হইত, যে স্থানে শত্রুগণ অসংখ্যবলে আক্র-
মণ করিত, তেজসিংহ ও দুর্জয়সিংহ উভয়েই
সেই স্থানে প্রথমে যাইবার উদ্যম করিতেন।
কেন না, রাঠোর চন্দাওয়ার অপেক্ষা হীন
নহে, চন্দাওয়ার রাঠোর অপেক্ষা হীন নহে।
একদিন নিশার যুদ্ধে শত্রুগণ দুর্গের
একটি দ্বার ভগ্ন করিয়া ফেলিল ও সেই
পথ দিয়া মোগলগণ দুর্গে প্রবেশ করিবার
উপক্রম করিল। দুর্গবাসী এই বিপদ্ দেখিয়া
যেন চকিতের ভ্রাস্ত রহিল, সহসা তেজসিংহ
বজ্রনাশে কতিপয় রাজ রাঠোর সঙ্গে লইয়া
শক্রমধ্যে পড়িলেন, অসুস্থবলে তাহাদি-
গের গতিরোধ করিলেন। অমাত্যিক
বেগে শক্রসেনা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দুর্গদ্বার
অতিক্রম করিলেন, পরে পশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ
হইলে লক্ষ দিয়া প্রাচীর অতিক্রম করিয়া

শেষিতারূপেই দুর্গে প্রবেশ করিলেন । এই অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়া সমস্ত দুর্গবাসী জয়নাদে দুর্গ পরিপূর্ণ করিল । দুর্জয়সিংহ সে বীরত্ব দেখিলেন, সে জয়নাদ শুনিলেন, রজনী-প্রভাত হইলে দুর্গদ্বার উল্কাটন করিবার আদেশ দিলেন । বিশতমাত্র চন্দাওয়ৎ লইয়া দুর্জয়নীর তেজে সহসা পঞ্চশত মোগলকে আক্রমণ করিলেন । সহসা আক্রান্ত মোগল-গণ সে সরোষ আক্রমণে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া পলাইল । অসমসাহসী চন্দাওয়ৎ পুনরায় দুর্গে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন, চন্দাওয়ারের বীরত্ব-যশে দুর্গ পরিপূর্ণিত হইল ।

এইরূপ পরস্পরে পরস্পরের বীরত্বে যেন জ্বলন্ত হইয়াই অসাধারণ সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । রজনীতে শয্যা ত্যাগ করিয়া চন্দ্রালোকে মশালের আলোকে উভয়ে প্রাচীরের উপর পদচারণ করিতেন, শত্রুসেনা লক্ষ্য করিতেন, শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতেন, আপন আপন সৈন্তগণকে সাহস দান করিতেন । শত্রুগণকে অসতর্ক দেখিলেই উভয়ে মিলিত হইয়া নৈশ আক্রমণে শত্রুসেনা ছারখার করিতেন, ভ্রাতার স্ত্রীর একের পার্শ্বে অস্ত্র যুদ্ধ করিতেন, উভয়েই অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেন, কেহই অস্ত্র অপেক্ষা অগ্রসর হইতে পারিতেন না । শত্রুসেনা ছারখার করিয়া চন্দাওয়ৎ ও রাঠোর একত্রে দুর্গে প্রবেশ করিতেন, পরি-শ্রান্ত তেজসিংহ ও দুর্জয়সিংহ প্রাচীরের উপর একই স্থানে উপবেশন করিয়া সামান্ত কটী ও অপরিষ্কার জলে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি করিতেন, পরে যখন পূর্বদিক্ রক্তিমচ্ছটায় রঞ্জিত হইত, সেই প্রস্তরনির্মিত প্রাচীরের উপর ভ্রাতৃত্বের স্ত্রীর দুই জন পরম শত্রু নিঃসঙ্কোচে নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা বাইতেন ।

রাজপুত-ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত পাঠ কর, কপটচিত্ততার পরিচয় নাই, সত্য-ভক্তের পরিচয় নাই, পরম শত্রুর সহিতও অস্ত্র-সময়ের বা বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় নাই । সম্রাটের বাকালজ্ঞান হইয়াছে, সন্ধি-পত্র লঙ্ঘন হইয়াছে, রাজপুতের সত্যলঙ্ঘন হয় নাই ।

এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল । অবশেষে সূর্য্যমহলে খাদ ও পানীয়দ্রব্যের অভাব হইতে লাগিল, তখন রাজপরিবারকে আর এ দুর্গে রাখা বিধেয় বোধ হইল না । অতিশয় যত্নে রাজ-পরিবারকে ভীমগড়-দুর্গে প্রেরণ করা হইল, দুর্জয়সিংহ ও অস্ত্রান্ত যোদ্ধগণ অর্ধেক ভোজনে প্রাণধারণ করিয়া তখনও দুর্গরক্ষা করিতে লাগিলেন ।

মহুঘোর বাহা সাধ্য, রাজপুতগণ তাহা করিল । আর একমাস দুর্গরক্ষা করিল, কিন্তু অনাহারে প্রাণধারণ করা মহুঘোর সাধ্য নহে । সূর্য্যমহলের দ্বার অবশেষে উন্মোচিত হইল, মোগলগণ ভীষণনাদে দুর্গে প্রবেশ করিল, দুর্গের মধ্যে মোগল ও রাজপুতের মহাকোলাহলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল ।

সে যুদ্ধ বর্ণনা করিতে আমরা অক্ষম, বর্ণনা করিবার আবশ্যকও নাই । রাজপুত-গণ যত্না নিশ্চয় জানিলে মানরক্ষার অস্ত্র কিরূপ যুদ্ধ করে, ইতিহাসের প্রত্যেক পক্ষে তাহা বর্ণিত আছে । মহুঘোর বাহা সাধ্য, রাজপুতগণ তাহা সাধিল, কিন্তু দেশের সহিত একের যুদ্ধ সম্ভবে না, রাজপুত হীনসংখ্য হইয়া ক্রমে হাটিতে লাগিল ।

যুদ্ধতরঙ্গ প্রাণ হইতে তোরণে, তোরণ হইতে গৃহমধ্যে গড়াইতে লাগিল, বন্ধুকের ধুম ও মহুঘোর কোলাহলে সূর্য্যমহল প্রাসাদ পরিপূর্ণ হইল, অল্পসংখ্যক রাজপুত ছিন্ন-ভিন্ন

ও শত্রুবেষ্টিত হইয়া তখনও অসুস্থবাবো প্রাণাধ রক্ষা করিতেছে।

প্রাণাধের শেষ কৃত্যে দুর্জয়সিংহের সহিত তেজসিংহের সহসা দেখা হইল, উভয়েই বড়ল-হস্ত, উভয়েই রক্তাপ্লুত। তেজসিংহ ক্রমশঃ চিন্তা করিয়া কহিলেন, “দুর্জয়সিংহ! চন্দাওরং রাঠোরের বীরত্ব দেখিয়াছে, রাঠোর চন্দাওরতের বীরত্ব দেখিয়াছে, আর যুদ্ধে নিম্ফল, এ যুদ্ধে জীবনদান করাও নিম্ফল। কিন্তু অতঃপর আমরা রক্ষা পাইলে মহারাণার অন্ত কার্য সাধন করিতে পারিব।”

দুর্জয়সিংহ। মহারাণার কার্যসাধন রাজপুতের প্রথম কর্তব্য, কিন্তু অতঃপর পরিজ্ঞাপ পাওয়ার কি পথ আছে?

তেজসিংহ ধীরে ধীরে একটি গবাক্ষের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া কহিলেন, “ভূনিরাছি, ঐ গবাক্ষ দিয়া একজন রাঠোরবালক লক্ষ দিয়া হুদে পড়িয়াছিল, পরে সম্ভরণ দ্বারা জীবনরক্ষা করিয়াছিল। রাঠোর-বালক বাহা করিয়াছিল, চন্দাওরং যোদ্ধা বোধ হয়, তাহা করিতে পারেন।”

লক্ষ্যার রোবে পূর্বকথা স্বরণে দুর্জয়ের মুখ রক্তবর্ণ হইল, হস্তের অঙ্গি কাঁপিতে লাগিল, রোবে পদাঘাত করিয়া সে গবাক্ষ বিদীর্ণ করিয়া লক্ষ দিয়া হুদে পড়িলেন।

তেজসিংহও সে গবাক্ষ দিয়া হুদে পড়িলেন, উভয়ে সম্ভরণ দ্বারা হুদে পার হইলেন। সূর্য্যমহল শত্রুহস্তগত হইল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভীমগড়-ধ্বংস।

ক পতাঃ পৃথিবীপালাঃ সৈন্তবলবাহনাঃ।

প্রমাণসাক্ষীকী বোবাং ভূমিরদাশি ভিত্তিত।

মহাভারতম্।

উপরি-উক্ত ঘটনার পর প্রায় একমাস কাল কোন যুদ্ধ হইল না। ভীমগড়নিবাসী রাজপুতগণ মনে করিল, যুদ্ধ বোধ হয়, এ বৎসরের জন্ত কান্ত হইল, কিন্তু সে আশায় তাহারা অচিরে নিরাশ হইল।

মহারাণা প্রায়ই দুর্গে গমনে না। অল্পসংখ্যক সৈন্ত লইয়া ও উপত্যকায় বাস করিতেন। স্থানে স্থানে সেনাগণকে সন্নিবেশিত করিতেন, সুযোগ পাইলেই অন্ধকার নিশীথে সমস্ত নৈমন্ত লইয়া নিশ্চিন্ত যোগলদীকে সহসা আক্রমণ করিতেন, পুনরায় বহুসংখ্যক যোগলসৈন্ত জড় হইবার পূর্বে যেন ভূগর্ভে বা পর্বতগহ্বরে লীন হইয়া যাইতেন। দিবসে, যামিনীতে, শীতে, বর্ষায়, গ্রীষ্মে, অবিভ্রান্ত প্রতাপসিংহ এইরূপে মেওয়ার রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্ত যুদ্ধ চলিতে লাগিল, মেওয়ার-বিজয় হইল না।

এইরূপে কিছু কাল অতিবাহিত হইলে মুসলমানগণ সহসা একদিন রজনীতে দ্বিসহস্র সৈন্তসমেত ভীমগড়-দুর্গ আক্রমণ করিল। ভীমগড়ে রাজপরিবার আছেন, এ সংবাদ কোনরূপে তাহারা জানিাছিল। রাজপরিবারকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করিলে অবশেষে প্রতাপ তাহাদিগের উদ্ধারের জন্ত অবশ্যই অধীনতা স্বীকার করিবেন, এই আশায় অতঃসংসা মহাকোলাহলে ভীমগড়-দুর্গ আক্রমণ করিল।

রাজপুতগণ নিশাযোগে এই সহসা

আক্রমণের ভয় প্রসূত ছিল না, প্রতাপসিংহ দুর্গে ছিলেন না, দেবীসিংহও কয়েক শত রাঠোর লইয়া মহারাণার সঙ্গে সঙ্গে পর্বতে পর্বতে কিরিতেছিলেন, কেবল বালক চন্দন-সিংহ পাঁচশত মাত্র রাঠোর লইয়া দুর্গে ছিল, আর তেজসিংহও দুর্গে ছিলেন। তিনি রাজ-পরিবাররক্ষার ভার লইয়াছিলেন, কদাপি দুর্গত্যাগ করিতেন না।

মুসলমানদিগের সহসা এই ভীষণ আক্রমণ দেখিয়া তেজসিংহের মুখ গম্ভীর হইল। তিনি ক্ষণেক নিস্তর হইয়া রহিলেন। দুর্গপ্রাচীর হইতে চারিদিকে পিপীলিকাশ্রেণীর স্তায় মুসলমানদিগকে দেখিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পর বালক চন্দনকে সঙ্বাদন করিয়া কহিলেন, “চন্দন! অস্ত্র দুর্গরক্ষা সংশয়ের বিষয়, রাজ-পরিবারকে সংশয়ের স্থানে রাখা বিধেয় নহে। ভীমগড় হইতে নিজস্ব হইয়া যাইবার জন্য জঙ্গলের ভিতর দিয়া এটিক গোপনীয় পথ আছে, তাহা কেবল আমি ও আমার বিশ্বস্ত ভীলগণ জানে। কিন্তু সে পথ অতিশয় বক্র, নিরাপদ স্থানে পৌছিতে সমস্ত রজনী অতি-বাহিত হইবে। বালক! পঞ্চশত রাঠোর লইয়া সমস্ত রজনী দুর্গরক্ষা করা অস্ত্র তোমার কার্য।”

উল্লাসে চন্দনসিংহ উত্তর করিলেন, “প্রভু পূর্বেই দুর্গরক্ষার ভার আমার উপর স্তম্ভ করিয়াছেন, দাস তাহা করিবে। আমাদিগের ধন, সম্পত্তি, জীবন মহারাণার, মহারাণার জন্য এ দাস অস্ত্র যুঝিবে। প্রভু নিশ্চিন্ত হইয়া রাজপরিবার-রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করুন, ভীমগড় সুর্য্যোদয় পর্যন্ত এ দাস রক্ষা করিবে।”

বালকের এ গর্বিত বচন শুনিয়া তেজসিংহ আনন্দিত হইলেন; কহিলেন, “চন্দনসিংহ! তুমি যখন এ কার্যের ভার লইয়াছ, আমার

আর চিন্তা নাই।” পরে দীর্ঘনিশ্বাস কেলিয়া অস্পষ্টভাবে কহিলেন, “কিন্তু যখন দেবীসিংহ প্রত্যাগমন করিয়া পুত্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবেন, তেজসিংহ তাঁহাকে কি বুঝাইবে?”

আর বিলম্ব না করিয়া তেজসিংহ রাজপরি-বার-রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, স্বয়ং ভীমবেশে সমস্ত পথ বাইলেন, কোন্ স্থানে তাঁহাদিগকে লইয়া বাইলেন, পাঠক পূর্বেই তাহা অবগত আছেন।

এ দিকে মুহূর্ত্তমধ্যে দুর্গ-প্রাচীরের উপর মশালের আলোক দৃষ্ট হইল মুহূর্ত্তমধ্যে তিন শত রাঠোর ছুগুগু হইতে নিজস্ব হইয়া স্থানে স্থানে শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; যে স্থানে পর্বত অতিশয় উচ্চ, আরোহণ অতি-শয় কষ্টসাধ্য, রাজপুতগণ সেই স্থানে শত্রুর অপেক্ষা করিতে লাগিল। রাজপুতদিগের সংখ্যা অতিশয় অল্প, কিন্তু সাহস অসাধারণ এবং সেই পর্বতরাশি অপেক্ষা তাঁহাদিগের জ্বর স্থির ও অকম্পিত। বালক চন্দনসিংহ অস্ত্র ধৈর্য্যজ্ঞানে জানী, দৈববলে বলিষ্ঠ, নিঃশঙ্ক-জ্বরে শত্রুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশিষ্ট দুই শত যোদ্ধা দুর্গের ভিতর রহিল।

দেখিতে দেখিতে তরলতেজে মুসলমান আসিয়া পড়িল, যুদ্ধনাদে আকাশ ও মেরিনী কম্পিত করিল। সে ঘোর রজনীর ভরফর যুদ্ধ বর্ণনা করা যায় না। অস্ত্র দুর্গ হস্তগত হইবে, অস্ত্র মহারাণার পরিবার বন্দী হইবে, এই আশায় ঘোর উল্লাসে মুসলমানগণ রাজ-পুতশ্রেণীকে আক্রমণ করিতে লাগিল। মুসলমানের অসংখ্য সেনা, কিন্তু সে পর্বত আরোহণ করিবার একমাত্র পথ, সুতরাং মুসলমানেরা সেই অসংখ্যক রাজপুতসেনাকে চারিদিকে বেষ্টিত করিতে পারিল না। সম্-

দ্রের তরঙ্গের স্তায় বার বার মহাগর্জনে মুসলমান সেই রাজপুত্রের খার উপর পড়িতে লাগিল, কিন্তু জলধিসীমাহ পর্বতপ্রাচীরের স্তায় রাজপুত্রের খার বার বার সে তরঙ্গকে প্রতিহত করিতে লাগিল ।

মহারাজার সম্মান, আমাদের জীবন, আমাদের মাতা, বনিতা, ভগিনী, কুটুম্বিনীর জাতি-ধর্ম সমস্তই আমাদের অসির উপর নির্ভর করে, প্রত্যেক রাঠোর নিশকে এই চিন্তা করিল, নিশকে অসংখ্য শত্রুকে যুদ্ধদান করিল । এ চিন্তায় যত দিন স্বাধীন যোদ্ধার ধমনীতে রক্ত বহিতে থাকে, তত দিন জগতে সে যোদ্ধার পরাজয় নাই । মোগলদিগের সেনা অধিক, কিন্তু রাজপুত্রগণ যবনের অধীনতা স্বীকার করিবে ? এই প্রশ্নে প্রত্যেক রাঠোরের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, কেবল নিশকে অসিগলনে সে প্রশ্নের উত্তর করিল ।

সমস্ত রক্তনী যুদ্ধ হইল । রাজপুত্রযোদ্ধাগণ প্রায় সমস্তই সমুদ্ররণে হত হইল । পূর্বদিকে রক্তমাছটা দেখা দিল, অসংখ্য মুসলমানগণ ভরহর যুদ্ধদান করিয়া অবশিষ্ট কতিপয় রাজপুত্রকে আক্রমণ করিল, উদ্বেল সমুদ্রের তরঙ্গের স্তায় যেন উপরে আসিয়া পড়িল ।

তখন রক্তাপুত্রকলেবরে বালক চন্দনসিংহ পলাইয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য পক্ষাশ্রয় মাত্র রাঠোর দুর্গে প্রবেশ করিল । তাহাদিগের আরক্ত নয়ন, রক্তপূর্ণ পরিচ্ছদ, দীর্ঘ কলেবর ও ভীষণ মুখমণ্ডল দেখিলে বোধ হয় যেন, ব্রহ্মবলে অসুরযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া দেবগণ ধীরে ধীরে আপন আলয়ে প্রত্যাগমন করিতেছেন ।

মহাকোলাহলে মুসলমানগণ তখন দুর্গ আরোহণ করিয়া প্রবেশের চেষ্টা পাইল, কিন্তু কনুঝনাশকে দুর্গকবাট রুদ্ধ হইল । কবাটের

পশ্চাতে অবশিষ্ট নির্ভীক রাঠোরবীরগণ শেব পর্য্যন্ত যুঝিবে, মুসলমান আক্রমণকারীদিগকে রাজপুত্রবীৰ্য্য দেখাইবে ।

৩৭ন মুসলমানগণ তিফিং হত্যাশাস হইল । সমস্ত রক্তনী যুদ্ধ করিয়া শ্রান্ত হইয়াছে, এক্ষণে দেখিল, দুর্গদ্বার রুদ্ধ, বোধ হয়, পুনরায় সমস্ত দিবস যুদ্ধ না করিলে দুর্গবিজয় হইবে না । সেনাপতি সেনাদিগকে অবসর ও শ্রান্ত লক্ষ্য করিলেন ; আদেশ দিলেন, “অতাই ডায়গড় লইব, অতাই প্রতাপসিংহের পরিবার বন্দী হইবে, সৈন্তগণ, ক্ষণেক বিশ্রাম কর ।”

মুসলমানদিগের উত্তমভঙ্গ দেখিয়া চন্দনসিংহ প্রাচীরের উপর উঠিলেন । দেখিলেন, প্রায় এক সহস্র মুসলমান দ্বারের বাহিরে বিশ্রাম করিতেছে বুঝিলেন, যুদ্ধ শেষ হয় নাই, ক্ষণেক নিবৃত্ত হইয়াছে মাত্র । দুর্গের ভিতরে চাহিলেন ; দেখিলেন, কেবল দুই শত জন রাঠোর । যুবকের আ কুঞ্চিত হলে, ললাট চিন্তাচ্ছন্ন হইল । ক্ষণমাত্র চিন্তার পরই যেন প্রতিজ্ঞা স্থির হইল, তখন ঈষৎ হাসিয়া প্রাচীর হইতে অবতীর্ণ হইলেন ।

যোদ্ধাগণকে চারিদিকে ডাকিয়া কহিলেন, “বন্ধুগণ, মহুঘোর বাহা সাধা, রাজপুত্রের বাহা সাধা, তাহা করিয়াছি । আমার পণ রক্ষা করিয়াছি, সূর্য্যদেব আকাশে উদ্ভিত হইয়াছেন । এক্ষণে দুর্গবাহিরে সহস্র যবন, ভিতরে কেবলমাত্র আমরা জীবিত আছি । এক্ষণে তোমাদিগের কি পরামর্শ ?”

একজন রাঠোর উত্তর করিলেন, “রাঠোর সমুদ্ররণে প্রাণত্যাগ ভিন্ন অন্য পরামর্শ জানে না ।”

চন্দনসিংহ । তাহার পর আমাদের মাতা, ভগিনী, বনিতা, যবনের গোলা হইবে ! রাজপুত্র-রমণী দিল্লীতে বিলাসের দ্রব্য হইবে !

রোষে সকলের মুখ রক্তবর্ণ হইল, কোষ হইতে অসি অর্ধেক বহির্গত হইল। তথাপি রাজপুতমণ্ডলী সকলে স্তব্ধ ও বাঁকাশ্রুত। অর্ধশতাব্দীর কেহ কেহ একটি ভয়ঙ্কর কথা উচ্চারণ করিল, “চিতারোহণ !” ক্রমে সকলে সম্মুখে কহিল, “পুরুষের রণশয্যা, রমণীর চিতারোহণ।”

চন্দনসিংহ তখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায় তাঁহার মাতা অমৃত্যু রাঠোরমণী-বেষ্টিতা হইয়া উপবেশন করিয়াছিলেন। পুত্র বাতীর চরণে প্রণত হইলে, মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৃদ্ধের সংস্কার কি?”

চন্দনসিংহ। সংবাদ ভাল। কোন রাজপুত যোদ্ধা যুদ্ধস্থান ত্যাগ করে নাই, শত্রুকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে নাই। বীরা উন্নয় হইয়াছেন, তর্গ এখনও আমাদের হস্তে।

মাতা সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে পুত্রের হস্তে ধীরে কহিলেন, “মাতা! যদি অমৃত্যু রাঠোরমণী নিবেদন করি, পুত্রের যুদ্ধে প্রায় তিন শত যোদ্ধা রাঠোরমণীলোকের জীবনদান করিয়াছেন, এক্ষণে হুর্গে রাঠোরমণীদের অধিক রাঠোরমণীলোকের প্রবেশ করিবার ক্ষমতা নাই।” চন্দনসিংহ বিবাকের সহিত কহিলেন, “বীরের পরম্পরের মধ্যে যোদ্ধার জ্ঞান ক

মাতুল্য বীর, সিংহের গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, “মাতার ষাণ্ডেয় পক্ষাশ্রম জন রাজপুত কি সহ্য সম্মুখ প্রবেশ করিতে ভয় করে?” চন্দনসিংহ কহিলেন, “রাজপুত মহাবীর কহিলেন, “চিতারোহণ করিতে ভয় করে না। যুদ্ধস্থান কামার জন্ত সন্ধ্যার সময়ে প্রথম রক্তাক্ত স্বামীধর্মের পুরস্কার চানি-যুদ্ধে ভূমি তর্গ হারাইয়াছে, বীর

“বৎস, এই কথা কহিতে ভয় করিতেছিলে? রাজপুতবীর মারতে ভয়, রাজপুতরমণী কি মরিতে জানে না? শুধু বৎস, বৃদ্ধের জ্ঞান প্রস্তুত হও, আমরা প্রস্তুত হইতেছি।”

পরে অমৃত্যু রাঠোরমণীদিগকে আহ্বান করিয়া চন্দনের স্ত্রী সহস্র-বদনে কহিলেন, “সখীগণ! সন্ধ্যা আমরা সতী হইব, স্বামীর সোহাগিনী হইব, ইহা অপেক্ষা রাজপুত কামিনীর অদৃষ্টে কি সুখ আছে? যুদ্ধে তুর্গগণ দেখুক, রাজপুত যোদ্ধাগণ বীর, রাজপুতরমণীগণ সতী।

নবোদিত সূর্যালোকে সহস্র নারী স্নানাদি সমাপন করিলেন, দেবদেবীর আরাধনা সমাপন করিলেন, পটুবস্ত্র পরিধান করিয়া রাজসভারে একত্রিত হইলেন। বালা, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা সকলে একত্রিত হইলেন, সকলে আনন্দে দেবতার নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর তাহার পর রাজপুতের পুরাতন বর্ষ অল্পসংখ্যক অলঙ্কারভূষিত সহস্র রমণী উল্লাসবৎ করিতে করিতে চিতারোহণ করিলেন। যখন পরাক্রম, অবমাননা ও ধর্মনাশ অনিবার্য হইল, রাজপুতরমণীগণ এইরূপে সতীত্ব রক্ষা করেন।

সেই অগ্নিশিখার চতুর্দিকে দুই তিন শত রাঠোর-বীর দণ্ডায়মান ছিলেন। নিঃশব্দে তাঁহারা অগ্নিশিখা উদ্ভিত হইতে দেখিলেন; মাতা, বনিতা ভগিনী ও দুহিতাকে চিতার প্রাণবিসর্জন করিতে দেখিলেন। তাঁহাদের জীবনের আর মায়া রহিল না, জগতে আর আশা রহিল না। তাঁহারা প্রান্তঃকালে পবিত্র জলে স্নান করিলেন, দেবদেবীর আরাধনা শেষ করিলেন, পরে নিঃশব্দে শরীরে বর্ষধারণ করিলেন, তদুপরি রক্তবস্ত্র পরিধান করিলেন, শিরে উজ্জল মুকুটের উপর তুলসী পত্র স্থাপন করিলেন, গলদেশে পদ্মমাল্য ধারণ করিলেন, শেষবার

রমেশচন্দ্রের গ্রন্থাবলী।

৩৯৮

আলিঙ্গন করিলেন। তা ব্রাতাকে, সম্ভান
পূর্বে বন্ধু বন্ধুকে, তা হইয়াছে। একপ
পিতাকে নিঃশব্দে আঁচিল। হইয়াছে। একপ
তাই তিন দণ্ড বেলায় পুনর্বার বিস্তৃত
সময় অনুব্রনা শব্দে ছুগুয়ার খুঁচুগিনী, পিসমুদ্র-
মুসলমানেরা দেখিলেন, সেই বার গের আ-
তরকবেগে অগ্ন্যশ্ব্যক রাজপুত বীর নিঃশব্দে
সহস্র মুসলমানকে আক্রমণ করিল। ককে

সে রাজপুতসংখ্যা শীঘ্র নিঃশেষিত হইল,
দুর্গ মোগল-চতুগত হইল। কিন্তু সেই
যুদ্ধে যে মুসলমানগণ পরিভ্রাণ পাইল, তাহারা
সেই ছুই শত বোদ্ধার দ্বকথা বিস্তৃত হইল
না।

পঞ্চাশৎ বর্ষ পরও দিল্লীর কোন কোন
রক্ত মোগল নিজ পুত্র বা পৌত্রকে ভীমগড়-
দুর্গ-বিজয়ের কথা গল্প করিত, রাঠোরদিগের
বুদ্ধকথা গল্প করিত।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:—

বীরদে কাতরতা।

পুরঃসরা বামবতায় যশোবানঃ,
হৃদঃসহস্রাণা নিত্যমীদৃশং।
ভবানুশাস্তেবহিষ্কৃত্যে রতিং,
নৈরাশ্রয়া হন্ত হন্তা মনথিতা ॥

কিরাতার্জুনায়।

বে দিন ভীলদিগের গহ্বরে মহারাজার
হিত পুষ্পের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সে দিন
প্রতাপসিংহ সহস্রা মোগলসৈন্য আক্রমণ
করিয়া বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।
মোগল-সৈন্য অসংখ্য, সমস্ত দিন ও
রক্ত রক্তনী রথা চেষ্টা করিয়া প্রতাপসিংহ

লইলেন। মোগলসৈন্য ক্রমে ভীমচাঁপ ভীলের
আবাসের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, মহা-
রাজা আর তথায় থাকি উচিত বিবেচনা না
করিয়া, সম্ভান ও পুষ্পকে সঙ্গে লইয়া ভূগর্ভস্থ
জাউরার খনিতে বাইরা আশ্রয় লইলেন।
ভীমচাঁপের আবাসে প্রতাপসিংহের পরি-
বারকে না পাইয়া মোগলসৈন্য তথা হইতে
চলিয়া গেল, মহারাজা তখন জাউরার খনি
লইব, ত বাহির হইয়া চাওরনদ্বর্গে স্বাধীন
হইবে, আসিলেন।

হহ, মুসলমান, দুর্গ রক্ষা করাও দুরূহ হইয়া উঠিল।
নিকট-প্রাচীরের দিক হইয়া আসিতেছে, বোদ্ধ-
চাওরনদ্বর্গে সহস্রা আসিতেছে, চারিদিকে
সৈন্যের ষাণ্ডু ক্রিতেছে, বুদ্ধসৈন্যের শিবির দেখা
গণ হীনবল হইতে হইয়াছে, দুর্গার সময় প্রতাপ-
মেঘমালায় ভায় দেখিলেন, জেজু দুর্গের সমস্ত
বাইতেছে। একদিনের ভা কুইলেন।

সিংহ পরামর্শ করিবার জন্য কুলপতিগণ
প্রধান বোদ্ধাদিগকে ডাকিল, তখন ব সমস্ত প্রাচীন
প্রতাপসিংহের দীর্ঘজীবী হইলেন বেষ্টন করিয়া-
বসিয়াছেন, কিন্তু যুদ্ধময়ী চারিদিকে ডাকিয়, আছেন?
বোদ্ধা কমলমীরে রক্তনী বাহা সাধা, রাজপুত হইয়াছেন,
ছিলেন, তাহার রক্তনী ররাছি। আমার ইচ্ছাছেন,
দৈলওয়ারার বাল, দুর্ভাগ্যে সব আকাশে উদিত্যাছেন।
বিজলীর প্রময়কু হইয়া গর্ভবাহিরে সহস্র বন, নি করি-
অস্ত্রাশ্রয় প্রাচীন কুল, দুর্ভাগ্যে জীবিত আছি। আর
প্রতাপ আপনীর চারিদিকে কি পরামর্শ?" পতি
লেন, তাঁহার পুরাতন চিঠি উত্তর করিলেন, "রাহু বুদ্ধ
নাই। নবনব বাল। পিতাগ ভিন্ন অস্ত্র পরপ্রাণ
হইয়াছেন, পিতার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার পর তপার্ণে
করিতেছেন, তাহার জীবিত, ভগিনী, বনিতা, বর্ষতে
মিতে প্রস্তুত। প্রজ্ঞা পাবে হইবে। রাজপুত-রমণী দিবসায়
দেখিলেন, পুত্র অপতারা হইবে। হইবে। হইবে। হইবে।
বসিয়া আছেন, পুত্র হইবে। হইবে। হইবে। হইবে।
ও উপভাষার ব বুদ্ধ

অনেকক্ষণ পর পরাধীন শেষ হইল, কৃত্যগণ ঋতু আনিল। বৃক্ষপত্র-বিনির্মিত পাত্রে সামান্ত আহার লইয়া সকলে আহার করিতে বসিলেন, কিন্তু মেওয়ারের গৌরবের দিনে রাজসভায় যে সমস্ত রীতি প্রচলিত ছিল, তাহার কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই।

সভার মধ্যে সাহসী ও সম্মানিত যোদ্ধা মহারাণার পাত্র হইতে কল বা আহারের দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেন, তাহাকে “হুনা” কহিত। প্রতাপসিংহ অত্ৰ কাহাকে “হুনা” দিবেন, স্থির করিবার জন্ত চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন।

তাহার পার্শ্বে পুত্র অমরসিংহ বসিয়াছেন, অল্পবয়সেই শত বুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, প্রতাপ তাহাকে সোধন করিয়া বলিলেন, “অমরসিংহ! এই ঘোর বিপদকালে তুমি বীরের শিক্ষা শিখিতেছ, বীরের কাৰ্য্য সাধন করিতেছে। কিন্তু অত্ৰ অত্ৰ এক যোদ্ধা আমার ঋতুর ভাগগ্রাহী।”

কিছু দূরে দুর্জয়সিংহ ও তেজসিংহকে দেখিয়া বলিলেন, “চন্দাওয়ার ও রাঠোর! ধন্ত তোমাদের বীরত্ব, ধন্ত তোমাদের স্বামি-ধর্ম। তোমরা উভয়েই আমার জন্ত জীবন পণ করিয়াছ, উভয়েই বিপদের সময় রাজ-পরিবারকে স্থান দিয়াছ, উভয়েই ভ্রাতৃত্বের জ্ঞান পরস্পরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বহু শত্ৰুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছ। তোমরা উভয়েই অতুল্য বীর, কিন্তু অত্ৰ অত্ৰ এক যোদ্ধা আমার ঋতুর ভাগগ্রাহী।”

সম্মুখে প্রাচীন যোদ্ধা দেবীসিংহ বসিয়া ছিলেন, তাহাকে সোধন করিয়া মহারাণা কহিলেন, “দেবীসিংহ! এ কালসময়ে তুমি আমার জন্ত সর্বস্ব হারাষ্ট্রাছ, তোমার বীরত্ব, তোমার স্বামীধর্মের পুরস্কার কি দিব? এ কাল-যুদ্ধে তুমি দুর্গ হারাষ্ট্রাছ, বীর পুত্র

হারাষ্ট্রাছ, পরিবার-কুটুম্ব সমস্ত হারাষ্ট্রাছ, তথাপি ঋতু হতে পর্তে পর্তে আমার সঙ্গী হইয়া কিরিতেছ। প্রতাপসিংহ অনেক রেশ সহ করিতে শিখিয়াছে, কিন্তু তোমার জ্ঞান স্বামী-ধর্মরত যোদ্ধার এই অবস্থা দেখিলে প্রতাপ-সিংহের পাষাণ-হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়। বীরকুল-চূড়ামণি! তোমার বীরত্বের পুরস্কার দেওয়া মহাযাসাধ্য নহে। অত্ৰ আমার আহারের ভাগগ্রাহী হইয়া আমাকে অন্নগৃহীত কর।”

মহারাণার এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ যোদ্ধা সহসা কোন উত্তর করিতে পারিলেন না, বৃদ্ধের নয়ন হইতে একবিন্দু অশ্রু পতিত হইল। অশ্রু-মোচন করিয়া ঈষৎ কম্পিত স্বরে কহিলেন, “মহারাণা! কাতরতা-চিহ্ন কমা করুন, বৃদ্ধের এক বিন্দু অশ্রু কমা করুন। আশা ছিল, এই বৃদ্ধ-বয়সে বৎস চন্দনকে দুর্গ-ভার অর্পণ করিব, বৎস চন্দনকে আমার পৈতৃক ঋণ দিয়া শান্তি লাভ করিব, কিন্তু ভগবান্ অশ্রুপূর্ণ ঘটাইলেন!” ভগবান্কে নমস্কার করি, পুত্র বীর-নাম কলঙ্কিত করে নাই, এ বৃদ্ধও মহারাণার কার্য্যে বীরনাম কলঙ্কিত করিবে না।”

আর কোন কথাবার্তা হইল না, যোদ্ধা-দিগের নয়ন সিক্ত হইল, বাক্যস্ফূর্তি হইল না। নীরবে ভোজন শেষ হইল, মহারাণা মহিষী ও পুত্রদিগের নিকট যাঁইলেন।

অন্ধকার নিম্নাধে একটি পর্বতগহবরের নিকট আগ্ন জলিতেছে, রাজশিশুগণ সেই অগ্নির চতুর্দিকে দোঁড়া দোঁড়ি করিতেছেন, অথবা বিশ্রান্ত হইয়া সেই প্রস্তরের উপর শূণ্যে নিদ্রা বাইতেছেন। রাজমহিষী ও পুত্র কষ্টী প্রস্তুত করিতেছিলেন, পুত্র-কর্ত্তাগণ উঠিলে ঋতু। প্রতাপসিংহ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া কণেক নীরবে এই দৃশ্যটি দেখিতে লাগিলেন। তাহার হৃদয় আজি চিন্তাপূর্ণ।

দুর্গসকল একে একে শত্রুহস্তগত হইয়াছে, সৈন্যসংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে । প্রতাপ-সিংহের আর অর্থ নাই, সশল নাই, রাজ্য নাই, রাজধানী নাই, সেই প্রস্তর ভিন্ন মস্তক রাখিবার স্থান নাই, হৃদয়ের কলত্রপুত্রদিগকে রাখিবার স্থান নাই । কিন্তু এ সমস্ত ক্লেশ প্রতাপসিংহ তুচ্ছ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বীরহৃদয় কাতর হয় নাই ।

কখন কখন রাজমহিষী কোন পর্ত্তগহবরে খাণ্ড প্রস্তুত করিয়াছেন, সহসা শত্রুর আগমনে সেই প্রস্তুত খাণ্ড ভাগ করিয়া দূরে পলাইয়া ছেন । পুনরায় তথায় খাণ্ড প্রস্তুত করিয়া ছেন, পুনরায় তাহা ভাগ করিয়া ক্ষুধার্ত্ত রোরুদ্রমান সন্তান লইয়া পলাইয়াছেন । অবশেষে সেই মেওয়ারে থাকিবার স্থান পান নাই, ভীলদিগের আশ্রয়গ্রহণ করিয়া ভূগর্ভে ও ধনীতে লুকাইয়াছিলেন, তথায় ভীলগণ তাঁহাকে রক্ষা করিত, ভীলগণ তাঁহাকে আহার বোগাইত । কিন্তু এ সমস্ত বিপদ প্রতাপ তুচ্ছ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বীর-হৃদয় কাতর হয় নাই ।

কখন কখন রজনীতে স্বামীপার্শ্বে রাজমহিষী শয়ন করিয়া আছেন, সহসা রাজ্রিযোগে যুধাধারায় বৃষ্টি আসিল, সেই অনাবৃত স্থল ভাসাইয়া লইয়া গেল, সমস্ত রাজ্রি সিক্তদেহে রাজমহিষী বালিকাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া দণ্ডারমান থাকিতেন, কিন্তু সে ক্লেশ প্রতাপ তুচ্ছ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বীর-হৃদয় কাতর হয় নাই ।

কখন কখন রাজপরিবার সমস্ত দিবস অনাহারে জজলে জজলে পলাইয়াছেন, সন্ধ্যার সময় কোন পর্ত্ত-কন্দরে আশ্রয় লইয়া খাণ্ড প্রস্তুত করিয়াছেন । খাণ্ড সহসা মিলে না, কেন্দ্রের “যল” নামক দুর্কার আটা প্রস্তুত করিয়া মহারাজী বহুদূর তাহারই রুটি প্রস্তুত

করিয়া শিশুসন্তানকে দিয়াছেন । একদিন কন্দরবাসী একটি বন্যবিড়াল মাসিয়া শিশুর গ্রাস হইতে সেই রুটি লইয়া পলাইল, শিশু অনাহারে রাজ্রি কাটাইল, ক্রন্দন করিতে করিতে মাতৃবক্ষে সুষ্প হইয়া পড়িল । প্রতাপসিংহ এরূপ ক্লেশও তুচ্ছ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বীর-হৃদয় কাতর হয় নাই ।

কিন্তু অল্প মহারাণার বীর-হৃদয় কাতর, তাঁহার প্রশস্ত ললাট চিন্তারেখাঙ্কিত ।

মহারাণাকে দূর হইতে দেখিয়া মহারাজী পুত্রের হস্তে রুটি রাখিয়া সব্বরে স্বামীকে সম্ভাবণ করিতে আসিলেন । দেখিলেন, স্বামীর চক্ষুজলপূর্ণ । বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “এ কি ? অল্প মহারাণা কাতর কেন ? তুর্কীরা বলিবে, এত দিনে মহারাণা যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, বিপদে কাতর হইয়াছেন ।”

প্রতাপসিংহ । জগদীশ্বর জানেন, যুদ্ধে প্রতাপ পরিশ্রান্ত নহে, বিপদে কাতর নহে ।

রাজী । তবে কি পুত্র-কন্ডার এই দুরবস্থা দেখিয়া কাতর হইয়াছেন ? মহারাণা যদি কষ্ট সহ্য করিতে পারেন, আমা- পক্ষে কি এই কষ্ট অসহ্য হইল ?

প্রতাপসিংহ । জগদীশ্বর আমার পুত্র-কন্ডাকে সুখে রাখিয়াছেন, তোমাকেও সুখে রাখিয়াছেন । রাজ্রি ! এই কালসময়ে অনেক বোদ্ধা শিশুদিগকে হারাইয়াছেন, বৎস অমর-সিংহের স্ত্রায় বীর পুত্র হারাইয়াছে, বীর-প্রসবিনী কলত্র হারাইয়াছে, জাতি-কুটুম্ব সমস্ত হারাইয়াছে । রাজ্রি ! এ কাল-যুদ্ধে অনেক বোদ্ধার সংসার মরুভূমি হইয়াছে, জীবন লুপ্ত হইয়াছে ।

রাজী । ঈশানী তাঁহাদিগকে শান্তিদান করুন, এরূপ শোক মহাব্যয় অসহ্য ।

প্রতাপসিংহ । রাজ্রি ! দেবীসিংহ নামক একজন রাঠোর-বোদ্ধা আমাদের যুদ্ধকার্য্যে

কেশ শুক্ল করিয়াছেন, রাঠোরদিগের মধ্যেও তাঁহার অপেক্ষা বীর কেহ নাই । অধুনা তুর্কাগণ তাঁহার দুর্গ লইয়াছে। তাঁহার স্ত্রী-পরিবার চিত্তাচরণ করিয়াছে, তাঁহার একমাত্র বীর পুত্র তুর্কী-হস্তে হত হইয়াছে । বৃদ্ধ দেবীসিংহ স্বামিধর্ম্য পালন করিয়া কবে নিজ জীবন দান করিবেন, এই আশায় অত্যা-বধি জীবিত আছেন ।

রাজ্যের নয়ন দিয়া অরুণ করিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল, তিনি রোদন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বলিলে, দেবীসিংহের পরিবার সমস্ত গিয়াছে ? দেবীসিংহ একমাত্র বীর পুত্র হারাইয়াছে ? হা বিধাতঃ ! পুত্রশোক অপেক্ষা বিষম বজ্র সৃজন করিতে তুমিও অক্ষম !”

প্রতাপসিংহ । বীর পুত্র গিয়াছে, পরিবার গিয়াছে, তুর্গ গিয়াছে, বংশ-বিনাশ হইয়াছে । সেই বৃদ্ধ আজি আমাকে কহিলেন, “ভগবানকে নমস্কার করি, পুত্র বীর-নাম কলঙ্কিত করে নাই, এ বৃদ্ধও মহারাজার কার্য্যে বীর-নাম কলঙ্কিত করিবে না । এক্ষণ স্বামিধর্ম্যের কি এই পুরস্কার ? বীর অস্ত্রচরগণকে উৎসন্ন করিয়া মেওয়ার-রক্ষায় কি কল ?

অশ্রুপূর্ণ-লোচনে রাজ্যী সন্তানদিগকে খাওয়াইতে বসিলেন, প্রতাপসিংহ চিন্তাতে শাস্তি পাইলেন না, অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, “যদি রাজ্যলোভের এই দুঃসহ যন্ত্রণাই ফল হয়, প্রতাপসিংহ সে রাজ্য চাহে না, রাজ্য-নামে জলাঞ্জলি দিবে !” পরদিন মহারাজা আকবর শাহের নিকট পত্র দ্বারা সন্ধি-প্রার্থনা করিলেন ।

ষড়্ বিংশ পরিচ্ছেদ ।

অপবিত্রে পবিত্রতা ।

কিমণেক্য কলং পয়োধরান,
ধনতঃ প্রার্থয়তে যুগাধিপঃ ।
প্রকৃতিঃ বলু সা মহীয়সঃ,
সহতে নাস্তসমুন্নতিং যথা ॥

কিরাতাচ্ছনীয়ম্ ।

একদিন সন্ধ্যার সময় প্রতাপসিংহ পুনরায় বোদ্ধাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন ; রাঠোর ও চোতানকুল, প্রয়ল ও কালাকুল, চম্পাও-য়ং, সকাওয়ং, জগাওং প্রভৃতি শিশোলীম-কুলের অধিপতিগণ উপস্থিত হইয়াছেন । তাঁহার বালাবধি যুদ্ধক্ষেত্রে শিক্ষা পাইয়া-ছেন, শত যুদ্ধে আপন আপন বীরত্ব ও আপন আপন কুলের গৌরব প্রকাশ করিয়া-ছেন, কিন্তু অগ্ন সভাস্থলে সকলে নীরব !

প্রতাপসিংহ আকবরকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা বোদ্ধাদিগের নিকট কহিলেন । আকবর অবশ্যই সন্ধিদান করিবেন, কিন্তু শিশোলীমগণ কি অধীনতা-স্বীকার করিয়া সন্ধিগ্রহণ করিবে ? প্রতাপসিংহ এই কথা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এই রাজপুতমণ্ডলীর মধ্যে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, এক্ষণ কেহ নাই । সভাস্থলে সকলে নীরব ।

যত দিন যুদ্ধ সাধ্য, তত দিন যুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে মেওয়ার-দেশের একটি উপ-ত্যকা বা পর্বতদুর্গ আর রক্ষা করা যথুষ্যের দুঃসাধ্য । শত্রুগণ নূতন সৈন্ত লইয়া মেওয়ারের প্রায় প্রত্যেক উপত্যকা আচ্ছাদন করিয়াছে, প্রত্যেক দুর্গ হস্তগত করিয়াছে, চারিদিক্ বেটন করিয়াছে, অপ্রতিহতগতিতে অগ্রসর হইয়াছে । যুদ্ধ ?—প্রতাপসিংহ আর কি লইয়া যুদ্ধ করিবেন ? মেওয়ারের আর সৈন্ত নাই, সৈন্তদিগকে বাইতে দিবার

অর্থ নাই, রক্ষা করেন, এরূপ দুর্গ নাই, থাকিবার স্থান নাই। চাওরন্দুর্গে থাকিয়া অচিরে শত্রুহস্তে বন্দী হইবেন, বীরগণ কি এই পরামর্শ দান করিবেন? অথবা অঘর ও মাড়োয়ারের রাজাদিগের স্তায় তুর্কীর অধীনতা-স্বীকার করিবার পরামর্শ দেন? অধীনতা-স্বীকার করিয়া সন্ধিহাপন করা ভিন্ন আর কি উপায় আছে?

বে স্বাধীনতার জন্ত এতদিন পর্তুগে ও উপত্যকায় যুদ্ধ করিয়াছেন, রাজপুতশোণিতে মেওয়ার-দেশ প্রাণিত করিয়াছেন, গৃহ ও প্রাশাদ ত্যাগ করিয়া কন্দরে ও গহ্বরে বাস করিয়াছেন, দিবসে ও রজনীতে ক্রেশ ও বিপদ সহ করিয়াছেন, সে স্বাধীনতা বিসর্জন দিবেন? রাজস্থানের সকল রাজাদিগের উপর স্নেহ পদস্থাপন করিয়াছে, এক্ষণে কি মহারাজার বংশ সেই পদতলে উন্নত মস্তক অবনত করিবেন? বাঙ্গালাওয়ার বংশ, নির্মল শিশোদীয়-বংশ কি এতদিনে তুর্কীর দাস হইবে?

রাজপুত বীরগণানিষ্টক। ইহার মধ্যে কোনটি কর্ভব্য? ইহা ভিন্ন আর কি উপায় আছে? সভাস্থলে সকলে নীরব।

অন্ত দাসত্ব-স্বীকার করিলে কল্যাণ পুনরায় স্বাধীন হওয়া সম্ভব। আকবর মহাবল-পরাক্রান্ত ও অতিশয় বুদ্ধিমান, কিন্তু আকবরের মরণের পর দিল্লীখর সেরূপ ক্ষমতাপন্ন না হইতে পারেন। তখন মেওয়ার পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, কিন্তু এক্ষণে শিশোদীয়বংশ একবার বিনষ্ট হইলে জগতে তাহার নাম থাকিবে না। এইরূপ তর্ক কাহারও কাহারও হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল।

এইরূপ পরামর্শ হইতেছে, এমন সময়ে একজন পত্রবাহক একখানি পত্র লইয়া

আসিল। প্রতাপ দেখিলেন, বিকানীর-রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পৃথ্বীরাজ এই পত্র লিখিয়াছেন। এ পত্র নহে, কয়েকটি কবিতা; পৃথ্বীরাজের স্তায় সুকবি সে সময়ে রাজস্থানে আর কেহ ছিলেন না।

বিকানীর দিল্লীর অধুগত, পৃথ্বীরাজ দিল্লীতে থাকিতেন, তথাপি প্রতাপের বীরত্ব শুনিয়া আনন্দিত হইতেন, মেওয়ারের স্বাধীনতা অরণ করিয়া অপমান অমপান বিন্দিত হইতেন, মনে মনে প্রতাপসিংহকে পূজা করিতেন। সে সময়ে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কে না মনে মনে মেওয়াররাজকে পূজা করিতেন?

আকবর যখন প্রতাপসিংহের সন্ধি-প্রার্থনাপত্র পাইলেন, তখন উল্লাসে পূর্ণ হইলেন। প্রতাপের স্তায় মহৎ শত্রু ভারতবর্ষে আর ছিল না, সেই প্রতাপ সন্ধিপ্রার্থনা করিয়াছেন, অধীনতা স্বীকার করিবেন, এই চিন্তায় আনন্দিত হইলেন, দিল্লীতে আনন্দ-সূচক বাজ ও ধুমধাম হইতে লাগিল। পৃথ্বীরাজ রোষে গজিয়া উঠিলেন, দিল্লীখরকে কহিলেন, “এ পত্র জাল মাত্র, প্রতাপের কোন শত্রু প্রতাপের গৌরবনাশের জন্ত এই পত্র সৃষ্টি করিয়াছে। দিল্লীখর! আমি প্রতাপসিংহকে জানি, আপনার রাজমুহুরের জন্ত প্রতাপসিংহ অধীনতা-স্বীকার করিবেন না।”

পরে পৃথ্বীরাজ প্রতাপকে কবিতাগর্ভে একখানি পত্র লিখিলেন; অন্ত রজনীতে রাজসভার প্রতাপসিংহ সেই পত্র পাইলেন। প্রতাপসিংহ পাঠ করিতে লাগিলেন।

পৃথ্বীরাজের কবিতা।

“হিন্দুর আশাভরসা হিন্দুর উপরই নির্ভর করে।

তথাপি রাগা তাহাদিগকে ভ্যাগ করিতেছেন ।

প্রতাপ না থাকিলে সমস্ত মরুভূমি হইত ।

কারণ, আমাদিগের যোদ্ধাগণ সাহস হারাইয়াছেন, রমণীগণ ধর্ম হারাইয়াছেন । আকবর আমাদিগের জাতিস্বরূপ বাজারের করিব না ।
ব্যাপারী ।

উদয়ের পুত্র ভিন্ন সমস্ত ক্রয় করিয়াছে—
তিনি অমূল্য ।

নরোজার জন্ত কোন্ প্রকৃত রাজপুত
সম্মত বিক্রয় করিবে ?

তৎপ্রতি কত জনে বিক্রয় করিয়াছে ।

সকলেই কল্লিরের প্রধান ধর্ম বিক্রয়
করিয়াছেন :

চিতোরও কি এই বাজারে আসিবেন ?

প্রতাপ সমস্ত ধন ব্যয় করিয়াছেন ।

কিন্তু রত্নটি রক্ষা করিয়াছেন ।

নৈরাশে অনেক এই স্থানে আসিয়া
নিজের অবমাননা দেখিতেছেন ।

হামিরবংশজ কেবল এই অপবন হইতে
রক্ষা পাইয়াছেন ।

জগতে জিজ্ঞাসা করে, প্রতাপ গোপনে
কোথা হইতে সহায়তা পায় ?

তাহার বীরত্ব এবং তাহার ধৃষ্টি হইতে ।

তদ্বারা ক্ষান্ত ধর্ম রক্ষা করিয়াছেন ।

ব্যাপারী চিরজীবী নহে, একদিন
ঠকিবেন ।

তখন আমাদিগের শূত্র ক্ষেত্র বপন-
করণার্থ প্রতাপের নিকট রাজপুত বীজ
লইতে আসিবে ।

তিনিই রাজপুত-বীজ রাখিবেন সকলে
এরূপ আশা করে !

যেন তাহার পবিত্রতা পুনরায় উজ্জ্বল হয় ।”

প্রতাপসিংহ একবার, দুইবার, তিনবার
এই পত্র পাঠ করিলেন । অবশেষে গর্জন

করিয়া কহিলেন, “বীরগণ ! চারিদিকে
অপবিত্রতার যথো প্রতাপসিংহ রাজপুতকুল
পবিত্র রাখিবে ! মেওয়ারে যদি স্থান না হয়,
আমরা মরুভূমি উত্তীর্ণ হইব, অন্তর্দেশে
যাইব, কিন্তু শিশাদীয়বংশ কলুষিত
করিব না ।”

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ।

মেওয়ারের যুদ্ধ ।

দনিতারিঃ প্রণাজ্ঞানপুত্রিদিগ্‌ যুধঃ ।

জয'ন রুধিতো রুষ্টিং স্বরিতত্ত্ব'র্ণবাগতান্ ॥

তেষাং নিগুহমানবাঃ স্তবুঠৈঃ কর্ণভেদিতৈঃ ।

অভূতামিত্রজ্ঞানবাগ্‌ভাণ্ডেবদিশ্‌ জযং ॥

ভট্টিকাবাহ ।

প্রতাপসিংহ দেশত্যাগ করিয়াছেন ।

মেওয়ারে শিশাদীয়-কুলের স্থান নাই ।

শিশাদীয়কুল সিদ্ধমদাভীরে যাইয়া নুতন
রাজ্য স্থাপন করিবে, তথাপি তুর্কার অধী-
নতা-স্বীকার করিবে না ।

প্রতাপসিংহ ও মেওয়ারের প্রধান প্রধান
যোদ্ধাগণ সশস্ত্রে ও সপরিবারে মেওয়ার
ত্যাগ করিয়াছেন, আরাবলীপর্বত অতিক্রম
করিয়াছেন, মরুভূমির প্রান্তে পৌছিয়া
বিশ্রাম করিতেছেন । সম্মুখে, পশ্চিমদিকে
মরুভূমি সন্ধ্যার আলোকে ধূ ধূ করিতেছে ;
পশ্চাতে আরাবলী-পর্বত ও মেওয়ারদেশ ।
সেই পর্বতরাশি এখনও দেখা যাইতেছে,
যোদ্ধাগণ সেই দিকে নিরীক্ষণ করিয়া সকলে
চিন্তাকুল । স্বর্গাদেব অস্ত গিয়াছেন, পুনরায়
বধন উদয় হইবেন, স্বদেশ নয়ন হইতে বহি-
ভূত হইবে, ঐ অনন্ত পর্বতমালা আর
দেখা যাইবে না । যে প্রদেশে শিশাদীয়-
বংশ বহু শতাব্দী বাস করিয়াছে, যে দেশে

সমরসিংহ, সংগ্রামসিংহ প্রভৃতি প্রাতঃসর-
ণীর ভূপতিগণ রাজ্য করিয়াছেন, সে দেশ
চিরদিনের জন্ত নয়নবহিত হইবে।
মেওয়ারের প্রত্যেক পর্বতভূগ ও উপত্যকা
যোদ্ধাদিগের মনে উদয় হইতেছে, যে যে
উপত্যকার পূর্বপুরুষগণ যুদ্ধ করিয়াছেন, যে
যে পর্বতে প্রতাপ অনন্ত যুদ্ধে শোণিতপাত
করিয়াছেন, সে সমস্ত মানসচক্ষে চিত্রের
জায় উদয় হইতেছে। যোদ্ধগণ নীরব ও
শোকাবুল, নীরবে অনন্ত বশঃপূর্ণ আরাবলী-
পর্বতের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। প্রত্যেক
শিবিরে রাজপুতনারীগণ শিশুগণকে ক্রোড়ে
লইয়া সজল-নয়নে আরাবলী-পর্বত দেখাই-
তেছেন।

“শিশোদীয়-বংশ নির্বাসিত হইবে।
সুন্দর মেওয়ারে শিশোদীয়-বংশের আর স্থান
নাই”—প্রতাপসিংহ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া
সভার এই কথা কহিলেন। সভার সকলে
নিবৃত্ত। তদাধো একটি স্বর শুনা গেল—
“এখনও মেওয়ারে শিশোদীয়ের স্থান আছে,
এখনও যুদ্ধের উপায় আছে।” বিস্মিত হইয়া
সকলে সেই দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, বৃদ্ধ
রাজমন্ত্রী ভামাশাহ। বংশাশ্রুতমে ইহারা
মেওয়ারে মন্ত্রীস্বার্থ্য করিয়াছেন।

ভামাশাহ কয়েক মাস অবধি প্রতাপ-
সিংহের নিকট ছিলেন না। প্রতাপ বধন
যুদ্ধ করিতেছিলেন, ভামাশাহ যুদ্ধার্থ অর্থ
সংগ্রহ করিতেছিলেন। সহসা তিনি শুনি-
লেন, প্রতাপসিংহ ও সমস্ত শিশোদীয়কুল
দেখত্যাগী হইতেছেন, যোদ্ধগণ আরাবলী-
পর্বত অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। বৃদ্ধ
মন্ত্রী তখন ক্রতগতিতে পশ্চাতে পশ্চাতে
বাইলেন, অতঃ তিনি প্রতাপসিংহের শিবিরে
উপস্থিত হইয়াছেন, অদ্য সভামধ্যে কল্পিত-
স্বরে বৃদ্ধ বলিলেন, “এখনও মেওয়ারে

শিশোদীয়ের স্থান আছে, এখনও যুদ্ধের
উপায় আছে।”

প্রতাপ চমকিত হইলেন, উৎসাহ ও
নবজাত আশার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,
“মন্ত্রিবর! আপনার কথা বার্থ হয় না, কিন্তু
আর যুদ্ধের কি উপায় আছে, প্রতাপসিংহ
দেখিতেছে না, আপনি নির্দেশ করুন।”

বৃদ্ধ করণোধে রাজসম্মুখে পুনরায় সেই
হির-গস্তোরস্বরে কহিলেন, “দাস বহুদিন
মন্ত্রীত্ব করিয়াছে, দাসের পিতা, পিতামহ,
প্রপিতামহ, বহুপুরুষ পর্যন্ত মেওয়ারের
মন্ত্রীত্ব করিয়াছেন, সে কার্যে বংশাশ্রুতক্রমে
যে ধন সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা এখনও
অস্পৃষ্ট। সে ধনের দ্বারা পঞ্চবিংশ সহস্র
সেনার দ্বাদশ বর্ষ পর্যন্ত ভরণ-পোষণ হইতে
পারে, অহুমতি করিলে দাস সে ধন প্রভু-
পদে উপস্থিত করে।”

পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্যের এই স্বামীদর্শ ও
প্রভুভক্তি দেখিয়া প্রতাপসিংহের নয়ন জল
পূর্ণ হইল, সে জল ধীরে ধীরে মোচন করিয়া
কহিলেন, “মন্ত্রিবর! আপনার এই ভক্তিতে
আমি পরিতুষ্ট হইলাম; কিন্তু রাজপ্রদ
ধন কিরূপে পুনরায় লইব? প্রতাপসিংহ
অদ্য দরিদ্র, তথাপি তাহার অধীনদিগের
ধন হরণ করিতে অক্ষম।”

ভামাশাহ। মহারাণা! এ দাস প্রভুকে
ধন দিতেছে না, মেওয়ার-রক্ষার্থ মেওয়ারকে
দিতেছে, মেওয়ারের অল্পপয়স্ক স্তত মাতার
জন্ত আর কি উপকার করিতে পারে?
শিশোদীয়ের ধন-প্রাণ সমস্তই মেওয়ারের,
তাহা কি মহারাণার অবিদিত? মেওয়ারের
জন্ত আপনারা শোণিত দিতেছেন, আমি
তুচ্ছ ধন দিতে কুণ্ঠিত হইব?

প্রতাপ। মন্ত্রিবর! আপনার যুক্তি
অগুণী, আপনার উদার বদেহভক্তি

বেদতুল্য! আপনার দায় শিরোধার্য করিলাম। আপনার দত্ত অর্থ গ্রহণ করিব, সেই অর্থবলে আর একবার উদ্যম করিব, মেওয়ার উদ্ধার হয় কি না দেখিব।

প্রতাপ সসৈন্তে ফিরিলেন, পুনরায় আরাবলী অতিক্রম করিয়া মেওয়ারে আসিলেন। সেই বিপুল অর্থবলে আর একবার উদ্যম করিলেন, মেওয়ার উদ্ধার হয় কি না, আর একবার দেখিলেন।

সে উদ্যমের ফল ইতিহাসে লেখা আছে, দেওয়ীরের যুদ্ধক্ষেত্রে অদ্যাপি অঙ্কিত রহিয়াছে। শাহবাজ খাঁ সসৈন্তে দেওয়ীরে শিবির সম্মিলিত করিয়া অবস্থিত করিতেছেন, প্রতাপ দেশভাগ করিয়া পলাইতেছেন, এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন, সচসা ঝটিকার স্তার চারিদিকে প্রতাপের সৈন্য আসিয়া পড়িল, দেওয়ীরের প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে শাহবাজ খাঁ সসৈন্তে হত হইলেন।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। আমাইত-পর্বতদুর্গ হস্তগত হইল, তখাকার মুসলমান দুর্গরক্ষক হত হইল।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। কমলমীর-দুর্গ হস্তগত হইল, তখাকার দুর্গরক্ষক আবছুজা সসৈন্তে হত হইল। উদয়পুর হস্তগত হইল, একবৎসরের মধ্যে একে একে দ্বাত্রিংশ পর্বতদুর্গ হস্তগত হইল।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। চিতোর, আজমীর ও মণ্ডলগড় ভিন্ন সমস্ত মেওয়ার পুনরায় প্রতাপের হস্তগত হইল। ভয়ভূত দিল্লীতে বাইরা আকবর শাহকে জানাইল যে, ক্রমাগত দশ বৎসর বিপুল অর্থব্যয়ে মহাবলপরাক্রান্ত আকবর শাহ মেওয়ারে যে জয়লাভ করিয়াছিলেন, প্রতাপসিংহের এক বৎসরের উদ্যমে সে সমস্ত বিলুপ্ত হইয়াছে।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। প্রতাপসিংহ মেওয়ার অতিক্রম করিয়া তাঁহার প্রধান শত্রু মানসিংহের অধর-প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। দেশ পর্য্যন্ত বাতিবাস্ত করিলেন, মল্লপুর নামক প্রধান নগর ও বাণিজ্যস্থান লুণ্ঠন করিলেন।

ইতিহাসের কথা আর এখানে লিখিবার আবশ্যক নাই। উপজ্ঞাসে আমরা উপজ্ঞাস-বর্ণিত দুর্গের কথাই লিখিব। সূর্য্যামল্লদুর্গ পুনরায় রাজপুতগণ আক্রমণ করিল। সে দুর্গ আক্রমণকালে তেজসিংহ ও দুজ্জয়সিংহ প্রাতঃস্মরণে স্তায় পরস্পরের পার্শ্বে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, চন্দাওয়ার ও রাঠোরগণ পরস্পরের সম্মুখে অধিক উত্তেজিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, দুর্ধমনীয় বেগের সম্মুখে মুসলমানগণ দীর হিতে পারিল না।

ক্রমে যুদ্ধের গতিতে তেজসিংহ একদিকে ও দুজ্জয়সিংহ অন্যদিকে বাইরা পড়িলেন, কিন্তু উভয়েই দুর্গে প্রথমে প্রবেশ করিবার মানসে অসাধারণ বীরত্বের সহিত শত্রুসেনা ভেদ করিয়া বাইতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে তেজসিংহই প্রথম প্রবেশ করিলেন, ক্ষণেক পরই চন্দাওয়ারগণ মহাকোলাহলে শত্রুসেনা মন্থন করিয়া দুর্গদ্বার অতিক্রম করিলেন।

তখন তেজসিংহ পুরাতন শত্রুকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, “দুর্গস্বামিন্! আপনার অহুমতি বিনা আপনার দুর্গে পূর্বেই প্রবেশ করিয়াছি, সে দোষ ক্ষমা করিবেন, কেবল মহারাণার কার্যসাধনার্থ এরূপ আচরণ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার দুর্গ আপনি অধিকার করুন, অহুমতি দিলে আমি নিদ্রান্ত হই।”

এ কথায় অজ্ঞপ্তিত-কলেবর হইয়া দুজ্জয়

সিংহ কহিলেন, “রাঠোর, ষটলাক্রমে তুমিই প্রথমে দুর্গে প্রবেশ করিয়াছ। তাহাই হউক, আপনার রাঠোর লইয়া দুর্গরক্ষা কর, আমি কোমার নিকট তিকা চাহি না। আমি সঙ্গেতে দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছি, দুর্গের দ্বার রুদ্ধ কর, পরে যদি চন্দাওয়ৎ অসিতে বল থাকে, সে আক্রমণ করিয়া দুর্গ কাড়িয়া লইবে।”

ধীরে ধীরে তেজসিংহ উত্তর করিলেন, “আমি রাজকার্যসাধনার্থ আপনার দুর্গে আসিয়াছি, এই সুযোগে দুর্গ অধিকার করিলে বিবাসবাতকতা হইবে, রাঠোর বিবাসবাতকতা জানে না। চন্দাওয়ৎ লই-

তেছে নও বিদেশীয় যুদ্ধ শেষ হয় নাই, আমা-
গর মধ্যে যুদ্ধ নিষিদ্ধ। যখন বিদেশীয় যুদ্ধ হইবে, তখন রাঠোর পুনরায় সূর্য্যমহলে সন্মত
নামে বিলম্ব করিবে না।”

ধীরে ধীরে আপন রাঠোর-সৈন্য লইয়া তেজসিংহ দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দুর্জয়সিংহ আরক্তনয়নে সেই রাঠোর-বীরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ইহার কয়েক দিন পর ভামগড়-দুর্গের উদ্ধার হইল, কিন্তু প্রাচীন বোদ্ধা দেবী-সিংহ সেই বিস্তীর্ণ দুর্গ ও প্রাসাদে কেবল প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইলেন। এ জগতে তাঁহার বাহা কিছু প্রিয়স্রবা ছিল, তাহা যুদ্ধক্ষেত্রে বা চিত্তার বিলুপ্ত হইয়াছে!

দেবীসিংহ সেই যুদ্ধক্ষেত্রে একাকী ক্ষণেক দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন, নবজাত সূর্য্য-রশ্মি দেবীসিংহের মুখমণ্ডলে জোড়া করিতেছে, নবজাত প্রভাতের বায়ু সেই শুক্লকেশ লইয়া জোড়া করিতেছে। এ শোকপূর্ণ অসার জগতে পুস্ত্রশোক অপেক্ষা আর দারুণ ব্যথা কি আছে, দেবীসিংহ বোদ্ধা, কিন্তু দেবী-সিংহ মল্লধা।

ধীরে ধীরে তেজসিংহ নিকটে আসিয়া কহিলেন, “পিতার চিরস্মৃতি! আপনাকে আমি কি সাধনা দিব? কেবল এই জিজ্ঞাসা করি, মহারাণার জন্ত সস্বপ্ন-স্বপ্নে রাজপুত-বালক প্রাণ দিয়াছেন, সে জন্ত কি রাজপুত-পিতা কাতর?”

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দেবীসিংহ উত্তর করিলেন, “রাজপুতের ধন, মান, পরিবার সমস্ত মহারাণার, মহারাণার কার্যে শিশু চন্দনসিংহ জীবন দিয়াছেন, সে জন্ত খেদ নাই। এ কাল-সময় বুদ্ধকে রাধিয়া শিশুকে লইল কি জন্ত, কেবল এই চিন্তা করিতেছি! শিশুচন্দন! পিতাকে কেন সঙ্গে লইলি না?”

সেই প্রাচীন মুখমণ্ডলে মল্লধীরের জন্ত কাতরতা-চিহ্ন দৃষ্ট হইল, বুদ্ধের নয়ন হইতে ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

তেজসিংহ দেখিলেন, দেবীসিংহ সামান্য ব্যাধা ব্যথিত হন নাই, তিনি সে ব্যাথাও ভাব্য; জানিতেন। দেবীসিংহের প্রাচীন হস্ত আপন মস্তকে স্থাপন করিয়া কহিলেন, “পিতঃ! আপনি একটি পুত্র হারাইয়াছেন, আর একজন এখনও জীবিত আছে। তেজসিংহ পিতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেছে, পুত্রকে আশীর্বাদ করুন।”

দেবীসিংহ। অগদীয়র তোমাকে কুশলে রাখুন, পিতৃগদীতে পুনরায় স্থাপন করুন।

তেজসিংহ। দেবীসিংহ সহায়তা না করিলে, পিতৃদুর্গ কিরূপে পাইব? রাঠোর-বীর! আপনি পিতাকে গদীতে আরোহণ করিতে দেখিয়াছেন, পুত্রকে কি সহায়তা করিবেন না?

ধীরে ধীরে দেবীসিংহ নয়নের জল মোচন করিলেন, কাতরতা বিশ্বৃত হইলেন, সবল হস্তে অসিধারণ করিয়া কহিলেন,

“দেবীসিংহের জীবনের এখনও আর একটি উদ্দেশ্য আছে, দেবীসিংহ আপন প্রতিজ্ঞা বিশ্বস্ত হয় নাই ।”

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ ।

—৪—

প্রথম আকাশে মেঘরাশি ।

অসারং সংসারং পরিত্যজিতবান্

নিরালোকং লোকং যরণং শরণং বাজবজনম্ ।

অদর্পং কন্দর্পং জননয়নবিশ্রাণকলং

অগজ্জীর্ণাশ্রয়ং কথমসি বিধাতুং ব্যবসিতঃ ॥

মালতীমাধবম্ ।

একদিন সন্ধ্যার সময় তেজসিংহ ভীল-পর্দার ভীমচাঁদকে দেখিতে বাইতেছিলেন, এমন সময় পর্বততলে হ্রদতটে সেই ভীল-বালিকাকে দেখিতে পাইলেন । বালিকা এখনও দেখিতে সেইরূপ, হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে, গীত গাইতে গাইতে নিকটে আসিল । বালিকা গাইল—

“প্রভাতে বাগানে গিয়া দেখে এলেম সই,
কিবা অপরূপ কথা শুনে এলেম সই ।”

তেজসিংহ । আজ কি দেখেছিলি ? কি শুনেছিলি ?

বালিকা । এই শুন না ।

“ফুটেছে মালতী ফুল, গন্ধেতে করি আকুল,
ধেয়ে এল অলিকুল, দেখে এলেম সই ।”

তেজসিংহ । এই দেখেছিলি, আর কিছু না ?

বালিকা । এই শুন না ।

“অলি এসে গান গায়, ফুল শুনে মুগ্ধ হয়,
‘তুমি নাথ’ ফুল কয়, শুনে এলেম সই ।”

তেজসিংহ হাসিতে হাসিতে কহিলেন,
“তুই আত্মশয় ত্যাগী, তোর গান বৃদ্ধিরাছি,
এ ফুলের নাম কি বল দেখি ?”

বালিকা । “ফুলের আবার নাম কি ?

ফুলের নাম পুশ ।” পুনরায় গাইতে লাগিল ।

“অলিরাব ধেরে বাব, বাব ফুলের যধু বাব,
ফুলে কবে সভ্য কর দেখিতে পাই কই ?
প্রভাতে বাগানে গিয়ে দেখে এলেম সই,
কিবা অপরূপ কথা শুনে এলেম সই ।”

তেজসিংহের মুখ গভীর হইল । যোবে বালিকার হাত ধরিয়া কহিলেন, “বালিকা, তুই যদি পুন্সব হইতিস, তোর চপলতার শাস্তি দিতাম ।”

বালিকা । আমি কি করিয়াছি ? আমাকে ছেড়ে দাও, আর আমি গীত গাইব না । গীত গাইলে তুমি রাগ করিবে, তাহা কি আমি জানিতাম ?

তেজসিংহ । পাপীয়াসি ! তুই কি ভক্ত এ গীত গাইলি ? পুন্সের যদি মিথ্যা নিন্দা করিস, অজ্ঞ আমার হস্তে তোর নিস্তার নাই ।

বালিকা । আমি পুন্সের কি জানি, পুন্স কে ? আমি দরিদ্র ভীলকন্তা, আমি ফুল তুলি, ফুলের গান করি, আমি পরের কথা কি জানিব ? আমাকে ছাড়িয়া দাও ।

বালিকা কি সত্যই বালিকা ? বথার্থই কি কেবল ফুলের গীত গাইতেছিল ? তেজসিংহ কখনও বালিকাকে ভাল করিয়া ব্রহ্মিতে পারিলেন না । ধীরে ধীরে ললাটের খেদ মোচন করিয়া ভাবিলেন, “আমি অনর্থক রাগ করিয়াছি ।”

ধীরে ধীরে বালিকার হাত ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, “না, আমি রাগ করিব না, তুই আর একটি গীত গা ।”

বালিকা এবার হাসিয়া করতালি দিয়া গাইল—

“আর শুনেছ আর শুনেছ নতন কথা কই,
পুন্সের হইবে বিরে কিন্তে বাই গো থই ।”

তেজসিংহ। কাহার সহিত বিবাহ হইবে?

বালিকা। কুন্দের আবার কার সঙ্গে বিবাহ হয়? অগ্নির সঙ্গে, আর কার সঙ্গে?

তেজসিংহ। ভীলবালা। তোর হাড়ে হাড়ে বুঝি। পুষ্পকুমারীর সহিত কাহার বিবাহ হইবে, তাহা কিছু শুনিয়াছিস?

বালিকা। তাহা কি জানি? তুমি কি শুনিয়াছ?

তেজসিংহ। পুষ্পকুমারীর সহিত দুর্জয়সিংহের এববার সম্বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু কত্কা তাহাতে সন্মত হন নাই, সে বিবাহ অপেক্ষা যত্ন পণ করিয়াছিলেন।

বালিকা। তাহা শুনি নাই।

তেজসিংহ। কি, শুনিস্ নাই?

বালিকা। সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহা শুনি নাই।

তেজসিংহ। তবে কি শুনিয়াছিস?

বালিকা। শুনিয়াছি, দুর্জয়সিংহের সহিত কোন একটি মেয়ের বিবাহ স্থির হইয়াছিল, এমন সময়ে তুর্কীরা সুর্য্যামহল অধিকার করিল, আর—

তেজসিংহ। আর কি?

বালিকা। কিছু নয়।

তেজসিংহ। আর কি বল, না হইলে প্রহার করিব।

বালিকা। আর সেই কত্কা সেই দুর্গ হইতে পলাইবার আগে নাকি বরকে অঙ্গুরীর দান করিয়াছিল।

তেজসিংহের নয়ন অগ্নির স্তায় জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু তিনি রাগ সংবরণ করিয়া কহিলেন, “তুই বন্য অসভ্য ভীল, তোর উপর রাগ করিয়া কি করিব? সম্মুখ হইতে দূর হ।” সঙ্গেসঙ্গে বালিকাকে ঠেলিয়া হ্রদের জলে ফেলিয়া দিলেন।

বালিকা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া স্তব্ধ করিয়া হ্রদ পার হইল। অপর পার্শ্বে সিন্ধু-কোশে সিন্ধু-বসনে একটি তৃদ শিলা-খণ্ডে দাঁড়াইয়া সেই নৈশ-আকাশ ধ্বনিত করিয়া গীত গাইতে লাগিল।

“আর শুনেহ আর শুনেহ ন্তন কথা কই,

পুষ্পের হইবে বিরে আনতে যাই বই।

যেরে এল বায়ুহাথ, গারে পরিমল সাজ,
অগ্নির মাথার গড়ে বাদ, শুনে কি না সই।”

তেজসিংহ উঠিলেন। দৃষ্টা বালিকার অলীক কথায় তেজসিংহের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। তাহার কারণ, তিনি নানাস্থানে জনপ্রবাদ শুনিয়াছিলেন, পুষ্পকুমারী দুর্জয়সিংহকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, সে প্রবাদ ভীল-বালিকার সৃষ্ট, তাহা তিনি জানিতেন না। এ কথা এতদিন বিশ্বাস করেন নাই, পুষ্পকুমারীর সত্যে সন্দেহ করেন নাই, যুদ্ধের সময় পুষ্পকে কোন কথা জিজ্ঞাসার অবসর পান নাই। কিন্তু অগ্ণ ভীল-কস্তার কথায় সন্দেহ জাগরিত হইল, সে সন্দেহ ক্রমে হৃদয়কে অভিভূত করিতে লাগিল।

অন্ধকারে সেই পর্ত্ত-পথ দি গমন করিতে লাগিলেন। ভীল-বালায় গীত এখনও তাহার কর্ণে শাক্ত হইতেছিল, তাহার মন অস্থির ও বিচলিত। বালিকা মিথ্যাকথা বলিবে কি সত্য?

তবে কি পুষ্প যথার্থই দুর্জয়সিংহের অনুরক্তা হইয়াছেন, দুর্জয়সিংহকে অঙ্গুরীর দান করিয়াছেন, তেজসিংহকে ভুলিয়াছেন? তেজসিংহের হৃৎকম্প হইল।

আবার তিনি পুষ্পের পুষ্পবিন্দিত মূখ-খানি চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই স্নান নয়ন, ঐষড়ির গুণ্ডর, শাদ ললাট ও সরল কথাগুলি স্মরণ করিতে লাগিলেন। পুষ্প

কখন, কখন, কখনও সভ্যলজ্জন করিবে না, তেজসিংহ, কেন আশঙ্কা করিতেছ ?

আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা বিবর মনে প্রাণপূর্ণ হইতে লাগিল, হৃদয় বিচলিত হইতে লাগিল, সম্ভেদ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, হৃদয় উত্তর ও বিশবাস্য হইতে লাগিল ।

পূর্বতের কৃষ্ণাটিকা যেমন ধীরে ধীরে উদ্ভিত হইতে থাকে, ক্রমে বৃহৎ রূপ ধারণ করে, উন্নত স্থির পর্বতকে আবৃত করে, গগনের সূর্য্যও প্রকৃতির প্রাসন্ন মুখচ্ছবি আবৃত করে, অবশেষে দীর্ঘবিলম্বী মেঘরূপ ধারণ করিয়া জগৎ কলুষময় ও গভীর অন্ধকারময় করে, সেইরূপ সম্ভেদ-মেঘ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া অন্ত তেজসিংহের প্রাসন্ন উদার হৃদয়কে আবৃত করিল ; হৃদয়ের সে অন্ধকার ছর্ভেত, অন্ধর পরিষ্কার দীপ্তির আলোক তাহাতে বিলীন হইয়া গেল ।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

সত্যপালন ।

স্বা সম্রাটের মনোমালিন্যে পেশলা ধারণ করি ।

শব্দোৎসবগে নিবৃত্তসকলঃ শব্দোৎসবগে প্রাণতঃ ।
যেবদুতঃ ।

শিপ্রহর রজনীতে চন্দ্রকরোজ্জ্বল পুষ্পো-
জ্জ্বল পাঠক পুষ্পকুমারীকে একবার দেখিয়া-
ছেন, কিন্তু সেদিন চারণদেব তথায় উপ-
স্থিত ছিলেন, সুতরাং পুষ্পকুমারী পরিচয়
দান করেন নাই । যদি পরিচয় জানিবার
অন্ত উৎসুক হইয়া থাকেন, চন্দ্র, অন্ত নিরা-
লয়ে বাইরা সে লাভ্যময়ীর হিত আলাপ
করিব । অন্ত তিনি মহারাজার সহচরীরূপে
রাজপরিবারের সহিত বাস করিতেছেন ।

পুষ্পকুমারী রাজপুত-বালিকা । পুষ্পের
পিতার সহিত তিলকসিংহের অতিশয় প্রায়

ছিল, সেই কারণ তিলকসিংহ নিজ পুত্রের
সহিত পুষ্পের বিবাহ দিতে বীড়িত হইয়া
ছিলেন । দশমবর্ষীয় বালক ও সপ্তমবর্ষীয়া
বালিকার একদিন সাক্ষাৎ হইল ; সেই দিন
একে অন্তকে মনে মনে বরণ করিলেন ।
বিবাহের বাক্যদান হইল, সন্ধা স্থির হইল,
সমস্ত আয়োজন স্থির হইল, শুভকাৰ্য্যের
দিনস্থির হইল, এরূপ সময়ে দিল্লীর আকবর
আগিয়া চিতোরনগরী আক্রমণ করিলেন ।
সে নগর-রক্ষার্থ পুষ্পের পিতা ও তিলকসিংহ
উভয়েই হত হইলেন । কিছু দিন পরে তেজ-
সিংহ পৈতৃক দুর্গ হইতে দূরীকৃত হইয়া
ভীলদিগের সাহায্য গ্রহণ করিলেন ।

সপ্তমবর্ষের বালিকা ও দশমবর্ষের বালক
প্রণয়ের কি জানিবে ? কিন্তু রাজপুতগণ
বাল্যকাল হইতে সত্যপালন করিতে শিখিত,
রাজপুতবালিকা সত্য বিশ্বস্ত হইলেন না ।
একদিনদুই সেই বালকের প্রতিমূর্ত্তি বালিকা
কয়েক দিনের মধ্যে বিশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু
সপ্তমবর্ষে বে সত্য করিয়াছিলেন, জীবনে
তাহা বিশ্বস্ত হইলেন না ।

তিলকসিংহের কুলের অধিকতর অব-
মাননা করিবার জন্য দুর্জয়সিংহ তেজসিংহের
বাগদস্তা বধুকে বলপূর্বক বিবাহ করিবার
মানস করিলেন । পিতার মৃত্যুর পর পুষ্প-
কুমারীর রক্ষক কেহ ছিল না, অথবা বাহারা
ছিলেন, তাঁহারা দুর্জয়সিংহের পক্ষাবলম্বী ও
অর্থভুক । তাঁহারাও দুর্জয়সিংহকে বিবাহ
করিবার জন্য বালিকাকে অহুরোধ করিতে
লাগিলেন । বালিকা উত্তর পাঠাইলেন,
“আমার স্বামী হত হইয়াছেন, আমি বিধবা,
পুরুষের অস্পর্শনীয় ।” সেই দিন হইতে
বালিকা সমস্ত অলঙ্কার ত্যাগ করিলেন ।
তখন পুষ্পের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ মাত্র ।

তদবধি সার্বভৌমিক কিছু কিছু পরি-

প্রথম ও চোঁটায় আমাদিগের শরীর সবল হয়, দৃঢ়বদ্ধ হয়। তৎকালব্যয়সে কিছু ক্রেশ, চিন্তা ও শোকে আমাদিগের মন গঠিত হয়, মানসিক প্রবৃত্তি দৃঢ়তর হয়, প্রতিজ্ঞা স্থিরীকৃত হয়, মানসিক পেশীগুলি যেন স্ফূর্তিপ্রাপ্ত ও বদ্ধ হয়। চিন্তা ও ক্রেশ অপেক্ষা মনের উৎকৃষ্ট শিক্ষক আর নাই, মানসিক দুর্বলতার নিপুণতর চিকিৎসক নাই। চিন্তা লৌহকর্মকারের ভায় বার বার নির্দয় ও সবল আঘাত করিয়া হৃদয়কে গঠিত করে, সে আঘাতে আমরা কাতর হই, আতর্জনাদ করি, কিন্তু কর্মকার নির্দয়, আপন কার্য বিশ্বস্ত হয় না। পরিশেষে আমাদের মন গঠিত হয়, হৃদয় গঠিত হয়, প্রবৃত্তিগুলি স্থিরীকৃত হয়, প্রতিজ্ঞা লোহবৎ দৃঢ় হয়। যিনি বাল্যকাল হইতে অন্তের চোঁটায় পালিত, অন্তের হস্তদ্বারা নীত, বাহ্যকে কখনও চিন্তা করিতে হয় নাই, ক্রেশ অল্পভব করিতে হয় নাই, তাঁহার মন এখনও গঠিত হয় নাই, প্রতিজ্ঞা স্থিরীকৃত হয় নাই; তাঁহার সুখ ও অজ্ঞানতা আমি হিংসা করি না।

বাল্যকালে ক্রেশ পড়িয়া কোমল রাজপুতবালিকার মন গঠিত হইল, লোহবৎ দৃঢ়ীকৃত হইল। আত্মীয়ের ভৎসনা ও ভয়-প্রদর্শনে, পরিচারিকাদিগের অহুরোধে, দুর্জয়সিংহের দূতাদিগের প্রলোভনে বালিকার হৃদয় বিচলিত হইল না, বাল্যকালের প্রতিজ্ঞা আরও দৃঢ়বদ্ধ হইতে লাগিল। লোকে যত দুর্জয়সিংহকে বিবাহ করিবার অন্বেষণ করিতে লাগিল, বালিকা ততই অধিকতর ভক্তিতাবে সেই অজ্ঞাত, অপরিচিত, বীর পুরুষের নামমাত্র পূজা করিতে লাগিলেন। আত্মীয়ের ক্রকুটি ও বন্ধুজনের ভৎসনা নীরবে সহ করিতে শিখিলেন, নিরানন্দ গৃহে বাস করার ক্রেশ সহ করিতে

শিখিলেন, আপন প্রতিজ্ঞা আপন হৃদয়ে গোপন করিতে শিখিলেন। বহু পরিজন-মধ্যে বালিকা একাকিনী বিচরণ করিতেন, একাকিনী চিন্তা করিতেন, একাকিনী পুশ্চরন করিতেন ও হৃদয়ের ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতেন। অভ্যাগে আমাদিগের কোন্ ক্রেশ না সহ হয়? পুশ্চুমারী পরের স্নেহ আর চাহিতেন না, পরের মিষ্টকথা চাহিতেন না, পরের ক্রকুটি বা মর্মেভেদী রহস্যে তাঁহার লোহবৎ হৃদয়ে আর ক্রেশ হইত না, বিধবাবেশধারিণী নবীনা রাজপুতবালা এইরূপে বাল্যকালের সত্যপালন করিতেন। অন্ধকার যত গাঢ় হয়, দীপালোক তত একুটিত ও প্রজ্বলিত হয়; সকলে ভৎসনা ও বিদ্বেষের মধ্যে পিতৃ-মাতৃ-হীনা ও বন্ধুহীনা রাজপুত-বালিকার হির অবচলিত প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর হইতে লাগিল।

দুর্জয়সিংহ অনেক প্রলোভন দেখাইয়া পুনরায় পুশ্চুমারীর হস্ত প্রার্থনা করিলেন। দ্বিতী শতবুখে দুর্জয়সিংহের যশ, পরাক্রম ও বিপুল অর্থের কথা বর্ণনা করিল। পুশ্চুমারী সমস্ত শুনিলেন, হিরস্বরে উত্তর করিলেন, “আমি বিধবা, পুরুষের অম্পর্শ-নোয়া।”

পুশ্চের আত্মীয়গণ এ কথা শুনিয়া অতিশয় রাগান্বিত হইলেন, পুশ্চকে অহুরোধ ও ভয় প্রদর্শন করিলেন, বালিকা অধিকদিন অবিবাহিত থাকিলে নিঃসঙ্গ কূলে কলঙ্ক হইবে বুঝাইলেন। পুশ্চুমারী সমস্ত শুনিলেন, হিরস্বরে উত্তর করিলেন, “আমি বিধবা, পুরুষের অম্পর্শ-নোয়া।”

অবশেষে পুশ্চের আত্মীয়দিগের সহিত যড়যন্ত্র করিয়া দুর্জয়সিংহ পুশ্চকে স্বর্যামহলে আনাইলেন। পুশ্চুমারী দুর্জয়সিংহের অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, “চন্দা-

ওগুংরাজ ! শুনিয়াছি, আপনি অতিশয় বিক্রমশালী, সকলই করিতে পারেন ; কিন্তু পুশ আপনাকে বিবাহ করিবার পূর্বে আশ্বাভিনী হইবে, তাহাও কি নিবারণ করিতে পারিবেন ? শুনিয়াছি, ভিলকসিংহের বিধবাকে হত্যা করিয়াছেন, আর একজন নারী-হত্যার পাতকে পাতকী হইবেন ?”

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

মেঘগজ্জন ।

হিন্দু কিং একং বেপসি ।

অভিজ্ঞানবৃন্দলং ।

কয়েক বৎসর অবধি পুশ এইরূপে একাকিনী চিন্তা করিতেন । সহসা একদিন নিশীথে স্বপ্নের স্তায় একজন চারণদেব সাক্ষাৎ দিয়া পুশকে বলিলেন, “সে অজ্ঞাত, অপরিচিত, বাল্যদৃষ্ট রাঠোর-বীর জীবিত আছেন । তিনি দেশের যুদ্ধ ঘূষিতেছেন, তিনি বাল্য-সত্যপালন করিতেছেন ।”

স্বপ্নের স্তায় সে চারণদেব ও চারণের গীত লয় হইয়া গেল, কিন্তু সে বার্তা পুশের হৃদয় হইতে লয় হইল না । বিধবার হৃদয়ে নব উল্লাস জাগরিত হইল, শুষ্ক লালসার উদ্বেক হইল । প্রাতঃকালের প্রথম আলোক-চ্ছটার যেরূপ সেই উদ্ভানের পুশগুলি বিকসিত হইত, সেইরূপ চারণবার্তার বিধবার হৃদয়-নিহিত আশা, নিহিত ভাব, নিহিত লালসা সহসা প্রাকৃটিত হইল ।

যে অজ্ঞাত বাল্যস্বামীর নাম জগিয়া এতদিন সত্যপালন করিয়াছেন, তিনি জীবিত আছেন ! তিনি নিদর্শন প্রেরণ করিয়াছেন, বাল্যসত্য তুলেন নাই । পুশকুমারী সেই বাল্যকালের কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করি-

তেন, সেই বাল্যস্বামীর মুখমণ্ডল স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেন, এখন যিনি বলিষ্ঠ হইয়া দেশের যুদ্ধ ঘূষিতেছেন, তাঁহার দীর্ঘ অবয়ব ও মুখকান্তি কল্পনা করিতে চেষ্টা করিতেন । বাল্যদৃষ্ট মুখমণ্ডল স্মরণপথে আসিত না অথবা অনেককণ চিন্তা করিলে কিছু কিছু মনে পড়িত । একখানি উন্নত মুখমণ্ডল, প্রশস্ত লম্বাট, উন্নত দেবকান্তি শরীর স্মরণে আসিত । কল্পনা হইত, যেন চন্দ্রালোকে সেই বীর গুণায়মান হইয়া পুশের হস্তধারণ করিয়াছেন, যেন বীরের উচ্চ নিশ্বাস, বীরের তপ্ত ওষ্ঠ সেই হস্ত স্পর্শ করিল । এ যে সেই চারণদেবের মূর্তি !

পুশ বিশ্বাসঘাতিনী নহেন, মনের নিহিত কন্দরেও সেই অজ্ঞাত স্বামী ভিন্ন আর কাহারও চিন্তা ছিল না । তথাপি কল্পনা অতিশয় মায়াবিনী ; যে স্থানের কথা বার বার শুনি, সে স্থান না দেখিলেও কল্পনাবলে মানসচক্ষে যেন সৃষ্ট হয়, অদৃষ্ট পুরুষের রূপা ধ্যান করি, কল্পনাবলে তাহার একটি চিত্র মনে সৃষ্ট হয় । সেই পুরুষের কল্পিত একখানি আকৃতি মনের সম্মুখে থাকে, অপরিচিতের মানসিক যে সমস্ত গুণ আমরা জানি, তদনুযায়ী একখানি মুখচ্ছবি গঠন করিয়া লই পুশ যখন অজ্ঞাত ও বাল্যস্বামীর কথা মনে করিতেন, চারণের দেবতুল্য মুখকান্তি হৃদয়ে জাগরিত হইত । তেজসিংহের অসাধারণ বীরত্বের কথা যখন শুনিতেন, চারণের উন্নত দীর্ঘ অবয়ব, বিশাল বক্ষঃস্থল ও দীর্ঘ বাহু স্মরণ হইত ! তেজসিংহের কর্তব্যের যখন কল্পনা করিবার চেষ্টা করিতেন, সেই চারণের সঙ্গীত-বিনিমিত রজনীকান্ত মিষ্টভাষা কর্ণকুহরে শব্দিত হইতে থাকিত । পুশ অবিশ্বাসিনী নহেন, সত্যপালনের জন্য জগৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু মায়াবিনী কল্পনা-

শক্তি অজ্ঞাত স্বপ্নের স্বপ্নের আকর্ষণ সহিত
বদনং দৃষ্ট চারণের সহিত ততই বিক-
সিত করিত । কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নও কি
সেই মূর্তির দিকে প্রেমান্বিত হইত ? পুন্-
শুমারী আনেন না, আমরাও জানি না ।

চাতক বেল্লপ মেঘের দিকে চাহিয়া
চাহিয়া বিভ্রান্ত হয় না, পুন্শুমারী সেইরূপ
পর্বতপথ চাহিয়া রহিলেন, পুনরায় স্বপ্নদৃষ্ট
সেই নবীন চারণকে প্রতীক্ষা করিতে লাগি-
লেন । পুন্শু চন্দ্রালোকে পনচারণ করিতেন,
নিম্নরু রজনীতে একাকী জাগরিতা থাকি-
তেন । দিবা গেল, মাস গেল, রোপাবিনি-
শ্চিত চন্দ্রালোকে সে নবীনমূর্তি আর দৃষ্ট
হইল না, রজনীর নিম্নরুতার সে স্বর্গীয়
সঙ্গীত আর শ্রুত হইল না ।

আকাশে বেল্লপ কৃষ্ণমেঘের সহিত বিদ্যা-
ভ্রতা জীড়া করে, পুন্শের স্বপ্নে নৈরাশের
সহিত আশা সেইরূপ খেলা করিত । কিন্তু
কখন সে আশা বা চিন্তার কোন পরিচয়
পায় নাই, বিধবা বাণীর নির্মূল স্নান মুখ-
বগুলে কোন ভাব লক্ষিত হইত না ।

সহসা সুসলমানের স্বর্ধ্যমহল আক্রমণ
করিল, নিম্নে অপরিচিত ভীলযোদ্ধার দ্বারা
পুন্শুমারী অন্তহানে নীত হইলেন । তাহার
পর রাজপরিবারের সঙ্গে সঙ্গে পুন্শু ফিরিতে
লাগিলেন । ভীমচাঁদের পাল হইতে জাউ-
রার খনিতে, তাহার পর কখন কন্দরে, কখন
গহ্বরে, কখন উপত্যকার, কখন চাওয়ন্দ-দুর্গে
বাস করিতে লাগিলেন । এখন যুদ্ধ ক্ষান্ত
হইয়াছে, কিন্তু মহারাণা প্রতাপসিংহ প্রাসাদ
তুচ্ছ করিয়া পর্বতশ্রেণীতে বাস করিতেন,
চিতোর শত্রুহস্তে রহিয়াছে বলিয়া, এখনও
ভাগসের রেশ সন্ধান করিয়া, প্রাসাদ তুচ্ছ
করিয়া, কুটীরে বাস করিতেন, রাজরাজী ও
রাজবধু সেই কুটীরে থাকিতেন, রাতশিঙগণ

সেই কুটীরের চারিদিকে জীড়া করিত । বহু
দিন চিতোর উদ্ধার না হয়, তত দিন
প্রতাপসিংহ অন্ত আশ্রয়ে বাস করিবেন না ।
প্রতাপসিংহ জীবিত থাকিতে চিতোর উদ্ধার
হইল না ; ইতিহাসে লিখিত আছে, প্রতাপ
সেই পর্বতশ্রেণীতে প্রাণত্যাগ করেন ।

পর্বতশ্রেণীর পার্শ্বদিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী
বহিয়া বাইত, পুন্শুমারী তথায় সর্বদা জল
আনিতে বাইতেন । অল্প রজনীতে সেই
স্থানে জল আনিতে বাইলেন ও কলস
রাখিয়া নীলমেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে
নিরীক্ষণ করিলেন । অনেকক্ষণ একাকী সেই
দিকে চাহিয়া রহিলেন । তাঁহার স্বপ্নের
চিন্তা আমরা কিরূপে অল্পভব করিব ?

মেঘ গর্জন করিল । সহসা পুন্শুমারীর
স্বপ্ন কাঁপিয়া উঠিল কেন ?—কে বলিবে,
কি জন্ত ?

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

বজ্রাঘাত ।

হৃদয় হৃদয় অঙ্গুলীমস্ত্রা বে অঙ্গুলী

অভিজ্ঞানমহতলন ।

সহসা শুভ্র হইতে পুন্শু একটি সঙ্গীত-
ধ্বনি শুনিলেন । সে সঙ্গীতে পুন্শের স্বপ্ন
আলোড়িত করিল, পূর্বস্মৃতি জাগরিত
করিল । আশার পুন্শুমারীর স্বপ্ন বিকসিত
হইল, আনন্দময় স্বপ্নে পুনরায় সে স্বপ্ন
ভাসিল, শুভপ্রায় লতিকা ঘন আর একবার
মুখ তুলিয়া আকাশের দিকে চাহিল ।

গীত ।

“বর্ষাকালে আকাশে স্তব্ধ ইন্দ্রধনু
দৃষ্ট হয়, তাহার কি কখনো কালি, কি
অনির্বচনীয় রূপ ! সে কণহারা ইন্দ্রধনু

স্বায়ীকে বিশ্বাস করিও, কিন্তু তদপেক্ষা উজ্জ্বলনয়না নারীর সত্যে বিশ্বাস করিও না !

“বক্রগতি কালসর্প কি স্নানর উজ্জ্বল চূড়া ধারণ করে । সে খল সর্পের সরল-তার বিশ্বাস করিও, কিন্তু তদপেক্ষা সুবেশ-ধারিণী নারীর সত্যে বিশ্বাস করিও না !

“জগতে অস্বামী দ্রব্যের স্বায়ীকে প্রত্যয় কর ; চপলা বিদ্যারতার ক্রিয়ে প্রত্যয় কর, জলে অস্থিত রেখার স্বায়ীকে বিশ্বাস কর ; উদ্ধার স্বায়ীকে বিশ্বাস কর ; কিন্তু নারীর সত্যে প্রত্যয় করিও না !

“জগতের মধ্যে চপল, চঞ্চল, মায়াবী, অপ্রকৃত, সমস্ত দ্রব্য একীভূত কর, তাহার উপর নাম লিখ, ‘নারীর সত্যপালন’ ।”

চারণের উগ্রস্বর শুনিয়া পুষ্প স্তম্ভিত হইলেন । ধীর ধীরে চারণদেব নিকটে আসিয়া পুষ্পকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ গীত দেবার মনোনীত হইয়াছে ?”

পুষ্প চকিতের হার দণ্ডায়মান রহিলেন । অনেকক্ষণ পর বলিলেন, “চারণদেব, এ গীতের অর্থ বুঝিলাম না, পূর্বেদিনে আপনি এরূপ গীত গান নাই ।”

সে কোমলস্বরে প্রস্তর দ্রবীভূত হইত, চারণের স্বর হইল না । তিনি কহিলেন, “গীত আমার নহে, আমি যেকুপ শিক্ষিত হই, সেইরূপ গাই ।”

পুষ্প । বিনি আপনাকে গীত শিখাইয়াছেন, তিনি কুশলে আছেন ?

চারণ । কুশলে নাই, তিনি কুস্বপ্নে অতিশয় প্রপীড়িত হইয়াছেন । আপনাকে যে নিদর্শনটি দিয়াছিলেন, তাহা একবার দেখিতে চাহিয়াছেন ।

পুষ্প এবার স্বার্থাভীতা হইলেন । তিনি চারণদত্ত অঙ্গুরীয়টি স্বহস্তে রাখিতেন ; সর্বদা

দেখিতেন, সর্বদা পরিভেন, পুনরায় স্বহস্তে রাখিতেন । কিন্তু যে দিন তিনি ভীষ্মচাঁর ভীষ্মের গহ্বরে নীতা হইয়াছিলেন, সেই দিন হইতে সেই অঙ্গুরীয়টি তিনি ধরিয়া পান নাই ।

চারণ কল্পিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে অঙ্গুরীয়টি কোথায় ?”

পুষ্প তর ও নিক্তর ।

অধিকতর ক্রুদ্ধস্বরে চারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে অঙ্গুরীয়টি কোথায় ?”

অক্ষুটস্বরে পুষ্প কহিলেন, “চারণদেব, অনবধানতা মার্জনা করুন, বীরপুত্রকে জানাইবেন—”

চারণ গর্জন করিয়া তৃতীয়বার এই প্রশ্নটি করিলেন, “সে অঙ্গুরীয়টি কোথায় ?”

পুষ্প । আমি অভাগিনী, সে অঙ্গুরীয়টি হারাইয়াছি ।

চারণ । অভাগিনি ! তাহার সঙ্গে সঙ্গে তেজসিংহের প্রণয় এ জীবনের মত হারাইয়াছ !

বিভাৎ-গতিতে ছদ্মবেশী তেজসিংহ নর-নের অদৃশ্য হইলেন ।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

পৈতৃকদুর্গে প্রবেশ ।

ততো তেরীয়াদক্ষাং পণবানাক নিঃসৃত ।

শব্দেননিবনো অগ্রঃ সংবত্বাছুতোপনঃ ॥”

রাবারণম্ ।

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় তেজসিংহ ভীমগড়-দুর্গে ফিরিয়া আসিলেন । মনে মনে কহিলেন, “চপলা নারীর জন্য বহুদিন বার্থ কাটাইয়াছি, অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইব ।”

ষিপ্রহর রজনীতে চারিদিকে সৈন্ত দ্বিগুণ হইল। এ নিম্নক নিম্নে অসংখ্য রাশিকৃত হইতেছিল, তেজসিংহ তাহার মধ্যে বাইরা কহিলেন, “বন্ধুগণ, বৈরনির্ব্যাতনের সময় উপস্থিত, আমার সহিত অগ্রসর হও।”

বাহারা তেজসিংহের সে গর্জন শুনি, সে নিম্নে তাহার লগাটে জুড়ি দেখিল, তাহাদিগের তিলকসিংহের কথা শ্রবণ হইল। নিঃশব্দে সকলে সূর্য্যমহল-দুর্গের দিকে চলিল।

পর্যন্ত ও উপত্যকার মধ্য দিয়া ষিপ্রহর রজনীতে নিঃশব্দে সৈন্তগণ চলিতে লাগিল। কখন জন্মের ভিতর দিয়া, কখন হ্রদের পার্শ্ব দিয়া, কখন অন্ধকারময় উপত্যকার নীচে দিয়া, কখন পর্যন্তের উপর দিয়া তেজসিংহের সৈন্ত চলিল। বতরূপ সৈন্ত চলিতেছিল, তেজসিংহের মুখে কেহ একটি কথা শ্রবণ করে নাই। সকলে বুঝিল, তিলকসিংহের পুত্রের হৃদয়ে রোমানল জাগরিত হইয়াছে, অষ্ট দুর্জয়সিংহের রক্ষা নাই।

অনেক পর্যন্ত ও উপত্যকা উত্তীর্ণ হইয়া সেনা অবশেষে সূর্য্যমহলের সম্মুখে আসিল। উন্নত শেখর যেন কিরীটের স্তায় দুর্গকে দারণ করিয়াছে, সেই পর্যন্ত ও দুর্গ নৈশ আকাশপটে চিত্রের স্তায় লক্ষিত হইতেছে। চারিদিকে কেবল পর্যন্তমালা ও অনন্ত পাদপঞ্জেরী দেখা বাইতেছে, নৈশ অন্ধকারে সূর্য্যমহল-দুর্গ নিস্তর, জগৎ নিস্তর। ক্ষণেক তেজসিংহ দণ্ডায়মান হইয়া দূর হইতে সেই পৈতৃক দুর্গ দেখিলেন, মনে মনে বলিলেন, “পিতা! অমুমতি দিন, অষ্টাব্দ বর্ষ নিক্সাসনের পর আপনায় পুত্র অস্ত দুর্গে প্রবেশ করিবে।”

নিঃশব্দে সৈন্তগণ সূর্য্যমহলতলে উপ-

শব্দকে আক্রমণ করিবার জন্য কেহ কেহ পরামর্শ দিলেন। তেজসিংহ জুড়ি করিয়া কহিলেন, “পিতার দুর্গে পুত্র তত্ববৎ প্রবেশ করে না। তেজসিংহ রাজপুত, রাজপুত যুগ্ম শত্রুর সহিত যুদ্ধ করে না।”

পরে উচ্চৈঃস্বরে ভেরী বাজাইলেন, ভেরীর শব্দ সে পর্যন্ত ও উপত্যকার বার বার শ্রবিত হইয়া জগৎকে চমকিত করিল। পরে তেজসিংহ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, “অন্ত তিলকসিংহের পুত্র পিতার দুর্গে প্রবেশ করিবেন, বাহার সাধ্য পথ রোধ কর।”

বাহারা সে ভেরীশব্দ, সে গর্জিত কথা শুনি, তাহারা বুঝিল, অস্ত তেজসিংহের গতিরোধ করা মাছুষের সাধ্যাতীত। দুর্গ-প্রহরিগণ নীচের শব্দ শুনিতে পাইল, লক্ষ্য করিয়া দেখিল, পিঙ্গলিকাসারের স্তায় সৈন্ত-শ্রেণী দুর্গে আরোহণ করিতেছে।

তৎক্ষণাৎ তাহারা দুর্জয়সিংহকে সংবাদ দিল। দুর্জয়সিংহ জাগরিত হইয়া দুর্গ-প্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান হইলেন, মুহূর্ত্তের মধ্যে বুঝিলেন, প্রাচীরে অস্ত্রধারী পুরুষ যে সত্য করিয়াছিলেন, অস্ত্র তাহার পালন করিতে আসিয়াছেন। রোষে মনে মনে বলিলেন, “তিলকসিংহের পুত্র! বহুকাল হহতে এই দিন আমি প্রতীক্ষা করিতেছি। আজ হৃদয় শান্ত হইবে, তুমি কি আমি অস্ত্র জীবন ত্যাগ করিব। এ জগতে উভয়ের স্থান নাই।”

দুর্জয়সিংহের আদেশে বিশত বোদ্ধা প্রাচীর হইতে অবতীর্ণ হইল। অবশিষ্ট প্রাচীরের ভিতর রহিল। প্রাচীরের উপরে চারিদিকে মশাল জলিল, দুর্গশিখরের এই আলোক বহুদূর পর্যন্ত চারিদিকের দেশ প্রদীপ্ত করিল, নৈশ গগন উদ্দীপ্ত করিল।

তেজসিংহ দেখিলেন, রিনা যুদ্ধে আর আরোহণ সম্ভব নহে। তখন বজ্রনাথে যুদ্ধের আদেশ দিলেন, স্বয়ং সমস্ত সৈন্তের অগ্রমারী হইয়া বর্শা ও অসিহস্তে শত্রুকে আক্রমণ করিলেন।

সে স্থানে উপরের সৈন্ত নীচস্থ বহু সৈন্তের গতিরোধ করিতে পারিত; কিন্তু তেজসিংহের গতিরোধ হইল না। তাঁহার রাঠোর-সেনাগণ যেক্রম দুর্জয়নীর ও অপ্রতি-হতভেজে দুর্জয়সিংহের সেনাকে আক্রমণ করিল, তাহা দেখিয়া উপস্থিত দুর্গবাসিগণ বিস্মিত হইল। মুহুর্তের মধ্যে প্রচণ্ডনাদ গগনে উখিত হইল, অল্পক্ষণমধ্যে দিশত চন্দ্ৰাওয়ং সৈন্ত বায়ুতড়িত পত্রের স্তায় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িল। অনেকে হত হইল, অনেকে পর্ত্ত হইতে উপলথণ্ডের স্তায় নীচে নিক্ষিপ্ত হইল, অবশিষ্ট দুর্গ-প্রাচীরাদিমুখে পলায়ন করিল। শবরাশির উপর দিয়া তেজসিংহের দুর্জয়নীর রাঠোর-সেনা হুকার-শব্দে অগ্রসর হইল।

দুর্জয়সিংহ উপর হইতে এই ব্যাপার দেখিলেন, নীরবে সসৈন্তে দুর্গপ্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার দন্তপীতি ওষ্ঠের উপর স্থাপিত, নয়ন হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল। তিনি কহিলেন, “তিলকসিংহের পুত্র পিতার স্তায় যুদ্ধ শিখিয়াছে, কিন্তু দুর্জয়-সিংহও দুর্বল হস্তে অসিধারণ করে না। আইস, বীরপুত্র, আজি তোমার যুদ্ধসাধ মিটাইব।”

মুহুর্তের মধ্যে তেজসিংহের সেনা প্রাচী-রের নিকট আসিল। তখন প্রকৃত যুদ্ধাভ্যাস হইল। রাঠোরগণ লক্ষ দিয়া প্রাচীর উল্ল-ঙ্ঘন করিবার চেষ্টা পাইল, চন্দ্ৰাওয়ংগণ বর্শাচালন দ্বারা তাহাদিগের প্রতিরোধ করিতে লাগিল। তেজসিংহের কতক সৈন্ত

প্রাচীরের উপর উঠিল, দুর্জয়সিংহের কতক সৈন্ত উৎসাহে প্রাচীর হইতে লক্ষ দিয়া নীচে আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, অচিরে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই নৈশ অন্ধকারে বা মশালের আলোকে শত্রু মিত্র বিমিশ্রিত হইয়া গেল, কথির-স্রোত বহিতে লাগিল, শবের উপর দণ্ডায়মান হইয়া সেনাগণ যুদ্ধ করিতে লাগিল। প্রচণ্ড যুদ্ধনাথে আহতদিগের আর্ন্তনাদ শ্রুত হইল। যেন শত বৎসরের বৈরভাব সেই রাঠোর ও চন্দ্ৰাওয়ং-দিগের ক্ষুরে আগ্রসিত হইল, যেন সেই বৈর-ভাবে ও জিহ্বাসার ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া চন্দ্ৰা-ওয়ং ও রাঠোর রণস্থল ও সমস্ত পর্ত্তদুর্গ কম্পিত করিল। সালুম্বা ও দুর্জয়সিংহের নাম বার বার ভীষণ হুকারে উচ্চারিত হইতে লাগিল, সে হুকার ডুবাইয়া রাঠোরগণ জয়-মন্ত্র ও তিলকসিংহের নাম করিয়া পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতে লাগিল। নিশাকালে সে যুদ্ধরবে চারিদিকে পর্ত্তত ও উপত্যাকাবাসি-গণ চমকিত হইল; বুঝিল, তিলকসিংহের পুত্র অত্যন্ত পৈতৃক দুর্গে প্রবেশ করিতেছেন।

প্রাচীরপার্শ্বে এইরূপ সময়-তরঙ্গ উথ-লিতে লাগিল, যুদ্ধের নাদ গগনে উখিত হইতে লাগিল। তেজসিংহ সে যুদ্ধে লিপ্ত না হইয়া একাগ্রচিত্তে অন্তরবলে প্রাচীরের দ্বার ভগ্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। দ্বার বৃহৎ বৃক্ষের কাষ্ঠে নির্মিত, কিন্তু অত্যন্ত রক্ষা নাই। তেজসিংহের ঘন ঘন কুঠার-আঘাতে সে দ্বার কম্পিত হইতেছিল। অচিরে প্রচণ্ড শব্দে সে দ্বার ভগ্ন হইল, মহাকালাহলে রাঠোর-সৈন্তগণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

সেই মুহুর্ত্তে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। দুর্জয়সিংহ জানিলেন, এই দ্বার রক্ষা না হইলে দুর্গরক্ষা হইবে না; সুতরাং স্বয়ং সে ভগ্ন-দ্বারের নিকট আসিয়া

শত্রুর পথরোধ করিবার চেষ্টা করিলেন। প্রভুর চতুর্দিকে দুর্গের সমস্ত সাহসী ও বলবান্ চন্দাওরং-বোদ্ধা অড় হইল। তেজসিংহও ভয়ঙ্করের উপর দণ্ডায়মান হইয়া পথ পরিহারের চেষ্টা পাইলেন, তাঁহার সহযোগী রাঠোরগণও সে চেষ্টার কান্ত ছিল না।

মুহূর্তের মধ্যে বোধ হইল যেন, দুই দিক হইতে সমুদ্রের দুইটি উত্তাল তরঙ্গ আসিয়া পরস্পরকে সজোরে আঘাত করিল, সে আঘাতের শব্দ গগন পর্য্যন্ত উখিত হইল। কণেক উভয় পক্ষ পরস্পরের বেগে যেন তরু হইয়া রহিল, কেহ অগ্রসর হইতে পারে না, কেহ পশ্চাতে হাইবে না। অসংখ্য শব্দ সেই ঘোরের নিকট রাশীকৃত হইতে লাগিল, শব্দের উপর দণ্ডায়মান হইয়া রাঠোর ও চন্দাওরং-গণ যুদ্ধ করিতে লাগিল।

দুর্জয়সিংহ সেই দিন যথার্থ বোদ্ধা নাম রাখিলেন। তাঁহার শরীর রক্তাশ্রুত, নয়ন-ঘর অলস। তিনি ভীষণ প্রতিজ্ঞায় সে ঘোর-রক্ষা করিতেছিলেন, রাক্ষসবলে শত্রুদিগকে প্রতিহত করিতেছিলেন, বজ্রগর্জনে আপন সেনাদিগকে প্রোৎসাহিত করিতেছিলেন। কিন্তু তেজসিংহ অস্ত্র যেন দৈববলে বলিষ্ঠ, তাঁহার গতি অশ্রু রোধ করা মহাবীর অসাধ্য। অমাত্যবিক বলে সেই শত্রুরাশি প্রতিহত করিয়া প্রচণ্ডনাদে সেই ঘারে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ঢালের সম্মুখে যেন কোন মস্তবলে মহাব্যবল হটিয়া গেল! বীরের নয়নঘর অলিতেছে, উকীষ ও শরীর রুধিরাক্ত, দক্ষিণহস্তে শালবৃক্ষের স্তায় দীর্ঘবর্শা কাঁপাইয়া তিলক-সিংহের পুত্র পৈতৃক দুর্গে প্রবেশ করিলেন।

মহাকোলাহলে মেদিনী ও আকাশ কম্পিত হইল, রাঠোর সৈন্য অষ্টাদশ বর্ষ পরে সূর্য্যমুখলে প্রবেশ করিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—

পুল্লশোক-বিমোচন।

সম্মান্যে বুৎলানাং পরিচানাং নিঃশব্দৈঃ

সম্মান্যে নভ্যবাস্তবস্ত কুন্তিতাঃ সপ্তসাগরাঃ।

সামান্যশ্চ।

যখন দুর্গবীর ভয় হইল, যখন রাঠোরগণ মহাকোলাহলে দুর্গে প্রবেশ করিল, তখন দুর্জয়সিংহ এক মুহূর্ত চিন্তা করিলেন। বীরে বীরে ললাটের খেদ ও রক্ত অপনো করিলেন, রাঠোর ও চন্দাওরং-র যুদ্ধ মুহূর্তের ক্ষণ নিরীক্ষণ করিলেন।

কণেক দৃষ্টি করিয়া স্থিরভাবে তেজসিংহকে কহিলেন, “রাঠোরবীর! তোহার যুদ্ধে আমি তুষ্ট হইয়াছি। তোমা পিতার স্তায় ঐ বাহতে অসাধারণ শক্তি ধা কর। কিন্তু এবার সাবধান! চন্দাওরং! আমাদের দুর্গ গিয়াছে, কিন্তু মা বীর নাই; রাজপুতমান রক্ষা কর, চন্দাওরং-কুলের মান তোমাদের হস্তে।”

এই কথা শুনিয়া চন্দাওরংগণ ভীষণ-গর্জনে মেদিনী ও আকাশ কম্পিত করিল। সকলে বুঝিল, এখনও রাঠোরদিগের বিজয়-সংলগ্ন, চন্দাওরং প্রাণ দিবে, কিন্তু অস্ত্র যুদ্ধে পরাজয়-স্বীকার করিবে না।

নৈরাশ-বলে বলিষ্ঠ হইয়া যেন ভয়সেতু জলতরঙ্গের স্তায় এবার চন্দাওরংগণ রাঠোরের উপর পড়িল। এবার রাঠোরগণ অগ্রসর হইতে পারিল না, সমুদ্রতরঙ্গসম চন্দাওরং-তরঙ্গের সম্মুখে ক্রমে হটিতে লাগিল।

অসুরবর্ষা তেজসিংহ রোষে গর্জন করিয়া আপন দীর্ঘবর্শা চালনা করিতে লাগিলেন। সে গর্জনে বার বার পর্বত-দুর্গ

কল্পিত হইল, কিন্তু মরণে কৃতসংকল্প চন্দাওরং-বীরগণ কল্পিত হইল না! ক্রমে রাঠোরগণ হটিতে লাগিল।

রাঠোরগণ প্রভুর উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া রাক্ষসের ভায় ঘূষিতে লাগিল, বার বার চন্দাওরংমণ্ডলীকে বেগে আক্রমণ করিল, বার বার চন্দাওরং-বেগ প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিল। সে বুধা চেষ্টা; সেই অল্পসংখ্যক কৃতসংকল্প চন্দাওরংমণ্ডলী যেন সহসা দৈববলে বলিষ্ঠ হইয়াছে, তাহাদিগের গতিরোধ করা মায়াবের অসাধ্য। সে গতি-রোধ হইল না, রাঠোর-সৈন্য হটিতে লাগিল।

“তিলকসিংহের প্রাসাদে তিলকসিংহের পুত্র প্রবেশ করিবে, সৈন্যগণ! পশ্চাদ্ধিকে কোথায় বাইতেছে?”—এই বলিয়া অবশেষে প্রাচীন রাঠোর দেবীসিংহ খড়্গহস্তে লক্ষ দিয়া চন্দাওরংমণ্ডলীর উপর পড়িলেন, তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য এবার সমস্ত রাঠোর অগ্রসর হইল। অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক চন্দাওরং তখন ছারখার হইয়া প্রায় সকলে নিহত হইল, রণ সাঙ্গ হইল।

শোণিতাক্ত-কলেবর প্রাচীন দেবীসিংহ তখন তেজসিংহের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, “তেজসিংহ! আমাব সঙ্কল্পসাধন হইল, আমাকে বিদায় দাও। তোমার পিতার ন্যায় যশস্বী হও, বৃদ্ধের অন্য আশীর্বাদ নাই।”

দেবীসিংহের জীবনশূন্য কলেবর ভূমিতে পতিত হইল! দুর্জয়সিংহের অব্যর্থ বর্শায় তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ হইয়াছিল।

বৃদ্ধ শেষ হইল। চন্দাওরং প্রায় সকলে হত হইয়াছে, কেবল দুর্জয়সিংহ ও তাঁহার কতিপয় যোদ্ধা জীবিত আছেন। দুর্জয়সিংহের খড়্গ ভগ্ন, ললাট কথিরাঙ্ক, নয়ন হইতে অগ্নিকুলির বহির্গত হইতেছে;

চন্দাওরংবীর তখনও ঘূষিতে প্রবৃত্ত, দুর্গ-পিপাসা তখনও নিবারণিত হয় নাই, জীবিত থাকিতে হইবে না।

পরাজিত দুর্জয়সিংহকে কেহ প্রাণে বধ না করে, তেজসিংহের পুর্বেই আদেশ ছিল। এক্ষণে রাঠোরগণকে জিহাংসার কিণুপ্রায় দেখিয়া তেজসিংহ পুনরায় উচ্চনাদে কহিলেন, “দুর্জয়সিংহের শরীরে যিনি অস্ত্রবর্ষণ করিবেন, তেজসিংহ তাঁহার শত্রু।”

রাঠোরগণ কান্স হইল। সেই নিস্তর-তার মধ্যে কেবল একটি শব শুনা গেল;—“প্রভুর আদেশ শিরোধার্য; কিন্তু জলন্ত অগ্নির ন্যায় পুঞ্জশোক এখনও হৃদয়ে জ্বলিতেছে, ঐ আমার পুত্রহত্যা।”

নিমেষমধ্যে জিহাংসা-তাক্তিত বৃদ্ধ গোকুলদাস লক্ষ দিয়া দুর্জয়সিংহের হৃদয়ের উপর ছুরিকা বসাইল, আহত দুর্জয়সিংহও ভগ্ন খড়্গ ধারী গোকুলদাসের মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন, দুইটি মৃতদেহ জড়িত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল! এত দিনে গোকুলদাসের পুঞ্জশোকা-বমোচন হইল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অদুরীয় ও রত্ন।

অদ্য অভূতাবনতাজি। ভবান্নি দাস! হুয়ারসম্ভব।

পাঠক! চল, এ যুদ্ধের ভীষণ গণ্ডগোল হইতে আমরা মহারাগার কূটরে বাই, তথায় অভাগিনী পুষ্পের সহিত দেখা হইবে।

সন্ধ্যাকালে সেই নদীতীরে পুষ্পকুমারী একাকী জল আনিতে আসিয়াছেন। সে

সর্বসহ নারীর লগাট শুধুমাত্র পূর্ববৎ পরি-
 কার, নয়নস্বয় পূর্ববৎ স্থির। বিষম বাস্তবায়
 কেহ পুষ্পকে একবিন্দু অকপাত করিতে
 দেখেন নাই, কাছারও নিকট স্নেহ বাচনা
 করিতে দেখেন নাই। একাকিনী যে বনে
 একদিন মুখস্বয় দেখিয়াছেন, এখন সে স্বপ্ন
 লীন হইয়াছে, জীবনের আশা লুপ্ত হইয়াছে,
 জগতের সমস্ত মুখ নির্বাণ হইয়াছে, এখনও
 একাকিনী ক্লমের নৈরাশ্র বহন করিতে-
 ছেন। কাহারও স্নেহ চাহেন না, কাহারও
 সহানুভূতি প্রতীক্ষা করেন না।

বালিকার মুখস্বয় সেইরূপ পরিষ্কার—
 পরিষ্কার, কিন্তু স্নেহৎ পাণ্ডুরণ। নয়ন সেই-
 রূপ স্থির, কিন্তু স্নেহৎ কালিমাবেষ্টিত।
 স্নেহের চক্ষু বায়া কেহ সে মুখখানি দেখিলে
 বৃত্তিতে পারিত, কোন গভীর অব্যক্ত চিন্তা
 রমণীর পরিষ্কার মুখস্বয়ের উপর ছায়া স্তম্ভ
 করিয়াছে। কিন্তু বাল্যকাল অবধি স্নেহ-
 ভূষ্টিতে সে মুখখানি কেহ দেখে নাই।

পুষ্প সন্ধ্যার সময় ধীরে ধীরে নদীকূলে
 আসিতেছেন, ক্রমে গমন করিয়া দেখি-
 লেন, পশ্চাতে ভীলকড়া। পুষ্প কহিলেন,
 “বালিকা, তোমার পিতা মহারাজীর বিপ-
 দের সময় আমাদিগকে স্থান দিয়াছিল, তাহা
 মহারাণা কখনও ভুলিবেন না। তুমি কি
 রাজ্ঞীকে দেখিতে আসিয়াছ?”

বালিকা। না দেবি, এই নদীকূলে
 একটি চাপাফুল লইতে আসিয়াছি, আমাকে
 একটি ফুল দিবে?

পুষ্প। হাঁ, লইয়া যাও।

বালিকা। দেবি! তোমার মুখখানি
 শাদা কেন?

পুষ্প। কৈ, না।

বালিকা। আমি জানি।

পুষ্প। কি জান?

বালিকা। তোমার মুখখানি শাদা
 কেন, জানি।

পুষ্প। কেন?

বালিকা। কোন দ্রব্য হারাইয়াছে।

পুষ্প। কি দ্রব্য?

বালিকা। এই সোনার কোন গহনা,
 হার কি বালা, কি আংটি।

পুষ্প শিহরিয়া উঠিলেন, ধীরে ধীরে
 বলিলেন, “হাঁ বালিকা, আংটি আংটি
 হারাইয়াছি, তার সঙ্গে সঙ্গে একটি রত্নও
 হারাইয়াছি।”

বালিকা। তাহার জন্ম তুঃখ কেন?
 একটি আংটি গিয়াছে, অল্প একটি হইবে!

পুষ্প। অঙ্গুরীর গেলে অঙ্গুরীর হয়,
 কিন্তু যে রত্নটি হারাইয়াছি, তাহা এ জীবনে
 আর পাইব না।

বালিকা। কি রত্ন পুষ্প? মুক্তাহার?
 বুকে পরিবার জিনিস?

পুষ্প। হাঁ বালিকা, সে বুকে পরিবার
 জিনিস; কিন্তু মুক্তা অপেক্ষা উজ্জ্বল, মুক্তা
 অপেক্ষা দুঃখুলা!

বালিকা। তবে কি হবে?

পুষ্প। এ জীবনে পুষ্পকুমারী অনেক সহ
 করিতে শিখিয়াছে, এ কতিপয় সহ্য ক'রবে।

বালিকা তীক্ষ্ণনয়নে পুষ্পের মুখের দিকে
 চাহিতেছিল, পুষ্পের চক্ষু দিয়া ধীরে ধীরে
 একবিন্দু জল বহিয়া পড়িল। বালিকা
 উর্দ্ধদিকে চাহিল, যেন একটি চাপাফুলের
 দিকে দেখিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে
 সেও চক্ষু মুছিল।

অনেকক্ষণ সেই উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া
 বালিকা কহিল, “দেবি! আমাকে ঐ
 চাপাফুলটি পাড়িয়া দাও, তাহা হইলে আমি
 তোমার রত্নটি খুঁজিয়া দিব। আমি বন-
 জন্মে বেড়াই, পাইলেও পাইতে পারি।”

ভীলকন্টার সরলতা দেখিয়া পুষ্প কোন উত্তর করিলেন না, ধীরে ধীরে সেই চাপা-কুলটি পাড়িয়া ভীলের হস্তে দিলেন। বাংলা-চন্দ্রলতা ত্যাগ করিয়া গভীরস্থরে ভীলকন্টা বলিল, “কল্যা পুষ্পকুমারী আপন রত্ন ফিরিয়া পাইবেন।”

পরদিন উষার রক্তিমচ্ছটা পূর্বাধিক রঞ্জিত করিয়াছে, ‘এরূপ সময়ে পুষ্পকুমারী রত্নটি ফিরিয়া পাইলেন। স্বর্ধ্যামহলের অধিপতি তেজসিংহ পুষ্পকুমারীর নিকট সজলনয়নে কমা প্রার্থনা করিতেছেন। পুষ্পের ক্ষীণ হস্ত দুটি মননজলে সিঁদ্ধ করিয়া কমা প্রার্থনা করিতেছেন।

সন্ধ্যায় পুষ্পকুমারী দেখিলেন, স্বর্ধ্যা-মহল-দুর্গের সেই দেবকান্তি দীর্ঘকাল চারণবে। উল্লাস ও উৎসেগে পুষ্প সংজ্ঞাহীন হইলেন, তেজসিংহ পুষ্পের নিশ্চেষ্টে কম্পিত কলেবর আপন বিশাল হৃদয়ে ধারণ করিলেন।

তেজসিংহের সহিত মহাসমারোহে পুষ্পকুমারীর বিবাহ হইল, স্বয়ং মহারাণা সে বিবাহ-সভার উপস্থিত হইলেন, “স্বয়ং মহারাজী পুষ্পকুমারীকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার গলদেশে আপনার মুক্তাহার দোলাইয়া দিলেন।

সে স্নিগ্ধের রক্তনী কে বর্ণনা করিতে পারে? সে তুষিত হৃদয়ের প্রথম স্নেহের উচ্ছ্বাস কে বর্ণিতে পারে? তেজসিংহ সেই পুষ্পবিনিমিত্ত দেহ নিজ হৃদয়ে ধারণ করিয়া সেই সূক্ষ্ম গুণ ঘন ঘন চূষন করিয়া কহিলেন, “পুষ্প! পুষ্প! একদিন তোমাকে অস্ত্রায় সন্দেহ করিয়া রোষ দিয়াছিলাম, তেজসিংহের সে দোষ তুমি ক্ষমা করিয়াছ?”

পুষ্পকুমারী সজলনয়নে কহিলেন, “দেব! তোমার দোষ যে দিন গ্রহণ করিব, সে

দিন যেন পুষ্প জীকিত না থাকে। বাড়না আমার নিজের দোষের উপযুক্ত শাস্তি, তোমার দত্ত প্রিয় অঙ্গুরীয় আমি কিরূপে হারাইলাম?”

তেজসিংহ সেই পুষ্পবিনিমিত্ত গুণে পুন-রায় চূষন করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, “পুষ্প, ক্ষোভ করিও না, তোমার দোষ নাই, সে অঙ্গুরীয় তুমি হারাও নাই।”

পুষ্প। আমি হারাই নাই, তবে কে হারাইল? আহা! এবার যদি পাই, চিরকাল এই হৃদয়ে ধারণ করি, আমার জীবনে আর ক্ষোভ থাকে না।

তেজসিংহ। ঈশানী তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন।

এই বলিয়া ধীরে ধীরে আপন হৃদয় হইতে সেই অঙ্গুরীয় বাহির করিয়া পুষ্পকে দিলেন; পুষ্প চকিত হইলেন, বাস্পোৎফুল্ল-লোচনে বার বার সেই অঙ্গুরীয় চূষন করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন। পরে বাস্পোৎফুল্ল-লোচনে স্বামীর নিকে চাহিলেন, কথা কহিতে পারিলেন না।

তেজসিংহ পুনরায় সেই সিন্ধু গুণ চূষন করিয়া আপন হস্ত দ্বারা পুষ্পের অঙ্গমোচন করিয়া দিলেন। ধীরে ধীরে একখানি পত্র বাহির করিয়া পুষ্পের হস্তে দিলেন। পুষ্প-কুমারী পড়িয়া দেখিলেন, সে ভীলকন্টার প্রেরিত। সে পত্র এই,—

“তেজসিংহ! তোমার অঙ্গুরীয় একদিন হারাইয়াছিলে, মনে পড়ে? সেদিন তুমি বালিকাকে বলিয়াছিলে, সে যদি খুঁজিয় পায়, অঙ্গুরীয় তাহার। পুষ্পকে ও মহা-রাজ্ঞীকে তুমি একদিন আমাদের বাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছিলে, মনে পড়ে? সেই দি বালিকা পুষ্পের বক্ষঃস্থল হইতে সেই অঙ্গুরীয় লইয়াছিল। পুষ্প তখন নিদ্রিত ছিল।

“বালিকা মনে করিল, পুষ্পের হাতে পাঁচটি অঙ্গুলী, বালিকার হাতে পাঁচটি অঙ্গুলী, পুষ্প যদি অঙ্গুরীয় পরিতে পারে, বালিকা তাহার অধিকারিণী নহে কেন? যে ভীল ও রাজপুতকে গড়িয়াছে, সে ত এক প্রকারি গড়িয়াছে; তবে পুষ্প বাহার অধিকারিণী, ভীলবালা তাহার অধিকারিণী নহে কেন?”

“কিন্তু আমি বালিকা, আমার বুদ্ধিতে ভুল হইয়াছে। তেজসিংহ বাগানের ফুল ভালবাসেন, বনফুল ভালবাসেন না। সে দিন রাজ্যে বাগানের ফুলগুলি লইয়া বুদ্ধি তুমি পুষ্পকে অঙ্গুরীয় দিয়াছিলে? আমার বনের ফুল, এই জন্ত বুদ্ধি আমাকে কিছু দাও নাই? আমি বালিকা, সকল কথা বুদ্ধিতে পারি না।

“রাজ সন্ধ্যার সময় পুষ্পকে দেখিতে গিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, তার কাছে ছুটি বাগানের ফুল চাহিয়া লইব। সে বলিল, তুমি তাহাকে অঙ্গুরীয়টা দিয়াছিলে, তাহার সঙ্গে একটি রত্ন দিয়াছিলে। আমি অঙ্গুরীয়টি পাইয়াছি, কে, রত্নটি ত পাই নাই।

“পুষ্প বলিল, অঙ্গুরীয় অপেক্ষা রত্নটি উজ্জ্বল। তবে আমার এই অঙ্গুরীয় রাখিয়া কি হইবে? এই পত্র যাঁহা দ্বারা পাঠাইতেছি, তাহা দ্বারা অঙ্গুরীয়টিও পাঠাইতেছি, পুষ্পের দ্রব্য পুষ্পকে ফিরাইয়া দিও।

“পুষ্পকে রত্নটি ফিরাইয়া দিব বলিয়াছিলাম, কিন্তু সেটি অনেক খুঁজিয়াও পাই নাই, আমার ভাগ্যে ভুটে নাই। যদি তুমি পুষ্পের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া থাক, পুষ্পকে ফিরাইয়া দিও।”

একবার, দুইবার, তিনবার পুষ্প এই চিঠি পাঠ করিলেন; শেষে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “নির্বোধ বালিকা, অঙ্গুরীয়টি

স্বন্দর দেখিয়াছিল, সেই জন্ত চুরি করিয়াছিল।”

বালিকা পিতৃগৃহে বাস করিতে লাগিল, কিন্তু গৃহের কার্য করিতে শিখিল না। সর্বদা পর্তুতে ও উপত্যকার বেড়াইত, আর একাকী সেই হৃদয়তে বসিয়া গান করিত। পালের অশ্রান্ত ভীল-নারীগণ তাহাকে গালি দিত, তাহার স্বভাব দেখিয়া কেহ তাহাকে বিবাহ করিল না।

সেই চন্দ্রনগরে অনেক দিন অবধি নির্জন কন্দরে ও উন্নত শিখরে রজনী দ্বিপ্রহরের সময় একটি রমণী-কণ্ঠনিঃসৃত গীত শ্রুত হইত। অতি প্রত্নাবে পথিকগণ কখন কখন সেই পর্তুতহৃদের তীরে একটি রমণীর পাণ্ডু মুখ ও উজ্জল নয়ন দেখিতে পাইত। লোকে বলিত, কোন বিশ্রামশূন্য উদ্ভিয়া প্রেতকন্তা হইবে।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা।

এতিকূলতামুগতে হি বিধৌ বিকলববেতি বহুসামন্তা।

অবলম্বনায় দিনভট্টরভূৎ ন পিণ্ডব্যতঃ করসংস্রবণি।

শিশুপালবধঃ।

১৫২৭ খৃঃাব্দে প্রতাপের মৃত্যু হয়।*

তাহার পর সত্ৰাট আকবর প্রায় আট

* যে ইতিহাস অবলম্বন করিয়া উপভাস ‘রচিত হইল, সেই ইতিহাস হইতে এতাদৃশ সংঘর্ষ হই একটি মন্তব্য এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

“Pertap Succeeded to the titles and renown of an illustrious house, but without a capital, without resources, his kindred and clans dispirited by reverses yet possessed of the noble spirit of his race, he

বসন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন ; তিনি জীবিত থাকিতে যেওয়ার-বিজয়ের আর কোন উদ্ভব হয় নাই ।

meditated the recovery of Cheetore, the vindication of the honour of his house, and the restoration of its power. Elevated with his design, he hurried into conflict with his powerful antagonist nor stooped to calculate the means which were opposed to him. Accustomed to read in his country's annals the splendid deeds of his forefathers, and that Cheetore had more than once been the poison of their foes, he trusted that the revolution of fortune might co-operate with his own efforts to overturn the unstable throne of Delhi. The reasoning was as just as it was but whilst he gave a loose rein to those lofty aspirations which meditated liberly to Mewar, his crafty opponent was counteracting his views by a scheme of policy which when disclosed filled his heart with anguish. The wily Mogul arraved against Pertap his kindled in faith as well as blood. The princes of Marwar, Amber, Bikaner and even Boondi late his firm ally, took part with Akbar and upheld despotism. Nay, even his own brother, Sagarji deserted him and received as the price of his treachery, the ancient capital of his race, and the title which that possession conferred.

But the magnitude of the peril confirmed the fortitude of Pertap who vowed, in the words of the bard to make his mother's milk resplendent ; and he amply redeemed his pledge Single-handed, for a quarter of a century, did he withstand the combined efforts of the empire ; at one time carrying destruction into the plains, at another flying from rock to rock, feeding his family from the fruits of his native hills, and rearing the nursing hero Umra amidst savage beasts and scarce less savage men, a fit heir his prowess and revenge. The bare idea that the son of Bappa Rawul should bow the head to mortal man, was insupportable ; and he spurned every over-

বাহাদীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যেওয়ার-বিজয়ের উদ্ভব করিতে লাগিলেন । প্রতাপের সপ্তদশ সন্তানের মধ্যে

ture which had submission for its basis, or the degradation of uniting his family by marriage with the Tatar, though lord of countless multitudes.

"The brilliant acts he achieved during that period live in every valley ; they are enshrined in the heart of every true Rajput, and many are recorded in the annals of the conquerors. To recount them all or relate the hardships he sustained, would be to pen what they would pronounce who had not traversed the country where tradition is yet eloquent with his exploits, or conversed with the descendants of his chiefs, who cherish a recollection of the deeds of their forefathers, and melt, as they recite them in to many tears.

"It is worthy the attention of those who in flinence the destinies of states in more favoured climes to estimate the intensity of feeling which could arm this prince to oppose the resources of a small principality against the then most powerful Empire of the world whose armies were more numerous and far more efficient than any ever led by the Persian against the liberties of Greece. Had Mewar possessed her. Thuoydides or her Xenophon, neither the wars of the Peloponnesus nor the retreat of the "Ten Thousand" would have yielded more diversified incidents for the historic muse than the deeds of this brilliant reign amid the many vicissitudes of Merwar. Undaunted heroism, inflexible fortitude that which keeps honour bright, perseverance—with fidelity such as no nation can boast, were the materials opposed to a soaring ambition, commanding talents, unlimited means, and the favour of religious zeal, all however insufficient to contend with one unconquerable mind, There is not a pass in the Alpine Araxai that is not sanctified by some deed of Partap, some brilliant victory, oftener more made glorious of defeat. Huldighat is the Thermopylae of Mewar ! the field of

ভ্যেচ অমরসিংহ প্রতাপের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রতাপ যুত্য়কালে অমরসিংহকে চিত্রকাল দ্বিতীয় সহিত যুদ্ধ করিবার আদেশ দিয়া বান, অমরসিংহ ও সুমু পিতার নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন। পুত্রের যতদূর সাধ্য, পিতার এই আদেশ পালন করিলেন, জাহাঙ্গীরের অনন্ত সৈন্তের সহিত অমরসিংহ বোড়শ বৎসর যুদ্ধে যুঝিলেন, মোগল-সৈন্ত পরাস্ত করিয়া দেশ রক্ষা করিলেন। জাহাঙ্গীর প্রতাপের ভ্রাতা সাগর-জীকে রাজপনে অভিষিক্ত করিয়া চিতোরে প্রেরণ করিলেন। ভ্রাতৃশূন্য অমরসিংহ দেশের অন্ত যুদ্ধ করিতেছেন, আর তিনি স্বয়ং বোংলের অধীন হইয়া চিতোর-দুর্গ রক্ষা করিতেছেন, এ চিন্তা সাগরজী সহ্য করিতে পারিলেন না। ভ্রাতৃশূন্যকে চিতোর-দুর্গ দিয়া জাহাঙ্গীরের নিকট বাইয়া রোষে অভিমানে আত্মহত্যা করিলেন।

এত দিনে চিতোর উদ্ধার হইল বটে, কিন্তু মোগলদিগের সহিত আর যুদ্ধ করা অসম্ভব। প্রতি যুদ্ধে অমরসিংহের সৈন্ত ও অর্থনাশ হইতে লাগিল, তিনি বিজয়লাভ করিয়াও যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিলেন, তাহা পূরণ করা হুঃসাধ্য। মন্থব্যোর যতদূর সাধ্য, অমরসিংহ ততদূর চেষ্টা করিলেন; অবশেষে ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে মোগলের অধীনতা স্বীকার করিলেন। সম্রাটের পুত্র শুলতান কুর্খের নিকট তিনি অধীনতা স্বীকার করিলেন, পরে নিজ পুত্র করুণকে শুলতানের সহিত অজমীরে জাহাঙ্গীরের শিবিরে প্রেরণ করিলেন।

শুলতান কুর্খ (যিনি পরে শাহজিহান নামে ভারতবর্ষের সিংহাসনে আরোহণ
Dewair her Moeathon "Tod's Anuals and Antiquities of Rajasthan."

করেন) যুবরাজ করুণকে লইয়া অজমীরে বাইলেন। এতদিন পর মেওয়ার-বিজয় হওয়াতে জাহাঙ্গীর অতিশয় আশ্চর্যিত হইলেন ও যুবরাজ করুণকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। যুবরাজকে আপন আসনের দক্ষিণদিকে অঙ্গন দিলেন, অনেক খিলৎ ও বহুমূল্য উপহার দান করিলেন এবং সজ্জা করিয়া রাজী হুজ্জিহানের নিকট লইয়া গেলেন। হুজ্জিহান নাম অগধিখ্যাত, তিনি বেক্রপ স্তম্ভরী ছিলেন, সেইরূপ ক্রমশঃ শক্তি ছিলেন। স্বামীকে তাঁহার অঙ্গনচন্দ্রায় রূপলাবণ্য ও চতুরতার বিমোহিত করিয়া রাখিতেন, অসাধারণ বুদ্ধিবলে সমগ্র ভারতবর্ষের শাসন নিরীহ করিতেন।

হুজ্জিহান যুবরাজ করুণকে আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন এবং খিলৎ, হস্তী, ঘোটক, অসি প্রভৃতি নানাদ্রব্য দান করিয়া যুবরাজের মনস্তৃষ্টি করিলেন। সম্রাট ও রাজী উভয়ের যতদূর সাধ্য, যুবরাজের সম্মান করিলেন, কিন্তু প্রতপসিংহের পৌত্রের ললাট পরিষ্কার হইল না। প্রাতঃস্বয়ং প্রতাপসিংহ স্বদেশের রাজা ছিলেন; অমরসিংহ ও করুণ এক্ষণে স্বদেশের জায়গীরদার। অজমীরের মহা ধুমধামের মধ্যে, ভারতেশ্বর ও ভারতেশ্বরীর সমাদর ও সম্মানের মধ্যে করুণের জয়গল কুঞ্চিত, করুণের ললাট মেঘাচ্ছন্ন।

এইরূপ বহু সম্মান ও উপহার দিয়া সম্রাট করুণকে বিদায় দিলেন। সম্রাট স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, তিনি করুণকে এই সাক্ষাতে সর্বজন্য দাদশ লক্ষ টাকার উপহার ও একশত দশটি অশ্ব ও পাঁচটি হস্তী দিয়াছিলেন; ইহা ভিন্ন শুলতান কুর্খ অন্ত উপহার দিয়াছিলেন।

করুণ বিদায় পাইয়া স্বদেশাভিমুখে

চলিয়া গেলেন। দিনের যুবধাম শেষ হইল।
রাজনীতে জাহাঙ্গীর হুজ্জিহানের নিকট
বাইয়া হাত করিয়া কহিলেন, “করুণ
কখনও সম্রাটের সভা দেখে নাই, সেই জন্য
লজ্জাশীল ও সর্বদা নতশির।”

লাবণ্যময়ী হুজ্জিহান তাঁহার একটি
সুখার হাসি হাসিয়া পতির দিকে আরত-
নয়নে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, “সম্রাট, তাহা
নহে, আমাদের সৈন্তবলে মেওয়ার অধীন
হইয়াছে, কিন্তু চিরস্থায়ী শিশৌদীরদিগের
এখনও অধীনতা অভ্যাস হয় নাই।”

হুজ্জিহানের কথা যথার্থ। অমরসিংহ
প্রতাপসিংহের পুত্র, অধীনতা সহ্য করিতে
পারিলেন না। সুলতান কর্ণ যখন দিল্লী-
শরের কর্ণ্য দিতে আসিলেন, অমরসিংহ
তাহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। সুলতান
কর্ণ মানসিংহের ভাগিনেয়, রাজপুত-মাতার
পুত্র, তিনি রাজপুতের উচিত সম্মান জানি-
তেন। তিনি অমরসিংহকে বলিয়া পাঠাই-
লেন, “আমি কেবল মহারাণার বন্ধু চাহি,
আর কিছু চাহি না। মহারাণা, আপনি
রাজধানী হইতে বাহিরে আসিয়া কেবল
দিল্লীশরের কর্ণ্য গ্রহণ করুন, আমি মেওয়ার-
প্রদেশ হইতে মুসলমান-সৈন্ত সমস্ত বাহিরে
লইয়া বাইব।”

বিজিত রাজাকে কেহ এরূপ সম্মান করে
না, তথাপি মহারাণা বিজিত, এক্ষণে দিল্লী-
শরের কর্ণ্যবলে দেশ শাসন করিতে হইবে,
এ কথা অমরসিংহ মনে স্থান দিতে পারি-
লেন না। তিনি পিতার নিকট যে সভা
করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিলেন, কর্ণ্য
গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

অমরসিংহ আপনার বোদ্ধাদিগকে
রাজসভায় আহ্বান করিলেন। চোহান ও
রাঠোর, বালা, প্রমর ও শিশৌদীর সকলে
রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। তেজসিংহ
উপস্থিত হইলেন; তাঁহার বয়স্ক্রম এক্ষণে
পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু শরীর পূর্ববৎ
দীর্ঘ, শক্ত ও বলিষ্ঠ। তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার
বালক গজপতি সিংহ * পিতার বর্ষা
করণ করিতে শিখিতেছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে
পিতামহের নাম রাখিতে শিখিতে-
ছিলেন।

দূত আসিয়া নিবেদন করিল, রাজধানীর
দ্বারদেশে সুলতান কর্ণ উপস্থিত আছেন,
মহারাণা গাইলে কর্ণ্য দান করিয়া দিল্লী
প্রত্যাবর্তন করিবেন। সভাস্থ সকলে নিস্তব্ধ,
নির্বাক। অনেককাল পর সমস্ত বোদ্ধার
সম্মুখে অমরসিংহ, পুত্র কর্ণের ললাটে
রাজসীমা দিলেন; কহিলেন, “প্রতাপসিংহের
পুত্র পিতার নিকট যে অঙ্গীকার করিয়া-
ছিলেন, তাহা বিশ্বস্ত হইবেন না। যুবরাজ
অস্ত্র হইতে রাজা হইলেন, আমি বৃদ্ধ, বান-
প্রস্থ অবলম্বন করিলাম।”

সেই দিন (খ্রিঃ ১৬১৬) অমরসিংহ রাজধানী
উদয়পুর ত্যাগ করিয়া নচৌকী নামক স্থানে
বাইয়া বাস করিলেন। তাহার পর তিনি
পাঁচ বৎসর জীবিত ছিলেন, কিন্তু আর রাজ-
ধানীতে প্রবেশ করেন নাই, রাজদণ্ড গ্রহণ
করেন নাই।

* বাহারা গজপতিসিংহের কথা জানিতে চাহেন,
তাঁহার “মাতৃবীক্ষণ” আখ্যায়িকা পাঠ করিবেন।

the first of these is the fact that the
the second is the fact that the
the third is the fact that the
the fourth is the fact that the
the fifth is the fact that the
the sixth is the fact that the
the seventh is the fact that the
the eighth is the fact that the
the ninth is the fact that the
the tenth is the fact that the

the eleventh is the fact that the
the twelfth is the fact that the
the thirteenth is the fact that the
the fourteenth is the fact that the
the fifteenth is the fact that the
the sixteenth is the fact that the
the seventeenth is the fact that the
the eighteenth is the fact that the
the nineteenth is the fact that the
the twentieth is the fact that the

the twenty-first is the fact that the
the twenty-second is the fact that the
the twenty-third is the fact that the
the twenty-fourth is the fact that the
the twenty-fifth is the fact that the
the twenty-sixth is the fact that the
the twenty-seventh is the fact that the
the twenty-eighth is the fact that the
the twenty-ninth is the fact that the
the thirtieth is the fact that the

the thirty-first is the fact that the
the thirty-second is the fact that the
the thirty-third is the fact that the
the thirty-fourth is the fact that the
the thirty-fifth is the fact that the
the thirty-sixth is the fact that the
the thirty-seventh is the fact that the
the thirty-eighth is the fact that the
the thirty-ninth is the fact that the
the fortieth is the fact that the

উৎসর্গ-পত্র ।

এই শতাব্দীতে যাহারা হিন্দুদিগের পথপ্রদর্শক-
রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন,
হিন্দুধর্মে ও হিন্দুশাস্ত্রে যাহারা স্বদেশীয়দিগকে
শিক্ষা দান করিয়াছেন,
সামাজিক উন্নতি ও জাতীয় ঐক্যসাধন-বিষয়ে
যাহারা আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন,
বঙ্গভাষায় গদ্য সাহিত্য যাহারা স্বহস্তে
সৃষ্ট ও ভূষিত করিয়াছেন—
রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
এই মহাত্মাদিগের নাম গ্রহণ করিয়া এই গ্রন্থ
উৎসর্গ ক রলাম ।

চৈত্র-সংক্রান্তি,

১২৮২ বঙ্গাব্দ

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত ।

বিন্দুর জন্মের পাঁচ বৎসর পরে তাহার একটি ভগিনী হইল। বড় মেয়েটি একটু কাল হইয়াছিল, ছোট মেয়ের রং পরীর মত; চক্ষু দুটি কাল কাল ভ্রমরের ঠার সুল্লর ও চঞ্চল, মাথার সুল্লর কাল কাল চুল, লাল ঠোঁট দুটিতে সदाই সুধার হাসি। গরিবের এ অমূল্য ধনকে গরিব বাপ-মা চুখন করিয়া তাহার সুধাহাসিনী নাম দিলেন। কিন্তু ভালবাসা ভিন্ন সুধার আর কিছু জুটিল না, বরং দুইটি মেয়ে হওয়াতে বাপ-মার আরও কষ্ট বাড়িল। ছোট মেয়ের জন্ম একটু দুখ চাই; এমন সুল্লর মেয়ের হাত দুখানি খালি রাখা যায় না, দুই একখানা গহনা হইলে ভাল হয়, পাড়াপড়সীর বাজী লইয়া বাইবার সময় একখানি ঢাকাই কাপড় পরাইয়া লইয়া গেলে ভাল হয়। কিন্তু এ সব ইচ্ছা পূরণ হয় কোথা থেকে? বাপ-মার মনে কত সাধ হয়, কিন্তু উপায় কৈ? গরির-চুঃখীর আবার কিসের সাধ?

এইরূপে বিন্দুর পিতা অনেক কষ্টে সংসার নির্বাহ করিতে লাগিলেন, বিন্দুর মাতা কষ্টকে কষ্ট বলিয়া গ্রাহ্য না করিয়া স্বামীর সেবা ও কত্তা দুটিকে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে সূর্যোদয়ের পূর্বে উঠিয়া বাসন ধুইতেন, ঘর ঝাঁট দিতেন, উঠান পরিষ্কার করিতেন, কন্যা দুটিকে খাওয়াইতেন, স্বামীর জন্য রন্ধন করিতেন। স্বামীর ভোজনান্তে পুকুরে বাইয়া স্নান করিতেন ও জল আনিতেন। বিপ্রহরে আহার করিয়া কন্যা দুটিকে লইয়া সেই সুল্লর বৃক্ষের ছায়ায় ভূমিতে কাপড় পাতিয়া সুখে বিশ্রাম করিতেন। আবার বৈকাল-বেলা পুনরায় রন্ধনাদি সংসারকার্য্য করিতেন। তথাপি এ সংসারে বিন্দুর মাতা অপেক্ষা করজন স্বামী? লক্ষ লক্ষ দরিদ্র

গৃহস্থের মধ্যে বিন্দুর মাতা সংসারে সহ্য কষ্ট থাকিলেও তিনি স্বামী পাঁহিয়াছিলেন, স্বপ্নের মণির ঠার দুইটি কত্তা পাঁহিয়াছিলেন, সমস্ত দিন পরিশ্রম ও কষ্ট করিতে হইলেও তিনি সেই শান্ত সংসারে কতকটা শান্তিভোগ করিতেন, দরিদ্রা রমণী ইহা অপেক্ষা সুখ আশা করেন না।

কিন্তু তাহার এ সুখ ও শান্তি অধিক দিন রহিল না। দারুণ বিধির বিড়ঘনা! সুধার জন্মের তিন বৎসর পরে হরিদাসের কাল হইল। হতভাগিনী সুধার মাতা তখন ললাটে করাঘাত করিয়া হৃদয়বিদারক ক্রন্দন-ধ্বনিতে পে ক্ষুদ্র পল্লী কাঁপাইয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন। ভগবান কেন এ দরিদ্রের একটি ধন কাড়িয়া লইলেন—কেন এ হতভাগিনীর একটি সুখ হরণ করিলেন—এ আঁধারের একটি দীপ নির্বাণ করিলেন? বিধবার আন্তনাদ শুনিয়া গ্রামের লোক জড় হইল, চাষা-মজুরগণ সেই পথ দিয়া বাইবার সময় একটু একটু অশ্রুবর্ষণ করিয়া গেল।

তাহার পর এক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। হরিদাসের যে অমী ছিল, তাহা তারিগীবাবু এখন চাব করান, বৎসরের শেষে হাত তুলিয়া বাহা দেন, বিন্দুর মাতা তাহাই পান। তাহাতে উদরপূষ্টি হয় না, মেয়ে দুটিকে মানুষ করা হয় না, ঘরের বেড়া দেওয়া হয় না, বৎসর বৎসর চাল ছাওয়া হয় না। বিন্দুর মাতা তখন সেই জীর্ণ কুটার বিক্রয় করিয়া ভাসুরের ঘরে আশ্রয় লইলেন। সে বাড়ীর রন্ধনাদি সমস্ত কার্য্য তাহাকেই করিতে হইত, তিনি বিন্দু ও সুধাকে কেলিয়া বাড়ীর ছেলেদের কোলে করিয়া থাকিতেন, তাহাদের জল আনিতেন, বাসন মাজিতেন, ঘর ঝাঁট দিতেন। তাহা

ভিন্ন আশ্রিত লোকের অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়, কিন্তু বিন্দুর মাতা কটু কথাই উত্তর দিতেন না, ভিন্নকারে ক্ষুব্ধ হইতেন না, কখন কখন তাঁহার মুক্ত স্বামীর নিন্দা করিলে বা পিতাকে নাম ধরিয়া গালি দিলে তিনি নীরবে শাকবগের আসিয়া ঢুকুৱ জল মুছিতেন;—ভাবিতেন, “আহা! আমার বিন্দু ও সুখা মাংস হউক, হে বিধাতা, তুমি ওদের কপালে সুখ লিখিও, আমার শরীরে সব সয়, আমি নিজের দুঃখ, নিজের অপমান গ্রাহ্য করি না। আহা! যেন বিন্দু ও সুখাকে বিবাহ দিয়া উহাদের সুখী দেখিয়া মরি, তাহা হইলেই আমার সুখ।”

* * * *

রমণী ডুব দিয়া উঠিয়া, এক কলস জল কাঁকে লইয়া বলিলেন, “আর মা বিন্দু, ঘরে আর, সুখাকে কোলে নে। আহা, বাছার নদীর শরীর, এইটুকু এসে ক্লান্ত হইরাছে। আহা, বাছা যে ছেলের মাংস, ইটুতে পারবে কেন? ও কি, ঘুমিয়ে পড়েছে না কি?”

বিন্দু। হ্যাঁ মা, ঘুমিয়ে পড়েছে, এই আমি কোলে ক’রে নিয়ে যাই।

মাতা। না না, ঘুমিয়ে ভারি হয়েছে, আমার কোলে দে, তুই মা আমার আঁচল ধ’রে পথ দেখে দে’খে আস, বড় অন্ধকার হয়েছে, একটু একটু মেঘ হয়েছে, রাত্রিতে বোধ হয়, জল হবে।

বিন্দু। না মা, আমিই কোলে নি, সে দিন ঘোষেদের বাড়ী থেকে রাত্রিতে সুখাকে কোলে ক’রে এনেছিলাম, আর আজ এই ঘাট থেকে ঘরে নে যেতে পারবো না? ঐ ত রাস্তাঘরের আলো দেখা যায়।

মাতা। তবে নে বাছা, কিন্তু দেখিস মা, সাবধানে আনিস, বড় অন্ধকার, যেন পড়ে বাসনি। ঐ সে দিন তোর আঁঠাই-

মার মেয়ে উমাতারা রাত্রিবেলা মেলা থেকে আসছিল, পথে পড়ে গিয়েছিল, আহা, বাছার কপালটা এতখানি কেটে গিয়েছে।

বিন্দু। মা, উমাতারা কোন্ মেলায় গিয়েছিল? কেমন সুন্দর সুন্দর পুতুল এনেছিল, একটা কাঠের বোড়া এনেছিল, আর একটা মাতীর মিঃহ এনেছিল, আর একটা কেমন বল এনেছিল, সেটা ঘোরে। সে সব কোথা থেকে এনেছিল মা?

মাতা। তা জানিসনি? ঐ ওরা যে অগ্রদ্বীপের মেলায় গিয়েছিল, সেখানে বছর বছর ভারী মেলা হয়, কত হাজার হাজার লোক যায়, কত বৈষ্ণব খাওয়ান হয়, কত গান-বাজনা হয়, কত দেশের লোক সেখানে যায়।

বিন্দু। মা, তুমি কখনও সেখানে গিয়েছিলে?

মাতা। গিয়েছিলাম বাছা, যখন আমি ছোট ছিলাম, একবার আমার বাপ-মা গিয়েছিলেন, আমরা বাড়ী শুদ্ধ গিয়েছিলাম, সেখানে তিন চারিদিন ছিলাম, একটা গাছ-তলায় বাসা ক’রেছিলাম।

বিন্দু। কেন, ঘর ছিল না? গাছতলায় বাসা করেছিলে কেন মা?

মাতা। সেখানে কত হাজার হাজার লোক যায়, ঘর কোথায়? সকলেই গাছ-তলায় বাসা করে। একটা ভারী আঁববাগান আছে, তাহার নীচে মেলা হয়, কত রাজ্যের দোকানী পসারী আসে, কত দেশের জিনিস বিক্রী হয়।

বিন্দু। মা, আমি একবার যাব, আমার বড় দেখতে ইচ্ছা হয়।

মাতা। আমার কি তেমন কপাল আছে মা যে, তোকে নিয়ে যাব? কত টাকা খরচ হয়।

বিন্দু। না মা, আমি আর বৎসর যাব
উমাতারারা দেখেছে, আমি কেন যাব না ?

মাতা। ছি মা, তুমি সেয়ানা মেয়ে,
অমন করে কি বারনা করে ? তোরা
জোঠাইয়া বড়মানুষ, তাঁহার মেয়ে বেখানে
ইচ্ছা বেড়াইতে যায়। তোরা যা গরিবের
ঘরের মেয়ে, তোদের কি বাছা বারনা
কবুলে লাজে ? আহা, ভগবান যদি তোদের
কপালে স্ত্রু লিখিত, তাহা হইলে কি আর
অন্ন-বস্ত্রের জন্ত তোদের এমন লালানিত
হইতে হয় ? তাহা হইলে কি আমার
সোনার পুতুলেরা যেন পথের কান্দালীর
মত ঘারে ঘারে করে ? হা ভগবান !
তোমারই ইচ্ছা।

চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার হইয়াছে,
পশ্চিমদিকে কাল মেঘ উঠিয়াছে, আকাশ
হইতে এক একবার বিদ্যুৎ দেখা দিতেছে,
অন্ধকারময় বৃক্ষের পত্রের মধ্য দিয়া শব্দ
করিয়া নিশার বায়ু বহিয়া যাইতেছে।
গ্রাম প্রায় নিস্তব্ধ হইয়াছে, কেবল এক
একবার বৃক্ষের উপর হইতে পেচকের শব্দ
শুনা যাইতেছে, অথবা দূর হইতে শৃগালের
রব শুনা যাইতেছে। সমস্ত জগৎ অন্ধকার,
কেবল মেঘের ভিতর দিয়া দুই একটি
হীনতেজ তারা এখনও দৃষ্ট হইতেছে, গ্রাম
হইতে দুই একটি প্রদীপ বা চুলার আগুন
দেখা যাইতেছে, আর এক একবার অল্প
অল্প বিদ্যুৎ দেখা দিতেছে। সেই অন্ধকারে
সেই বৃক্ষের নীচে গ্রাম্য পথ দিয়া বিন্দু মার
আঁচল ধরিয়া নিঃশব্দে যাইতেছিল, যদি
সে অন্ধকারে বিন্দু কিছু দেখিতে পাইত,
তবে সে দেখিত, মাতার চক্ষু হইতে ধীরে
ধীরে দুই একটি অশ্রুবিন্দু সেই শীর্ণ গণ্ডস্থল
দিয়া বহিয়া পড়িতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, কান্দ,

দুই ভগিনী।

তালপুকুর গ্রামে একটি সুন্দর পরিবার
সুপ্রভাটীর দেখা যাইতেছে। বেলা দ্বি-
প্রহর হইয়াছে, গ্রামের চারিদিকে মাঠ গ্রীষ্ম-
কালের প্রচণ্ড রৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়াছে।
বৈশাখ মাসে চাষাগণ চারিদিকের ক্ষেত্রে
চাষ দিয়াছে, গরু ও লাঙ্গল লইয়া একে
একে গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছে, দুই এক
জন বা শ্রান্ত হইয়া সেই ক্ষেত্রে মধ্যে বৃক্ষ-
তলে শয়ন করিয়াছে। তাহারিগের গৃহিণী
বা কস্তা বা ভগিনী বা মাতা তাহাদের জন্ত
বাড়ী হইতে ভাত লইয়া যাইতেছে। চারি-
দিকে রোজতপ্ত ক্ষেত্রের মধ্যে তালপুকুর
গ্রাম বৃক্ষাচ্ছাদিত এবং অপেক্ষাকৃত শীতল।
চারিদিকে রাশি রাশি বাঁশ হইয়াছে এবং
তাঁহার পাতাগুলি অল্প অল্প বাতাসে সুন্দর
নড়িতেছে। গৃহে গৃহে আম, কাঁঠাল, তাল,
নারিকেল ও অন্যান্য ফলবৃক্ষ সকলকে ছায়া
বিতরণ করিতেছে। কদলীবৃক্ষে কলা
হইয়াছে, আর মাদার, মনসা প্রভৃতি কাঁটা-
গাছ ও জ্বলে গ্রাম্য-পথ পুরিয়া রহিয়াছে।
এক এক স্থানে বৃহৎ অশ্বখ বা বটগাছ ছায়া
বিতরণ করিতেছে এবং কোন স্থানে বা
প্রকাণ্ড আশ্রুবৃক্ষের বাগান ২০। ৩০ বিঘা
ব্যাপিয়া রহিয়াছে ও দিবাতাগে সেই স্থান
অন্ধকারপূর্ণ করিতেছে। পত্রের ভিতর
দিয়া স্থানে স্থানে সূর্য্যরশ্মি রেখাকারে
ভূমিতে পড়িয়াছে, দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ডালে
ডালে পক্ষিগণ ফুলারে নীরব হইয়া রহি-
য়াছে, কেবল কখন কখন দূর হইতে ঘুঘুর
মিষ্ট স্বর সেই আশ্রয়স্থানে প্রতিধ্বনিত
হইতেছে। আর সমস্ত নিস্তব্ধ।

ভিন্ন আশ্রিত পুরুষ প্রায়ে একটি স্থলর
সন্নিহিত হুইত কটীর দেখা যাইতেছে। চারি-
দিকে বাঁশঝাড় ও আম-কাঁঠাল প্রভৃতি ছুই
একটি কলবৃক্ষ ছায়া করিয়া রহিয়াছে।
বাহিরে বসিবার একখানি ঘর, সেই ছায়া
শীতল এবং তাহার নিকটে ৫৬টি নারিকেল-
বৃক্ষে ডাব হইয়াছে। সেই ঘরের পশ্চাতে
ভিতর-বাড়ীর উঠান, তথায়ও বৃক্ষের ছায়া
পড়িয়াছে। উঠানের এক পার্শ্বে একটি
মাচানের উপর লাউগাছ লাউ হইয়াছে,
অপরদিকে কাঁটাগাছ ও জঙ্গল। একখানি
বড় শুইবার ঘর আছে, তাহার উচ্চ রক
স্থলর ও পরিষ্কাররূপে লেগা। পার্শ্বে
একটি রান্নাঘর ও তাহার নিকট একটি
গোয়ালঘরে একটি মাত্র গাভী রহিয়াছে।
বাড়ীর লোকদের খাওয়া দাওয়া হইয়া
গিয়াছে, উছনে আশ্রয় নিভিয়াছে, বেড়ার
ছুই একখানি কাপড় শুকাইতেছে, শুইবার
ঘরের রকে একটি তক্তাপোষ ও দুই একটা
চরকা রহিয়াছে। পশ্চাতে একটি ডোবার
কিছু জল আছে, তাহাতে কয়েকখানি
পিতলের বাসন পড়িয়া রহিয়াছে, এখনও
মাল্য হয় নাই। ডোবার পার্শ্বে দুই একটি
তুলগাছ, কয়েকটি কলাগাছ ও একটি
আঁবগাছ, আর অনেক কাঁটাগাছ ও
জঙ্গল। বাড়ীর চতুর্দিকে বৃক্ষ ও জঙ্গল।
এই দ্বিপ্রহরের সময়ও বাড়ীটি ছায়াপূর্ণ
ও শীতল।

শুইবার ঘরের বেড়া বন্ধ, ভিতরে
অন্ধকার; সেই অন্ধকারে বাড়ীর গৃহিণী
নিঃশব্দে পদচারণ করিতেছিলেন। তাহার
একটি ভিন্ন বৎসরের কত্তা ভূমিতে মাদুরের
উপর ঘুমাইয়া আছে, আর একটি ছয়
মাসের পুত্রসন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া রমণী
ধারে ধীরে সেই ঘরে বেড়াইতেছেন। এক

একবার ছেলেকে চাপড়াইতেছেন, এক
একবার শুণ, শুণ, শব্দে ঘুম পাড়াইবার
ছড়া পাইতেছেন, আবার নিঃশব্দে ধীরে
ধীরে এদিকে ওদিকে বেড়াইতেছেন।

নারীর বয়স অষ্টাদশ বৎসর, শরীর
ক্লীণ, মুখখানি প্রশান্ত, কিন্তু একটু শুকাইয়া
গিয়াছে, চক্ষু দুটি বিশাল ও কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু
ধীর ও চিন্তাশীল। অষ্টাদশ বৎসরের
রমণীর যেরূপ বর্ণনা আমরা উপভাসে পাঠ
করি, তাহার কিছু ইহার নাই, সে প্রগলভতা,
সে উদ্বেগ, সে উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য নাই।
উপভাস-বর্ণিত সুখ সকলের কপালে ঘটে
না, উপন্যাস-বর্ণিত সৌন্দর্য্য সকলের থাকে
না। এই বিশাল সংসারের দিকে চাহিয়া
দেখ, ছুই একজন ঐশ্বর্য্যের সন্তানকে
ছাড়িয়া দিয়া সহস্র সহস্র দরিদ্র-গৃহস্থ তদ্র
লোকের সংসারের দিকে চাহিয়া দেখ,
আমাদের দরিদ্র ভগিনী বা কত্তা বা
আত্মীয়গণ কিরূপে সুখে, দুঃখে, কষ্টে,
সহিষ্ণুতার সংসারযাত্রা করেন, চাহিয়া দেখ,
দেখিয়া বল, ছার উপন্যাসের কাল্পনিক
অলীক সুখ কল্পনের কপালে ঘটিয়াছে,
রূপার বিপ্লব ও গরম ছদ্ম মুখে করিয়া কল্প-
জন সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? কণেক
বেড়াইতে বেড়াইতে শিশু নিদ্রিত হইল,
মাতা নিদ্রিত শিশুকে সমস্ত মেজাজে মাদু-
রের উপর শোয়াইয়া আপনি নিকটে বসিয়া
কণেক পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন।
সেই ঘরের স্তিমিত আলোক সেই প্রশান্ত
ঈষৎ চিন্তাশীল ললাটের উপর পড়িয়াছে।
ছিন্ন, প্রশান্ত, অভিশয় কৃষ্ণবর্ণ নয়ন দুটি
সেই শিশুর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, নয়নে
মাতার স্নেহ, মাতার স্বপ্ন বিরাজ করিতেছে,
তাহার সঙ্গে সঙ্গে মাতার চিন্তা ও মাতার
অসীম সহিষ্ণুতা লালিত হইতেছে। শরীর-

খানি কীণ, কিন্তু সুগঠিত। কীণ
বাহু দ্বারা নারী ধীরে ধীরে
করিতেছিলেন আর সেই
ঘরে বসিয়া তাঁহার কন্তু চি
ছিল। সংসারের চিন্তা,
জগতের চিন্তা আর কখন
চিন্তা ও স্মৃতি ধীরে ধীরে
উদয় হইতেছিল।

ছেলে ঘুমাইয়া
খানি রাখিয়া আ
স্থাপন করিয়া
লেন, নয়নঃ
তিনি অচি
বিশ্রামের
ঘরটিও
পার্শ্বে
সংসারে
হইতে

হি
হই

রি

ভা

ত

হ

হাবলী ।

সুখার হাসিতে এ জগৎ মিষ্ট হয় ।

লিকা এখন তাহার ভাঙ্গা কপালে

ধনেও জানে না ! নিদারুণ

'রে এই কচি ছেলের কপালে

লিখিলে—কেমন ক'রে এ

ত্রে গরল মিশাইলে ?”

ক যে, আমরা প্রথম পরি-

ণা বলিতেছিলাম, দ্বিতীয়

বৎসরের পরের কথা

গল্প এই সময় হইতে

ঘটনাগুলি কতক

‘ছে, আর দুই

ীতে থাকিয়া

১ কত্নাকে

ার স্বামীর

১ কোন

ার বড়

য়ের

ইউ

খন

৩রাং

রতে

শীঘ্র

তা

১৫-

র

লাগিল ও একে একে ভাঙ্গিয়া বাইতে লাগিল। যেহেতু জ্যোতাইয়া বকের উপর ছুট পা মেলাইয়া বলিয়া বৈকালে কেশ-বিন্ধ্যাস করিতে করিতে সহাস্তে বিন্দুর মাকে বলিলেন, (বিন্দুর মা চুলের দড়ী ধরিয়া ছিলেন) “তা ভাবনা কি বোন, আমাদের বাড়ীর মেরের বের জন্ত ভাবতে হয় না, আমাদের কুল,মান, বর্ধমানে ভারী চাকরী, একে না জানে বল, কত তপিস্তে করলে তবে লোকে এমন বাড়ীর মেয়ে পায়, তোমার আবার বিন্দুর বের ভাবনা? এই রসো না, তিনি পূজার সময় বাড়ী আসুন, আমি বিন্দুর এমন সখ্যক ক’রে দেব যে, কুটুমের মত কুটুম হবে। এই আমার উমাতারার বয়স সাত বৎসর হয় নি, এর মধ্যে কত গ্রামের লোক আমাকে কত সাধাসাদি করেছে, বে দিলেই এখন মাথায় ক’রে নিয়ে যায়, তা আমি গা করিনি। আমার উমাতারার এমন সখ্যক করব যে, কুটুমের মত কুটুম হবে। তবে আমার উমাতারার বর্ণের জেলা আছে, তোমার মেয়ে একটু কালো, আর তোমাদের বোন তেমন টাকা-কড়ি নেই। আমার দেওয় তেমন সোনা ছিল না, কিছু রেখে যায় নি, তাই বল। তা ডেব না বোন, আমি যখন এ বিষয়ে হাত দিয়েছি, তখন আর কোন ভাবনা নেই।”

আশ্বাসবচন শুনিয়া ও সেই স্মরণ তাবিজ-বিভূষিত বাহর ঘন ঘন সঞ্চালন দেখিয়া বিন্দুর মা আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু জ্যোতাইয়ার বাহ নাড়াতে বিন্দুর বিশেষ উপকার হইল না, বিন্দুর বিবাহ হইল না।

তার পর পূজার সময় তারিণীবাবু বাড়ী আসিলেন। তাঁহার গৃহিণীর জন্ত পূজার কাপড়, পূজার গহনা, পূজার সামগ্রী কতই আসিল, গৃহিণীও আফ্লাদে আটখানা।

বাড়ীর ছেলেরদের জন্ত কত গোবাক,কাপড়, জুতা, উমাতারার জন্ত ঢাকাই কাপড়, মাথার কুল ইত্যাদি। নাজীর মহাশয় বাড়ী আসিয়াছেন, গ্রামে ধুম পড়িয়া গেল, কত লোক সাক্ষাৎ করিতে আসিল, কত খোসা-মোদ, কত স্নাত্যতি, কত আরাধনা। কাহারও পূজার সময় ছুই পাঁচ টাকা কর্তব্য চাই, কাহারও বিপদে সংপরামর্শ চাই, কাহারও ছেলের একটি চাকরী চাই, আর কাহারও বিশেষ কিছু আপাততঃ চাই না, কেবল বড়লোকের খোসামোদটা অভ্যাসমাত্র, সেই অভ্যাসেই স্নত হয়। এত ধুমধামের মধ্যে বিন্দুর কথা কেই বা বলে, কেই বা শোনে। ১৫দিনের ছুটি ফুরাইয়া গেল, নাজীর মহাশয় আবার বর্ধমানে চলিয়া গেলেন, বিন্দুর সখ্যকের কিছুই স্থির হইল না।

পড়সীর মেয়েদের সঙ্গে যখন বিন্দুর মা দেখা করিতে যাইতেন, বৃদ্ধাদিগকে কত স্তুতি করিয়া কন্ডার একটি সখ্যক করিয়া দিতে বলিতেন। তাঁহারাও আগ্রহচিন্তে বলিতেন, “তা দেব বৈ কি, তোমার দেব না তো কার দেব? তবে কি জান বাছা, আজ-কাল মেয়ের বে সহজ কথা নয়। আর তুমি কিছু দিতে খুতে পারবে না, বিন্দুর বাপ ত ত কিছু রেখে যায় নি, তেমন গোছান লোক হতো,ঐ তোমার ভাহরের মত টাকা করুতে পারত, তবে আর ভাবনা থাকত? সেই সময় আমি কত বলেছিলাম, তা তখন সে গা করত না, তোমরাও গা করুতে না, এখন টের পাচ্ছ; গরিবের কথা বাসি হলেই ভাল লাগে! তা দেব বৈ কি বাছা, তোমার মেরের সখ্যক ক’রে দেব, এ বড় কথা?” অথবা অন্য একজন বৃদ্ধা বলিলেন, “তার ভাবনা কি, বিন্দুর বের আবার ভাবনা কি? তবে একটা কথা কি জান, বিন্দু দেখতে

মনতে একটু ভাল হতো, তবে এ কাজটা শীঘ্র শীঘ্র হতো। তা মেয়ের মুখের ছিঁরি আছে, ছিঁরি আছে, তবে রংটা বড় কালো, আর চোখ দুটো বড় ডেবডেবে, আর মাথার বড় চুল নাই। না, তা মেয়ের ছিঁরি আছে, তবে একটু কাহিল, হাড়গুলো যেন জির জির করছে, হাত-পাগুলো যেন লম্বা লম্বা, আর এর মধ্যে ঢেঁসা হয়ে উঠেছে। তা হোক, তুমি ভেব না, কালো মেয়ে কি আর বিকোর না? বে কি আটকে থাকে? তা থাকবে না, যখন আমরা আছি, তখন কিছু আটকাবে না।" এইরূপে বৃদ্ধাদিগের যথেষ্ট আশ্বাস-বাক্য ও তাহার সঙ্গে বিন্দুর বাপের নিন্দা, বিন্দুর মার নিন্দা ও বিন্দুর নিন্দা সম্বন্ধে প্রচুর বর্ণনা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আশঙ্ক ও আপ্যায়িত হইয়া বিন্দুর মা বাড়ী আসিতেন।

গ্রামের মধ্যে দুই একজন প্রাচীন লোক ছিলেন। তাঁহারা অনেক লোক দেখিয়াছেন, অনেক গ্রামে বাতাসা করতেন, অনেক ঘর জানেন, অনেক মেয়ের সখ্যক করিয়া দিয়াছেন। বিন্দুর মা করেক দিন তাঁহাদের বাড়ী হাঁটাচাঁটা করিলেন। কোন দিন ছেলেদের জন্ত দুই চারি পুরসার চিনির বাতাসা লইয়া গেলেন, কখন বা কিছু মিলি বা মিষ্টান্ন লইয়া গিয়া গৃহিণীদিগের মনজুটি করিলেন, গৃহিণীদিগকে অনেক স্তুতি-মিনতি করিলেন, তাঁহারাও আশ্বাসবাক্য দিলেন, সন্ধান করিবেন, কর্তাকে বলিবেন, এইরূপ অনেক যত্ন বচন বলিলেন। অবশেষে বিন্দুর মা বোমটা দিয়া সেই কর্তাদিগেরই মিনতি আরম্ভ করিতে লাগিলেন, পথে ঘাটে দেখা হইলে গরিবের কথাটি মনে রাখিবার জন্ত মিনতি করিলেন। তাঁহারাও বলিলেন, "তা একথা আমাদের এত দিন রহিল? এ সব কাজ কি আমাদের না

বলিলে হয়? ঐ ও পাড়ার বোম্বের বাড়ীর কালীতারার ঘের জন্ত কত হাঁটা-চাঁটা করেছিল, শেষে বড়বো একদিন আমাদের ডেকে বললেন, আমরা কাজটা হয়ে গেল। কেমন বে দিগে দিগেছি, রায়ের বনিয়ারী ঘর, খাবার অভাব নেই, টাকার অভাব নেই, যেন কুবেরের ঘর, সেই ঘরের ছেলেদের সঙ্গে বোম্বের মেয়ের বৈয় সখ্যক করে দিলাম। ছেলেটি মোজাবরে বটে, আর একটু কাহিল ও একটু বয়স না কি হয়েছে, তা এখনও চল্লিশের বড় বেশী হয়নি, আর কালীতারার আট বৎসর হলেও দেখতে বাড়ন্ত, গ্রাম শুদ্ধ এ সখ্যকের সুখ্যাতি করছে। ছেলেটি বর্তমানে থাকে, লেখা-পড়া না জাহুক, তার মান কত, যশ কত, সাহেবদের খানা দেয়, মজলীস লোকে ভরা, গাড়ী-ঘোড়া, লোকজন, বাবুয়ানা দেখলে লোকে বলে, হা জমীদারের ঘরের ছেলে বটে। তা আমরা হাত না দিলে কি এমন সখ্যক হয়? তুমি মা এত দিন কোথা হাঁটাচাঁটা করছিলে, আমাদের একবার জিজ্ঞাসাও কর না? এখন বে বার আপন আপন প্রভু হয়েছে, তাতে কি কাজ চলে? তা আজ আমাদের মনে পড়েছে, তবু ভাল।" সজল-নয়নে বিন্দুর মা আপনার দোষ স্বীকার করিলেন এবং এমন লোকের নিকট পূর্বে না আসা বড়ই নিকৃৎতার কার্য হইয়াছে ভাবিলেন। অশ্রুজল ও মিনতিতে তুটু হইয়া গ্রামের মণ্ডল বলিলেন, "তা ভেব না মা, এখন আমাদের যখন বললে, তখন আর ভাবনা নেই, দুই চারি দিনের মধ্যে সখ্যক স্থির করে দিচ্ছি।" বিন্দুর মা আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, অনেক আশা করিয়া আশার-নিদা চাভিয়া আপেকা

করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুই চারি দিন অতীত হইল, দুই চারি মাস অতীত হইল, বিন্দুর সখ্যক হইল না, গরিবের মেয়ে তরিল না।

বিন্দুর মা দেখিলেন, তালপুকুরের লোক অনেক সদৃশবিশিষ্ট বটে। নিঃস্বার্থ হইয়া পরের বাড়ী কি রান্না হইতেছে, প্রত্যহ তাহার খবর রাখেন; পরের বৌ-ঝি কি করিতেছে, তাহার বৈজ্ঞানিক অতুস্কান রাখেন; ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে সে বৈজ্ঞানিক সংবাদ প্রচার করিবার জন্য নিঃস্বার্থ যত্ন করেন, কেহ বিপদে পড়িলে বা দায়ে ঠেকিলে তাহাকে পূর্বদোষের জন্য বিশেষরূপে নীতিগত তিরস্কার দেন, নৈতিক উপদেশ দেন এবং নিঃস্বার্থরূপে তাহাকে আশ্বাস দিতে, পরামর্শ দিতে, যত্ন ও বাক্যব্যায়ে ক্রটি করেন না; তবে কাজের সময় সহায়তা করা—সে স্বতন্ত্র কথা! বিন্দুর মাতাকে এই দায় হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কেহ হস্ত-প্রদান করিলেন না, তাঁহার যাচঞায় কেহ একটি কপর্দক দিলেন না, তাঁহার উপকারার্থে কেহ বায়পদের কনিষ্ঠ জঙ্গুলী নাড়িলেন না। বিন্দুর মা যদি কখনও তালপুকুর হইতে বাহিরে যাইতেন, তবে দেখিতেন, এ সদৃশগুলি জগতের অন্তান্ত স্থানেও লক্ষিত হয়। তবে বিন্দুর মাতা নিরীক্ষা, এক একবার তাঁহার মনে এরূপ উদয় হইত যে, এ প্রচুর আশ্বাসবাক্য ও সংপরামর্শের পরিবর্তে তাঁহাকে এই সামান্য দায় হইতে কেহ উদ্ধার করিয়া দিলে তাঁহার নৈতিক উন্নতি না হউক, সাংসারিক সুখ কতক পরিমাণে হইত।

তালপুকুর গ্রামে হরিদাসের একজন পরম বন্ধু ছিলেন। তাঁহার হেমচন্দ্র নামক একটি পুত্র ভিন্ন সংসারে আর কেহ ছিল

না। পিতা দরিদ্র হইলেও পুত্রকে অনেক বস্ত্রে লেখা-পড়া শিখাইবার চেষ্টা করিয়া ছিলেন এবং হেমচন্দ্রও যত্ন সহকারে পাঠ করিয়া বর্দ্ধমানে প্রথম পরীক্ষা দিয়া কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কয়েক মাসের পরই পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তিনি পড়া-শুনা বন্ধ করিয়া তালপুকুরে ফিরিয়া আসিলেন এবং সামান্য পৈতৃক সম্পত্তিতে জীবন নির্বাহ করিতে লাগিলেন।

হেমচন্দ্র যত্ন বিন্দুর মা ও বিন্দুকে বাল্যকাল অবধি জানিতেন। তাঁহার বিবরণ-বুদ্ধি কিছু অল্প থাকি বশতই হউক অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিন্দুরকর বিদ্যা কয়েক মাসাবধি শিখিয়াই হউক, অথবা কলিকাতার বাতাস পাইয়াই হউক, তিনি পিতার পরম বন্ধু হরিদাসের দরিদ্রকন্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন। সমস্ত গ্রাম এ যুগের ন্যায় কার্যে চমকিত হইল, হেমচন্দ্রের বংশের পুরাতন বন্ধুগণ তাঁহাকে এরূপ কার্য করিয়া পিতার নাম ডুবাইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু ছেলটি কিছু গোঁয়ার, তিনি বিন্দুর মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, (আমাদের লিখিতে লজ্জা করে) বিন্দুর শুক মলিন মুখখানিও দুই একবার গোপনে দেখিলেন এবং তৎপরে বিন্দুর মাতাকে ও জ্যেষ্ঠাইমাকে সম্মত করাইয়া বিবাহের সমস্ত আয়োজন ঠিক করিলেন। বিন্দুর জ্যেষ্ঠাই-মামল লোক ছিলেন না, তাঁহার মনটি সরল, কলহ বা তিরস্কার করা তাঁহার বড় অভ্যাস ছিল না, তিনি কাহারও অনিষ্ট করিতে চাহিতেন না। তবে বড়মামুষের মেয়ে, স্বামী অনেক রোজগার করে, তাহাতে যদি একটু বড়মামুষী রকম দর্প থাকে, একটু বড় হুটুয় করিবার ইচ্ছা থাকে,

দরিত্রের সহিত যদি সহায়ত্ব করিত একটু কম থাকে, তাহা মার্জনীয়। দুই একটি ঘোষ অনুসন্ধান করিয়া আমরা যেন নিষ্কাশন করিয়া না হই, আমাদের মধ্যে কাহার সেরূপ দুই একটি ঘোষ নাই?

বিন্দুর সরলস্বভাব জ্যোতাইয়া বিন্দুর বিবাহের জন্য বিশেষ যত্ন করেন নাই, কাহারও জন্য বিশেষ যত্ন করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না, কিন্তু বিন্দুর একটি সম্বন্ধ হওয়াতে তিনি প্রকৃতই আত্মদানিত হইলেন। তিনি শুভদিন দেখিয়া হেমচন্দ্রের সহিত বিন্দুর বিবাহ দিলেন এবং পাড়া-পড়সী ঘেয়ে যখন বাড়ীতে আসিল, তখন সেই তাবিজ-বিভূষিত বাহ সঞ্চালন করিয়া জ্যোতাই বলিলেন, “আহা, আমার উমাতারাও যে, বিন্দুও সে। আমি বিবাহ না দিলে কে দেয় বল, বিন্দুর মার ত ঐ দশা, বাপও সিকি পরমা রেখে যায়নি, আমি না করিলে কে করে বল!” ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি! পড়সীগণও “তুমি বলে কবুল, নৈলে কি অস্ত্রে এতটা করে?” এইরূপ অনেক যশোগান ও নিঃস্বার্থতার প্রশংসা করিয়া ঘরে গেল।

তখন সুধার বয়স পাঁচবৎসর মাত্র, কিন্তু সুধার মার বড় ইচ্ছা, সুধারও বিবাহ দিয়া যান। হেমচন্দ্র অনেক আপত্তি করিলেন, অনেক মিনতি করিলেন, সুধাকে আপন ঘরে রাখিয়া একটু বাল্যশিক্ষা দিয়া পরে ১০১২ বৎসরের সময় নিজ বায়ে বিবাহ দিবার অঙ্গীকার করিলেন, কিন্তু সুধার মা কিছুতেই শুনিলেন না। তিনি বলিলেন, “বাছা, সুধার বিয়ে না দিয়া যদি মরি, তবে আমার জীবনের সাধ মিটবে না।” হেমচন্দ্র কি করেন, অগত্যা সম্মত হইয়া সুধাকে সামান্য অবস্থার শিক্ষিত একটি যুবীর সহিত বিবাহ দিলেন।

বিন্দুর মাতা স্বামীর মৃত্যুর পর তখন প্রথমে আপনাকে একটু সুখী মনে করিলেন; দুই বিবাহিতা কন্যাকে জোড়ে লইয়া আপনাকে জগতের মধ্যে ভাগ্যবতী মনে করিলেন। তিনি তখনও তারিণীবাবুর বাড়ীতে রহিলেন। সুধার বিবাহের কয়েক মাস পরেই তিনি জীবনলীলা সংবরণ করিলেন।

আর একটি কথা আমাদের বলিবার আছে। পঞ্চম বৎসরের সুধা বিবাহিতা স্ত্রী হইল, সপ্তম বৎসরে বিধবা হইল! সুধা স্ত্রী কাহাকে বলে, জানেন না, বিধবা কাহাকে বলে, তাহাও জানেন না। জ্যোতাই ভগিনীর বাড়ীতে আসিয়া সাতবৎসরের প্রফুল্ল বালিকা যোমটা খুনিয়া ফেলিয়া আনন্দে পুতুল-খেলা করিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সংসারের কথা।

প্রায় ত্রিপ্রহর রাত্রি হইয়াছে। চন্দ্রের নিখল শীতল কিরণে স্নানর তালপুকুর গ্রাম সুপ্ত রহিয়াছে। বড় বড় তালপুকুর আকাশপটে অন্ধকারময় ও বিষ্ময়কর ছবির ভ্রাম্য বিন্যস্ত রহিয়াছে। গ্রামের চারিদিকে প্রচুর ও স্নানর বাঁশ-ঝাড়ের সূচিকণ পত্রের উপর সুপ্ত চন্দ্র-কিরণ রহিয়াছে, পুষ্করীপীঠ এবং কম্পমান জলের উপর চন্দ্রালোক স্নানর খেলা করিতেছে, গৃহস্থের প্রাঙ্গণে, প্রাচীরের ও তৃণাচ্ছাদিত ঘরের চালের উপর সেই স্নানর আলোক যেন রূপার চাদর বিছাইয়া দিয়াছে। সমস্ত সুপ্ত গ্রামের উপর চাঁদের আলোক যেন সুইফলের ভ্রাম্য ছুটিয়া রহিয়াছে। গৃহস্থগণ অনেকেই খাওয়া

দাওয়া করিয়া কবাট বন্ধ করিয়া শয়ন করিয়াছেন, কেবল কোথাও কোথাও কোন নিজাধীন বুদ্ধ বাহিরের প্রাক্ষেপে বসিয়া এখনও ঘুমপান করিতেছেন, আর কোথাও বা অল্পবয়সী গৃহস্থবধূ এখনও বাটার পার্শ্বের পুকুরে বাসন মাঝিতেছেন, সংসারের কাজ এখনও শেষ হয় নাই। নৈশবায়ু ধীরে ধীরে বহিয়া বাইতেছে, আর দূর হইতে কোন একুলমনা কুবকের গান সেই বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে শুনা যাইতেছে।

বিন্দু সংসার-কার্য শেষ করিয়া, এখনও স্বামী আসেন নাই বলিয়া উদ্বিগ্ন-মনে সেই শুইবার ঘরের রকে বসিয়া রহিয়াছেন, নির্মল চন্দ্রকিরণ তাঁহার শুভ্রবসন ও শাস্ত নয়নের উপর পড়িয়াছে। সুখা আজ শুইতে যাইবে না, হেমচন্দ্রকে সন্ন্যাসী সাজাইবে স্থির করিয়াছে, কিন্তু বালিকা ভগিনীর পার্শ্বে সেই রকে একটু শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িল, তাহার কুসুমরঞ্জিত পাট তাহার আঁচলেই রহিল। নিজাতেও সে সুন্দর পরিপক্ব বিষফলের স্রাব ওষ্ঠ দুটি প্রাক্ষিপিকারিত, বোধ হয়, বালিকা এই সুন্দর সুশীতল রঞ্জনীতে কোন সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিল।

ক্ষণেক পরে বাহিরের কবাটে শব্দ হইল, বিন্দু তাহাই প্রত্যাশা করিতেছিলেন, তৎক্ষণাৎ গিয়া কবাট খুলিয়া দিলেন। হেমচন্দ্র বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

হেমচন্দ্রের বয়স পঞ্চবিংশ বৎসর হইয়াছে, তাঁহার শরীর দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ, ললাট উন্নত ও প্রশস্ত, মুখমণ্ডল শ্রাবণ, কিন্তু সুন্দর-নয়ন দুটি অতিশয় তেজোব্যঞ্জক। অনেক পঞ্চ হাঁটিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, শরীরে ধূলি লাগিয়াছে, পা দুটি ধূলায় ভরিয়া গিয়াছে।

বিন্দু সন্ন্যাসী সাজাইয়া একদিন দৌড়ি আসিয়া

দিলেন এবং পা দুইবার জল ও গায়ছা আনিয়া দিলেন; হেম হাত-মুখ ধুইলেন।

বিন্দু। তোমার আসতে এত রাত্রি হ'ল? এখনও খাওয়া-দাওয়া হয়নি?

হেম। আমি সন্ধ্যার সময় আস্তেম, তবে কাটোয়ার একটি পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল, তিনি বৈকালে আমাকে তাঁহার বাসার নিয়ে গেলেন, উপরোধ ক'রে কিছু জলখাবার খাওয়াইলেন, সেই জন্য এত দেরী হল। তা তোমরা খেয়েছ ত?

বিন্দু। সুখা খেয়ে ঘুমিয়াছে, আমি খাব এখন। তুমি ত বৈকালে জল খেয়েছ, আর কিছু খাওনি, তবে ভাত এনে দি?

হেম। আমার বিশেষ ক্ষুধা পারিনি, তবে ভাত নিয়ে এস, আর রাত্রি করার আবশ্যক নাই।

বিন্দু সেই রকে একটু জল ছিটাইয়া আসন পাতিলেন, পরে রান্নাঘর হইতে খালে করিয়া ভাত আনিয়া দিলেন। খাবার সামান্য ভাত, ডাল, মাছের ঝোল ও বাড়ীতে উচ্ছে ও লাউ হইয়াছে, তাহাই ভাজা ও তরকারি। আর লেবু হইয়াছিল, বিন্দু তাহা কাটিয়া রাখিয়াছিলেন, গাছ হইতে দুইটি ডাব পাড়াইয়া তাহা শীতল করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং বাড়ীতে গাভী ছিল, তাহার দুগ্ধ খন করিয়া রাখিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র আহারে বসিলেন, বিন্দু পার্শ্বে বসিয়া পাখা করিতে লাগিলেন।

হেম। খোকর জন্ত একটা ঔষধ এনেছি, সেটা এখন খাওয়াইও না, রাত্রিতে যদি ঘুম ডান্দে, যদি কান্দে, তবে খাওয়াইও। আর যে চেষ্টার গিয়াছিলাম, তার বড় কিছু হ'ল না।

বিন্দু। কি হ'ল?

হেম। খাওয়াবার আমার অভিলাষ

একটি উকিল আছেন, আমি তাঁর কাছে তোমার বাপের জমীর কথা বলবো এবং সমস্ত অবস্থা বুঝিয়ে বলবো।

বিন্দু। তার পর?

হেম। তিনি বলেন, মোকদ্দমা ভিন্ন উপায় নেই।

বিন্দু। ছি! জ্যেষ্ঠা মহাশয়ের সঙ্গে কি মোকদ্দমা করে? তিনি ছেলেবেলা আমাকে মানুষ করেছিলেন, আবাব বে দিয়েছেন, জ্যেষ্ঠাই-না এখনও আমাদের জিনিস-টিনিস পাঠিয়ে দেন, তাঁদের সঙ্গে কি মোকদ্দমা করা ভাল?

হেম। আমাদের বিবাহের জন্ত আমরা তোমার জ্যেষ্ঠা মহাশয়ের নিকট বড় ঋণী নই; কিন্তু তুমি তখন ছেলেমানুষ ছিলে, সে সব কথা বড় জান না, জানবার আবশ্যকও নাই। তথাপি তোমার জ্যেষ্ঠা, এই জন্তই তাঁর সঙ্গে বিবাদ করিতে ইচ্ছা নাই, কেবল অগত্যা করিতে হয়।

বিন্দু। ছি! সে কাজটা কি ভাল হয়? আর দেখ, আমরা গরিব লোক, আমাদের কি মোকদ্দমা পোষার? আমরা গরিবের মত যদি থাকতে পারি, হুবেলা হুপেট যদি খেতে পাই, ডগবানের ইচ্ছার যদি ছেলে দুটিকে মানুষ করতে পারি, তা হলেই ঢের হ'ল। তোমার বে জমীজমা আছে, তাতেই আমাদের গরিবের সোনা কলে, তোমার পৈতৃক বাড়ীই আমার সাত রাজার ধন।

হেম। আমি যখন তোমাকে বিবাহ করেছিলাম, একপ কটে চিরকাল জীবন বাপন করব, তা মনে করিনি। তুমি সহিষ্ণু, সাদাসী, পতিব্রতা, এত কষ্ট সহ করেও মুখ ফুটে একটি কথা কও না, সে তোমারই গুণ, আমি ত চক্ষে দেখিতে পারি না।

ভাবিলেন, “পথের কাঙ্গালীকে কোলে করিগা লইয়া স্বর্গে স্থান দিয়াছ, সেটা কি ভুলে গেলে?” একান্তে একটু হাসিয়া বলিলেন, “কেন, এমন ঘর-বাড়ী, এখানে রাজার উপাদের দ্রব্য পাওয়া যায়, এখানে আমাদের অভাব কিসের? একটি রাজার উপাদের জিনিস দেখবে?”

হেম একটু হাসিয়া বলিলেন, “কৈ, দেখি!”

বিন্দু উঠিয়া রান্নাঘরে গেলেন। সেই দিন গাছের কচি কচি আঁব পাড়িয়া তাহার অঞ্চল করিয়াছিলেন, স্বামীর সম্মুখে পাবর-বাটীটি রাখিয়া বলিলেন, “একবার খেয়ে দেখ দেখি।”

হেম হাসিয়া অঞ্চল ভাতে মাখিলেন, খাইয়া সহাস্তে বলিলেন, “হী, এ রাজার উপাদের দ্রব্য বটে, কিন্তু সে আমাদের এ রাজ্যের গুণ নয়, রাজরাণীর হাতের গুণ!”

কণেক পরে আবার বলিলেন, “আমি সত্য বলছি, জ্যেষ্ঠা মহাশয়ের সঙ্গে মোকদ্দমা করবার আমার ইচ্ছা নেই, কিন্তু তিনি তোমার পৈতৃক ধন কেড়ে নেবেন, আমাদের দরিদ্র ব'লে তুচ্ছ করবেন, তা আমি কখনই সহ্য করব না। আমি দরিদ্র, কিন্তু আমি অন্তায় সহ্য করতে পারি না।”

বিন্দু। তবে এক কাজ কর দেখি। ঐ ভাত কটি এই ঘন হুঁষ দিয়া খেয়ে নাও দেখি, তা হ'লে গায়ে জোর হবে, তার পর কোমর বেঁধে লড়াই করো।

হেমচন্দ্র সেই যুদ্ধের উত্তোগ করিলেন, আবার গাভীছকের অথবা রাজার রন্ধন-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিলেন। তখন বিন্দু বলিলেন, “আচ্ছা, জ্যেষ্ঠা মহাশয়ের সঙ্গে এ বিষয় মিটিয়ে ফেটো ভাল হয় না? গ্রামেও

হেম। সে চেট্টাও করেছিলাম। তোমার জোঠা মশাই বলেন যে, জমীতে তাঁরই স্বত্ব আছে, তিনি এখন দশ বৎসর অবধি জমীদারকে খাজানা দিচ্ছেন, তিনি অর্থব্যয় করে জমীর উন্নতি করেছেন এবং জমীদারের সেরেস্তায় আপনার নাম লিখিয়েছেন, এখন তিনি এ জমী হাতছাড়া করবেন না। তবে তোমাকে ও সুধাকে কিছু নগদ অর্থ দিতে সম্মত আছেন, তা জমীর প্রকৃত মূল্য নয়, অর্দ্ধেক মূল্য অপেক্ষাও অল্প। কেবল আমরা দরিদ্র, এই জন্ত তিনি এরূপ অঙ্গার করছেন।

বিন্দু। আমি মেয়েমানুষ, তুমি যতদূর এ সব বিষয় বুঝ, আমি ততদূর পারি না। কিন্তু আমার বোধ হয়, তিনি যা দিতে চান, তাতেই স্বীকার হওয়া ভাল। তিনি আমাদের গুরু, এক সময়ে আমাকে পালন করেছেন, যদি কিছু অল্প মূল্যেই তাঁকে একটা জিনিস দিলেম, তাতেই বা ক্ষতি কি? আর দেখ, মোকদ্দমা কূলে আমাদের বিস্তর খরচ, কর্ত্তব্য করতে হবে, তা কেমন করে পরিশোধ করব? যদি মোকদ্দমায় জমী পাই, তা হ'লে স্বয়ং পরিশোধ করতে সে জমী বিক্রী হ'য়ে যাবে, আর জোঠা মশাই চিরকাল আমাদের শত্রু থাকবেন। আর যদি মোকদ্দমায় হারি, তবে একূল ওকূল দুকূল গেল। তিনি যদি কিছু অল্প মূল্যই দেন, না হয়, আমরা কিছু অল্পই পেলেম, গোলমালটা এইখানেই শেষ হয়। আমি মেয়েমানুষ, ও সব গোলমাল বুঝি না, মোকদ্দমা বড় ভয় করি, সেই জন্তই এরূপ বল্লম, কিন্তু তুমি রাগ না করে বেশ করে বিবেচনা করে দেখ, শেষে যেটা ভাল বোধ হয়, সেইটে কর।

হেমচন্দ্র আহার সমাপন করিলেন, এক ঘটা জল খাইলেন, অনেকক্ষণ

বিবেচনা করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “তোমার যত মেয়েমানুষ যার বন্ধু, সে এ জগতে ভাগ্যবান। আমি তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করে যে উকীলের নিকট গিয়েছিলেম, সে আমার মুখতা। তোমার পরামর্শটি উৎকৃষ্ট। আমি এই পরামর্শই গ্রহণ করলেম, জোঠামশাই বাড়ী এসেছেন, কলাই আমি এ বিষয় নিশ্চিন্তি করুব। আর পুনরায় যখন কোন পরামর্শের আবশ্যক হবে, এই ঘরের বৃহস্পতির সঙ্গে অগ্রে পরামর্শ করুব।”

বিন্দু সহাস্তে বলিলেন, “তবে বৃহস্পতির আর একটি পরামর্শ গ্রহণ কর।”

হেম। কি বল, আমি কিছুই অস্বীকার করুব না।”

বিন্দু। ঐ বাটীতে যে ছুখটুকু প'ড়ে আছে, সেটুকু চুমুক দিয়ে খাও দেখি।

হেমচন্দ্র অগত্যা বৃহস্পতির এই দ্বিতীয় পরামর্শটিও গ্রহণ করিলেন, পরে আসন ত্যাগ করিয়া আচমন করিলেন।

বিন্দু তখন হেমচন্দ্রের জন্ত শয্যা রচনা করিয়া দিলেন, তাতে একটি পান দিলেন এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই শয্যায় স্বামীর পাশে বসিয়া সাংসারিক কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর হেমচন্দ্র সেই স্নেহময়ীকে আপন হৃদয়ে ধারণ করিয়া স্নেহে চুখন করিয়া কহিলেন, “যাও, অনেক রাত্রি হয়েছে, তুমি থাওয়া-দাওয়া কর গিয়ে।” জগতের মধ্যে সৌভাগ্যবতী বিন্দুবাসিনী তখন উঠিয়া পাকগৃহে আহারাদি করিতে গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চাষাবাসের কথা।

স্মৃতি প্রভাত হইয়াছে। উষা তরুণী গৃহিণীর দ্বায় সংসার-কার্যের জন্ত জগতে সকলকে উঠাইলেন, সকলকে নিজ নিজ কার্যে প্রেরণ করিলেন। মাতা যেরূপ কষ্টকে সুন্দররূপে সাজাইয়া দেন, সেই-রূপ সুন্দর সাজ পরিধান করিয়া উষা আকাশে দর্শন দিগেন। হস্তমুখী তরুণীর প্রণয়াভিলাষে প্রণয়ী সূর্য্য অচিরেই উদিত হইলেন, উষার পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। তাঁহার উজ্জল কিরণরূপ সপ্ত অক্ষ রথে সংযোজিত করিয়া সেই জ্বলন্তকেশী সবিভা আকাশমার্গে ধাবমান হইলেন, আকাশ আলোকে পূর্ণ করিলেন, জগতে সংজ্ঞাশূন্যকে সংজ্ঞা দান করিলেন, রূপশূন্যকে রূপ দান করিলেন। উষা ও সূর্য্যোদয়ের শোভায় বিম্বিত হইয়া চারি সহস্র বৎসর পূর্বে আমাদের প্রাচীন ঋষিদের ঋষিগণ এই-রূপ সুন্দর কল্পনা দ্বারা সে শোভাটি বর্ণন করিয়া গিয়াছেন; সে-রূপ সরল, সুন্দর এবং প্রকৃতির আলোকে আলোকপূর্ণ কবিতা তাহার পর আর রচিত হয় নাই।

হেমচন্দ্র প্রাতঃকালে গাজোখান করিলেন এবং বাটী হইতে বাহির হইলেন। গ্রামের বৃক্ষ, পত্র ও কুটারগুলি সূর্য্যের লোহিত আলোকে শোভা পাইতেছিল, গ্রাম্য পুষ্পগুলি বৃক্ষে, ঘোপে বা জঙ্গলে ফুটিয়া রহিয়াছে এবং প্রাতঃকালের পাখী-গুলি নানাদিক্ হইতে রব করিতেছে। গৃহস্থের ঘেষেরা অতি প্রত্যুষে উঠিয়া ধর, দ্বার ও প্রাঙ্গণ ঝাঁট দিয়া পুকুর হইতে কলস করিয়া জল আনিতেছে অথবা রন্ধনাদি

আরম্ভ করিতেছে, বালকগণ পাঠশালায় বা খেলার যাইতেছে, কৃষকগণ লাঙ্গল ও পরু লইয়া মাঠের দিকে যাইতেছে। হেমচন্দ্রও আজ নিজের জমীখানি দেখিতে যাইবেন মানস করিয়াছিলেন।

ছায়াপূর্ণ গ্রাম্য পথ দিয়া কতকদূর আসিয়া হেমচন্দ্র একজন কৃষকের বাড়ীর সম্মুখে পৌঁছিলেন; কৃষকের নাম সনাতন কৈবর্ত।

সনাতন কৈবর্তের একখানি উচ্চ ভিত্তি-ওয়ালা ঘর ছিল, তাহার পার্শ্বে একখানি চেকির ঘর ও একখানি গোয়ালঘর, তথায় ৪৫টি গরু ছিল। উঠানেই উষ্ম, পার্শ্বে একখানি চালা আছে, বৃষ্টি-বাদলের দিন সেই চালার ভিতর রান্না হয়, নচেৎ খোলা উঠানে। সম্মুখে কতকগুলো কাঁটাগাছ ও জঙ্গল, একস্থানে একটা বড় খানা আছে, তাহাতে বৎসরের গোবর সঞ্চিত হয়, চাষের সময় উপকারে লাগে। গোয়ালঘরের পার্শ্বে গাড়ীর দুখানা চাকা ও খান দুই লাঙ্গল পড়িয়া আছে এবং বাড়ীর পশ্চাতে একটা ডোবার ন্যায় ময়লা পুকুর আছে। আমাদের বলিতে লজ্জা করে যে, অনেক নতন মিউনিসিপাল আইন ও নিয়ম শিক্ষা সত্ত্বেও সনাতনের প্রণয়িনী এই ডোবাতাই যে কেবল বাসন ধুইতেন, এমন নহে, তাহার স্নান ও কাপড়কাচাও এইখানে হইত এবং তাহার হৃদয়েষের পানের জল ও সংসারের রান্নার জলও এই পুকুরের।

হেমচন্দ্র আসিয়া সনাতনকে ডাকিলেন। সনাতনের তখন নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, তবে গাজোখানরূপ মহৎ কার্যের উদ্‌যোগপক্ষে রত ছিল, দুই একবার এ-পাশ ও-পাশ করিতেছিল, দুই একবার হস্ত বিস্তার করিয়া হাই তুলিতেছিল, আর এক একবার পা

শয়ানা সহধর্মিণীর সহিত “পোড়ারমুখী
এখনও উঠা গিনি, এখনও বাগীর ঘুম
ভাঙলো না বুঝি” ইত্যাদি মিষ্টালাপ
করিতেছিল, এই নৈতিক বক্তৃতার মধ্যে
সনাতন হেমচন্দ্রের ডাক শুনিল।

গলাটা মহাজনের গলার ছায়, অতএব
বুদ্ধিমান সনাতন সহসা উঠিল না। আবার
ডাক, তৃতীয়বার ডাক, স্তব্ধ সনাতন
কি করে, একটা উপায় করিতে হইল।
বিপদ আপদে সনাতনের একমাত্র উপায়
তাহার গরীয়সী সহধর্মিণী, অতএব তাহা-
কেই একটু অহনয় করিয়া বলিল, “এই
দরজাটা খুলিয়া উঁকি মেরে দেখ ত কে
এসেছে? যদি হারাম সিকদার মহাজন
হয়, তবে বলি বাজী নেই।” সনাতনের
প্রণয়িনী প্রিয় স্বামীর “পোড়ারমুখী”
প্রভৃতি মিষ্টালাপ শুনিয়া এতক্ষণ চুপ করিয়া
ছিলেন, এখন সময় পাইলেন। স্বামীর
কথাটি শুনিয়া আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া
শুইলেন। একটু হাই তুলিয়া সনাতনের
দিকে পিছন করিয়া অসঙ্কচিত-চিত্তে অসি
একবার নিদ্রা গেলেন।

সনাতন দেখিল খড় বিপদ, অথচ
আপনি সহসা বাহির হইতে পারে না,
কি করে? দুই একবার প্রণয়িনীকে
ডাকিল, কোন উত্তর নাই, একবার টানিল,
সাড়া নাই, একবার ঠেলা দিল, তথাপি
চৈতন্ত হইল না। সকল যত্ন ব্যর্থ হইল,
সকল বাণ কাটা গেল, তখন বীর পুরুষ
একেবারে রোবে দণ্ডায়মান হইয়া রিজহস্তে
যুদ্ধবার উত্তম করিল, —বলিল, “এত বেলা
হ’ল, এখনও বাগীর উঠা হ’ল না, এত
ডাকাডাকি করিলে, তবুও হারামজাদীর
সাড়া নাই, এইবার সাড়া করছি, দুটো
“শুতো” দিলেই ঠিক হবে।”

সনাতনশরী দেখিলেন, আর কোন-অস্ত্র
খাটে না, এখন অস্ত্র অস্ত্র না ধারণ করিলে
বড় বিপদ। অতএব তিনিও একেবারে
বিছানার উত্তিয়া বসিলেন, —বলিলেন, “কি,
হয়েছে কি? সকাল থেকে উঠে বাগ-মা
তুলে গাল দিচ্ছ কেন? মাতাল হয়েছ না
কি? দেখ না, মিন্‌বের মরণ আর কি!”
বিধুমুখী এইরূপে স্বামীর দীর্ঘায় বাহা
করিয়া পুনরায় পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

সে তীব্র স্বর শ্রবণে ও আরক্ত নয়ন
দর্শনে সনাতনের বীর হৃদয় বসিয়া গেল,
তথাপি সহসা কাপুরুষের ছায় যুদ্ধ ত্যাগ
করিল না।

সনাতন। বলি আবার শুনি যে?

স্ত্রী। শোব না?

সনাতন। ঘরের কাজ-কর্ম করতে হবে না?

স্ত্রী। হবে না।

সনাতন। জল আন্বিনি?

স্ত্রী। আন্বো না।

সনাতন। রান্না চড়াবি নি?

স্ত্রী। চড়াব না।

সনাতন। তবে আবার শুনি যে?

স্ত্রী। শোব না?

সনাতন। তবে বরকমা করবে কে?

স্ত্রী। তা আমি কি গ্রামে গিয়া-

পোড়ারমুখী, আমি কিরিয়া আসিতে-

গীহাকে দেখিয়া প্রণাম

বাপ হারামজাদা, আশীর্বাদ করিয়া কহি-

দাবা, এখানে মজুরের সঙ্গে

হবে? আর এস, ঘরে এস। তবে ভাল

আন গে।

সনাতন। প্রত্যহই মনে করি,

কবার ডেকে ধাওয়াই, তবে

“রাগ” মান থেকে ছুটা নিরে এসে

আর একবার মরণার্থে বিব্রত, আর শরী-

একটি হাই মরণার্থে বিব্রত, আর শরী-

করিতে লাগি, আর ছেলেগুলোকে টিক্‌টিক্‌

সনাতন পরাস্ত হইল; তখন বিধুমুখী হাতে পারে ধরিয়া ঘাট মানিয়া অনেক মিনতি করিয়া উঠাইল। সেই অব্যর্থ সাধনে বিধুমুখীর কোণের ক্লিষ্ট উপশম হইল এবং তিনি গাত্রোত্থান করিলেন। মনে মনে হাসিতে হাসিতে মুখে রাগ দেখাইয়া বলিলেন, “এখন কি করিতে হবে বল। এমন লোকেরও বর করিতে মাছুবে আসে? গালাগাল না দিলে রাজপ্রভাত হয় না।”

সনাতন। না, গাল দিলেম কৈ, একটী বার আদর ক’রে পোড়ারমুখী বলেছি বই ত নয়, তা আর বল্‌ব না।

স্ত্রী। না, কিছু বলনি, আমার আদর-লোহাগে কাজ নেই, কি করিতে হবে বল।

সনাতন। বলি, ঐ দরজায় কে ডাকাডাকি করছে, একবার গিয়ে দেখ না, যদি হারাম এসেছেন, একটু দুধ খাবেন কি? সিকদার হয়, তবে বলিস, আমি ঘরে নেই।

তখন বিধুমুখী গাত্রোত্থান করিলেন, তাঁহার বিশাল শরীর তুলিলেন। মুখখানি বাড়ীর গরুর দুধ একটু খান। এই বলিয়া একখানি মধ্যমাকৃতি কাল-পাথরের থালা সনাতন দুধ ছইতে গেল, তাহার স্ত্রী পাথর-স্তম্ভ, সেইরূপ প্রশস্ত, সেইরূপ উজ্জল বর্ণ। শাটি আনিয়া।

শরীরখানি বেশ নাড়শ-মুদ্র, ফলাকার, গোলাকার--পৃথিবীর স্তায়! পা দুখানি তাহার পড়িলে পৃথিবী তাহার স্তনের চিহ্ন

হেমচন্দ্র প্রাতঃকণ করিতে ভালবাসিতেন!

লেন এবং বাটী হইতে “সনাতনের মনে ভয়-গ্রামের বৃক্ষ, পত্র ও ফুলকান্‌ দিন এই রমণী-লোহিত আলোকে শোভা তাহার বাসরোধ গ্রাম্য পুষ্পগুলি বৃক্ষে, ঝোপে বর্ষে বর বড়, না ফুটিয়া রহিয়াছে এবং প্রাতঃকাল হইতে, পার্শ্বে গুলি নানাদিক হইতে রব করি

গৃহস্থের মেয়েরা অতি প্রত্যাষে উঠি খুলিয়া মধুর-ধার ও প্রাক্ষণ আঁট দিয়া পুস্কর হই

করিয়া জল আনিতেছে অথবা সনাতন বাড়ী

মন্দিরকে দেখিয়া সনাতনের স্ত্রী তখন ব্যগ্র ও অজিত হইয়া, ভাড়াভি বাহির হইয়া, মাঝায় একটু বোমটা টানিয়া, এক-খানি কাঠের চৌকি লইয়া বাবুকে বসিতে দিল ও সনাতনকে ডাকিয়া দিল।

সনাতন তখন নির্ভয়ে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিয়া দণ্ডবৎ হইয়া বলিল, “ভাজে, আমরা ঘুমিয়েছিলাম, তা আপনাকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে”

সে। তা হোক, এখন চল, মাঠে যেতে হচ্ছে তথানি দেখতে হবে। কৈ, তোমার কৈ কৈ?

সনাতন। আজ্ঞে, জন ঠিক করেছে, এই বাই। আপনি অনেকটা পথ চ’লে এসেছেন, একটু দুধ খাবেন কি?

সে। আবশ্যক নাই।

সনাতন। “না, একটু খান, আমাদের তাঁহার বিশাল শরীর তুলিলেন। মুখখানি বাড়ীর গরুর দুধ একটু খান।” এই বলিয়া একখানি মধ্যমাকৃতি কাল-পাথরের থালা সনাতন দুধ ছইতে গেল, তাহার স্ত্রী পাথর-স্তম্ভ, সেইরূপ প্রশস্ত, সেইরূপ উজ্জল বর্ণ। শাটি আনিয়া।

দোয়া ল সনাতনের স্ত্রী একটু বোমটা দিয়া এ ছেলে কোলে করিয়া এক বাটি দুধ বাবুকে আনিয়া ধরিল। হেম আনন্দচিতে ক্রেশকের ভক্তদত্ত দুধ পান করিলেন।

সনাতনও লোককোডাকি করিয়া হাজির করিয়া দুইখানি ও চারিটি বলদ লইয়া প্রস্তুত হইল। ল ক্ষেতের দিকে চলিল। পথে অস্ত্রাধা হইতে হইতে সনাতন বলিল, “তা এত কষ্ট ক’রে যাবেন কেন? আমাদের জমিন ছুটা চাষ দিয়েছি, আর ণব হলোই হয়, আজ সব হয়ে যাবে, তাই ফাল ধান বুনে দেব। আপনি আর ক’ন কেন?”

হেম। না, আমি অনেক দিন অবধি আমার জমীটা দেখিনি। তোরা কি কচ্ছিস্ না কচ্ছিস্, একবার দেখা ভাল, তাই আজ সকালে মনে করলেম, একবার দেখে আসি।

সনাতন। তা দেখুন না, আপনার জিনিস দেখবেন না? জমীটা ভাল, ধান বেশ হয়, তবে আপনারা ভদ্রলোক, জন খাটিয়ে চাষ করাতে হয়, তাই বোধ হয়, আপনারদের তত লাভ হয় না।

হেম। সামান্যই লাভ হয়। তোমাদের জন-মজুরদের দিয়ে বেলী থাকে না। গেল বার ২০০২৫০ মণ ধান হয়েছিল, কিন্তু তোদের দিয়ে, বীজ-খরচ দিয়ে, জমীদারের খাজনা দিয়ে ১০০ টাকার বড় বেলী ঘরে উঠেনি।

সনাতন। তা বাবু, সেই যে একবার বলেছিলেন, জমীটা ভাগে দেবেন, তা কি এখন ইচ্ছে আছে? যদি দেন, তবে আমাকেই দেবেন, আমি আপনার বাড়ীর চাকর, আপনার বাপের আমল থেকে ঐ জমী করছি। আপনাকে কোন কষ্ট পেতে হবে না, কিছু দেখতে হবে না, আমি নিজের খরচে চাষাবাদ করব, আমার হাল গরু সবই আছে, বছরের শেষে অর্ধেক ধান মেখে গাড়ী করে আপনার বাড়ী পৌঁছিয়ে দেব।

হেম। কেন বল দেখি, তোর ভাগ নেবার এত ইচ্ছে কেন?

সনাতন। আজ্ঞে, আপনি ত জানেন, আমার একখানি নিজের ছোট জমী আপনার জমীর পাশে আছে, কিন্তু ৮১০ কুড়ো, তাতে পেট ভরে না, আপনারদের কাছে মজুরি করে যা পাই, তাতেই আমার চলে। তবে যদি আপনার জমীটা ভাগে পাই, তবু লোকের কাছে বলতে পারব, এতটা জমী ভাগে করি। আর আপনারদের যত খরচ হয়,

আমরা ছোট লোক, আমাদের চাষে তত খরচ হবে না, দু' পরশা পাব, ছেলেগুলো খেয়ে বাঁচবে।

হেম। তা আচ্ছা, দেখা যাক কি হয়। তুই এখন ত আমার জমীটা বুনে দে, তার পর যা হয় কর্বো এখন।

এইরূপ কথাবার্তা করিতে করিতে হেমচন্দ্র, সনাতন ও সনাতনের লোকজন গ্রাম হইতে বাহির হইয়া যাঠে গিয়া পড়িলেন।

বৈশাখ মাসের দুই একটি বুড়ির পর সকল জমীই চাষ হইতেছে। প্রাতঃকালের শীতল বায়ুতে কৃষকগণ আনন্দে গান করিতে করিতে অথবা গরুকে নানারূপ নিকট-সম্বন্ধ-বাচক কথার উত্তেজিত করিতে করিতে চাষ দিতেছে। ক্ষেত্রের পর ক্ষেত্র, বঙ্গদেশে উর্বরা-ভূমির অন্ত নাই, তাহাঙ্গি বাঙ্গালী-দিগের প্রাণসর্বস্ব। জমীর পাখুই আইলের উপর দিয়া অনেক জমী পার হইয়া অনেক কৃষকের কৃষি-কার্য দেখিতে দেখিতে হেমচন্দ্র নিজ জমীর দিকে ঘাইতে লাগিলেন; কিন্তু অতদূর তাঁহার জমী দেখা হইল না, পথে তিনি সহসা তাঁহার শব্দরমহাশয় তারিণীবাবুকে দেখিতে পাইলেন। তারিণীবাবু পূর্বদিন কার্যবশতঃ অল্প গ্রামে গিয়াছিলেন। অল্প প্রত্যুষে বাটী ফিরিয়া আসিতেছিলেন। হেমচন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া প্রশ্নাম করিলেন, তিনিও আলীকাদ করিয়া কহিলেন, “এ কি বাবা, এখানে মজুরের সঙ্গে কোথা যাচ্ছ? এস, ঘরে এস। তবে ভাল আছে? আমি প্রত্যাহই মনে করি, তোমাকে একবার ডেকে ধাওয়াই, তবে কি জান, বর্তমান থেকে ছুটি নিরে এসে অবধি নানা বিষয়কার্যে বিভ্রত, আর শরীরও ভাল নেই, আর ছেলেগুলোকে টিকটিক

ক'রে বলি, তোমাকে একবার নিমন্ত্রণ ক'রে আসবে, তা যদি তারা ঘর থেকে একবার বেরোয়। তা তুমি একদিন এস, খাওয়া দাওয়া করো।”

হেমচন্দ্র খণ্ডরমহাশয়ের সঙ্গে ফিরিলেন; বলিলেন, “আজ্ঞে, তা যাব বৈ কি, আমিও মনে করেছিলাম, আজকালের মধ্যে একদিন দেখা ক'রব, কিছু আবশ্যক আছে। মহাশয়ের যদি অবকাশ থাকে, তবে আজই সন্ধ্যার সময় আসি।”

তারিণী। তা তুমি ঘরের ছেলে, আবার অবকাশ অনবকাশ কি, যখন আসবে, তখনই দেখা হবে। বাছা উমাতারা খণ্ডরবাড়ী হ'তে এসেছে, সেও কতবার বলেছে, বাবা, একবার হেমবাবুকে নিমন্ত্রণ কর না, আর গিন্নীও ভোমার কথা কত বলেন। তা আসবে বৈ কি, এস, আজ সন্ধ্যার সময় এস, কিছু জলযোগ করো।

এইরূপ, কথাবার্তা করিতে করিতে উভয়ের একত্রে গ্রামে আসিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বড়মানুষের কথা।

সন্ধ্যার সময় হেমচন্দ্র তারিণীবাবুর বাড়ীতে বাটিলেন। বাড়ীর বাহিরে গোয়ালঘর আছে, দু' তিনটি ধানের গোলা আছে, একটি পূজার চণ্ডীমণ্ডপ আছে ও তাহার সম্মুখে যাত্রার একখানি বড় আটচালা আছে। নাজীর-বাবুর বাড়ীতে বড় ধুমধামে দুর্গাপূজা হয়, নাচ-গাওনা-বাজনা হয়, এসিদ্ধ যাত্রার মত বৎসর বৎসর আইসে এবং গ্রামের লোকে সে বাটী সমাকীর্ণ হয়। প্রতিবারই নাজীর মহাশয় পূজার সময় বাড়ী

আসেন, এখান কোন আবশ্যকের জন্য বৈশাখ মাসে এক মাসের ছুটি লইয়া আসিয়াছেন।

আজ দুই বৎসর হইল, তারিণীবাবু আপনার বসিবার জন্য বাহিরে একটি পাকা ঘর করিয়াছেন এবং বাড়ীর পার্শ্বে কতকগুলি ইটের পাঁজা পোড়ান হইয়াছে, গৃহিণীর বড় ইচ্ছা যে, শুইবার ঘরটিও পাকা হয়। সেই পাকা বৈঠকখানা ঘরে একটি তেলের বাতী জলিতেছে, একটি বড় তক্তপোষের উপর সতরঞ্চ ও চাদর বিছান আছে, তাহার উপর তারিণীবাবু বসিয়া ধূম-সেবন করিতেছেন, পাড়ার ৪৫ জন লোক সম্মুখে বসিয়া নানারূপ আলাপ ও গল্পরহস্য করিতেছে।

হেমচন্দ্র আসিবামাত্র তারিণীবাবু তাঁহাকে বসিতে দিলেন এবং দুই চারিটি মিষ্টান্ন করিয়া একটি ছেলেকে বাড়ীর ভিতর লইয়া যািতে বলিলেন।

বাড়ীর ভিতর চারিদিকে বেড়া দেওয়া প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, সম্মুখে শুইবার ঘর, উচ্চ ভিটার উপর স্নানর বড় আটচালা, তাহার এ পাশে ও পাশে উচ্চ ভিটার উপর স্নানর স্নানর তিন চারিখানি চৌচালা বা পাচালা ঘর। ঘরের ভিত্তিগুলি স্নানররূপে লেপা, উঠান ঝাঁট দেওয়া পরিষ্কার এবং তাহার এক পার্শ্বে রান্নাঘর। বাটীর পশ্চাতে একটি বড় রকম পুকুর; তাহার চারিদিকে বাগান; নারিকেল, আম, কাঁঠাল প্রভৃতি নানারূপ ফলের গাছ আছে।

হেমচন্দ্র বাড়ীর ভিতর আসিয়াই ষাণ্ডীকে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন, তিনিও আশীর্বাদ করিয়া ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর পার হইয়াছে, শরীরখানি গোরবর্ণ, স্থূল এবং কিছু খর্ব্ব হইলেও জম্জাল। স্থূল বাহুর উপর মোটা মোটা তাম্বিল ও বাজু বাহুর সৌন্দর্য্য

সংসারের অর্থ প্রকাশ করিতেছে। হাতে মোটা মোটা ছইগাছি বালা, পায়ে মোটা মোটা মল। তাঁহার সেই বহুমূল্য গহনা ও বৌবনের শরীরখানি দেখিলে, তাঁহার আন্তে আন্তে চলন ও ভারি ভারি পদবিক্ষেপ দেখিলে, তাঁহার অল্প অল্প হাসিমাখা একটু একটু গোরব ও দর্পমাখা কথাগুলি শুনিলে তাঁহাকে বড়মাল্লবের গৃহিণী বলিয়া বোধ হয়। তথাপি তারিণীবাবুর গৃহিণী মন্দ লোক ছিলেন না, তাঁহার মনটা সাদা, তাঁহার কথাগুলিতে একটু দর্প থাকিলেও হান্তপূর্ণ ও মিষ্ট, তিনি আপনার সুখ্যাতি বা ধন-গোরবের কথা শুনিতে ভালবাসিলেও পরের নিন্দা, পরের অনিষ্ট বা পরকে ক্রেশ দেওয়া ইচ্ছা করিতেন না।

শান্তডী। বলি, বাড়ীর পাশে বাড়ী, তবু কি একদিনও আস্তে নেই? বুড়ী আছে কি নরেছে ব'লে আর খবর নাও না?

হেম। না, তা নয়, প্রত্যহই আপনাদের খবর পাই, তবে আমাদের অবস্থা সামান্য, সর্দাদাই কাজকর্মের রত থাকতে হয়।

শান্তডী। হাঁ, এখন তাই বল্বে বই কি? এই এত ক'রে বিন্ধকে হাতে ক'রে মাছুষ করলুম, এত ক'রে বিয়ে-থা দিলুম, তা সেও কি একবার জিজ্ঞাসা করে না যে, জোঠাইমা কেমন আছে?

হেম। সে সর্দাদা আপনার তত্ত্ব নেয়, আর এই উমাতারা এসে অবধি একবার আস্বে আস্বে মনে করছে, কিন্তু সংসারের সকল কাজ তাকেই করিতে হয়, আর ছেলেটিরও ব্যায়রাম, সেইজন্তই আস্বে আস্বে পারে না। তা উমাতারা যদি একদিন আমাদের বাড়ী যায়, তবে তার বোনের সঙ্গেও দেখা হয়, ছেলে-ছটিকেও দেখে আসতে পারে।

শান্তডী। না বাপু, উমার যে ঘরে বিয়ে

হয়েছে, তাদের এমন মত নয় যে, উমা কারও বাড়ীতে যাওয়া আসা করে। তারা ভারী বড়মাছুষ, ধনপুত্রের বনিয়াদী বড়মাছুষ, ঐ যে আগে ধনেশ্বর ব'লে নবাবদের দেওয়ান ছিল না, তাদেরই ঝাড়, ভারী বড়লোক, সে অঞ্চলে তেমন ঘর নাই।

হেম। হাঁ, তা আমি জানি।

শান্তডী। হাঁ, জান্বে বৈ কি, তাদের ঘর কে না জানে? ক্রিয়া, কর্ম, দান, ধর্ম, সকল রকমে, বুঝলে কি না, তাদের যেমন টাকা, তেমনি যশ। এই এবার তাদের একটি মেয়ের বিয়ে হ'ল বর্দ্ধমান, ঐ ইনি যেখানে কর্ম করেন, সেইখানে, তা বিয়েতে দশ হাজার টাকা খরচ করলে। তাদের কি আর টাকার গুণাগুণ আছে? বছর বছর পূজা হয়, তা দেশের যত বামুন আছে, বুঝলে কি না, এ ধনপুত্রের দক্ষিণা পায় না, এমন বামুনই নেই।

হেম। তা আমি জানি।

শান্তডী। তা উমাকে কি শীগগির পাঠায়, সেই পূজার সময় একবার করে পাঠায়, আর পাঠায় না। এবার এই ইনি ছুটি নিয়ে এসেছেন, তাই কত লোং পাঠিয়ে হাঁটাইটি ক'রে তবে উমাকে পাঠিয়েছে। তাও ব'লে দিয়েছে, ১৪ দিনের বাড়ি যেন একদিনও না থাকে, তা এই ১৪ দিন হলেই পাঠাব। এই বর্দ্ধমানে আমাদের লোক গিয়েছে, কাপড়, সন্দেশ, আঁব, লিচু, এই সব আনতে দিচ্ছে, মেয়ের সঙ্গে পাঠাতে হবে। বড়ঘরে মেয়ে বিয়ে দিলে কিছু খরচ কর্তেই হয়।

হেম। তা হয়ই ত, তা এর মধ্যেই আমার ব্রীকে ছেলেকের নিয়ে পাঠিয়ে দেব এখন। সে উমার সঙ্গে দেখা ক'রে যাবে।

শান্তডী। হাঁ, তা আস্বে বৈ কি; বিন্ধ আমার পেটের ছেলের মত, সে আস্বে না?

সে আসবে, আর তুমিও বাছা মধ্যে মধ্যে এসো, আমাদের বোঁজ-খবর নিও।

হেম। হাঁ, তা আসবো বৈ কি। এখন উমা আর আছে ক'দিন?

বাণ্ডী। আর আছে কৈ? এই বর্জমান থেকে আঁব সন্দেশ এলেই উমাকে পাঠিয়ে দেব; মেয়ের সঙ্গে কিছু না দিলে ত ভাল দেখায় না, বড়মাত্র্য কুটুম করেছি, কিছু না দিলে খুলে কি ভাল দেখায়? আবার দেখ, এই আসছে মাসে বক্সীবাটা, আবার তত্ত্ব করতে হবে। তাতেও বিস্তর খরচ আছে।

হেম। তা বটেই ত।

বাণ্ডী। কাজেই যেমন কুটুম করেছি, তেমনই তত্ত্ব করতে হয়, লোকের কাছেও আমাদের একটু মানদণ্ড আছে, কুটুমেরাও জানে, আমরা বিধবী লোক, কাজেই কিছু দিয়ে খুশি তত্ত্ব না করলে ভাল দেখায় না। তবে তোমার ছেলে দুটি ভাল আছে?

হেম। না, খোকার ৫।৭ দিন থেকে রাখে একটু গা গরম হয়, তা আমি কাল কাটোয়া থেকে ঔষধ এনে খাওয়াছি, আজ একটু ভাল আছে।

বাণ্ডী। বেশ করেছ, বাছা বিন্দুও ঐ রকম ছিল, কাহিল ছিল, মধ্যে মধ্যে জ্বর হ'ত। আহা, সেদিনকার ছেলে, বাছা এমন ধীর শান্ত ছিল যে, মুখটি খুলে কখনও কিছু চায় নি, আমি যতক্ষণ না ডেকে তাকে ভাতখাও-রাতেম, ততক্ষণ সে মুখটি তুলে একবার বলতো না যে, জ্যোঠাইমা ক্রিদে পেয়েছে। জ্যোঠাই-মা তার প্রাণ; তার বাপ ম'রে অবধি তাল্ল মার আর মনস্থির ছিল না, স্ত্রতরাং বিন্দুকে আর সুখকে আমি যতক্ষণে খাওয়াতেম, ততক্ষণে খেত, যতক্ষণে পরাতেম, ততক্ষণে পড়ত। আমার উমাতারা যে, বিন্দুও সে, আহা, বেঁচে থাকুক, একবার আসতে বলো।

হেম। হাঁ, আসবে বৈ কি।

বাণ্ডী। এই পূজার সময় বিন্দু এল, আবার সেই দিনই চ'লে গেল; এবার পূজার সময় ত তা হবে না। ঘরের মেয়ে, পূজার সময় ঘরে ৫।৭ দিন থেকে কাজকর্ম করবে। আর কাজকর্ম ত এমন নয়, এই আমাদের ঠাকুর দর্শন করতে, বুঝতে কি না, এই তাঃ ক্রোশের মধ্যে বত গ্রাম আছে, সব গ্রামের কি ইতর, কি ভদ্র সবাই আসে। তোমরা বাছা বাইরে থেকে এস, বাইরে থেকে চ'লে যাও, ঘরের কাজ ত জান না। রাত তিনটের সময় হাঁড়ি চো

তিনটে পর্যন্ত উঠনের জাল নেবে না, তবুও ফুলিয়ে উঠতে পারিনি! লোকই কত, খাওয়া-দাওয়াই কত, তার কি সাম্য-পরি-সাম্য আছে?

হেম। তা আর আমি দেখিনি? প্রতি বছরই দেখছি। আপনার বাড়ী পূজার ধুমধাম, এ সকলেই জানে।

বাণ্ডী। তা কি জান বাপু, বংশাধুগত ক্রিয়াকর্মটা উনি না করলে নয়। তবে দি টাকা না থাকত, সে আলাদা কথা এই গ্রামে কি সকলেই পূজা করে, এই তোমরা কি পূজা কর, তা ত নয়, তার জন্য লোকে ত কিছু বলে না, তবে আমাদের পুরুষাত্মক থেকে এটা আছে, মল্লিকদের বাড়ীর একটা নাম আছে, এ'র চাকরীও আছে, কাজেই আমাদের না করলে নয়, এই জন্য করা।

হেম। তা বটেই ত।

কতক্ষণ পর্যন্ত হেমচন্দ্র এই মল্লিকবাড়ীর ইতিহাস, ধনের ইতিহাস, পূজার ইতিহাস, ধনপুত্রের ধনধরের বংশের গৌরব, মেয়ের গৌরব, তত্ত্বের গৌরব, এই সমুদয় হৃদয়গ্রাহী বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা সেই দিন সায়ং-কালে শুনিয়াছিলেন, তাহা আমরা ঠিক

নি না। তবে এই পর্য্যন্ত জানি যে, কখনও পর হেমচন্দ্রের (দৈনিক পরিশ্রমের জন্যই বোধ হয়) চক্ষু দুটি একটু একটু মৃদিত হইয়া আসিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে তিনি কথার স্পষ্ট অর্থ গ্রহণ না করিয়াই “তা বটেই ত,” “তা বৈ কি” ইত্যাদি খাণ্ডীর সজোব-জনক শব্দ উচ্চারণ করিতেছিলেন। যাত্রি এক গ্রহর হইয়াছে, এমন সময় ঝন্ ঝন্ করিয়া শব্দ হইল; ধনপুরের ধনেশ্বর-বংশের পুত্রবধু, বোড়ববর্ষীরা, হীরক-মুক্তা-বিভূষিতা, রূপাভিমানিনী উমাতারা ঘরে প্রবেশ করিলেন।

উমাতারা অতিশয় গৌরবর্ণা, মুখখানি কাঁচা সোনার মত এবং তাহার উপর সুবর্ণ ও হীরকের জ্যোতি বড় শোভা পাইতেছে। মাথায় সুন্দর চিকণ কালো চুলের কি সুন্দর চিকণ ধোঁপা, তার উপর কপালে জড়োয়া-সিঁতির কি বাহার হইয়াছে! ধোঁপায় সোনার ফুল, সোনার প্রজাপতি, আর একটি হীরার প্রজাপতি! হাতে পৈঁচা, যবদানা, মরদনা, আর জড়োয়া বালা; বাহতে জড়োয়া তাবিজ ও বাজুর কি শোভা! পিঠে পিঠকাঁপা ছলিতেছে, কণ্ঠদেশে চন্দ্রবিন্দু-মৃদিত চন্দ্রহার! গলায় চিক, বৃকে সখের সাতনর যুক্তাহার! হাসিতে হাসিতে ধীরে ধীরে উমাতারা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, “ইস, আজ কি ভাগ্যি, না জানি, কার মখ দে'খে উঠেছি!”

হেমচন্দ্র। আশার ভাগ্যি বল; ভাগ্যি না হইলে কি তোমার মত লোকের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়?

উমা। হ্যা গো হ্যা, তা নৈলে আর এই দশদিন এখানে এসেছি, একবারও দেখা করুতে আস না? তা বা হোক, ভাল আছ ত? বিন্দু দিদি ভাল আছেন?

হেম। সে ভাল আছে ভূমি ভাল আছ?

উমা। আহি, যেমন রেখেছ, তবু জিজ্ঞাসা করুলে, এই ঢের! তা আজ এখানে আমা-দের দর্শন দিলে কি মনে ক'রে? বিন্দুদিদি যে বড় ছেড়ে দিলে, এতক্ষণ এখানে আছ, রাগ করবেন না ত?

হেম। তোমার বিন্দুদিদি আপনি আসতে পারুলে বাচে, সে আর ছেড়ে দেবে না? সে এই কত দিন থেকে তোমাকে দেখবার জন্য আসবে আসবে করুছে। তা কাল-পরশুর মধ্যে একদিন আসবে।

উমা। তবে কালই পাঠিয়ে দিও। দেবে ত?

হেম। আচ্ছা, কালই আসবে। সেও তোমার সঙ্গে দেখা করুতে অতিশয় উৎসুক, ভূমি শশুরবাড়ী থাকলে সর্বদাই তোমার মার কাছে তোমার খবর জেনে পাঠায়।

উমা। তা আমি জানি। বিন্দু দিদি আমাকে ছেলেবেলা থেকে বড় ভালবাসে, ছেলেবেলা আমরা দুজনে এক সঙ্গে খেলা করতাম, সে আমাকে এক দণ্ড না দে'খে থাকতে পারত না। ছেলেবেলা মনে করু-তুম, বিন্দুদিদির সঙ্গে চিরকাল একসঙ্গে থাকব, প্রতাহ দেখা হবে, কিন্তু ছেলেবেলার ইচ্ছাগুলি কি কখনও সম্পন্ন হয়? মনের ইচ্ছা মনেই থাকে। তা কাল তোমার ছেলেটিকেও পাঠিয়ে দেবে?

হেম। দেব বৈ কি, অবশ্য দেব।

উমাতারা অতিশয় আশ্বাসিত হইলেন। পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন যে, উমার পিতার ধনলিপ্সার, মাতার ধনগৌরবে, শশুরবাড়ীর বড়মাহুয়ী চালে, উমার বালাহর, বালা ভালবালা একেবারে বিনুশ্ব করে নাই, সে এখনও বালাকালের সৌহৃদ্য কখন কখন

মনে করিত, বাণ্যকালের সুহৃদকে একটু স্নেহ করিত। ধনপুরের ধনেশ্বর-বংশের পুত্রবধূর অপূর্ণ রূপগরিমা ও বহুমূল্য হীরক-মুক্তাদি দেখিয়া আমরা প্রথমে একটু ভীত হইয়াছিলাম—এগুলি দেখিলেই আমাদের একটু ভয়সঞ্চার হয়—এক্ষণে, বাহা ইউক, তাঁহার হৃদয়ের সদগুণ দেখিয়া কথঞ্চিৎ আশস্ত হইলাম; আর এই সামান্য সদগুণটি জগৎসংসারে সচরাচর দেখিতে পাইলে সুখী হইব। অন্তান্ত কথাবার্তার পর উমা বলিলেন, “তবে এখন একবার উঠ, অল্পগ্রহ ক’রে বখন এসেছ, একটু জলটল খেয়ে যাও, জলখাবার তৈয়ের হয়েছে।”

উমা কন্ম কন্ম করিয়া আগে আগে গেলেন, হেমচন্দ্র বিনীতভাবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। খাবার ঘরে ঢুকিলেন, খাবার সম্মুখে ছটি সামাদান জলিতেছে, রূপার খালে খানকতক লুচি, আর নানারূপ মিষ্টান্ন, চারিদিকে রূপার বাটিতে নানা রকম বাজান ও দুগ্ধ-ক্ষীর, যেন পূর্ণচন্দ্রের চারিদিকে কত নক্ষত্র ঘেষ্টন করিয়া বহিয়াছে। হেমচন্দ্রের কপালে এরূপ আয়োজন, এরূপ খাবার-দাবার সহসা ঘটে না, এই রোপ্য-সামগ্রীর মূল্যে তাঁহার এক বৎসরের সাংসারিক খরচ চলিয়া যায়।

উমাতারা আবার বলিলেন, “তবে খেতে বসো, গরিবদের যথাশাখা কিছু করেছি, ক্রটি হয়ে থাকলে কিছু মনে করো না।”

জ্ঞানীর সহিত অনেক মিষ্টালাপ করিতে করিতে হেমচন্দ্র আগার করিতে লাগিলেন। যে বৎসর বিন্দুর বিবাহ হইয়াছিল, তাঁহারই পর বৎসর উমার বিবাহ হয়। উমা অতিশয় দৌরবর্ণা ও সুন্দরী, হেমচন্দ্রের মতে উমার চেয়ে বিন্দুর নয়ন ছুটি সুন্দর ও সুখের অধিক, কিন্তু এ বিষয়ে হেমচন্দ্র নিরপেক্ষ

সাক্ষী নহেন, সুতরাং তাঁহার দৃষ্টি আমরা গ্রাহ্য করিতে পারিলাম না। এখানে সকলে বলিত, বিন্দু কালো মেয়ে, উমা সুন্দরী এবং সেই সৌন্দর্য্যগুণেই উমার বড় ঘরে বিবাহ হইল। ধনপুরের জমীদারের ছেলে সুন্দরী না হইলে বিবাহ করিবেন না স্থির করিয়া ছিলেন, উমা সুন্দরী মেয়ে বলিয়া তাঁহার সেই স্থানে বিবাহ হইল।

তারিণীবাবু এত ধনবান্ সঞ্চয় করিয়া অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতেন, তারিণীবাবুর মহিষীও ধনপুরের দাসীর নিকট গঞ্জনা সহিতেন; কিন্তু বড়মাতৃঘের কাছে লাথি-ঝাঁটাও নয়, গরিবের একটি কথা নয় না।

তারিণীবাবু ধনী কুটুম্ব করিয়াছেন বলিয়া গ্রামে তাঁহার মান-সন্ত্রম বাড়িল; তিনি ক্রমে দেশের মধ্যে একজন বড়লোক হইতে চলিলেন। এরূপ লাভ হইলে গোপনে দুই একটি গঞ্জনা ও তিরস্কার ও কুটুম্বের ঘৃণা কোন্ বিষয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন লোকে হেলায় না বহন করেন?

উমাতারার টাকার সুখ হইল, অল্প সুখ তত হইয়াছিল কি না, জানি না, যদি এই উপজ্ঞাসের মধ্যে ধনপুরের জমীদার-পুত্রের সহিত কখনও দেখা হয়, তবে সে কথার বিচার করিব। তবে শুনিয়াছি, বয়সের সহিত সেই জমীদার-পুত্রের রূপ-লালসা বাড়িতে লাগিল এবং নানা দিকে প্রবাহিত হইল। কিন্তু বড়মাতৃঘের কথার আমাদের এখন কাজ নাই, আমরা গরিব গৃহস্থের ইতিহাস লিখিতেছি

উমার স্বতঃপ্রবৃত্তিতে অন্নকষ্টেরও অভাব ছিল না। গরিবের মেয়ে বলিয়া তাঁহাকে কখন কখন কথা সহিতে হইত, ননদদিগের লাঞ্ছনা, সময়ে সময়ে দাসীদিগেরও গঞ্জনা! কিন্তু পা-ময় গহনা পরিলে বোধ হয়, অনেক

ষ্টকমু নয়, তাহার ও জড়োয়া দেখিলে বোধ হয়, হৃদয়জাত অনেক চুঃখের হ্রাস হয়। এ শাস্ত্রে আমরা বড় বিজ্ঞ নহি, স্ববর্ণরোপের গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই, জড়োয়া চক্ষুতে বড় দেখি নাই, সুতরাং তাহার মূল্যও জানি না। হীরকের জ্যোতিতে মনের মালিঙ্গ ও অন্ধকার কতদূর দূর হয়, বিজ্ঞবর পণ্ডিত ও পণ্ডিতাগণ নির্দ্ধারণ করুন। আমরা কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ অববি উমাতারার সহিত বাকালাপ করিতে করিতে এবং অনেকবার উমাতারার সেই স্ববর্ণমণ্ডিত মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে একটু সন্নিদ্রমণা হইলেন। তাঁহার বোধ হইল যেন, সেই হীরকমণ্ডিত স্নানর ললাটে এই বয়সেই এক একবার চিন্তার ছায়া দৃষ্ট হইতেছে, যেন সেই হাস্ত-বিষ্কারিত নয়নের প্রান্তে সময়ে সময়ে চিন্তার ছায়া দৃষ্ট হইতেছে। এটি কি প্রকৃতই চিন্তার ছায়া, না সেই সামান্যনের আলোক এক একবার বায়ুতে স্তিমিত হইতেছে, তাহার ছায়া? না ভবিষ্যৎ জীবন সেই বোবনের ললাটে আপন ছায়া অঙ্কিত করিতেছে?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

বিষয়কণ্ঠের কথা ।

আহারাদি সমাপ্ত হইলে হেমচন্দ্র বাহির-বাটীতে আসিলেন, শুইলেন, তারিণীবাবু তখন একাকী বসিয়া আছেন। প্রদীপের স্তিমিত আলোকে একখানি কাগজ পড়িতেছেন, সেখানি দৈনিক বা সাপ্তাহিক বা

মাসিক পত্র নহে, সে একটি পুরাতন তমক-সূক। তারিণীবাবুর কপালে বয়সের দুই একটি রেখা অঙ্কিত হইয়াছে, শরীর স্থূল, বর্ণ শ্রাম, চক্ষু দুইটি ছোট ছোট, কিন্তু উজ্জল, মস্তকে টাক পড়িতেছে, সম্মুখের কয়েক-গাছি চুল পাকিয়াছে। তারিণীবাবুর আকারে বা আচরণে কিছুমাত্র বাহ্যভঙ্গর বা অর্থের দর্প ছিল না, যাহারা বিষয় সৃষ্টি করেন, তাঁহাদের সেগুলি থাকে না, যাহারা ভোগ করেন বা উড়াইয়া দেন, তাঁহাদের সেগুলি ঘটিয়া থাকে। হেমচন্দ্রকে দেখিয়া তারিণী-বাবু কাগজখানি রাখিলেন, ধীরে ধীরে চসমাটি খুলিয়া রাখিলেন, পরে নস্ত্র ও ধীরবচনে বলিলেন, “এসো বাবা, বসো।” হেমচন্দ্র উপবেশন করিলেন।

মিষ্টালাপ ও অন্তান্ত কথার পর হেমচন্দ্র বিষয়ের কথা উত্থাপন করিলেন, তারিণী-বাবু কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাহা শুনিলেন এবং ধীরে ধীরে উত্তর দিতে লাগিলেন।

হেম। অনেক দিন পরে আপনি বাড়ী এসেছেন, আপনাকে দেখেও কথাবাস্তা শুনে বড় সুখী হলেম, যদি অল্পমতি করেন, তবে একটু বিষয়কর্ণের কথা বলতে ইচ্ছা করি।

তারিণী। হাঁ, তা বল না, তার আবার অল্পমতি কি বাবা, যা বলতে হয় বল, আমি শুনিছি।

হেম। আমার স্বত্তর মহাশয় যে সামান্য একটু জমী চাষ করাতেন, তারই কথা বলছি।

তারিণী। বল।

হেম। সে জমীটুকু আমার স্বত্তর মহাশয় আজীবন দখল করতেন ও চাষ করাতেন। তাঁর পূর্বে তাঁর পিতা আজীবন চাষ করাতেন, তা অবশ্যই আপনি জানেন।

তারিণী। জানি বৈ কি। হরিদাসের পিতার পূর্বে তাঁর পিতা সেই জমী চাষ করাতেন, তিনি আমারও পিতামহ, হরিদাসেরও পিতামহ। তখন আমরা বালক ছিলাম, কিন্তু সে কথা বেশ মনে আছে। পিতামহের কাল হ'লে আমার পিতাই সমস্ত জমী চাষ করাতেন, হরিদাসের পিতা জ্যেষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু তাঁর বিষয়বৃত্তি বড় ছিল না। এই কল্প আমার পিতাই সমস্ত সম্পত্তি একজমালিতে তত্ত্বাবধান করতেন পরে আমার জ্যেষ্ঠা, হরিদাসের পিতা, পৃথক্ হয়ে গেলে তাঁর জীবনযাপনের জন্ত আমার পিতা তাঁকে কয়েক বিঘা জমী চাষ করিতে দিয়াছিলেন খাজ। হরিদাসও আজীবন সেই জমীটুকু চাষ ক'রে এসেছেন মাত্র, কিন্তু আমাদের এ সম্পত্তি একজমালি। এ সকল কথা বোঝ হয়, তুমি জান না, কেমন ক'রেই বা জানবে, তুমি সে দিনের ছেলে, আর সেবেলা ত গ্রামে বড় থাকতে না, বর্ধমানের ও কলকাতার লেখাপড়া করত।

হেমচন্দ্র সেই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, সম্পত্তি একজমালি, তাহা এই নূতন শুনিলেন। তারিণী-বাবুর এট নূতন স্মরণ তর্কটি শুনিয়া তাঁহার একটু হাসি পাইল, কিন্তু অদ্ভুত তিনি তর্ক থণ্ডন করিতে আইসেন নাই, আপোষ করিতে আসিয়াছেন; সুতরাং হাসি সংবরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “পূর্বের কথা আপনি আমাপেক্ষা অনেক জানেন, তাহার সন্দেহ নাই। আমি এই-মাত্র বলছিলাম যে, স্বতন্ত্রমহালয় যে জমী আজীবনকাল পৃথক্‌রূপে চাষ ক'রে এসেছেন, তা হ'তে তাঁর অনাথা কল্পা কিছু প্রত্যাশা করিতে পারে কি?”

তারিণী। আহা! বাছা বিন্দু এই বয়সেই পিতা-মাতা-হারা হয়ে অনাথা

হয়েছে, তাহা ভাবলে বুক ফেটে যায়। আহা! আজ যদি হরিদাস মৃত, এমন সোনার চাঁদ মেয়েকে নিষে, এমন সচ্চরিত্র সোনার জামাইকে নিষে ঘর করিতে পারত, তা হ'লে কি এত গুণগোল হ'ত, এত খরচ ক'রে আমাকে তার কবিত জমীটুকু রক্ষা করিতে হ'ত? তবে ভগবানের ইচ্ছা, হরিদাস গেছেন, আমাকে একলাই সমস্ত ভার বহন করিতে হল; একজমালি জমীর যে অংশটুকু তিনি চাষ করাতেন, তা পুনরায় অত্রান্ত জমীর সঙ্গে আমাকেই তত্ত্বাবধান করিতে হচ্ছে। তাতে আমার লাভ বিশেষ নেই, সেই জমীটুকু রক্ষার জন্ত তার মূল্য অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিতে হয়েছে। কিন্তু কি করি, পৈতৃক সম্পত্তি পরের হাতে যায়, জমীদার অত্রকে দেয়, তা আর চক্ষে দেখা যায় না।

হেম। তবে স্বতন্ত্রমহালয়ের জমী হ'তে কি তাঁর কল্পা কিছুই প্রত্যাশা করিতে পারে না?

তারিণী। কল্পা আবার কি বল আমরা বুড়ো হয়ে কত লোক তোমরা কালেতে ছেলে, জামাইদের সব কথা একটু ভেদে বললে কি বুঝে উঠতে পারি? বিন্দু আম দেয় থাকবে, ক, আমার উমা যে, বিন্দু সে, স্বতন্ত্র মালিকী হারার ঘরে এক কুনকে চা আছে, স্বতন্ত্র মালিকী বিন্দু ও উমা তার সম ভাগ ক'রে থাকবে, তাতে আবার জমী অংশই কি, প্রত্যাশা কি?

হেমচন্দ্র বেশ মনে তারিণী-বাবুর সবিপেয়ে উঠা কথার, তারিণী-বাবুর স্মরণ ও তিনি স্পর্শ করিতে পারিতেছেন না অনেকক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বৃথা চো করিয়া, অনেকক্ষণ কথার প্রত্যাশা কহিয়া অবশেষে কহিলেন, “তারিণী হারার যদি অল্পমতি

দিন, যদি রাগ না করেন, তবে আর একটি কথা বলি।’

তারিণী। বল বাবা, এতে রাগের কথা কি আছে? তুমি আমার ছেলের মত, তোমার কথায় আমার রাগ?

হেম। আপনি বোধ হয় জানেন যে, ষষ্ঠ মাহাশয় যে জমী আজীবনকাল পৃথক-নপে চাষ করে আসছিলেন, তা যে এজমালি সম্পত্তি, তা আমরা স্বীকার করি না।

তারিণী। তোমরা স্বীকার করবে কেন? তোমরা কালেক্টর ছেলে, ইংরেজী লেখাপড়া শিখেছ, তোমরা কি আর এজমালি স্বীকার করবে? এখন কালেক্টর ছেলেরা ভায়ে ভায়ে একত্র থাকতে পারে না, শুনেছি, মায়ে পোয়ে এজমালিতে থাকতে পারে না, তোমাদের কথা কি বল? আমরা বুড়ো সুড়ো লোক, আমরা সে সব বুঝি না, আমরা এজমালিতে থাকতে ভালবাসি, বাপ-পিতামহ যা করে গেছেন, তাই করতে ভালবাসি। আগা, থাকতো আমার হরিদাস, সে জানত, এ জমী মল্লিকবংশের এজমালি সম্পত্তি কি না, তোমরা সেদিনকার ছেলে, তোমরা কি জানবে বল?

হেম। তা যাই হউক, আমরা এজমালি বলে স্বীকার করি না, তা আপনি জানেন। আর এজমালি হোক আর নাই হোক, সে সম্পত্তির একটি অংশ বোধ হয় আমরা প্রত্যাশা করতে পারি আমার ষষ্ঠ-মাহাশয় যে জমীটুকু চাষ করতেন, একপে আমার জ্বর পক্ষে আমি যদি সেই জমীটুকু পৃথকরূপে চাষ করতে চাই, তাতে কি আপনি সম্মত আছেন?

তারিণী-বাবু কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ না হয়ে একটি হাসিয়া বলিলেন, “হি বাবা, তুমি স্বভাবতঃ বুদ্ধিমান ছেলে, লেখাপড়া শিখেছ,

এমন নির্কুড়ির কথা কেন? মল্লিক-বংশের বংশাভূগত এজমালি জমী কি পৃথক করা যায়? তাই যদি পারতেন তবে সেই জমী-টুকুর মূল্যের দশগুণ খরচ করে আমার হাতেই রাখতেন কেন? সঙ্গত কথা বল, তবে শুনতে পারি; অসঙ্গত কথা শুনবে কেমন করে? ওরে হরে! আর এক ছিলিম তামাক দিয়ে যা; রাত হয়েছে, আর এক ছিলিম তামাক খেয়ে শুতে যাই, কা’ল রাত্রিতে গ্রীষ্ম, বড় ঘুম হয়নি, গাটা ঘুম ঘুম করছে।”

উগ্রস্বভাব হেমচন্দ্রের মনে একটু রাগের সঞ্চার হইল, কিন্তু তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, তিনি বাস্তবিকই অসঙ্গত কথা বলিয়াছিলেন। যে জমী তারিণী-বাবুর স্বায়ত্ত্ববিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোক দশ বৎসর দখল করিয়া আসিয়াছেন, সেটি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বলা অসঙ্গত নহে ত কি? ক্ষণেক চিন্তা করিয়া হেমচন্দ্র পুনরায় বলিলেন, “আপনার যদি শোবার সময় গরম থাকে, তবে আমি আর আপনাকে বসিয়ে রাখব না, তবে আর একটি কথা আছে, যদি আজ্ঞা করেন, নিবেদন করি।”

তারিণী। না না, তাড়াতাড়ি উঠো না। অনেক দিনের পর তোমাকে দেখলেম, চক্ষু জুড়াল, তোমাকে কি ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করে? তবে বড় গ্রীষ্ম পড়েছে, তাই গাটা মাটি মাটি করে। তা এখনই আমি শুতে যাব না, বিলম্ব আছে, কি বলছিলেন বল।

হেম। আপনি সে জমীটুকু ছেড়ে দিতে অস্বীকার করবেন, তা আমি পূর্বেই শুনেছিলাম, তবে সেই জমীর জন্ত আমরা কিছু কি প্রত্যাশা করতে পারি? এ বিষয়ে মোকদ্দমা করতে আমাদের নিতান্ত অনিচ্ছা, কোন মতে আপোসে এ বিষয়টা মীমাংসা

একটি পরসাদিতে পারি, আমার বোধ হয় না।

হেমচন্দ্র একটু হাসিলেন, মনে মনে ভাবিলেন, “তারিণী-বাবু বাজারী-একরাত্তিতে একশত টাকা খরচ করেন, আমার দশ টাকা হইলে মাসের খরচা চলিয়া যায়।” প্রকাশ্যে বলিলেন, “আজ্ঞা আজ্ঞা, তাও দিতে আমি সম্মত হলেম।”

তারিণী। তা হবে বৈকি, তোমার মত সুবোধ ছেলেকে কি আর এ সব কথা বলতে হয়?

আর অনেককণ কথা হইল। বিষয়ী তারিণী বাবু এক একটি করিয়া সমস্ত নিয়মগুলি আপনার সাপক্ষে স্থির করিয়া লইলেন, বিষয়বুদ্ধিহীন হেমচন্দ্র তাহাতে আপত্তি করিলেন না। রাত্রি দেড় প্রহরের পর তারিণী-বাবু হেমচন্দ্রের অনেক প্রশংসা করিয়া এবং তাহাকে সহস্র বর্দ্ধমানে একটি চাকরী করিয়া দিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং তিনি কালে, একজন ধনী, জ্ঞানী, মানী, দেশের বড়লোক হইবেন আশ্বাস দিয়া হেমচন্দ্রকে বিদায় দিলেন। হেমচন্দ্রও ষণ্ডর মহাশয়ের ডজাচরণের অনেক স্তুতিবাদ করিয়া বাড়ী আসিলেন।

আমাদিগের লিখিতে লজ্জা হয়, তারিণী-বাবু ও হেমচন্দ্রের এই প্রচুর মিথ্যলাপ ও স্তুতিবাদ তাহাদের পরম্পরের হৃদয়ের প্রকৃত ভাব ব্যক্ত করে নাই। হেমচন্দ্র বাড়ী আসিবার সময় মনে মনে ভাবিতেছিলেন, “শাইলক্কে পণের অল্প অংশ পরিত্যাগ করান যায়, কিন্তু ধনী, মানী, বিষয়ী, বর্দ্ধমানের প্রসিদ্ধ কর্মচারী তারিণী-বাবুর পণ বিচলিত হয় না।” তারিণী-বাবুও তাহার গৃহিণীর পার্শ্বে শয়ন করিয়া গৃহিণীকে বলিতেছিলেন, “আজকাল কালেরের ছেলে-

গুলো কি হারামজাদা; আর এই হেমই বা কি পোয়ার, বলে কি না, জ্যেষ্ঠবৃত্তের সঙ্গে মোকদ্দমা করবে! বলতেও লজ্জা করে না। শীঘ্র অধঃপাতে যাবে।” গৃহিণী এ কথাগুলি বড় শুনিলেন না, তিনি ধনবান্ কুটুম্বের কথা স্বপ্ন দেখিতেছিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বাল্যকালের বন্ধু।

রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের সময় হেমচন্দ্র বাটা আসিয়া দেখিলেন, বিন্দু তাহার জন্ত উৎসুক হইয়া পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। হেমকে দেখিবামাত্র সে শাস্ত মুখখানি ক্ষুণ্ণির্ণ হইল, নয়ন দুটিতে একটু হাসি দেখা দিল, হেমের মুখের দিকে সর্বেহে চাহিয়া বিন্দু বলিলেন, “কি ভাগ্যি, তুমি এতকণে এলে; আমি মনে কর্লেম, বুঝি বাড়ীর পথ ভুলে গেছ বা উমাতারার কথা ঠেলতে পার্লেম না, আজ জ্যেষ্ঠা মশাইয়ের বাড়ী থেকে বুঝি আসতে পার্লেম না।”

হেম। কেন বল'দেখি, এত ঠাট্টা কেন? অধিক রাত্রি হয়েছে না কি?

বিন্দু আবার হাসিয়া বলিলেন, “না, এই কেবল ছপূর রাত্রি! সন্ধ্যা থেকে তোমার একজ- বন্ধু অপেক্ষা কর্ছেন।”

হেম। কে? কে? কে?

“এই দেখ্বে এস না,” এই বলিয়া বিন্দু আগে আগে গেলেন, হেম পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন।

বাড়ীর ভিতর বাইবামাত্র একজন গৌরবর্ণ যুবা পুরুষ উঠিয়া তাহার দিকে অগ্র-

রি হইলেন ; হেমচন্দ্র কণেক তাঁহাকে
দিতে পারিলেন না, বিন্দু তাহা দেখিয়া
কণেক মূঢ়কে হাসিতে লাগিলেন । কণেক
পির হেস বলিলেন, “এ কি শরৎ ! তুমি
কল্কেতা হ’তে কবে এলে ? উঃ, তুমি কি
বলিলে গেছ ! আমি তোমাকে তোমার
কালীতারার বিবাহের সময় দেখে-
ছিলাম, তখন তুমি বর্দ্ধমানে পড়তে, একবার
বাড়ী এসেছিলে : তখন তুমি সাত আট
বালকের বালক ছিলে মাত্র । এখন বলিষ্ঠ
দীর্ঘাকার যুবক হয়েছ, তোমার দাড়ী-পোপ
হয়েছে, তোমাকে কি সহসা চেনা যায় ?”

শরৎ । নয় বৎসরে অনেক পরিবর্তন হয়,
তার সন্দেহ কি ? দিদির বিবাহের পরেই
বাবার মৃত্যু হ’ল, তার পর মাও গ্রাম হ’তে
বর্দ্ধমানে গিয়ে রইলেন, সেই জন্ত আর বাড়ী
আসা হয়নি । আমি এষ্টে স পাশ করলে
পর বর্দ্ধমান হ’তে কল্কেতায় গেলেম, মাও
বর্দ্ধমানের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে পুনরায় গ্রামে
এসে রয়েছেন, তাই আমাদের গ্রীষ্মের
ছুটিতে বাড়ী এলেম । নয় বৎসরের পর
আপনি আমাতে পরিবর্তন দেখবেন, তাতে
বিস্ময় কি ? আমিই তখন দেখেছি, আর
এখন কি দেখছি ! বিন্দু দিদি আমার চেয়ে
দুই বৎসরের বড়, আমরা ছেলেবেলায়
সর্বদা একত্রে খেলা কর্তেম, আমি মল্লিক-
দের বাড়ী যেতম, অথবা বিন্দু দিদি সুধাকে
কোলে ক’রে আমাদের বাড়ী দেখতে আস-
তেন, পেরারা-তলার সুধাকে রেখে আকুশি
দিয়ে পেরারা পেড়ে খেতেন ; আজ কি না
বিন্দু দিদি সংসারে গৃহিণী, দুই ছেলের মা !

বিন্দু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “তুমি
আর বলো না, তোমার দৌরাণ্যো ভাল-
পুত্রের আঁব-বাগানে আঁব থাকত না,
এখন কল্কেতার গিরে লেখা-পড়া শিখে

তুমি কালেকের ছেলের মধ্যে মা কি এক-
জন প্রধান ছাত্র হয়েছ । তখন গেছোদের
মধ্যে একজন প্রধান গেছো ছিলে ।”

শরৎ । বিন্দু দিদি, সেও তোমাদের জন্ত ।
তোমার জোঠাই-মা কাঁচা আঁবগুলো খেতে
বারণ করতেন, আমি সন্ধ্যার সময় লুকিয়ে
লুকিয়ে বেড়া গলিরে রাসাঘরে আঁব দিয়ে
আসতাম কি না, বল না ?

হেম উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, “আর
পরম্পরের গুণ-ব্যাখ্যার আবশ্যক কি,
অনেক গুণ বেরিয়ে পড়েছে ! আমিও
তোমাদের বাড়ী যেতম, সুধাকে তখার
কখন কখন দেখতে পেতম, তখন সুধা
৪১৫ বৎসরের ছোট মেয়েটি । সুধা ! ঘোষে-
দের বাড়ী যেতে, মনে পড়ে ? সেখানে
তোমার দিদি তোমাকে কোলে ক’রে নিয়ে
যেতেন, মনে পড়ে, শরৎকে মনে পড়ে ?

সুধা । শরৎ-বাবুকে একটু একটু মনে
পড়ে । দিদি আপনি পেরারা পেড়ে খেত,
আমি পাড়তে পাবতাম না, শরৎ-বাবু
আমাকে কোলে ক’রে পেরারা পেড়ে
খাওয়াতেন ।

হেমচন্দ্র তখন বিন্দুকে জিজ্ঞাসা করি-
লেন, “তোমাদের সকলের খাওয়া দাওয়া
হয়েছে ? শরৎ খেয়েছে ?”

শরৎ । হাঁ, বিন্দু দিদি আমাকে বেরূপ
কচি আঁবের অমল খাইয়েছেন, সেরূপ কচি
আঁব কখন খাইনি !

বিন্দু । কেন, নয় বৎসর পূর্বে যখন
গাছে গাছে বেড়াতে, তখন ?

শরৎ । হাঁ, তখন খেয়েছি বটে, কিন্তু
তখন ত এমন রেঁধে দেবার কেউ ছিল
না ।

বিন্দু । থকবে না কেন ? রেঁধে দেবার
তবু সইত না, তাই বল ।

হেম। সুধার খাওয়া হয়েছে? তোমার খাওয়া হয়েছে?

বিন্দু। সুধা খেয়েছে, আমি এই বাই খাই গে। তুমি আর কিছু খাবে না?

হেম। না, তোমার জ্যেষ্ঠা মশায়ের বাড়ীতে যে খেয়ে এসেছি, আর কি খেতে পারি? বাও, তুমি বাও, খাওয়া খাওয়া কর গে, অনেক রাজি হয়েছে।

বিন্দু রাত্রা-ঘরে গেলেন। সুধা হেম-চন্দ্রের জন্ম এতক্ষণ জাগিয়াছিল, এখন রকের উপর একটি মাদুর পাতিয়া শুইল, চিন্তাশূন্য বালিকা শুইবামাত্র সেই শীতল নৈশ বায়তে ও শব্দবর্ণ চক্ষালোকে তৎক্ষণাৎ নিম্জিত হইয়া পড়িল। সমস্ত তালপুতুর গ্রাম এখন নিমন্তক এবং সেই শুল্লর চন্দ্রকরে নিম্জিত।

হেমচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র সেই রকে উপবেশন করিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। তালপুতুরের ঘোষবংশ ও বসুবংশের মধ্যে বিবাহ-সূত্রে সম্বন্ধ ছিল; হেম ও শরৎ বাল্যকালে পরস্পরকে জানিতেন ও প্রীতি করিতেন। এক্ষণে কণেক কথাবার্তার পর হেমচন্দ্র উন্নতহৃদয়, বুদ্ধিমান, ধীরপ্রকৃতি, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শরচ্চন্দ্রের অন্তঃকরণ বুদ্ধিতে পারিলেন; শরচ্চন্দ্রও হেমচন্দ্রের উন্নত তেজঃপূর্ণ অন্তঃকরণ জানিতে পারিলেন। এ জগতে আমাদিগের অনেক পরিচিত লোক আছে, মনের একা অতি অল্প লোকেরই সহিত ঘটে, সুতরাং হৃদয়ের অহরূপ লোক দেখিলেই হৃদয় সহসা সেই দিকে আকৃষ্ট হয়। হেমচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র বতাই কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন, ততই তাঁহাদিগের হৃদয় পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল, হেম শরৎকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্থায় দেখিতে লাগিলেন, শরৎ হেমকে জ্যেষ্ঠের স্থায় ভক্তি

করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পরস্পর কথোপকথন হইতে হইতে বিন্দু আহারা সমাশন করিয়া তথায় আসিয়া বসিলেন সুধার মাথার বাঁশ ছিল না, কপ্ত ভগিনী মন্তকটি আপন ক্রোড়ে স্থাপন করি তাহার গুচ্ছ গুচ্ছ কেশগুলি লইয়া সন্মোখেলা করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর হোয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “শরৎ, তুমি এবার এ এর, জন্ম পড়ছে, ছয় সাত মাস ধরে তোমাদের পরীক্ষা, পরীক্ষার অবশ্যই তু যে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবে এবং পানি পাবে, তার সন্দেহ নেই।” তার পর কি করবে স্থির করেছে?”

শরৎ। কিছুই স্থির নেই। আমার বি, এ, পর্যন্ত পড়তে হচ্ছে। কিন্তু মা গ্রামে থাকেন। এই পরীক্ষার পর গ্রামে থেকে তিনি আমাকে বিষয়টি দেখতে বলেন। তা দেখা হাক কি হয়, আমাদের বিষয়ও অতি সামান্য, বৎসরে সাত আট শত টাকার অধিক লাভ নেই, কোন উপযুক্ত চাকরী পেলে করুতে ইচ্ছা আছে। মা চাকরী-স্থানে আমার সঙ্গে থাকবেন, এখানে লোকজন বিষয় দেখবে।

হেম। তা বা হয়, তোমার পরীক্ষার পর হবে। এই কয়েকমাস কলকাতার থেকে মনোবোগ করে পড়া-শুনা কর, ‘এন্ট্রান্স’ পরীক্ষা যে রকম সম্মানের সহিত দিরাছ, এই পরীক্ষাটা সেইরূপ দাও।

শরৎ। সেইরূপ ইচ্ছা আছে। শীঘ্র কলকাতার গিয়ে পড়তে আরম্ভ করব। আমি মনে মনে এক একবার ভাবি, আপনারাও কেন একবার কলকাতার আসুন না; আপনারা কি চিরকালই এই গ্রামে বাস করবেন? আপনি নয় বৎসর পূর্বে একবার

কলকোতা করেকমাস ছিলেন, বিন্দু দিদি কখনও কলকোতা দেখেন নি, একবার উভয়েই চলুন না কেন ? এই চাব দেওয়া, ধান বুনা হয়ে গেলে আসুন, আমাদের বাড়ীতে থাকেবেন, আবার ইচ্ছা হ'লে পুনরায় ভাদ্রমাসে ধান কাটবার সময় আসবেন ।

হেম । শরৎ, তুমি আমাদের স্নেহ কর, তাই এ কথা বলছ । কিন্তু আমি কলকোতার গিয়ে কি করব বল ? তুমি লেখা-পড়া করবে, পরীক্ষা দেবে, সম্ভবতঃ চাকরী পাবে ; আমি গিয়ে কি করব বল ।

শরৎ । কেন, আপনি কি কোন প্রকার চেষ্টা দেখতে পারেন না ? আপনি একপ লেখা-পড়া শিখে কি চিরজীবন এইখানে কাটাবেন ? শুনেছি, আপনি ক ছেড়ে বিস্তর বই পড়েছেন, ক-ও বিন্দুর শিক্ষা বলে, স্নান বাহির হইয়া গেলেন । অতঃপাশ্চাত্যও নির্জিত ছিল, দ্বিপ্রহর রাত্রির নির্মল চন্দ্রালোক সুধার স্নানর প্রস্তুতিত পুষ্পের স্নান ওষ্ঠদ্বয়ে, সুচিকণ কেশপাশে ও সুগোল বাহতে বিরাজ করিতেছিল । বালিকা খেলার কথা বাবিড়াল-বৎসের কথা বা বাল্যকালে পেয়ারা খাইবার কথা স্বপ্ন দেখিতেছিল ।

শরৎ । রাতি হইতে নির্গত হইয়া শরচ্চন্দ্র সেই আকাশের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া যখন কলেবর জড়িতে লাগিলেন, “আমি বর্দ্ধ-ধাক্কাতেও কলিকাতায় অনেক গৃহস্থ ও ধনা-দেওয়া কলিকাতায় দেখিয়াছি, কিন্তু অজ্ঞ এই তিন চারি সামান্ত গৃহে বেক্ষপ সরলতা, বার্থযত্ব হইয়া, অল্পতম ভালবাসা ও প্রকৃত ধর্ম-শরৎ বেক্ষপ কৃত্রাপি দেখি নাই । জগ-আপনারা অচন্দের পরিবার যেন সর্বদা নিরা-ধাক্কাতে আ-সর্বদা সুখে ও ভালবাসায় পূর্ণ একবার সর্বাল্যকাল হইতে একাকী থাকিয়া

একবার উন্নতির চেষ্টা করি দেখা বাবে ; আমার স্থির বিশ্বাস যে, বিশাল বহু-সম-দ্রোণে আপনার মত শিক্ষা, গুণ, অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও অসাধারণ সততা অচিরেই পরি-চিত ও পুরস্কৃত হবে । আর যদি তা না হয়, পুনরায় গ্রামে ফিরে আসবেন, তাতেই বা ক্ষতি কি ?

হেমচন্দ্র কণেক চিন্তা করিলেন, বলিলেন, “শরৎ, তুমি আমাদের দয়ালু হইতে চাইলে, এটি দয়া । কিন্তু আমরা—

কেতার বাই, তা বাসা করি, কব-
অষ্টম পারিচ্ছেদ ।

বিন্দুর বন্ধুগণ ।

পরদিন প্রহাষে বিন্দু গাত্রোধান করিয়া ঘর, দ্বার, প্রাঙ্গণ কাঁট দিলেন এবং গৃহের পশ্চাতের পুকুরে বাসন মার্জিতকিলেন, এমন সময় বাহিরের দ্বারে কে আঘাত করিল । হেমচন্দ্র ও সুধা তখনও উঠেন নাই, অতএব বিন্দু বাসন রাখিয়া শীঘ্র আসিয়া কবাট খুলিয়া দিলেন, —দেখিলেন, সনাতনের স্ত্রী । বিন্দু বালাবহুয় তাহাকে কৈবর্ত-দিদি বলিয়া ডাকিতেন, এখনও সেই নাম ভুলেন নাই ; বলিলেন, “কি কৈবর্ত-দিদি, এত সকালে কি মনে করে ? তোর হাতে ও কি ও ?”

সনাতনের পত্নী । না কিছু নয় দিদি, মনে করছ, আজ সকালে তোমাদের দেখে যাই, আর সুধা দিদি চিনি-পাতা দৈ বড় ভাল-বাসে, তাই কাল রেতে দৈ পেতে রেখেছি, সুধাদিদির সঙ্গে এনেছি । সুধাদিদি উঠেছে ?

বিন্দু। আবার অনেক সময় যখন পড়া-শুনা করা উচিত, তখন বাড়ীর ভিতর এসে ছেলে-বেলার পেয়ারা পাড়ার গল্প করা হবে! তাতে খুব লেখা-পড়া হবে!

শরৎ। আর অনেক সময় যখন ডাট খেতে অরুচি হবে, তখন কচি কচি আঁবের অম্বল খাওয়া হবে, আমি দেখতে পাচ্ছি, পান্ডুর ভাগটাই বেশী।

বিন্দু। হাঁ, তোমার এখন লাভেরই চন্দ্রের জন্ম এতক্ষণ শুনছিলাম, অম্বল রাঁধুনী রকের উপর একটি ম. চিত্রাশ্রুত বালিকা শুইবা নৈশ বায়তে ও শুভ্রবর্ণ চন্দ্রা নাকি? ঐ ক্ষণে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। সমস্ত কুল-পুত্র গ্রাম এখন নিদ্রাক্ত এবং সেই সুন্দর চন্দ্রকরে নিদ্রিত।

হেমচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র সেই রকে উপবেশন করিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। ভালপুত্রের ঘোষবংশ ও বসুবংশের মধ্যে বিবাহ-সূত্রে সম্বন্ধ ছিল; হেম ও শরৎ বাল্যকালে পরস্পরকে জানিতেন ও প্রীতি করিতেন। এক্ষণে কণেক কথাবার্তার পর হেমচন্দ্র উন্নতহৃদয়, বুদ্ধিমান, ধীরপ্রকৃতি, দৃঢ়চরিত্তজ শরচ্চন্দ্রের অন্তঃকরণ বৃত্তিতে পারিলেন; শরচ্চন্দ্রও হেমচন্দ্রের উন্নত তেজঃপূর্ণ অন্তঃকরণ জানিতে পারিলেন। এ জগতে আমাদের অনেক পরিচিত লোক আছে, মনের একা অতি অল্প লোকেরই সহিত ঘটে, সুতরাং হৃদয়ের অন্তরূপ লোক দেখিলেই হৃদয় সহসা সেই দিকে আকৃষ্ট হয়। হেমচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র বড়ই কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন, ততই তাঁহাদের হৃদয় পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল, হেম শরৎকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভ্রাত্র দেখিতে লাগিলেন, শরৎ হেমকে জ্যেষ্ঠের ভ্রাত্র ভক্তি

কা'ল একবার তোমাদের বাড়ী যাব, আবার উমাতারার সঙ্গেও দেখা করিতে যাব।

শরৎ। দিদি কা'ল উমার বাড়ী যাবে, বিন্দুদিদি, তুমিও সেখানে গেলেই সকলের সঙ্গে দেখা হবে।

বিন্দু। তবে সেই ভাল। আহা, কালীকে দেখতে আমার বড় ইচ্ছে করে। আমার বিয়ে হবার আগে কালীর বিয়ে হয়েছে, আহা! সেই অবধি সে যে কত কষ্ট পেয়েছে, কে বলতে পারে? আচ্ছা শরৎ বাবু, তোমার মা দেখে শুনে এমন ঘরে বিয়ে দিলেন কেন? যেসময় বরকে দেখেছিলেন, লোকে বলে, এখন তার বয়স ৪০ বছর ছিল।

শরৎ। দিদিদিদি, সে কথা আর ভিজ্জেস না। মার ও সম্বন্ধে অধিক মত ছিল এ, পর্যন্ত পড়বার কুল বড়, ভাল লোকে থাকেন। এই পরীক্ষার উপ কুল পাওয়া তিনি আমাকে বিষয়টি দেখতে যোগেশ্বর দোখা বাক কি হয়, আমাদের বিষয়ও অতি সামান্য, বৎসরে সাত আট শত টাকার অধিক লাভ নেই, কোন উপযুক্ত চাকরী পেলে করতে ইচ্ছা আছে। মাও চাকরী-স্থানে আমার সঙ্গে থাকবেন, এখানে লোকজন বিষয় দেখবে।

হেম। তা বা হয়, তোমার পদীসী পয় হবে। এই কয়েকমাস ব্যস্ত কাজ-থেকে মনোবোগ করে পড়পান, দিদি 'এন্ট্রান্স' পরীক্ষা বেরকর সমস্ত কোন দিয়াছ, এই পরীক্ষাটা সেইরূপ হয়ে ঘরে শরৎ। সেইরূপ ইচ্ছা আছে পূর্বকালে কেতার গিয়ে পড়তে আরম্ভ না কি না, মনে মনে এক একবার ভাবি, কেন একবার কলকাতায় করিয়া বিন্দু আপনারা কি চিরকালই এল মোচল করবেন? আপনি নয় বৎসর

অনেকক্ষণ পরে শরৎ বলিলেন, “বিন্দু দিদি, তবে আজ আমি আসি, অনেক রাত্রি হয়েছে, আমার কা’ল দেখা হবে । বত দিন আমি গ্রামে আছি, তোমার কচি আঁবের অঞ্চল এক একবার চাকতে আসব । আর যদি অল্পগ্রহ করে তোমরা কল্কেতার যাও, তবে ত আর আমার সুখের সীমা থাকবে না ।”

বিন্দু হাসিয়া বলিলেন, “তা আচ্ছা, এস । কল্কেতার যাওয়া না যাওয়া কা’ল স্থির করব, কিন্তু যাওয়া হোক আর নাই হোক, কচি আঁবের অঞ্চল রাখতে পারে, এমন একজন রাখুণীর বিয়র কা’ল তোমার দিদির সঙ্গে বিশেষ করে পরামর্শ ঠিক করব, সে বিষয় আর ভাবতে হবে না ।”

হাসিতে হাসিতে শরচ্চন্দ্র হেম ও বিন্দুর নিকট বিদায় লইয়া বাহির হইয়া গেলেন । সুখা তখনও নিদ্রিত ছিল, দ্বিপ্রহর রাত্রির নির্মল চন্দ্রালোক সুখার সুন্দর প্রাকৃতিত পুষ্পের স্তায় ওষ্ঠদ্বয়ে, সূচিকণ কেশপাশে ও সুগোল বাহুতে বিরাজ করিতেছিল । বালিকা খেলার কথা বা বিড়াল-বৎসের কথা বা বালাকালে পেরারা খাইবার কথা স্বপ্ন দেখিতেছিল ।

বাটা হইতে নির্গত হইয়া শরচ্চন্দ্র সেই নির্মল আকাশের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, “আমি বর্দ্ধ-মানে ও কলিকাতায় অনেক গৃহস্থ ও ধনা-চোর পরিবার দেখিয়াছি, কিন্তু অল্প এই পল্লীগ্রামের সামান্ত গৃহে যেরূপ সরলতা, অমায়িকতা, অকৃত্রিম ভালবাসা ও প্রকৃত ধর্ম দেখিলাম, যেরূপ কৃত্রাপি দেখি নাই । জগ-দীশ্বর ! হেমচন্দ্রের পরিবার যেন সর্বদা নিরা-পদে থাকে, সর্বদা সুখে ও ভালবাসায় পূর্ণ থাকে । বালাকাল হইতে একাকী থাকিয়া

ও কেবল পাঠে রত থাকিয়া আমার এ জীবন শুষ্কপ্রায় হইয়াছে আমা ।” ঘরের সুখুমার বৃত্তিগুলি শুকাইয়া গিয়াছে । হেম-চন্দ্রের প্রণয় ও বিন্দু দিদির তে যে অল্প আমার হৃদয় যেন, পুনরায় প্রাণিত হইল ; জগদীশ্বর করুন, যেন এই পবিত্র স্নেহপূর্ণ পরিবারের নিকট থাকিয়া আমি পুনরায় মহুষ্যোচিত স্নেহ ও প্রীতি লাভ করিতে পারি ।” এই প্রকার নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে শরৎ বাড়ী বাইলেন ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

বিন্দুর বন্ধুগণ ।

পরদিন প্রত্যবে বিন্দু গাত্রোথান করিয়া ঘর, দ্বার, প্রাঙ্গণ কাঁট দিলেন এবং গৃহের পশ্চাতের পুকুরে বাসন মাঞ্জিতেছিলেন, এমন সময় বাহিরের দ্বারে কে আঘাত করিল । হেমচন্দ্র ও সুখা তখনও উঠেন নাই, অতএব বিন্দু বাসন রাখিয়া শীঘ্র আসিয়া কবাট খুলিয়া দিলেন,—দেখিলেন, সনাতনের স্ত্রী । বিন্দু বালাবহুদার তাহাকে কৈবর্ত-দিদি বলিয়া ডাকিতেন, এখনও সেই নাম ভুলেন নাই ; বলিলেন, “কি কৈবর্ত-দিদি, এত সকালে কি মনে করে ? তোর হাতে ও কি ও ?”

সনাতনের পত্নী । না কিছু নয় দিদি, মনে করুহু, আজ সকালে তোমাদের দেখে বাই, আর সুখা দিদি চিনি-পাতা দৈ বড় ভাল-বাসে, তাই কা’ল রেতে দৈ পেতে রেখেছি, সুখাদিদির সঙ্গে এনেছি । সুখাদিদি উঠেছে ?

বিন্দু। না, এখনও উঠেনি। তা তোরা বোন করিয়া উঠ। লোক, রোজ রোজ দুখ দৈ দিস কেন বড় ভাবি? তোরা এত পাবি কোথা থেকে বোন?

স-প। না এ আর কি দিদি, বাড়ীর গরুর দুখ বৈ ত নয়, তা ছ একদিন আনুই বা। গরুও তোমাদের, আমাদের ঘরদোরও তোমাদের, তোমাদের দুটো খেয়েই আমরা আছি, তা তোমাদের জিনিস তোমরা খাবে না ত কে খাবে?

বিন্দু। তা দে বোন, এখন শিকের তুলে রেখে দি, ভাত খাবার সময় ভাতের সঙ্গে খাব এখন। কৈবর্ত-দিদি, তুই বেশ দৈ পাতিস, সুখা তোর দৈ বড় ভালবাসে, ও কি লো? তোর চোখে জল কেন? তুই কাঁদ-ছিস না কি?

সত্য সত্যই সনাতনের পত্নী বর বর করিয়া চক্ষের জল ফেলিয়া উঁহঁ করিয়া কাঁদিতে বসিয়াছিল। সনাতন অনেক কষ্ট করিয়া আপন প্রেয়সী গৃহিণীর শরীরের অসুস্থরূপ কাপড় যোগাইতেন, কিন্তু সেই কাপড়ে অতদ্রুত রূপদীর বিশাল অবয়ব আচ্ছাদন করিয়া তাহার আঁচলে আবার চক্ষুর জল মুছিতে ফুলার না! বাহা হউক, কষ্টে চক্ষের জল অপনৌত হইল, কিন্তু সে ফোরারা একবার ছুটিলে খামে না, কৈবর্ত-রমণী আবার উচ্চতর স্বরে উঁহঁ করিয়া কন্দন আরম্ভ করিলেন।

বিন্দু। বলি ও কি লো? কাঁদছিস কেন লো? সনাতন ভাল আছে ত?

স-প। আছে বৈ কি, সে মিনুষের আবার কবে কি হয়? উঁহঁ।

বিন্দু। তোর ছেলোটো ভাল আছে ত?

স-প। তা তোমাদের আশীর্বাদে বাছা ভাল আছে।

বিন্দু। তবে সুখ সুখ সকালবেলা চখের জল ফেলছিস কেন? কি, হয়েছে কি?

স-প। এই সকালে ঘোষেদের বাড়ী গিয়েছিল গো, তা সেখানে—উঁহঁ।

বিন্দু। সেখানে কি হয়েছে, কেউ কিছু বলছে, কেউ গালি দিয়েছে?

স-প। না, গাল দেবে কে গা দিদি? কারই কিছু খাই, না কারই কিছু খারি যে. গাল দেবে? তেমন ঘর করিনি গো দিদি যে কেউ গাল দেবে। মিনুষে পোড়ারমুখো হোক, হতভাগা হোক, গতর ঝেটে খার, আমাকে খেতে পবুতে দিতে পারে, আমরা গরিব-গুরুবো লোক, কিন্তু আপনাদের মানে আছি। গাল আবার কে দেবে গা দিদি?

বিন্দু কৃষকপত্নীর এই স্বামিভক্তিসূচক এবং দর্পপূর্ণ কথা শুনিয়া একটু মুচ্কে হাসিলেন,—বলিলেন,—“তা, তাই ত বোন, জিজ্ঞাসা করছি, তবে তুই কাঁদছিস কেন? সনাতন কিছু বলেছে না কি?”

রমণীর বিশাল কৃষ্ণ কলেবর একবার কম্পিত হইল, নয়ন দুইটি ঘূর্ণিত হইল, ক্রোধ-কম্পিতস্বরে বে কথাগুলি উচ্চারিত হইল, তাহার মধ্যে এইমাত্র বোধগম্য হইল—“ডেকরা, পোড়ারমুখো, হতভাগা, সে আবার বলবে? তার প্রাণের ভয় নেই? কোন্ মুখে বলবে? তার ঘর করছে কে? সংসার চাণিয়ে মিছে কে? আমি না থাকলে সে কোন্ চুলোর যেত? বলবে! প্রাণে ভয় নেই?” ইত্যাদি।

বিন্দু আর একবার হস্ত সংবরণ করিয়া একটু তীব্রস্বরে বলিলেন, “তবে তুই সুখ সুখ সকালবেলা চখের জল ফেলছিস কেন, বল তো? তোর হয়েছে কি?”

স-প। দিদি, কিছু নয়, কিছু হয়নি, তবে

ঘোবেদের বাড়ী আর সকালে শুহ্ন,
উঁহঁহঁ।

বিন্দু। নে, তোর নেকাম করুতে হর কর
বানু, আমি আর দাঁড়াতে পারিনি, আমার
বাসন-কোসন সব মাজতে প'ড়ে রয়েছে,
উহ্ন ধরাতে হবে, এখনই ছেলে ছুটি
উঠলেই দুধ চাইবে।

এইরূপে কথা হইতে হইতে সুধা
প্রাতঃকালের প্রাকৃতিক পদের স্তার ঈষৎ
রঞ্জিত-বদনে, চক্ষু দুটি মুছিতে মুছিতে
শরনবর হইতে আসিয়া দাঁড়াইল। বিন্দু
বলিলেন, “এই যে সুধা উঠেছে, এত
সকালে বে?”

সুধা। দিদি, আজ খুব সকালেই ঘুম
ভেঙ্গে গেল। একটা বড় মজার স্বপ্ন
দেখলেম, সেজন্তে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

বিন্দু। কি স্বপ্ন?

সুধা। বোধ হ'ল যেন, আমরা ছেলে-
বেলার মত আবার শরৎ-বাবুর বাড়ী
শেরারী খেতে গেছি। বেন তুমি পেড়ে
পেড়ে খাচ্ছ, আর শরৎ-বাবু আমাকে কোলে
ক'রে পেরারা পেড়ে দিচ্ছেন, এমন সময়
হঠাৎ পা ফস্কে প'ড়ে গেলেন, আমিও
প'ড়ে গেলেম। উঃ! এমনি লেগেছে।

বিন্দু। সে কি লো? স্বপ্নে প'ড়ে গেলে
কি লাগে?

সুধা। হ্যাঁ দিদি, বোধ হ'ল বেন বড়
লেগেছে, শরৎ-বাবু যেন গাছতলার সেই
গর্ভচাঁতে পড়ে গেলেন!

বিন্দু হাসিয়া বাললেন, “আহা! এমন
দুরবস্থা। আজ শরৎ বাবু এলে তাঁর পায়ে
বেধা হয়েছি কি না ভজ্জনা ওরুব এখন!
পা-চাঁ ভেঙ্গে যায় নি ত?”

সুধা। না দিদি, ভেঙ্গে যায় নি।

বিন্দু। তুমি কেমন ক'রে জানলে?

সুধা। আমার বে তখনই উঠে আমাকে
নিরে পেরারা পাড়তে লাগলেন।

বিন্দু উচ্চ হাস্ত সংবরণ করিতে পারি-
লেন না, বলিলেন, “সাবাস! ছেলে বাবু!
আজ তাকে তাঁর গুণের কথা বলব এখন।”

হাস্ত সংবরণ করিয়া পরে বলিলেন,
“সুধা, কৈবর্তদিদি তোর জন্তে আজ চিনি-
পাতা দৈ এনেছে, ভাতের সঙ্গে খাবে
এখন। দৈখানা শিকের তুলিয়ে রেখে এস ত
বানু। আমি উহ্ন ধরাই গে, এখনই
ছেলেরা উঠবে।”

বালিকা মাথার কেশগুলি নাচাইতে
নাচাইতে দৈ লইয়া গেল, দৈ শিকের উপর
তুলিয়া রাখিয়া প্রাকৃতিক-রূপে হাস্ত বদনে
ঘাটের দিকে ছুটিয়া গেল। বিন্দুও রান্না-
ঘরের দিকে বাবার উদ্ভোগ করিতেছেন,
এমন সময় কৈবর্তপত্নী আর একবার চক্ষুর
জল অপনয়ন করিয়া, একবার গলা সাড়া
দিয়া, গলাটা পরিষ্কার করিয়া জিজ্ঞাসা
করিল, “বলি দিদিটাকরুণ, কথাটা কি
সত্যি?”

বিন্দু। কি কথা লো?

স-প। ঐ বা শুনু?

বিন্দু। কি শুনি রে?

স-প। তবে বুঝি সত্যি? আহা, এত

দিন পরে এই কি কপালে ছিল! আহা,
সুধাদিদির কচি মুখখানি একদিন না দেখলে
বুক ফেটে যায়!

এবার অব্যবহিত ক্রন্দনের রোল উঠিল,
কৈবর্ত-সুন্দরী সেই বিশাল কক্ষ শরীরখানি,
বাহা সনাতন সভয়ে দৃষ্টি করিতেন ও
সশঙ্কচিত্তে পূজা করিতেন—সেই শরীরখানি
ক্রন্দন-বেগে কম্পিত হইতে লাগিল। গৃহে
হেমচন্দ্র নিদ্রিত ছিলেন, তিনি ঈষৎ
ভূমিকম্প বোধ করিলেন। ক্রি না

জানি না, কিন্তু কৈবর্ত-সুন্দরীর
তারপর যখন তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ
করিল, তখন নিম্না অসম্ভব। তিনি শীঘ্র
গাত্রোত্থান করিয়া উঠে:খরে কহিলেন,
“বাড়ীতে কাঁদছে কে গো ?

এই বলিয়া হেমচন্দ্র ঘর হইতে বাহিরে
আসিলেন। বিন্দুকে পুনরায় জিজ্ঞাসা
করিলেন, “সকালবেলা বাড়ীতে কাঁদছে
কে গো ?”

বিন্দু। ও কেউ নয়, কৈবর্তদিদি কি
অমঙ্গলের কথা শুনে এসেছে, তাই মনের
ছুখে কাঁদছে।

হেমচন্দ্র বলিলেন, “কে ও, সনাতনের
স্ত্রী, কেন, কি হয়েছে গো ? বাড়ীতে কোন
অমঙ্গল হয়নি ত ? কোন ব্যারাম স্তারাম
হয়নি ত ?”

সনাতনের গৃহিণী বাবুকে দেখিয়া কণ্ঠ-
স্বরক্ক করিয়া, অশ্রুজল সংবরণ করিয়া,
কাপড়খানি টানিয়া, কণ্ঠে হুটে কোন রকমে
মাথায় একটু ঘোমটা দিয়া, চিপ্ করিয়া
প্রণাম করিয়া আবার গারে কাপড়টা ভাল
করিয়া দিয়া, আবার ঘোমটা একটু টানিয়া
পলার সাড়া দিয়া, গলাটা একটু পরিষ্কার
করিয়া আবার চক্ষুর জল মুছিয়া যত্নসহ
বলিলেন, “না গো, অমঙ্গল নয়, তবে একটা
কথা শুনু, তাই দিদি-ঠাকুরগকে জিজ্ঞেস
করতে এসেছি।”

বিন্দু। সেই কথাটা কি, আমি তখন
থেকে বার করতে পারলুম না ! তুমি পার
ত কর।

মেম। মেয়েমানুষের কথা মেয়েমানু-
ষেই বুকে, আমরা তত বুঝি না। আমি
শরতের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।

এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে হেম বাড়ীর
বাহিরে গেলেন।

স-প। ঐ গো ঐ ! তবে ত আমি যা
শুনেছি, তাই ঠিক।

বিন্দু বলিল, “তোকে আজ কিছুতে
পেরেছে না কি ? এমন করছিস কেন ? কি
শুনেছিস, বল না ?

স-প। ঐ যে শব্দ-বাবুদের বাড়ীতে
আমি সকালে যা শুনু।

বিন্দু। কি শুনি ?

স-প। তবে বলি দাদা-ঠাকুরগ, গরি-
বের কথায় রাগ করো না। সত্যি মিথ্যা
জানি না, ঐ ঘোষেদের বাড়ীর চাকর
মিন্বে আমাকে বলে, মিন্বে মূখে
আশুন, সেই অবধি আমার বুকটা যেন
খড়াস খড়াস করছে, দিদিঠাকুরগ, একবার
হাত দিয়ে দেখ।

বিন্দু। আমার দেখবার সময় নেই,
আমি কাজে যাই।

এই বলিয়া বিন্দু রান্নাঘরের দিকে
ফিরিলেন।

তখন কৈবর্ত-বধু বিন্দুর আঁচল ধরিয়া
তাঁহাকে দাঁড় করাইয়া বলিল, “না দিদি,
রাগ করো না, তোমাদের জন্তে মনটা
কেমন করে, তাই এম, না হ’লে কি জন্তের
জন্তে আসতেম, তা নয়, আহা, সুধাদিদিকে
একদিন না দেখলে আমার মনটা কেমন—
(বিন্দু পুনরায় রান্নাঘরের দিকে পদক্ষেপ)
না না, বলছি কি, বলি, ঐ ঘোষেদের
বাড়ীর হতভাগা চাকর মিন্বে বলে কি, তার
মুখে আশুন, তার বেটার মুখে আশুন, তার
বোয়ের মুখে আশুন, তার বাড়ীতে ঘু-
চরক, (বিন্দুর রান্নাঘরের দিকে এক পদ
অগ্রসর হওন — না না, বলছি কি, সেই
মিন্বে বলে কি, উঃ, এমন কথা কি মুখে
আনে গো ? এও কি হয় গো ? তোমাদের
শরীরে মায়-দয়াও ত আছে—(বিন্দুর রান্না-

ঘরের ভিতর গমন, সনাতন-গড়ীর পশাপশম ও ঘারদেহে উপবেশন) না না, বলছিল কি, সেই হতভাগা চাকর মিন্বে বলে কি না, দিদিঠাকরণ, তোমরা না কি সকলে আমাদের ছেড়ে কলুকেতার চ'লে বাছ? আহা, দিদিঠাকরণ, তোমাকে ছেলেবেলায় মানুষ করেছি, তোমাকে আর দেখতে পাব না? সুখাদিন আমাকে এত ভালবাসে, সে সুখাদিনকে কোথায় নিয়ে যাবে গো? (রোদা)

বিন্দু একটু বিরক্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে হস্ত সংবরণ করিতে পারিলেন না,—বলিলেন, “হ্যাঁলা কৈবর্ত দাদ, এই কথা বলতে এই এতক্ষণ থেকে মন করছিলি? তা কাঁদিস্ কেন বোন্, আমাদের যাওয়া কিছুই ঠিক হয়নি, কেবল শরৎ বাবু কথায় কথায় কাঁল বলোছিলেন না, তা আমাদের কি যাওয়া হইবে সেখানে বিস্তর খরচ।”

স-প। ছি দিদি, সেখানেও যায়! শুনেছি, কলুকেতার গেলে জাত থাকে না, কিছু জাত-খিচার নেই, হিঁহ মুচনমানে বিচার নেই, সে দেশেও যায়! তোমাদের সোনার সংসারে এখানে ব'সে রাজি কর। শরৎ-বাবু কি বল না, গুর মাগ নেই, ছেলে বেক, উনি কালেজে গড়েন। দিদিঠাকরণ! কালেজের ছেলে সব করতে পারে। শুনেছি না কি কালেজের ছেলে সাগর পার হয়ে বিলেতে যায়। ও মা! তারা ত কেষ্ট মানুষের গলায় ছুরী দিতে পারে! হেঁ দিদি, বিলেত কোথায়, সেই যে গঙ্গা-নাগরের গল্প শুনি, তারও না কি পার যেতে? শুনেছি নকায় যেতে হয়।

বিন্দু। হেঁলো, কত সাগর পার হয়ে

তবে বিলেত যায়। শুনোছ, লকা পোরয়েও অনেকদূর যায়।

স-প। ও বাবা, সে গঙ্গা-নাগরে যে ডেউ শুনেছি, তাতে কি আর মানুষ বাচে? তা নর্য থেকে কি আর মানুষ করে আসে, তারা রাক্ষুস হয়ে আসে শুনেছি, তারা কেষ্ট মানুষের গলায় ছুরী দেয়। না বাবু, তোমাদের বিলেত গিয়েও কাজ নেই, কলুকেতার গিয়েও কাজ নেই, তোমরা ঘরের নকী ঘরে থাক। তবে আমি এখন আসি দিদি।

বিন্দু দুখ জাল দিতে দিতে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “এস বোন্।”

স-প। আর দৈ-খানি কেমন হয়েছ, খেয়ে বলো। আর সুখাদিনি কি বলে, বলো।

বিন্দু। বলব দিদি, বলব।

সনাতন-গৃহিণী কয়েক পা গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, “আর দেখ দিদি, গরিবের কথাটা যেন মনে থাকে। কোথায় কলুকেতার বাবে? ঘরের নকী ঘর আলো ক'রে থাক।”

বিন্দু। তা দেখা যাবে। আমাদের যাবার এখন কিছুই ঠিক নেই, যদি যাওয়া হয়, তবে অল্প দিনের ভাঙে, আগার ধান কাটার সময় আসুব। গ্রাম ছেড়ে আমরা কোথায় থাকব?

কৈবর্ত বৃদ্ধ কতক পরিমাণে সন্তুষ্ট হইয়া তখন ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে গেলেন। সনাতন অল্প প্রাতঃকালে উঠিয়া বিত্তীর্ণ শয্যায় পার্শ্বশায়িনী নাই দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইয়াছিল। বিরহবেদনায় বাধিত হইয়াছিল কি অল্প প্রাতঃকালেই মুখনাড়া খাইতে হয় নাই বলিয়া আপনাকে তাগ্য-বান্ মনে করিতেছিল, তাহা আমরা ঠিক জানি না। কিন্তু সেই দুঃখ বা সুখ জগতের

অধিকাংশ সুখ-দুঃখের স্তায় কণকালহারী মাত্র। প্রথম সূর্যালোকে গৃহিণীর বিশাল ছায়া প্রাঙ্গণে পতিত হইল, গৃহিণীর কণ্ঠস্বরে সনাতন শিহরিয়া উঠিল।

সেই দিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় বিন্দুর প্রতিবাসিনী হরিমতি নামে একটি বৃদ্ধা গোয়ালিনী ও তাহার বিধবা পুত্রবধু বিন্দুকে দেখিতে আসিল। হরিমতির পুত্র জীবিত থাকিতে তাহাদিগের অবস্থা ভাল ছিল, কিছু জমা-জমী ছিল, বাড়ীতে অনেকগুলি গাভী ছিল, তাহার দুই বেচিয়া স্বচ্ছন্দে সংসার নির্বাহ হইত। পুত্রের মৃত্যুর পর হরিমতি শিশু পুত্রবধুকে লইয়া সে জমা-জমী দেখিতে পারিল না, অস্ত্র কাহাকে কোরফা জমা দিল, বাহা খাজনা পাইল, সে অতি সামান্য। গরুগুলি একে একে বিক্রয় হইল; এক্ষণে দুই একটি আছে মাত্র, তাহার দুই বিক্রয় করিয়া উদরপূর্তি হয় না। খাণ্ডী ও পুত্রবধু সর্বদাই বিন্দুর বাড়ীতে আসিত ও বিন্দুর ছেলের ব্যায়রামের সময় যথাসাধ্য সংসারের কাজ করিয়া দিত। বিন্দুর এক্ষণ অবস্থা নহে যে, তাহাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন, তথাপি বৎসরের ফল পাইলে দরিদ্র প্রতিবাসিনীকে কিছু খাজ পাঠাইয়া দিতেন, শীতের সময় দুই একখানি কাপড় কিনিয়া দিতেন, বৃদ্ধার অসুখ করিলে কখন সাবু, কখন দুই একটি সামান্য ঔষধি পাঠাইয়া দিতেন এবং সর্বদা বৃদ্ধার তত্ত্ব লইতেন। দরিদ্রা এই সামান্য উপকারে এবং সকল বিপদ আপদেই বিন্দুর স্নেহের আশ্রয়লাভে অতিশয় আপ্যায়িত হইত এবং বিন্দুকে বড়ই ভালবাসিত। বিন্দু গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় যাইবে শুনিয়া আজ আসিয়া অনেক কান্নাকাটি করিল। বিন্দু তাহাকে সাধনা করিয়া এবং তাহার

পুত্রবধুকে একখানি পুরাতন শাড়ী দিয়া বসে পাঠাইলেন।

হরিমতি গ্রন্থান করিলে তাঁতিদের একটি বৌ বিন্দুর সহিত দেখা করিতে আসিল। তাঁতি-বৌ দেখিতে কালো এবং অতিশয় কাহিল, সে কাজকর্ম করিতে পারিত না, সে অস্ত্র খাণ্ডীর নিকট সর্বদাই গাঙ্গি খাইত। তাহার স্বামী তাহাকে ভালবাসিত না। পত্নীত্বকালে তাহার পিঠে বেদনা হইয়াছিল, ঘাট থেকে জল আনিতে পারিত না, তজ্জন্ত তাহার খাণ্ডী তাহাকে প্রহার করিয়াছিল। তাঁতি-বৌ কাহার কাছে যাবে? কাঁদিতে কাঁদিতে বিন্দুর কাছে আসিয়াছিল। বিন্দুর এমন অর্থ নাই যে, তাঁতি-বৌকে ঔষধ কিনিয়া দেন, তবে বাড়ীতে কেরোদিন তৈল ছিল, প্রত্যহ তাঁতি-বৌকে রোজে বসাইয়া নিজে মালিস করিয়া দিতেন। চারি পাঁচ দিনের মধ্যে বেদনা আরাম হইয়া গেল, সেই অবধি তাঁতি-বৌ গৃহকার্য্যে অবসর পাইলেই বিন্দু মাকে দেখিতে আসিতে বড় ভালবাসিত।”

আমাদের লিখিতে লজ্জা করিতেছে, তাঁতি-বৌ যাইতে না যাইতে বাউরীপাড় হইতে হীরা বাউরীণী বিন্দুর নিকট আসিল। হীরার স্বামী পাণ্ডী বয়, বেশ রোজ্জার করে, কিন্তু যথার্থকর্ম মদ খাইয়া উড়িয়া দেয়, বাড়ী আসিয়া প্রত্যহ স্ত্রীকে প্রহার করে। বিন্দু একদিন হেমচন্দ্রকে বলিয়া হীরার স্বামীকে ডাকাইয়া বিশেষ তিরস্কার করিয়া দিলেন। সেই অবধি হেমবাবুর ভয়ে এবং বিন্দুর জ্যোত্মহাশয়ের ভয়ে বাউরীর ত্যাগ-চার কিছু কমিল, হীরাও প্রাণে বাঁচিল। আজ হীরা আপন শিশুটিকে নৃতত একখানি কাপড় পরাইয়া কোলে করিয়া বিন্দুর কাছে

আনিয়া বলিল, “যাঠাকরুণ, এবার তোমার আশীর্বাদ হাতে ২৫ টাকা জমেছে, অনেক কাল ধরের চালেরুড় গড়েনি, এবার চাল নুতন ক’রে ছাইরেছি, আর বাছার জন্তে কাটোরা থেকে এই নুতন কাপড় কিনেছি।” বিন্দু শিশুকে আশীর্বাদ করিয়া বিদায় করিলেন ।

তাহার পর গ্রামের শীঠাকরুণ, বামা সদগোপিনী, শ্রামা আশুরিণী, মহামায়া ধোপানী প্রভৃতি অনেকেই বিন্দুর কলিকাতার বাইবার কথা শুনিয়া কান্নাকাটি করিতে আসিল। আমরা তাহাদিগকে বিন্দুর নিকট রাখিয়া এক্ষণে বিদায় লই। আমাদের অনেকেই বিন্দু অপেক্ষা দুই পরসী অধিক আয় আছে, ভরসা করি, আমরা যখন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিব, আমাদের জন্তও কেহ কেহ হৃদয়ের অভ্যন্তরে একটু শোক অনুভব করিবে। ভরসা করি, যখন আমরা এ সংসার হইতে প্রস্থান করিব, তখন যেন দুই একটি পরোপকারের পরিচয় দিয়া বাইতে পারি, কেবল ঈর্ষা, পরান্নিধা এবং পরের সর্বনাশ দ্বারা “বড়লোক হইয়াছি,” এই আখ্যানটি রাখিয়া না বাই।

নবম পরিচ্ছেদ ।

বাল্যসহচরীগণ ।

সন্ধ্যার সময় বিন্দু জ্যেষ্ঠাভিয়ার বাড়ীতে গেলেন এবং অনেক দিনের পর বাল্যসহচরী কালীতারা ও উমাতারাকে দেখিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলেন। তিন জন বাল্যসহচরী এখন তিন সংসারের গৃহিণী হইয়া-

ছেন; কিন্তু এখনও বাল্যকালের সৌন্দর্য একেবারে ভুলেন নাই, অনেক দিনের পর তাঁহাদিগের পরস্পরের দেখা হওয়ার তাঁহারা বাল্যকালের কথা, যশুরবাড়ীর কথা, সংসারের কথা, নিজ নিজ সুখ-দুঃখের অনন্ত কথা কহিয়া সন্ধ্যাকাল বাপন করিলেন।

কালীতারা বাল্যকাল হইতেই অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, বিন্দু অপেক্ষাও কালো ছিলেন, কিন্তু তথাপি এককালে তাঁহার মুখে লাষণা ছিল, এখনও সেই শক্ত, শুদ্ধ বদনে ও নয়নদ্বয়ে একটু কমনীয়তা দৃষ্ট হয়। কিন্তু সে মুখখানি বড় শুষ্ক, চক্ষু দুটি বসিয়া গিয়াছে, কণ্ঠার হাড় দেখা বাইতেছে, শীর্ণ হস্তে দুইপাছি কাঁপা বালা আছে, কণ্ঠে একটি মাছলী। তাঁহার বস্ত্রখানি সামান্ত, সম্মুখের চুল অনেক উঠিয়া গিয়াছে, মাথায় ছোট একটি খোঁপা। কালীতারা বাল্যকালে একটু হাবা মেয়ে ছিল, এখনও অতিশয় সরলা, যশুরবাড়ীর কাজকর্ম করেন, দুই বেলা দুই পেট খান, কেহ কিছু বলিলে, চুপ করিয়া থাকেন।

বিন্দু বলিলেন, “কালী, আজ কত দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হ’ল, তোমাকে কি আর হঠাৎ চেনা যায়?”

কালী। বিন্দুদিদি, আমাদের দেখা হবে কোথা থেকে? বিয়ে হয়ে অবধি প্রায় আমি বর্ধমানের থাকি, বাপের বাড়ী কি আর আসতে পাই?

উমা। কেন কালীদিদি, তুমি মধ্যে মধ্যে বাপের বাড়ী আস না কেন? এই আমি তো প্রতিবার পূজার সময় আসি।

কালী। তা তোমাদের কি বল বোন, তোমাদের চের লোকজন আছে, কাজ-কর্মের শ্রমুন্ট নেই, পাঁচ ক’রে চ’লে এলেই হ’ল। আমাদের ত তা নয়, বৃহৎ সংসার, অনেক

কাজকর্ম আছে, আর আমাদের যে ঘর, তাতে চাকর-দাসী রাখা প্রথা নেই। কাজেই আমরা কেউ এলে কাজ চলবে কেমন করে বল? এই এবার এসেছি, আমার এক বড় নন্দ আছে, তাকে কত মিনতি করে আমার কাজগুলি করতে বলে এসেছি। তা হু পাঁচ দিন সে করবে, বরাবর কি আর করে?

বিন্দু। তোমাদের জমিদারীর শুনেছি, অনেক আর, তোমার স্বামীর অনেক গাড়ী-বোড়া আছে, তা বাড়ীতে চাকর-দাসী রাখেন না কেন?

কালী। না দিদি, আর জেরালা নেই, খরচ শুনেছি, বিস্তর হয়, ধারও কিছু হয়েচে শুনেছি; তা আমি বাড়ীর ভিতর থাকি, ও সব কথা ঠিক জানি না। আমাদের এক-খানা বাগানবাড়ী আছে, বাবু সেইখানে থাকেন, তাঁর শরীরও অসুস্থ, বাড়ীতে প্রায় আসেন না, তা কাজকর্মের কি জানবেন? আমার খাণ্ডারীরাই কাজকর্ম দেখেন শুনে, কি রাখবেন কেমন করে বল, আমাদের বাড়ীর ত সে রীতি নয়, বাইরের লোকদের কি ছুঁতে আছে? কাজেই বোঁদের সব করতে হয়।

বিন্দু। তা তোমাদের ধার-টার হয়েচে ধোন, তা খরচ একটু কমাও না কেন? শুনেছি, তোমার স্বামী অনেক খরচ করে সাহেবদের খানা-টানা দেন, অনেক গাড়ী-বোড়া রাখেন,—তা এ সবগুলো কেন? তোমার স্বামীকে যেমন আর, তেমনি ব্যয় করতে বলতে পার না?

কালী। ও মা! তাঁকে কি আমি সে কথা বলতে পারি? তিনি বিষয়কর্ম বুঝেন, আমি বোঁ-মানুষ হয়ে কোন্ লজ্জার তাঁকে এ কথা বলবো? তবে কখন কখন যখন আমাদের

বাড়ীতে বেড়াতে আসেন, আমার খুড়মাও ড়ীরা তাঁকে ঐ রকম কথা দুই একবার বলে-ছিলেন শুনেছি।

বিন্দু। তা তিনি কি বলেন?

কালী। বলেন, আমাদের ভারী বংশ, দেশে কুলের যেমন মর্যাদা, সাহেবদের কাছে বনিয়াদী বড়মানুষ-বংশ বলে তেমন মর্যাদা তা সাহেবদের খানা-টানা না দিলে কি হয়? শুনেছি, সাহেবেরাও তাঁকে বড় ভালবাসেন, এই যে কত “কমিটা” বলে না কি বলে, বর্ধ-মানে বত আছে, বাবু সবতেই আছেন, আর এত রোগা শরীর, তবু গাড়ী করে প্রত্যহ সাহেবদের বাড়ী ছুবেলা যাওয়া আসা আছে, সাহেব-মহলে নাকি তাঁর স্মারী মান।

সরলস্বভাব কালীতারার এই স্বামি-গৌরবর্ণনা শুনিয়া বিন্দু একটু হাসিলেন, অভিমানিনী উমা একটু ঈর্ষায় অকুটি করিলেন।

বিন্দু। আচ্ছা কালী, তোমাদের বাড়ীর মধ্যে এখন গিন্নী কে?

কালী। আমার খাণ্ডারী তত নেই, কাজেই আমার তিন জন খুড়-শুড়ীরাই গিন্নী। বড় যে, সে ভালমানুষ, কাঁ কোন কথার থাকেন না, মেজোই কিছু বাড়ী, সক-লেই তাকে ভয় করে, বোঁরা ত দখলে কাঁপে। আচ্ছা, সে দিন আমার খুড়মাও ছোটজারাম্মাঘর থেকে কড়া করে দুধ দ্রা দেই পড়ে গিয়েছিল, গরম দুধে তার পায়ের কচ-চামড়া পুড়ে গিয়েছে। তাতে তার বড় কষ্ট না হয়েছিল, খাণ্ডারী ভরে প্রাণ একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল। আমার মেজো খুড়-শাণ্ডারী ঘাট থেকে নেয়ে এসে যেই শুনেলে যে, দুধ অপচ হয়েছে, এমন মুড়ো খেওঁরা নিয়ে ভেড়ে এসেছিল, এমন বকুনি দিলে, বাপ-মা তুলে এমনি গাল দিলে, আমার

ছোট জা চোকের জলে নাকের জলে হ'ল !
আহা, কচি মেয়ে, দশ বছর মাত্র বরস, ভরে
তিন দিন ভাল ক'রে ভাত খেতে পারে নি।

উমা। তা তোমাকেও অমনি ক'রে
বকে ?

কালী। তা বকবে না, দোষ করুলেই
বকবে, তা না হ'লে কি সংসার চলে ?

উমা। তোমাকে যখন বকে, তুমি কি
কর ?

কালী। চুপ ক'রে কাঁদি, আর কি
করব বল ?

অভিমানিনী উমা একটু হাসিয়া বলি-
লেন, “আমি ত তা পারিনি বাবু, কথা
আমার গায়ে সহ্য হয় না।”

কালী। তা হ্যাঁ বিন্দুদিদি, স্বপ্নবাজীতে
কেউ গাল দিলে আর কি করবো বল ?
একটি কথাই জবাব দিলে, পাঁচটি কথা
শুনতে হয়। তা কাজ কি বাবু, খাশুড়ীই
হোক আর ননদই হোক, কেউ ছুটো কথা
বললে চুপ ক'রে থাকি, আবার তখনই ভুলে
যাই। কথা ত আর গায়ে কোটে না, কি
বল বিন্দুদিদি ?

বিন্দু। তা বেশ কর বোন, কথা বর-
দাস্ত কর্তে পারলেই ভাল, তবে সকলের
কি আর বরদাস্ত হয় ?—তা নয়। আচ্ছা,
তোমার ছোট খুড়শাশুড়ীও শুনেছি না কি
রাগী ?

কালী। হাঁ, রাগী বটে, তা মেজোর সঙ্গে
ত আর পারে না, রাগ ক'রে হু একটা কামণ্ড
ব'লে আপনার ঘরের ভিতর খিল ফি ঘর
থাকে, মেজো এক কথায় পঁচিশ কথা শুনি ব'লে
দেয়। মেজোর কিছু টাকা আছে সন্ন্যাসী
সে ছেলেদের ভাল ভাল খাবার
আবার ছোটর ঘরে বসে ছেলেদের মশ বাবস্থা
শিখিয়ে দেয়। তারা ছোটর ঘরে বসে পড়েছে,

ছোটর ছেলেরা খেতে পার না, কেল-কেল
ক'রে চেয়ে থাকে। আবার ছোটর খাবার
ঘরের পাশেই এবার একটা নর্দমা তরর
করেছে, ছোট কত ঝগড়া করলে, আমার
ছোট দেওর আপনি বাবু কাছে নাগিশ
করতে গেলেন, বাবুও নিজে একদিন বাড়ী
এসে তাঁর মেজো খুড়ীকে বুঝাতে গেলেন,
তা সে কথা কি শুনে ? মেজোর বহুনি
শুনে বাবু ফের গাড়ী ক'রে বাগানে
পালিয়ে গেলেন, মেজো আপনি দাঁড়িয়ে
মজুরদের দিয়ে সেই নর্দমাটি করালেন, তবে
সে দিন রাত্রে জলগ্রহণ করলেন।

উমা। সাবাস মেয়ে বা হোক ! ধবীতে
কালী। বলবো কি উমা,

ঝগড়া-কোন্দল হয়, তাতে, তুমি ছেলে-
পালায়। তবে আমাদের সনে ক'রে চক্কর
লাগে না। আর আমি কারে আবার স্নেহের
যে যা বলে, চুপ ক'রে থাকিদি ভাববে, তবে
যাই, আমার কি বল ?

বিন্দু। কালী, তোমার কষ্ট কিছুই
সব বিখবা, তাদের আছে ব'লে আমি ভুখ
কালী। বরেন্দ্র জানি না, কেন এই
বরেন্দ্র আর কথাব ব'লে কয়েক দিন হ'তে
এক, আশ্রিতক সময়, অনেক রকম ভাবনা
বছলে হয়। ভবিষ্যতের কথা ভগবানুই
জ্ঞানেন। তা বিন্দুদিদি, তুমি কল্কেতার

যাচ্ছ, আর কালীদিদিও বর্ধমানের আছেন,
শুনেছি, সেও কল্কেতা হ'তে তাঃ ষষ্ঠী
পথ। আমরা ছেলেবেলা যেমন তিনবোনের
মত ছিলেম, বেন চিরকাল সেইরকম থাকি,
আপন-বিপদের সময় বেন পরস্পরকে ভরী
মত জান ক'রে সেই রকম ব্যবহা
সহসা উমার মনের বিকা
ও কালীর মনও এ
তাঁহারা আঁচল দি
গাড়ীর ভিতর

কালী। হ্যা, থাকে বৈ কি, ছুই গিল্প-
খাণ্ডী, আর একজন মাসখাণ্ডী আছেন;
তারা তিন জনই বিধবা, তাঁদের ছেলে-মেয়ে,
বৌ, মতি, সকলেই ঐ বাড়ীতে থাকে।
আর একজন মামীখাণ্ডীও আছেন, তিনি
সধবা, তাঁর স্বামী পূর্বদেশে পদ্মাগারে চাকরী
করুতে গিয়েছিল, সেখানে না কি আর
একটা বিয়ে করেছে না কি করেছে, তের
বছর বাড়ী আসে নি, বাড়ীতে টাকাও
পাঠায় না, কাজেই মামী ছুই ছেলেকে
নিরে ঐখানেই আছেন, এই বাড়ীতেই সে
রাই ছেলেদের বিয়ে হয়, আজ তিন চার বছর
ক'।

খরচ শুনোছি, সে ছেলে দুটি কেমন, লেখা-
শুনছি; তা?

সব কথা ঠিক ছোট ছোট ছেলেটি ভাল, ইন্ডুলে
খানা বাগানবাসে, বড়টা লম্বাছাড়া হয়ে
থাকেন, তাঁর মাহেবদের বোলে তাকে কি
আসেন না, ভেঁজেছিলেন, তা সে আবার
আমার খাণ্ডীরাই নিয়ে পাল্লায়। সবাই
কি রাখবেন কেমন ক'টাকে জেলে দেবে,
বাড়ীর ত সে রীতি নয়, ব'লে করে ঘর
কি ছুঁতে আছে? কাজেই ব'লে ছেলেটাকে
করুতে হয়।

বিন্দু। তা তোমাদের ধার-টার হতে
বোন, তা খরচ একটু কমাও না কেন
শুনছি, তোমার স্বামী অনেক খরচ করে
মাহেবদের খানা-টানা দেন, অনেক গাড়ী-
বোড়া রাখেন,—তা এ সবগুলো কেন?
তোমার স্বামীকে যেমন আর, তেমন ব্যয়
করুতে বলতে পার না?

কালী। ও মা! তাঁকে কি আমি সে কথা
বলতে পারি? তিনি বিষয়কর্ম বুঝেন, আমি
বৌ-মামুষ হয়ে কোন্ মজার তাঁকে এ কথা
বলবো? তবে কখন কখন যখন আমাদের

তোমার দেওর দুজন শু গ্রামেই আছেন,
তোমার স্বামী না কলকৈতার গিরাছেন?

উমা। হ্যা, এক বৎসর হ'ল, তিনি কল-
কৈতার আছেন, আমাকেও কলকৈতার
নিরে বাবার জন্তে তাঁর মার কাছে লোক
পাঠিয়েছিলেন, তিনিও বলেছেন, এই জ্যেষ্ঠ
কি আশাট মাসে পাঠিয়ে দেবেন।

কালী। হ্যা, শরৎ বলছিল, তোমার
স্বামী না কি কোন্ বড় রাস্তার উপর মন্ত
বাড়ী নিয়েছেন, অনেক টাকা খরচ করে
সাজিয়েছেন; তাঁর না কি সুন্দর শাদা
ঘোড়ার এক জুড়ি, আর কালো ঘোড়ার
এক জুড়ি আছে, তেমন পাড়ী-বোড়া রাজা-
রাজড়াদেরও নেই। আবার না কি কল-
কৈতার বাইরে বড় বাগান কেন্‌বার কথা
চলছে, সেই বাগানও না কি ইজ্ঞাপুরী, তেমন
কল, তেমন সুল, তেমন পুকুর, তেমন
মার্কেলের মেজেওরাল ঘর কলকৈতার
কম আছে। উমা, তুমি বড় সুখে থাকবে।

উমার বিষয়বিনিমিত্ত সুন্দর স্মৃতি ওঠে
একটু হাস্যকণা দেখা গেল, উজ্জল নয়নদ্বয়ে
যেন একটু স্নান ছায়া পড়িল। তিনি ধীরে
ধীরে বলিলেন, “কালীদিদি, যদি শাদা জুড়ি,
কালো জুড়ি, আর মার্কেলের ঘর হ'লে সুখ
হয়, তা হ'লে আমি সুখী হব, কিন্তু কপালের
কথা কে বলতে পারে?” স্মৃতিশীল বিন্দু
দেখিলেন, উমা ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস
পরিভাষ্য করিলেন।

চাম্ কণেক সকলে মৌন হইয়া রহিলেন,
না হ'ল পর উমা আবার বলিলেন, “বিন্দু-
শুভকি! আমাদের ছেলেবেলা এই গ্রামে এক-
খাণ্ডী সন্ন্যাসী এসেছিল, মনে পড়ে? সে
দর হাত বেধেছিল, মনে পড়ে?
নিরে তে। কৈ, মনে পড়ে না।
সে কি দিদি, তুমি আমার চেয়ে

বড় তোমার মনে পড়ে না? কালীদিদির বোধ হয় মনে পড়ে।

কালী। কৈ, না, আমারও মনে নেই।

উমা। তবে বুঝি সে কথাটা আমার মনে লেগেছিল, তাই আমার মনে আছে। ঠিক বারো বছর হ'ল, এই বৈশাখ মাসে একদিন এমনি সন্ধ্যার সময় এইখানে খেলা করছিলাম, একটু একটু অন্ধকার হয়েছিল, আর একটু একটু চাঁদের আলো দেখা দিয়েছিল, এমন সময় একজন জটধারী সন্ন্যাসী ঐ জঙ্গলের ভিতর হ'তে বেরিয়ে এল। আমরা ভয়ে কাঁপতে লাগলাম, কিন্তু সন্ন্যাসীটা কাছে এসে বললে, "ভয় নেই, তোমরা পরসাদ নিয়ে এস, আমি তোমাদের হাত দেখবো।" আমি মার কাছে সেই দিন ৪টা পরসাদ পেয়েছিলাম, ভয়ে তা সন্ন্যাসীকে দিলাম। তখন সন্ন্যাসী খুসী হয়ে হাত দেখে বললে, "মা তুমি বড় ধনবানের পত্নী হবে গো, তুমি কিছু ভেব না।" তখন কালীও হাত দেখাবার জন্তে বাড়ী থেকে একটা পরসাদ এনে দিলে, সন্ন্যাসী সেটি নিয়ে বললে, "তোমার ধন-টন হবে না, তুমি ভাল বংশের বউ হবে।"

বিন্দু হাসিয়া বলিলেন, "আর জটধারী মহাশয় আমার কি ব্যবস্থা করলেন?"

উমা। তাই বলছি, তোমার মা ঘাটে গিয়েছিলেন, তাঁর কাছে পরসাদ-টরসাদ বড় থাকতো না, তুমি শুধু হাতে হাত দেখাতে এলে। সন্ন্যাসী বললে, "মা, তোমার ধনও নেই, বংশও নেই, গরিবের ঘরে ঘর নিকিয়ে গরিবের ভাত খাবে।" এই ব'লে সব পরসাদগুলি তোমার হাতে দিয়ে সন্ন্যাসী চলে গেল।

বিন্দু হাসিয়া বলিলেন, "তা বেশ ব্যবস্থা করেছিলে ত। এখন আমার মনে পড়েছে,

গ্রামের লোকে সন্ন্যাসীটিকে রামপ্রসাদ সরষতী বলত।

উমা। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই সরষতী ঠাকুর। তোমার মা পুকুর হ'তে জল এনে নিজস্বা করার আমি সব কথা বললাম। তখন তিনি আঁচল দিয়ে তোমার চক্ষের জল মুছিয়ে বললেন, "তা হোক, বাছা বেঁচে থাক, বেঁধা হোক, চির-এইসী হয়ে থাকিস, যেন গরিবের ঘরে ঘর নিকিয়েই সুখে থাকিস। বাছা, ধন-কুলে সুখ হয় না, ধন-কুলে তোর কাজ নেই।" বিন্দুদিদি, এই কথাটা আমার কেবল মনে পড়ে, ধন বা কুল হলেই যদি সুখী হ'ত, তবে পৃথিবীতে আর অভাব থাকত না।

বিন্দু। ও কি, ও উমা, তুমি ছেলে-বেলাকার একটা কথা মনে ক'রে চক্ষের জল ফেলছ কেন? তোমার আবার সুখের অভাব কিসে উমা? তুমি যদি ভাববে, তবে আমরা কি ক'রব?

উমা। না দিদি, আমার কষ্ট কিছুই নেই, আমার কষ্ট আছে ব'লে আমি ক'রব করছি না। কিন্তু জানি না, কেন এই কল্কেতার বাব ব'লে কয়েক দিন হ'তে মনে অনেক সময়, অনেক রকম ভাবনা উদয় হয়। ভবিষ্যতের কথা ভগবান্ট জানেন। তা বিন্দুদিদি, তুমি কল্কেতার যাক, আর কালীদিদিও বর্ধমানের আছেন, শুনেছি, সেও কল্কেতা হ'তে ৩৪ ঘণ্টা পথ। আমরা ছেলেবেলা যেমন তিনবোনের মত ছিলাম, যেন চিরকাল সেইরকম থাকি, আপস-বিপদের সময় যেন পরস্পরকে ভয় মত জান ক'রে সেই রকম ব্যবস্থা। আমি সহসা উমার মনের বিকট দৃষ্টি দিয়ে ও কালীর মনও এতে চাপিয়া সেই তাঁহার আঁচল দিয়ে গাড়ীর ভিতর

মোচন করিলেন এবং অনেক সাধনা করিয়া
রাত্রি এক প্রহরের সময় বিদায় লইয়া
আপন আপন গৃহে গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতায় আগমন।

ইহার কয়েক দিন পরে হেমচন্দ্র সপরি-
বারে কলিকাতা বাজা করিলেন। যাত্রার
পূর্বদিন বিন্দু আপন পরিচিত গ্রামের সকল
আত্মীয়, কুটুম্বিনী ও বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ
করিয়া বিদায় লইয়া আসিলেন। তাল-
পুকুরে সে দিন অনেক অশ্রুজল বহিল।

যাইবার দিন অতি প্রত্যুষে বিন্দু আর
একবার জ্যোতাইয়ার নিকট বিদায় লইতে
গেলেন। বিন্দুর জ্যোতাইয়া বিন্দুকে সত্যই
স্নেহ করিতেন, বিন্দুর গমনে প্রকৃত দুঃখিত
হইয়াছিলেন। অনেক কাহ্নাকাটি করিলেন,
বলিলেন, 'বাছা, তোরা আমার পেটের ছেলের
নত, আমার উমাও যে, বিন্দু-সুখাও সে। আহা,
তোদের হাতে ক'রে মানুষ করেছি, তোদের
ছেড়ে দিতে আমার প্রাণটা কৈদে উঠে।
তা বা, বাছা, যা, ভগবান্ করুন, হেমের
কল্কেতায় একটি চাকরী হোক, তোরা
বেঁচে বসে সুখে থাক, শুনেও প্রাণটা জুড়ুবে।
বাছা উমা শশুরবাড়ী গেছে, তারেও না কি
'কল্কেতায় নিয়ে যাবে, এই জ্যোতামাসে নিয়ে
যাবে বলে আমার জামাই পীড়াপীড়ি
করছে। শুনলেম, সে না কি কল্কেতায়
নতুন বাড়ী কিনেছে, বাগান কিনেছে,
বাড়ী কিনেছে, ঐ ঘোষেদের বাড়ীর
কান্না বুলতে পারি? তেমন গাড়ী-ঘোড়া
বো-মানুষ হয়ে কো-অমন টাকা, অমন
বলবো? তবে কখন

বড়মানুষী চালচোল আর কোথাও নেই
ঐ ও মাসে আমি একবার বেনের বাড়ী
গিরেছিলেম, বুঝলে কি না, তা এই-নীচে থেকে
আর তেতালী পর্যন্ত সব বগলীর বাড়ী
টানিয়েছে। আর মোকদ্দম, জিনিসপত্র,
সে আর কি বলব। সে দিন প্রায় পঞ্চাশজন
মেয়ে খাইয়েছিল, বুঝলে কিনা, তা সবাইকে
রূপোর খাল, রূপোর সেরকাবী, রূপোর গেলান,
রূপোর বাটি দিয়েছিলেন। আর আমার
বেনের কথাবার্তাই বা কেমন। তারা ভারী
বড়মানুষ, তাদের রীতিই ভালো। এই আমার
জামাই শুনেছি, নতুন বাড়ী ক'রে খুব সাক্ষি
য়েছে, বাড়ী, লঠন, দেয়ালগিরি, গাল্চে, মক-
মলের চাদর, বুঝলে কি না, আর কত সোনা-
রূপো, শাদা পাথরের সামগ্রী তার গোণা গুণ্ডি
করা যায় না। তা তোমরা চোখে দেখবে
বাছা, আমি চোখে দেখিনি, তবে কল্কেতা
থেকে একজন লোক এসেছিল, সেই বলে
যে, * * * ইত্যাদি ইত্যাদি।

তা বেঁচে থাক বাছা, সুখে থাক,
আমার উমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হবে, দুটি
বোনের মত থেকে। আহা, বাছা, তোদের
নিয়েই আমার শরত্কা, তোদের না থেকে
কেমন ক'রে থাকব? (রোদন) তা বাছা,
উমাও লীগগির যাবে, তার সঙ্গে দেখা
করিস্, না হয়, তাদের বাড়ীতে গিয়েই দিন
কতক রইলি। তাদের ত এমন বাড়ী নয়,
শুনেছি, সে মস্ত বাড়ী, অনেক ঘর-দরজা,
বুঝলে কি না * * ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনেক অশ্রুজল বর্ষণ করিয়া জ্যোতাই-
য়ার কাছে বিদায় লইয়া বিন্দু একবার
শরতের মাতার নিকট বিদায় লইতে
গেলেন। শরৎ কলিকাতায় যাওয়া অবধি
তাহার মাতা প্রায় একাকী বাড়ীতে থাকি-
তেন, শরৎ অনেক বলিয়া কহিয়া একটি

কি রাখিয়া দিয়ছিলেন, কিন্তু একটি বামনী রাখিবার কথা শরতের মাতা কোনপ্রকারে সম্মত হইলেন না। বাড়ীটি প্রশস্ত, বাহির-বাটীতে একটি পাকা ঘর ছিল, শরৎ কলিকাতা হইতে আসিলে সেইখানেই আপনার পুস্তকাদি রাখিতেন ও পড়াশুনা করিতেন। বাড়ীর ভিতর দুই তিনটি পাকা ঘর ছিল, আর একটি খোড়ো রান্নাঘর ছিল। তাহার পশ্চাতে একটি মধ্যমাকৃতি পুকুর, শরৎ তাহা প্রতিবৎসর পরিষ্কার করাইতেন।

শরতের মাতা গোরবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি ও ক্ষীণ ছিলেন, বিশেষ স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি আর শরীরের যত্ন নইতেন না, স্ততরাং আরও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিলেন। কি শীতে, কি গ্রীষ্মে তিনি অতি প্রত্যুষে উঠিয়া স্নান করিতেন, একখানি নামাবলি ভিন্ন অস্ত্র উত্তরীয় ব্যবহার করিতেন না। স্নান-সমাপনান্তর প্রত্যহ প্রায় এক প্রহর ধরিয়া আশ্রিত করিতেন, তাহার পর স্বহস্তে রন্ধনাদি করিতেন। স্বামীর মৃত্যুতে ও কালীতারার কষ্টের চিন্তায় বিধবার শরীর দিন দিন শীর্ণ হইয়া আসিতেছিল, মাথার চুল অনেকগুলি শুক হইয়াছিল, অকালে বর্দ্ধক্যের দুর্লভতা উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি সমস্ত দিন দেব-আরাধনায় ও পারমার্থিক চিন্তায় অহিবাহিত করিতেন। কালে বাছা শরৎ একজন বিদ্বান ও মাননীয় লোক হইবেন, কেবল সেই আশায় তাঁহার জীবনের গ্রন্থি এখনও শিথিল হয় নাই।

হেমচন্দ্র, বিন্দু ও সুধাকে আশীর্বাদ করিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, “যাও বাছা, ভগবান তোমাদের কল্যাণ করুন, তোমরা মানুষ হও, বাছা শরৎ মানুষ হোক, এইটিকে দেখে যাই, আমার এ বয়সে আর কোন বাছা নেই। দেখিস বাছা শরৎ, এদের যাওয়া-

দাওয়ার কোন কষ্ট না হয়, বিন্দুর ছুটি ছেলের যেন কোন কষ্ট না হয়, বাছা সুধা কচি মেয়ে, ওর যেন কোন কষ্ট না হয়।”

সুধার কথা কহিতে কহিতে বৃদ্ধার নয়ন হইতে কঁর কঁর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, বৃদ্ধা বৈধবা-বয়সে আনিতেন, এই জ্ঞানশূন্য অন্নবয়স্কা বালিকাকে ভগবান কেন সে বয়সে দিলেন ?

অস্বস্ত কথাবার্তার পর শরতের মাতা বিন্দু ও সুধাকে অনেক সঙ্গপদেশ দিলেন, হেমকে কলিকাতার বাইরা সাবধানে থাকিতে বলিলেন, শরৎকে মনোযোগ পূর্বক লেখাপড়া করিতে বলিলেন। অবশেষে বৃদ্ধা সকলকে পুনরায় আশীর্বাদ করিলেন, সকলে বৃদ্ধার পদধূলি মাথায় লইয়া বিদায় হইলেন; শরৎও মাতাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “মা, তোমার কথাগুলি আমি মনে রাখিব, যত্নে পালন করিব, যে দিন তোমার কথার অবাধ্য হইব, সে দিন যেন আমার জীবন শেষ হয়।”

সকলে চলিয়া গেলেন, বৃদ্ধা সজলনয়নে অনেকক্ষণ অবধি সেই পথে চাহিয়া রহিলেন, শেষে শূন্যহৃদয়ে সে পথপানে চাহিয়া চাহিয়া শূন্যগৃহে প্রবেশ করিলেন। হেম বাটা আসিয়া দেখিলেন, সনাতন কৈবর্ত আসিয়াছে। বিন্দু গ্রাম হইতে বাইবার পূর্বে আপন জমীখানি তাহাকে ভাগে দিয়াছিলেন, ক্রতজ্ঞ সনাতন সজলনয়নে বাবুকে আর একবার দেখিতে আসিয়াছিল। সনাতনের সঙ্গে সনাতনের পত্নীও আসিয়াছিল, সে আর একখানি চিনিপাতা দৈ আনিয়াছিল। বিন্দু অনেক ব্যর্থ করিল, কিন্তু কৈবর্ত-পত্নী তাহা সুনিল না, বলিল, “গাড়ীতে যদি আরগা না হয়, আমি হাতে ক’রে বর্দ্ধমান টেনসন পর্যন্ত দিবে আসিব।” স্ততরাং সুধা গাড়ীতে চাপিয়া সেই দৈ কোলে করিয়া লইল। গাড়ীর ভিতর

বিন্দু ও সুধা দুই ছেলেকে লইয়া উঠিলেন, শরৎ ও হেম হাঁটিয়া বাইতেই পছন্দ করিলেন। গোবর গাড়ী বড় আন্তে আন্তে যায়, প্রাতঃকালে গ্রাম ত্যাগ করিয়াও বেলা দুই প্রহরের সময় বর্ধমানে পৌছিল।

ষ্টেশনের নিকট একটি দোকানে গিয়া সকলে উঠিলেন এবং তথায় রাঁধা-বাড়া করিয়া শীত শীত খাওয়া-দাওয়া করিয়া লইলেন। বর্ধমানের ষ্টেশনের কাছে বড়সুন্দর থালা ও সীতাভোগ পাওয়া যায়, শরৎবাবু তাহার কিছু কিছু সংগ্রহ করিলেন এবং তাহা দিয়া সুধা শেববার তালপুকুরের চিনিপাতা দৈ খাইয়া লইল।

বেলা দুইটার পর গাড়ী ছাড়, দুইটা না বাজিতে বাজিতে ষ্টেশন লোকপূর্ণ হইল। হেম অনেক দিন রেলওয়ে ষ্টেশনে আসেন নাই, অতিশয় ঔৎসুক্য সহিত সেই লোকের সমাগম দেখিতে লাগিলেন। নানা দেশ হইতে নানা উদ্দেশ্যে নানা প্রকার লোক ষ্টেশনে জড় হইতেছে, দেখিয়া হেমের মনে একটি অচিন্তনীয় ভাব উদয় হইল। দূর-মাড়ওয়ার ও বিকানীর প্রদেশ হইতে বড় বড় পাঠরী লইয়া বণিকগণ কলিকাতায় বাণিজ্যার্থে আসিতেছে; ইহারাই ভারত-বর্ষের প্রকৃত বণিকসম্রদায়, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই এই অন্নব্যয়ী, বহুকষ্টসহ, বহুপথগামী, কঠোরজীবী জাতির সমাগম ও বাণিজ্য আছে। আরা প্রভৃতি জেলা হইতে সবল-দরদর, বহুশ্রমী, কিন্তু দরিদ্র বিহারীগণ চাকরীর জন্ত কলিকাতাভিমুখে গমন করিতেছে। কানী, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ হইতে বাঙ্গালী নারী, পুত্র ও বন্ধুদিগের সজ্জিত বাড়ী কিরিয়া আসিতেছেন, বাঙ্গালী নারী সহজে দুর্বলা ও গৃহপ্রিয়, তীর্থ করাই তাঁহাদিগের দেশভ্রমণের একমাত্র উপায়, তীর্থ করিবার

জন্ত তাঁহারা কষ্ট ভুখ করিয়া মথুরা, বৃন্দাবন ও পুষ্কর তীর্থ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আইসেন। বালকগণ ছুটির পর পুনরায় কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতে আসিতেছে, যুবকগণ নানা স্বপ্নসম আকাঙ্ক্ষা বা উদ্দেশ্য বা উচ্চাভিলাষে আকৃষ্ট হইয়া সেই মহানগরীর দিকে আসিতেছেন। আশা তাঁহাদিগের সম্মুখে নানা চিত্র অঙ্কিত করিতেছে, যুবকগণ সেই কুহকে ভুলিয়া উৎসাহপূর্ণ-হৃদয়ে কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছেন। কলিকাতাবাসী কেহ কেহ বিদেশ হইতে চাকরী করিয়া কিরিয়া আসিতেছেন, অনেক দিন পর পুত্রকলত্রের মুখ দর্শন করিয়া প্রীতিলাভ করিবেন। কেহ বা প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত, কেহ বা আত্মীয়-বন্ধুকে একবার দেখিবার জন্ত, কেহ ধন, মান, পদ বা যশো-লিপ্সায়, কেহ বা জীবনের সায়াহ্নে কেবল গন্ধাতীরে বাস করিবার জন্ত, সকলেই নানা উদ্দেশ্যে এই বিস্তীর্ণ কার্যক্ষেত্রের দিকে ধাবমান হইতেছে। এই রাজধানী কর্ম-দেবীর একটি প্রধান মন্দির, হেমচন্দ্র সেই মন্দির-আগমন-পথে অসংখ্য যাত্রী দেখিতে লাগিলেন।

দুইটার পর গাড়ী ছাড়িল, পাঁচটার পর গাড়ী কলিকাতায় আসিয়া পৌছিল। শরৎ একখানি গাড়ী ভাড়া করিলেন এবং সকলেই গাড়ীতে উঠিয়া ভবানীপুর শরতের বাটী অভিমুখে বাইতে লাগিলেন।

হুগলীর পোলের উপর হইতে বিন্দু বিশাল গন্ধাবকে গৃহভূলা অসংখ্য অর্ণবপোত ও তাহার মান্ডলের অরণ্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং অপরপার্শ্বে কলিকাতার ঘাট ও হুগলী দেখিয়া পুলকিত হইলেন। গাড়ী বড়বাজার ও চানাবাজারের ভিতর দিয়া চলিল। তথায় শরতের কিছু কাপড়-চোপড়

কিনিতেছিল, তাহাতে কিছু বিলম্ব হইল।
বিন্দু ও সুধা কখনও তালপুকুর হইতে
বাহিরে যান নাই, ভারতবর্ষের মধ্যে এই
প্রধান জনাকীর্ণ স্থান দেখিয়া তাঁহারা অধিক-
তর বিস্মিত হইলেন। রাস্তার উভয় পার্শ্বে
দোকান, কোন কোন স্থানে সরু সরু গলীর
উভয় পার্শ্বে দ্বিতল বা ত্রিতল দোকানে পথ
প্রারম্ভ করিয়াছে; কত দেশের কত
প্রকার বস্ত্রাদি রাশি রাশি হইয়া সজ্জিত
রহিয়াছে; বিলাতী ধান, দেশী কাপড়, বারা-
ণসী শাটী, বস্তুর কাপড়, মসলী পত্তনের ছিট,
ফ্রান্সের সাতীন বস্ত্রাদি, ইউরোপের নানা
স্থানের গালিচা, চাদর, ছিট, পরদা ও সহস্র
প্রকার ভিন্ন ভিন্ন কাপড়। মণিয়ুক্তার
দোকানে মণিমুক্তা সজ্জিত রহিয়াছে,
খেলানার দোকানে রাশি রাশি খেলানা,
সারি সারি খাবারের দোকানে এখন মিষ্টান্ন
প্রস্তুত হইতেছে, পুস্তকের দোকানে পুস্তকশ্রেণী।
শিল, যাহা একখানি কিনিলে গৃহস্থের তিন-
পুরুষ যায়, তাহাই বিন্দু রাশি রাশি দেখি-
লেন, লোহার কড়া, বেড়ী, ঝাঁঝি প্রভৃতি
দ্রব্যোতে দোকান পরিপূর্ণ, পিত্তল ও কাঁসার
দ্রব্য কোথাও চক্ষু ঝলসাইয়া বাইতেছে।
কাঁচের দোকানে ঝাড়, লঠন, পাত্র, গেলাস,
খেলানা, লেপ্স প্রভৃতি সুন্দররূপে সজ্জিত
রহিয়াছে, কাঠদ্রব্যের দোকানে ছুতারগণ
দ্রব্যাদি পালিস করিতেছে, ছবির দোকানে
কড়িকাঠ ও দেওয়াল ছবিপূর্ণ, বাস্তুর
দোকানে কাঠের বাস্ক, টিনের বাস্ক,
চামড়ার বাস্ক, লোহার বাস্ক, কত প্রকার
দোকানে বিন্দু ও সুধা কত প্রকার দ্রব্য
দেখিলেন, তাহা সংখ্যা করিতে পারিলেন
না। পথ জনাকীর্ণ, গাড়ীর ভিড়ে গাড়ী
চলিতে পারে না, মহাব্যবস্থার ভিড়ে
মহাব্যবস্থা অগ্র-পশ্চাৎ দেখিতে পার

না, চারিদিকে লোকের শব্দ, গাড়ীর শব্দ,
ধরিকারদিগের কথা, বিক্রেতাদিগের চীৎকার-
ধ্বনি! বিন্দু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,
“এ কি বিশাল মহাব্যবস্থা-সমুদ্র! এত লোক
কি করে, কোথা হইতে আইসে, এত দ্রব্য
কে ক্রয় করে, কোথায় চলিয়া যায়।” অল্প
তালপুকুর হইতে দরিদ্র বিন্দু এই মহাব্য-
বস্থাকে বিলীন হইতে আসিয়াছেন, এ মহা-
নগরীর কোন নিভৃত স্থানে কি বিন্দু স্থান
পাইবেন?

সন্ধ্যার সময় বিন্দুর গাড়ী চীনা বাজার
হইতে বাহির হইয়া লালদীঘির নিকট গিয়া
পড়িল, তথায় বাইবার সময় তিনি প্রাসাদ-
তুল্য ইংরাজী দোকান দেখিয়া বিস্মিত হই-
লেন। এই সকল দোকান কাপড়ওয়ালার
দোকান বা জুতাওয়ালার দোকান শুনিয়া
বিস্মিত হইলেন। জুতাওয়ালার ও কাপড়-
ওয়ালার একত্রে ভারত-সমাজের নিয়ন্তর,
জুতাওয়ালার ও কাপড়ওয়ালার ইংলণ্ডের
গৌরববস্ত্রপ, ইংলণ্ডের রাজ্যবিস্তারের
প্রধান হেতু!

বিস্মিত-নয়নে সুধা ও বিন্দু লাট
সাহেবের বাড়ী দেখিতে দেখিতে গড়ের মাঠে
বাহির হইয়া পড়িলেন। তখন সন্ধ্যার ছায়া
গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, ইক্ষুপুরীতুল্য চৌর-
দ্বীপে দীপালোক প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, এখন
মর্ত্যে যাহা দেবত্ব করিতেছেন, তাঁহারা
বেকশ, ফিটন বা লেগুনেট করিয়া ইডেন-
গার্ডেনে সমাগত হইতেছেন। ঐ প্রসিদ্ধ
উদ্যান হইতে অপূর্ণ বাগ্গধনি প্রকট হই-
তেছে এবং আকাশের বিদ্যুৎ মহাব্যব-
স্থার বিজ্ঞানমততার অধীন হইয়া নরনারীর
রঞ্জনার্থ আলোক বিতরণ করিতেছে।
ভারতবর্ষের আধুনিক অধীশ্বরদিগের
গৌরব ও ক্ষমতা, প্রভুত্ব ও বিলাস দেখিয়া

তালপুকুরনিবাসিনী দরিদ্রা বিন্দু বিম্বিত হইলেন।

গাড়ী চলিতে লাগিল। দিনের পরিশ্রম বশতঃ সুধা হেমের বক্ষে মস্তক-স্থাপন করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। বিন্দুও পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, ছোট স্থপ্ত শিশুটিকে ক্রোড়ে করিয়া তিনিও চক্ষু মুদিত করিয়া-ছিলেন। শরৎ-বাবু শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া-ছিলেন, হেমচন্দ্র সুধার মস্তকটি ধারণ করিয়া নিস্তরঙ্গ পথ ও হৃদয়াদি দর্শন করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে হেমের অন্তঃকরণে চিন্তা আবির্ভূত হইতে লাগিল। তাঁহার উদ্দেশ্য কি সফল হইবে? ভবিষ্যতে কি আছে? শান্ত নিস্তরঙ্গ তালপুকুর ত্যাগ করিয়া তিনি অজ্ঞ এই মহানগরীতে আসিলেন, এই সদাচঞ্চল মহা-সমুদ্রের কোন নিভৃত কন্দরে কি তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান আছে?

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা বড়বাজার।

বিন্দু। ও সুধা একবার এ দিকে এস ত বোন।

সুধা। কি দিদি, আমাকে ডাকছে?

বিন্দু। হ্যাঁ বোন, ঐ কাপড় একখানা কেচে রেখেছি, ছাদের উপর শুকুতে দাও। আমি ক্রোড়ে থেকে ছ কলসী জল তুলে শীত নেয়ে নি, রোদ উঠেছে। এখন গয়লানী দুখ আনবে, উছন ধরাতে হবে। কলকাতার ক্রোর জলে নাইতে সুখ হয় না, এর চেয়ে আমাদের পাড়ারগৈরে পুকুর ভাল, বেশ নেবে

মান করা যায়। আর ক্রোর জলে কেমন একটা গন্ধ।

সুধা হাসিয়া বলিল, “তোমার বৃথি কলকাতার সবই খারাপ লাগে? কেন, কলকাতার কলের জল কেমন সুন্দর। কি খাবার জন্তে এক কলসী ক’রে আনে, সে যেন কাকের চক্ষু, আর কেমন মিষ্টি।”

বিন্দু। নে বোন, তোর কলকাতার সুখ্যাতি আর শুনেতে পারি না।

সুধা। কেন দিদি, তুমি মনে কি দেখলে বল। কত বড় সহর, কত বাজার, দোকান, ঘর, গাড়ী, ঘোড়া লোকজন, এমন কি আমাদের তালপুকুরে আছে? এমন দোতারা বাড়ী কি আমাদের তালপুকুরে আছে?

বিন্দু। তা না থাকুক বোন, আমাদের তালপুকুরের সোনার বাড়ী। চারিদিকে নড়বার জায়গা আছে, একটু বাতাস আসে, একটু রোদ আসে, দুটো নাউ-গাছ আছে, দুটো আঁব-গাছ আছে, এখানে কি আছে, বল তো? গাড়ী-ঘোড়া যাদের আছে, তাদের আছে, আর দোতারা পাকা বাড়ী নিয়ে কি ধুয়ে খাব? ঘরে বাতাস আসে না, ছোট অন্ধকার উঠানে রোদ আসে না, পাড়ায় লোকের বাড়ী দেখা কবুতে যাবার যো নাই, পাকী না হ’লে বাড়ীর বাহিরে যাবার যো নেই, ও মা, এ কি গো! যেন পিঞ্জরের ভিতর পাখী রেখেছে।

সুধা। কেন দিদি, সে দিন আমরা গাড়ী ক’রে কত বেড়িয়ে এলেম, চিড়িয়া-খানার বাঘ-সিংহ দেখে এলেম, গাড়ী ক’রে বেরুলেই কত কি দেখতে পাই।

বিন্দু। না বাবু, আমার গাড়ী ক’রে বেড়াতে ভাল লাগে না। আমাদের তালপুকুর সোনার তালপুকুর, সকাল বেলা

কুরের ঘাটে আস্তেম, সেই ভাল। আর সব লোককে চিন্তেম, সবাব বাড়ী যেতেম, সবাই কত আমাদের ভালবাস্ত। এখানে কে কাকে চেনে বল।

সুধা। তা দিদি, এক দিনেই কি চিন্বে, থাকতে থাকতে সকলকে চিন্বে। ঐ সেদিন দেবীপ্রসন্ন বাবুদের বাড়ী থেকে ঝি এসেছিল, আমাদের যেতে বলেছে। আর চন্দ্রনাথবাবু আমাদের কা'ল কত খাবার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

বিন্দু। তা আলাপ হবে বৈ কি বোন; যত দিন থাকিব, লোকের সঙ্গে চেনাশুনা হবে। তবে কি জান সুধা, তাঁরা হলেন বড়লোক, আমরা গরিব মাছ, তাঁদের সঙ্গে কি ততটা মেশা যায়, তা নয়; তাঁরা আমাদের সঙ্গে দুটো কথা কন, এই তাঁদের অনুগ্রহ। তা কল্কেতার যখন এসেছি, তখন ছজন চার জনের সঙ্গে কি চেনাশুনা হবে না, হবে বৈ কি।

সুধা। আর শরৎ-বাবু রোজ সন্ধ্যার সময় ত আমাদের বাড়ীতে আসেন, কত গল্প করেন, কত লোকের কত কথা কন, কত বইয়ের কথা বলেন, দিদি, সে গল্প শুনে আমার বড় ভাল লাগে।

বিন্দু। আহা, শরতের মত কি ছেলে আজকাল আর দেখা যায়? তাঁর একজামিনের জন্ত সমস্ত দিন পড়া-শুনা করিতে হয়, তবু প্রত্যহ আমরা কেমন আছি, জিজ্ঞাসা করিতে আসেন, পাছে কল্কেতার এসে আমাদের মন কেমন করে, তাই রোজ সন্ধ্যার সময় এখানে আসেন। যত দিন তাঁর বাড়ীতে ছিলাম, তত দিন ত তাঁর পড়া-শুনা ঘুরে গিয়েছিল, কিসে আমরা ভাল থাকি, সেই চেষ্টা করিতেন। তাঁর টাকার জাঁক নেই, লেখাপড়ার জাঁক নেই, আর শরীরে

কত মারা-দরা। তাঁর মত ছেলে কি আর আছে?

সুধা। দিদি, ঐ বৃষ্টি গয়লানী আসছে। বিন্দু। কি লো, আজ একটু ভাল হুধ এনেছি, না কাল্কেতার মত জলে দেওয়া হুধ এনেছি? তোদের কল্কেতার বাছা কলের জলের ত অভাব নেই, তোদের হুধেরও অভাব নেই, রংটা রাখতে পারলেই হ'ল।

গোয়ালিনী। না মা, তোমাদের বাড়ীতে কি সে রকম হুধ দিলে চলে, এই দেখ না কেন? খেলেই ত তোমরা ভাল মন্দ বুঝতে পারবে।

বিন্দু। দেখছি বাছা দেখছি; আহা, তালপুকুরে আমরা তিন পো এক সের করে হুধ পেতেম, তাই ছেলেরা খেয়ে উঠতে পারত না। তুই বাছা পাঁচ পো করে হুধ দিস, তা খেয়েও ছেলের পेट ভরে না! আর কড়ার যখন হুধ ঢালি, সে হুধ ত নয়, যেন জল ঢালছি।

গো। তা পাড়ারীয়ে যেমন হুধ পেতে মা, এখানে কি তেমন পাবে? সেখানে গরু চরে খায়, থাকে ভাল, হুধ দেয় ভাল, আমাদের বাঁধা গরু ক'তেমন হুধ দেয়?

বিন্দু। আর কা'ল একটু দৈ আনতে বলেছিলাম, তা এনেছি?

গো। হাঁ, এই বে এনেছি।

বিন্দু। ও মা! ঐ চার পরসার দৈ?

গো। তা, হাঁ মা, চার পরসার দৈ আর কত হবে? ঐ তোমার ঝিকে বল না, বাজার থেকে একখানা কিনে আনতে, যদি এর চেয়ে বড় আনে, তবে দাম দিও না। ই্যা মা, তোমাদের পিত্তে আমরা আছি, তোমাদের কি আমি ঠকাব পা?

বিন্দু। ওলো সুখা, এই দেখ্‌ লো, তোর সোনায় কল্‌কেতার চার পরসার দৈ দেখ্‌ ! একটু জল মেখে থাম্‌ বোন, তা না হ'লে তাতে মাখতে ক্লাবে না। কে ও কি এসেছিল ?

ঝি। কেন গা ?

বিন্দু। বাছা, আজ একটু সকাল সকাল বাজার যাস্‌। আজ বাবু দশটার সময় বের-বেন বলেছেন, সকাল সকাল বাজার ক'রে আসিস্‌। তুই কি মাছ নিয়ে আসিস্‌, তার ঠিক নেই। হাঁ লা, বড় বড় কৈ মাছ বাজারে পাওয়া যায় না ?

ঝি। তা পাওয়া যাবে না কেন মা ? তবে যে দর, সে ছোঁয়া যায় ? বড় বড় কৈ এক একটা দুপয়সা, তিন পয়সা, চার পয়সা চায়।

বিন্দু। বলিস্‌ কি রে ? কল্‌কেতার লোক কি খায় দায় না, কেবল গাড়ী-ষোড়া চ'ড়ে বেড়ায় ?

ঝি। তা খাবে না কেন মা ? বে যেমন খরচ করে, সে তেমন খায়। আমাদের দিন চার পরসার মাছ আসে, তাতে ছবেলা হয়, তাতে কি ভাল মাছ পাওয়া যায় ?

বিন্দু। আচ্ছা, মাগুর মাছ ?

ঝি। ও মা, মাগুর মাছের কথাটি কইও না, একটা বড় মাগুর মাছের দাম চার পরসী, ছ-পয়সা, আট পয়সা, বল বো কি মা, কল্‌কেতার বাজার যেন আগুন। আমরাও মা পাড়াগাঁয়ে ঘর কঁরেছি, হাটে মাছ কিনে খেয়েছি, তা কল্‌কেতার কি তেমন পাই ? কল্‌কেতার কি আমাদের মত গরিব লোকের থাকবার জো আছে মা, এই তোমরা ছবেলা ছপেট খেতে দিচ্ছ, তাই তোমাদের হিল্লোতে আছি, নৈলে কল্‌কেতার কি আমরা থাকতে পারি ?

বিন্দু। তা নে বাছা, বা ভাল পাস্‌, নিয়ে

আসিস্‌, টেংরা মাছ হয়, পার্শে মাছ হয়, দেখে শুনে ভাল দেখে আনিস্‌। আর এক পরসার ছোট ছোট ঝোরলা মাছ আনিস্‌, একটু অমল রেঁধে দেব। বাবুকে যে কি দিয়ে ভাত দি, তা ভেবে ঠিক পাইনি। আর দেখ্‌, শাগ যদি ভাল পাওয়া যায়, এক পরসার আনিস্‌ ত, নটে শাগ হয়, পালম শাগ হয়, না হয় নাউ শাগ হয় ত আরও ভাল। আহা, তালপুকুরে আমাদের নাউ শাগের ভাবনা ছিল না, বাড়ীতে যে নাউ শাগ হ'ত, তা খেয়ে উঠতে পারতাম না। আলু-গুনো বড় মাগগি, আলু জেরাদা আনিসনি, বেগুন হয়, উচ্ছে কি রিক্‌ হয়, কি আর কিছু ভাল তরকারী যা দেখ্‌বি, নিয়ে আসিস্‌। আর খোড় পাস্‌ ত নিয়ে আসিস্‌, একটু ছে চ'কি ক'রে দেব, না হয় মোচা নিয়ে আসিস্‌, একটু ষট রেঁধে দেব। হা কপাল ! খোড়, মোচা আবার পরসার দিয়ে কিনতে হয়।

স্নান সমাপন করিয়া, গয়লানীকে বিদায় করিয়া, রিক্‌কে পয়সা দিয়া, বিন্দু রান্নাঘরে প্রবেশ করিলেন এবং উনান জালাইয়া হুধ জাল দিয়া উপরে লইয়া গেলেন। ছেলে দুটি উঠিয়াছে, তাদের হুধ খাওয়াইয়া বিছানা মাছুর তুলিলেন এবং স্বর পরিকার করিলেন। একটু বেলা হইলে দাসী বাজার হইতে মাছ তরকারী আনিয়া, তখন বিন্দু ঝির নিকট ছেলে দুটিকে রাখিয়া পুনরায় রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিলেন। বাটীতে একটি দাসী ভিন্ন আর লোক ছিল না, রন্ধনকার্য্য দুই ভগিনীই নির্বাহ করিতেন। সুখা নতুন বাড়ীতে আসিয়া ভাঁড়ারী হইয়াছেন, বড় আফ্লাদের সহিত ভাঁড়ার হইতে হুণ, তেল, মসলা বাহির করিলেন, চাল ধুইয়া দিলেন, তরকারী

কুটিলেন, মাছ কুটিলেন এবং আবৃত্তকীয় বাটনা বাটনা দিলেন। বিন্দু নীত্র রন্ধন আরম্ভ করিয়া দিলেন।

পাঠক বুঝিয়াছেন যে, হেমচন্দ্র করেক দিন শরতের বাটীতে থাকিয়া ভবানীপুরে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়ী ভাড়া করিয়া ছিলেন। শরৎ এ অপব্যয়ের বিরুদ্ধে অনেক তর্ক করিলেন, আপন বাড়ীতে হেমকে রাখিবার জন্য অনেক স্তুতি-মিনতি করিলেন, কিন্তু তাহাতে শরতের পড়ার হানি হইবে বলিয়া হেমচন্দ্র তথায় কোন প্রকারে রহিলেন না। শরৎ অগত্যা অহুসন্ধান করিয়া মাসে ১১ টাকা ভাড়ার একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া দিলেন।

ভবানীপুরে শরৎ-বাবু অনেক দিন ছিলেন, তাঁহার সহিত অনেকের আলাপ ছিল, হেমচন্দ্রও তাঁহাদিগের পরিচিত হইলেন। কেহ হাইকোর্টে ওকালতী করেন, কেহ বড় হোসের বড় বাবু, কাহারও বনিয়াদী বিষয় আছে, আরও বিষয়-সম্বন্ধে সন্দেহ; কিন্তু গ' ঘোড়ার আড়ম্বর আছে। কেহ নবাগত শিষ্টাচারী সম্বৎসরজাত হেমচন্দ্রের সহিত প্রকৃত সম্বাবহার করিলেন, কেহ বা ঝাড়-লঠন-পরিশোধিত জনাকীর্ণ বৈঠকখানায় দরিদ্রকে আসিতে দিয়া এবং দুই একটি সগর্ভ কথা কহিয়া ভদ্রাচরণ বজায় রাখিলেন এবং নিজ বড়মুহূষী প্রকটিত করিলেন। কেহ হেমচন্দ্রের কথাবার্তা ও সদাচারে তুষ্ট হইয়া শরতের সহিত হেমকে দুই একদিন আহারে নিমন্ত্রণ করিলেন, কেহ বা নব্য সভ্যতার সুন্দর নিয়মামুসারে হেমচন্দ্রের “একোয়ে-তান্‌স ফরম” করিতে “ভেরি হ্যাপি” হইলেন। কোন বিষয়কর্মে ব্যস্ত বড়লোকের কার্পেটমণ্ডিত ঘরে হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ

অপেক্ষা করিয়াও সাক্ষাতব্যত লাভ করিতে পারিলেন না, অন্ত কোন বড় লোক, তিনিও বিষয়-কার্যে অতিশয় ব্যস্ত, জুড়ী করিয়া বাহির হইবার সময় ক্রহেমের জানালার ভিতর হইতে সহস্র মুখচন্দ্র বাহির করিয়া সাহুগ্রহ-বচনে জানাইলেন যে, হেমবাবু কলিকাতায় আসিয়া ভবানীপুরে আছেন শুনিয়া তিনি (উপরি-উক্ত বড় লোক) বড় সুখী হইয়াছেন। অন্ত তিনি (উপরি-উক্ত বড় লোক) বড় “বিজি,” কিন্তু তিনি “হোপ” করেন, নীত্র একদিন বিশেষ আলাপ-সালাপ হইবে। আর যদি হেমবাবু তাঁহার (উপরি-উক্ত বড় লোকের) বাগান দেখিতে মানস করেন, তবে শনিবার অপরাহ্নে আসিতে পারেন, সেখানে বড় “পাটি” হইবে, তিনি (উপরি-উক্ত বড় লোক) হেমবাবুকে “রিসিভ” করিতে বড় “হ্যাপি” হইবেন! স্বর্ঘর-শব্দে ক্রহেম বাহির হইয়া গেল, অশঙ্করোদগত অর্দ্ধম হেমচন্দ্রের বস্ত্রে দুই এক কোঁটা লাগিল, হেমবাবু সেই অমৃত হাস্য ও অমৃত-বচনে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া ধীরে ধীরে বাড়ী গেলেন।

ভবানীপুরে ভবের বাজার দেখিতে দেখিতে হেমচন্দ্র ক্রমে ক্রমে কলিকাতার বিস্তীর্ণতর ভবের বাজারও কিছু কিছু দেখিতে পাইলেন। বাল্যকালে তিনি মনে করিতেন, কলিকাতার বড়বাজারই সর্বোপেক্ষা বৃহৎ ও জনাকীর্ণ; কিন্তু এক্ষণে দেখিতে পাইলেন, কলিকাতার বড়বাজার হইতেও একটি বাজার আছে, তাহাতে রাশি রাশি মাল গুণ্ণামজাত আছে, সেই অপূর্ণ মাল ক্রয় করিবার জন্য আলোকের দিকে পতকের স্তায় বিশ্বসংসার সেই দিকে ধাবিত হইতেছে। বাল্যকালে তিনি শিশু-শিক্ষায় পড়িয়াছিলেন যে, গুণ থাকিলে

বা বিস্তা থাকিলেই সম্মান হয়, সে বাল্যো-
চিত প্রমত্তাচার শীঘ্রই তিরোহিত হইল,
তিনি এখন দেখিলেন, সম্মানান্বিত সেরকরা,
মণকরা বাজারে বিক্রয় হইতেছে, কেহ
ভারী থানা দিয়া, কেহ সখের গার্ডেনপাটী
দিয়া, কেহ ধন দিয়া, কেহ বা পরের ধনে
হস্তপ্রসারণ করিয়া সেই অমৃত ক্রয়
করিতেছেন ও বড় সুখে, নিয়মিতাক্ষে
সেই সুখা সেবন করিতেছেন। সুন্দর
সুশোভিত বৈঠকখানার ঝাড়-লঠন হইতে
সে অমৃতের স্বচ্ছবিন্দু করিয়া পড়িতেছে,
দর্পণ ও ছবি হইতে সে নির্মল অমৃত
প্রতিকলিত হইতেছে, সুবর্ণবর্ণ সুধার
সহিত যে অমৃত মিশ্রিত হইতেছে, নর্তকীর
সুললিত কণ্ঠস্বরে সে অমৃত-প্রস্রবণের স্বর
শব্দিত হইতেছে! মনুষ্য-মল্লিকাগণ ঝাঁকে
ঝাঁকে সে অমৃতের দিকে ধাইতেছে। কখন
বুকের বাড়ী হইতে বর্ষর-শব্দে সেই অমৃত
নিঃসৃত হইতেছে, কখন অশ্লারের দোকান
হইতে সে সুখা প্রতিকলিত হইতেছে, জগৎ
তাহার কিরণে আলোকপূর্ণ হইতেছে!
আর কখনও বা অব্যবহিত-বেগে কর্তৃপক্ষ-
দিগের মহল হইতে সে অমৃতপ্রোত প্রবাহিত
হইতেছে, বাবতীর বড়লোকগণ, সমাজের
সমাজপতিগণ, ভারী ভারী দেশের মহামান্ত্র-
গণ, পরম সুখে তাহাতে অবগাহন করিতে-
ছেন, হাবডুঝু খাইতেছেন, আপনাদিগের
জীবন সার্থক মনে করিতেছেন! আবার
কখনও বা বিলাত হইতে “পেক” করা
“এম্‌টিমিনীসোল” করা বাস্কে বাস্কে সে
মাল আমদানী করা হইতেছে, ছইখানি
কাঁপা বা গিলটী করা জবোর সহিত রাশি
রাশি চাটুকানিতা বিমিশ্রিত করিয়া
বিলাতী মহাজনের মন ফুলাইয়া দেশীয়
বিজগণ সে মাল আমদানী করিতেছেন।

এ বাজারে সে মালের দর কত। “আদত
বিলাতী সম্মানসূচক পদ!” “আদত বিলাতী
সম্মানসূচক পদবী!” এই গৌরব-স্বনিতে
বাজার গুলজার হইতেছে।

বিভীর্ণ বাজারের অল্প কোথাও
“বেশহিতৈষিতা,” “সমাজ-সংস্কার” প্রভৃতি
বিলাতী মাল বিলাতীদের বিক্রয় হইতেছে,
সে হাটে বড়ই গোলমাল, বড়ই লোকের
ঠেলাঠেলি, বড়ই লোকের কোলাহল,
তাহাতে কলিকাতার টাউনহল, কৌন্সিল-
হল, মিউনিসিপাল হল প্রভৃতি বড় বড়
অট্টালিকা বিদীর্ণ হইতেছে। হেমচন্দ্র
দেখিলেন, রাজমিস্ত্রী অনবরত মেরামত
করিয়াও সে সব বাড়ী রাখিতে পারিতেছে
না, দেয়াল ও ছাদ কাটিয়া গিয়া সে
কোলাহল গগনে উথিত হইতেছে, সমস্ত
ভারতবর্ষে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আবার
সে হাটের ঠিক সম্মুখে অন্তরূপ মাল বিক্রয়
হইতেছে, বিক্রয়গণ বড় বড় জয়ঢাক
বাজাইয়া চীৎকার করিতেছে—“আমাদের
এ ষাটী দেশী মাল, ইহার নাম ‘সমাজ-
সংরক্ষণ,’ ইহাতে বিলাতী মালের ভেজাল
নাই, সকলে একবার চাকিয়া দেখা।” হেম-
চন্দ্র একটু চাকিয়া দেখিলেন, দেখিলেন,
মালটা বোল আনা বিলাতী, বিলাতী পায়ে
বিক্রীত, বিলাতী মালমসলার প্রস্তুত, কেবল
একটু দেশী ঘিের ভাজিয়া লওয়া মাত্র।
হেমচন্দ্র দরিদ্র হইলেও লোকটা একটু
সৌখীন, তাহার বোধ হইল, ঘিটাও ভাল
ষাটী দেশী ঘি নহে। ঈষৎ পচা ও দুর্গন্ধ।
সেই ঘিের ভাজা গরম গরম এই “প্রস্তুত
দেশী মাল” বিক্রয় হইতেছে। রাশি রাশি
খরিদার সেই হাটের দিকে ধাইতেছে।
সের দরে, মণ দরে, হাঁড়ি করিয়া, জালার
করিয়া, সেই মাল বিক্রয় হইতেছে। মুটেরা

রাশি রাশি মাল বহিরা উঠিতে পারিতেছে না, তাহার সৌরভে সহর আমোদিত হইতেছে !

তাহার পর সাধুদের বাজার, বিজ্ঞাতার বাজার, পাণ্ডিত্যের বাজার, হেমচন্দ্র কত দেখিবেন ? সে সামান্য পাণ্ডিত্য নহে, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ; এক শাস্ত্রে নহে, সর্বশাস্ত্রে ; এক ভাবায় নহে, সকল ভাবায় ; এক বিষয়ে নহে, সকল বিষয়ে ; কম বেশী নহে, সকল বিষয়েই সমান সমান ; অল্প পরিমাণে নহে, সের দরে, মণ দরে জালায় জালায় পাণ্ডিত্য বিকাশিত রহিয়াছে । সে গাঢ় পাণ্ডিত্যের ভারে দুই একটি জালা ফাঁসিয়া গেল, পথ-ঘাট পাণ্ডিত্যের লহরীতে কর্দমময় হইল, পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকার দল ঝাঁকে ঝাঁকে আসিল, হেমচন্দ্র আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, সেই পাণ্ডিত্যের উৎস হইতে নাকে কাপড় দিয়া ছুটিয়া পলাইলেন ।

তাহার পর ধর্মের বাজার, যশের বাজার, পরোপকারিতার বাজার, হেমচন্দ্র দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত হইয়লেন । কলিকাতার কি মহাত্মা ! এমন জিনিসই নাই, যাহা খরিদ-বিক্রয় হয় না । যাহাতে দুই পরস্পর লাভ আছে, তাহারই একথানা দোকান ধোলা হইয়াছে, মাল গুদামজাত হইয়াছে, মালের গুণাগুণ যাহাই হউক, একখানি জমকাল “সাইন্ বোর্ড” সম্মুখে দর্শকদিগের নয়ন বললিত করিতেছে ! বাল্যকালে তিনি বড়বাজারের বণিকদিগকে চতুর মনে করিতেন, কিন্তু অজ্ঞ এ বাজারের চতুরতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, চতুরতার জিনিসের কাটতি, চতুরতার বিশেষ মুনকা, চতুরতার জগৎ-সংসার ধাঁধা লাগিয়া রহিয়াছে ।

কলিকাতার অনেক দিন থাকিতে থাকিতে হেমচন্দ্র সময়ে সময়ে অল্প পরিমাণে খাঁচী মালও দেখিতে পাইলেন । কখন কোন বৃদ্ধ দোকানে বা অন্ধকার হুটীরে একটু খাঁচী দেশহিতৈষিতা, একটু খাঁচী পরোপকারিতা বা একটু খাঁচী পাণ্ডিত্য পাইলেন, কিন্তু সে মাল কে চায়, কে জিজ্ঞাসা করে ? কলিকাতার গৌরবাধিত বড়বাজারে সে মালের আমদানী-রপ্তানী বড় অল্প, অসভ্য মহাসম্রাজ্ঞ ক্রেতাদিগের মধ্যে সে মালের আদর অতি অল্প ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

—•—

ছেলে-মুখে বুড়ো কথা ।

আষাঢ় মাসে বর্ষাকাল আরম্ভ হইল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল, হেমচন্দ্রের ভবিষ্যৎ আকাশও মেঘাচ্ছন্ন হইতে লাগিল । তিনি কলিকাতার কোন কার্যের জন্য বিশেষ লালায়িত নহেন, কিছু না হয়, ছয় মাস পরে গ্রামে ফিরিয়া যাইবেন, পূর্বেই স্থির করিয়াছিলেন, তথাপি যখন কলিকাতার কর্মের চেষ্টায় আসিয়াছেন, তখন কর্ম পাইবার জন্য যত্নের ক্রটি করিলেন না ; কিন্তু এ পর্যন্ত তিনি কোন উপায় করিতে পারেন নাই । তাহার চারিদিকে কলিকাতার অনন্ত লোক-স্রোত অনবরত প্রবাহিত হইতেছে, এই অনন্ত জনসমুদ্রের মধ্যে হেমচন্দ্র একাকী !

সন্ধ্যার সময় তিনি শ্রান্ত হইয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিতেন । শান্ত, সন্তুষ্ট বিন্দু স্বামীর অন্ত ভাল খাবার প্রস্তুত করিয়া

রাখিতেন, দুখানি আঁক, দুটি পানকল, চারিটি মুগের ডাল, এক খেলাস মিছরী-পান। সব্বই আনিয়া দিতেন, প্রকলচিতে মিটবাঁকা ঘারা চেমচন্দ্রের প্রাঙ্গি দূর করিতেন। পল্লীগ্রামে বেক্রপ, ভবানীপুরেও সেইরূপ, বামীসেবাই বিন্দু একমাত্র ধর্ম, ছেলে দুটিকে মানুষ করাই তাঁহার একমাত্র আনন্দ; সেই কার্যে প্রত্যেককাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ব্যস্ত থাকিতেন, সন্ধ্যার সময় শিশু দুটিকে লইয়া ছাদে গিয়া বসিতেন। কখন কখন দেশের চিন্তা করিতেন, কখন কখন ছাদের প্রাচীরের গবাক্ষের ভিতর দিয়া পথের জনশ্রোত শোণিতেন, তাঁহার শরীর পূর্বাপেক্ষা একটু ক্ষীণ, তাঁহার জ্ঞান মুখগুল পূর্বপেক্ষা একটু অধিক জ্ঞান!

প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় শরৎ হেমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। বিন্দু শয়নঘরে প্রদীপ জালিয়া একটী মাহুর পাতিয়া দিতেন, সকলে সেই স্থানে উপবেশন করিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কথাবার্তা করিতেন। হেমচন্দ্র কলিকাতায় যাহা যাহা দেখিতেন, তাহাই বলিতেন; শরৎ কলেজের কথা, পুস্তকের কথা, শিক্ষক বা ছাত্রদিগের কথা, কলিকাতার নানা গল্প, নানা কথা, সংসারের সুখ-দুঃখের কথা, জগতের ধন ও দারিদ্র্যের কথা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কহিতেন। তাঁহার নবীন বয়সের উৎসাহ ধর্মপরাধনতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা সেই কথায় বেদীপ্যমান হইত, জগতে প্রকৃত মহৎ লোকের উৎসাহ, মহত্ব ও অবচলিত প্রতিজ্ঞার গল্প কহিতে কহিতে শরৎচন্দ্রের শরীর কটকিত হইত, জগতের প্রভাবনা, মিথ্যাচরণ ও অত্যাচারের কথা কহিতে কহিতে সেই যুবকের নয়নদ্বয় প্রজ্জ্বলিত হইত।

হেমচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মেহের সহিত

সেই উন্নতহৃদয় যুবকের কথা শুনিয়া অভিভূত হই ও প্রীত হইতেন, বিন্দু বাণ্যস্বহৃদয়ের হৃদয়ের এই সমস্ত উৎকৃষ্ট চিন্তা ও ভাব দেখিয়া পুলকিত হইতেন এবং মনে মনে শরতের জ্যোত্স্ন্য প্রশংসা করিতেন; বালিকা সুধা মিত্রা ভুলিয়া যাইত, একাগ্র-চিন্তে সেই যুবকের দীপ্ত মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া থাকিত ও তাহার অমৃতভাষা শ্রবণ করিত। শরতের তেজঃপূর্ণ গল্পগুলি শুনিয়া বালিকার হৃদয় হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ হইত, শরতের দুঃখ-কাহিনী শুনিয়া বালিকার চক্ষু জলে ছল ছল করিত।

হেমচন্দ্র কলিকাতায় যাহা যাহা দেখিতেন, সে কথা সর্বদাই সন্ধ্যার সময় গল্প করিতেন। একদিন কলিকাতার “বড়বাজারের” মাহাশ্বেয়ার কথা বর্ণনা করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “শরৎ! দেশহিতৈষিতা, পরোপকারিতা প্রভৃতি সঙ্গুণগুলি মনুষ্য-হৃদয়ের প্রধান গুণ, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সঙ্গুণগুলির নামে তোমাদের কলিকাতায় যে রাশি রাশি প্রভাবনা কার্য হয়, তাহাতে বিস্মিত হইয়াছি। আমাদের পল্লীগ্রামে প্রকৃত স্বদেশ-হিতৈষিতা বিরল, তাহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু স্বদেশহিতৈষিতার আড়ম্বরও বিরল!”

শরৎ। আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য, বড় বড় সহরেই বড় বড় প্রভাবনা, কিন্তু আপনি কি প্রকৃত সঙ্গুণ কলিকাতায় পান নাই, প্রকৃত দেশহিতৈষিতা, সত্য-চরণ, বিজ্ঞানভ্রম, বশোলিপা প্রভৃতি যে সমস্ত সঙ্গুণ মনুষ্য-হৃদয়কে উন্নত করে, সেগুলি কি আপনি দেখেন নাই?

হেম। শরৎ, তাহা আমি বলি নাই, বরং কলিকাতায় সেরূপ অনেক সঙ্গুণ দেখিয়া আমি তৃপ্ত হইয়াছি। কলিকাতায়

যে প্রকৃত দেশহারাগ দেখিরাছি, যমেশ্বর-দিগের হিতসাধন জন্য বেক্ষণ অনন্ত চেষ্টা, উত্তম, জীবনব্যাপী উৎসাহ দেখিলাম, এরূপ পল্লীগ্রামে কখনও দেখি নাই; পুস্তকে ভিন্ন অস্ত্র স্থানে লক্ষিত করি নাই। বিচ্ছিন্নরাগও সেইরূপ। কলিকাতায় আসিবার পূর্বে আমি প্রকৃত বিচ্ছিন্নরাগ কাহাকে বলে, জানিতাম না, কেবল জ্ঞান আহরণের জন্য দেশবাসি-দিগের মধ্যে জ্ঞান-বিতরণ জন্য, যৌবন হইতে মধ্যবয়স পর্যন্ত, মধ্যবয়স হইতে বার্দ্ধক্য পর্যন্ত অনন্ত অব্যাহত পরিশ্রম, তাহা কলিকাতায় দেখিলাম। আর প্রকৃত যশে অভিরুচি, জীবনপণ করিয়া সংকার্যের দ্বারা মহত্ত্বলাভ করিতে দুর্দমনীয় আকাজক্ষা ও অধ্যবসায়, ইহা পল্লীগ্রামে কোথায় দেখিব? ইহাও কলিকাতায় দেখিলাম। শরৎ, আমি কলিকাতায় শত শত সঙ্গুণ দেখিয়াছি। কিন্তু যেখানে একটি সঙ্গুণ আছে, সেইখানে তাহার দশ প্রকার মিথ্যা অহুসার আছে; যদি দশজন প্রকৃত দেশ-হিতৈষী থাকেন, একশত জন দেশহিতৈষীর নাম লইয়া চীৎকার ও ভণ্ডামী করিতেছেন, দশজন প্রকৃত সমাজসংরক্ষণে যত্নশীল, শত-জন সেই সঙ্গুণের নামে শত প্রকাব প্রতা-রণার দ্বারা পরস্পর রোজগার করিতেছে। এইটি প্রকৃত দোষের কথা।

শরৎ। সে দোষ তাহাদের, না আমা-দের? বিন্দু দিদি, তোমার এ মাহুরে ছার-পোকা আছে?

বিন্দু। সে কি শরৎবাবু, কামড়াচ্ছে না কি?

শরৎ। কামড়ায় নি, জিজ্ঞাসা করছি, আছে কি না?

বিন্দু। না শরৎবাবু, আমার বাড়ীতে এমন জিনিসটি নেই। আমি নিজের হাতে

প্রত্যহ বিছানা-মাহুর রোদে দ, জিনিস পত্র বাড়-খোড় করি। নোংরা আঁকি দু চক্ষে দেখতে পারি না।

শরৎ। সে দিন হেমবাবু আর আমি দেবীপ্রসন্ন-বাবুর বাড়ীতে গিয়েছিলাম, বাড়ীর ভিতর আমাদের খেতে নিয়ে গিয়ে-ছিল; তা তাদের মাহুরে এমন ছারপোকা যে বলা যায় না। তার কারণ কি বিন্দুদিদি

বিন্দু। কারণ আর কি, নোংরা, অপরি-কার। জিনিসপত্র নোংরা রাখলেই এগুলো জন্মায়।

শরৎ। বিন্দু দিদি, আমরাও সেইরূপ সমাজ অপরিষ্কার রাখলেই তাতে প্রতা-রণার কীটগুলো জন্মায়। আমরা যদি পর-নিন্দা ইচ্ছা করি, পরনিন্দা বাজারে বিক্রয় হইবে। আমরা যদি পাণ্ডিত্যাভিমাত্রীর মূর্থতার মুগ্ধ হইয়া ই। করিয়া থাকি, সেই মূর্থতাই বিচ্ছিন্নরূপে বিক্রয় হইবে। ওষ্ঠে বিচ্ছিন্ন দেশহিতৈষিতার যদি আমরা পুণ-কিত হই, সেইরূপ দেশহিতৈষিতার ছড়া-ছড়ি হইবে। চীনাবাজারে যখন ধেরূপ কাপড় লোকের পছন্দ হয়, সেই সময় সেইরূপ কাপড়ের মূল্য অধিক হয়, আমাদেরই অধিক হয়। আমাদেরও ধেরূপ সঙ্গুণে পছন্দ ও রুচি, সেইরূপ ভূরি ভূরি উৎপন্ন হইতেছে। এটি তাহাদের দোষ, না আমাদের দোষ?

বিন্দু। আচ্ছা, সে কথা বুঝলুম। কিন্তু মাহুরে ছারপোকা হ'লে মাহুর রোদে দিতে পারি, মশারি বা বিছানায় কীট থাকলে তা ধোপার বাড়ী দিতে পারি। সমাজে এরূপ কীট উৎপন্ন হ'লে তার কি উপায়? সমাজ কি ধোপার বাড়ী পাঠান যায়, না রোদে দেওয়া যায়?

শরৎ। বিন্দু দিদি, সমাজ পরিষ্কার করিবারও উপায় আছে। স্বর্ঘ্যের

আলোকে বেরূপ যাছরের ছায়পোকাগুলি
সুড় সুড় করিয়া বাহির হইয়া যায়, প্রকৃত
শিক্ষার আলোকে সমাজের অনিষ্টকর
সামগ্রীগুলিও একে একে সমাজ পরিত্যাগ
করিয়া অন্ধকারে বিলীন হয়। যদি শিক্ষার
সে ফল না ফলে, তাহা হইলে সে শিক্ষা
প্রকৃত শিক্ষা নহে। ওঠহ দেশহিতৈষিতায়
যদি আমরা যুদ্ধ না হই, তবে সেরূপ দ্রব্য
কত দিন উৎপন্ন হয়? পাণ্ডিত্যভিযানী
মূর্থতা দেখিলে যদি আমরা সহ্যন্তে তথা
হইতে প্রস্থান করি, তবে সে সামগ্রী কত
দিন বিরাজ করে? এ সমস্ত মেকী সামগ্রী
বে এখন এত পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সে
আমাদের শিক্ষার দোষে, তাহাদের দোষে
নহে।

হেম। শরৎ, তোমার উৎসাহ দেখিয়া
আমি আনন্দিত হইলাম, কিন্তু তথাপি শিক্ষা-
গুণে সমাজ হইতে প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা
একেবারে লোপ হইবে, এরূপ আমার আশা
নাই। শিক্ষিত দেশে যতদূর প্রতারণা আছে,
আমাদের দেশে তত নাই, মনুষ্য-হৃদয়ে যত
দিন সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি উভয়ই থাকিবে,
জগতে তত দিন ধর্মাচরণ ও প্রতারণা উভ-
য়ই থাকিবে; তথাপি প্রকৃত শিক্ষাগুণে
সমাজে কর্তব্যসাধনবাসনা ক্রমে বিস্তৃত হয়,
তাহা আমাদেরও বোধ হয়।

বিশু। তা আজকাল তোমাদের
কলেজে যে লেখা-পড়া হয়, তাতে কি এ
শিক্ষা দেয় না?

শরৎ। বিশু দিদি, কলেজের শিক্ষাকে
অনেকে অতিশয় নিন্দা করে, আমি তাহা
করি না। যে শিক্ষার আমরা মহৎ জাতি-
দিগের, মহৎলোকদিগের জীবনচরিত ও
কার্য-কলাপ অবগত হইতেছি ও প্রকৃতির
বিশ্বকর নিয়মাবলী শিখিতেছি, তাহা কি

মন্দ শিক্ষা? যাহারা ইহা হইতে উপকার
লাভ করিতে পারেন না, সে তাহাদের হৃদ-
য়ের দোষ, শিক্ষার দোষ নহে। হেমবাবু
কলিকাতায় যে প্রকৃত দেশহিতৈষিতা,
প্রকৃত উন্নতি-ইচ্ছার কথা বলিলেন, তাহা
পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্বে যাহা ছিল, অতঃ তাহা
হইতে অধিক লক্ষিত হয়, তাহা কেবল এই
কলেজের শিক্ষাগুণে। আবার এই শিক্ষা-
গুণে এই সঙ্গুণগুলি পঞ্চাশৎ বৎসর পর
আরও অধিক লক্ষিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ
নাই। বহু শতাব্দীতেও আমরা ইউরোপীয়
জাতিদিগের ঠিক সমকক্ষ হইতে পারিব কি
না, সন্দেহ, কিন্তু তথাপি আমার ভরসা যে,
জগদীশ্বরের রূপায় দিন দিন আমরা অগ্রসর
হইতেছি। আত্মবিসর্জন ও কর্তব্যসাধনে
অনন্ত উৎসাহ ও অনন্ত চেষ্টা, এই উন্নতির
একমাত্র পথ, সেই আত্মবিসর্জন, সেই নিকাম
কর্তব্যসাধন আমরা এখনও কতটুকু শিখি-
য়াছি, চিন্তা করিলে হৃদয় ব্যথিত হয়।

কথার কথার রাত্রি অনেক হইয়া গেল,
শরৎ যাইবার জন্য উঠিলেন। হেম তাহার
সঙ্গে দ্বার পর্যন্ত যাইলেন, দেখিলেন, পথে
জ্যোৎস্না পড়িয়াছে এবং গ্রীষ্মকালে নীতল
নৈশ বায়ু বহিয়া যাইতেছে। স্মরণ্য তিনি
এক পা ছই পা করিয়া শরতের সঙ্গে অনেক
দূর গেলেন। পথেও এইরূপ কথাবার্তা
হইতে লাগিল। দেবীপ্রসন্ন-বাবুও আজ
সন্ধ্যার সময় হাওরা ঝাইতে বাহির হইয়া-
ছিলেন, তিনি শরৎ ও হেমকে দেখিয়া
শরতের বাটী পর্যন্ত তাহাদিগের সহিত
গেলেন।

হেমচন্দ্র দেবীবাবুর সহিত কিরিয়া
আসিবার সময় বলিলেন, “আমি কলেজের
অনেক ছেলে দেখিয়াছি, অনেকের সহিত
কথা কহিয়াছি, কিন্তু শরতের স্তায় প্রকৃত

শিকলাভ করিয়াছেন, শরতের জ্বর উন্নত হৃদয়, উন্নত চিত্ত, অনিন্দনীয় উচ্চম ও উৎসাহ আছে, এরূপ অল্পই দেখিয়াছি ।”

দেবীবাণী বলিলেন, “হাঁ, ছেলেটা ভাল, গুণবান্ বটে, বৈচে ধাক্ক, বাপের নাম রাখবে । আর লেখাপড়াও শিখবে বটে, কিন্তু ছেলেমানুষ হয়ে বুড়োর মত কথা কয় কেন ? ছোঁড়াটা শেষে ফাজিল না হয়ে যায়, তাই ভাবি ।”

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

দেবীপ্রসন্ন বাবু ।

ভবানীপুরের কায়স্থদিগের মধ্যে দেবী-প্রসন্ন বাবুর ভারি নাম । তাঁহার বয়স পঞ্চাশ বৎসর হইবে, তাঁহার শরীরখানি এখনও বলিষ্ঠ, তুল ও গোরবর্ণ । তাঁহার প্রসন্ন মুখে হান্ত সর্কদাই বিরাজমান এবং তাঁহার মিষ্ট কথায় সকলেই আপ্যায়িত হইত । তাঁহাদের অবস্থা এককালে বড় মন্দ ছিল, দেবীপ্রসন্ন-বাবু বাল্যকালে অনেক ক্লেশ ভোগ করিয়া-ছেন এবং অল্প বয়সেই লেখাপড়া ছাড়িয়া সামান্ত বেতনে একটা “হোসে” কর্ম লইয়া ছিলেন । তথায় অনেক বৎসর পর্যন্ত বিশেষ কোন উন্নতি করিতে পারেন নাই, অবশেষে হোসের সাহেবকে অনেক ধরিয়া পড়ার সাহেব বিলাত বাইবার সময়ে হোসের পুরা-তন ভৃত্যের পদস্থ করিয়া দেন । সেভাপ্য বধন একবার উন্নত হয়, তখন ক্রমেই তাহার জ্যোতি-বিস্তার হয় । সেই সময় তিন চারি বৎসর হোসের অনেক লাভ হওয়ার সাহেব-গণ বড় ভুট্ট হইয়া শেষে দেবী বাবুকে

হোসের বড় বাবু করিয়া দিলেন । বলা বাহুল্য, তখন দেবী বাবুর বিলক্ষণ ছ পয়সা আয় হইল এবং তিনি ভবানীপুরের পৈতৃক বাড়ীর অনেক উন্নতি করিয়া সম্মুখে একটি সুন্দর বৈঠকখানা প্রস্তুত করাইলেন এবং সুন্দররূপে সাজাইলেন । দেবী বাবু প্রত্যহ ৮টার সময় বৈঠকখানায় বসিতেন, প্রত্যহ অনেক লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন ।

ক্রমেই দেবী বাবুর নাম বিস্তার হইতে লাগিল । দুর্গোৎসবের সময় তাঁহার বাড়ীতে বহু সমারোহে পূজা হইত এবং যাত্রা ও নাচ দেখিতে ভবানীপুরের যাবতীয় লোক আসিত । তন্নিম্ন বাড়ীতে একটি বিগ্রহ ছিল, প্রত্যহ তাঁহার সেবা হইত, এবং বাড়ীর মেয়েরা নানারূপ ব্রত উপলক্ষে অনেক দান-দ্বন্দ্ব করিত । ছুই একজন করিয়া দেবী বাবুর দরিদ্রা জ্ঞাতি-স্বত্নিনীগণ সেই বিস্তার বাড়ীতে আশ্রয় পাইল, পাড়ার মেয়েরাও সর্কদা তথায় আসিত, স্ত্রতরাং বাহিরবাটী ও ভিতরবাটী সমান লোকসমাকর্ষণ ।

হেমচন্দ্র কলিকাতায় আসিবার পর অল্প-দিনের মধ্যেই দেবীপ্রসন্ন বাবুর সহিত আলাপ করিলেন এবং দেবীবাণীও সেই নবাগত ভদ্রলোককে যথোচিত সম্মান করিয়া আপন বৈঠকখানায় লইয়া যাইলেন । বৈঠকখানায় সুন্দর পরিভার বিছানা পাতা আছে, তিনটি মোটা মোটা গির্দে এবং একটি কুলুদিতে দুইটি সমাদান । ঘরের দেয়াল হইতে জোড়া জোড়া দেয়ালগিরি বস্ত্রে ঢাকা রহিয়াছে এবং নানারূপ উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ছবি ঝুলিতেছে । কোথাও হিন্দু-দেবদেবীদিগের ছবি রহিয়াছে, তাহার পার্শ্বে আবার জর্জনি-দেশস্থ অতি অল্প-মূল্যের অপকৃষ্ট ছবিগুলি বিরাজ করিতেছে । সে

ছবিতে কোন রমণী চুল বাধিতেছে, কেহ স্নান করিতেছে, কেহ শুইয়া রহিয়াছে; কাহারও শরীর আবৃত, কাহারও অর্ধাবৃত, কাহারও অনাবৃত। আবার তাহাদের মধ্যে করেকজিওর একখানি “মেগ্‌ডেলীন,” টিসীয়নের “ভিনস্” ও লেওসিয়রের এক জোড়া হরিণও বিকাশ পাইতেছে, কিন্তু সে ছাপা এত নিকট যে, ছবিগুলি চেনা ভার। বহুবাজারে বা নীলামে বাহা শস্তা পাওয়া গিয়াছে এবং বাহা দেবীবাবু বা দেবীবাবুর সরকারের রচিসম্মত হইয়াছে, তাহাই ছাপা হউক, ওলিওগ্রাফ হউক, সংগ্রহ পূরক বৈঠকখানার দেয়াল সাজান হইয়াছে।

হেমচন্দ্র সর্বদাই দেবীবাবুর সহিত আলাপ করিতে বাইতেন এবং কখন কখন সময় পাইলে আপনার কলিকাতা আসার উদ্দেশ্যটিও প্রকাশ করিয়া বলিতেন। দেবীবাবু অনেক আশ্বাস দিতেন, বলিতেন, “হেমবাবুর মত লোকের অবশ্যই একটি চাকরী হইবে, তিনি স্বয়ং সাহেবদের নিকট হেমবাবুকে লইয়া যাইবেন, হেমবাবুর দ্বার লোকের ভক্ত তিনি এইটুকু করিবেন না, তবে কাহার ভক্ত করিবেন?”—ইত্যাদি। এইরূপ কথাবার্তা শুনিয়া হেমচন্দ্র একটুকু আশ্বস্ত হইতেন; দেবীপ্রসন্নবাবুর প্রধান গুণ এইটি যে, তাঁহার নিকট শত শত প্রার্থী আসিত, তিনি কাহাকেও আশ্বাসবাক্য দিতে ক্রটি করিতেন না।

কিন্তু কার্য্য-সম্বন্ধে বাহা হউক না কেন, ভদ্রাচরণে দেবীবাবু ক্রটি করিলেন না। তিনি ছই তিন দিন হেম ও শরৎকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন এবং তাঁহার গৃহিণী হেমবাবুর স্ত্রীকে একবার দেখিতে চাহিয়াছেন বলিয়া পাঠাইলেন; বিন্দু কাজ কর্ত্ত করিয়া প্রায় অবসর পাইতেন না, কিন্তু

দেবীবাবুর স্ত্রীর আজ্ঞা চেলিতে পারিলেন না, সুতরাং একদিন সকাল সকাল ভাত খাইয়া স্বধাকে ৮ ছইটি ছেলেকে লইয়া পাকী করিয়া দেবীবাবুর বাড়ী গেলেন। দেবীবাবু তখন আপিসে গিয়াছেন, সুতরাং বহির্বাটী নিস্তক্ক; কিন্তু বিন্দু বাড়ীর ভিতর বাইয়া দেখিলেন যে, অন্দরমহল লোকা-কীর্ণ। উঠানে দাসীরা কেহ কাঁট দিতেছে, কেহ ঘর নিকাইতেছে, কেহ কাপড় শুকাইতে দিতেছে, কেহ এখন মাছ কুটিতেছে, কেহ সকল কার্য্যের বড় কার্য্য—কলহ করিতেছে। কলিকাতার দাসীগণের বড় পায়, মা-ঠাকুরগণের কথাই গারে সর না,—কোন আশ্রিতা আত্মীয়্য বলিয়াছে, তাহা সহিবে কেন—দশ ও দশনাইয়া দিতেছে, ভদ্র-রমণী সে বাস্তবলহর রোধ করার উপায়ান্তর না দেখিয়া চক্ষুর জল মুছিয়া স্থানান্তর হইতেছেন। প্রাণকোতলার বি-বোয়ের হাট, সকলে একেবারে নাইতে গিয়াছে, সুতরাং রূপের ছটা, গল্পের ছটা, হাস্যের ছটার শেষ নাই। ত বার তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্নানরীতি খায় অবস্রমানা প্রিয়বন্ধুদিগের চরণে প্রাক্ক করিতেছিলেন। কেহ গুল দিয়া দাঁত মাজিতে মাজিতে বলিলেন, “হালা, ও বাড়ীর ন-বোয়ের জাঁক দেখেছিস্? সেদিন যগ-গিতে এসেছিল, তা গয়নার জাঁকে আর ভুঁয়ে পা পড়ে না, হাঁ গা, তা তার স্বামীর বড় চাকরী হয়েছে হট-ইটে, তা এত জাঁক কিসের লা?” কেহ চুল খুলিতে খুলিতে কহিলেন, “তা হোক বোন, তার জাঁক আছে জাঁকই আছে, তার স্বাস্ত্যী কি হারামজারী! মা গো মা, অমন বৌ-কাটুকী স্বাস্ত্যী ত দেখিনি, বোকে স্বামী ভালবাসে বলে সে বুড়ী যেন হু চকে

সেখতে পারে না। তের তের ঘণ্টা
 নট আর দেখিনি।" কত সুন্দরী গায়ে
 ঢালিতে ঢালিতে বলিলেন, "ও সব গোধূলি
 গো, সব সোমান—স্বাস্তী আবার
 কালে মায়ের মত হয়, ছু বোলা বকুলিয়ার
 খেতে আমাদের প্রাণ যায়।" কত সুন্দর
 কবু লো চুপ কবু, এখনি নাড়া দাও
 তোর কথা শুনে পেলে
 রাখবে না। তবু বোন
 হাজার গুণে ভাল।
 স্বাস্তী মাগীর কথা

রামাঘরে কোন কোন বৃদ্ধা আত্মীয়গণ
বসিয়াছিলেন, কেহ বা গিন্নীর জন্য ভাত
নামাইবার উদ্দেশ্যে করিতেছিলেন, কেহ
ছুটো কথা কহিতে আসিয়াছিলেন, কেহ
ছেলে কোলে ক'রে কেবল একটু খিমাহিত্তে-
ছিলেন। বামীর মা কিস্ কিস্ করিয়া
বলিলেন, “ই্যা লা, ও পাড়ী ক'রে কারা
আজ এলো? ঐ যে হন হন ক'রে সিঁড়ি
দিয়ে উঠে গিন্নীর কাছে গেল?” শ্রামীর
মা, “তা জানিস্ নি, ওরা যে এক বর
কারেত, কোন্ পাড়া-গাঁ থেকে এসেছে, এই
ভবানীপুরে আছে, তা ঐ বড় যেটা দেব্‌লি,
তার স্বামী বুঝি বাবুর আপিসে চাকরী
করবে, ওর ছোট বোনটা বিধবা হয়েছে।
গিন্নী ওদের ডেকে পাঠিয়েছিল।” “না
জানি, কেমনতর কারেত, গাঁয়ে কখনো

বিন্দু ও সুধা সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া রেল-
দেওয়া বারান্দা দিয়া গিল্লীর শোবার ঘরে
গেলেন। গিল্লী তেল মাখিতেছিলেন; এক-
জন আশ্রিতা আত্মীয় তাঁহার চুল খুলিয়া
দিতেছিলেন, আর একজন বুকে বেশ করিয়া
ভেল মালিস্ করিয়া দিতেছিলেন। তাঁহার
বুকে কেমন এক রকম ব্যথা আছে (বড়-
মাহুব গিল্লীদের একটা কিছু থাকেই) তা
কবিরাজ বলিয়াছে, রোঙ্গা ঝানের আগে এক
ঘটা করিয়া বেশ করে তেল মালিস
করিতে। গিল্লী দেবীবাবুর জায় বলিষ্
নহেন, তাঁহার শরীর শীর্ণ, চেহারাখান
একটু রুক্ষ, নেজাজটা একটু খিটখিটে

সেই বৃহৎ পরিবারের আত্মীয়, দাসী, বোঝী, সকলেই সে মেজাজের গুণগ্রন্থতাই সকাল-সন্ধ্যা অহুভব করিত। শুনিয়া, দেবীবাবু স্বয়ং রজনীকালে তাহার কিছু কিছু আত্মদান পাইতেন। দেবীবাবু স্বয়ং বিষয় করিয়াছেন, তাঁহার আচরণটা পূর্ববৎ নয় ছিল, কিন্তু নূতন বড়মাছুয়ের মহিবীর ততটা নম্রতা অসম্ভব, নবাগত ধনদর্প দেবীবাবুর গৃহিণীতেই একমাত্র আশ্রয় পাইয়া দ্বিগুণ-ভাবে উৎখলিয়া উঠিয়াছিল।

গিন্নী। কে গা তোমরা?

বিন্দু। আমরা তালপুকুরের বোসেদের বাড়ীর গো, এই কল্কেতায় এসেছি। আপনি আস্তে বলেছিলেন, কাজের গতিকে এত দিন আস্তে পারিনি, তা আজ মনে করলেম, একবার দেখা করে আসি।

গিন্নী। হাঁ হাঁ বুঝেছি, তা বসো বসো! তখনকার কালে নূতন লোক এলেই পাড়ার লোকদের সঙ্গে দেখা করার রীতি ছিল, তা এখন সে রীতি উঠে গেছে, এখন লোকের কোথাও যাবার বার হয় না। তা তবু ভাল, তোমরা এসেছ। তালপুকুর কোথায় গা? সেখানে ভদ্রলোকের বাস আছে?

বিন্দু। আছে বৈ কি, সেখানে তিরিশ চাল্লিশ ঘর ভদ্রলোক আছে, আর অনেক ইতরলোকের ঘর আছে। ঐ বর্ধমান জেলার নাম শুনেছেন, সেই জেলায় কাটোয়া থেকে ৮।১০ ক্রোশ পশ্চিমে তালপুকুর গ্রাম।

গিন্নী। হাঁ হাঁ, কাটোয়া শুনেছি বৈ কি—ঐ আমাদের বিয়েরা সব সেইখান থেকে আসে।” অল্প হাস্ত সেই ধনাঢ্যের গৃহিণীর ওষ্ঠে দেখা দিল। বিন্দু চুপ করিয়া রহিলেন। ক্ষণেক পর গৃহিণী বলিলেন—এটি

দেবীবাবুর স্ত্রীর আজ্ঞা চেলিতে পারি, স্ততরাং একদিন সকাল সকাল গিয়া কইয়া নুথাকে ৭ ছুইটি ছেলেকে টাকা করিয়া দেবীবাবুর বাড়ী করেন, বৃতখন আপিসে গিয়াছেন, প্রথম-সন্তক; কিন্তু বিন্দু বাড়ীর খুলিয়া দিতেলেন যে, অন্তরবহল লোক লেন,—তা নয় সুসীরা কেহ কাঁট দিতেছে আমাদের বাবুর ছে, কেহ কাপড় শুকা-সংসার, তেমন কি সকলোই মাছ কুটিতেছে, তা নয়, ও য'কায়ে। কপায়ে, কার্য—কলহ

দ্বিতীয়-সংখ্যক আশ্রিতা ঈশ্বর বড় ক্রমাগত তেল মালিস করিতে করি—ইপাইতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহারও একটি কথা এই সময়ে বলিলে আশু মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে। বলিলেন,—“কেবল টাকা কড়ি কেন বল বোন, যেমন মান তেমনি ঘশ, তেমন লেখা-পড়া, সাহেব মহলে কত সম্মান। বন্দী যেন ঐ খাটের খুরায় বাধা আছে।”

ঈষৎ হাস্তের আলোক গিন্নীর রুদ্ধবদনে লক্ষিত হইল, কথাটি তাঁহার মনের মত হইয়াছিল। একটু সময় হইয়া সেই আশ্রিতাকে বলিলেন, “আহা! তুমি কতক্ষণ মালিস করবে গা? তুমি হাঁপাচ্ছ ঘে। আর সব লোক কোথা, কাজের সময় যদি একজন লোক দেখতে পাওয়া যায়, সব রান্নাঘরের দিকে মন পড়ে আছে, তা কাজ করবে কেমন করে?”

তীরস্বরে এই কথাগুলি উচ্চারিত হইল; দাসীতে দাসীতে এইকথা কাণাকাণি হইতে হইতে তারের খবরের স্তার পাতকোত্তলার পৌছিল। সহসা তথায় যুবতীদিগের হাস্ত-ধ্বনি ধামিয়া গেল, বোরে বোরে কিরে কিরে কাণাকাণি হইতে হইতে সেই খবর রান্নাঘরে

বেধেতে পারে না। তেরে রেখে দাও।
নট আর দেখিনি।" কত বড় গল্প

সমাজ ।

৫৬৯

চালিতে চালিতে বলিলেন, "এই যে কবিতা, কবিতা হোক।
গো, সব সোমান-খাত্তা আর... হিন্দু হাংগা মেরে, মেরে...
কালে খায়ের বত হয়, হু বেল... হিন্দু হাংগা মেরে, মেরে...
খেতে আমাদের প্রাণ বার।" হিন্দু হাংগা মেরে, মেরে...
কবু লো চুপ কর, এখন না... হিন্দু হাংগা মেরে, মেরে...
তোর কথা শুনে পেয়েছি খেলানি, কখন বিটোর, কখন...
হাংগা না। তবু বোম... হিন্দু হাংগা মেরে, মেরে...
হাংগার গবে ভাল... হিন্দু হাংগা মেরে, মেরে...
খাত্তা মগীর... হিন্দু হাংগা মেরে, মেরে...
বটকে হা... হিন্দু হাংগা মেরে, মেরে...

মল্লিকবাড়ী হইতে গোপবালার মার
নিকট ঘটকী আসিল। গোপীর মা গালি
মিলা বলিলেন, "বলিস্ কি পোড়ারমুখী,
আমার মেয়েকে জলে ভাসাইয়া দিব?
৫০বৎসরের বুড়োর সঙ্গে আমার কচিমেয়ের
বিয়ে দিব? টাকা নিয়ে কি মেয়ে ধুয়ে
থাবে, গয়না নিয়ে কি মেয়ে পেতে শোবে?
হলেম বা আমরা গরিব, আমরা গরিবই
থাক্বে, টাকা নিয়ে মেয়েকে বিক্রয় করুব
না। ও মা, হি! হি! হি! হি! বলি, বুড়ো যে
আমার গোপীর ঠাকুরদানার বয়সী,—বাছা
উমার যদি ছেলে থাকত, সে যে আজ প্রায়
আমার গোপীর বয়সী হত, বিন্দুর মেয়ে যে
প্রায় আমার গোপীর বয়সী,—আর সেই
বিন্দুর জ্যেষ্ঠা উমার বাপ, সে কি না আমার
গোপীকে বিয়ে করতে চার? বলি, যম
কি বুড়োদের জলে থাকে লা? আর
বুড়োগুলোই বা কি গা? নাতনী-বয়সী
ফুটফুটে মেয়ে দেখেও মুখ দিয়ে নাল পড়ে?
হি! হি! অমন বুড়োর মুখে আগুন।
না গো না, অমন কথাটি মুখে এনো
না,—ঐ কালীর মা এক বুড়োর সঙ্গে
মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল, কি হ'ল দেখলে ত?
আবার সেই রকম কাজ করে? না গো না,

আবার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে,
কি হ'ল, খার সংসার, তিনি আমাকে কাদিয়ে
চলে গিয়েছেন,—আমিও গেলেই বাঁচি,
আর এ বয়সা সহ হয় না!" বিধবা স্বামীকে
স্বরণ করিয়া ঘোঁষন করিতে লাগিলেন।

ঘটকী ফিরিয়া গেল, বালিকা গোপ-
বালা বেড়ার বাহিরে দাঁড়াইয়া সকল কথা-
গুলি শুনিла; মনে মনে বলিল, "আমি বড়
ঘরের বোঁ হব, তাতে মা আপত্তি করুতে-
ছেন। মার আপত্তি খাটবে না।"

তারিণী-বাবু মতলব স্থির করিলে সহজে
হট্টিবার লোক নহেন। পরদিন ঘটকী বিন্দুর
নিকট আসিল, একশাখা চিঠি বিন্দুর হস্তে
দিল। চিঠিখানি বিন্দুর জ্যেষ্ঠাইমা লিখিয়া-
ছেন। তাহাতে এই লিখা আছে,—

"মা বিন্দু, তোমার জ্যেষ্ঠামহাশয়ের
সন্তানাদি না থাকায় আবার বিবাহ করিবেন
স্থির করিয়াছেন, এ বিবাহে আমারও মত
আছে। মিত্রগোষ্ঠীর গোপবালা নামে একটি
মেয়ে আছে, তাহাকেই তোমার জ্যেষ্ঠামহা-
শয় পছন্দ করিয়াছেন, মেয়েটি শুনিয়াছি,
বড় নন্দ্র। মেয়ের মা তোমারই আশ্রিত
লোক এবং তোমার কথা শুনে। তাঁহার
সম্মতি যাহাতে হয়, সে বিষয়ে যত্ন করিয়া
তোমার জ্যেষ্ঠাইমার কথা রক্ষা কর।

পুনশ্চ—বাছা, উমা গিয়ে অবধি তুমিই
আমার মেয়ে,—আবশ্যক হইলে তোমার
ঘরে মাকে স্থান দিও।"

বুদ্ধিমতী বিন্দু পত্রের প্রথম ভাগ পড়িয়া
হাসিয়া গড়াইয়া পড়িলেন, শেষ ছত্রটি
পড়িয়া একবিন্দু অশ্রুবর্ষণ করিলেন। তাঁহার
জ্যেষ্ঠাইমার এ বিবাহে কিরূপ মত আছে,
শেষ ছত্রে বুঝিতে পারিলেন। পত্রের উত্তর
লিখিলেন—

"জ্যেষ্ঠাইমা, জ্যেষ্ঠামহাশয় জ্ঞান হারাইয়া,

বখাসরুণ উপার, তাহা কি আমি জানি না? বর্ধমানের এ কথা কে না জানে? আপনাকে অবহেলা করিব? আপনার পাছুকা বহন করিতে পারিলে কৃতার্থ হই, আপনার কথা শুনিব না ত কাহার কথা শুনিব?

তারিণী বাবু। না, আর আমাদের কথা কই খাটে? যাও ভায়া, বাড়ী যাও, তোমার যা আমার বিরূপ অপমান করিয়াছেন, গিয়া শুন। কাঁটা মারিয়া আমার লোক বিদায় করিয়াছেন। মিজ্জা আমার সম্মান জানিতেন, এখন কি না, তাঁহার বিধবা—যাঁহাকে কষ্টের সময় অন্নবস্ত্র দিয়া পালন করিলাম, সে আমার এমন অপমান করে? আচ্ছা, দেখিব, দেখিব, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়?

গোকুল। বলেন কি? মা আমার পথের কাঙ্গালী, সে ভালপুত্রের ধনাঢ্য মল্লিক-বংশের অপমান করিবে? কথাটা কি, ভেঙ্গেই বসুন না।

তারিণী বাবু। আর ভেঙ্গে বলিয়া কি তোমার কাছে অপমানিত হইব? না হে ভায়া, তাহাকে কাজ নাই। এখন তোমরা বড় মাহুৰ, তোমরা বড় ধর, আমরা ছোট লোক, এখন কি আর আমাদের দিকে ফিরে চাহিবে, না আমাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করিবে?

গোকুল। কি বলিলেন? কি বলিলেন? আপনাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা? এ বে আকাশের চাঁদ হাতে পাইলাম। এ দরিদ্র আপনাদের হাতের এক মুষ্টি ভিক্ষা পাইলে সম্মানিত হয়, আমরা আপনাদের সহিত কুটুম্বিতা করিব, এমন দিনও হবে?

মিষ্টকথার দেবতারিণীও তুষ্ট হন, তারিণী-বাবুর মন একটু ভিজিল। আজ্ঞা করিলেন, “হরে, হরে! তামাক দে ত। ব’স ভায়া ব’স,

অনেক দূর থেকে আসিয়াছ, দেখাছ, এখনও বাড়ী যাওয়া হয় নি, একেবারে এইখানেই উঠেছ। তা ব’স ভায়া ব’স, তোমার মত বিনীত ছেলে একালে দেখলেও আনন্দ হয়।”

গোকুল। আজ্ঞা না, আমি দাঁড়ায়েই রহিলাম, বতকণ আপনার আদেশ না পাইব, বতকণ আপনার আদেশ তামিল না করিব, ততকণ আসন গ্রহণ করিব না, জলগ্রহণও করিব না।

তারিণী-বাবুর মুখে এখন হাসি দেখা দিল, হৃদয়ে উল্লাসের সঞ্চার হইল। গোকুলের হাত ধরিয়া বসাইয়া, একবার কল্কেতে ছুঁ দিয়া আঙুনটা ধরাইয়া ভাল করিয়া তামাক টানিয়া গলায় সড়া দিয়া পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন, “না, বল্ছিলাম কি, তোমার পিতা মিজ্জার সহিত আমার বিরূপ প্রণয় ছিল, তাহা ত তুমি জানই।”

গোকুল। আজ্ঞা হাঁ, তাহা জানি বৈ কি।

তারিণী বাবু। তাঁহার বিপদ আপদের সময় সাহায্য দিতে গ্রামের মধ্যে বড় কেই ছিল না, তিনি আমার কাছেই আসতেন, তাহাও ত তুমি জান।

গোকুল। আজ্ঞা হাঁ, জানি বৈ কি।

তারিণী বাবু। তাঁহার মৃত্যুর পর, মাঠা কুরুণকে সাহায্য দেওয়া, তোমাকে বর্ধমান সাহেবদের নিকট পরিচিত করিয়া দেওয়া, তোমার ছোট বোনটিকে কাপড়-চোপড় দেওয়া,—এ সব কথা ত তুমি জানই। নিজের গুণ নিজমুখে বলা সাজে না, কিন্তু মিজবংশের জন্ত কি করিয়াছি না করিয়াছি, তাহা ত তুমি জান।

গোকুল। আজ্ঞা হাঁ, জানি বৈ কি।

তারিণী বাবু। তা করিব না কেন বল ? তোমাদের বৃত্ত ভাল, বংশ ভাল, আচরণ ভাল, তোমাদের জন্ত করিব না ত কি আমার নাস্তিক ভাষা-জামাইদের জন্ত করিব ? না আমার নিজের মাতাল জামাইদের জন্ত করিব ? না তোমারা, এ ঘোর কলিতেও ধর্ম আছে, এখনও হুঁধ্য পূর্বদিকে উদয় হয়, এখনও তোমাদের জায় সংশয়ের উন্নতি অবশ্যই হইবে।

গোকুল। সে আপনার অমুগ্রহ।

তারিণী বাবু। তাই মনে করছিলাম, বিষয়-সম্পত্তি যৎ-বিক্ষিপ্ত করেছে, তালুক, জমা, মহাজনি, তেজারতি, লগ্নি, কারবার, বাড়ী, ঘর, গহনাপত্র সমস্তই আছে। এ আর কাহাকে দিয়া যাব ? কল্যা উমা ত অ'মাকে কাদিয়ে চ'লে গিয়েছে, গৃহিণীও সেই শোকে যায় যায় হয়েছেন। তা ভেবে চিন্তে দেখলেম, তালপুকুর গ্রামের মধ্যে কুলে, মানে, সদা-চরণে মিত্রবংশই শ্রেষ্ঠ, তা যদি মিত্রবংশের সঙ্গে একটা কুটুম্বিতা স্থাপন করে যাই, তা হ'লে যা রেখে যাব, এ সমস্তই তোমাদের, তোমার ভগিনীরও যা, তোমারও তাই।

গোকুল বুদ্ধিমান্ ছেলে, কথার আভাষে তারিণী-বাবুর মতলবটা বুঝিল, মনে মনে বুদ্ধিমানের জায়ই নিষ্পত্তি করিল। মেয়ে-ছেলের আবার পছন্দ অপছন্দ কি ? মেয়ে-গুলো হয়েছে পুরুষের সুখের জন্ত এবং বংশের উন্নতির জন্ত, তাহাদের আবার সুখই কি, উন্নতিই কি ? যদি ভগিনীটাকে মল্লিকবংশে ভাসিয়ে দিলে মিত্রবংশের (অর্থাৎ নিজের) কোন উন্নতি-সাধন হয়, তবে ত সে পরম মঙ্গল। প্রকান্তে বলিল, “মহাশয়, বাহা আজ্ঞা করিতেছেন, এ ত

আপনার অমুগ্রহ মাত্র। ইহার বাড়ি কি সম্মান আর আমাদের আছে ? আমরা পথের কাশালী, আপনাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা ত আমাদের সশরীরে স্বর্গলাভ !”

তারিণী বাবু। আহা, তোমার মত বিনীত মিষ্টভাষী ছেলে কি আজকাল দেখা যায় ? আর দেখছি কি ভায়া, আমার যথা-সরুয তোমাদেরই। তোমার বংশের উন্নতি হউক, তোমার ভগিনী আমার গৃহের গৃহ-লক্ষ্মী হউক, তোমার মাতাঠাকুরাণী দীর্ঘজীবী হউন এবং তোমারও ত উপার্জন হতেছে, ভূমিও একটি বিবাহ করিয়া তোমাদের পুরাতন ঘর বজায় রাখ।

গোকুল তখন অনেকক্ষণ মাথা চুলকা-ইয়া আশ্বতা আশ্বতা করিয়া শেষে মুখ ফুটিয়া বলিল, “আমরা ত আপনাদেরই দাস, যখন আজ্ঞা করিবেন, আমার ভগিনী আপনার পরিচারিকা হইবে। তবে আমরা আপনার সহিত কুটুম্বিতা করি, এরূপ আমাদের অবস্থা কৈ ? পৈতৃক ভাঙ্গা ঘরে আমরা বাস করি, তাহার ইটকাঠ নাই। তা আমাদের ঘর বজায় থাকে যে বলছেন, সে আপনারই অমুগ্রহের উপর নির্ভর। যখন এ দৌনের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কুটুম্বিতায় স্বীকার হইয়াছেন, তখন বাহাতে আমাদের ঘর বজায় থাকে, পুরাতন গৃহটির সংস্কার হয়, আপনার কুটুম্ব বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দিতে পারি, এরূপ উপায় অবশ্যই আপনি করিয়া দিবেন।”

বুদ্ধিমান্ তারিণী-বাবু দেখিলেন, বালক গোকুলজন্ম এত দিন বুধা বর্দ্ধমান নগরীতে কাজ করে নাই, সেও বিশ্ববুদ্ধিতে নিপুণ হইয়াছে, ভগিনীকে বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা আদায় করিবার উপায় করিতেছে টাকার কথা উত্থাপন হওয়ার নাজীর

মহাশয়ের বুকটা একবার হিম্মা গেল, কিন্তু আবার সেই ফুটফুটে মেয়েটির প্রকৃত ওষ্ঠ (ছই দিন পূর্বে বাহার মধু আশ্বাসন করিয়া-ছিলেন) তাঁহার মনে পড়িল, স্বপ্নের ঠোঁট দিয়া নাল পড়িতে লাগিল। হান্তগদগদ-বয়ে বলিলেন, “বল বল ভায়া, তোমার কি বতলব, তাহাই বল। আমার সমস্ত সম্পত্তি ত তোমাদেরই দিতে বসেছি, তা, এখনই দি, আর পরেই দি।”

গোকুল। বহি আজ্ঞা করেন ত বলি, আপনি সমস্তই জানেন। আমাদের বাহিরের ও ভিতরের ইষ্টকাবশিষ্ট ঘর—বাহা আপনার পদধূলিতে পবিত্র হইবে,—সেই ঘর পুনঃসংস্কার করিতে হইবে। খিড়কীর পুকুরটি, বাহাতে আপনি পুণ্যশরীরে অব-গাহন করিবেন,—তাহাও সংস্কার করিতে হইবে। গৃহে কোন উপকরণাদি নাই, আপনি গেলে একটি আসন দিব, তাহারও উপায় নাই, চৌকি, তক্তপোষ, খাট, বিছানা এ সমস্তই আবশ্যিক। তত্ত্বিন্ন আপনার স্ত্রীর আশ্রিতা পাইলে মাতা ঠাকুরাণী রূপার বাসন না করিয়া কিরূপে থাকিয়াইবেন, আর মল্লিক-বংশের সহিত কুটুম্বিতা হইলে আমাদের একটু মান রাখিয়া চলিতে হইবে, ভাল করিয়া তত্ত্ব করিতে হইবে, লোকজন জাতি-কুটুম্ব সকলকে তুষ্ট করিতে হইবে, এ সমস্ত কথা কি আপনার স্ত্রীর বহনশীল লোকের নিকট আমার স্ত্রীর বালকের বলা-সাজে ? তা আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমি আর কি বলিব ? (পরে মাথা চুলকা-ইতে চুলকাইতে) আজ্ঞে, পাঁচ হাজার টাকার কমে যে এ কার্য সম্পাদন হয়, এমন ত বোধ হয় না।

বৈজ্ঞানিক বলেন, পৃথিবীর উন্নয়ন দ্রব-পদার্থ সর্বদাই কলঙ্ক করিতেছে, বখন

অভিশপ্ত বাশের তেজ হয়, তখন আরের-গিরি দিয়া ফুটিয়া বাহির হয়। টাকার কথা উত্থাপন হওয়াতেই গিরিগী-বাবুর উদরস্থ রাগটা একটু কলঙ্ক করিতেছিল, কিন্তু স্থির করিয়াছিলেন, গিরিগীর হাজারটা টাকা কি জোর পনের শত টাকা দিয়া কজা-রসুটি ক্রয় করিবেন। কিন্তু বখন গোকুল পাঁচ হাজার টাকার উল্লেখ করিল, তখন আরের-গিরি কোথায় লাগে ! উঠকবরে বলিলেন, “কি বললে মিজের পো ? পাঁচ হাজার টাকা ? বলি, বত বড় মুখ, তত বড় কথা ? বলি, আমি কি তোমাদের বংশ চিনি না ? তোমার ঠাকুরদাদা গ্রামের হাড় জালিরে গিয়েছে, তোমার বাপ হাড় জালিরে গিয়েছে, আবার ভূমি হাড় জালাতে এসেছে ? পাঁচ হাজার টাকা জলে ভেসে আসে, না পাঁচ হাজার টাকা কখন মিজ-বংশে দেখেছে ? বলি, এক রস্তুি ছেলে, সে দিন হাতে ক’রে মাছব করেছি, আমাদের সম্মুখে এমন কথা বলতে ভয় হয় না ? এমন বিধর্মীর সঙ্গে কুটুম্বিতা করলে নরকভোগ করতে হয় ! এমন কুলাদাদের মুখ দেখলেও পাগ হয়।” ইত্যাদি, ইত্যাদি। গোকুল কিছুমাত্র অপ্র-তিভ বা ক্রুদ্ধ না হইয়া নাজীর মহাশয়ের মেজাজ একটু গরম হইয়াছে দেখিয়া, একটি প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

বলা বাহুল্য যে, নাজীর মহাশয়ের গরম হওয়া বুঝা, বুড়ো বয়সে বালিকা-বিবাহ লাল মনে উদয় হইলে সে রোগ আর ছাড়ে না। আবার তাহার উপর সেই বালিকাটিকেও মধ্যে মধ্যে পুকুরধারে বেধিতে পাইতেন, উঃ, কি চোক ! কি ফুক ! কি ঠোঁট ! বিধাতা কি তুলী দিয়া লিখিয়াছেন ? টকটকে রং কি আলতা দিয়া আঁকিয়াছেন ? কি ললিত বাহুলতা !

কি হুটু হুটে পরীর ভায় পরীর। একটি বীথনিবাগ ত্যাগ করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে বৃদ্ধ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, মনে মনে স্থির করিলেন, “টাকা আমার শরীরের রক্ত, কিন্তু শরীরের রক্তপাত করেও এ রক্তটি লাভ কব্ব। বংশটা বড় হারামজাদা, কিন্তু মেয়েটাকে একবার ঘরে আনুতে পাবুলে হয়, টাকা শুদ্ধ আদার কব্ব, মিঞাদের ঘর-ভিটে যদি বিক্রয় করে না লই, তবে আমার নাম তারিগী মল্লিক নয়।”

আর কয়েক দিন ঘটকী হাঁটাইটি করিল, দুই হাজার টাকা,—আড়াই হাজার টাকা—তিন হাজার টাকা, উ’হ! গোহুল প্রকাশে বলিল,—“আমরা নিতান্ত গরিব, তারিগীবাবু অল্পগ্রহ না করিলে কে করিবে?” মনে মনে বলিল, “বুড়ো বরসে ধেড়ে রোগ ধরিতাছে, টাকা দেবে না? না কে দড়ী দিয়া টাকা আদার করিব।”

অবশেষে নাজীর বাবু ঘটকীকে চারি হাজার টাকা পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া বলিলেন, “ইহাতে যদি না হয়, তবে ঐ সনাতনবাঈ গ্রামে বসুদের বাড়ীতে যে মেয়েটি আছে, দেখতে শুভে ভাল, বরসও শুভে দশ বারো বৎসর হইরাছে, তাহাদের বাড়ী বাইও, এই মাসেই ক্রিয়া সমাপন হইবে, ঠিক করিয়া আসিও।”

গোহুল দেখিল, নাজীর মহাশয়ের মানরক্ষার জন্যও তাহার কথাটা কত রাখা চাই। অতএব সেই চারি হাজার টাকাতাই সম্মত হইল, আর ভিকা বলিয়া দেখুশত টাকা, আর ঢেলীর কাগড় বলিয়া পঞ্চাশ টাকা, আর খাওয়ান দাওয়ান বলিয়া একশত টাকা, আর তত্ত্ব বলিয়া পঞ্চাশ টাকা, আর সভাধরচ পঞ্চাশ টাকা, আর বিবাহের আত্মতা ধরচ বলিয়া একশত টাকা আদার

করিয়া হইল। বলা বাহুল্য যে, এই জিনিস ইত্যাদি খরচেই বৃহৎ হুণকান করা, গৃহের সংকার করা ও বিবাহের সমস্ত ব্যয়ের আয়োজন হইল, চারি হাজার টাকার গ্লোবুল-বাবুর কোম্পানীর কাগজ হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

বিবাহের আয়োজন ।

তালপুকুরে হলহুল পড়িয়া গেল। ধন-শালী বিবরী বিজ মহামাভ নাজীর মহাশয় আবার দারপরিগ্রহ করিবেন, গ্রামের মধ্যে সুন্দরী মেয়ে বাছিয়া তাহাকে কদমেশ্বরী করিবেন, মিজবংশ সম্মানিত করিবেন, মল্লিকবংশ উজ্জল করিবেন, বিবাহে বড় ঘট হইবে, দেশের সমস্ত ভদ্রলোক সমবেত হইবে, মুলুকের কাশালী ভিহারী বিদায় পাইবে,—এইরূপ কথা ঘরে, ঘারে, পথে, বাটে প্রতিশ্রুতি হইতে লাগিল। কৃষকেরা মল্লিক বাড়ীর নিকট দিয়া বাইবার সময় একবার দাড়াইয়া ছুটা খোসগল্প শুনিয়া বাইত, রমণীগণ মিজ-বাড়ীর নিকট কলস নামাইয়া একবার মেয়েকে দেখিয়া বাইত।

তারিগী-বাবুর বৈঠকখানা প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন-সময় পর্য্যন্ত, মধ্যাহ্ন হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত লোকারণ্য; কত বন্ধু, কত পরামর্শ-দাতা, কত সমাজপতি ও দলপতি, কত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আসিত, তাহার ঠিক নাই। দিবারাত্রি সাধুবাণ, স্ততিবাদ ও নাজীর মহাশয়ের বিজ্ঞতার প্রশংসা চলিত। দলপতি ও সমাজপতি বলিতেন, “এ ত তারিগী-বাবুরই উপযুক্ত কাজ। এরূপ যোগ্য লোক কি

আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়? লক্ষ্মী-সরস্বতী ধারে বাঁধা। বিজ্ঞা-বুদ্ধি-বলে সাহেব-মহলে তারিণী-বাবুর কত মান, কত রাজ্য। রায়বাহাদুর হার মানিয়া যায়। আর বিষয়ের ত কথাই নাই, ভালপুত্রের মধ্যে দীন-দরিদ্র, ইতর-ভদ্র যে যখন বিপদে আপদে পড়ে, তারিণী-বাবু ভিন্ন আর সহায় কে? তারিণী-বাবু দীর্ঘজীবী হউন, আমাদের সমাজ বজায় রাখুন, আশু পুত্রমুখ দেখিয়া পরম সুখ ভোগ করুন" ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণপাণ্ডতগণ তারম্বরে কহিলেন, "তারিণী-বাবুর সদাই ধর্মে মতি, তিনি ধর্মনিষ্ঠ লোক, তাঁহার ত এ যোগ্য কাজই বটে। সংকল দেখিয়া, ভদ্রবংশ দেখিয়া স্নলক্ষণা কত্তা স্থির করিয়াছেন, শাস্ত্রসম্মত কাজ করিয়া হিন্দু আচার বজায় রাখিয়াছেন। আজকাল যেসকল সময়, নাস্তিকগুলো কি কি করে, তাহার ঠিক আছে? কেহ বয়স্ক কত্তা খোঁজে, কেহ বিধবা বিয়ে করিতে চায়, কেহ বা আবার জাতি ছেড়ে অন্য জাতিতে বিয়ে করে। ছি! ছি! সমাজ, তারিণী-বাবুকে দেখিয়া শিক্ষা লাভ কর! পুত্রসন্তান-কামনায় সৎসংজ্ঞা, স্নলক্ষণা, নবমবর্ষীয়া বালিকা গ্রহণ করিয়া তারিণী-বাবু আজ স্বজাতির নাম উজ্জ্বল করিলেন, সমাজের গৌরব বর্দ্ধন করিলেন।"

তারিণী-বাবুর বহুগণ বলিলেন, "তানবমবর্ষীয়া বালিকা গ্রহণ করিবেন না কেন? তারিণী-বাবুর বয়সই বা কি? এখনও চল্লিশ পার হয় নাই, এই ত বিবাহের উপযুক্ত কাল। আহা, মুখখানি যেন কাষ্ঠিকের মত, শরীরখানি যেন গণেশের মত, কত কাল তপস্বী করিয়া কত্তা এরূপ বরলাভ করে," ইত্যাদি।

এই সকল কথা শুনিয়া তারিণী-বাবুর

মুখে আর হাসি ধরিত না, লুকাইয়া দর্পণে ঘন ঘন আপনার মুখখানি দেখিতেন, চুলে ঘর ঘন কলপ দিতেন, কাহার সাধা একগাছি পাঁকা চুল বাহির করে? নাপিতের মাখি-রানা ঘিণ্ডণ করিয়া প্রত্যহ ক্ষৌরকার্য্য সম্পাদন করিতেন, দাড়ী-গোপ এখনও উঠে নাই বলিলেও চলে!

স্বর্ণকার দিনে দুই তিনবার করিয়া তারিণী-বাবুর বাড়ী হাটাহাটি করিতেছে, পুরাতন গহনা ভাঙ্গিয়া নূতন ধরণের গহনা করিবার ফরমামেশ হইয়াছে, সেই নূতন গহনাতে প্রেমিক তারিণী-বাবু নব-বধূর অঙ্ক ভূষিত করিয়া দিবেন! কথাটা এক একবার মনে হইতেছে আর বৃদ্ধের বুকটা নাচিয়া উঠিতেছে। বালিকার স্নন্দর ললাটে সিঁতি পরাইয়া দিবেন, ললিত বাহুলতা হাতে ধরিয়া আদর করিয়া তাবিজ-বাজু পরাইয়া দিবেন, কুমুমকলিবিবিন্দিত বক্ষের উপর সখের হার বুলাইয়া দিবেন, কটিতে রসের চন্দ্রহার দোলাইবেন! ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধের শরীরটি রোমাঞ্চিত হইল,—বুড়ো বুঝি পাগল হয়!

তারিণী বাবুর বাড়ী আজ লোকারণা এবং জাতিহুট্টে পরিপূর্ণ। দাসদাসী গোলাপী কাপড় পরিয়া ছুটাহুটি করিতেছে, পুত্র হইতে বড় বড় মাছ, হাট হইতে চাকারী করিয়া শাক-সবজী, বর্দ্ধমান হইতে ঝাঞ্জা, সীতাভোগ ও মিহিদানা, কলিকাতা হইতে সন্দেশ ও রসগোল্লা সংগৃহীত হইয়া বাড়ী পূর্ণ হইয়াছে। বাড়ীতে যেন দিবা-রাত্রি উৎসব হইতেছে, বাহিরে দিবা-রাত্রি বাজ ও লোকের কোলাহল, সমস্ত গ্রামে হলহুল পড়িয়া গিয়াছে।

দয়িজ বিন্দু ও সুধা-গলা ধরাধরি করিয়া কাদিল, একদিন সন্ধ্যার সময় লুকাইয়া

জ্যোতাইয়ার ঘরে গিয়া তাঁহার গলা ধরিয়া কাঁদিল। কিন্তু আজ আনন্দের দিন,— ছুঃখিনীদের কান্না কে শুনে, কে দেখে? সজোরে ঢাক বাজাও, রোসনচোকির শব্দে গ্রাম কম্পিত কর, ভেরীরবে সমস্ত গ্রামে প্রচার কর,—আজ গ্রামের আনন্দের দিন, আজ মহামাত্র নাজীর মহাশয়ের শুভ বিবাহ!

এদিকে কন্নার বাড়ীও আজ লোকারণ্য। মিজগণ এককালে গ্রামের বড়লোক ছিলেন, তালপুকুর ও নিকটস্থ গ্রামসমূহে তাঁহাদের জাতি-কুটুম্বের অভাব ছিল না, তবে সন্ধ্যার অন্ধকারে যেমন পক্ষিকুল নিজ নিজ কুলায়ে লীন হইয়া থাকে, মিজদিগের দরিদ্র ও ছুরবস্তার সময় সেইরূপ জাতি-কুটুম্বগণ নিজ নিজ কুলায়ে লীন হইয়াছেন, কেহ সাড়াশব্দ করেন নাই, একবার তত্ত্বতল্লাস করেন নাই। আবার সূর্যের উদয়ে যেরূপ পক্ষিকুল মহা আনন্দে শব্দ করিয়া পুনরায় আকাশ আচ্ছন্ন করে, আজি মিজদিগের সৌভাগ্যবির উদয়ে দশ গ্রাম হইতে জাতি-কুটুম্ব আসিয়া গোপীর মার পুরাতন গৃহ আচ্ছন্ন করিল।

চারুর মা সম্পর্কে গোপবালার মাসী হয়। বড় ঘরে বিবাহ হইয়াছে, স্থল শরীর-খামি গহনা-ভরা, মুখে সদাই হাসি। এত দিন পরে বোম্বুধিকে মনে পড়িল, পাকী করিয়া মিজদের বাড়ী আসিলেন। হেসে হেসে গরবিনী বলিলেন, “তা বোন্, আমার চারুও যে, গোপীও সে—আহা! এত দিন বাছা গোপীকে দেখিতে পাই নাই, মনে করি আসি আসি, তা আমাদের যে সংসার, সহজে কি আসা হয়? বেঁচে থাকুক, শওরবাড়ীর গৃহলক্ষ্মী হয়ে থাকুক, সোনার টাঁদের মত ছেলের মুখ দর্শন করুক। মল্লিকদের বাড়ী সর্বদাই বাতায়ত আছে, বাছা গোপীকে

সর্বদাই দেখে যাব। আমরা আসব না ত কে আসবে? কথায় বলে, মাও বে, মাসীও সে, মা-মাসী বাছাকে দেখবে না ত দেখবে কে?” ইত্যাদি।

হরির মা সম্পর্কে গোপীর শিসী হয়। সামান্ত গৃহস্থঘরে বিবাহ হইয়াছে, শরীর শীর্ণ, স্বভাবটি রুদ্ধ। ভ্রাতার মরণের পর মিজ-বাড়ীতে পা দেন নাই, তবে গোপীর মা অল্প কষ্টে লালায়িত হইয়া অনেক অশ্রু-বিনয় করায় একবার পাঁচ টাকা ধার দিরাছিলেন, তাহাও ঘট-বাটি বিক্রয় করাইয়া, সুদশু আদায় করিয়া লইয়াছেন। আজ পিসামার শরীর স্নেহে গলিয়া পড়িতেছে। গোপীর চুল বেঁধে দিতেছেন, গহনা পরাইয়া দিতেছেন, কত সেবা-শুশ্রূষা। বলিলেন, “তা আমরা করুব না ত করবে কে গা বোন্? থাকতেন আজ দাণ্ডা বেঁচে, আহা, এ আনন্দের দিনে কতই আনন্দ করতেন! আহা, দাদা যখন যে কাজটি করতেন, আমাকে না জিজ্ঞাসা ক’রে ত করতেন না, আমাকে না ডাকাইয়া কি বাড়ীতে কিয়াকর্ম হবার বো ছিল? তা দাদা যেমন পুণ্যাশ্রা ছিলেন, বাছা গোপীও সেই রকম গো। আহা, মেয়ের মুখে কথাটি নাই। তা এমন মেয়ের বড় ঘরে বিয়ে হবে না ত কার হবে? বেঁচে থাক বাছা, গা ভ’রে গহনা পরুবি, পাকী চড়ুবি, বারাগসী শাড়া প’রে বোগ-গিবাড়ী যাবি,—এর বাড়ী কি সুখ আছে? বাছা, তোদের সুখ দেখে মরুতে পাগলেই বাঁচি।” ইত্যাদি।

শ্রামের মা সম্পর্কে গোপীর খুড়ী হন। তাঁহার স্বামীর সহিত গোপীর বাপ বিবাহ লইয়া অনেক বিবাদ করিয়াছেন,—গোপীর বাপের মৃত্যুর পর শ্রামের মা বিধবা জার উপর সে কলহের বিলক্ষণ প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। মোকদ্দমা করিয়া দরিদ্র জার

জমা-জমী বিক্রয় করিয়া তাঁহার ঘটী-বাটি
বিক্রয় করিয়া লইলেন, সন্দেশ হাতে করিয়া
ছেলেদের পাঠাইয়া দিতেন ; বলিয়া দিতেন,
“গোপীকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাবি।” গোপীর
মা গরিব ও ভালমাহুদ, সমস্ত সহ করিত ও
কামিত। টাকার কি মধ্যমরী কমতা! গোপীর
মার সৌভাগ্য-উদয়ে শ্রামের বা সমস্ত বৈরি-
ভাব ভুলিলেন, শ্রির কার প্রতি তাঁর কত
মায়ী, কক মমতা, কত যত্ন। বলিলেন, “আহা
বোন! পুরাতন কথা কি ভূলা যায়? সেই
তোমার আমার একই বৎসরে বিয়ে হয়,
আহা, আমরা বোন বোনের মত ছিলাম গো।
এক মন, এক প্রাণ, কেবল শরীর ভিন্নবে ত
নয়। তোমার গোহুল যখন পেটে, তখন
বাছা শ্রামলাল হয়, তা আমার শ্রামলাল যে,
গোহুলও সেই। তা গোহুল বেঁচে থাকুক,
শুণবান বুদ্ধিমান্ ছেলে হয়েচে, দু পরসী
রোজগার কবুচে, মিঞাকুলের নাম রাখবে।
আর বাছা গোপীর বড় ঘরে বিয়ে হতেছে,
বড় মাহুদের বৌ হবে, গা-ভরা গহনা
পাবে, সুখে থাকবে! আহা, ওদের সুখ
দেখলে আমাদের চক্ষু ভুড়ায়,”—ইত্যাদি।

এইরূপ আত্মীয়দিগের যত্ন, শুক্রবা, আশী-
র্বাদ ও মঙ্গলকামনার গোপীর মা বড়ই
আশ্রয়িত হইলেন। তাহাদের বাড়ী হইতে
বড় বড় তত্ত্ব আসিয়া মিঞা-বাড়ী ভরিয়া গেল।
এ কয়েক বৎসর ইহার চতুর্বাংশ অগ্রগহ
পাইলে গোপীর মা অন্নবস্ত্রের জন্ত বিন্দু ও
সুখার ধারে গিয়া দাঁড়াইত না। গোপবালা
মার চেয়ে সেরানা মেয়ে, বাপের বুদ্ধি পাই-
রাছে। বুদ্ধাদিগের কাছে মেয়ের মুখে কথাটি
নাই, তাহাদের মমতা ও স্নেহবাক্যে মেয়ের
চক্ষু ছল ছল করিতেছে। চক্ষু মুছিয়া পুতুর-
ধারে সমবয়স্কদিগের কাছে আসিয়া একবার
প্রাণখুলিয়া হাসিল।

সমবয়স্কারা বলিল, “কি লো, বড় ঘরে
বিয়ে হবে ব’লে বড় আত্মাদ বে,—সুখে
হাসি ধরে না বে।”

গোপী। না লো, তার জন্ত হাসি নয়।
বরস্তাগণ। তবে কি জন্ত, মনের কথাটা
খুলে বল না।

গোপী। এই আমার মাসীমা, পিসীমা,
খুড়ীমাদের বড় দে’খে হাসিছিলেম।

বরস্তাগণ। ইস্! হেসে বে গড়িয়ে
গেলি। মেয়ের রকম দেখ না। তা মাসীমা
বিয়ের সময় এসেছেন, তোদের ভালবাসেন
ব’লে যত্ন কচ্ছেন, তাতে আবার হাসি
কিসের লা?

গোপী বলিল, “না, না, তা নয়, তবে
মাসীমা পিসীমার বড় দে’খে একটা রূপকথা
মনে পড়ল, তাই হাসিছিলেম। রূপকথাটি
বলি শুন।

দুই ভাই ছিল, বড় ভাইটি বড়লোক
আর ছোট ভাইটি গরিব। তা বড় ভায়ের স্ত্রী-
বড়মাহুদী চাল, সে গরিব ছোট জাটিকে
একবার ডেকে জিজ্ঞাসাও করে না, দেখা
হ’লে কথাও কর না। গরিবরা দুখে থাকে,
কাঁদাকাটি করে, কিছু দিন পরে সে গ্রাম
থেকে উঠে গেল।

বিদেশে চাকরী-বাকরী ক’রে গরিবদের
শেবে অনেক টাকা হ’ল। তখন তারা গ্রামে
ফিরে এসে পাকা বাড়ী কবুলে, নূতন পুতুর
কাটালে, জমিদারী কিনলে আর অনেক
চাকর-বাকর রেখে বড়মাহুদী চালে চলতে
লাগল।

বড়জা তখন ছোটজাকে অনেক আদর
ক’রে নিমন্ত্রণ ক’রে পাকী পাঠালে।
ছোট আ’থেতে এসে দেখে—রূপার
খালে ভাত বাড়ী, রূপার বাটিতে ব্যঞ্জন
সাজান, রূপার রেকাবিতে সন্দেশ-মণ্ডা।

ছোট জা আসনে বসল। ভাতগুলি চার ভাগ করলে, ব্যঞ্জনগুলি চার ভাগ করলে, সন্দেশ-মণ্ডাগুলি চার ভাগ করলে। এই রকমে ভাগ করে আসন থেকে উঠে হাত ধুলে।

বড় জা বললে, ‘এ কি বোন্, খেলে কৈ?’
ছোট জা বললে, ‘বাদের জন্ত খাবার করেছ দিদি, তাদের জন্ত ভাগ করে দিলেম। এ ত আমার জন্ত খাবার করনি দিদি।’

বড় জা বললে, ‘তোমার জন্ত নয় ত কার জন্ত বোন্?’ ছোট জা বললে, ‘এই এক ভাগ আমাদের পাকা বাড়ীর জন্ত, এই এক ভাগ আমাদের পুকুরের জন্ত, এই এক ভাগ আমাদের জমিদারীর জন্ত আর এই এক ভাগ আমাদের লোকজনের জন্ত। এই সব দে’খে রান্না-বাণা করেছ দিদি, খাওয়া-দাওয়া এদের সমর্পণ কর। আমাকে যদি খাওয়াতে ইচ্ছা থাকত, তা হ’লে যখন গরিব অবস্থার স্নেহের জন্ত লালারিত ছিলাম, তখন একদিন ডেকে খাওয়াতে’।’

সন্ধ্যার সময় শাঁক বাজিয়া উঠিল। ঘরে ঘারে প্রদীপ বাতি জ্বলিল, বাহির-দরজার বাজ আরম্ভ হইল, বৃদ্ধাগণের ডাকাডাকি, তরুণীগণের খোসগল্প ও হাস্যধ্বনি, দাসীদিগের ছুটোছুটিতে বাড়ী পুরিয়া গেল। বাহির বাড়ীতে কত্ৰাকর্তা গোব্বল-বাবু কোমরে চাদর বাধিয়া ডাবা হাঁকা হাতে লইয়া, সভা প্রস্তুত করিতেছেন, বাতি জ্বলাইতেছেন, হাঁক-ডাক দিতেছেন, আশ্বালন করিতেছেন। ভিত্তর-বাড়ীতে সমস্ত প্রস্তুত, কত্ৰাকে সাজা-ইবার জন্ত ভাক হইল। মেয়ে সাজিতে বসিল। মুখধানি নস্ত ও শান্ত, হৃদয়ধানি আনন্দে নৃত্য করিতেছে।

বঠ পরিচ্ছেদ ।

—০—

শুভ বিবাহ ।

ভুবায়মতিত বিশাল হিমালয় পর্বতের ভায় টোপ-মণ্ডিত তারিণী-বাবুর বিশাল শরীর সভ্যত্বল অমৃকাইয়া রহিয়াছে। পাখুরে-কাল হুল শরীরের উপর রক্তবর্ণ চেলির কাপড় শোভা পাইতেছে। পকাশ বৎসরের গোঁপ-কামান বরের মাথার বিরাট টোপ শোভা পাইতেছে। কোথায় গেলেন কবি কালিদাস, তিনি সে মনোহর-রূপ বর্ণনা করুন,—আমরা অক্ষম।

বাড়ী লোকারণ্য, চারিদিকের গ্রামসবু-হের কারহকুলের কেহ নিয়ন্ত্রণে বাদ পড়ে নাই। বাড়ীর ভিতর একেবারে মেয়েতে ভরিয়া গিয়াছে, তাহাদের কল্ কল্ শব্দ, তাহাদের হাস্যধ্বনি ও তাহাদের কথারহস্যে বাড়ী আনন্দপূর্ণ। কোন নবীনা উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া সখীকে ডাকিতেছে, “ওলো দেখ’বি আর লো দেখ’বি আর। ও মা, এ কি বিয়ের বর, না মুশকো মিন্বে লো?”

দ্বিতীয়া। দূর পোড়াকপালী, বিয়ের রাজি বরকে অমন কথা বলে? কেন লো, বরের রূপ মন্দই বা কি? রংটা একটু কাল বই ত নয়, মুখের ছিঁরি আছে।

প্রথমা। হাঁ, ছিঁরি আছে বৈ কি,—কেবল গাল দুটি বেন পাকা বেগুন বুলে রয়েছে।

দ্বিতীয়া। দূর পোড়ারমুখী! শুকনো চড়ান গাল বুঝি ভাল?

প্রথমা। আর ঠোঁট দুটি বেন বোল্ডার কামড়ে দিচ্ছে।

দ্বিতীয়া। দেখিসু,—দেখিসু, ঐ ঠোঁট

পেরে গোপী বজ্র যাবে। স্বপ্নবাতী একবার গেলে হয়, এমন গোলগাল স্বামী পেরে আর এ-মুখে হবে না।

প্রথমা। আর বুকে কি চুল দিদি, ঠিক যেন আমাদের বাড়ীর আঁতাকুড়ের জল।

দ্বিতীয়া। দূর হতভাগী! অমন কথা বলতে নেই।

প্রথমা। ও বাবা! পেটটা কি ফুলো গা! মিন্‌বের পেট ফুলেছে না কি?

দ্বিতীয়া। যা যা, তোর আর বরের নিয়ে কবুতে হবে না। গোপী শুনে রাগ কবুবে। দেখিস, ঐ নাদোন্স নোদোন্স শরীর পেরে আমাদের গোপীর মন ভুলে যাবে।

প্রথমা। না, সত্যি দিদি, বরের পা ছুঁখানা দেখ, ও মা, পায়ে গোদ হয়েছে না কি? গোপী পা নিয়ে কোন্ লজ্জায় মিন্‌বে বিয়ে করতে এল? কোন্ এক জোড়া মোজা পরে ঢেকে এল দিদি?

দ্বিতীয়া। দেখিস, দেখিস, ঐ পা গোপী কত যত্নে পূজা কবুবে।

প্রথমা। ইস! তা আর হ'তে হবে না। গোপী আপনার খুদে খুদে আলতা-মাখা পা ছুঁখানি যদি মিন্‌বের টোপরের উপর না রাখে, তবে আমি আর কি বলেছি। আমি গোপীকে জানি, সে চাপা মেয়ে, মুখে ভাল-মাহুদ, মনখানি কুরের মত ধারাল।

বর গাত্রোথান করিলেন, যেন হিমালয়-পর্বত শিকড় ছিঁড়িয়া উঠিলেন। বাড়ীর ভিতরে স্ত্রী-আচার, রসিকাগণ সে আচার বর্ণনা করুন, আমরা তাহার কি জানি? বাড়ীর উঠানে একেবারে মেয়ে পিলু পিলু করিতেছে, তারিণীবাবুর বিশাল শরীরের চারিদিকে ঘুরিতেছে কিরিতেছে, নিলুজ্জ্বল হইয়া ধূলু ধূলু করিয়া হাসিতেছে, যেন

একটি বিশাল তমালবৃক্ষের চতুর্দিকে মরনা পাখীগুলি উড়িতেছে! কোন বেরেটি ভিকি মারিয়া তারিণী-বাবুর ধলুধলে কানটি একবার মলিয়া দিল! কেহ কেহ বা সেই প্রকাণ্ড উদরের উপর দৈবের হাতের ছাপ লাগাইয়া গেল এবং কোন রসিকা সেই বিশাল পৃষ্ঠদেশে আল্পানার দাগ দিয়া যেন দূরবিলম্বী মেঘরাশির উপর বিদ্যুতের শোভা করিয়া দিল।

কুজ গোপীকে পিঁড়ায় বসাইয়া বরের চারিদিকে সাতবার পাক দেওয়া হইল, তারিণী-বাবুর মনটি নৃত্য করিতেছে, নজরটি সেই পিঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে! যখন “বর বড় না ক'নে বড়” গ্রন্থ হইল, তখন গোপীর পরমবন্ধুগণও স্বীকার করিল, বর বড় বটে। যখন বরণডালা লইয়া পতি-পুত্রবতী কোন গৃহিণী নাজীর মহাশয়কে “ভ্যা” করিবার অমুরোধ করিলেন, তখন রসিকাগণ কানাকানি করিতে লাগিল,— “ভ্যা করিবেন দিন কত পর—গোপী তেমন মেয়ে নয়।”

তাহার পর বর-কন্ডা একত্র বসিলেন, পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করাইলেন। তারিণী-বাবু স্বৈরপূর্ণ হুলহুলে কন্ডার সেই সূচিকণ স্তন্যর পুষ্পবিন্দিত হস্ত গ্রহণ করিয়া গোমাক্ত হইলেন—অবগুণ্ঠনশূন্য বধুর মধুমাখা মুখ, মুক্তাবিভূষিত ললাট এবং অলক্তক-রঞ্জিত ওষ্ঠ দেখিয়া বুড়ো বুঝি, বিবাহ-সভার মুচ্ছা যায়।

তাহার পর বাসরঘর! বাসরঘরে আজ বড় ভাষাসা—তারিণী-বাবুর মত নাদোন্স নোদোন্স, গোল-গাল, বরষ রসিক বর ভাল-পুরুষের স্তন্যরসগণ সর্বদা পান না, আজ বুঝি, বরকে আশুই খেয়ে কেলেন! বর ঘরে আসিবামাত্র একজন ভাষা, হুলাদিনী, মধ্য

বয়স রসিকা তাঁহার হাত ধরিয়া বসাইয়া বলিলেন, “এস এস গোপীবল্লভ এস, তোমার বিরহে গোপবালা বে একেবারে শুকিয়ে পিঁয়াছে।” রসিক তারিণী-বাবু ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, একজন নয়, যেন ষোলশত গোপিনী সেই নিকুঞ্জে বসিয়াছেন!

বাসুরঘরের রং-তাঁয়াসা আমরা কেমন করিয়া বর্ণনা করিব? বাসুরঘরের কথা আমরা কি জানি? কোথা গেলে রসিকা কন্দরোগণ,—তোমরা সে গৃহ আচার জান, তোমরা সে রসের কথা জান,—তোমরা যাঁহা করিবার কর। গোবর্দ্ধন পর্বতের স্তায় তারিণী-বাবুর কোলে ময়না পাখীটির স্তায় কন্ঠাটিকে বসাও, আমরা বিদায় হইলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

দম্পতি-প্রণয় ।

সুখের স্বপ্নের মত তারিণী-বাবুর ছুটি ফুরাইল, তিনি পুনরায় বর্ধমানের কার্যে যোগ দিলেন। মধ্যে মধ্যে গ্রামে আসিয়া নব-বধূটিকে দেখিয়া জীবন সার্থক করিতেন, আবার অনিচ্ছক বলদের মত ফিরিয়া বর্ধমানের ঘাইয়া আপিসের ঘানিগাছে বাঁধা হইয়া ঘুরিতেন।

তিন চারি বৎসর এইরূপে কাটিয়া গেল। তারিণী-বাবুর আর কাজ করা পোষায় না। বয়সে শরীর দুর্বল হয়, মন নিস্তেজ হয়, কাজে সর্বদাই তুল হইত। সাহেবেরা অভিযন্ত্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “নাজীর বাবুর পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইয়াছে, পেন্সন

লউক।” অস্ত্রান্ত আয়লাগণ কানাকান করিত, নাজীর মহাশয়ের মন নতন বোয়ের দিকে পড়িয়া রহিয়াছে, কাজ করিবেন কিরূপে?

চাকরীর মাসা শীঘ্র ছাড়া যায় না— অনেক গল্পনা সহ্য করিয়াও আরও এক বৎসর কাজ করিলেন, শেষে অগত্যা পেন্সন লইয়া গ্রামে আসিয়া বসিলেন। তখন গোপবালার চতুর্দশ বৎসর বয়স, যৌবনের কান্তিতে শরীর কাটিয়া পাড়িতেছে, রূপে ঘর আলো করিয়াছে, গা ভারয়া গহনা পরিয়া রূপাভিনিমিত্ত গৃহিণী গৃহ জমকাইয়া বসিয়াছে! বার্ষিক্যে রূপ-তৃষ্ণার্ত তারিণী-বাবু মনে করিলেন, “চাকরীর মুখে আশ্রয়, এবার নববধূকে লইয়া জীবন সার্থক করিব।” নব-বধূ মনে করিলেন, “এবার বুড়ো মিন্বেকে ঘরে পাইলাম, নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইব, কর্তাটি আর যাবেন কোথায়?”

উমার মা রোগাক্রান্ত, সংসার দেখিতে পারেন না, দু-বেলা ছুপেট খান, আর প্রায়ই আপনার ঘরে শুইয়া থাকেন। বিন্দু সর্বদাই জোঠাইমাকে দেখিতে যাইত, কিন্তু নববধূ তাহাতে মুখ ভার করিতেন। লোকের কাছে বলিতেন, “ওদের জাত গিয়েছে, ওদের আচার-ব্যবহার ভাল নয়, উহার ঘন ঘন আসা যাওয়া করিলে আমাদের নিন্দা হয়।” যে নম্রমুখী দরিদ্র-বালিকা নগ্নাবস্থায় বিন্দুর উঠানে সেদিন খেলা করিতে আসিত, আর একটি সন্দেসের জঙ্ক লালারিত হইত, সে এখন বড়ঘরের গৃহিণী, সম্পর্কে গুরু! তাহার এই কথা শুনিয়া বিন্দু গোপনে হাসিলেন, জোঠাইয়ার বাড়ী যাওয়া আসা কতকটা বন্ধ করিলেন।

উমার মার একটি পুরাতন দাসী ছিল, সে শুক্রবা করিত। বড় সত্যানের প্রতি

দাসীর এ মারা দেখিয়া নববধূ সে দাসীর প্রতি বিরক্ত হইলেন, অভিমানে স্নান চক্ষে জল আনিয়া লাল ঠোঁট ফুলাইয়া কর্তার কাছে লাগাইলেন, “আমার ঘর-সংসারের কাজ চলে না, আমি খেটে খেটে হাড় কালী করছি আর দিদি গিদে ঠেসান দিয়ে শুয়ে থাকেন, তাঁর দাসী না হ’লে চলে না। তা দিদিকে নিয়েই থাক, দিদি সংসার চালান, আমি বাপের বাড়ী চল্লেম।” বলা বাহুল্য, পুরাতন দাসী সেই দিনই বিদায় হইল। উমার মার মুখে জল দেয়, এমন একজন লোক রহিল না।

পড়ুসীর লোক সর্বদাই উমার মার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে আসিত, ছোট-মার মেজাজ ও ভাবগতিক দেখিয়া তাহারও আসা প্রায় বন্ধ করিল। উমার মার কাপড়-চোপড় ও পূজা-আছার খরচের জন্য তারিণী-বাবু আলাদা কিছু টাকা মাসে মাসে দিতেন, নববধুর চক্ষে জল দেখিয়া তাহাও বন্ধ করিলেন।

কিন্তু এত করিয়াও তারিণী-বাবু নব-বধুর মন পাইলেন না। স্নানরী গোপবালা স্বামীর নিকট সর্বদাই বিমর্ষ, সর্বদাই অভিমানিনী। সুবতী নাগরীর অভিমান-অশ্রুর প্রভাব গোপবালা জানিতেন, বুদ্ধিমতী সুবোগ পাইয়া এখন ধনকে সেই অশ্রু জড়িলেন।

বৃদ্ধ দেখিলেন, বর্ধমানের সাহেবদের চাকরী করা অপেক্ষা তরুণী ভার্য্যার পরিচর্যা বিষম কাজ। সে কার্য্যে বৃদ্ধ হাবুডুব খাইতে লাগিলেন, তবু ত তরুণীর মন উঠে না, মান ভাঙ্গে না। নূতন বস্ত্র, নূতন অলঙ্কার, নানা প্রকার উপাদেয় বস্তু দিয়া সে রাঙ্গা চরণের সেবা করিতেন, তবু ত সে রাঙ্গা চরণের প্রসাদ পান না। তালুক হইতে

তোড়া তোড়া টাকা আনিয়া দেন, তরুণী টাকাগুলি বাস্তে বন্ধ করিয়া মুখ কিরাইয়া বসেন। জিজ্ঞাসা করিল তরুণী কথা কহেন না অথবা ঘোর অভিমানে ব্যস্ত করিয়া বলেন, “তবু যে জিগগেস করুলে, এই আমার ভাগ্য। আমার প্রতি ত তোমার মায়্য নেই, মায়্য দিদির প্রতি! আমি গরিবের মেয়ে, আমাকে তামিল্য করবে না ত কি?” (ক্রন্দন)

বুড়ো চন্দ্রের জল মুছাইয়া বলিতেন, “সে কি, সে কি, তোমাকে মাথায় ক’রে রাখব,—তুমি কি আমার অশ্রুর ধন? কি করলে তুই হবে বল, আমি এখনই করছি।”

বিনাইয়া বিনাইয়া নবীনা বলিলেন, “ভা আমি মেরেমাছুব, কি করলে ভাল হয়, আমি কি রকমে জীব? ঐ চাটুযোদের বাড়ীর কর্তাটি বুড়ো বয়সে আবার একটা বিয়ে করেই কিছুদিন পরে তাঁর কাল হ’ল, ছোট মেরেটাকে সতীনের হাতে ফেলে গেলেন। বড় সতীন, তাকে উঠতে বসতে গাল দেয়, দিবারাত্রি মজুরের মত থাটায়, ভুবেলা খেতে দেয় না। ছোট বোটি যেন মড়ার মত হয়ে গিয়েছে—পথের কান্দালীর মত কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে; তা আমারও সেই দশা হবে। কেনই বা হবে না? কান্দালীর ঘরে জন্য, আমি পথে ভিক্ষা করব না ত কে করিবে?” (ক্রন্দন)।

তারিণী বাবু। সে কি? উমার মার মাধ্য কি তোমাকে কিছু বলে?

গৃহিণী। হাঁ, উমার মার ত আমার প্রতি বড় মায়্য! এখনই হুচকে দেখতে পারে না,—এর পরে আমাকে কি আর আশ্ব রাখবে? (ক্রন্দন)

এইরূপ প্রায়ই মধ্যে মধ্যে কাঁদাকাটি হইত, দিবারাত্রি অভিমান হইত, তারিণী-বাবু আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। গৃহিণীর কথা-বার্তার বুঝিলেন যে, গৃহিণী ভবিষ্যতের জন্য কিছু সংগ্রহ করিতে চাহে। এতটুকু মেরের পেটে এত বুদ্ধি কেমন করিয়া হইল, বুঝিতে পারিলেন না। তারিণী-বাবু জানিতেন না যে, গৃহিণীর পরামর্শদাতা পরম বুদ্ধিমান গোঁকুলচন্দ্র ঘন ঘন বর্জমান হইতে আসা-যাওয়া করিত এবং গোপনে ভগিনীর সহিত পরামর্শ করিত।

তরুণী ভার্য্যার তীব্র অভিমান ও অশ্র-জল দেখিয়া হৃদয়ে ধৈর্য্য ধরিতে পারে, এরূপ বীর-পুরুষ সংসারে অল্প। তারিণী-বাবুর মন ক্রমে টলিতে লাগিল, তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, “আমার ভাল-মন্দ হইলে কিছু বিষয় ছোট গৃহিণীর হাতে থাকে, এরূপ একটা বন্দোবস্ত করিয়া যাওয়া ভাল। উহাকে বিষয় দিব না ত কাহাকে দিব? সেই মাতাল জামাইটা শেষকালে সমস্ত বিষয়টা কাড়িয়া লইবে? না, না, সে কথা নহে, আমার প্রাণের গোপবালাকে কিছু দিয়া যাইব। আর যদি ছোট গৃহিণী দ্বারা আমার পুত্র-সন্তান হয়, তাহা হইলে ত সে-ই পাইবে, মাকে দেওয়াও বা, ছেলেকে দেওয়াও তাই।”

অনেক বিবেচনা করিয়া বৃদ্ধ বর্জমান গেলেন। তথায় উকীল-মোক্তারগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, রেজিষ্টারী-আগসি হাটাইটি করিয়া শেষে একখানি দলীল লইয়া বাড়ী আসিলেন এবং বাড়ীতে পৌঁছিয়াই নব-বধূর রাক্ষা চরণে পূজা দিতে আসিলেন। হাতগঙ্গদণ্ডের তরুণী ভার্য্যাকে সন্তোষ করিয়া দলীলখানা তাঁহার হস্তে দিলেন, মনে করিলেন, “এবার উড়া পাখী পিঞ্জরে

পুড়িলাম,—এ কুক-ময় এড়াইবার নহে, দেখিব, মন গলে কি না গলে।”

অভিমানিনী বধু স্বামীকে দিকে একবার কিরিয়াও চাহিল না।

তারিণী-বাবু। বলি, চূপ করে রইলে যে? বধু। তবে কি ক'রব?

তারিণী-বাবু। দলীলখানা কি জান?

বধু। কেমন করে জানব?

তারিণী-বাবু। এখানা উইল।

বধু। শুন্লেম।

তারিণী-বাবু। বড় মূল্যবান দলীল।

বধু। তোমার বাক্সে রেখে দাও।

তারিণী-বাবু। আমার ভাল-মন্দ হ'লে আমার বিজয়পুর তালুকখানি তোমারই হইবে।

বধু। আমার চাই না।

তারিণী-বাবু। সে কি? সে কি? এত অভিমান কিসের?

বধু। অভিমান আবার কি? যে মানে রেখেছ, ঢের হরছে।

তারিণী-বাবু অবাক হইয়া রহিলেন! বধু চক্ মুহিতে লাগিলেন।

তারিণী-বাবু দলীলখানি জোঁর করিয়া বধুহস্তে দিলেন। বধু দলীলখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া কেলিয়া ক্রোধে হনু হনু করিয়া চলিয়া গেলেন।

রাত্রি হইয়াছে। ছোট গৃহিণী খান নাই, দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়াছেন। তারিণী-বাবুর মাথার বজ্রাঘাত পড়িল। বৃদ্ধ বারম্বার কালীঘাটের কাকালার মত বসিয়া মিনতি করিতে লাগিলেন।

এক ঘণ্টা মিনতির পর দরজা খুলিল।

বধু বলিলেন, “আবার হাড় জালাতে এসে কেন?”

তারিণী-বাবু সেই রাক্ষা চরণ দুইটি

আপনার কলপ দেওয়া চুলের উপর স্থাপন করিয়া বলিলেন, “কি অপরাধ করেছে, বল ?”

বধূ। অপরাধ আবার কি ?

তারিণী-বাবু। দলীলখানা ছিঁড়লে কেন ?

বধূ। কি দলীল ?

তারিণী-বাবু। আমার প্রধান তালুকখানা তোমাকে উইল ক’রে দিয়েছিলেম।

বধূ। আর সম্প্রতি যে জমীদারী কিনেছে, সেটি বুকি, দিদিকে দেওয়া হবে ? তা দিদি তোমার নয়নের তারা, দিদি তোমার মাথার মণি,—দিদিকে সর্বস্ব দিয়ে বাও। আমি গরিবের মেয়ে, আমি তোমার চন্দুর শূল হয়েছি, আমাকে ভিখারীর মত তাড়িয়ে দাও, আমি গরিব মার কাছে চ’লে যাই। লোকের বাড়ী ধান ভেনে খাব, তবু তোমার অন্ন খাব না,—এ অপমান, এ লাঞ্ছনা, এ যাতনা আর সহ্য হয় না।

(ক্রন্দন)

তারিণী-বাবু বিস্মিত হইলেন ! তিনি সম্প্রতি একটি জমীদারীর অংশ নীলামে ক্রয় করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কথা গৃহিণীদের বলেন নাই। সে কথা গোপবালাকে কে বলিল ? নববধূ সেটিও চাহেন নাকি ? সর্বস্ব নববধূকে উইল করিয়া যাইলে উমার মার দশা কি হইবে ? এইরূপ নানা চিন্তা তারিণী-বাবুর হৃদয়ে উদয় হইতে লাগিল।

সেয়ানা মেয়ে গোপবালা স্বামীর মনের সম্বন্ধে বৃত্তিতে পারিয়া আবার উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া বলিল, “আমাকে ছেড়ে দাও, আমি পথের কাকালিনী হব, পথে ভিক্ষা ক’রে খাব। আমাতে তোমার বিশ্বাস নাই, তখন আমি এ বাড়ীতে থাকব না, গাছতলার গুহে থাকব। বাহার উপর বিশ্বাস আছে,

সেই দিদির কাছে বাও,—আমাকে ছেড়ে দাও, আর দত্ত ক’রে মেরো না।” রমণী আছাড় খাইয়া পড়িল—বুকি বা হিষ্টিরিয়া হয়, বড়মাহুষী ব্যারামটিও দরকারের সময় গোপবালার আসিত।

সে রাত্রির কথা অধিক বর্ণনায় আমরা অক্ষম। একদিকে তারিণী-বাবুর ভীষণ বিষয়কামনা, অল্পদিকে তরুণী ভার্য্যার ভয়ঙ্কর উপদ্রব,—আজি পথের ভিখারীও তারিণী-বাবুর অবস্থা দেখিলে দুঃখিত হইত। তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী ঘন ঘন অশ্রুবাণ, অভিমান-বাণ, ক্রন্দনবাণ, হিষ্টিরিয়া-বাণ, আবার মিনতি-বাণ, ভালবাসার বাণ দ্বারা বৃদ্ধের শরীর জর্জরিত করিলেন। কখন তর্জন-গর্জন, কখন সাধা-সাধনা, কখন বা মিনতি, কখন বা কত গল্প বলেন। কলিকাতার কত বড়মাহুষ সমস্ত বিষয় স্বীকে দিয়া গিয়াছেন, স্বামীর অবর্তমানে স্বী সুলন্দররূপে সংসার চালাইতেছেন। নারী কি বিশ্বাস-ঘাতিনী ? নারী কি স্বামীর সংসার, স্বামীর ঘর অবহেলা করিয়া জীবন-ধারণ করিতে পারে ? স্বামীর ঘর ভিন্ন নারীর কি অন্য ঘর এ জগতে আছে ?

সমস্ত রাত্রি এইরূপ যুদ্ধ চলিল। প্রাতঃ-কালে প্রথম আলোকছুটা পূর্বদিকে দেখা দিল, তখন বিষয়ী তারিণী-বাবু পরাস্ত হইলেন; বলিলেন, “হৃদয়ের ধন ! তোমাকে দিব না ত কাহাকে দিব ? আমার বখাসর্বস্ব তোমাকে লিখে দেব, তুমি বড় না আমার জমীদারী বড় ?”

সময়-বিজয়ী গোপবালা তখন নয়নের অশ্রু মুছিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া মাটি হইতে উঠাইয়া আপন পার্শ্বে স্থান দিলেন এবং রেহগগদ্বশে বলিলেন, “তুমিই আমার ধন, তুমিই আমার সর্বস্ব, তুমিই আমার জীবন ! বিষয় কি তুচ্ছ,—তোমার

তাহার তত্ত্ব জ্ঞানগ্রাহী বজ্র তা শুনি
কাতার কোন শিক্তি নোকে মন
ভূত হইয়াছে ? বহুনাথ-বাবুর
বালকদিগের উচ্চাভিলাষ, বহুনাথ-বাবুর
সহিত বজ্রতা করা বিষয়াদিগের
বহুনাথ-বাবুর সহিত সখ্য স্থাপন
কর্তাদিগের সুখস্বপ্ন !

উঁহার পশ্চাতে হাতকাটা
গরিয়া, সুবর্ণের চেন ঝুলাইয়া, হরিশঙ্কর
একটু একটু হাসিতেছেন । তিনি লোপ
লোক, ইংরাজী বড় জানেন না, উঁহা ছবৎসরে
ছুরী কেমন ! কোন্ ইংরাজীও
স্বায় চাকরী পাইয়াছে ? তিনি পরের কথা,
কেটা বাধিয়া আপিসে যান, সে স্বভাবতঃ
ইংরাজী কহেন, বড় বড় সাহেবের
পাত্র । প্রাচীন হিন্দু-সমাজেও এসে সেই
হরিশঙ্কর-বাবুর সাহেবের একা কেমন করে
হিন্দুসমাজ-সম্বন্ধে হরিশঙ্কর নেই, বজ্র-বাক্য
বেদ মনে করেন, হিন্দুর কাছে মনের কথা বলে ।
রীতি-নীতি বজ্রার রহ গিয়ে ছুটো কথা করে
কারণ মনে করেন,
হরিশঙ্কর-বাবুর উদ্ভব ভরসা হ'ল না । তুমি এক-
বাবু লোকটি বিচক্ষণতার যা কর্তব্য, তা কর, তার
চলিলেই লাভ, আছেন ।

অনুবর্তন করি 'পরদিন থাওয়া দাওয়ার পর
কলিল, ধর্মপুত্রকে সুধার কাছে রাখিয়া বিন্দু
ধর্মাবলম্বীকোন্টী করিয়া উমাকে দেখিতে
উপরে একটা সুখও উমাদিদির সঙ্গে দেখা
রীতিনীতির্ভ বাইবে বলিয়া উৎসব হইল, কিন্তু
সন্ধ্যায় সুবলিলেন, “আজ নয় বোন, আর এক-
গল্প করিয়াছি পানি, তোমাকে নিয়ে যাব ।”

প্রশংসা প্রকাশ শ্রবনকণ্ঠে গিয়া বিন্দু দেখিলেন,
উৎসব বহি একা বসিয়া একটি চুলের দড়ী বিনাই-
হরিশঙ্ক, দাস-দাসী সকলে নীচে আছে ।
সভ্যতার কে দেখিয়া বিন্দু শিহরিয়া উঠিলেন ।

এই কি সেই ভালপুকুরের উমা, বাহার
মোহনকর কথা বিন্দু-বিরিক্ত প্রচার হইয়া-
ছিল ? সুখের স্বং কাল হইয়া গিয়াছে,
স্বয়ং কালী পড়িয়াছে, কঠোর হাড় চুটা
রাখির হইয়া পড়িয়াছে, বাহ অভিশয় শীর্ণ,
শরীরখানি দড়ীর মত হইয়া গিয়াছে ।
চারিমােস পূর্বে বিন্দু বাহাকে প্রথম যৌব-
নের লাভাণে বিভূষিতা দেখিয়াছিলেন,
আজ তাহাকে জ্বিংশৎ বৎসরের রোগক্লিষ্টা
নারীর স্বায় বোধ হইতেছে । কঠোর হাড়ের
উপর দিয়া তারাহার লম্বমান রহিয়াছে,
বহুমূল্য বালা ছুগাছি সে শীর্ণ হস্তে চল চল
করিতেছে ।

উমা পদদ্বন্দ্ব স্তনিয়া স্নান চন্দ্র
সহিত পিছনে ফিরিয়া দেখিলেন । বিন্দুকে
দেখিয়াই চুলের দড়ী রাখিয়া উঠিলেন ।
স্নানবদনে ধীরে ধীরে কহিলেন, “আঃ, বিন্দু
দিদি, তুমি এসেছ, আমি কত দিন তোমার
কথা মনে করছি । তুমি ভাল আছ ?
ছেলেরা ভাল আছে ?”

সে ধীর কথাগুলি শুনিয়াই তীক্ষ্ণবুদ্ধি
বিন্দু উমার স্বয়ং অবস্থা ও তাহার চারি-
মাসের ইতিহাস অল্পভব করিলেন । বস্ত্রে
স্বয়ং উদ্বেগ সন্ধান করিয়া উহার হাত
ছুটি ধরিয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,
“হা বোন, আমরা সকলে ভাল আছি,
সুধার বড় জর হয়েছিল, তা সেও ভাল
হয়েছে । তুমি কেমন আছ উমা ?
তোমাকে একটু কাহিল দেখছি কেন
বোন ?”

উমা । ও কিছু নয় বিন্দু দিদি, আমারও
কল্ককতায় এসে আমাশা হয়েছিল, তা ভাল
হয়েছে, এখন একটু কাসি আছে, বোধ হয়,
কল্ককতায় জল আমাদের সর না, আমরা
ভালপুকুরেই ভাল থাকি ।

সেই নীরস ওষ্ঠে একটু কণ্ঠ হস্ত লক্ষিত হইল।

বিন্দু। তালপুকুরে আবার যেতে ইচ্ছে করে? আমরা এই পূজার পর বাই, তুমি যাবে কি?

উমা। তা সে ত আমার ইচ্ছে নয় বিন্দু দিদি, বাবু কি তাতে মত করবেন? বোধ হয় না।

বিন্দু। তবে তোমাকে এখানে দেখে যে শুনে কে? আমরা রইলাম অনেক দূরে, আর ছেলেদের কেলেণ্ড ত সর্বদা আসতে পারি না। তোমারও কান্না করেছে, রোগা হয়ে গেছে, তোমাকে দেখে কে?

উমা। কেন বিন্দু দিদি, রোজ ডাক্তার আসে, বাবু একজন ভাল-ডাক্তার রাখিয়ে দিয়েছেন। সে ওষুধ দিচ্ছে, আমি এখন ওষুধ খাই।

বিন্দু। তা যেম হ'ল, কিন্তু আপনার লোক না হ'লে কি দেখতে শুনে পারি? আর তোমার অন্তর হ'লে সংসারই দেখে কে? তা জ্যোতাইমাকে কেন লেখ না; তিনি এসে দিন কতক থাকুন। আবার তুমি একটু সারুলে তিনি চ'লে যাবেন। তুমি না হয়, দিন কতক গিয়ে তালপুকুরে থাকবে।

উমা। না, মাকে আর কেন আনান? আমার ব্যারামের বেশ চিকিৎসা হচ্ছে, আর সংসারে অনেক চাকর-লাসী আছে, কিছু অন্তরীধা হচ্ছে না, তা মাকে কেন ডাকান?

বিন্দু। না, তবু বোধ হয়, তেমন বড় হয় না, মায়ে যেমন বড় করে। তেমন কি আর কেউ পারে? চাকার হোক মার প্রাণ। তা ধনঞ্জয়-বাবু তোমাকে বড় করেন ত?

অঙ্গী কণ্ঠস্বরে উমা উত্তর করিলেন, “হা, তা আমার বধন বা আবৃত্তক, তখনই পাট; কিছুই অভাব নেই। বড় করেন বৈ কি।”

তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিন্দু দেখিলেন, অভিমানিনী উমা আপনার প্রকৃত বাতনার কথা কহিতে চাহে না, উমার ইহ-জগতে সুখ ও সুখের আশা ভ্রমসাৎ হইরাছে। বিন্দুই বা সে কথা কিরূপে জিজ্ঞাসা করেন? কণ্ঠক চিন্তা করিয়া কহিলেন, “না উমা, আমার বোধ হয়, জ্যোতাইমা এখানে এসে করেক দিন থাকলে ভাল হয়। দেখ, সুখ-দুঃখ ব্যারামস্তারাম আমাদের সকলেরই আছে, ব্যারামের সময় আপনার লোক বতটা করে, পরে কি ততটা করে? এই সুখার ব্যারাম হ'ল, বাবু ছিলেন, শরৎ ছিল, কত বড়, কত শুশ্রূষা করলে, তবে আরাম হ'ল। তুমিও বোন বড় কাহিল হয়ে গেছ, সর্বদা কাসছ, এখন থেকে একটু বড় নেওয়া ভাল। তা আমার কথা রাখ বোন, জ্যোতাইমাকে আজই চিঠি লেখ, না হয় আমার বল, আমি লিখি। আহা উমা, তুমি কি ছিলে বোন, আর কি হয়ে গেছে।” এই বলিয়া বিন্দু সম্মুখে উমার কপালে হাত বুলাইয়া কপাল থেকে চুলগুলি সরাইয়া দিলেন।

এইটুকু স্নেহ উমা অনেক দিন পায়, তাই, এইটুকুতে তাহার হৃদয় উথলিল, চক্ষু দুইটি ছল ছল করিল, একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উমা ধীরে ধীরে বলিলেন “বিন্দু দিদি, তুমি আমাকে লেবেলা থেকে বড় ভালবাস—” আর কথা বাহির হইল না, উমা চক্ষুর জল অঞ্চল দিয়া মুছিলেন।

বিন্দু অতিশয় স্নেহের ভাষায় বলিলেন, “উমা, তুমি কি আমাকে ভালবাস না?”

উমা। বাসি, বতদিন বাঁচব, তোমাকে ভালবাসব।

বিন্দু। তবে বোন, আজ আমার কাছে এত গোপন চেষ্টা কেন? তোমার মনের দুঃখ কি আমি বুঝিনি? জগতে তোমার

সুখের আশা শেষ হয়েছে, তা কি আমি বুঝিনি ? বিবাহের পর বে প্রণয়ে তুমি ভাসতে, আমার সঙ্গে দেখা হইলেই যে কথা আমাকে বলতে, যে প্রণয়স্বপ্ন শেষ হয়েছে, তা কি আমি বুঝিনি ? উমা, তুমি এ সব কথা আমার নিকট কেন লুকাচ্ছ ? আমি কি পর ? প্রাণের উমা, তুমি আমি যদি পর হই, তবে ভগতে আপনার লোক কে আছে ?

এ শ্রেহবাক্য উমা সঙ্গ করিতে পারিল না, নয়ন দিগা বর্ষ করিয়া বারি বহিতে লাগিল, প্রাণের বিন্দু দিদির হৃদয়ে মুখখানি লুকাইয়া অভাগিনী একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল ।

অশ্রুসিক্ত মুখখানি ধীরে ধীরে তুলিয়া উমা ক্ষীণস্বরে বলিলেন, “বিন্দু দিদি, তোমার কাছে আমি কখনও কিছু গোপন করিনি, কখনও করব না । কিস্তি আজ কমা কর, এ সব কথা আমি একদিন বলব ।”

বিন্দু । উমা, আমি আজই শুন্ব, মনের দুঃখ মনে রাখলে অধিক ক্লেশ হয়, আপনার লোকের কাছে বললে একটু শান্তি বোধ হয় ।

উমা । কি বলব বল ?

বিন্দু । আমি জিজ্ঞাসা করেছিলেম, ধন-জর-বাবু কি এখন তেমন ব্যস্ত করেন ?

উমা । বিন্দু দিদি, আমার বখন বা দরকার হয়, সবই পাই, আবার রোগের চিকিৎসা করাতেন, যত্ন নেই কেমন করে বলব ?

বিন্দু । উমা, তুমি কি আমাকে পুরুষ-মাহুয পেয়েছ যে, ঐ কথাই ভুলাচ্ছ ? ভাত-কাপড় ও ওষুধ কি আমার যত্ন ? আমি সে যত্নের কথা বলিনি । ধনজর-বাবু কি পূর্বের মত তোমাকে স্নেহ করেন, পূর্বের মত মন খুলে তোমাকে ভালবাসেন, পূর্বের মত কি তোমার ভালবাসার স্বীকৃতি হন ?

উমা, মেয়েমাহুযের কাছে মেয়ে মাহুযের কি এ কথাগুলি খুলে জিজ্ঞাসা করিতে হয় ? স্বামীর যে স্নেহ ধনবতী স্ত্রীর ধন, দরিদ্র নারীর সুখ, সকল মেয়েমাহুযের জীবন, সে স্নেহটি কি তোমার কাছে ?

হতভাগিনী উমা “না” কথাটি উচ্চারণ করিতে পারিলেন না, কেবল মাথা নাড়িলে সেই কথার উত্তর করিয়া মাথাটি আবার বিন্দুর বুকে লুকাইলেন ।

বিন্দুর মুখ গভীর হইল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, “উমা, সে ধনটি হারালে ত চলবে না, সে ধনটি রাখবার জন্তে কি তুমি বিশেষ চেষ্টা করেছিলে ?”

উমা । ভগবান্ জানেন, আবার ভাল-বাসা কমেনি, তাঁকে এখনও চক্ষে দেখলে আমার শরীর জুড়ায় ।

বিন্দু । উমা, তোমার ভালবাসা আমি জানি, তুমি পতিব্রতা ও জীবনে তোমার ভালবাসা হ্রাস হবেনা । কিন্তু দেখ বোন্, কেবল ভালবাসায় স্বামীর স্নেহ থাকে না, সংসারও চলে না । মেয়েমাহুযের আরও কিছু কর্তব্য আছে, আমাদের আর কিছু শিখতে হয় ।

উমা । বিন্দু দিদি, বিনি আমাদের খেতে পড়তে দেন, বিনি আমাদের প্রণয় শুরু, তাঁকে ভালবাসা ছাড়া আর কি দিতে পারি ? ভালবাসা ভিন্ন নারীর আর কি স্নেহ আছে ?

বিন্দু । উমা, ভালবাসাই আমাদের প্রথম ধর্ম, কিস্তি তা ভিন্ন আমাদের আরও কিছু শিখতে হয় । তা না হ’লে সংসার চলে না । বিনি আমাদের জন্তে এত করেন, তাঁর মনটি সর্বদা ভুট্ট রাখবার জন্তে, তাঁর গৃহটি সর্বদা প্রফুল্ল রাখবার জন্তে, আমরা যেন একটু ব্যস্ত করিতে শিখি অনেক সময়

একটি মিষ্ট কথার কোভ নিবারণ হয়, একটি মিষ্ট কথার ক্রোধশান্তি হয়, আমাদের একটু বড় ও প্রফুল্লতার সংসারটি প্রফুল্ল থাকে। সংসারের জালা যদি একটু সহ্য করতে শিখি, ক্রোধ একটু সংবরণ করতে শিখি, অভিমান একটু ত্যাগ করে ক্ষমা-গুণ শিখি, তা হ'লে সংসারটি বজায় থাকে, না হ'লে জীবন তিক্ত হয়। উমা, আমি অনেক নির্দোষচরিত্র পুরুষ ও নির্দোষচরিত্রা নারী দেখেছি, তাদের ভালবাসারও অভাব নেই, তথাপি তাদের সংসার অশানভূমি, জীবন তিক্ত। একটু ধৈর্য্য, একটু ক্ষমা সংসারের পথকে মসৃণ করে, সে গুণগুলির অভাবে উৎকৃষ্ট সংসারও কটকমর হয়, তখন তাঁরা মনে করেন, পূর্বে হ'তে একটু বড় করলে এ জীবনে কত সুখ হ'তে পারত। কিন্তু তখন জন্মের চ'লে গেছে। প্রণয় একবার ধ্বংস হ'লে আর আসে না, জীবনের খেলা একবার সাক্ষ হ'লে আর সে খেলা আরম্ভ করতে আমাদের অধিকার নেই।

উমা। বিলু দিদি, তোমারই কাছে বাল্যকালে এ কথাটি আমি শুনেছিলাম, ভালপুরুষে তোমাদের দরিদ্র সংসার দে'খে এ শিক্ষাটি আমি শিখেছি, ভগবান জানেন, এতে আমার কোন ত্রুটি হয়নি। লোকে আমাকে ধনাভিমানিনী বলত, কিন্তু যিনি আমার গুরু, তিনিই আমাকে সর্বদা মুক্তা-হার ও হীরকাভরণ পরতে দেখতে ভালবাসতেন, সেই জন্তে আমি পবিত্র, এই-রাত্রি আমার অভিমান। লোকে আমাকে রূপাভিমানিনী বলত, কিন্তু দিদি, তুমি জান, সে রূপে আমি একদিন তুষ্ট ছিলেন, সেই জন্তে আমার অভিমান। তাঁকে তুষ্ট রাখা ভিন্ন আমার জীবনের অন্য ইচ্ছা ছিল না। বধন কল্লভের এলেন, তখন

আমি এই বড় দ্বিগুণ করলেম, কেন না, আমি ভিন্ন এ বাড়ীতে আর মেয়েমাহুষ ছিল না, আমি যদি একটু বড় না করি, কে করবে বল?

বিলু। উমা, তুমি বে একটু করবে, তা আমি জানতেম, তোমাকে ছেলেবেলা থেকে আমি জানতেম, অস্ত্রে তোমাকে দোষ দিয়েছে, আমি দোষ দিই মি। বৈধ্যা, ক্ষমা, একটু বড়, মেহ ও প্রফুল্লতাই আমাদের কর্তব্য, এগুলি তুমি শিখেছ, সকলে শিখে না। পূর্বকালে আমরা বড় বড় সংসারে বৌ-মাহুষ হয়ে থাকতেম, স্বাস্থ্য ও নন্দনের ভয়ে, জায়ের ভয়ে, আমাদের স্বাভাবিক ঔদ্ধত্য অনেক চাপা পড়ত। আমরা মুখ বন্ধ করে থাকতেম, স্বাস্থ্যভীর আদর্শে সংসার চলত। এখন সবাই পৃথক পৃথক থাকতে শিখেছে, ছেলেরাও যা ইচ্ছা করে, বোরেরাও আপনাদের কর্তব্য ভুলে যায়, সংসারস্থ অনার্য্যাসে বিনষ্ট হয়।

উমা। বিলু দিদি, আমারও অনেক সময় মনে হয়, সকলে একত্রে থাকবার প্রথাই ভাল ছিল, ছেলেরা শীঘ্র কুপথে যেতে পারত না, মেয়েরাও নন্দ্রতা শিখত।

বিলু। উমা, সুখ-দুঃখ সকল প্রধাতেই আছে। কালীতারা বৃহৎ পরিবারে আছে, আহা! কালী কি সুখে আছে? একত্র বাস করবার কি এই সুখ?

উমা। কালীদিবির দুঃখের অন্ত কারণ বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে বিবাহ হয়েছে, সে চির-জীবন প্রণয়স্থখে বঞ্চিত।

বিলু। আমি প্রণয়স্থখের কথা বলছি না। প্রত্যাহ সকাল থেকে দুপুররাত্রি পর্য্যন্ত পথের মুঠের চেয়েও খেটে খেটে যে সে রোগগ্রস্ত হয়েছে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত

যে নির্দোষে পথের কাকালী অপেক্ষাও গল্পনা
ও গালি খায়, তার কারণ কি ?

উমা । বিন্দু দিদি, কালীদিদির খুঁড়-
বাগড়ীরা মন্দ লোক, সেই জন্যে ।

বিন্দু । তা বড় সংসারে সকলেই যে
ভাল লোক হবে, তারই সম্ভাবনা কি ? এক-
জন মন্দ হলোই সংসার তিক্ত হয়, সমস্ত দিন
খিটনাটি ও কোন্দল ; যে কালীতারার মত
ভালমানুষ, তারই অধিক বাতনা । এই সব
দেখে, বাদের একটু টাকা হয়, তারা ভিন্ন
থাকতে চায়, না হ'লে আপনার লোক কে
ইচ্ছে ক'রে ত্যাগ ক'রে বসে । তা ভিন্ন
থেকেও যদি আমাদের বার বেটুকু করা
আবশ্যক, তাই করি, বাগড়ীর ভয়ে বেটুকু
শিখতেম, সেইটুকু যদি নিজ বুদ্ধিতে শিখি,
তা হ'লেও সংসারে অনেকটা সুখ থাকে ।
এখনকার মেয়েরা এটি বড় শিখে না, কালে
বোধ হয় শিখবে ।

এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে
রাতার জুড়ীর শব্দ হইল, একখানি গাড়ী
আসিয়া ফটকে দাঁড়াইল । উমা তাহা র অর্থ
বুলিলেন, স্ত্রত্যং দেখিতে উঠিলেন না, বিন্দু
গবাক্ষের নিকট বাইরা দেখিতে লাগিলেন ।
বাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার নরন হইতে
বুঝ বুঝ করিয়া জল পড়িতে লাগিল । ধনঞ্জয়-
বাবু বাগান হইতে আসিলেন । তাঁহার বেশ-
ভূষা বিশৃঙ্খল, তিনি নিজে অচেতন, দুই জন
ভৃত্য তাঁকে গাড়ী হইতে উপরে উঠাইয়া
নুইয়া গেল ।

বুঝ বুঝ করিয়া চক্ষুর জল ফেলিতে
ফেলিতে হিন্দু উমাকে দুই হস্তে আপনার
বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন, "উমা,
ভগবান্ জানেন, নারীর যতদূর কষ্ট হয় ।
তুমি তা সহ্য করুছ, সেই কষ্টে উমা
আর উমা নেই, বোধ হয়, রাত্রে জেগে,

না খেয়ে, কেঁদে কেঁদে তোমার এই দশা
হয়েছে, রোগও হয়েছে । কি করবে বোন,
যদি সহিতে হয়, সয়ে থাক, যত্নের ক্রটি
করো না, অভিমান দেখিও না, একটি
উচ্চকথা করো না, তা হ'লে আরও
মন্দ হবে, এ রোগের সে ওষুধ নয় ।
নীচবে এ বাতনা সহ্য কর, যখন অবকাশ
পাবে, মিষ্টকথার ধনঞ্জয়-বাবুকে ভুট্টে করো,
কথায় বা ইচ্ছিতে তিরস্কার করো না, কাঁদতে
হয়, গোপনে কাঁদবে । বাদের নিজে ধনঞ্জয়-
বাবু এখন এত সুখ অলুভব করেন, হয় ত
কাল তাদের উপর বিরক্ত হবেন । পরম
অসদাচারীও অসদাচার পরিত্যাগ ক'রে
আবার পবিত্র ব্রহ্ম সংসারসুখ খুঁজছে,
এমনও আমি দেখেছি । তোমার মাকে
আমি আজই চিঠি লিখব, ধৈর্য ধারণ ক'রে
আশার ভর ক'রে থাক । প্রাণের উমা, ভগ-
বান্ এখনও তোমার কষ্ট মোচন করিতে
পারেন, তোমাকে সুখ দিনে পারেন ।

দুই ভগিনীতে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া
অনেকক্ষণ রোদন করিলেন । উমা বিন্দুর
কথায় কোন উত্তর দিলেন না, মনে মনে
ভাবিলেন,—ভগবান্ একটি সুখ আমাকে
হিতে পাবেন—মৃত্যু ।

— — —

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।

— — —

আর একজন হতভাগিনী ।

বন্দু বাটী আসিয়া পাণ্ডী হইতে না
নামিতে নামিতে সুখা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া
আসিয়া বলিল, "দিদি, দিদি, কে এসেছে,
দেখবে এস ।"

বিন্দু । কে লো ?

সুধা। এই দেখবে এস না, এই শোবার
ঘরে বসে আছে।

বিন্দু। কে, শরৎ-বাবু?

সুধা। না, শরৎ-বাবু নয়। দিদি, শরৎ-
বাবু এখন আর আসেন না কেন?

বিন্দু। শরৎ-বাবুর কি পড়া-শুনা নেই?
তার পরীক্ষা কাছে, সে কি রোজ আসতে
পারে?

সুধা। পরীক্ষা কবে দিদি?

বিন্দু। এই শীতকালে!

সুধা। তার পর আসবে ন?

বিন্দু। আসবে বৈ কি বোন, এখনও
আসবে। তবে রোজ রোজ কি আসতে
পারে? যে দিন অবকাশ পাবে, আসবে।
উপরে কে বসে আছে?

সুধা। কে বলানা?

বিন্দু। চন্দ্রনাথ-বাবুর স্ত্রী এসেছেন
না কি? তিনি ত মধ্যে মধ্যে আসেন, আর
কে আসবে?

সুধা। না, তিনি নন।

বিন্দু। বুদ্ধি দেবী-বাবুর স্ত্রী?
এতদিন পর বুদ্ধি তিনি একবার অচ্যুগ্রহ
ক'রে পদধূলি দিলেন?

সুধা। না, তিনিও নন, কালীদিদি
এসেছে।

বিন্দু। কালীতারা? তারা কল্কুেতার
এসেছে, কৈ, কিছুই ত জানি না।

এই বলিতে বলিতে উপরে আসিয়া
বিন্দু কালীতারাকে দেখিলেন। অনেক দিন
পর তাহাকে দেখিয়া বড় ভীত হইলেন;
বলিলেন, “এ কি, কালীতারা! কল্-
কুেতার কবে এলে? তোমরা সকলে ভাল
আছ?”

কালী। এই পাঁচ সাত দিন হ'ল এসেছি,
এতদিন কাজের ঝন্টটে আসতে পারিনি,

আজ একবার যেজো খুড়ীকে অনেক ক'রে
ব'লে করে এলেম। ভাল নেই।

বিন্দু। কেন, কারও ব্যারাম হয়েছে
না কি?

কালী। বাবুর বড় ব্যারাম, তাঁরই চিকিৎসা
সার জন্তে আমরা কল্কুেতার এসেছি।
বর্ধমানের এত চিকিৎসা করালেন, কিছুই হ'ল
না, এখন কল্কুেতার ইংরাজ ডাক্তার দেখ-
ছেন, ভগবানের যা ইচ্ছে।” এই বলিয়া
কালীতারা রোদন করিতে লাগিলেন।

বিন্দু। সে কি? কি ব্যারাম?

কালী। অর আর আমাশা। সে অরও
ছাড়ে না, সে আমাশাও বন্ধ হয় না। আহা!
তাঁর শরীরখানা যেন কাঠিপানা হয়ে গেছে!
আবার চুন্ধুতে বস্ত্র দিয়া কালীতারা
ফোপাইতে লাগিলেন।

বিন্দু তা কঁাদ কেন বোন, কঁাদলে
আর কি হবে বল! এখন ভাল ক'রে
চিকিৎসা করাও। ব্যারাম হয়েছে, ভাল হয়ে
যাবে। স্ত্রী কবিরাজ দেখাচ্ছে না কেন?
পুরাণ জন্ত আর আমাশায় কবিরাজ যেমন
চিকিৎসা করে, ইংরেজ ডাক্তারে তেমন কি
পারে?

কালী। কবিরাজ দেখাতে কি বাকি
রেখেছে বিন্দু, কবিরাজে হার মেনেছে,
তবে ইংরেজ ডাক্তার তেকেছে। বর্ধমানে
তিন মাস থেকে ভাল ভাল কবিরাজ দেখান
হয়েছে, কল্কুেতা থেকে ভাল ভাল কবিরাজ
গিয়েছিল, কিছু করতে পারলে না।

বিন্দু। তবে দেখ বোন, ইংরেজী চিকিৎসা
সার কি হয়! তোমরা আছ কোথায়?

কালী। কালীঘাটে একটি বাড়ী নিয়েছি,
ষ্টিক আদি-গন্ধার কিনারায়।

বিন্দু। কালীঘাটে কেন? এই বর্ধাকালে
কালীঘাটে শুনেছি অনেক ব্যারাম হচ্ছে,

সেখানে না থেকে একটু কাঁকা জায়গায়
রইলে না কেন ?

কালী। তাও কি হয় যদি ? ওঁরা
কল্ককেতার আস্তে চান না, বলেন, এখানে
বাছ-বিচার নেই, এখানে জাত থাকে না।
শেষে কত ক'রে কালীঘাটের একজন
পাণ্ডাকে দিয়ে একটি বাড়ী ঠিক ক'রে তবে
আমরা এলেম। রোজ আদিপুজার আমাদের
মান হয়, রোজ পূজা দেওয়া হয়। কত ক্রিয়া-
কর্ম, ঠাকুরকে কত মানত করা হয়েছে,
আমার খাণ্ডুড়ী বোড়া মহিষ যেনেছেন,
আমার কি আছে বিন্দু দিদি, আমার রূপার
গোট ছড়াটি বেচে বোড়া পাটা দেব
মেনেছি। আহা, ঠাকুর যদি রক্ষা করেন,
বাবুকে যদি এ যাত্রা বাঁচান, তবেই আমরা
বাঁচলেম, নৈলে আমাদের এত বড় সংসার
ছারখার হয়ে যাবে। আমাদের মান বল,
ধন বল, বিষয় বল, খ্যাতি বল, কুলের
গৌরব বল, বাবুর হাতেই সব ; তিনিই সক-
লের মাথা, তিনি একাই সব করুছেন ক'থা-
ছেন, তিনিই সব চালিয়ে নিচ্ছেন, তিনি
না থাকলে আমাদের কে আছে বল ?
ডগবানু ! এ কাদালিনীকে চির-হতভাগিনী
করো না।

আজীবন যে স্বামীর প্রণয়সুখ কখনও
ভোগ করে নাই, প্রণয়সুখ কাহাকে বলে,
জানিত না। আজি সে স্বামী-বিরোগ-চিত্তার
বাতনার লুপ্ত হইল !

বিন্দু কালীকে অনেক করিয়া সাধনা
করিলেন ; বলিলেন, “ভর কি বোন, চিকিৎসা
হচ্ছে, তবে আর ভর কি ? আমাদের
বাবু আছেন, ভোমার ভাই শরৎ-বাবু
আছেন, সকলে দেখবে শুনবে, পীড়া শীঘ্র
আরম্য হবে। এই সুধার এমন ব্যায়রাম
হয়েছিল, শরৎ-বাবু কত বয় করলেন, দিন-

রাত্রি ষাণ্ডরা ঘুম ছেড়ে সেবা করলেন, তাই
রক্ষা, না হ'লে কি সুধা বাঁচত ?”

কালী। বিন্দু দিদি, শরৎ রোজ এখানে
আসে ?

বিন্দু। আগে আসত বোন, এখন তার
পরীক্ষা কাছে, তাই আসতে পারে না,
বাবুই বুঝি তাকে একটু ভাল ক'রে লেখা-
পড়া করুতে বলেছেন ; প্রায় একমাস অবধি
আসে নি।

কালী। বিন্দু দিদি, মধ্যে মধ্যে তাকে
আসতে বলো, এখানে মধ্যে মধ্যে এসে গল্প-
সল্প করলে থাকুরে ভাল, আহা, দিন-রাত
পড়ে পড়ে শরতের চেহারা কালী হয়ে
গেছে, চক্ষু ব'সে গেছে। কাল সে এসেছিল,
হঠাৎ চেনা যায় না।

বিন্দু। সে কি কালী, কৈ, তা আমরা
কিছু জানি না। এখানে যখন আসত, তখন
বেশ চেহারা ছিল, এর মধ্যে এমন হয়ে
গেছে ? এমন করেও পড়ে ? না হয় পরীক্ষা
নাই হ'ল, তাই বু'লে কি পড়ে ব্যায়রাম করবে ?
আমি বাবুকে বলব এখন, শরৎ-বাবুকে
একদিন ডেকে আনবেন, মধ্যে মধ্যে শনি-
বার কি রবিবার এখানেই না হয় থাকলো।

তাহার পর উমাতারার কথা হইল। বিন্দু
বাহা বাহা দেখিয়াছিলেন, অনেক আক্ষেপ
করিয়া কালীকে তাহা শুনাইলেন, কালীও
খানিক কাদিলেন। বিন্দু শেষে বলিলেন,
“আমি আজই জ্যোঠাইবাকে চিঠি লিখব,
জ্যোঠাইমা আনুন, যা করবার করুন, আমি
আর একটু দেখতে পারি না। কল্ককেতা
ছাড়তে পারলে বাঁচি, আবার ভালপুত্রের
বেতে পারলে বাঁচি।”

কালী। তোদের এই ডাক্র মাসে বাবার
কথা ছিল না ? ডাক্র মাস ত প্রায় শেষ
হ'ল।

বিন্দু। কথা ত ছিল, কিন্তু হয়ে উঠল কে? আবার উমাতারার এই রোগ, তোমাদের বাড়ীতে রোগ, এ সব রেখে ত যেতে পারিনি? পূজার পর না হ'লে আমাদের বাড়ী হাছে না, পূজারও বড় দেবী নেই, মাসখানেকও নেই।

কালী। তবে তোমাদের খানটান দেখবে কে?

বিন্দু। বাবু সনাতনকে জমী ভাগে দিয়ে এসেছেন। সনাতন আমাদের পুরাতন লোক, আমাদের অংশ গোলায় বন্ধ ক'রে রাখবে, তার কোন ভাবনা নেই।

আর কতক্ষণ কথাবার্তার পর কালীতার। চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় হেমচন্দ্র বাটী আসিলেন। বিন্দু কিছু জল খাবার আনিয়া দিলেন এবং উভয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

হেম। এদিকে উমাতারার রোগ ও দুর্দশা, ওদিকে কলিকাতার স্বামীর উৎকট পীড়া, আবার ভূমি বন্ড, শরৎও না কি ছেলেমানুষের মত শরীরের বন্ধ না নিয়ে পড়াশুনা করছে। এখন কোন্ দিক সামলাই? উপায় কি? বিপদে ভূমিই মন্ত্রী, এর উপায় কি ঠিক করছে?

বিন্দু। ললাটের লিখন বাজার সৈন্তও কিরার না, মন্ত্রীর বহুবারও কিরার না। তবে আমাদের বা সাধ্য, তা করব।

হেম। তবু কি ঠিক করলে? উমাকে কি ব'লে এলে?

বিন্দু। কি আর বলব? আমার ঘটে যেটুকু বৃদ্ধি আছে, তাই দিয়ে এলেম, এখনকার চকলমতি স্বামীকে বশ করবার যে মন্ত্রটি জানি, তাই শিখিয়ে এলেম।

হেম। সে ভীষণ মন্ত্রটি কি, আমি জানতে পারি কি?

বিন্দু। জানবে না কেন? উমার বাড়ীতে বড় একটি কাঠালগাছ আছে, তারই ডাল নিয়ে প্রকাণ্ড একটি মৃগের প্রস্তত ক'রে বিপথগামী স্বামীকে তদ্বারা বিশেষরূপে শিক্ষা দেওয়া। এই মহামন্ত্র!

হেম। না, বৃহস্পতির এরূপ মন্ত্র নয়।

বিন্দু। তবে কিরূপ?

হেম। কচি আঁবের অখল রেঁধে দেওয়া, পাকা আঁবের স্মিষ্ট রস ক'রে দেওয়া, বৃহস্পতির মন্ত্রের এইরূপ কয়েকটি সাধন দেখেছি, আর বেশী বড় জানি না।

বিন্দু। তবে তাই শিখিয়ে এসেছি। আর জ্যোতাইমাকে পত্র লিখব, তিনি এলে বোধ হয়, উমার মনও একটু ভাল হবে, ধনঞ্জয়-বাবুও লজ্জার খাতিরে কয়েক মাস একটু সাবধানে থাকবেন।

হেম। জ্যোতাইমা জামাইয়ের বাড়ীতে আসবেন কেন?

বিন্দু। আমি সব কথা লিখলে আসবেন। হাজার হোক মার মন।

হেম। আর কালীতারার কি উপায় করলে?

বিন্দু। সেটি তোমাকে দেখতে হবে। তোমার চাকরী টাকরী ত বিলক্ষণ হ'ল, এখন প্রত্যহ একবার ক'রে কালীঘাটে গিয়ে রোগীর বস্ত্র করুতে হবে। সে বাড়ীতে মাহুঘের মত মাহুঘ একজনও নেই, হয় ত ঠাকুরবাড়ীর প্রাসাদগুলা খাইয়ে রোগীর রোগ আরও উৎকট করবে, চিকিৎসাটি বাতে ভাল ক'রে হয়, ভূমি দেখো।

হেম। তা আমার বা সাধ্য করব। কা'ল প্রভাতেই সেখানে যাব। আর শরতের কি বন্দোবস্ত করলে? ভূমি রইলে একদিকে, আমি রইলেম আর একদিকে, শরৎ-বাবুকে একটু দেখে শুনে কে?

বিন্দু। তাই ত, সে পাশ লা ছেলেটার কথা কৈ আমি ভাবিনি। ওলো সুখা, তুই একটু শরৎবাবুর যত্ন-টক্কর কবুতে পাবুবি? নৈলে ত সে পড়ে পড়ে সারা হ'ল।

সুখা দূরে থেলা করিতেছিল, দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল, “দিদি ডাকছিলে?”

বিন্দু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “হাঁ বোন, ডাকছিলেম। বলি, তুমি শরৎ-বাবুর একটু যত্ন কবুতে পাবুবে?”

বালিকার কণ্ঠ হঠাৎ লগাট-প্রদেহ পর্য্যন্ত রঞ্জিত হইল। সে দৌড়াইয়া পলাইয়া গেল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

শারদীয়া পূজা।

আখিনে অধিকাংশ পূজার সময় আগন্ত হইতে লাগিল। ছেলেগুলোর বড় আয়োজন। নতুন কাগড় হইবে, নতুন জুতা হইবে, নতুন পোষাক বা টুপী হইবে, ইত্যূলের ছুটি হইবে, পূজার সময় যাত্রা হইবে, ভাসানের দিন বালকবৃন্দ আক্লাদে আটখানা।

গৃহস্থগৃহিণীদিগের আনন্দের সীমা নাই। কেহ বড় ভবের আয়োজন করিতেছেন, নতুন জামাইকে ভাল রকম তত্ত্ব করিয়া বেরানের মন রাখিবেন। কেহ বড় তত্ত্ব প্রত্যাশা করিতেছেন, পানকরা ছেলের বিবাহ দিয়া অনেক অর্থ লাভ করিতেছেন, ঘড়ী, ঘড়ীর চেন, ধারাপ হইয়াছিল বলিয়া তাহা টানিয়া কেলিয়া দিয়া বেরানের গোট বেড়াইয়া ভাল ঘড়ী আদায় করিয়াছেন, আবার অপরাহ্নে ছাদে পা থেলাইয়া ধসিয়া

বুদ্ধিমতী পড়সী-গৃহিণীদিগের সহিত পরামর্শ করিতেছেন, “এবার দেখু, বেরান কেমন তত্ত্ব করে, যদি তত্ত্বের মত তত্ত্ব না করে, লাখি ঘরে কে'লে দেব। বিয়ের সময় বড় ফাঁকি দিয়েছে, এবার দেখু, কে ফাঁকি দেয়। আমার ছেলে কি বানের জলে ভেসে এসেছে, এমন ছেলে কল্কৈতার কটা আছে? মিন্‌বের যেমন বাহাতুরে ধরেছে, এমন ছেলেরও এমন ঘরে বিয়ে দেয়! তা দেখু, দেখু, তত্ত্বের সময় কড়াগুতা বুঝে নেব, নৈলে আমি কারেতের মেরে নই।” রোক্ত-মানা বালবধু বাপের বাড়ী বাবার স্ত্রী তিন মাস হইতে বুঝা ক্রন্দন করিতেছে, গৃহিণী তত্ত্বটি না দেখিয়া বো পাঠাইবেন না।

সামান্ত ঘরের যুবতীগণও দিন গণিতেছে, স্বামী বিদেশে চাকরী করেন, পূজার সময় অনেক কষ্টে ছুটি পাংরা একবার ভাষ্যার মুখদর্শন করেন। এবার কি তিনি আসিবেন, সাহেব কি এবার ছুটি দিবেন? ইয়া গা, সাহেবদের কি একটু দয়া-মমতা নাই? তাঁদেরও কি স্বামী-পরিবারের জন্য একটু মন কেমন করে না?

বাবু-বহলেও আনন্দের সীমা নাই। কাহারও বজরা ভাড়া হইতেছে, নাচ-গানের ভাল রকম আয়োজন হইতেছে, আর কত কি আয়োজন হইতেছে, আমরা তাহা কিরূপে জানিব? আদার বাপারী আহারের খবরে কাজ কি?

গল্পাটোমেও আনন্দের সীমা নাই। মাতা বসুমতীর অল্পগ্রহ অপার, কৃষকগণ ভাত্র মাসে শস্ত কাটিয়া জমিদারের খাজানা দিতেছে, মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিতেছে, বৎসরের মধ্যে এক মাস বা দুই মাসের জন্য গৃহে একটু ধান জমাইতেছে। কৃষকবৃন্দ গোপনে চোরের মত সেই ধান

একটু সরাইয়া থাকেই দুসাহসি শাঁকা করিতেছে বা হাটে একখানি নুতন কাগড় কিনিতেছে। বর্ষার পর সুন্দর বস্ত্রবিশেষ বেন স্নাত হইয়া সুন্দর হরিষর্ষ বেশ ধারণ করিল; আকাশ মেঘরূপ কলঙ্ক ত্যাগ করিয়া শরৎের ঐ আহলাদকর ছোৎনা বর্ণন করিতে লাগিল। বায়ু নির্মল হইল, বড় গরম নহে, বড় শীতল নহে, মন্থবায়ুরীরের সুখবর্জন করিয়া মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল। গৃহস্থের ঘরও ধনদ্বায়ে পূর্ণ হইল, গৃহস্থের মন একটু আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, চালে নুতন খড় দিয়া ছাউনি বাঁধা হইল। বঙ্গদেশে শারদীয়া পূজার যে এত ধুমধাম, তাহার এই কারণ, অল্প কারণ আমরা জানি না।

কিন্তু আনন্দময় শরৎকাল সকলের পক্ষে সুখের সময় নহে। দরিদ্রের হৃৎ অপরীত হয়, কিন্তু শোকার্তের শোক অপরীত হয় না। উমাতারার মাতা কলিকাতার আসিলেন। বিন্দু বার বার উমাকে দেখিতে যাইতেন, কিন্তু উমার রোগের শান্তি হইল না। ধনঞ্জয়-বাবু দিনকতক একটু অপ্রতিভের দ্বারা বোধ করিলেন, কিন্তু অনেক দিনের অভ্যাস তাঁহার চরিত্রে গভীররূপে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা আপনীত হইল না, তিনি বাড়ীর ভিতরে আসা বন্ধ করিলেন, বাহিরেই আহারাদি করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। উমার মাতা পুনরায় পরীগ্রামে যাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন, কিন্তু যিন দিন কছার অবস্থা দেখিয়া সহসা কলিকাতা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। হতভাগিনী উমা আরও ক্লীণ হইতে লাগিল; বর্ষাশেষে তাহার কাসি ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; মুখখানি অতিশয় শুষ্ক, চক্ষু দুইটি কেঁটের প্রকৃতি। কাহাকেও ভিরঙ্কার না করিয়া, আপনার মনভাগ্যের কথা না

কহিয়া সে দিনে দিনে ধীরে ধীরে আপনার গৃহকর্তা করিত, বিন্দুর সঙ্গে আলাপ করিত, মাতার সেবা-শুভ্রবা করিত, স্বামীর ভক্ত নানারূপ ব্যঞ্জনাদি সহজে প্রস্তুত করিয়া বাহিরে পাঠাইয়া দিত।

হেমের যত্নে কালাতারার স্বামীর পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম হইল, কিন্তু আরোগ্য হইল না। সে বয়সে পুরাতন রোগ শীঘ্র যায় না, তাহার উপর বৃহৎ সংসারের নানারূপ উপদ্রব, কালীঘাটের পাণ্ডাদিগের নানারূপ উপদ্রব। অনেক যত্নে ষেটুকু ভাল হয়, একদিন অনিয়মে সেটুকু আবার মন্দ হয়, হেমচন্দ্র পীড়ার আরোগ্যের বড় আশা করিতে পারিলেন না।

বিন্দু মধ্যে মধ্যে শরৎকে ডাকিয়া পাঠাইতেন, শরৎ আসিয়া উঠিতে পারিতেন না, তাঁহার পড়াশুনার বড় ধুম, এখন ভাল করিয়া না পড়িলে পরীক্ষা দিবে না, কিরূপে? বিন্দুও বড় জেদ করিতেন না, কেবল প্রত্যহ কোন নুতন ব্যঞ্জন রান্নায়া কি ফল ছাড়াইয়া পাঠাইয়া দিতেন। সুধা বত্ন সহকারে মিছরীর পানা প্রস্তুত করিত, আঁক পেপে ছাড়াইয়া দিত, মৃগের ডাল ডিঙ্কাইয়া দিত, প্রত্যহ অপরাহ্নে নিজহস্তে রেকাবি সাজাইয়া কিয়ের দ্বারা শরতের বাটাতে পাঠাইয়া দিত। শরৎ অনেক বারও করিয়া পাঠাইতেন, কিন্তু ছেলটি কিছু পেটুক, সেই মৃগের ডালগুলির নিদর্শন রেকাবিতে অধিকক্ষণ থাকিত না, একবার চুমুক দিতে আরম্ভ করিলে সে মিছরীর পানা নিমেষের মধ্যে অস্তিত্ব হইত। ঝিকে বলিতেন, “ঝি, কাল থেকে আর এনো না, তাঁরা কেন রোজ কষ্ট করে প্রস্তুত করেন? আমি সত্য বলছি, আমার এ সব দরকার নেই।” ঝি খালি পাত্রগুলি হাতে লইয়া “তা দেখতেই পাচ্ছি।”

মণিরা প্রস্থান করিত। বলা বাহুল্য যে, পেটুক বালকের কথার মনো করা না শুনিয়া মুখা প্রভৃতি মিছরীর পানী প্রস্তুত করিয়া পাঠাইত।

এইরূপে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেছে, শেষে পূজা আসিয়া পড়িল। দেবী-বাবুর বাড়ীতে বড় ধুমধাম; দেবীর বহু বৃষ্টি, অনেক গাওনা, বাজনা, তিন রাত্রি যাত্রা! দেবী-বাবুর গৃহিণীর বৃকের বেদনটা সেট সময় বোধ হয় একটু কমিয়াছিল, কেন না, তিনি তিন রাত্রি ধরিয়া সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্য্যন্ত বারান্দার চিক ফেলিয়া ঠার বসিয়া যাত্রা শুনিলেন। কবিবাক্ষ গৃহিণীর মতলব বুঝিয়া, একটু আশ্রয় আশ্রয় করিয়া বলিল, ‘হাঁ, তাতে হানি কি? যে তেলটা দিয়েছি, পেটা যেন ভাল ক’রে মালিস করা হয়।’

দেবী-বাবুর গৃহিণীর উপরোধে চন্দ্রনাথ-বাবুর স্ত্রী ও অন্যান্য ভদ্র-গৃহিণীগণ আসিয়া যাত্রা শুনিল, নিতান্ত অনভি-লাষও নাই। বিজ্ঞানসন্দের যাত্রা, রাধিকার মানভঞ্জন, গানগুলি বাছা বাছা, ভাবই কত, অর্থ ই কত! গৃহিণীগণ রোক্তমান গণ্ডা গণ্ডা ছেলেগুলোকে খাবড়া মারিয়া খুম পাড়াইয়া একাগ্রচিত্তে সেই গীতরস গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বিদেশিনীর প্রতি রাধিকার স্তুতি শুনিয়া বৃদ্ধাগণ ভাবে গদগদচিত্তে সুর তুলিয়া কাদিয়া উঠিলেন।

বিন্দুও কি করেন, একদিন ছেলে ছটাকে স্তম্ভার কাছে রাখিয়া যাত্রা শুনিয়া আসিলেন। সকালে আসিয়া গিয়া হেমকে বলিলেন, “মানভঞ্জন বড় মন্দ হয়নি, তুমি একদিন গিয়ে শুনে এস না।”

হেম। না, মানভঞ্জনপ্রথা তোমার কাছেই ছেলেবেলা অনেক শিখেছি, যাত্রার আর কি শিখব?

বিন্দু খাবীর মুখ চাশিয়া ধরিয়া বলিলেন, “বিধা, কথাসংগো আর বণো না, পাপ হবে।”

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিজয়া-দশমী।

আজি মহা কোলাহলে ভাসান হইয়া গিয়াছে; মহানগরীর পথে ঘাটে বাটীতে বাটীতে আনন্দধ্বনি ধ্বনিত হইয়াছে, বাজ ও গীতধ্বনি শব্দিত হইয়াছে। রাজপথে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, কি ইতর, কি ভদ্র, কি শিশু, কি যুবা, সকলেই নদীর স্রোতের স্তার গমনাগমন করিয়াছে; নিতান্ত দরিদ্র ও একখানি নূতন বস্ত্র পরিয়া বড় আনন্দ লাভ করিয়াছে। দেবীর উৎসবধ্বনি অস্ত্র এই মহানগরীকে পুলকিত ও কম্পিত করিয়া ক্রমে নিস্তব্ধ হইল।

ভাহার পর ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত, বন্ধু বন্ধুর সহিত, পুত্র মাতার নিকট, সকলে প্রণাম বা নমস্কার, আশীর্বাদ বা আলিঙ্গন দ্বারা সকলকে তৃপ্তি করিল। বোধ হইল যেন, জগতে আজি বৈবাহার তিরোহিত হইয়াছে, যেন শত্রু শত্রুকে ক্ষমা করিল, অপরাধগ্রস্ত অপরাধীকে ক্ষমা করিল। মহা-হৃদয়ের সুকুমার মনোবৃত্তিগুলি ক্ষতি পাইল, দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা ও বাৎসল্য অস্ত্র বাঙ্গালীর হৃদয়ে উৎখলিতে লাগিল। শরতের সুন্দর জ্যোৎস্নাতে রাজপথে আনন্দের লহরী, সৌভাগ্যের লহরী, ভালবাসার লহরী বহিতে লাগিল। সংসারের লীলাখেলা দেখিতে দেখিতে আমরা অনেক শোকের বিষয়, অনেক দুঃখের বিষয়, অনেক পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত

কম্বার বিষয় দেখিয়াছি, নিষ্ঠুর লেখনীতে
সেগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এই পুণ্য-
রজনীতে কণেক পাড়াইয়া এই সুখলহরী
দেখিলাম, হৃদয় তুটু হইল, শরীর পুলকিত
হইল। এ রজনীতে যদি কোন অপবিত্রতা
থাকে, কোন পাপাচরণ অঙ্গুষ্ঠিত হয়,
তাহার উপর যবনিকা পাত্তিত কর, সেগুলি
আজ দেখিতে চাহি না।

রাত্রি দেড় প্রহরের সময় বিন্দু রাস্তাঘরে
ভাত খাইয়া উঠিলেন। ছেলে দুইটি ঘুমাই-
রাছে, স্ত্রী ঘুমাইরাছে, হেম-বাবুও শুইয়া-
ছেন, কিও বাড়ী গিয়াছে, বিন্দু সদর-দরজার
খিল দিয়া নীচে একাকী ভাত খাইলেন ও
উঠিয়া আচমন করিলেন। এমন সময়
কপালট একটি শব্দ শুনিলেন, কে যেন
আন্তে আন্তে বা মারিল।

এত রাত্রিতে কে আসিয়াছে? বিন্দু
একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, আবার
শব্দ হইল।

“কে গা? দরজার কে পাড়িয়ে গা?”
কোন উত্তর আসিল না, আবার শব্দ হইল।

বিন্দু কি উপরে গিয়া হেমকে উঠাইবেন?
হেম আজ অনেক হাঁটিয়াছেন, অতিশয় শ্রান্ত
হইয়া নিদ্রিত হইয়াছেন। বিন্দু সাহসে ভর
করিয়া আপনি গিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন।
লোকটা কে, দেখিয়া প্রথমে চিনিতে পারি-
লেন না, পরমুহূর্তেই চিনিলেন, শরচ্চন্দ্র!

কিন্তু এই কি শরচ্চন্দ্রের রূপ? বড় বড়
লম্বা লম্বা রুক্ষ চুল আসিয়া কপালে ও
চক্ষুতে পড়িয়াছে, চক্ষু দুটি কোটরপ্রবিষ্ট,
কিন্তু ধক ধক করিয়া জলিতেছে, মুখ অতি-
শয় শুক ও অতিশয় গম্ভীর; শরীরখানি লীর্ণ
বহইয়াছে; একখানি ময়লা একলাই মাত্র
লাঙ্গিরায়। উভয়ে ভিতরে আসিলেন, শরৎ
কোলে, “বিন্দু দিদি, অনেক দিন আস্তে
করি

পারিনি, কিছু মনে করো না, আজ বিজয়ার
দিন প্রণাম কন্তে এলেম।”

বিন্দু। শরৎ-বাবু, বেঁচে থাক, দীর্ঘ-
জীবী হও, তোমার বে-খা হোক, স্নেহে
সংসার কর, এইটি যেন চক্ষু দেখে বাই,
তাইকে আর কি আশীর্বাদ করব?

বিন্দুর স্নেহগর্ভ হৃদয় শরতের চক্ষু
দিয়া জল পড়িতে লাগিল, শরৎ কোন
উত্তর করিতে পারিলেন না বিন্দুর পা দুটি
ধরিয়া প্রণাম করিলেন। বিন্দু অনেক
আশীর্বাদ করিয়া তাঁহাকে তত ধরিয়া
তুলিলেন, পরে বলিলেন, “শরৎ-বাবু,
তুমি অনেক দিন এখানে এসনি, তাতে
এসে যার না। প্রত্যহ তোমার খবর
পেতেম, জান্তেম, আমাদের কোন বিপদ
আপদ হলেই তুমি আসবে। কিন্তু এমন
ক’রে কি লেখাপড়া করে? লেখাপড়া
আগে, না শরীর আগে? আহা, তোমার
চক্ষু দুটি ব’সে গেছে, মুখখানি শুকিয়ে গেছে,
শরীর জীর্ণ হয়েছে, এমন ক’রে কি দিন-
রাত জেগে পড়ে? শরৎবাবু, তুমি বুদ্ধিমান
ছেলে, তোমাকে কি বুঝাতে হয়? তোমার
বিন্দু দিদির কথাটি রেখো, রাত্রিতে কোন ক’রে
ঘুমিও, দিনে সময়ে আহার করিও, তোমার
মত ছেলে পরীক্ষার অবশ্য উত্তীর্ণ হবে।”

শরতের শুক ওঠে একটু হাসি দেখা
গেল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,
“বিন্দু দিদি, পরীক্ষা দিতে পাবুলে কি জীব-
নের সুখবুদ্ধি হয়? হেমবাবু পরীক্ষা বড়
দেন নাই, হেমবাবুর মত সুখী লোক জগতে
করজন আছে?”

বিন্দু। তবে পরীক্ষার জন্তে এত চিন্তা
কেন? শরীর মাটি করুছ কেন?

শরৎ। পরীক্ষার জন্তে এক মুহূর্তও
চিন্তা করি না।

বিন্দু। তবে কিসের চিন্তা?

শরৎ উত্তর দিলেন না, বিন্দুকে রকের উপরে বসাইলেন, আপনি নিকটে বসিলেন, বিন্দুর দুই হাত আপন হস্তে ধারণ করিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন, বীরে বীরে বড় বড় অশ্রুবিন্দু সেই শীর্ণ গণ্ডস্থল বহিয়া বিন্দুর হাতে পড়িতে লাগিল।

বিন্দু। এক শরৎ বাবু! কাঁছ কেন? ছি, তোমার কোন কাঁছ হয়েছে? মনে কোন যাতনা হয়েছে? তা আমাকে বল না কেন? শরৎ-বাবু, ছেলেবেলা থেকে তোমার মনের কোন কথাটি বলনি, আমি কোন কথাটি তোমার কাছে জিজ্ঞেসেছি? এতদিনের স্নেহ কি আজ তুলে, তোমার বিন্দু দিদিকে কি পর মনে করলে?

শরৎ। বিন্দু দিদি, যে দিন তোমাকে পর মনে করব, সে দিন এ জগতে আমার আপনার কেউ থাকবে না। আমার মনের যাতনা তোমার নিকট লুকাব না, আমি হতভাগা, আমি পাপিষ্ঠ।

বিন্দু দেখিলেন, শরতের দেহ ধর ধর করিয়া কাঁপিতেছে, নয়ন অগ্নির স্তায় জ্বলিতেছে। বিন্দু একটু উষ্ম হইলেন, বীরে বীরে বলিলেন, “শরৎ-বাবু, তোমার মনের কথা আমাকে বল, সঙ্কোচ করো না।”

শরৎ। আমার মনের কথা জিজ্ঞাসা করো না। বিন্দু দিদি, আমি ঘোর পাপিষ্ঠ, আমার মন পাপ-চিন্তার কক্ষবর্ণ। বন্ধুর গৃহে এসে আমি অসদাচরণ করেছি, ভগিনীর প্রণয়ের বিষময় প্রতিদান করেছি, বিন্দু দিদি, আমার হৃদয়ের কথা জিজ্ঞাসা করো না, আমার জীবনের ঘোর কলকে কলঙ্কিত।

শরৎ বিন্দুর হাত দুটি ছাড়িয়া দিয়া

দুই হস্তে বিন্দুর দুই বাহুদেশ ধরিলেন, এত বলের সহিত ধরিলেন যে, বিন্দুর সেই হৃৎকল কোমল বাহ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। শরতের সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে, নয়ন হইতে অশ্রু-কণা বহির্গত হইতেছে।

বিন্দু শরৎকে এতদূর কখন দেখেন নাই, তাঁহার মনে সন্দেহ হইল, ভয় হইল। সেই আদর্শচরিত্র ব্রাতৃসম শরৎ কি মনে কোন পাপচিন্তা ধারণ করে? তাতা বিন্দুর স্বপ্নেরও অগোচর। কিন্তু অত এই নিম্নরাজিতে এই ক্ষিপ্তপ্রায় যুবককে দেখিয়া সেই নিরাজ্ঞের রমণীর মনে একটু ভয় হইল। প্রভুত্বপরমতি বিন্দু সে ভয় গোপন করিয়া স্পষ্টভাবে বলিলেন, “শরৎ-বাবু, তোমাকে বাধ্যকাল হ’তে আমি ভাই বলে জানি, তুমি আমাকে দিদি বলে ডাকতে; দিদির কাছে ভ্রাতা বা বন্ধুতে পারে, নিঃসঙ্কচিত-চিত্তে তা বল।”

শরৎ। আমি যে অসদাচরণ করেছি, যে পাপচিন্তা মনে ধারণ করেছি, তা ভগিনীর কাছে বলা যায় না, আমি মহাপাপী।

বিন্দু সরোবে বলিলেন, “তবে আমার কাছে সে কথা বলবার আবশ্যক নেই,— আমাকে ছেড়ে দাও, ভগিনীকে সম্মান কর।”

শরৎ বিন্দুর বাহুবর ছাড়িয়া দিলেন, আপনার মুখখানি বিন্দুর কোলে লুকাইলেন, বালকের স্তায় অজস্র রোদন করিতে লাগিলেন।

বিন্দু কিছু বুঝিতে পারিলেন না। শিশুর স্তায় বাহার নির্মল আচরণ, শিশুর স্তায় যে পদতলে পুড়িয়া কাঁদিতেছে, সে কি পাপচিন্তা ধারণ করিতে পারে বীরে বীরে শরতের মুখখানি তুলিলেন, কী

ধীরে আপন অকল দিয়া তাঁহার নয়নবারি মুছাইয়া দিলেন, পরে আন্তে আন্তে বলিলেন, “শরৎ, তোমার হৃদয়ে এমন চিন্তা উঠতে পারে না, যা আমার চুব্বার অযোগ্য। তোমার যা বলবার বল, আমি শুনিছি।”

শরৎ। ভগদীশ্বর তোমার এই দরার জন্তে তোমাকে সূখী করুন। বিন্দু দিদি, আর একটি অভয়দান কর। যদি আমার প্রার্থনা বিফল হয়, প্রতিজ্ঞা কর, তুমি এ কথাটি কাকেও বলবে না? আমার পাপ-চিন্তা আমার জীবনের সহিত শীঘ্র লীন হবে, জগতে যেন সে কথা প্রকাশ না হয়।

বিন্দু। তাই অস্বীকার কর্লেম।

শরৎ তখন মুহূর্তের ভক্ত চিন্তা করিলেন, দুই হস্ত দ্বারা হৃদয়ের উদ্বিগ্ন যেন বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন, তাহার পর আবার বিন্দুর হাত দুটি ধরিয়া, তাঁহার চরণ পর্য্যন্ত মাথা নামাইয়া অক্ষুটবরে কহিলেন, “পুণ্য-হৃদয়, সরলা, বিধবা সূতার সহিত আমার বিবাহ দাও।” বিন্দু তখন এক মুহূর্তের মধ্যে ছয় মাসের ঘটনা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার মাথার আকাশ ভাঙ্গিয়া পাড়ল।

শরৎ তখন ক্লিষ্টস্থরে বলিতে লাগিল, “বিন্দু দিদি, আমি মহাপাপী। ছমাস হ’ল, যে দিন সূধাকে তালপুকুরে দেব্লেম, সেই দিন আমার মন বিচলিত হ’ল। পুস্তক-পাঠ ভিন্ন অস্ত্র ব্যবসা আমি জানুতেম না, পুস্তকে ভিন্ন প্রণয় আমি জানুতেম না। সে দিন সেই সরলহৃদয়, স্বর্গের লাভণ্যে বিভূষিতা, ত্রয়োদশ বৎসরের বালিকাকে দেখে আমি হৃদয়ে অননুভূত ভাব অনুভব কর্লেম। কালে সেটি তিরোহিত হবে, আশা করে-ছিলাম, কিন্তু দিন দিন ক্রমেই অধিক

বিষ পান করিতে লাগ্লেম, আমার শরীর, মন, আত্মা জর্জরিত হ’ল। বিন্দু দিদি, তুমি সরল-হৃদয়ে আমাকে প্রত্যহ তোমার বাটিতে আসিতে দিতে, হেমবাবু জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার স্তায় স্নেহ করে আমাকে আসিতে দিতেন, আমি হৃদয়ে কালকূট ধারণ করে, পাপচিন্তা ধারণ করে, দিনে দিনে এই এই পবিত্র সংসারে আসুতেম। ভগদীশ্বর এ মহাপাপ, এ মহা প্রতারণা কি ক্ষমা করবেন? বিন্দু দিদি, তুমি কি ক্ষমা করবে? সূধার পীড়ার পর যখন প্রত্যহ তাকে সাধনা করিতে আসুতেম, অনেকক্ষণ বসে ছুই জনে গল্প করুতেম, অথবা আকাশের তারা গণ্যুতেম, তখন আমি জানুন্তু হয়ে যে কি পাপচিন্তা করুতেম, বিন্দু দিদি, তোমাকে কি বলব। আমার বিবাহ হবে, একটি সংসার হবে, লাভণ্যময়ী সূধা সে সংসারে রাজ্ঞী হবে, আমার জীবন সুধাময় করবে, এই চিন্তা আমাকে পূর্ণ করুত, এই চিন্তা আকাশের নক্ষত্রে পাঠ করুতেম, এই চিন্তা বায়ুর শব্দে শ্রবণ করুতেম। প্রত্যহ আসুতে আসুতে আমি প্রায় জানুন্তু হলেম, তখন হেমবাবু আমার পাঠের ব্যাঘাত হচ্ছে ব’লে একদিন কয়েকটি উপদেশ দিলেন। তখন আমার জ্ঞান হইল, পাঠা পুস্তক ও পরীক্ষা চিত্তার আশ্রনে দণ্ড হোক, কিন্তু যে উৎকট বিপদে আমি পড়েছি, পাছে সরলচিত্তা সূধা সেই বিপদে পড়ে, এই ভয় সহসা আমার হৃদয়ে জাগরিত হ’ল, আমি সেই অবধি এ পুণ্য-সংসার ত্যাগ কর্লেম। সূধাকে না দেখে আমিও তার চিন্তা তুলব মনে করে-ছিলাম; কিন্তু সে বৃথা আশা। বিন্দু দিদি, সে পাপচিন্তা তুলবার ভক্ত আমি ছুই মাস অবধি প্রাণপণে চেষ্টা করেছি; কিন্তু সে বৃথা চেষ্টা। নদীর স্রোত হস্ত দ্বারা রোধ করিবার চেষ্টা

ভায়! আমি পাঠে মন রত করিতে চেষ্টা করেছি, নাট্যশালার গিরে সে চিন্তা ফুলতে চেষ্টা করেছি, আমার সহপাঠীদের সহিত মিশেছি, গীত-বাত শুনে গিরেছি, কিন্তু সে কাল-চিন্তা ফুলতে পারিনি। ঘরের দেয়ালে, নৈশ আকাশে, আমার পুস্তকের পংক্তিতে পংক্তিতে, নাট্যশালার নাট্যাভিনয়ে, সেই অনিলনীর মুখমণ্ডল দেখ্তেম, রাত্রিতে সেই আনন্দময়ী মূর্তির স্বপ্ন দেখ্তেম। বিন্দু দিদি, এ দুই মাসের কথা আর বলব না, পথের কাদালীও আমা অপেক্ষা সুখা। বিন্দু দিদি, আমার মনের কথা তোমাকে বল্লম, আমাকে ঘৃণা করো না, আমাকে মহাপাপী বলে দূর ক'রে দিও না। আমি পাপিষ্ঠ, কিন্তু তুমি ঘণা করলে এ জগতে কে আমাকে একটু স্নেহ করবে, কে আমাকে স্থান দেবে?”

আবার শরতের শীর্ণ গণ্ডস্থল দিয়া নয়ন-বারি বহিতে লাগিল। বিন্দু স্থির হইয়া এই কথাগুলি শুনিলেন, কি উত্তর দিবেন? শরতের প্রস্তাব, পাগলের প্রস্তাব, কিন্তু সে কথা বলিলে হয় ত এই ক্রিপ্তপ্রায় যুবক আজই আত্মঘাতী হইবে। বিন্দু ধীরে ধীরে শরতের চক্ষুর জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, “ছি, শরৎ-বাবু, আপনাকে এমন করে ক্লেশ দিও না, আপনাকে থিক্কার করো না। তোমাকে ছেলেবেলা থেকে আমি ভাইয়ের মত মনে করি, তোমাকে কি আমি ঘৃণা করিতে পারি? এতে ঘৃণার কথা ত কিছুই নেই, কেন আপনাকে মহাপাপী বলে থিক্কার করছ? তবে বিধবা-বিবাহ আমাদের সমাজে চলন নেই, তা একদম বিবাহ হয় কি না, বাবুকে জিজ্ঞাসা করব, যা হয়, তিনি ব্যবস্থা করবেন। তা তুমি আপনাকে একপে ক্লেশ দিও না, তোমার এ কথার

বাবুর ঘাই মত হ'ক না কেন, তোমার প্রতি আমাদের স্নেহ এ জীবনে ভিরোহিত হবে না।

শরৎ। বিন্দু দিদি, তোমার মুখে পুশ-চন্দন পড়ুক, তুমি আমাকে যে এই দয়া করলে, আমাকে যে আজ ঘৃণা ক'রে ত্যাগ করে দিলে না, এ দয়া আমি জীবন থাকতে বিশ্বস্ত হব না।

বিন্দু। শরৎ-বাবু, তোমার বোধ হয়, আজ রাত্রিতে এখনও খাওয়া দাওয়া হয়নি, কিছু খাবে? একটু মুখটুকু ধোও না? বাবুর জন্তে আজ তুচ্ছ করেছিলাম, তার খানকত আছে। একটি সন্দেশ দিবে খাবে?

শরৎ। না দিদি, আজ কিছু খাব না, থাকে আমার রুচি নেই।

বিন্দু। তবে কা'ল সকালে একবার এস, বাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করো।

শরৎ। কমা কর, এ বিষয়ে হেমবাবু যা বলেন, আমাকে বলো, তার পূর্বে আমি হেমবাবুর কাছে মুখ দেখাতে পারব না।

বিন্দু। তা কা'ল না এলে নেই নেই, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এস, এমন ক'রে আপনাকে কষ্ট দিলে অনুতাপ করবে যে।

শরৎ। দিদি, কমা কর, এ বিষয়ে নিশ্চিন্তি না হ'লে আমি সুখার কাছে মুখ দেখাব না। দেখো বিন্দু দিদি, এ কথা যেন সুখার কানে না উঠে, তার মন যেন বিচলিত না হয়। আমার আশা যদি পূর্ণ না হয়, জগতে একজন হতভাগা থাকবে, আর একজনকে হতভাগিনী করবার আশঙ্ক নেই।

বিন্দু। তা তবে এ বিষয়ে বাবুর যা মত হয়, তা তোমাকে লিখে পাঠাব।

শরৎ। না দিদি, পত্রে এ কথা লিখো না, আমি আপনি এসে তোমার নিকট জিজ্ঞাসা ক'রে বাব। কবে আসব বল,

আমার জীবনে সিংহাসন স্থাপন করেছেন কি
কুণ্ডলিখেছেন, তাই জানুন বল।

বিন্দু। শরৎ-বাবু, তা কথা তুই এক-
দিনে সিংহাসিত হই না, অনেক দিক্ দেখতে
হবে, অনেক পরামর্শ করিতে হবে। তা তুমি
কিন ১৫।১৬ পরে এস।

শরৎ। তাই হোক। আমি কালীপূজার
রাজিতে আবার আসব, এ কয়েক দিন
জীবন্ত হইয়া থাকব।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

মেয়ে-মহলের মতামত।

শরৎ-বাবু যেই বাটী হইতে বাহির হইয়া
গেলেন, অমনি দেবী-বাবুর বাড়ীর একটি
ঝি ঠাকুরের প্রসাদ এক খাল কল ও মিষ্টান্ন
লইয়া আসিল। ঝি খাল নামাইয়া বলিল,
“মাঠাকুরণ তোমাদের জন্যে এই ঠাকুরের
প্রসাদ পাঠিয়ে দিবেছেন গো! অনেক
বাড়ীতে যেতে হইয়াছিল, তাই আসতে এত
রাত হ'ল।”

বিন্দু। খাল রাখ বাছা, ঐ রকে রাখ,
কা'ল আমাদের বিকে দিয়ে খালা পাঠিয়ে
দেব।

ঝি রকের উপর খাল রাখিল। গার
কাণ্ডখানা একটু টানিয়া গারে দিয়া,
একটু মুখ ফিরাই দাড়াইয়া, পাশে একটি
আঁতুল দিয়া মুচুকে মুচুকে হাসিতে লাগিল।

বিন্দু। কি লো, কি হইছে? তোদের
বাড়ীতে পূজার কোন ভামাসা টামাসা
হইছে না কি, তাই বলতে এসেছিস?

ঝি। ই্যা, তামাসাই বটে, ভদ্র

নোকের ঘরে হলেই ভামাসা, আমাদের
ঘরে হলেই নোকে পাঁচ কথা কর।

বিন্দু। কি লো, কি ভামাসা, কোথায়
হইছে?

ঝি। না বাপু, আমরা গবিব-গুবো
নোক, আমাদের সে কথার কাজ কি বাপু।
তবে কি জান, নোকে এ সব দেখলেই পাঁচ
কথা কর।

বিন্দু। কি দেখলি রে, ভেবেই বল
না।

ঝি আর একবার কাণ্ডটা সোর ক'রে
নিরে আর একটু মুচুকে হেসে বলে, “বল,
ঐ ছোঁড়াটা এত রাতে বেরিয়ে গেল, ও
কে গা?”

বিন্দু একটু ভীত হইলেন। সদর-দর-
জাটা এতক্ষণ খোলা ছিল, ঝি কি দাঁড়িয়ে
দাঁড়িয়ে শরতের কথাগুলি শুনিয়াছে? একটু
ক্লান্ত হইয়া বলিলেন, “তুই কি চোখের মাথা
থেরেছিস? শরৎ-বাবু এসেছিলেন, চিন্তে
পারিসনি? তুই কি আজ নেকরা করিতে
এসেছিস?”

ঝি। না, চোখের মাথা বাই নি গো।
শরৎবাবু, তা চিনেছি। তা ভদ্র নোকের
ছেলে কি ভদ্র নোকের মেয়ের লগে অমনি
ক'রে হাত কাড়াকাড়ি করে? জানি না বাপু,
তোমাদের পাড়াগাঁয়ে কি নিয়ম, আমি এই
ঊনত্রিশ বছর কলকাতার চাকরী করছি, কৈ,
এখনি ধারাটি দেখিনি। তা ভদ্র নোকের
কথার আমাদের কাজ কি বাপু? আমরা
ছবেলা ছপেট খেতে পাই, তাই ভাল,
আমাদের ও সব কথার কাজ কি?

দেবী-বাবুর বাড়ীর ঝি ওলা বড় বেহারা,
তাহা বিন্দু পূর্বে লক্ষ্য করেছিলেন, কিন্তু
অত এই ঝির এই বিজ্ঞপূর্ণ অকৃতজ্ঞ ও
কথা শুনিয়া মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু

ক্রোধে আরও অনিষ্ট হইবে জানিয়া তাহা
স্বপ্নরূপে করিয়া কহিলেন, “ও কি জানিন্
নি, শরৎ-বাবুর বা ক'রিয়ে দেয় না, তাই
বাসার একলা থেকে প'ড়ে প'ড়ে পাগলের
মত হয়ে গিয়েছে, কি বলে, কি কর, তার
ঠিক দেই।”

ঝি। হ্যাঁ গা, তা শরৎ-বাবু পাগলই
হোক আর ছাগলই হোক, পরের বাড়ী এসে
উৎপাত করে কেন? বিরে-পাগলা হয়ে
থাকে, একটা বিরে করুক গিরে, তোমাকে
এসে টানাটানি করে কেন? তোমাকে বিরে
করতে চায় না কি?

বিন্দু। দূর পোড়ারমুখী! তোর মুখে কি
কথা আটকায় না লা? বা মুখে আসে, তাই
বলিস? শরৎ-বাবু একটি মেরেকে দেখেছে,
তার সঙ্গে বিরে করতে চায়। তা শরৎ-বাবু
সে কথা বাড়ীর কাউকে বলতে পারে না,
লজ্জা করে, তাই আমার কাছে বলতে
এসেছিল।

ঝি। সে কে গা? কোন্ মেরেটি?
বিন্দু। তা জানিবি এখন, সৰ্ব্বদা যদি ঠিক
হয়, তোরা সবাই জানিবি।

ঝি। হ্যাঁ গা, আর লুকলে চলবে
কেন? আমরা কি আর কিছু জানিনি গা?
আমরা ত আর বুড়ো হাবড়া হইনি, চক্কর
মাথাও খাইনি, কানের মাথাও খাইনি।
ঐ যে সুধা সুধা ক'রে চৌচিরে শরৎ-বাবু
কাঁদছিলেন, যেন সুধার জন্তে বুক কেটে
বাচ্ছিল, তা কি আর শুনিনি গা? এ কথা
তোমরা বলবে কেন? এ কথা কি ভদ্র
নোকে বলে, না কেউ কখন শুনেছে? বিধ-
বার আরার বিরে? ও মা, হি! হি! হি!
ভদ্র নোককে হওবৎ, আমাদের ঘরে এমন
কথাটি হ'লে তাকে একঘরে করে। ও মা,
হি! হি! হি! এমন কলঙ্কের কথা কি কেউ

কোথাও শুনেছে? এ ভদ্রের ঘর? মুচি-
বুচনমানের ঘরে ত এমন কথা কেউ শুনে
নি। ও মা, হি! হি! হি! ও মা, অবাক
করে মা, কোথা বাব মা—ইত্যাদি
ইত্যাদি।

বিন্দু এবার বথার্থই ভীত হইলেন। বড়-
মামুঘের ঘরের গর্জিগী মন্ডভাবিগী কি বক্ত-
কণ তাঁহার উপর ব্যস্ত করিতেছিল, ততক্ষণ
বিন্দু সহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সুধার নামে
এ কলঙ্ক রটাইবে তাবিয়া বিন্দু হতজ্ঞান হই-
লেন। শরতের পাগলামী প্রস্তাবে তিনি
কখনই সম্মত হইবেন না স্থির করিয়াছিলেন,
কিন্তু বিধবার নামে সামান্য মিথ্যা কলঙ্কও
বড় ভয়ানক, মিথ্যা সত্য কেহ ভাবে না,
কলঙ্ক চারিদিকে বিস্তৃত হয়, অগণনীয় হয় না।

বুদ্ধিমতী বিন্দু তখন একটু চিন্তা করিয়া
বাক্স হইতে একটি টাকা বাহির করিলেন।
অল্প দিন দেবী-বাবুর বাটী হইতে ধাবার
আসিলে বিদের ছই আনা পরসাদ দিতেন,
অল্প সেই টাকাটি বিদের হাতে দিয়া বলি-
লেন, “ঝি তুই দেবী-বাবুর, বাড়ীতে অনেক
দিন আছিল, পুজার সময় তোকে আর কি
দিব, এই একটি টাকা নিয়ে যা, একখানা
নুতন কাপড় কিনিস। আর শরৎ-বাবু পাগলের
মত কথাগুলি বলেছে, সে কথা আর কাউকে
বলিস নি। আজ দশমীর দিন, বোধ
হয়, কোথাও সিদ্ধি থেয়ে এসেছিল, তাই
পাগলের মত বকেছিল। তা পাগলের কথা
কি ধরতে আছে, ভদ্রঘরে এমনও কি হয়,
আমাদের একটু যান-সম্মত আছে, শরৎ-
বাবুরও মা আছেন, বোন আছেন, এমন
কাজও কি হয়ে থাকে? তা পাগলের কথা
বা শুনেহিস্ শুনেহিস্, কাউকে বলিসনি
বাহা, এ পাগলামী কথা যেন কেউ টের
পায় না।”

চক্চকে টাকাটি দেখিয়া স্বির মত একটু কিরিল, (অনেকেই করে) সে বলিল, “তা বৈ কি মা, পাগলের কথা কি ধরতে আছে, না বলতে আছে? শরৎ-বাবু একটু সিদ্ধি খেয়েছিলেন বই ত নয়, এই আমাদের বাড়ীর ছেলেরা যে বোতল বোতল কি আনাচ্ছে আর খাচ্ছে, আর কি বা আচরণ! রাত্রিতে বাড়ী থাকে না, বাপ-মাকে একটু ভয় করে না, নজ্ঞা করে না। এখনকার সব অমনি হয়েছে গো, তা এখনকার ছেলেদের কথা কি ধরতে আছে? শরৎবাবু যা বলেছে বলেছে, তা সে কথা আমি কি মুখে আনতে পারি, না কাউকে বলতে পারি? কাউকে বলব না মা, তুমি কিছু ভেব না।”

ঝি তুই হইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইল। বলা বাহুল্য যে, মুহুর্তের মধ্যে তারের সংবাদ যেমন অগতের এক প্রান্ত হইতে অল্প প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করে, বিন্দুর বাড়ীর কথা সেই রাত্রিতেই শ্বেইরণ ভবানীপুর, কালীঘাট, কলিকাতা অতিক্রম করিল। পরদিন প্রাতে টি টি পড়িয়া গেল।

দেবী-বাবুর মহিবি পরদিন পা ছড়াইয়া তেল মাখিতে মাখিতে এই কলঙ্ক-কথা শুনিয়া একেবারে ভেক-দর্শনে সর্পের স্তায় কঁাস করিয়া উঠিলেন।

“ই্যা গা, তা হবে না কেন গা, তা হবে না কেন? এখন আর ভদ্র-ইতরে বাছ-বিচার নেই, যত ছোটলোক পাড়া-গাঁ থেকে এসে কায়েত ব’লে পরিচয় দেয়, অমনি কায়েত হয়ে যায়। ওদের চোদ্দ পুরুষে কেউ কারোকে সঙ্গে ক্রিয়া-কর্ম করেছে, না কায়েতের মান রাখতে জানে? ওদের সঙ্গে আবার খাওয়া-দাওয়া। মিশের ঘটে ত বৃদ্ধি নেই, তাই ওদের সঙ্গে চলা-কোরা করে। যেন এখন আজ মিশেকে ছুঁকথা শুনিবে,

আপনার মান-মর্যাদা জানে না, ভারী হোসে কর্ম হয়েছে, যার তার সঙ্গে চলা-কোরা করে। ওগো, আমি তুমিই বুঝেছি গো, তখনই বুঝেছি, যখন ভবানীপুরে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে যায় হয় না, ডেকে পাঠাতে হয়, তখনই বুঝেছি, কেমন কায়েত! আর সেই অবধি আর আসা হয়নি, জাঁক কত! ঐ বিধবা ছুঁড়ীটাকে আবার পাড়ওয়ালা কাপড় পরান হয়, কত আদর করা হয়। তা হবে না? এ সব হবে না? যেমন জাত, তেমনি আচরণ, হাড়ী-মুচিদের আর কি হবে? ঐ যে মুচনমানদের বিধবার নিকে হয় না? এ তাই লো তাই।”

শ্রামীর মা। (গৃহিণীর ব্যথার জন্য বুকে ও হাতে ঘন ঘন তৈল মর্দন করিতে করিতে) তা না ত কি বোন, ওরা আবার কায়েত! কায়েত হ’লে বিধবাটাকে অম্নি ক’রে রাখে? ও মা, ঐ ছুঁড়ীটা আবার একাদশীর দিন জল-টল খায়, গায়ে তেল মাখে, মাছ না হ’লে ভাত-খাওয়া হয় না, ছি। ছি! ছি। এই আজ একাদশী, কে বলুক দেখি, সকাল থেকে একটু জল-গ্রহণ করেছে।

বামীর মা। (গৃহিণীর চুলে তেল মাখাইতে মাখাইতে) সুছ তাই? আবার গাড়ী ক’রে ঐ ছুঁড়ীটাকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়, শরৎ-বাবু আবার ছুঁড়ীটাকে না কি রোজ রোজ দেখতে আসে। ছি! ছি! লজ্জার কথা, লজ্জার কথা।

গৃহিণী। অমন মেয়েকেও ধিক! মেয়ের মাকেও ধিক! অমন মেয়ে কি গর্ভে ধারণ করে? অমন মেয়ে কখনো মুখে হুণ দিয়ে মেয়ে ফেলতে হয়। বিধবা হয়েছে, তবু লজ্জা নেই, মাথার কাপড় খুলে শরতের

সঙ্গে ছাদে বেড়ান হয়, শরৎ-বাবুর
রীর পান। ক'রে পাঠান হয়। তা শরৎ-বাবুর
কি দোষ বল? পুরুষের মন বৈ ত নয়,
তাতে আবার বিয়ে-খা হয় নি, দুটো বোনে
অমন করে ছেঁলে মাহুকে ভোলালে সে
আর ভুলবে না? অমন মেয়ের মুখ দেখতে
আছে? ঝেঁটা মার, ঝেঁটা মার।

এইরূপে গৃহিণী ও তাঁহার সঙ্গিনীগণের
সুমিষ্ট কণ্ঠধ্বনি ক্রমে সপ্তমে চড়িতে লাগিল।
বিন্দুর মা, বিন্দুর বাপ, বিন্দুর চতুর্দশ পুরুষ
অবধি যাবতীয় পুরুষ স্ত্রীর বিশেষ স্ততিবাদ
করা হইল, রোষে গৃহিণীর বকের ব্যাথাটা
বড়ই বাড়িল, ঘন ঘন কবিরাজ আসিতে
লাগিল, সন্ধ্যার সময় বাবু আপিস হইতে
আসিয়া গৃহিণীর পীড়া দেখিতে আসিয়া,
যে রূপ মধুর আলাপ শ্রবণ করিলেন, মাহু-
ভাগ্যে সেরূপ কদাচ ঘটে!

গৃহিণীর গলার শব্দ শুনিয়া ঝি-বোরা
পাতকোতলার জড়সড় হইয়া কানাকানি
করিতে লাগিল।

প্রথমা। কি লো, কি হয়েছে, অত
চোঁচোঁচি কেন?

দ্বিতীয়া। ওলো, তা শুনিব্ নি, তবে
শুনেছি কি?

প্রথমা। ওলো, কি লো কি?

দ্বিতীয়া। ওলো, ঐ যে হেম ব'লে
পাড়ারী থেকে এসেছে, সেই তার স্ত্রী আর
শ্রালী আমাদের বাড়ী একদিন এসেছিল, তা
সেই শ্রালী না কি বিধবা, তার আবার শরৎ-
বাবুর সঙ্গে বিয়ে হবে।

তৃতীয়া। দূর পোড়াকপালী! তাও
কি হয় লো, বিধবার আবার বিয়ে হয়?

দ্বিতীয়া। তা হবে না কেন, ঐ যে
বিভাসাগর ব'লে বড় পণ্ডিত আছে, ঐ
বার সীতার বনবাস তুই সে দিন পড়'ছিল,

ঐ সেই না কি বলেছে, বিধবার বিয়ে হয়।
সে না কি কয়েকজন বিধবার বিয়ে দিয়েছে
চতুর্থা। সে ত বড় রসের সাগর লো,
বিধবার আবার বিয়ে দেয়? তা বিধবা
যদি বুড়ী হয়, তবুও বিয়ে হয়?

দ্বিতীয়া। তা হবে না কেন? ইচ্ছে
করুলেই হয়।

চতুর্থা। তবে শ্রামীর মা আর বামীর
মা কি দোষ করেছেন, চুরি ক'রে দুধটুকু
খান, মাচটুকু খান। তা বিভাসাগরকে
ব'লে বিয়ে করুলেই হয়, আর কিছু লুকোতে
চুরোতে হয় না।

প্রথমা। চূপ্ কর লো চূপ্ কর, এখনই
শুনতে পেল বোকে কাটিয়ে দিবে। তা
শরৎ-বাবু শুনেছি ভাল ছেলে, তিনি এমন
করেন কেন?

দ্বিতীয়া। আর ভাল ছেলে, বলে, বার
সঙ্গে বার মজে মন, কিবা হাড়ী কিবা
ডোম। ভাল ছেলে হ'লে কি চর, হুইকটে
মেয়েটি দেখেছে, মন ভুলে গেছে।

তৃতীয়া। হ্যাঁ দিদি, সে হেমবাবুর
শ্রালীর বরস কত গা?

দ্বিতীয়া। বরস ১৩।১৪ বছর হয়েছে,
দেখতেও সুন্দর, হেসে হেসে শরৎ-বাবুর
সঙ্গে কথা কয়, মিছরীর পান। খাওয়ার,
তার সঙ্গে না জানি কি খাওয়ার, তাতে আর
শরৎবাবু ভুলবে না? হাজার হোক, পুরুষের
মন ত।

চতুর্থা। তবে শরৎ-বাবুর সঙ্গে সে
মেয়েটির অনেক দিনের আলাপ।

দ্বিতীয়া। তবে আর শুন'ছি কি,
এ রসের কথা বুঝি কি? আলাপ সেই
পাড়ারী থেকে। কি জানি বাবু, সেখানে
কি হয়েছে, না ঝেনে শুনে পরের নিষা করা
ভাল নয়, কিন্তু কলুকেতার এসে বে ডলা-

নটা চলিয়েছে, তা আর ভাবানীপুৰে কে না জানে ? ওলো, শরৎ-বাবু সেই মেরেটিকে নিয়ে আপনার বাড়ীতে কত দিন রাখে, তার বোন্ আর হেমবাবুও সেই বাড়ীতে ছিলেন । হেমবাবু না কি গতক মন্দ বুঝে আলাদা বাড়ী করুলেন, তা সেখানে অমনি রাখিকা বিরহ-বেদনার অচেতন হয়ে পড়লেন, নড়া করুলেন যে, ভারী জ্বর হয়েছে, আবার আমাদের কুষ্ঠাকুর সেখানে গিয়ে উপস্থিত । ওলো, এ ঢের কথা লো ! বলি, বিজ্ঞানমন্ডর পড়েছি ? এ তাই লো তাই । এখনকার ছেলেরা সব সুডঙ্গ কাটতে শিখেছে । দেখিস্ লো সাবধান ।

চতুৰ্থা । দূর পোড়ারমুখী !

দাসী-মহলেও বড় হলহুল পড়িয়া গেল । বুড়ী ঝির কাছে শুনে নবীনা ঝিয়া সকাল থেকে বারান্দার, উঠানে, রান্নাঘরে কানাকাণি করিতেছে আর কিস কিস করিতেছে । একজন তরঙ্গী নবীনা বলিল, “হ্যাঁ, এ কি সন্তি লা, সন্তি বিধবার বিয়ে হবে না কি ?”

তুলসী নবীনা উত্তর করিল, “তবে শুনি-ছি কি, সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে, পত্তর হয়ে গেছে, হেমবাবু সেকরাকে গয়না গড়াতে দিয়েছে, আর তুই এখনও হবে কি না, জিজ্ঞেস কর্চিস্ ?”

তত্বদী । তবে ত এটা চলন হয়ে যাবে ।

ভদ্রর ঘরে হ'লে ত ছোট লোকের ঘরেও হবে ?

হু । কেন লো, তোর আবার সব গেছে না কি ? ঐ কৈবর্ত ছোঁড়াটাকে বে কর্চি না কি ? ঐ ভোদের কেউ হয় না ! ঐ যে কিস কিস ক'রে তোর সঙ্গে সদাই কথা কর ।

ও । দূর পোড়ারমুখী ! অমন কথা

আমাকে বলিসনি । তোর আপনার মনের কথা বল্চিস্ ? ঐ যে ভোদের ভেতের সদানন্দ বেণে আছে না, তার সে দিনে বো ম'রে গেছে, আর এখন ভাত রেণ্ডে দেখ, এমন নোকটি নেই । তা ধনে মশলা কেন-বার নতা ক'রে যে ঘন ঘন তার দোকানে যাওয়া হয়, বলি, তার ঘর করুতে ইচ্ছে হয় না কি ?

হু । তোর বুঝে আশুন !

এইরূপে দুই জন নবীনা পরস্পরের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতেছে, এমন সময় একজন বৃদ্ধা দাসী আসিয়া বলিল, “কি লো, তোরা গালাগালি করিস্ কেন লো ?”

হু । না গো, কিছু নয়, এই শরৎ-বাবুর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, তাই বলছিহু । ভদ্রর বাই করে, তাই সাজে গো, আর আমাদের সময় যত কলঙ্ক

বৃদ্ধা । তা এটা কি ভদ্ররের কাজ ? এ ত মুচনমানের কাজ ?

হু । তবে হেমবাবু এমন কাজ করেন কেন ?

বৃদ্ধা । করেন, তার কারণ আছে । ত'রা কি জানবি বল ? তোরা কানে তুলো দিয়ে থাকিস্, এ কথা কি জানবি বল ?

উভয় নবীনা । কি কি, বল না দিদি, এর কথাটা কি ?

বৃদ্ধা । বলি শুনিমনি বুঝি ? হেমবাবুর যে এখন আর না বিয়ে দিয়ে পারে না, সে কথা শুনিমনি বুঝি ?

উভয়ে । না না, কি কি ?

বৃদ্ধা । এই শুনি আর, কানে কানে বলি ।

উভয় নবীনা কাজকর্ম ফেলিয়া বৃদ্ধার কাছে দৌড়িয়া আসিল । বৃদ্ধা তাহাদের কানে কানে বলিল । সে শব্দটি তেতালা

পর্যন্ত ও বার-বাড়ী পর্যন্ত শুনা গেল—“বলি, শুনিমনি? হেম-বাবুর জালী যে পোরাডী।”

সত্যের আধিকার হইতে লাগিল, সত্য প্রচারিত হইতে লাগিল।

ভবানীপুর হইতে কালীঘাট পর্যন্ত খবর গেল। কালীতারার তিন খুড়খাণ্ডী সে দিন একাদশী করিয়া রুক্মভাব হইয়া আছেন, তাঁহার এই সংবাদ শুনিয়া একেবারে তেলে-বেগুণে জলিয়া গেলেন। বড়িট একটু ভাল-মাস্থ্য, তিনি বলিলেন, “এখনকার কালে আর ধর্ম নাই, বাছ-বিচার নাই, বার বা ইচ্ছে, সে তাই করে। করুক গিয়ে বাবু, যে পাশ করবে, সে-ই নরক ভুগবে, আমাদের সে কথার কাজ কি?”

ছোটটি বলিলেন, “কি হয়েছে, কি হয়েছে? আমাদের বৌয়ের ভাই বিধবা-বিয়ে করবে? ও মা, কি ভেন্নার কথা গো, হি! হি! হি! নোকের কি এখন মান সম্মম নেই, একটু লজ্জা নেই, বা ইচ্ছে, তাই করে? এ যে হাড়ী-ডোমেরাও এমন কাজ করে না, এ যে আমাদের কুলে কালী পড়ল, এ যে ছোট লোকের মেয়ে বিয়ে ক’রে আপনার কুলটা মজালেন। ও মা, হি! হি! হি! হি!”

মেজোটি একবার তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া কালীতারাকে সোধোখন করিয়া বলিলেন, “ও পোড়ারমুখী, ও হারামজাদী, বলি হেলা, এই তোদের মনে ছিল লা? ওলো, গলায় দড়ী দেবার ভজ্ঞে কি একটা পরসামেলি লা? বলি, কলসী গলায় বেঁধে আদি গলায় ডুবে মরলি নি কেন? মর, মর, মর। আমাদের কুলে এই লাহনা! ওলো বাগদীর মেয়ে! বলি, খন্তরকুলটা একেবারে ডোবাগি রে? তা রোস্ না, বিয়ে হোক না, তোরই একদিন, কি আমারই একদিন। নোড়া দিয়ে তোর মুখ ভোঁতা কা’রে দেব না? তোর

পিটে মুকো খেঁয়া ভাঙবো না? মাথায় খোল ঢেলে তোকে ঝেঁটা মেয়ে যদি বের ক’রে না দি, তবে আমি কায়েতের মেয়ে নই।”

কালীতারার কাদিয়া কাদিয়া সারা হইল, সন্ধ্যার সময়ে বিন্দুকে চিঠি লিখিলেন, “বিন্দু দিদি, এ কি কথা, এ ত আমি শুনি নাই, এ অপযশ, এ নিন্দা, এ কলঙ্ক কি আমাদের কুলে? বিন্দু দিদি, এ কাজটি করিও না। শরৎ যদি পাগল হইয়া থাকে, তাহাকে তোমাদের বাড়ী ঢুকিতে দিও না। এ কাজ হইলে আমি বস্তুরবাড়ী মুখ দেখাইতে পারিব না, খাণ্ডীরা আমাকে আন্ত রাখিবে না, তোমার কালীতারাকে আর দেখিতে পাইবে না।”

কলিকাতার সে সংবাদ রটিল। বিন্দুর জ্যেষ্ঠাইমা লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, “বিন্দু, তোকে আর সুধাকে আমি পেটের ছেলের মত মনে করি, পেটের ছেলের মত মাস্থ্য করোছি। বুড়ী জ্যেষ্ঠাই-মাকে এ বয়সে খুন করিসনি, মল্লিকবংশ একবারে কলঙ্কে ডুবাসনি। বাছা বিন্দু, তোর জ্ঞান হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে, বাপ-মার কুল নরকে ডুবাসনি। বাপ-মা থাকলে কি এমন কাজটি করতিস্ বাছা?”

বিন্দুর মাথার বজ্রাঘাত পড়িল। বিন্দু দেখিলেন, ঝিকে যে একটি টাকা দিয়া ছিলেন, তাহাতে কোন কলহ হয় নাই কলঙ্ক জগৎ শুদ্ধ রটিয়াছে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পুরুষ-মহলের সভামত।

হেমচন্দ্র বিদ্যুৎ মিকট লম্বত কথা অব-
গত হইয়া অস্ত্রকরণে বড়ই ব্যথিত হই-
লেন। শরভের প্রতি তাঁহার বে ভক্তি ও
জ্ঞা ছিল, তাহার কিছুনাথ লাঘব হইল না,
শরভের প্রভাবটি তিনি পাণ প্রস্তাব মনে
করিলেন না। তিনি শান্ত স্থিতিপ্রিয় লোক
ছিলেন, সমাজের মতের বিরুদ্ধে কার্য
করিয়া সকল বন্ধুবান্ধব ও স্বদেশীয়দিগের
মনে ক্রোধ দেওয়া স্তারসঙ্গত কার্য বিবেচনা
করিলেন না। বাহা হউক, তিনি এ বিষয়ে
অনেক চিন্তা করিয়া, অনেক পরামর্শ লইয়া
বাহা হউক নিশ্চিন্ত করিবেন, এইরূপ স্থির
করিলেন।

ভাগ্যক্রমে তাঁহার পরামর্শের অভাব
রহিল না। পরামর্শদাতৃগণ দলে দলে
আসিতে লাগিলেন, হিতৈষী বন্ধুগণ হিতকথা
বলিতে আসিতে লাগিলেন, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত-
গণ শাস্ত্রীয় কথা বলিতে আসিলেন, সমাজ-
সংস্কারকগণ প্রকৃত সংস্কার কাহাকে বলে,
বুঝাইতে আসিলেন; সমাজ-সংরক্ষকগণ
বুঝাইতে আসিলেন। ভবানীপুরে তাঁহার এত
বন্ধু ছিল, হেমচন্দ্র পূর্বে তাহা অনুভব করেন
নাই।

প্রথমে জনার্দন-বাবু, গোবর্দ্ধন-বাবু,
হরিশ্চর-বাবু প্রভৃতি বৃদ্ধ সমাজপতিগণ
আসিয়া হেম-বাবুর সঙ্গে অনেককণ এদিক
ওদিক কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। হেম-
বাবু অতি উজ্জ্বল কার্য-সম্পন্ন, তাঁহার শিষ্টা-
চারে সকলেই তুষ্ট আছেন, তাঁহার সর্বদাই
হেমবাবুর তত্ত্ব লইয়া থাকেন ও হিত-
কামনা করেন, হেমবাবুর চাকরীর কি

হইল, তিনি সাহেবদের সঙ্গে দেখা করিয়া
জান করিয়া চেষ্টা করেন না। কেন, তাঁহার
হেম-বাবুকে কোন কোন সাহেবের কাছে
লইয়া যাইবেন, ইত্যাদি অনেক যেরংগত
কথার আপনাদিগের অকৃত্রিম ঘেহ (বাহার
পরিচয় হেমবাবু ইতিপূর্বে পান নাই)
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনেককণ পর
শয়ৎ-বা র কথা উঠিল, হেমবাবুর স্বরের
কথাও উঠিল, জনার্দন-বাবু বলিলেন, “এখন-
কার কলেজের ছেলেরা সকলেই ঐরূপ,
তাঁহার ঐতি-নীতি বুঝে না, পৈতৃক আচার
হুসারে চলে না, স্তত্রায় দোষ ঘটে। তা
তুমি বাবা বুদ্ধিমান্ ছেলে, তুমি কি আর
নিরোধের কাজ করবে, তা আমরা
স্বপ্নেও মনে করি না। তোমাকে সংপরামর্শ
দেওয়াই বাহুল্য।”

গোবর্দ্ধন বাবু। তবে কি জান বাবা,
আমরা কয়েকজন বৃদ্ধা আছি, বতদিন না
মরি, তোমাদেরই হিতকামনা করি, দুটা
কথা না বললে নয়। শরৎটা লক্ষীছাড়া
ছেলে, আমাদের কথা শুনে না, যা ইচ্ছে তাই
করে, তা ওটাকে আর বাড়ীতে আসতে
দিও না, তা হ'লেই এ কথাটা আর কেউ বড়
শুনতে পাবে না, কে আর কার কথা মনে
ক'রে রাখে বল?

হরিশ্চর বাবু। হাঁ, তা বৈ কি? এ যে
মিস্ত্রিজার বাড়ীতে সে দিন একটা কলঙ্ক
উঠিল, তোমরা সে কথা অবগতই জান, (এই
বলিয়া কলঙ্কটি আর একবার প্রকাশ করা
হইল) তা মিস্ত্রিজা বুদ্ধিমান্ লোক, চাপিয়া
গেলেন, এখন আর সে কথা কে তোলে বল?

জনার্দন বাবু। হাঁ, তা বৈ কি? কে বা
কার কথা মনে রাখে? আজকাল সকলেই
আপনার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। সে কালে এক
রীতি ছিল, গ্রামের বৃদ্ধাদের কথাটি না

নরে পাড়ার কোম কাজ হ'ত না। কেমন, ল না গোবর্দ্ধন-বাবু, এইসকালে আমাদের ভোমসত না নিয়ে কি কেউ কোন কাজ করতে পারত ?

গোবর্দ্ধন বাবু। নাথি কি ? আর এখনই যারা একটু শিষ্ট-শাস্ত, তারা কোন্ আমাদের না জিজ্ঞাসা ক'রে কিছু করেন। ঐ ঘোষজা মশাইয়ের বিধবা ভাদ্রবৌকে নিয়ে সে বৎসর এইরূপ একটা কলঙ্ক হ'ল, (সে কলঙ্কটি সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা হইল) তা ঘোষজা মশাই তখনই আমার কাছে এসে বল্লেন, “হরিহর বাবু, করি কি ? যাই যে ?” তা আমি বল্লেম, “যখন আমার কাছে এসেছ, তখন কিছু ভয় নেই, আমি এর একটা কিনারা ক'রে দিবই।” কি বল জনার্দন-বাবু, আমরা অনেক দেখেছি শুনেছি, বিপদ-আপদের সময় আমাদের জানালে আমরা কোন একটা উপায় ক'রে দিতে পারি।

জনার্দন বাবু। তা বৈ কি।

হরিহর বাবু। তা আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া ঘোষজাকে বলিলাম, “তোমার ভাদ্রবৌকে ৬কালীধামে পাঠাইয়া দাও।” তিনি সেই অমুসারে কার্য্য করিলেন। এখন কাহার সাধ্য সে কথা উত্থাপন করে ? তা বাবা, এখনকার কি ছেলেরা, কি মেয়েরা সকলেই খেচ্ছা-চারী হয়েছে, যার যা ইচ্ছা করে, তাতে তোমার দোষ কি বল ? তা একটি কাজ কর। তোমার শ্রাণীটিকেও ৬কালীধামে পাঠিয়ে দাও, সেখানে যা ইচ্ছা করবে, কে দেখতে যাচ্ছে বল ? তোমার কোন অপঘণ হবে না।

হেম আর সন্ত করিতে পারিলেন না, কস্পিতস্বরে বলিলেন, “মহাশয়, আপনাদিগের কথা ঠিক বৃত্তিতে পারি-তেছি না, শরৎ যে সমাজনীতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে আমার মত

নাই ; সে বিষয় পরে বিচার্য্য। কিন্তু আপ-নারা যদি শরৎ-বাবুর অথবা আমার শ্যালীর চরিত্রের কোন ঘোষ ধরিয়াছে, এরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন, তবে একেবারে ভ্রম করিয়াছেন। তাঁহাদের নির্মল চরিত্রে ঘোষ স্পর্শে না, তাঁহাদিগের অপেক্ষা নির্দোষ-চারিত্র লোক আমি জানি না।”

জনার্দন-বাবু, গোবর্দ্ধন-বাবু ও হরিহর-বাবু একস্বরে বলিলেন, “না না, আমরা দোষের কথা বলি নাই, এমন কথাও কি লোকে বলে ?”

হরিহর বাবু। এমন কথাও কি লোকে বলে, যেরে কিছু হলেও কি লোকে বলে ? তা নয়, তা নয়। ঘোষজা মশাই কি সে কথা বলেছিলেন, তা নয়, অল্প একটু কারণ দেখিয়ে পাপ কর্লেন। তা আমরাও তাই বলছি, তোমার শ্রাণীর চরিত্রে কোন দোষ থাকলেও সে কথা মুখে আনতে আছে ? রাম ! আমরা কি কারও কলঙ্কের কথা মুখে আনতে পারি ? তা নয়, তা নয়। তবে গোলমালটা এইরূপে চুকিয়ে ফেল-লেই ভাল। সকল বিষয়েই সরল পথ অব-লম্বন করাই ভাল, সরলপথেই ধর্ম্ম।

জনার্দন বাবু। তা বৈ কি, তা বৈ কি, “যতো ধর্ম্মততো জয়ঃ” শাস্ত্রেই এ কথা আছে। হরিহর বাবু যে কথাটা বল্লেন, তাই সংপথ, তার কি আর সন্দেহ আছে ? তুমি বুদ্ধিমান্ হলে, এবারটা যেন চেপে গেলে, কিন্তু তুমি ছেলেমানুষ, যেরে অল্প-বয়স্ক বিধবা কি রাখতে আছে ? কখন কি হয়, তার ঠিক আছে ?

গোবর্দ্ধন বাবু। তা বৈ কি, শাস্ত্রে বলে, সহস্রাঙ্ক ইন্দ্রও নারীর গুণকথা দেখতে পান না, পঞ্চমুখ ব্রহ্মাও নারীর গুণকথা জানতে পারেন না। তুমি শুধু বাবা ছেলেমানুষ।

হরিহর বাবু। তা বৈকি, এবার কেন চাপিয়া গেলে, কিন্তু দৈবক্রমে—দৈবের কথা বলা যায় না—যদি যথাকালে তরুণ বরষা বিধবা একটি লজ্জান প্রসব করে, তাহা হইলে কি আর চাপিবার যো থাকিবে? লোক ত একেই কলঙ্প্রিয়, তখন কি আর রক্ষা থাকিবে? এখনই লোকে সেই কথা বলিতেছে। তা ওকালী-ধামে পাঠানই শ্রেয়ঃ।

ইত্যাদি নানা সারগর্ভ পরামর্শ দিয়া বুদ্ধগণ বিদায় হইলেন। হেমচন্দ্র রোষে ও অভিমানে উত্তর দিতে পারিলেন না, তাঁহার অলস নরন হইতে একবিন্দু অশ্রু বিমোচন করিলেন।

তাহার পর রামলাল, শ্রামলাল, যত্নলাল প্রভৃতি নবোদয় দল হেমচন্দ্রকে পরামর্শায়ত দান করিতে আসিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ শিক্ষিত; কেহ এটাল ক্লাস পর্যন্ত পাঠ করিয়া পরে বাড়ীতেই (রেনল্ডস প্রভৃতি) সাহিত্য আলোচনা করিয়া বিজ্ঞ হইয়াছেন; কেহ সচরিত্র; কেহ বা সভ্যতা-সম্মত আয়োদ্যগুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন ও দেখেন। কিন্তু পরামর্শদানে সকলেই সমান সক্ষম, সকলেই হেমচন্দ্রের “হিতৈষী” বহু।

তাঁহারা অত্য প্রাতে একটি কথা শুনিয়া হেমবাবুর নিকট আসিলেন, হেমবাবুর অযথা নিন্দার প্রতিবাদ করাই তাঁহাদের একান্ত ইচ্ছা, পাড়ার একজন বিজ্ঞোৎসাহী যুবক ও একজন ধর্মপরায়া বিধবার অযথা অপবাদ তাঁহারা সচু করিতে পারেন না, সেই জন্যই হেমবাবুর নিকট প্রকৃত অবস্থা জানিতে আসিলেন। কিন্তু হেমবাবুর যদি কোন কথা বলিতে কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন

না। কেন না, কাহারও গুপ্তকথা অল্পসন্ধান করা সূচি-সম্মত কার্য নহে। কিন্তু যদি হেম-বাবুর বলিতে কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে—ইত্যাদি ইত্যাদি নব্য ভাষার গৌরচন্দ্রিককা অনেকগুলি চলিল।

হেম-বাবুর এখন আর লুকাইবার কিছুই নাই, বৈষ্ণব অপবাদ রাষ্ট্র হইয়াছে, তাহাতে সত্যকথা প্রকাশ হওয়াই ভাল। এই অনাহুত বহুদিগের আগমনে ও প্রেমে তিনি অতিশয় তিক্ত হইলেও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া বাহা ঘটনা, তাহা জানাইলেন।

রামলাল। তা বাহাই হউক, অত্বে যে হোর অপবাদ শুনিলাম, তাহার অধিকাংশ মিথ্যা জানিরা আক্লাদিত হইলাম। কিন্তু দেখুন, সকলে সহজে এ অপবাদটি অবিবাহিত করিবেন না। আপনি সকল সময়ে বাটী থাকেন না, শরৎ কলেভেই কিছু অব্যাহা ও গরী এবং স্বীয় মতগুলি লইয়া বড় স্পর্ধা করে এবং নারীর চরিত্র হর্ষিঞ্জের। অতএব অপবাদ-সম্বন্ধে সমাজের মনে যদি কিছু সন্দেহ থাকে, তাহা স্বভাবসিদ্ধ এবং মহাযাচরিত্র পর্যালোচনার ফল মাত্র। তা বাহা হউক, আপনি বিবাহে আপাততঃ মত করেন নাই, এটি সুখের বিষয়।

শ্রামলাল। সে কথা যথার্থ, আরও দেখুন, এ কার্য প্রকৃত সমাজসংস্কার নহে। যে কার্যে আমাদের দিন দিন এক্যসাধন হইবে, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি হইবে, তাহাই আমাদের কর্তব্য। পুরাতন লোকদিগের স্ত্রীর আমাদের কোন প্রেজুডিস নাই, কিন্তু এ কার্যটি আমাদিগের সমাজে বিপ্লব ও বিচ্ছেদ ঘটাইবে মাত্র, ইহা দ্বারা আমাদের এক্যসাধন হইবে না, অতএব এ কার্য গর্হিত।

যত্নলাল। আরও দেখুন, মেলথস

বলেন, লোকসংখ্যা বড় দীর্ঘ বৃদ্ধি পায়, খাদ্য তত দীর্ঘ বৃদ্ধি পায় না। এই জন্যই মূলতঃ দেশে অনেক পুরুষ ও নারী অবিবাহিত থাকে; আমাদের দেশে সেটি হয় না, অতএব নিবেদন, বিধবাগুলিকে অবিবাহিতা রাখা কর্তব্য।

ভামলাল। আর আপনায় যত বুদ্ধিমান লোক এটিও অবশ্য বিবেচনা করিবেন যে, স্বদেশের উন্নতি, ভারতের উন্নতি, আমাদের সকলেরই উদ্দেশ্য; তাহাও বিধবা-বিবাহ দ্বারা বিশেষরূপে সংঘটিত হইবে না। আমার সামান্য ক্ষমতা দ্বারা বড় দূর দেশের উন্নতি হয়, আমি তাহার চেষ্টা করিতেছি। একটি লাইব্রেরী স্থাপন করি-
য়াছি, দেশস্থ যাবতীয় গ্রন্থকারদিগকে পুস্তকের জন্য পত্র লিখিয়াছি এবং প্রতি শনিবারে সেই লাইব্রেরীতে কয়েকজন বন্ধু সমবেত হন, রাজনৈতিক তর্কও করিয়া থাকেন। আপনায় যদি অবকাশ থাকে, তবে এই আগামী শনিবার আসিলে আমরা বড়ই তুষ্ট হইব।

বহুলাল। আরও দেখুন, আমাদের সংসারে যে কবিত্ব, যে মধুরস্বটুকু আছে, আমাদের গৃহে গৃহে যে অমৃতটুকু জুড়ান আছে, কি কাল কি ধনী সকল গৃহে যে অর্কিচর্চা মিলিতটুকু আছে, ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে সেটুকু কোথায়? বৈদেশিক আচরণ অঙ্গুরণ করিবেন না, তাহাতে আমাদের গৃহস্থস্থ বৃদ্ধ হইবে, ভারতবাসীর শেষ স্বধটুকু বিলুপ্ত হইবে, আর্ধ্য-ধর্মের নিমিত্ত দীপটি একেবারে নির্বাপন হইবে। ইউরোপীয়-দিগের সঙ্গুণগুলি অঙ্গুরণ করুন, আমাদের গৃহ-সংসারের কবিত্ব, মিষ্টত্ব ও হিন্দুস্বটুকু ধ্বংস করিবেন না।

রামলাল। সে কথা সত্য। বহুবাহুর কথাগুলি শুনিবেন, তাহার দ্বারা বিদেশ-হিতৈষী লোক আজকাল দেখা যায় না। তাহার কথাগুলি সারগর্ভ, তাহা আর আমার বলা বাহুল্য। আর যে অপবাদ শুনিলাম, তাহা যদি সত্য হয়—বাহা অনেকে বিশ্বাস করিবে, যদিও সে বিষয়ে আমার নিজের যত সমস্ত প্রমাণাদি না দেখিয়া ব্যক্ত করিতে চাহি না—যদি সে অপবাদ সত্য হয়, তাহা হইলে এইরূপ বৃদ্ধ ও এইরূপ রমণীকে উৎসাহিত করিলে ভারতের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, অধোগতি হইবে!

হেমচন্দ্র এরূপ তর্কের উত্তর করিতেও ঘৃণা বোধ করিলেন; নব্য পরামর্শদাতৃগণ কণেক পর উঠিয়া গেলেন।

তাহার পর সমাজ-সংরক্ষণের দুই একজন চাই, দিগ্গজ ঠাকুরকে লইয়া হেম-বাবুর বাটী আসিলেন। দিগ্গজ ঠাকুর ভবানীপুরের মধ্যে হিন্দুধর্মের একটি আক্টল'নী মহামেট, ধর্মশাস্ত্রের একটি পেসিকিক সমুদ্র, বিজ্ঞান একটি শুওধারী দিগ্গজ, তর্কে বহুবাহু অবতার। বেদ-বেদান্ত, ঋতি, স্মৃতি, ন্যায়, দর্শন, রাশি, ইতিহাস, ব্যাকরণ, অভিধান, সকলই তাহার কর্তৃত্ব, সকল বিষয়েই তাহার সমান অধিকার। তিনি আপন পরিমাণবহিত বিজ্ঞা-পয়োষি হইতে অজস্র তর্কশ্রোত বর্ষণ করিয়া হেম-চন্দ্রকে একেবারে প্রাবিত করিলেন, হেম-চন্দ্র একেবারে নিরস্ত হইয়া বসিয়া রহিলেন। যখন দিগ্গজ ঠাকুরের গলা জাড়িয়া গেল, বাক্য-ক্ষমতা শেষ হইল, (তর্কক্ষমতা শেষ হইবার নহে) তখন তিনি কাসিতে কাসিতে আরক্ত নরনে নিরস্ত হইলেন।

হেম তখন বীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "মহাশয়, এ কার্য করিতে এখনও আমার

মত নাই, সুতরাং আপনার একপে এইরূপ পরিভ্রম স্বীকার করার বিশেষ আবশ্যক নাই। তবে আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও পড়া-শুনায় বড়দূর উপলব্ধি হয়, তাহাতে বোধ হয়, বিধবা-বিবাহ লব্ধকে আবাদিগের শাস্ত্রেও দুটি মত আছে, ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রথা ছিল। বৈদিক কালে বিধবা-বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল, মহু প্রভৃতি শাস্ত্র-প্রণেতাদিগের কালে এ প্রথাটি একেবারে নিষিদ্ধ হয় নাই। কিন্তু ক্রমে উঠিয়া বাইতে-ছিল। পরে পৌরাণিক কালে এ প্রথাটি একেবারে নিষিদ্ধ হইয়া যায়। আমার শাস্ত্রে অধিকার নাই, আলোচনারও ক্ষমতা নাই, অস্ত্র পণ্ডিতদিগের মধ্যে বাহা শুনিয়াছি, তাহাই বলিতেছি। শুনিয়াছি, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতাগণ্য বিত্তাসাগর মহাশয়ও বলেন, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রের অন্তর্গত নহে।”

বাহারা দ্বি-প্রহর রজনীতে সহসা একটু গ্রামে আগুন লাগিতে দেখিয়াছেন, আকাশের রক্তবর্ণ দেখিয়াছেন, অগ্নির প্রজ্জ্বলিত অললহৌ জিহ্বা দেখিয়াছেন, তাহারাই তৎকালে দিগ্‌গজ ঠাকুরের মুখের ভঙ্গী কতক পরিমাণে অনুভব করিতে পারেন। অগ্নি-গর্জন-বিনিমিত-স্বরে তিনি কহিলেন, “সেই (কাসি) সেই বিধবা-বিবাহ-প্রচারক বিত্তাসাগর পণ্ডিত ? সে আবার পণ্ডিত ? সে বর্ষপরিচয় লিখিয়া পণ্ডিত হইয়াছে, (অধিক কাসি) একটা নৃতক প্রথা লইয়া দেশের সর্বনাশ করিয়াছে, ধর্মে কুঠারাবাত করিয়াছে, মহা-হৃদয়ের স্তরে স্তরে শেল নিক্ষেপ করিয়াছে, হিন্দু-চরিত্র অনপেনের কলঙ্করাশিতে আবৃত করিয়াছে, আর্ধ্যমান, আর্ধ্যগৌরব, আর্ধ্য রীতিনীতি একেবারে সূক্ষ্মবকে ময় করিয়াছে, (ভয়ানক কাসি) উঃ, (কাসি) সে পণ্ডিত ? সেই অধর্ষবিষেবী

য়েচ্ছদিগের অহঙ্করণকারী, বিদেশীর রীতির পক্ষপাতী, আর্ধ্যধর্মশূন্য, আর্ধ্য অভিমানশূন্য, আর্ধ্যবংশের কুসন্তান—(অনবরত কাসিতে বাক্যশ্রোত সহসা রুদ্ধ হইল। তখন আসন পরিত্যাগ করিয়া) চক্ক হে সংরক্ষক মহাশয়, এ বাড়ীতে আর থাকা নহে, এখানে পদবিক্ষেপ করিলেও পাপ আছে। বাহা শুনিয়াছিলাম, সমস্তই সত্য বটে, সে গর্ভবতী, যদি গর্ভ নষ্ট করে, তোমরা পুলিশে সংবাদ দিও।”

হেমচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলেন না, দিগ্‌গজ ঠাকুরের ক্রোধ ও অক্‌ভঙ্গী দেখিয়া তাঁহার একটু হাসি আসিল।

সে দিন সমস্ত দিন হেমচন্দ্রের পরামর্শের অভাব রহিল না। তাঁহার এত বন্ধু আছে, এত হিতৈষী আছে, এত পরামর্শদাতা আছে, তাহা পীড়ার সময়, কষ্টের সময়, দারিদ্র্যের সময়, হেমচন্দ্র, অনুভব করেন নাই।

কলিকাতা হইতে বালিগঞ্জ পর্য্যন্ত এ কথা রাষ্ট্র হইল। ধনঞ্জয়-বাবুর বাগানে সুসভ্য সভা হইয়াছে, গীত, নৃত্য, সঙ্গ ও দিবার ভ্রায় বাড়ের আলোক সে শতকে রঞ্জিত করিতেছে। তথায় দরিদ্রের এই কথাটি উঠিল।

ধনঞ্জয়-বাবু স্থানীয় কলঙ্ক সর্বদে আর কোন উপহাস করিলেন না, একটু হাসিলেন; কিন্তু অস্ত্রান্ত ধার্মিকগণ এ ধর্মবহির্ভূত কার্যের কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, হিন্দুধর্মের সুল স্তম্ভস্বরূপ হরিশঙ্কর-বাবু একেবারে অবাৎ হইয়া গেলেন, তাঁহার হস্ত হইতে সুখাপাঞ্জ পড়িয়া শত ধণ্ড হইয়া পেল, বলিলেন, “হী ধর্ম! তোমাকে কি সকলেই বিশ্বত হইল ? ভক্তলোকের বরে কি অধর্ম-আচরণ! হিন্দুমানী আর বুদ্ধি

থাকে না।" শিক্ষিত বহুনাথের হস্ত হইতে কাটা-ছুরি পড়িয়া গেল, সম্মুখের গোজিহ্বা অনাবৃত্তি রহিল, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আর সুখি ক্রাশনালিটি থাকে না।" বিবস্ত্র-বাবু, সিক্কেস্বর-বাবু, গিল্কেস্বর-বা প্রভৃতি বনিয়াদী ধনাঢ্যগণ নিজ নিজ আসনে কম্পিত হইলেন, এই ঘোর অধর্ম-কর্মের নাম শুনিয়া তাঁহারা বাকৃশক্তি-রহিত হইলেন এবং তাঁহাদের কালের লোকের ধর্মাত্মতার কথা শতমুখে প্রশংসা করিয়া এখনকার কলেক্টর ছেলেদের খেচ্ছাচারিতার ভূয়োভয়: নিন্দা করিতে লাগিলেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতার অবতার "মিষ্টর কর্থ-কার"ও তাঁহার সারগর্ভ মত প্রকাশ করিলেন যে, "এরূপ বিবাহ পাশ্চাত্য সভ্যতার অমুমোদিত নহে, এ পাশ্চাত্য সভ্যতার বিড়ম্বনা মাত্র। বিধবা বাহির হইয়া আসুক, জগৎ পরিদর্শন করুক, সুসভা সুরূপ যুবক-দ্বিগের সহিত আলাপ করুক, (দর্পণে নিজ প্রতিমূর্ত্তি দর্শন) তৎপর দীর্ঘ কোর্টসিপের পর একজনকে নির্বাচন করুক, এইরূপ কার্য পাশ্চাত্য সুসভা প্রথা; পিঞ্জরবদ্ধ বিধবাকে বিবাহ দেওয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার অবমাননা মাত্র।"

এই সারগর্ভ ভ্রমগ্রাহী বক্তৃতা শুনিয়া সভার সভ্যগণ বলিয়া উঠিলেন, "তাঁহারা ত জগৎ পরিদর্শন করিয়াছেন এবং সুরূচি-সম্পন্ন যুবকদ্বিগের সহিতও আলাপ করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের একটি করিয়া পাশ্চাত্য সভা (অর্থাৎ সুন্দর বর) মিলে না কেন? তাঁহাদের একটি করিয়া বিবাহ ঘটে না কেন?" সভা ও সভ্যদিগের মধ্যে এ রসের কথাটা সুধার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর গড়াইল, কিন্তু পাঠকগণ আমাদিগকে

মার্জনা করিবেন, আমরা সে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করিতে অক্ষম।

বিবাহগতের পরামর্শ, মতামত, বিক্রম ও দোষারোপ হেমচন্দ্রের কানে উঠিল। সম্ভার সময় হেম-বাবু বিন্দুর নিকট গিয়া বলিলেন, "সমাজ একমত হইয়া এই বিধবা-বিবাহ নিবারণ করিতেছে, এ কার্য করিতে আমার ইচ্ছা নাই। বাঁহাদের বিজ্ঞা আছে, বাঁহাদের বিজ্ঞা নাই, বাঁহারা সংলোক. বাঁহারা সংলোক নহে, বাঁহাদের শ্রদ্ধা করি এবং বাঁহাদের শ্রদ্ধা করি না, সকলে একমত হইয়া এ কার্য নিষেধ করিতেছেন।"

বিন্দু। আর তা ছাড়া এ কাজে কলঙ্ক কত, নিন্দা কত! এ কাজ কবুলে সমাজে আমাদের অস্তিত্ব নিন্দা হবে।

হে। না, তাহার বড় ভয় নাই। সমাজ অগ্রহ করিয়া আমাদের সম্বন্ধে যে কলঙ্ক বিখ্যাস করিতেছেন ও রটাইতেছেন, তাহা অপেক্ষা অধিক কলঙ্ক হইবার সম্ভাবনা নাই। বিধবা-বিবাহে প্রকৃত অধর্ম নাই, আমাদিগের হিতৈষিণ্য বিশেষ অগ্রহ করিয়া শরতের চরিত্র ও সরলা বালিকার চরিত্র-সম্বন্ধে যার পর নাই অধর্ম-সূচক প্রবাদ প্রকটিত করিতেছেন, এক্ষণে সেই অধর্মচরণ গোপন করিয়া রাখিলেই সমাজের মতে ধর্মরক্ষা হয়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ।

যার বে তার মনে আছে ।

সুধার বিবাহের কথা গাইয়া পাড়াপড়গাঁও ঘুম নাই, চল, একবার সেই সুধাকে দেখিয়া আসি। স্ত্রু গ্রহের অভ্যন্তরে সেই সরল

বালিকা কি করিতেছিল, চল, একবার তাহা দেখিয়া আসি ।

সুধার নিকট এ কথা গোপন রাখিবার সমস্ত যত্ন বুঝা হইল । যে কথা লইয়া পাড়ায় এত আন্দোলন, মেয়েমহলে এত আন্দোলন, সে কথা গোপন থাকে না । যে বাড়ীতে যি আছে, সে বাড়ীতে সংবাদপত্রেরও অনাবশ্যক ।

তবে যি বিল্লুর নিবেদনবাক্যের এইটুকু মান রাখিল যে, সুধাকে সব কথা ভাবিয়া বলিল না, সুধার চরিত্র-সম্বন্ধে যে কলঙ্ক উঠিয়াছিল, সেটুকু বলিল না । তবে শরৎ-বাবু যে সুধাকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল হইয়াছেন, মাতাঠাকুরাণীর নিকট সেই বিবাহের জন্য জ্ঞেপ করিতেছেন, পাড়ায় পাড়ায় এই কথা রাষ্ট হইয়াছে, তাহা সুধাকে গোপনে অবগত করাইল ।

বালিকা একেবারে শিহরিয়া লজ্জার অভিভূত হইল, বাতনায় অস্থির হইল । উঃ, এ কি সর্বনাশের কথা, কি অধর্মের কথা, এ কথা কেন উঠিল, সুধা লোকের কাছে কেমন করিয়া আর এ মুখ দেখাইবে ? কালী দিদির কাছে, শরতের মাতার কাছে, দেবী-বাবুর বাড়ীতে, চন্দ্রবাবুর বাড়ীতে কেমন করিয়া মুখ দেখাইবে ? হতভাগিনী আবার তালপুকুরে কোন মুখে কিরিয়া বাইবে ? ছি ছি ! শরৎবাবু এমন কাজ কেন করলেন, বিধবার নাম কেন লজ্জার ডুবালেন, এ কলঙ্ক কি আর কখনও ধাবে ? ঐ পথে মেয়েমাতুলেরা কি বলিতে বলিতে ঘাই-তেছে ? তাহারা বুঝি সুধার কলঙ্কের কথা কহিতেছে ! ঐ হেম-বাবু দিদির সঙ্গে কি কথা কহিতেছেন ? লজ্জায়, বিষাদে, মনের বাতনায়, বালিকা অধীর হইল, মুখ ফুটিয়া সে কথা কাতাতকৎ কহিতে পারে না ।

বালিশে মুখ লুকাইয়া সমস্ত দুই প্রহর বেলা একাকিনী কাঁদিল, সন্ধ্যার সময় না থাইয়া শুইতে গেল । উঃ, শরৎ-বাবু কেন এমন কাজ করিলেন ? দরিদ্র বিধবার কেন কলঙ্ক রটাইলেন ?

কিন্তু অন্ধকারে স্থাপিত লতা বেরূপ সহস্র বাধা অতিক্রম করিয়া একটি সূর্য্য-রশ্মির দিকে ধায়, অভাগিনী সুধার শুষ্ক অন্তঃকরণ সেইরূপ এই বাতনায় ও লজ্জায় জীবনের একটি আশা-রশ্মির দিকে ধাবিত হইল । বিষাদে অন্ধকারের মধ্যে সুধা যেন একটি কিরণছটা দেখিতে পাইল, অকুল সমুদ্রের মধ্যে যেন ধ্রুব-নক্ষত্রের হীন জ্যোতি তাহার নরনে পতিত হইল ।

শরৎ-বাবু কেন এমন কাজ করিলেন ? বোধ হয় শরৎ-বাবু না আসিলে সুধা যেমন পথ চাহিয়া থাকে, সন্ধ্যার সময় একাকিনী বসিয়া শরৎ-বাবুর কথা ভাবে, শরৎ-বাবুও সেইরূপ সুধার কথা একবার মনে করেন । বোধ হয়, দিন-রাত্রি শরৎ-বাবু এই লজ্জার কথা ভাবেন, বোধ হয়, সেই জন্যই অস্থির হইয়া শরৎ-বাবু এই লজ্জার কথা প্রস্তাব করিয়াছেন । বোধ হয়, শরৎ-বাবু অনেক বাতনা পাইয়াছেন, না হইলে কি দিদির কাছে মুখ ফুটিয়া এমন কথাও বলিতে পারেন ? যি বলে, শরৎ-বাবু বড় কাঁদিল হইয়া গিয়াছেন, অভাগিনী সুধার জন্য শরৎ-বাবু এত কষ্ট পাইয়াছেন । সুধার ইচ্ছা করে, একবার শরৎ-বাবুর পা ছুঁখানি হৃদয়ে ধারণ করে । তা কি হবে ? বিধাতা কি দরিদ্র সুধার কপালে এত সুখ লিখিয়াছেন ? শরৎ-বাবু বাহা প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা কি হইতে পারে ? উঃ, লজ্জার কথা, পাপের কথা, সুধা, এ কথা মনে স্থান দিও না ।

ধীরে ধীরে চক্ষু হইতে এক বিদ্রু অশ্রু

বাহির হইয়া পড়িল। ছোট ছোট দুটি হস্ত দিয়া সেই চক্ষু মুছিয়া কেলিয়া সুখা আবার ভাবিতে লাগিল,— “আচ্ছা, শরৎ-বাবু বাহা বলিয়াছেন, সত্য সত্যই যদি তাহা হয়? দরিদ্র সুখা যদি সত্য সত্যই শরৎ-বাবুর গৃহিণী হয়? তাহা হইলে প্রত্যঃকালে উঠিয়া সেই ভালপুকুরে শরৎ-বাবুর বাড়ীটি পরিষ্কার করিবে, উঠান ঝাঁট দিবে, বাসন মাজিবে, কামরনে শরৎ-বাবুর মাতাকে সেবা করিবে, আর স্বহস্তে শরৎবাবুর ভাত রান্না দিয়া খাইবার সময় তাঁহার কাছে বসিবে। অপরাহ্নে আক ছাড়াইয়া দিবে, বেলের পান্না প্রস্তুত করিয়া দিবে, আর স্বহস্তে মিছরীর পান্নার বাটি শরৎ-বাবুর মুখের কাছে ধরিবে।” সহসা একটি পদশব্দ হইল, সুখা শিহরিয়া উঠিল, লজ্জার মুখ লুকাইল, পাছে তাহার হৃদয়ের চিন্তা কেহ টের পায়, শাপীয়াসীর পাপচিন্তা পাছে কেহ জানিতে পারে।

আর যদি শরৎ-বাবুর বিদেশে কোথায় চাকরী হয়? সুখা দাসীর জ্ঞান তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে, হৃদয়ের সহিত তাঁহার বন্ধ করিবে, একটি ক্ষুদ্র কুঠীরে তাহার বাস করিবে, সুখা সেই কুঠীরে দুটি লাউগাছ দিবে, দুটি কুমড়াগাছ দিবে, দুই চারিটি কুলের গাছ স্বহস্তে রোপণ করিবে। কলিকাতার ঠাকুরদের সুন্দর সুন্দর ছবি চার পরস। করিয়া পাওয়া যায়, সুখা তাই কিনিয়া শুইবার ঘরটি সাজাইবে। উমা সিংহে চড়িয়া বাপের বাড়ী আসিয়াছে, উমার মাতা দুই হাত প্রসারিত করিয়া আলুথালু-বেশে মেরেকে একবার কোলে করিতে আসিয়াছে, দাসীগণ কেহ পাখা হাতে, কেহ থালা হাতে, কেহ কুলের মালা হাতে করিয়া দৌড়াইয়া আসিয়াছে। অথবা অন্ধকার জ্বলনের মধ্যে পতিপ্রাণা দমরুদী নিম্নিত রহিয়াছে, নল

রাজা উঠিয়া বসিয়া গালে হাত দিয়া চিন্তা করিতেছে। অথবা কুঞ্জবনে রাধিকা গালে হাত দিয়া ভাবিতেছে, বিদেশিনী তাহার নিকট বসিয়া ক্রুদ্ধের কথা বলিতেছে, শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া রাধিকার হৃদে চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। এরূপ ঠাকুরের ছবিগুলি দিয়া সুখা ঘরটি সাজাইবে, ভাল করিয়া ঝাঁট দিয়া ঘরটি পরিষ্কার করিবে, আপন হস্তে শয্যা প্রস্তুত করিবে, সন্ধ্যার সময় প্রদীপ জ্বালাইয়া শরৎ-বাবু আসিতেছেন বলিয়া প্রতীক্ষা করিবে। শরৎ বাবু বাড়ী আসিলে সুখা জল আনিয়া আপন হস্তে শরতের পা ধুইয়া দিবে, সেই পা দুখানি ধারণ করিয়া সাজ্জনরয়ে একবার বলিবে, “তোমার দয়া, তোমার যত্ন, কেমন করিয়া পরিশোধ করিব? আমার জীবনসর্ব্বস্ব তোমারই, দরিদ্র বলিয়া একটু রেহ করিও।”

চিন্তা একবার আরম্ভ হইলে আর শেষ হয় না। প্রাতঃকালে সুখা গৃহকার্য্য করিতে করিতে এই চিন্তা করিত, দ্বিপ্রহরের সময় সমস্ত দিন জানালার কাছে বসিয়া বসিয়া ভাবিত; সন্ধ্যার সময় বিলুপ্ত হেম-বাবু একত্র বসিয়া যখন কথাবার্তা কহিতেন, সুখাও তাঁহাদের কাছে বসিত, কিন্তু তাহার মন কোথায় বিচরণ করিত। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিলুপ্ত দেখিলেন, সুখা সমস্ত জানিতে পারিয়াছে, সুখা দিবা-রাত্রি চিন্তাশীল! সুখা আর প্রজ্বল বালিকা নহে, যৌবন-প্রারম্ভে যৌবনের যশ তাহার হৃদয়ে পরিপূর্ণ করিয়াছে। সুখা সমস্ত দিন অন্তঃকলঙ্ক; কখন কদাচ শরতের নামটি হইলেই সুখার মুখখানি লজ্জার রঞ্জিত হইত, বালিকা অন্তঃকলঙ্কে উঠিয়া বাইত।

একদিন অপরাহ্নে বিলুপ্ত ঘরে আসিয়া দেখিলেন, সুখা জানালার কাছে বসিয়া

একখানি বৈ পড়িতেছে, দিদি আসিতেই
সুখা সেই বইখানি মুড়িল।

বিন্দু। ও কি বৈ পড়ছিলে বোন?

একটু লজ্জিত হইয়া সুখা বলিল, “ও
বন্ধিম বাবুর একখানা বই।”

বিন্দু। কি বই?

সুখা। বিষবৃক্ষ।

বিন্দুর মুখ গভীর হইল। তিনি ধীরে
ধীরে বলিলেন, “ও বই আমাকে দাও, উহা
পড়িও না।”

সুখা দিদির হাতে বৈখানি দিয়া আন্তে
আন্তে জিজ্ঞাসা করিল, “কেন পড়িব না
দিদি? ও কি খারাপ বই?”

বিন্দু। না বোন, বইখানি ভাল, কিন্তু
ছেলেমানুষে কি ও বই পড়ে?

সুখা। তবে দিদি, তুমি আমাকে গল্পটি
বলিও।

বিন্দু। গল্প আর কি, নগেন্দ্রের সঙ্গে
সুন্দর বিবাহ হইল, কিন্তু তাহাতে সুখ
হইল না, ক্রন্দ শেষে বিষ খাইয়া মরিল।

শুধু-হৃদয়ে সুখ স্থানান্তরে গেল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

দেওয়ালী।

ভারতবর্ষের দেওয়ালী একটি বড় সুন্দর
প্রথা। এই কালী-পূজার অঙ্গকার নিম্নাধে
ভারতবর্ষের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত
বেখানে হিন্দু বাস করে, সেইখানেই গ্রাম,
নগর ও সংসারীর গৃহ দীপাবলীতে উদ্ভাস
হয়। সে দিন অমাবস্তার অঙ্গকার-রাত্রি
আলোকে পরিপূর্ণ হয়, আকাশের নির্মল
মঙ্গলসমুদ্র নিম্নে জগতের নক্ষত্র দেখিয়া

হাস্ত করে। ধনীর গৃহ উজ্জ্বল আলোক-
শ্রেণীতে পরিপূর্ণ হয়, দরিদ্র গৃহিণী একটি
পরসার তেল কিনিয়া কোন প্রকারে পাঁচটি
প্রদীপ সাজাইয়া সন্ধ্যার সময়ে কুটীরদ্বারে
জালাইয়া দেয়।

কলিকাতায় আজ বড় ধুম। গৃহে গৃহে
তুবড়ী উজ্জ্বল অগ্নি-কণা উদ্যৌরব করিতেছে,
যেন আমাদের টাউন হলার সমস্ত-
দিগকে অহুসরণ করিতেছে, সেইরূপ গলার
আওয়াজের সহিত তাহাদের কার্য শেষ
হয়। যুবা যশোলিপ্সু দিগের স্তায় হাউইবাঁজি
আকাশের দিকে মহা ভেজে উঠিতেছে,
আবার তেজটুকু বাহির হইয়া গেলে হেঁট-
মুখ হইয়া মাটিতে পড়িতেছে; যাহার মাথার
পড়ে, তাহার সর্বনাশ। বঙ্গদেশের
অসংখ্য নব্য কবির স্তায় আজি রাত্রিতে
অসংখ্য পটকা শব্দ করিতেছে—একই আও-
রাজে তাহাদের উত্তম শেষ—কেন না, প্রথম
প্রকাশিত পদ্মকুমুদ বা গীতিকাব্যটি বিক্রয়
হইল না। বিষয়ীর স্তায় চরকিবাজী বুথা
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে, ঘুরিতে ঘুরিতেও
সকলকে জালাইতেছে, মেজাজ বড় গরম,
কেহ কাছে বাইতে পারে না। আর ছুঁচা-
বাঁজির ক্ষুদ্র ঘণিত জীবন ছুঁচামি করিয়াই
শেষ হইল; কুটিলতা! ভিন্ন সরল গতি
তাহারা জানে না, পরকে বিরক্ত করা, পর-
নিন্দা, পরহিংসা, পরমানি তাহাদের জীব-
কার উপায়।

রাত্রি দশটার পর শরচ্চন্দ্র হেমের
বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বিন্দুর সহিত
দেখা করিবেন মনে করিয়াছিলেন, দেখিলেন,
স্বয়ং হেমচন্দ্র দ্বারদেশে তাঁহাকে প্রতীক্ষা
করিতেছেন। হেমচন্দ্র নিম্নে শরন্তের হাত
ধরিয়া বাহিরের দ্বারে লইয়া গেলেন, শরৎ
লজ্জার ও উদ্বেগে কাঁপিতে কাঁপিতে হেমের

সহিত সেই ঘরে গিয়া বসিলেন, মুখ নত করিয়া রহিলেন, বাক্যক্ষুণ্ণ হইল না।

হেম প্রদীপের সন্তে উসকাইয়া দিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, “শরৎ, আমার স্বীকে ভূমি যে কথা বলিয়াছিলে, তাহা শুনিয়াছি।”

শরৎ অনেক কষ্ট করিয়া অশ্রুটখরে বলিলেন, “বদি আমি দোষ করিয়া থাকি, আপনাদের বালা-স্বহৃদের এই একটি দোষ কমা করুন।”

হেম। শরৎ, তুমি দোষ কর নাই, তোমার উন্নত চরিত্রের উপযুক্ত কার্য করিয়াছ। সমস্ত জগৎ যদি তোমাকে নিন্দা করে, জানিও, তোমার প্রতি আমার মন তিলাঙ্কিত বিচলিত হয় নাই।

শরৎ উত্তর করিতে পারিলেন না, তাহার চক্ষুর জল হৃদয়ের ক্রতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। হেমচন্দ্র তাহা বুঝিলেন।

হেম। আমার স্ত্রী বালাকাল অবধি তোমাকে বড় ভালবাসেন, ভ্রাতার মত স্নেহ করেন, তিনিও তোমার কথায় দোষ গ্রহণ করেন নাই। তোমার প্রতি আমাদের ভক্তি, আমাদের স্নেহ চিরকাল একরূপ থাকিবে।

শরৎ। আপনাদের এই দয়া আমি এ জীবনে ভুলিব না।

কণেক উত্তরে চুপ করিয়া রহিলেন, পরে অনেক কষ্টের সহিত শরৎ হৃদয়ের উবেগ দমন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “আমার প্রস্তাব-সম্বন্ধে একটু বিবেচনা করিয়াছেন?” খাস রুদ্ধ করিয়া শরৎ উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, তাহার জীবনের সুখ বা দুঃখ এই উত্তরে নির্ভর করে।

হেম। সেই কথা বলিতেছি। তুমি

সকল দিক্ দেখিয়া, সকল বিষয় আলোচনা করিয়া এই প্রস্তাবটি করিয়াছ?

শরৎ। আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতদূর বুদ্ধিতে পারি, ইহাতে কোন পক্ষে কোন ক্ষতি দেখিতে পাই না। যতদূর আমার সাধ্য, আমি বিশেষ চিন্তা করিয়াই এ প্রস্তাবটি করিয়াছি।

হেম। শরৎ, তুমি শিক্ষিত, কিন্তু তোমার বচন অল্প, এই জন্যই আমি হুই একটি কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। এ বিবাহে অতি-শয় লোক-নিন্দা।

শরৎ। অনেক নিন্দা সহ্য করিয়াছি, জীবনে অনেক নিন্দা সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি। কাজটি যদি অস্ত্রায় না হয়, তবে নিন্দা-ভরে আমি জীবনের সুখ হুইসম্বন্ধন করিব?

হেম। তোমাদের একঘরে করিবে।

শরৎ। সমাজের যদি তাহাতেই রুচি হয়, তাহাই তরুন। আমি সমাজের অঙ্গ-গ্রহের প্রার্থী নহি।

হেম। তোমাদের নিষ্কল কুলে কলঙ্ক হইবে।

শরৎ। কলঙ্ক কি? আমি বিধবাবিবাহ করিয়াছি, এই কথা? এটি যদি পাপকার্য্য না হয়, তবে সে কলঙ্ক আমার গারে লাগিবে না; যাহারা নিন্দা করিবেন, তাহাদের মতামতে আমার কতিবুদ্ধি নাই। আর যদি আপনি এ কাজ নিন্দনীর মনে করেন, আজ্ঞা করুন, আমি ইহাতে নিরস্ত হই।

হেম। বিধবা-বিবাহ বোধ হয় আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়, কিন্তু আধুনিক রীতিবিরুদ্ধ।

শরৎ। জিৎশং বৎসর পূর্বে সমুদ্রগমনও রীতিবিরুদ্ধ ছিল, অতঃপরে

সহস্র সহস্র বাড়ী জগন্নাথ বাইতেছে । চন্দ্র-নাথ-বাবু সে দিন বলিলেন, অস্বাস্থ্যকর নিয়মগুলির ক্রমশঃ সংস্কার হওয়াই জীবিত সমাজের লক্ষণ । ক্রমশঃ উন্নতিই জীবনের চিহ্ন, গতিহীনতা মৃত্যুর চিহ্ন ।

হেম । শরৎ, তুমি চিন্তাশীল, তুমি উদার-চরিত্র, একটি কথা আমি স্পষ্ট করিয়া বলি, বিশেষ চিন্তা করিয়া তোমার প্রকৃত মতটি আমাকে বলিও । দেখ, হ্রদে উষেগ চিরকাল সমান থাকে না, অল্প বে প্রণয় আমাদের গৃহে উদ্ভাস প্রায় করে, দুই বৎসর পর সেটি হ্রাস পায় অথবা আমরা সেটি একেবারে ভুলিয়া যাই । সুখের প্রতি তোমার এক্ষণে প্রথম চিরকাল না থাকিতে পারে, তখন তোমার মনে কি একটু আক্ষেপ উদয় হইবে না ? উত্তর করিও না, আমি বাহা বলিতেছি, আগে মন দিয়া শুন । তখনও তোমরা একঘরে হইয়া থাকিবে, বন্ধুগণ তোমাদের গৃহে আহার করিবে না, তোমার কন্যাকে কেহ বিবাহ করিবে না, তোমার পুত্রকে কেহ গৃহে ডাকিবে না, সমাজের মধ্যে তোমরা একক । তখন হর ত মনে উদয় হইবে, কেন বাল্য-কালে না বুঝিয়া একটি কাজ করিয়া এত বিপদ জড়াইলাম, আমার স্নেহের পাত্র, ভালবাসার পাত্র পুত্র-কন্যাকে জগতে অনুখী করিলাম । শরৎ, যে কাজে এই ফল সম্ভব, সে কাজে কি সহসা হস্তক্ষেপ করা বিধেয় ? যৌবনের সময় একটু বিচক্ষণতার সহিত কার্য্য করিয়া বার্ত্তকোর অনুশোচনা দূর করা উচিত নহে ? সুখের স্তার অনিন্দনীর, রূপ-বভী, জ্যোতিষবর্ষা, সরলজন্ম অনেক বালিকা কারুগৃহে আছে, তোমার স্তার কার্য্যতঃ পাইলে তাহাদের পিতা-মাতা আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিবেন, সেরূপ

বিবাহ করিলে এখন না হউক, কালে তুমিও সুখী হইবে । শরৎ, তুমি বুদ্ধিমান, বিবেচনা করিয়া কার্য্য কর, এখনকার লালসার বশ-বর্ত্তী না হইয়া বাহাতে জীবনে সুখী হইবে, তাহাই কর ।

শরৎ । হেম বাবু, আমার কথার বিখ্যাস করুন, আমি কেবল হ্রদের উষেগের বশ বর্ত্তী হইয়া এই প্রস্তাব করি নাই, জীবনে সুখী হইব, সেই আশার প্রস্তাব করিয়াছি । আপনি যে কথাগুলি বলিলেন, তাহা শতবার আমার মনে উদয় হইয়াছে, আলোচনা করিতে ক্রটি করি নাই । আক্ষেপের বিষয়, বাহা বলিতেছেন, যদি বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ কার্য্য হয়, তবে আক্ষেপ হইবে বটে, যদি তাহা না হয়, তবে তদ্ব্যতীত কখনই আমার হ্রদে আক্ষেপ উদয় হইবে না । বলুন, এই বিশীর্ণ সমাজে কোন্‌ বিজ্ঞ লোক সংকার্য্য করিয়া পরে আক্ষেপ করিয়াছেন ? ধর্ম্মপ্রচার করিয়া অনেকে জাতি হারাইয়াছেন, বিদেশগমন করিয়া অনেকের জাতি গিয়াছে, ইহাদিগের মধ্যে কোন্‌ তেজস্বী লোক সেইরূপ কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া পরে আক্ষেপ করিয়াছেন ? সমাজের সংস্কার-পথে তাঁহারা অগ্রগামী হইয়াছেন, এই চিন্তা তাঁহাদিগের বার্ত্তকো শাস্তি দান করে । হেম-বাবু, তাঁহারা সমাজের বহির্ভূত নহেন, সমাজ অল্প তাঁহাদিগকে ভক্তি করে, সমাদর করে, স্নেহ করে, কল্যাণ তাঁহাদিগকে আগুন বলিয়া গ্রহণ করিবে । এইরূপে সমাজসংস্কার সিদ্ধ হয়, এইরূপে জীবিত সমাজ হইতে অনিষ্টকর নিবেদনগুলি একে একে খলিত হয় ।

হেম-বাবু, পরে আক্ষেপ হইবে, এরূপ কাজ করিতেছি না, চিরকাল স্নেহে থাকিব, জগদীশ্বরের ইচ্ছায় চিরকাল অভাগিনী

স্বধাকে স্বধী করিব, এই জন্ত এই কাজ করিতেছি।

স্বধার মন, স্বধার হৃদয়, স্বধার মেহ, সরলতা ও আত্মবিসর্জন আমি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছি, স্বধা আমার সহ-ধর্মিণী হইলে এ জীবন অন্তিম হইবে। হেম-বাবু, আমার স্বপ্নের উষেগের কথা বলিয়া আপনাকে তাক্ত করিব না, কিন্তু যদি এ বিবাহে আপনাদিগের মত না হয়, আমার জীবনের উত্তম ও আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ ও চেষ্টা অস্ত সাধ হইল, হৃদয়ে একটি শেল লইয়া প্রমজীবীরা পরিপ্রম করে না।

হেমচন্দ্র একটু হাসিয়া বলিলেন, “একটি বালিকার জন্ত উৎসাহী পুরুষের জীবনের উৎসাহ লোপ হয় না, একটি নৈরাশ্রে তোমার জ্ঞান উন্নত-হৃদয় যুবকের জীবনের চেষ্টা ও উত্তম ক্ষান্ত হইবে না।”

হতাশ হইয়া শরৎ বলিলেন, “একটি অবলম্বন না থাকিলে মনুষ্য-হৃদয়ে উৎসাহ, চেষ্টা, ধর্ম কিছুই থাকে না, অতঃপর আমার জীবন অবলম্বনশূন্য হইল। কিন্তু একথা আপনাকে বুঝাইতে পারি, এরূপ আমার ক্ষমতা নাই। তবে আপনারা স্থির করিয়াছেন, এ বিবাহে আপনাদিগের মত নাই?”

হেমচন্দ্র শরতের দুইটি হাত ধরিয়া হাসিয়া বলিলেন, “শরৎ, তুমি ভাল করিয়া বুঝিয়া স্থিরিয়া এই কার্যটি করিতেছ কি না, তাহাই দেখিতেছিলাম। উপরে যাও, আমার স্ত্রী তোমাকে বলিলেন, এ বিবাহে আমাদের সম্পূর্ণ মত আছে। হতাশাগিনী স্বধার জীবন জগদীশ্বর স্বত্বপূর্ণ করিবেন। তাহাতে কি আমাদের অমত হইবে? জগদীশ্বর তোমাদের উভয়কে স্বধী করুন।”

• শরৎ উত্তর করিতে পারিলেন না। ধারা বহিরা তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রু পড়িতে

লাগিল। তিনি নীরবে হেবের হাত দুটি আপনার মাথার স্থাপন করিলেন, পরে উপরে গেলেন।

শরৎঘরে বিন্দু একটি প্রদীপ জালিয়া একটি মাত্র পাতিয়া বসিয়াছিলেন, শরৎ সহসা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বিন্দুর পা দুটি ধরিয়া নয়নজলে তাহা সিক্ত করিয়া পদ্ম-গদঘরে বলিলেন, “বিন্দু দিদি, তুমি আমাকে জীবনদান করিলে, এ দয়া, এ মেহের কি পরিশোধ করিতে পারি?”

বিন্দু। ও কি শরৎ-বাবু, ছাড়, ছাড়, ছি! ছি! যার পা ধ্বংস হইবে, সে ধ্বংসই এখন, আমাকে কেন? ছি! ক্ষেপে দাও।

শরৎ একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, “বিন্দু দিদি, তুমি এ কথা বুঝিয়াছ, তুমি এ কার্যে সম্মত হইয়াছ, তাহার জন্ত আমি চিরকাল তোমার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।”

বিন্দু। আর সম্মতি না দিয়া কি করি? যখন বরকর্তা ও কস্তাকর্তা সম্মত হয়েছেন, তখন আর আমরা বারণ ক’রে কি করি?

শরৎ। বরকর্তা ও কস্তাকর্তা কে?

বিন্দু। দেখতে পাচ্ছি, বরই বরকর্তা, কস্তাই কস্তাকর্তা। বর এসে কনে দে’খে গেলেন, বেশ পছন্দ হ’ল, আর কনেও লুকিয়ে লুকিয়ে বর দেখলেন, বেশ পছন্দ হ’ল, সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেল!

শরৎ। বিন্দু দিদি, একবার উপহাস ভাগ কর, তুমি নিঃসঙ্কটিভ-সন্তে তোমার সম্মতি প্রকাশ করিয়া আমার মনকে শান্ত কর। স্বধা ছেলেমানুষ, তার আবার সম্মতি কি? সে এ গুরু কার্যের কি বুঝবে বল?

বিন্দু। না গো, সে এখন বেশ বুঝতে শুরুতে গিয়েছে। তা’ বুঝি ভান না? সে যে

। সেখানে যেতে হয়েছে, লুকিয়ে লুকিয়ে
হুক পড়ে ।

শরৎ । তোমার পায়ে ধরি বিন্দু দিদি,
ছাড়, একবার তোমার মনের কথাটি
মা আমাকে তুষ্ণ কর ।

বিন্দু । না বাবু, পায়ে-টারে ধরো না,
ইহা সুখ দেখতে পাবে, আবার রাগ
ব ? তুমি চ'লে গেলে কি আমরা ছুটি
ন কৌদল করব ? পরের দারে কেন
। বাবু ?

শরৎ । তোমার সঙ্গে আর পারিলাম
বিন্দু দিদি ! মনে করিয়াছিলাম, তোমার
পরামর্শ করিব, সব ঠিকঠাক করিব,
দখিতেছি, আজ কিছুই হইল না ।

বিন্দু । তা ঠিকঠাক আর কি ? কেবল
ন-পুরুত ডাকা বাকি আছে বৈ ত নয়,
না হয় ডেকে দি বল ? না, কি আজ-
কলেজের ছেলে নিজেই বায়ুন-পুরুতের
। সেরে নেয়, তাও ত জানি না । স্ত্রী-
য়ারটা কি আমাদের করুতে হবে, না তাও
নিজেই সেরে নেবে ? তা না হয় সুধাকে
ক দি ? ও সুধা ! একবার এদিকে আর
বানু, শরৎ-বাবু তোকে ডাক্‌চেন, বড়
গর, একটু শীঘ্র ক'রে'আর ।

শরৎ হতাশ হইয়া উঠিলেন, বিন্দুও
নতে হাসিতে উঠিলেন । শরৎ তখন
র ছুটি হাত ধরিয়া বলিলেন, “বিন্দু
দি, তুমি ছেলেবেলা থেকে আমাকে
স্নেহ কর, একটি কথা শুন । তুমি
দায়ী সম্মত হইয়াছ, হেম-বাবু তাহা
টাকে বলিয়াছেন, একবার সেই কথাটি
। বলিয়া আমাকে তুষ্ণ কর, একবার
মাদের আলীকাদ কর ।”

বিন্দু তখন ধীরে ধীরে বলিলেন, “শরৎ-
, ভগবান আমার অভাগিনী ভগিনীর

জীবনের সুখের উপায় করিয়া দিয়াছেন,
তাহাতে কি আমাদের অমত ? ভগবান
তোমাকে সুখে রাখুন, তোমার চেষ্টাগুলি
সকল করুন, তোমাকে যান ও যণ দান
করুন । অভাগিনী সুধাকে ভগবান সুখে
রাখুন, বেন চির পতিব্রতা হইয়া সংসারে
সুখলাভ করে ।”

শাক্তনয়নে শরৎ উত্তর করিলেন, “বিন্দু-
দিদি, জগদীশ্বর তোমার এ দয়ার পুরস্কার
দিবেন । তোমাদের দয়া, তোমাদের সং-
কার্য, লাহস, তোমাদের অনিন্দনীয় স্নেহ এ
জগতে ছলভ । লোকনিন্দা-ভয় করিও
না ; বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণ বলেন, বিধবা-
বিবাহ আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে ।”

বিন্দু । শরৎ বাবু, আমি যেয়েমাছব,
আমি শাস্ত্র বুঝি মা । কিন্তু আমার ক্ষুদ্র
বুদ্ধিতে বোধ হয় যে, কতি মেয়েকে আমরা
চিরকাল বাতনা দিব,এরূপ আমাদের শাস্ত্রের
মত নয়, দয়াবান পরমেশ্বরেরও ইচ্ছা নয় ।

জগতের মধ্যে শরচ্চন্দ্র বিন্দুর নিকট
অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বিদায় লই-
লেন ; নীচে উঠানে আসিলেন ; দেখিলেন,
সুধা ভাঁড়ার-খরের দরজার চাবী দিয়া
একটি প্রদীপ হাতে করিয়া বাতির হইয়া
আসিতেছে । শরৎ সুধাক প্রায় ছই মাস
অবধি দেখেন নাই, তাঁহার হৃদয় স্তম্ভিত
হইল, শরীর কণ্টকিত হইল । ঐ লাবণ্যময়ী
পবিত্রহৃদয়া স্বর্গীয়ী কল্পা কি শরতের
হইবে ? ঐ মেহমারিত নির্মল নয়ন দুটি কি
শরৎ চুম্বন করিবেন ? ঐ লতা-বিনিমিত
কমনীয় পেলব বাহ দুটি কি শরৎ নিজ বাহুতে
ধারণ করিবেন ? ঐ কুসুম-বিনিমিত
লাবণ্য-বিভূষিত দেহলতা কি শরৎ নিজ বক্ষে
ধারণ করিবেন ? শরতের দহিত্র কুটীরে কি
ঐ স্বন্দর কুহুমটি দিবা-রাত্রি প্রক্ষুটিত

খাকিবে? প্রাতঃকালে উঠার আলোচকর
তার এই প্রশ্ন-আলোক কি শরতের জীবন
আলোকিত করিবে? রায়কালে এই মেহ-
প্রদীপ কি শরতের জ্বর? কুটার উজ্জল
করিবে? অসংখ্য উভয়ে, অসংখ্য চেষ্টায়,
ক্রেপে ও পরিশ্রমে, এই মেহময়ী ভাব্য কি
শরতের জীবনে শান্তি দান করিবে, জীবন
সুখময় করিবে? এইরূপ চিন্তা-লহরীতে
শরতের পূর্ণ জন্ম উদ্ভাসিত লাগিল, শরৎ
একটি কথা কহিতে পারিলেন না।

সুখা কবাকটের শিকলো দিয়া চাবী বন্ধ
করিয়া, দেখিল, শরৎ-বাবু দাঁড়াইয়া
আছেন। সহসা তাহার গোরবর্ণ মুখমণ্ডল
লজ্জার রক্তবর্ণ হইল, সুখা হেটুম্বী হইল,
মাথার কাপড়টি টানিয়া দিল। আবার শরৎ-
বাবুর কাছে মাথার কাপড় দিল মনে করিয়া
অধিক লজ্জিত হইল, চক্ষু ছুটি মুদিত করিল,
চক্ষুর উপরের চর্ম পর্যন্ত লজ্জার রঞ্জিত হই-
য়াছে। সুখা আর দাঁড়াইতে পারিল না,
দৌড়াইয়া পলাইয়া গেল।

সুখার সেই রঞ্জিত অবনত মুখখানি
অনেক দিন শরতের জন্মের অভিত রহিল।
ক্রেপে, নৈরাশ্রে, পীড়ার সে মুক্তি অনেক দিন
তাঁহার স্মরণপথে আরোহণ করিয়াছিল।

আনন্দ ও উদ্বেগপূর্ণ জন্মের শরৎ-বাবু
আসিলেন। শরতের ভাগ্যে কি এই স্বর্গীয়
সুখ বর্ষাধী আছে? না অস্ত রজনীর দীপা-
বালীর জ্বার এই সুখের আশা সহসা নিবিয়া
বাইবে, বোর অমাবস্তার অন্ধকার শরতের
জন্ম-পূর্ণ করিবে? অপরিমিত সুখ মহাব্য-
ভাগ্যে প্রায় ঘটে না, অপরিমিত সুখের
সময় মহাব্যজ্ঞানের এইরূপ ভয়ের উদয়
হয়।

বাণী আসিবামাত্র শরতের তৃত্য শরতের
হস্তে একখানি পত্র দিল। শরতের জন্ম

মহা তত্ত্ব হইল, কেন হইল, শরৎ তাহা
জানেন না।

উপরে গিয়া বাতির আলোকে শরৎ
দেখিলেন, তাঁহার মাতার চিঠি। মাতা
গুরুকে দিয়া পত্র লিখাইয়াছেন। পত্র এই-
রূপ --

“বাহা শরৎ! তুমি সুস্থ-শরীরে কুশলে
থাক, তোমার চেষ্টা সফল হয়, তোমার
জীবন সুখময় হয়, তাহাই ভগবানের নিকট
দেয়ায় প্রার্থনা করিতেছি।

“বাহা, আজ একটি নিন্দার কথা শুনিয়া
মনে বড় ব্যথা পাইলাম। বাহা শরৎ, তুমি
ভাল ছেলে, তুমি মাকে ভালবাস; আমি
এ নিন্দার কথা বিশ্বাস করি না। তুমি
তোমার অভাগিনী মাতাকে কষ্ট দিবে না।

“লোকে বলে, তুমি সুধাকে বিবাহ
করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। বাহা, এটি অর্থের
কথা, এ কাজটি করিয়া তোমার বাপের
নির্ধন কুলে কলঙ্ক দিও না, তোমার মাতা
দিন বেঁচে আছে, তাহাকে তুমি কষ্ট দিও
না। বাহা, তুমি ত কথার অবাধ্য ছেলে
নও।

“বাহা শরৎ, আমি অনেক কষ্ট সহ
করেছি। তোমার বাপ আমাকে কাঁদিয়ে
রেখে গিয়েছেন, বাহা কালীর বে অবস্থা, তা
তুমি জান। তুমি আমার জন্মের ধন, তোমার
আশার বেঁচে আছি, এ বরসে তুমি আমাকে
কাঁদাইও না, আমার অধিক দিন বাঁচবার
নেই।

“আমার মাথার চুলের মত তোমার পর-
মাতৃ হোক। তববান্ তোমাকে সংসারে সুখ
লাভ করুন, পুণ্যকর্মে তোমার মতি হোক।
এ অভাগিনী আর কি আশীর্বাদ করবে?”

শরৎ একবার, দুইবার, তিনবার এই
পত্র পাঠ করিলেন। তাঁহার হাত কাঁপিতে

লাগিল, লম্বা শরীর কাঁপিতে লাগিল, চক্করল
হস্ত হইতে পত্রখানি পড়িয়া গেল ; শরৎ
বৃদ্ধিত হইয়া ভূতলে পড়িল ।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ।

মাতা ও সন্তান ।

সে দিন রাজিতে শরৎ বে মাতন্য ভোগ
করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিতে আমরা
অক্ষম । নৈরাত্তের কৃষ্ণবর্ণ ছায়া তাঁহার হৃদ-
য়কে আবৃত করিল, ঘৃণা ও লজ্জা তাঁহাকে
বাঞ্ছিত করিল, বজুর সর্বনাশ করিয়াছেন,
এই চিন্তা শত বৃদ্ধিকের স্তায় তাঁহাকে দংশন
করিতে লাগিল ।

যে স্বপ্নবৎ সুখের আশা ছয় মাস ধরিয়া
শরৎ হৃদয়ের হৃদয়ে সযত্নে ধারণ করিয়াছেন,
তাহা অভ্র জলাঞ্জলি দিবেন ? মাতৃ-আজ্ঞা-
পালনার্থ শরৎ তাহা করিতে প্রস্তুত আছেন ।
সমস্ত জীবন সুখশূন্য, উদ্বেগশূন্য, আশাশূন্য
হইবে, মরুভূমির স্তায় শুষ্ক ও রসশূন্য হইবে,
দুর্ভিক্ষ জীবনভার বহন করিতে পারিবেন ?
মাতৃ-আজ্ঞার অন্ত শরৎ তাহাতেও প্রস্তুত
আছেন । কিন্তু জীবনের প্রিয়তম বন্ধু হেম-
চন্দ্র ও বিন্দুর নামে আজি যে কলঙ্ক রটিল,
সমাজে তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিবে, তিরস্কার
করিবে, অস্বস্তি দিয়া তাঁহাদিগের দিকে
দেখাইয়া দিবে, শরৎ সেটি কি সহ্য করিতে
পারিবেন ? লোকে এখন বলিবে, ঐ দুই
জনে একটা নষ্টা বিধবাকে শরতের সঙ্গে
বিবাহ দিতে চাহিয়াছিল, শরৎ বৃদ্ধিয়া
সুস্থিয়া সে বিবাহ করিলেন না, ব্যক্তিচারি-
নীটী হেমবাবুর ঘরেই আছে, এ হৃদয়বিদারক

বিন্দু বালাকালাবধি শরতের স্নেহবরী ভগি-
নীর স্তায়, তাঁহার প্রতি শরৎ এইরূপ আচ-
রণ করিবেন ? যে হেম-বাবু স্বীয় ঔদার্য্যভূষণে
শরৎকে ত্রাতার স্তায় ভালবাসিতেন, লোক-
নিষ্ঠা তুচ্ছ করিয়া আজি কেবল শরৎ ও
সুখার সুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া শরতের
বিষয় প্রস্তাবেও সম্মত হইরাছিলেন, তাঁহাকে
কি শরৎ অগতের তিরস্কার ও ঘৃণার পন্থা
করিবেন ? যে স্নেহপূর্ণ নিফলক পরিবারে
প্রবেশ করিয়া শরৎ এতদিন শান্তিলাভ
করিয়াছিলেন, আজি কি কুটিলগতি বিষয়
সর্পের স্তায় তাহাদিগকে দংশন করিয়া
চলিয়া আসিবেন ? কালবিবে সে পরিবার
অর্জ্বরিত হউক, ধ্বংস প্রাপ্ত হউক, অনপনের
কলঙ্ক-সাগরে নিমগ্ন হউক, শরৎ নিঃসঙ্কচিত-
চিত্তে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া আসিবেন ?
এ চিন্তা শরতের অসহ্য হইল, অসহ্য বেদনার
চীৎকার করিয়া উঠিলেন, “মাতা, ক্ষমা কর,
আমি এ কাজটি পারিব না ।”

আর সেই ধর্ম্মপরায়ণা, পবিত্র-হৃদয়া,
হতভাগিনী সুধা ? ছয়মাস পূর্বে সে বালিকা
ছিল, প্রণয়ের কথা জানিত না, বিবাহের
কথা মনে উদয় হয় নাই । এই ছয় মাসের
মধ্যে শরৎই তাহাকে প্রণয় শিক্ষাইয়াছে,
বালিকার হৃদয়ে নূতন ভাব, নূতন চিন্তা, নূতন
আশা জাগরিত করিয়াছে । আহা ! ঔষার
আলোক হেরূপ নিমন্ত্রে ধীরে ধীরে সুপ্ত
অগতে ও গভীর আকাশে প্রসারিত হয়, এই
নূতন আশা অনাধিনী বিধবার হৃদয়ে সেই-
রূপ ব্যাপ্ত হইয়াছে, লাজ্জাবতী নন্দমুখী
বিধবা তৃষ্ণার্ত চাতকের স্তায় প্রণয়-বারিষ্ণ
অন্ত চাহিয়া রহিয়াছে । এখন শরৎ তাহাকে
কলিতা করিবেন ? চিরকাল হতভাগিনী
করিবেন ? কলঙ্কে কলঙ্কিতা করিয়া তাহাকে

হরত অগ্নি অবমাননা ও কলকে দহন করিয়া অকালে সে প্রাণত্যাগ করিবে, অথবা চিরজীবন জন্মে এই নিষ্ঠুর শেল বহন করিয়া জীবন্ত হইয়া থাকিবে। শরৎ আর সন্ত করিতে পারিলেন না, গর্জিত বৃষক আজি ভূমিতে স্তম্ভিত হইয়া বালিকার হায় রোদন করিতে লাগিলেন।

শরৎ বড় গরম হইল। শরৎ উঠিয়া গবাকের কাছে দাড়াইলেন। শরৎকালের নৈশবায়ু তাঁহার ললাটে লাগিল, তাঁহার জলন্ত মুখমণ্ডল ঈষৎ শীতল হইল। সমস্ত জগৎ সুপ্ত ও নিস্তব্ধ। অমাবস্তার অন্ধকারে আকাশ ও মেদিনী আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, আকাশ হইতে অসংখ্য তারা এই পাপপূর্ণ, শোকপূর্ণ জগতের দিকে নিস্তব্ধে দৃষ্টি করিয়া রহিয়াছে।

মাতা পত্রে লিখিয়াছেন, তিনি দুই এক-দিনের মধ্যে কলিকাতার আসিবেন। মাতাকে এ সকল কথা বুঝাইলে তিনি বুঝিবেন? এ কার্যে তিনি সম্মতি দিবেন? সে বুঝা আশা! শরৎ মাতাকে জানিতেন। বার্ককো, বৈধব্যে তিনি কখনই এ কার্যে সম্মত হইবেন না, কিংবা যদি মুখে সম্মতি প্রকাশ করেন, জগৎ বড় ব্যথা পাইবেন, পুত্রের আচরণে অচিরে শোকে প্রাণত্যাগ করিবেন। করযোড় করিয়া সেই নীল আকাশের দিকে চাহিয়া শরৎ লাড়নরনে কহিলেন, "পুণ্ডা জননি! আমি যেন সন্তানের আচরণ না ভুলি, তোমার জন্মে যেন সন্তান না দিই, তোমার শেষকাল যেন ভিক্ত না করি।"

সমস্ত রাত্রি চিন্তার দংশনে শরৎজগৎ ছট-কট করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালের শীতল বায়ুতে তাঁহার শরীর একটু শীতল

কর্তব্য নিরূপণ করিলেন। শোকসন্তপ্ত কিন্তু শান্ত-হৃদয়ে তিনি নিবালোক প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রাতঃকালের শীতল বায়ুতে তাঁহার একটু তন্দ্রা আসিল। কতক্ষণ নিদ্রা গেলেন, তাহা তিনি জানেন না, কিন্তু তাঁহার বোধ হইল যেন, কেহ কোমল হস্তে তাঁহার মাথার হাত বুলাইতেছে। তখন চক্ষু উন্মীলিত করিলেন, দেখিলেন, তাঁহার স্নেহময়ী মাতা। তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া বাৎসল্য ও স্নেহের সহিত তাঁহার মাথার হাত বুলাইতেছেন। শরৎ উঠিলামাত্র তাঁহার মাতা বলিলেন, "বাছা শরৎ, তুমি এত কাহিল হইয়া গিয়াছ; আচ্ছা, তোমার মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে। বিছানার না শুইয়া ভূমিতে শুইয়া আছ কেন? এস বাছা, বিছানায় এস।"

শরৎ। না মা, আমি বেশ ঘুমাইয়াছি, আর ঘুমাইব না। মা, তুমি কখন এলে? কবে আসিবে, তাহা ঠিক করিয়া আমাকে লিখ নাই কেন? টেসন হইতে আসিতে তোমার কোন কষ্ট হয় নি ত?

মাতা। না বাছা, আমার সঙ্গে গুরু এসেছেন, তিনি গাড়ী ঠিক করে দিয়েছেন, আমার কোন কষ্ট হয় নাই।

শরৎ। মা, আমি না বুঝিয়া স্থিতি অপরাধ করিয়াছি, তোমার মনে কষ্ট দিয়াছি, সেটি ক্ষমা কর। তোমার চিঠি পাইয়া আমার অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়াছি।

মা, আমি তোমার অবস্থা হইব না, যদি কিছু কষ্ট দিয়া থাকি, সন্তানকে সেটুকু ক্ষমা কর। মা, তুমি আমার সকল দোষই ত ক্ষমা কর।

বৃদ্ধার নরন হইতে বর বর করিয়া জল পড়িতে লাগিল; তিনি স্নেহ-গঙ্গাধরে সজাগেন। "বাছা শরৎ, গোর মুখে ফুল

পড়ুক, তুই আমার কথাটি রেখে আমার
প্রাণ ঠাণ্ডা করলি। বাছা, তুমি আমার কথা
রাখিবে, তাহা জারিতাম, তুমি ত আমার
অবাক্য ছেলে নও। আঁহা, ভগবান্ ভোমাকে
মুখী করুক।

মাতার কত দুটি মস্তকে স্থাপন করিয়া
শরতের অব্যক্ত অশ্রুধারা বিসর্জন করিতে
লাগিলেন। মাতা অঞ্চল দিয়া পুত্রের অশ্রু
মুছাইয়া দিলেন, মাতৃমেহে পুত্রের হৃদয়
শান্ত হইল।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ।

— — —

কুলগৌরবের পরিণাম।

সুখার সহিত শরতের বিবাহের কথা
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তথাপি মেয়ে-মহলে সে
কলঙ্কের কথা লইয়া অনেক দিন অবধি
নাড়া-চাড়া হইতে লাগিল, এমন সরস কথা
কি আর রোজ মিলে? কালীতারার খাণ্ড-
ডীরা ত হাটের নেড়া হজুক চায়, বখন
একটু কাজকর্ম করিয়া অবসর হয় অথবা
কালীতারাকে গল্পনা দিতে ইচ্ছা হয়, অমনি
কথায় কথায় কথা উঠে।

ছোট। ই্যা ই্যা, বিয়ে ভেঙ্গে গেছে,
মুখেই ভেঙ্গেছে, কাজে কি আর ভাঙ্গে?
আমার বেন কলকাতার এসেছেন, ছেলে
আর কি করে, দিন কত চুপ করে আছে।
বেনও গলাবাজী করবেন, আর ছেলেটা ঐ
হতভাগী ছুঁড়ীটাকে বিয়ে করবে।

মেজ। ই্যা গো ই্যা, বেন বড় গুণবতী।
ঐ পোড়ারমুখী ত সব করেছে, ও না করলে
কি আর সম্বন্ধ হ'ত? তার পর আমাদের

ভরে সে কাজটা বেয়ে-পেল, আমাদের ঘরে
মেয়ে দিয়েছে, পোড়ারমুখীর প্রাণে ভর নেই,
ঐ বিয়ে হ'লে কি আজ কালীকে আন্তো
রাখতুম? আঁহা, বেনম নজ্জার মা, তেমনি
নজ্জার বেয়েও হয়েছে, এমন ছোট পোড়ার
ঘরের বেয়েও কিরে ক'রে আসে? আমাদের
এমন কুলেও কালী দিয়েছে।

ছোট। আর সেই বাগীই কি নজ্জার
বাবু—ঐ তেম-বাবুর স্ত্রীর কি লজ্জা-সরম
নেই? সে কি না বিধবা বোনটাকে বিয়ে
দিতে রাজি হ'ল? ও মা, ছি! ছি! চৌদ্দ-
পুরুষকে একবারে কলঙ্কে ডুবালে? এমন
মেয়ে বেচে থাকার চেয়ে ম'রে বাওয়াই
ভাল। বাপ-মা হুণ খাইয়ে মেয়ে ফেলেনি
কেন?

মেজ। আর সেই এক রক্তি মেয়েটাই
কি নজ্জার গা? এমন বিধবাকে কি আর
ঘরে রাখতে হয়? অন্ত নোক হ'লে কালী-
বুন্দাবনে পাঠিয়ে দিত কি হরিনামের
মালা হাতে দিয়ে বৈকুণ্ঠের আখড়ার
পাঠিয়ে দিতে। ছি! ছি! ভদ্রলোকের ঘরে
এমন নজ্জার কথা?

ছোট। তা দিক না সেটাকে ঘের ক'রে
আর এত চলাচল কেন, সেটাকে বাজারে
বেয় ক'রে দিক না?

মেজ। ওলো, চলাচল কি হয়েছে?
আরও হবে। তোর ত বোন সব কথা
জানিস নি? আমি ওদের সব শুনেছি। ঐই
দেখ না কি হয়? বড় দেরি নেই। তখন
কেমন ক'রে সুকোয় দেখবে। পুলিশে খবর
দেব না? এমন কুটুখ থাকার চেয়ে না থাক
ভাল, কুটুখের মুখে আগুন।

ছোট। আমার কলঙ্কের আর এসে
কালীকে লিখে নোক পাঠিয়েছিল। একটু
নজ্জা-সরম নেই গা?

যেক। ও লো, লজ্জা-সমর খাঙ্কলে আর পোড়ারমুখী ছেলের অমন সব্ব কর? তা হতভাগা বংশে আর কি হবে বল না? বৌমাকে নিজে আসবে? কঠোর চেল দিয়ে শিঠ ডেকে বেধ না? কালী একবার ঘাবার নাম ককক রিকি? ওর শিঠের চামড়া বকি না ভুলি? আনি কায়েতের মেয়ে নই। হি! হি! অমন হবে বৌ পাঠান, শুনের ছুঁলে আমাদের সাত পুরুষের জাত বার, কি ককমারি হয়েছে যে, এমন হাড়ি-ভোমের বরে গিয়ে বাবু বিয়ে করেছেন! হি! হি! হি!

এইরূপ বংশের সুখ্যাতি, মাতার সুখ্যাতি, শরতের সুখ্যাতি, বিন্দু ও সুখার সুখ্যাতি কালীতারাকে কত দিন শুনিতে হইত, তাহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু অমৃতভাষিনী-দিগের সে অমৃত-বচন এক্ষণে কিছু দিনের জন্য মূলত্ববী রহিল। বাবুর পীড়া সহসা এত বৃদ্ধি পাইল যে, তাঁহার প্রাণের সংশয়; তখন সকলে তাঁহার চিন্তার ব্যাকুল হইল।

তখন কালীতারার খুড়খাণ্ডীরা বড়ই ভয় পাইল, সে বিপুল বংশ গোছাইয়া রাখিতে পারে, এমন আর একজন লোক সে বংশে ছিল না। কালীতারার ডরে ও চিন্তার ঈর্ষ হইরা গেল, খাইবার সময় খাওয়া হইত না, রাতিতে চিন্তার ঘুম হইত না, কেবল বাবু কেমন আছেন, জানিবার জন্য ছটকট করিতেন। ভগিনীপতির সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সংবাদ পাইয়া শরচ্ছ সে ব্যাটীতে আসিলেন, কয়েকদিন তথায় রহিলেন। হেমচন্দ্রও প্রত্যহ প্রাতঃকালে আসিয়া বিশ্রাম পর্যন্ত তথায় থাকিতেন। তাঁহাকে দেখিয়া লোকে কানাকানি করিত, তিনি তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। হেমকে দেখিয়া শরৎও একটু অপ্রতিভ হইলেন, কিন্তু উদারচরিত্র হেম

শরৎকে একপাশে ডাকিয়া বইয়া গিয়া বলিলেন, “শরৎ, তুমি আর আমাদের বাকী যাও না কেন? তুমি যক্ষ কার্য কর নাই, লজ্জা কিসের? বিবাহে তোমার যাঁতার বন্ধ নাই, যাঁতার কথা অনুসারে কার্য করি-
বাহ, তাহা কি রিকমীয়? তোমার যাঁতার ফলতে তুমি যদি বিবাহ করিতে যীকার করিতে, আমরা যীকার করিডার না। শরৎ, তোমার করণের দোর নাই, বোনের কার্য না করিলে নিজার কারণ নাই। লোকের কথা আমরা গ্রাহ্য করি না, তুমিও গ্রাহ্য করিও না।”

শরৎ হেমের এই কথাগুলি শুনিয়া তন্তিত হইলেন। যে বালা-বন্ধুকে তিনি জগতের দৃশ্যপদ করিয়াছেন, বাহার পবিত্র সংসার তিনি কলঙ্কিত করিয়াছেন, সেই ষড়িভূলা ব্যক্তি আপনি আসিয়া শর-
তের হাত ধরিয়া তাঁহাকে সকল মার্জনা করিলেন। শরৎ হেমের কথার উত্তর দিতে পারিলেন না, কৃতজ্ঞতার তাঁহার চক্ষু জলপূর্ণ হইল, মনে মনে কহিলেন, “এত দিন আপ-
নাকে জোষ্ঠ সহোদর বলিয়া গ্রেহ করিতাম, অত্ন হইতে দেব বলিয়া পূজা করিব।”

হেমচন্দ্র ও শরৎ রোগীর যথেষ্ট শুশ্রূষা করিলেন, ঠাকুরের প্রসাদ বন্ধ করিয়া দিলেন, অর্থব্যয়ে সজ্জিত না হইয়া কলি-
কাতার মধ্যে সর্কোংকুট চিকিৎসকগণকে প্রত্যহ ডাকাইতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের আদেশ সম্পূর্ণরূপে পালন হয়, দেখিবার জা-
শরৎ দিকারাত্রি রোগীর ঘরে থাকিতেন কিন্তু কিছুভেই কিছু হইল না। এক সপ্তা-
উৎকট পীড়া সহ করিয়া কালীতারার স্বামি-
মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

কালীর শরীরখানি চিন্তার আত্মখা-
হইয়া গিয়াছিল; এ সংবাদ পাইবামাত্র

সেইকার শবে ঘোড়ন করিয়া ঘুরিতে আছাড়
পাইয়া মুর্ছিত হইল ।

শরৎ অনেক অলসিয়া বাতাস করিয়া
বিলিকে সংজ্ঞা দান করিলেন, তখন কালী-
তারার একবার স্বামীর দিকে দেখিব বলিয়া
চীৎকার করিতে লাগিল । শরৎ সেটি
নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলেন, পারিলেন
না । আলুখালুবেশে যুদ্ধক্ষেপে শোকবিলহলা
কালীতারার স্বামীর ঘরে ধোড়িয়া গেলেন,
যুদ্ধ স্বামীর চরণ দুইটি মস্তকে স্থাপন করিয়া
ক্রন্দন-ধ্বনিতে সকলের হৃদয় বিদীর্ণ করি-
লেন । কালীতারার স্বামীর প্রণয় কখনও
জানেন নাই, অত সে প্রণয়টি জানিল, শূন্য-
হৃদয় বিধবা অসম্মত বাতনার স্বামিপদে বার
বার লুপ্তিত হইয়া অভাগিনীর কান্না কাঁদিতে
লাগিল । একবার করিয়া যুদ্ধ স্বামীর মুখ-
মণ্ডল দেখে আর একবার করিয়া হৃদয়
উথলিয়া উঠে, রোদনেও তাহার শাস্তি হয় ।
কণেক পর আবার মুর্ছিত হইয়া পড়িল,
কালীর চৈতন্তশক্তি শীর্ণ দেহ হস্তে উঠাইয়া
শরৎ অস্ত্র ঘরে লইয়া আসিলেন ।

কয়েক দিন পরে কালীতারার শরৎ-
বাড়ীর সকলে বন্ধমানে প্রস্থান করিলেন ।
শোকবিলহলা বিধবা ভবানীপুরে শরতের
বাড়ীতে আসিয়া মাতার স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে
শাস্তি লাভ করিলেন । কালীর বয়ঃক্রম
২০ বৎসর হয় নাই, কিন্তু তাহার সন্মুখের
সমস্ত চুল উঠিয়া গিয়াছে, চক্ষু ছুটি বসিয়া
গিয়াছে, শরীরখানি অতি শীর্ণ, শোকে ও
কষ্টে নানারূপ রোগের সঞ্চার হইয়াছে ।
দেখিলে তাহাকে চত্বারিংশৎ বৎসরের চির-
রোগিণী বলিয়া বোধ হয় । চির-
দুঃখিনী মাতৃস্নেহে কথঞ্চিৎ শাস্তি লাভ
করিলেন ।

হইরাছিল, কিন্তু উৎকট ক্লম হইলেই সর্বদা
শূন্য হয় না ।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ।

ধনগৌরবের পরিণাম ।

আমরা একজন হতভাগিনীর কথা পূর্ক
পরিচ্ছেদে লিখিলাম, আর একজন হত-
ভাগিনীর কথা এই পরিচ্ছেদে লিখিব ।
শোকের কথা আর লিখিতে ইচ্ছা করে না,
কিন্তু যখন সংসারের কথা লিখিতে বসিয়াছি,
তখন শোকের কাহিনীই লিখিতে বসিয়াছি ।
শোকদুঃখের কথা না লিখিলে সংসারের
চিত্রটি প্রকৃত হয় না, সংক্ষেপে সে কথাটি
লিখিব ।

কালীতারার স্বামীর পীড়ার সময় হেয়-
চন্দ্র সর্বদাই সেই বাড়ীতে থাকিতেন,
সুতরাং বিন্দু বাড়ী হইতে বড় বাহির হইতে
পারিতেন না । তাঁহাদের পাড়ার লোকে
অনুগ্রহ করিয়া বেকাপ প্রবাদ রটাইরাছিল,
তাহাতে তাহার বাড়ীর বাহিরে বাইতে বড়
ইচ্ছাও ছিল না । তবে উমাতারা কেমন
আছে, জানিতে বড় উৎসুক ছিলেন । মধ্যে
মধ্যে লোক পাঠাইতেন, লোকে বে খবর
আমিত, তাহাতে বিন্দুর বড় ভয় হইতে
লাগিল । কয়েকদিন পরে তিনি পাড়ী করিয়া
উমার বাড়ী গেলেন ।

বিন্দু পথে মনে করিতেছিলেন, তাহার
জ্যোতাইমা তাঁহাকে কত তিরস্কার করিবেন ;
কিন্তু বাড়ী পৌছিয়া তাহার জ্যোতাইমাকে
বে অবস্থার দেখিলেন, তাহাতে বিন্দুর চক্ষুতে
জল আসিল । জ্যোতাইমার সে চির-প্রকৃত মুখ-
বারি তাকাইয়া গিয়াছে, ভাঙ্গা ভাঙ্গা নয়ন

ভালি হায়ে হায়ে গুর হইয়াছে, সে হুল
শরীরখানি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে । কতবার
সেবার দিনরাত্রি আগরণ করিবা, কতবার
মাসিক কষ্টের জন্ত নিবা-রাত্র রোমন ও
চিন্তার উমার মাতা অকালে বার্ককোর
লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

বিন্দু আসিবারাম্রাই তাঁহার জ্যেষ্ঠাইমা
চক্ষুর জল ফেলিয়া বলিলেন, “আর মা,
তোরা একে একে আর, বাছা উমাকে এক-
বার দেখ, যা কবুতে হয় কর, আমি আর
পারি না ।”

উদ্বিগ্ন-হৃদয়ে বিন্দু জ্যেষ্ঠাইমার সঙ্গে
ঘরে প্রবেশ করিলেন, উমাতারাকে দেখি-
বারাম্রাই তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইল । মৃত্যুর
ছায়া সেই রক্তশূন্য, জ্যোতিঃশূন্য মুখমণ্ডলে
পতিত হইয়াছে ।

বিন্দু দিমিকে দেখিয়া রোগীর মুখখানি
একবার একটু উজ্জ্বল হইল, বিন্দুর দিকে
উমা হাত বাড়াইলেন, বিন্দু সেই হাতটি
ধরিয়া বালা-সহচরী উমাতারার নিকট বসিয়া
নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন, মনে মনে
ছেলেবেলার কথা উদয় হইতে লাগিল । অতি
শৈশবে বিন্দু জ্যেষ্ঠাইমার বাড়ী খেলা করিতে
আসিত, উমার সঙ্গে কত খেলা করিত, উমা
আপনার সন্দেশটি ভাঙ্গিয়া বিন্দুকে দিত,
আপনার খেলনা হইতে বিন্দুকে একটি দিত ।
তাহার পর বিন্দুর পিতার মৃত্যু হইলে বিন্দু
জ্যেষ্ঠাইমার বাড়ীতে আশ্রয় পাইয়াছিল,
তখনও উমার সঙ্গেই খেলা করিতে ভাল-
বাসিত, উমাও গরিবের ঘরে বলিয়া
বিন্দুকে ভুল করিত না ।

তাহার পর উভয়ের বিবাহ হইল, উভয়ে
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গেলেন, কিন্তু বালাকালের
ক্লেশটি ভুলিলেন না, এখন জ্যেষ্ঠাইমার
বাড়ীতে উমার সঙ্গে দেখা হইত, তখনই কত

আনন্দ । হয় মাস পূর্বে জ্যেষ্ঠাইমার বাড়ীতে
বিন্দুর কত আহ্বানে দেখা করিয়াছিলেন,
আজ সে আনন্দ কোথায় ? কপতে উমার
সেই অতুল সৌন্দর্য কোথায় ? সেই সুন্দর
ললাটে হীরকের সিঁতি কোথায় ? সে
সুগোল বাহতে হীরক-খচিত বলয় কোথায় ?
সরলচিত্তা জ্যেষ্ঠাইমার সেই মিষ্ট হাসি
কোথায় ? সেই একটু ধনগর্ব, একটু
সংসারিক গর্ব কোথায় ? সে সংসারমুখ
অভীভূতের গর্ভে লীন হইয়াছে, সে সুখ উমা-
তারার অদৃষ্টাকাশে আর কখন হইবে না ।
সে সুখ সাক্ষ হইয়াছে, উমাতারার লীলা-
খেলাও সাক্ষপ্রায়, ধন, যৌবন, অতুল সৌন্দর্য
অকালে লীন হইল ।

অনেকক্ষণ পরে ক্লিষ্টরূপে উমা কহিলেন,
“বিন্দু দিদি, অনেক দিনের পর তোমাকে
দেখিলাম, তোমাকে একবার দেখিয়া
প্রাণটা জুড়াইল ।

বিন্দু । কালীতারার স্বামীর বড় পীড়া
হইয়াছিল, তাই আমরা বড় ব্যস্ত ছিলাম,
সেই জন্য উমা, তোমাকে দেখিতে আসিতে
পারি নাই ।

উমা । ব্যারাম্রাই আরাম হইয়াছে ?

বিন্দু ধীরে ধীরে বলিলেন, “কালী
বিধবা ।”

উমা নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন ; এক বিন্দু
অশ্রুজল সেই শীর্ণ গণ্ডস্থল দিয়া গড়াইয়া
পড়িল । ক্রমে পরে বলিলেন, “কালী
এখন কোথায় ?”

বিন্দু । শরতের বাড়ীতে আছে ।
কালীর মাও সেইখানে আছেন, তিনি কলি-
কাতার আসিয়াছেন ।

উমা । কালীকে বলিও, তাহার মন সুস্থ
হইলে একবার আসিয়া দেখা করে । মরিবার
আগে তাকে একবার দেখিতে বড় ইচ্ছা করে ।

বিন্দু। হি উমা, এমন কথা মুখে আন কেন? তোমার উৎকট রোগ হইয়াছে, তা ডাক্তার দেখিতেছে, ব্যারাম ভাল হইবে এখন; হি, এমন ভাবনা মনে আনিও না।

উমা। ভাল হয়ে কি হবে?

বিন্দু। ভাল হইয়া আবার সংসার করিবে। মজ্ববোর, কষ্ট কি আর চিরকাল থাকে? আজ যে কষ্ট আছে, কাল তাহা থাকিবে না, সুখ-দুঃখ সকলেরই কপালে ঘটে। ব্যারাম ভাল হইলে তুমি সুখী হইবে, পতিপুত্রবতী হইয়া সোনার সংসারে বিরাজ করিবে।

উমা কোন উত্তর করিলেন না, একটি কীর্ণ হাসি সেই কীর্ণ ওষ্ঠপ্রান্তে দেখা গেল। অনেক বেন কি শব্দ শুনিতে লাগিলেন, পরে বলিলেন, “ঐ জানালা থেকে দেখ।”

বিন্দু ও বিন্দুর জ্যোষ্ঠাইমা ভানালার নিকট গিয়া দেখিতে লাগিলেন। জুড়ী আসিয়া কটকের নিকট পাড়াইল, ধনঞ্জয় ও একটি বাবু গাড়ী হইতে নামিলেন। দার-বেশে একটি বৃদ্ধা পাড়াইয়া ছিল, তাহার সঙ্গে হইজন কি কথা কহিতে লাগিলেন। তিনজন পুরান্ন করিতে করিতে উপরে গেলেন।

বিন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন, “জ্যোষ্ঠাইমা, ধনঞ্জয়-বাবুর সঙ্গে ও বাবুটি কে?”

জ্যোষ্ঠাইমা। ও গো, ঐ ত আমার জামাইয়ের শনি। ওর নাম সুবন্তি-বাবু, কলিকাতার যত বড় মাছবের কাছে গিয়া পোড়ারমুখো অমনি ক’রে হেসে হেসে কথা কর গো, আর যত মন রীত-চরিত শিক্ষার আর টাকা ক’কি দেয়। জামাইয়ের কত টাকা ক’কি দিবে নিরয়ে। ভগবান জানেন! যম কি পোড়ারমুখোকে ভুলে

বিন্দু। আর ঐ জুড়ীটাকে ঐ বে হাত মেড়ে নেড়ে হেসে হেসে বাবুদের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে উপরে গেল?

জ্যোষ্ঠাইমা। কে জানে, ও জুড়ীটাকে, এই কয়েকদিন অবধি জ্যোষ্ঠাইমার মত আমার জামাইয়ের সঙ্গে লেগে রয়েছে। কি কুচক্র ঘুরচে, কে জানে?

কীর্ণবরে উমা কহিলেন, “মা, আমি জানি, তোমরাও মীর্জা জানবে।” রোগী পাশ করিয়া শুইলেন ও নিশ্চল হইয়া রহিলেন। উমা একটু ঘুমাইয়াছে বিবেচনা করিয়া বিন্দু সে দিন বিদায় হইলেন।

সেই দিন অবধি বিন্দু প্রায় প্রত্যহ উমাকে দেখিতে আসিতেন, কিন্তু বিন্দুর স্নেহ, উমার মাতার রক্ত, সমস্ত বুধা হইল। রোগীর মনে সুখ নাই, আশা নাই, জীবনে আর কৃতি নাই, তাহার কানি অতিশয় বৃদ্ধি পাইল, তাহার সঙ্গে আশাও বাড়িল, দুর্বল কীর্ণ উমা সমস্ত দিন প্রায় আর কথা কহিতে পারিত না। তখন চিকিৎসকগণও আরোগ্য আশা ত্যাগ করিল, আজ আর, কাল আর, এইরূপ বিশেষণ করিতে লাগিল। শেষে বিন্দু কালীর বাড়ীতে থবর পাঠাইলেন ও কালীকে সঙ্গে করিয়া উমাকে দেখিতে গেলেন।

হতজাগিনী বিববা কালীদিবিকে দেখিয়া রোগীর চক্ষু হইতে ধারা বহিয়া উজল পড়িতে লাগিল, রোগী কথা কহিতে পারিলেন না। কালীও উমার একটি হাত ধরিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

পীড়া বড় বাড়িল। সন্ধ্যার সময় শাড়ী অতিশয় কীর্ণ, প্রায় পাওয়া যায় না। চিকিৎসক আসিয়া মুখ ভারি করিলেন, একটি নূতন ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গেছেন।

খাওয়াইতে হইবে, প্রাতঃকালে আবার আসিব।

উমার মাতা এ করেকদিন ক্রমাগত রাত্রি জাগরণ করিয়াছিলেন। বিন্দু বলিলেন, “জ্যেষ্ঠাইমা, আজ তুমি ঘুমাও, কাজ আমি রাত্রিতে থাকিব, উমার কাছে আমিই বসিয়া আছি।”

কালীতারাও থাকিতে ইচ্ছা করিল।

রাত্রি ৯টা হইয়াছে, তখন বিন্দু একবার ঔষধ খাওয়াইলেন। উমা অতি ক্লিণ্মরে বলিলেন, “আর কেন ঔষধ? আমি চলিলাম। বাইবার সময় তোমাদের মুখ দেখিয়া মরিলাম, এই আমার পরম সুখ। বিন্দু দিদি, কালী দিদি, আমাকে মনে রাখিও।”

বিন্দু ও কালী রে গীর দুই হস্ত আপনাদিগের বক্ষে ধারণ করিলেন, নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

অর্ধ ঘণ্টা পর উমা ক্লিণ্মরে বলিলেন, “মা, মা!” উমার মাতা পাশেই শুইয়াছিলেন, তাঁহার ঘুম হয় নাই। তিনি কন্ডার আরও নিকটে আসিলেন। উমা দুই হাত তুলিয়া মার গলা ধরিলেন, কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার বাস-প্রবাস কষ্টে বহিতে লাগিল, হস্ত-শব্দ হিয় হইল, নখগুলি নীলবর্ণ হইল, চক্ষু স্থির হইল, মাড়বন্ধে বেহমরী উমার মৃতদেহ শাস্তি প্রাপ্ত হইল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় উমার মাতা, বিন্দু ও কালীতারা পাকী করিয়া সে বাটা হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। কটকের নিকট তাঁহারা দেখিলেন, সেই স্মৃতি-বাবু ও সেই ব্রহ্মা বাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া নামিয়া আনিতেছেন। বিন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন, “জ্যেষ্ঠাইমা, ও বুড়ী কে, তুমি এখন জেনেছ?”

জ্যেষ্ঠাইমা কোন উত্তর করিলেন না।
দুই ভিন্নবার বিন্দু জিজ্ঞাসা করার বলিলেন,

“ঐ বুড়ী মাগীর বোনদি না কে একটা আছে, সে এই থিয়েটারে সোতা সাজে, সাবিজী সাজে, রাধিকা সাজে, তার মুখে আগুন। স্মৃতি-বাবু সেইটাকে ধনঞ্জয়-বাবুর কাছে আনিয়াছিলেন, তার নাম করে ১০। ১৫ হাজার টাকা বা’র করে নিয়েছেন, ভগবানুই জানেন। বাছা উমা বেঁচে থাকতে সেটাকে বাড়ী আনেন নি, এখন না কি এনে রাখবেন, তার জন্ত অনেক টাকা দিয়ে বর সাজান হয়েছে।”

* * * *

ধনবানু, গুণবানু, রূপবানু ধনঞ্জয়-বাবু কলিকাতা সমাজের একটি শিরোরত্ন। সকল সভার তাঁহার সমান আদর, সকল স্থানে তাঁহার গৌরব, সকল গৃহে তাঁহার ধ্যাতি। তাঁহার অমাত্যরা তাঁহার বদান্ততার সুখ্যাতি কথেন, শিকিত সম্প্রদায় তাঁহার কৃতির প্রশংসা করেন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা তাঁহার হিন্দুস্তানীর প্রশংসা করেন, কতকর্ত্তাগণ (উমার মৃত্যুর পর) তাঁহার সহিত সম্বন্ধস্থাপনার্থ ঘন ঘন ঘটকা পাঠাইতেছেন। রাজপুরুষেরা ধনাঢ্য বদান্ত জমিদারপুত্রকে রাজা খেতাব দিবার সম্মান করিতেছেন।

অবিজ্ঞ অশিক্ষিত স্মৃতি-বাবু শীঘ্র কলিকাতার একজন অনারারি মেজিষ্ট্রেট হইবেন, এই রূপ শুনা যায়। তিনি সাহেবদিগের সহিত সর্বদাই দেখা-সাক্ষাৎ করেন, একবার লেভিকে গিয়াছিলেন। তাঁহার ভজ্ঞাচরণ ও সুমার্জিত কথাবার্তা শ্রবণে সকলে ভূত হইয়াছেন। স্মৃতি-বাবুর গাড়ী-ঘোড়া আছে, সুমার্জিত বুদ্ধি আছে ও মিষ্ট কথার শসাধারণ ক্ষমতা আছে, তিনি সাহেব-সুবোকে ভূত রাখেন, বড়মহাশয়ের সর্বদাই ঘন বোগান, তিনি ক্রমশই উন্নতির

পথে উঠিতেছেন। তিনিও সমাজের একটি শিরোরত্ন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—৪—

পরীক্ষা।

শরৎ-বাবুর পরীক্ষা অতি নিকট, তিনি সমস্ত দিনই পড়েন, বাড়ীর ভিতর বড় ঘান না। শরৎ পড়িয়া পড়িয়া বড় কাহিল হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার মাতা ও ভগিনী তাঁহার অনেক বহু-শ্রদ্ধা করেন, শরতের ষাণ্ডারা দাওয়া দেখেন, যাতে শরৎ একটু ভাল থাকেন, একটু গায়ে সারেন, সে বিষয়ে দিবা-রাত্রি যত্ন করেন। কিন্তু শরতের চেহারা কিরিল না, শরৎ বড় পরি-ক্ষম করেন, রাজি জাগিয়া, একাকী পড়িবার ঘরে গিয়া বসিয়া থাকেন, তিনি দিন দিন আরও বিবর্ণ ও দুর্বল হইতে লাগিলেন।

শরতের মাতা বলিলেন, “বাছা, এত প’ড়ে প’ড়ে কি ব্যায়াম করিবে? তোমার পরীক্ষা দিবে কাজ নাই, চল, আমরা তাল-পুকুরে ক্রিকেট নাই, তোমার বাপের বিষয় দেখিও, বন্ধনে থাকিবে। কলিকাতার জল হাওয়া তোমার সঙ্গ হয় না।”

শরৎ বলিলেন, “না মা, এই বরষা লেখা-পড়া ছেড়ে দেওয়া ভাল হয় না। পরীক্ষা নিকট, একবার চেষ্টা করে দেখি।”

কালীতারা পূর্বেই বর্জ্যমানে শরতের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। মনে করিলেন, বোঁ ঘরে এলে শরতের মনে ক্ষুধি হইবে, শরৎ একটু গায়ে সারিবে। সেই ববাহের কথা একদিন শরতের নিকট

উত্থাপন করিলেন। শরৎ বলিলেন, “দিদি, পড়িবার সময় ব্যস্ত কর কেন?”

বিন্দুর ভোঁটাইয়া এখন বিন্দুদের বাসায় থাকেন, এখনও তালপুকুরে ক্রিকেট ঘান নাই। তিনি সর্বদাই শরতের মাতার সহিত দেখা করিতে আসিতেন এবং সমস্ত দিন ধরিয়া কথাবার্তা কহিতেন। তাঁহার দুই জনে উমার কথা কহিতেন, কালীর কথা কহিতেন, আর মনের দুঃখে রোদন করিতেন। উমার মা বলিতেন, “দিদি, তখন যদি লোকের কথা না শুনে আমরা একটু বুকে শ্রুতি কাজ করিতেন, তা হ’লে আর আজ এমনটি হ’ত না। তুমি তখন বড় ক্লম দেখে বামুন-পুরুতের কথা শুনে কালীর বিবাহ দিলে, আমিও পড়ার কথা শুনে বাছা উমার বড়মামুদের সঙ্গে বিবাহ দিলে, তাই আজ এমন হ’ল। তা ভগবানের ইচ্ছা, এতে কি মানুষের হাত আছে, আমরা যা মনে করি, সেইটি কি হয়? তা দিদি, আমার যা হয়েছে, তা হয়েছে, তুমি শরৎকে একটু দেখো, বাছা প’ড়ে প’ড়ে বড় কাহিল হয়ে গিয়েছে। শরৎকে মানুষ কর, শ্রুতি সংসার করতে পারে, এইরূপ বিয়ে-থা, বোঁ ঘরে নিয়ে এস, বোয়ের মুখ দেখে শোক একটু ভুলবে।”

শরতের মাতা বলিলেন, “আমার তাই ইচ্ছে। বাছা যে কাহিল হয়ে গিয়েছে, আমার বড়ই ভাবনা হয়েছে। আমারও বোঁ ঘর, বিয়ে-থা দিলে বাছা একটু গায়ে সারবে। তা শরৎ যে বিয়ে করতে চায় না। তার উপর লোকে যে একটা নিশা রটিয়েছে, মনে হ’লে কষ্ট হয়।”

উমার মাতা। হি, হি, সে কথা আর শ্রুতি এন না। আমি তখন মেরেকে নিয়ে ব্যস্ত, কিছু দেখতে শুনতে পাইনি, তা না

হ'লে কি আমার এমন হয়? বাছা বিন্দু ছেলেমানুষ, হেঁচ আর শরৎও ছেলেমানুষ। ওরা সব সেদিনকার ছেলে, সেদিন ওদের হাতে ক'রে মানুষ করেছি, ওদের কি এখনও ভেতন বুদ্ধি-তুদ্ধি হয়েছে? তা নয়, বুদ্ধি থাকলে কি আর এমন কাজ করে? তা না হয়েছে হয়েছে, বিন্দু আর সে কথাটি মুখে আনে না; তা তাতে তোমার ছেলের বিয়ে আটকাবে না, নিম্নে মেয়েদেরই। ভুগতে হবে, নিম্নে সহিতে হবে, বিন্দুকে আর বাছা সুধাকে। আহা, সে কচি মেয়ে, কিছু জানে না, সে দিন অবধি বেড়াল নিয়ে খেলা করত, আঁকুসি দিয়ে পেয়ারা পেড়ে খেতো, তাকেও এমন কলঙ্ক ডোবার? আহা, বাছার শরীরখানি যেন খেঁয়াকাঠি হয়ে গিয়েছে, মুখখানি শাদা হয়ে গিয়েছে, চোক দুটি ব'সে গিয়েছে। তুধের ছেলে, এমন কলঙ্ক কি সহিতে পারে? তা কপালে নিম্নে আছে; কে খণ্ডাবে বল?

শরতের মা। আহা বাছা সুধার কথা মনে হ'লে আমার বুক কেটে যায়। কচি মেয়ে, ছেলেবেলার বিধবা হয়েছে, আহা, বাছার কপালে যে কি কষ্ট, তা আমরাই বুঝি, সে তুধের ছেলে, সে কি বুঝবে? তার উপর আবার এই নিম্নে? যারা নিম্নে করে, তাদের কি একটু মারা-দরা নেই গা, একটু বিচার নেই? সুধা কি করেছিল? তার এতে কি দোষ টুল? আর কাকেই বা দোষ দি? বাছা বিন্দুও ত মন্দ ভেবে এ কাজ করে নি; শরৎ সুধাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, কলিকাতায় না কি এমন বিয়ে কটা হয়ে গিয়েছে; বিন্দু ছেলেমানুষ, সে মনে ভাবলে, এ বিয়ে হলোই বা, না হয় যথোক্ত দুটা মন্দ বলবে, শরৎ আর সুধা ত মুখে থাকবে। এই ভেবেই বিন্দু কাজটা

করতে চেয়েছিল, সেও মন্দ ভেবে করেনি, আহা, বিন্দুকে আমি ছেলেবেলা থেকে জানি, তার মত মেয়ে আমাদের গ্রামে নেই। তা বিন্দু আমাদের বাড়ী আসে না কেন? তাকে আসতে বলো, তাকে দেখলেও প্রাণটা ছড়ায়।

উমার মা। আমি বলি গো বলি; তা সে সমস্ত দিনই কাজ করছে, তাই আসতে পারে না। বাছা সুধা ত আর এখন কিছু কাজ করতে পারে না, তার যে শরীর হয়েছে, তাকে বড় কাজ করতে দিই না। আমিও এই শোকে আর পেরে উঠি না, কুটনো কুটতে উমাকে মনে পড়ে, উঠতে দাঁড়াতে উমাকে মনে পড়ে। আহা! বাছা রে, এই বরষে মাকে কে'লে কেমন ক'রে গেলি?

উত্তরে অনেকক্ষণ রোদন করিতে লাগিলেন। কালীতারা সেই সময়ে বয়ে আসিলেন। উমার মা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হ্যাঁ কালী, তোর ভাই অমন হয়ে যাচ্ছে কেন? তুই একটু দেখিস বাছা, একটু খাবার দাবার যত করিস, প'ড়ে প'ড়ে কি ব্যারাম করবে?”

কালী। আমি যত করি গো, কিন্তু সদাই পড়া-শুনা করে; খাওয়া দাওয়া তেমন মন নেই, তাই কাহিল হয়ে যাচ্ছে।

উমার মা। বিয়ের কথা বলেছিলি?

কালী। একবার কেন, অনেকবার বলেছিলাম।

উমার মা। কি বলে?

কালী। সে কথার কান দেয় না, বলে, বিবাহে তার রুচি নেই। অনেক জেদ ক'রে, মার নাম করে বললে ব'লে, যাকে বলো, মা যদি নিতান্ত ইচ্ছা ক'রে থাকেন,

তবে আমি বিবাহ করব, কিন্তু তাতে আমি সুখী হব না।

উমার মা। ও সবুজুছেলে এমনই ক'রে বলে গো, তার পর বৌকে পছন্দ হলেই মন ফিরে যায়। আমার বোধ হয়, বিবাহ দেওয়াই কর্তব্য।

শরতের মা। না দিদি, বাছা শরৎ আমার কাছে কখন মনের কথা ঢেকে রাখে না। আমার ভয় করে, আমি জোর ক'রে বিয়ে দিলে পাছে শরৎ অসুখী হয়। আমার কপাল ত অনেক দিনই ভেদেছে, বাছা কালীর উপরও ভগবান নির্দয় হলেন, (রোদন) কেবল শরৎই আমার ভরসা, শরৎ যদি অসুখী হয়, এ চক্ষে দেখতে পারব না।

উমার মা। বালাই, কেন গা বাছা, শরৎ অসুখী হবে? তা এখন বিয়ে না করে নেই, পরে করবে, এখন পড়া-শুনার মন দিয়েছে, না হয় পড়ুক না, সে ভালই ত।

শরতের মা। দিদি, পড়াশুনাও যে তেমন হচ্ছে, আমার বোধ হয় না। শরতের চিরকাল পড়া-শুনার মন আছে, সে জন্ত সে এমন কাহিল হয়ে যায় না।

উমার মা সে দিন বিদায় হইলেন। কালীতারা বলিলেন, “মা, তবে শরতের জন্ত কি করব? ডাক্তার দেখাব?”

মাতা। বাছা, মনের ভাবনার ডাক্তার কি করবে? চিকিৎসক সে রোগ চিকিৎসা করতে জানে না।

কালী। তবে কি হবে? বিন্দু দিদির সঙ্গে একদিন পরামর্শ ক'রে দেখব? আমাদের যখন যা কষ্ট হ'ত, বিন্দু দিদিই আমাদের পরামর্শ দিতেন।

মাতা। বিন্দু এ বিষয়ে পরামর্শ দেবে না।

কালী। দেবে বৈ কি মা, আমি একদিন বিন্দু দিদির বাড়ী যাব এখন।

শীতকালে শরতের পরীক্ষা আসিল। শরতের সহাধ্যায়ীরা সকলেই বলিল, পরীক্ষার হয় শরৎজন্ম, না হয় তাহার একজন সহাধ্যায়ী কান্তিকচন্দ্র, সর্বশ্রেষ্ঠ হইবে। একমাস শরৎ পরীক্ষার ফল জানা গেল, কান্তিকচন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেন। শরৎকে বিস্মিত হইয়া দেখিল, পরীক্ষার উত্তর ছাত্র-দিগের মধ্যে শরতের নাম নাই।

তখন শরতের মাতা শরৎকে ডাকাইয়া বলিলেন, “বাছা, এত ক'রে প'ড়েও তেনে হাড় কালী ক'রেও ত পরীক্ষার উত্তর হতে পারুলে না। এখন কি করবে?”

শরৎ কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন না হইয়া বলিলেন, “মা, একবার পারি নাই, আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখি না। পরীক্ষা বড় কঠিন, অনেকেই প্রথমবার উত্তর হইতে পারে না।”

কালীতারাও কয়েক দিন বিন্দু দিদির বাড়ী গেলেন, কিন্তু বিন্দু কোন পরামর্শ দিতে পারিলেন না, বলিলেন, “তোমার মাকে বলিও, জ্যোতাই-মার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শরৎ-বাবুর জন্ত বাহা ভাল হয়, তাহা করিবেন। আমরা বোন ছেলেমানুষ, আমরা এ বিষয়ে কিছু পরামর্শ দিতে পারি?”

কালী এই কথাগুলি মাতাকে বলিলেন। মাতা। বাছা, সুধাকে কেমন দেখলে?

কালী। সুধা ভাল আছে। কিন্তু কলুকেতার এসে কি বদলে গেছে, এখন আর তাকে চেনা যায় না। সে এখন ঢেঁকা হয়েছে, একটু কাহিল হয়ে গেছে, কিন্তু বেশ কাজ-কর্ম করছে। রংটাও সে ছেলে-বেলার মত কাঁচা সোনার রং নেই, এখন

কাল হয়ে গেছে, এখন আর সে তালপুকুরের সেই কচি মেয়েটির মত নেই।

বুদ্ধিমতী শরতের মাতা কোন উত্তর করিলেন না। সমস্ত দিন আপনা আপনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, কয়েক দিন অবধি প্রায়ই একাকী বসিয়া ভাবিতেন। পরে একদিন রাত্রে শয়ন করিতে বাইবার সময় মনে মনে বলিলেন, “বাছা শরৎ, মাতার প্রতি বাহা কর্তব্য, তাহা তুমি করিয়াছ। ভগবান্ সহায় হউন, সন্তানের প্রতি যাহা কর্তব্য, তাহা আমি করিব।”

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গুরুদেবের আদেশ।

পরদিন প্রাতঃকালে শরতের মাতা একখানি শিবিকা আরোহণ করিয়া ভবানীপুর হইতে উত্তরদিকে ঝড়শে বেহালা নামক গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। একটি ক্ষুদ্র কুটারের সম্মুখে পাকীর ভিতর রহিলেন, সঙ্গে কি ছিল, সে কুটারের ভিতরে গেল।

ক্ষণেক পরে সেই ঝির সঙ্গে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাহির হইয়া আসিলেন। ইহার বয়স কত, ঠিক অল্পভব করা যায় না। মস্তকে অল্পই কেশ আছে, তাহা সমস্ত শুষ্ক, শরীর গোরবর্ণ ও বলপূর্ণ, মুখখানি বার্কিকোর রেখায় অঙ্কিত। ইনি তালপুকুরের ঘোষ-বংশের কুলগুরু। গুরুদেবের সঙ্গে একজন তেজস্বী ব্রহ্মচারীও বাহিরে আসিলেন, তিনি সম্ভ্রান্তি কার্ণী হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন।

গুরুদেব। মা, আজ কি মনে করিয়া আমাকে লাক্ষাং দিতে আসিয়াছ? আইস, ঘরে আইস।

শরতের মাতা বুদ্ধের সঙ্গে কয়েক ভিত্তি গিয়া বসিলেন;—ব্রিজাঙ্গা করিলেন, “পিতা কুশলে আছেন?”

গুরুদেব। ই্যা বাছা, ভগবানের ইচ্ছায় আমার শরীর সুস্থ আছে। বাছা, তোমার মঙ্গল?

শরতের মাতা। ভগবান্ জীবিত রাখিয়াছেন; কিন্তু মনের সুখলাভ করিতে পারি নাই। আমার কন্যা কালীতারা আজ কয়েক মাস বিধবা হইয়াছে।

গুরুদেব নীরবে একটু অশ্রুবিন্দু ত্যাগ করিলেন, বলিলেন, “মা, রোদন করিও না, ভগবানের বাহা ইচ্ছা, তাহাই সাধিত হইবে, কে নিবারণ করিতে পারে?”

শরতের মাতা। সে কথা সত্য। কিন্তু কালীর বিবাহের সময় আমি গ্রামের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মত অহুসারে কার্য্য করিয়াছিলাম। আপনি নিষেধ করিয়াছিলেন। আপনার কথা শুনিলে এ কষ্ট সহ্য করিতে হইত না, বাছা কালীকে এই বয়সে জলে ভাসাইতাম না। সেই সন্তাপ আমার মনে দিবানিশি জ্বলিতেছে।

গুরুদেব। আপনাকে দোষ দিবেন না। এ সমস্ত মহুষ্যের হাত নহে, এ সকল বিষয়ে আমাদের পরামর্শ অতি অকিঞ্চিংকর। আমরা অনেক পরামর্শ করিয়া, অনেক চিন্তা করিয়া, ভাল বুঝিয়াই কাজ করি, মুহূর্ত্তমধ্যে আমাদের কল্পনা ও চিন্তা বিকল হইয়া যায়, ভগবান্ আপনার অভীষ্ট অহুসারে কার্য্য করেন।

শরতের মাতা। তথাপি সংপরাশ্রম লইয়া করিলে পরে আক্ষেপ থাকে না। পিতা, সেই জন্ত অস্ত্র আপনার কাছে আর একটি বিষয়ে সংপরাশ্রম লইতে আসিয়াছি। একটি ক্রিয়া-সম্বন্ধে আপনার বত লইতে আসিয়াছি।

গুরুদেব। মা, তুমি জানই ত আমি ক্রিয়া-কর্মে বাওরা অনেক বৎসর অবধি বন্ধ করিয়াছি, কোন শাস্ত্রীয় মতামতও দিতে এখন সন্ধান নহি। আমা অপেক্ষা বিজ্ঞ অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কলিকাতার ও নবমীপে আছেন, শাস্ত্র আলোচনা করাই তাঁহাদের ব্যবসা, ক্রিয়া-অনুষ্ঠানে তাঁহারা সুদক্ষ, মতামত দিতেও তাঁহারা সুপরাগ। আমি সে ব্যবসা অনেক দিন ছাড়িয়া দিয়াছি, কেবল পরকালের সুখের জন্য প্রতাহ দেব-অর্চনা করি, মনের ভুটীর জন্য একটু ইচ্ছামুসারে শাস্ত্রাদি পাঠ করি। সে অতি সামান্য।

শরতের মাতা। পিতা, যদি কেবল একটি ক্রিয়া সম্বন্ধে মত লইবার আবশ্যক হইত, তাহা হইলে আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিতাম না, কিন্তু আপনারা আমার স্বামী-দেবের বংশাভ্যুগত গুরুদেব; আপনি আমার স্বামীর মহাশয়ের স্মৃতি ছিলেন, স্বামী মহাশয়ের গুরু ছিলেন, আমাদের বংশে একটু বিশদ আপন হইলে আপনার নিকট পরামর্শ লইব না ত কাহার নিকট লইব? আপনি আমাদের সংসারের জন্য বেটুকু স্নেহ ও যত্ন করিবেন, কে সেত্ব করিবে? আমাদের আর কে সহায় আছে?

গুরুদেব। মা, রোদিন করিও না, আমার বংশাধ্য আমি তোমাদের জন্য করিব। কিন্তু হৃদয়ের ক্ষমতা অল্প, বিচ্ছাও অল্প।

শরতের মাতা। বাঁহারা অধিক বিদ্যার অভিমান করেন, তাঁহাদের পরামর্শ লইতে আমার কুচি হয় না। আপনার কতটুকু বিদ্যা, তাহা আমাদের বদদেশে অবিস্তিত নাই, তাহা না হইলে রক্তপন্নীতে আপনার ক্ষুদ্র হুটীরে কাশী প্রভৃতি দূরদেশ হইতে বিভার্ধিগণ আসিত না। পিতা, আপনার কথাই আমার পক্ষে বেষ্মক্য।

গুরুদেব। মা, তোমার ভ্রম হইয়াছে, আমার শাস্ত্রজ্ঞান সামান্য, আমাদের শাস্ত্র সমুদ্রতুল্য, আমি গণ্ডুমাত্র জল গ্রহণ করিয়াছি। অধ্যায়ীদিগের সহিত কথাবার্তা কহিতে আমার বড় ভাল লাগে, তাঁহাদের জন্য আমার মনে একটু স্নেহ উদয় হয়, সেই জন্যই ছুই একজন আমার নিকট আসেন, সম্প্রতি কাশী হইতে এই ব্রহ্মচারী ঠাকুর আসিয়াছেন।

শরতের মাতা। পিতা, সেই স্নেহটুকু পাইবার জন্য আমিও আসিয়াছি, কত্নাকে স্নেহ করিয়া একটু পরামর্শ দিন।

গুরুদেব। মা, বল, তোমার কি বলিবার আছে, আমি তোমার স্বামীর বংশ বহুকাল অবধি জানি, আমার সামান্য ক্ষমতার যদি তোমাদের কোন উপকার-সাধন করিতে পারি, সাধ্যামুসারে তাহা করিব।

শরতের মাতা ধীরে ধীরে কহিলেন, “পিতা, আমার পুত্র শরতের সহিত একটি বাণবিধবার বিবাহের কথা হইতেছে, সেই বিষয়ে আপনার মত, আপনার পরামর্শ, আপনার আশীর্বাদ লইতে আসিয়াছি।”

গুরুদেব শরতের মাতাকে বাল্যকাল হইতে জানিতেন, তাঁহার হিন্দুধর্ম অনুষ্ঠানে প্রগাঢ় মতি জানিতেন, তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন,—বলিলেন, “মা, বিধবা-বিবাহ আমাদের রীতি-বিরুদ্ধ, প্রচলিত শাস্ত্রবিরুদ্ধ, প্রচলিত ধর্ম-বিরুদ্ধ, তাহা কি তুমি জান না? এতো ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের সর্বসম্মত মত, সকলেই আপনাকে একথা বলিতে পারিত, এটি জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমার নিকট আসিয়াছ কি জন্য?”

শরতের মাতা। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের সর্বসম্মত মত জানিতে চাহি না, সে জন্য

আপনার কাছে আসি না। আপনার মত, আপনার পরামর্শ জানিত ইচ্ছা করি, এই জ্ঞান আসিয়াছি। শ্রবণ করুন, আমি নিবেদন করিতেছি।

তখন শরতের মাতা আপন দুঃখের ইতিহাস আত্মোপাস্ত গুরুদেবের নিকট বিস্তারিত করিয়া বলিলেন। বিন্দু মাতার কথা, বিন্দু ও হেমের কথা, হতভাগিনী সুধার কথা, তাহাঙ্গিরের কলিকাতায় আসিবার কথা, শরৎ ও সুধার পবিত্র প্রণয়ের কথা, লোকের লজ্জাবহ অপযশের কথা, নিরশ্রয় নির্দোষ সুধার অধ্যাত্ম, অবমাননা, অসহ্য যাতন ও শরীরের দুর্ব্বাহার কথা, চিরদুঃখিনী কালীতারার কথা, হতভাগিনী উমার কথা সমস্ত সবিস্তারে বর্ণন করিলেন। সে কথা শুনিতে শুনিতে গুরুদেবের চক্ষু দিয়া অজস্র জল পড়িতে লাগিল, কালীর ব্রহ্মচারীর নয়ন অগ্নিবৎ জ্বলিতে লাগিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল। শেষে শরতের মাতা বলিলেন, “গুরুদেব, আমাদের চারদিকেই দুর্দশা উপস্থিত, এ ঘোর বিপদে পিতার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিতে আসিলাম। লোকের কথায় মত্ত হইয়া উমার মা উমাকে বড়মামুষের ঘরে বিবাহ দিলেন, বাল্যকালেই সে উমা যতনায় প্রাণত্যাগ করিল। গ্রামের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কথা শুনিয়া, আপনার নং-পরামর্শ তখন তুচ্ছ করিয়া, আমি বড় কুলে কালীর বিবাহ দিলাম, ভগবান্‌সে পাপের শাস্তি আমাকে দিচ্চেন। বাছা কালীর সুখের দিকে চাইলে বুক কেটে যায়। সংসারে আমার আর কেহ নাই, ভগতে আমার আর সুখ নাই; বাছা শরৎ ভিন্ন আমার অবলম্বন নাই; আর বাছা হিন্দু ও সুখ আছে। তারাও আমার পেটের ছেলের মত, তাদের অভাগিনী মা মরিবার সময় তাদের

আমার হাতে সঁপিরা দিয়াছিল। গুরুদেব! আপনিই এখন ইচ্ছাদের বন্ধ, আপনিই ইচ্ছা-দিগের অভিভাবক, আপনি এগুলির ভার লউন, বাছা ভাল বিবেচনা করেন করুন; এ অনাথা বিধবা আর এ ভার-বহনে অক্ষম।”

এই কথাগুলি কহিয়া শরতের মাতা ঝর ঝর করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। পিতৃতুল্য গুরুর নিকট দুঃখের কথা বলায় বেন সে ব্যথিত হৃদয় একটু শান্ত হইল।

শরতের মাতার কথা শুনিতে শুনিতে বুকের চক্ষু অনেকবার অশ্রুতে পূর্ণ হইয়াছিল, এখন নিরাশ্রয় বিধবাকে যোদন কারতে দেখিয়া তাঁহার নয়ন হইতে দুই শীর্ণ গণ্ডস্থল বহিয়া টুং টুং করিয়া জল পড়িতে লাগিল। বৃদ্ধ কণেক আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। কণেক পর বলিলেন, “মা, তোমার কথাগুলি শুনিয়া আমার মন বড় বিচলিত হইতেছে। এখন কি জিজ্ঞাস্য আছে, বল।”

শরতের মাতা। পিতা, বিধবা-বিবাহ মহাপাপ কি না, আমার এইমাত্র জিজ্ঞাস্য।

গুরুদেব। বাছা, জগদীশ্বরই পাপপুণ্য ঠিক নিরূপণ করিতে পারেন, আমরা শাস্ত্রের কথা কিছু কিছু বলিতে পারি।

শরতের মাতা। তাহাই বলুন। আমাদের সনাতন হিন্দুশাস্ত্রে কি এ কার্য রহিত? লোক-নিন্দার কথা আমাকে বলিবেন না; আমার অধিক দিন বাঁচিবার নাই, লোক-নিন্দার আমার আর বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

গুরুদেব। মা, শাস্ত্র একখানি নয়, সকল-গুলি এক সময়ের নয়, সকলগুলিতে এক কথা লিখা নাই। যে সময়ে এই হিন্দু আত্মির বেকরণ আচার ব্যবহার ছিল, তাহারই সার-ভাগ, উৎকৃষ্ট ভাগটুকুই আমাদের শাস্ত্র।

শরতের মাতা। পিতা, আমি জীলোক, আমি ও সমস্ত কথা ঠিক বুঝিতে পারি না।

কিন্তু আমাদের সনাতন শাস্ত্রে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ কি না, এই কথাটুকু বলুন।

গুরুদেব। এখন ও প্রথা নিষিদ্ধ হই-
রাছে, অতএব এখনকার শাস্ত্রে ও কার্য্যটি
নিষিদ্ধ বৈ কি।

শরতের মাতা। পিতা, এখনকার শাস্ত্র
আর পুরাতন শাস্ত্র আমি জানি না, আমি
মূৰ্খ অবলা। আপনার পড়িতে কিছু বাকি
নাই, যেগুলি আমাদের ধর্ম্মের মূলশাস্ত্র,
তাহার মর্ম্ম কি, এ দরিদ্র অনাথাকে বুঝাইয়া
বলুন, আমার মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে।
শুনিয়াছি, কলিকাতার কোন কোন প্রধান
পণ্ডিত বলেন যে, শাস্ত্রে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ
নহে, কিন্তু আপনার মুখে সে কথা না
শুনিলে আমি তাহা বিশ্বাস করিব না।
আপনার মতই আমার বেদবাক্য।

গুরুদেব অনেককণ চিন্তা করিতে
লাগিলেন। শেষে ধীরে ধীরে কহিলেন,
“মা, তুমি যখন জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমি
কিছুই লুকাইব না, আমার মনের কথা
তোমাকে বলিব। তুমি যে পণ্ডিতের কথা
বলিতেছ, তিনি আমার সহায়ারী ছিলেন,
তাহার প্রগাঢ় শাস্ত্রবিজ্ঞা আমি জানি, তাহার
প্রগাঢ় সত্যপ্রিয়তা আমি জানি। মা, একদিন
আমি বিভাসাগর মহাশয়ের সহিত বিধবা-
বিবাহ লইয়া অনেক আলোচনা করিয়া
ছিলাম, অনেক কলহ করিয়াছিলাম, তখন
আমি শাস্ত্রবিজ্ঞাভিমানী ছিলাম। কিন্তু মা,
বাল্যকাল হইতে সেই পণ্ডিতশ্রেষ্ঠকে আমি
জানি, তিনি ভ্রান্ত নহেন, প্রবঞ্চকও নহেন,
তাহার কথাটি প্রকৃত। বিধবা-বিবাহ সনাতন
হিন্দুশাস্ত্রে নিষিদ্ধ নহে। আমার পরম সুহৃদ
রামপ্রসাদ সরস্বতীরও এই মত, তিনি
তাহার মত প্রকাশ করিয়া তোমাকে আশ্বস্ত
করিবেন।

শরতের মাতা। পিতা, আপনার অনাথা
কন্তাকে যে শাস্তিদান করিলেন, জগদীশ্বর
তজ্জন্ত আপনার মঙ্গল করিবেন। আমি
শাস্ত্রের কথা আর জিজ্ঞাসা করিব না, সামা-
জিক রীতির কথাও জিজ্ঞাসা করিব না।
তবে ভগবানের নয়নে কাজটি ভাল কি মন্দ,
এই একটি কথা জানিতে বাসনা করি।
আপনারা দুই জন পণ্ডিত আছেন, একটি
উত্তর দিয়া বিধবাকে শাস্তি দান করুন।

রামপ্রসাদ সরস্বতী। মা, যিনি জগতের
মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, তিনিও এ কথার উত্তর
দিতে অক্ষম, এ গীনবুদ্ধি কিরূপে ইহার
উত্তর দিবে? জগদীশ্বরের অতিপ্রিয় অণু-
মাত্রও জানিতে পারে, মনুষ্যের এরূপ ক্ষমতা
নাই। তবে যিনি করুণাময়, তিনি বালবিধ-
বাকে চিরবৈধবা যন্ত্রণা সহ করিবার জন্ত
সৃষ্টি করিয়াছেন, এরূপ আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে
অল্পভব হয় না।

সরস্বতী ঠাকুরের হির, গম্ভীর, পুণ্যময়
কথাগুলি সেই ক্ষুদ্র কুটারে শব্দিত হইতে
লাগিল। সরস্বতী ঠাকুর কে?

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পরিশিষ্ট।

বৈশাখ মাসে তালপুকুর গ্রামে আমরা
প্রথমে হেমচন্দ্র ও তাহার পরিবারের সহিত
আলাপ করিয়াছিলাম। তাহার আমাদের
এক বৎসর মাত্র পরিচিত হইলেও বড় স্নেহের
পাত্র। পুনরায় বৈশাখ মাস আসিয়াছে,
চল, তাহাদের সেই তালপুকুর গ্রামের
বাটাতে বাইয়া বিদায় লই

হেমের কিছু হইল না, তাঁহার দারিদ্র্য ঘুচিল না। তিন বৎসর যাবৎ কলিকাতায় থাকিয়া পুনরায় চাষবাস দেখিবার জন্ত ফিরিয়া আসিলেন। চন্দ্রনাথবাবু তাঁহাকে হাইকোর্টে কোন একটি কার্য্য দিবার জন্ত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। মার্জিতবুদ্ধি যুবক-মাজ্রাই এমন সুবিধা পাইলে আপনার বিশেষ উন্নতি-সাধন করিতে পারিতেন। কিন্তু হেমের বুদ্ধি তত তীক্ষ্ণ নহে, বুদ্ধিটা কিছু পাড়াগাঁয়ে, সুতরাং তিনি সে কার্য্য না লইয়া পাড়াগাঁয়ে ফিরিয়া আসিলেন। শরৎ তাঁহাকে কলিকাতায় আর কয়েক মাস থাকিতে অনেক জেদ করিয়াছিলেন; হেম বলিলেন, “না শরৎ, কলিকাতা নগরী যথেষ্ট দেখিয়াছি, আর দেখিতে তত রুচি নাই।”

বিন্দু পূর্ববৎ কচি আঁবের অখল রাখিতে তৎপর এবং এক্ষণে সে রন্ধন-কার্য্যের একটি সুবিধাও হইয়াছিল। বিন্দুর জ্যেষ্ঠাইমার উমা ভিন্ন আর সন্তানাদি ছিল না; উমার মৃত্যুর পর তাঁহার জীবনে বিশেষ সুখ ছিল না; তিনি প্রায়ই দুই গ্রহরের সময় বিন্দুর বাড়ীতে আসিতেন। বিন্দুর বাড়ীর রকে তিনি পা মেলাইয়া বসিতেন, বিন্দুর ছেল-গুলিকে লইয়া খেলা করিতেন, অথবা সনাতনের গৃহিণীর সহিত বসিয়া গল্প করিতেন, সেও বিন্দুর জ্যেষ্ঠাইমার চুলের সেবা করিত। আর বিন্দু, (আমাদের লিখিতে লজ্জা হইতেছে) সমস্ত দুই গ্রহর বেলা নাউশাক কাটিত, সন্দেশপাতা পাড়িত, আঁকুসি দিয়া কচি আঁব পাড়িত। জ্যেষ্ঠাইমা বলিতেন, “বিন্দু মেয়েটি ভাল বটে, কিন্তু বুদ্ধি-ভুদ্ধি কখনও পাকিল না।”

তারিণী-বাবুর একমাত্র কন্যা মরিয়াছে, তাহাতে তিনি একটু শোক পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বিষয়ী লোক, লজ্জাই সে শোক

ভুলিলেন। তাঁহার কার্য্যেও বিশেষ উৎসাহ ছিল, বিশেষ বর্দ্ধমান কালেক্টরীর সোরেস্তা-দারী থালি হইবার সম্ভাবনা আছে, সুতরাং উৎসাহী তারিণীবাবুর জীবন উদ্বেগমুক্ত নহে।

শরতের মাতা সান্দ্রনয়নে বধু সুধাকে যেরে আনিয়া বুদ্ধবয়সে শান্তিলাভ করিলেন। বিবাহটা কলিকাতাই হইয়াছিল; কেহ বিবাহে আসিলেন, কেহ বা আসিলেন না, কিন্তু কাজটা তজ্জন্ত বন্ধ রহিল না। বাহার্য্য কার্য্যে ত্রুটি হইয়াছিলেন, তাঁহার্য্যও বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন না। শাস্ত্রপ্রকৃতি দেবীপ্রসন্নবাবু একবার আসিবেন আসিবেন মনে করিয়া-ছিলেন, কিন্তু এবার বাড়ীর ভিতরে সে কথাটা উত্থাপন করার বিশেষ হিতকর উপ-দেশ প্রাপ্ত হইলেন, তাহার পর আর আসি-বার কথাও কহিলেন না। পাড়ার দলপতি, সমাজপতি ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ একটা খুব হলভুল করিলেন, খুব গণ্ডগোল করিলেন, কাজটার বাধা দিবারও বিশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে কাল গিয়াছে, সেরূপ বাধা দেওয়ার এক্ষণে লোকের গুণাগুণ প্রকাশ পায়, কাজ বন্ধ থাকে না। চন্দ্রনাথ সমস্ত ভবানীপুরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত সেই বিবাহে নিম-ন্ত্রণ থাইতে আসিলেন, কলিকাতার অনেক ভদ্রলোক তথায় আসিলেন, আনন্দের সহিত সে শুভকার্য্য নিরীক্সে সম্পন্ন হইল। পাড়ার সর্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিবাহ-সমাজে বিস্তা-সাগর মহাশয়ের দলের কোন কোন পণ্ডিত আসিবেন বলিয়া সে দিকে বড় ঘোঁষিলেন না। পাড়ার দেশহিতৈষী আর্য্যসন্তানগণ, বাহার্য্য এই অনার্য্য কার্য্যে বাধা দিবার জন্ত ঢিল ছুড়িতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার একজন অনার্য্য পুলিশের সার্জনের বিকৃত মুখ দেখিয়া অচিরে (ঢিল পকেটেই রাখিয়া) তথা হইতে অদূত হইলেন।

শরৎ ও হেম পল্লীগ্রামে আসিলে গ্রামস্থ লোকে প্রথমে তাঁহাদের সহিত আহার-ব্যবহার করিলেন না। কিন্তু তারিণী-বাবুর দ্বার অনেক অনুরোধে তারিণী-বাবু শেষে সকলকে ডাকাইয়া একটি মীমাংসা করিয়া দিলেন। মীমাংসা হইল যে, শরৎ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। কিন্তু শরৎ কলেজের ছেলে, বলিলেন, “আমি যে কার্য্যটি করিয়াছি, তাহা পাপ বলিয়া মনে করি না, ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিব না।” শেষ শরতের মাতা একদিন ব্রাহ্মণ খাওয়াইয়া দিলেন। তারিণী-বাবু রসিক লোক ছিলেন, হাসিয়া শরৎ বাবুকে বলিলেন, “ওহে বাবু, তোমরা বুঝ না, কুটির জল যে দিক্ দিবেই যাক, শেষকালে গিয়া নদীতে পড়িবেই পড়িবে। তোমরা বিধবাই বিয়ে কর আর শরের বোকেই বাঁর করে নিয়ে যাও, বামুনদের পেটে কিছু পড়িলেই সব চুকিয়া যায়। এই আমাদের সমাজ হইয়াছে, তা তোমরা আপত্তি করিলেই কি হইবে?” শরৎ উত্তর করিলেন, “এরূপ সমাজ হইয়াছে বলিয়াই সংস্কার অবশ্যস্বামী ভ্রাতৃ ভ্রাতারের বিচার না থাকিলে সে সমাজ থাকে না।”

সনাতনের দ্বী অনেকদিন বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিত;— বলিত, “আমি তখনই বলেছিহু গো, কল্কেতায় যেও না, কল্কেতায় গেলে জাতধর্ম থাকে না। ও মা, সোনার সংসার কি হলো গা? আহা, আমার সুখাদিদি আমার চিনি-পাতা দৈ খেতে বড় ভালবাসুক গো, ও মা, তার মনে এত ছিল, কে জানে বল? ও মা, তখনই বলেছিহু গো কলেজের ছেলে জেস্ত মাস্তবের গলার ছুরী দেয়; ও মা, তাই করে গা?” ইত্যাদি ইত্যাদি।

কল্কেতনের গৃহিণী মনে মনে সুধাকে

অনেক তিরস্কার করিত, কিন্তু মায়া কাটাইতে পারিল না, আবার লুকাইয়া লুকাইয়া চিনি-পাতা দৈ শরৎ-বাবুর বাড়ী লইয়া যািত। ক্রমে উভয় পক্ষের মধ্যে পূর্ব সন্তাব স্থাপিত হইল।

শরতের মাতা পূর্ববৎ ধর্ম্মকর্মে সমস্ত দিন মন দিতেন, সংসারের কিছু দেখিতেন না। কালীতারা সংসারে গৃহিণী, এত দিন পর জীবনের শাস্তি কাহাকে বলে, তিনি জানিতে পারিলেন। তিনি ভাঁড়ার রাখিতেন, রন্ধনাদি করিতেন, সমস্ত গৃহটি পরিপাটি রাখিতেন, সংসার চালাইতেন। সুখা শরতের মাতাকে ভক্তিভাবে পূজা করিত, কালীদিদিকে স্নেহ করিত, কালীদিদি যাহা বলিত, তাহা করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিত। ঘর ঝাঁট দিত, উঠান ঝাঁট দিত, পুকুর হইতে জল আনিত, বাটনা বাটিত, কুটনো কুটিত, দুধ জাল দিত, আর পুকুরে বাইরা বাসন মাকিতে বড় ভালবাসিত। পুকুরধারে আঁব-গাছ ছিল, কাঁঠালগাছ ছিল, অস্তান্ত ফলের গাছ ছিল, সুখা সেইখানেও ঘুরিত, যে ফলটি পাকিত, কালীদিদির কাছে আনিয়া দিত।

একদিন সন্ধ্যার সময় সুখা সেই গাছগুলির মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে, কি একটা মনে ভাবিতেছে, এমন সময় শরৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া বলিল, “কি ভাবিতেছ?”

সুখা একটু লজ্জিত হইয়া মুখ ঢাকিয়া বলিল, “বলিব না।”

শরৎ। হ্যাঁ, বলিবে বৈ কি, বল না?

শরৎ ধীরে ধীরে সেই কুসুম-শুবকতুল্যা দেহখানি হৃদয়ে ধারণ করিয়া সে লজ্জাব-নতমুখার প্রফুল্লিত ওষ্ঠদ্বয়ে গাঢ় চুষন করিলেন। সে স্পর্শে সুখার সর্বশরীর কঁটকিন

সংসার।

হইল। লজ্জার অভিভূত হইয়া সুধা বলিল,
“ছি। ছেড়ে দাও।”

শরৎ ছাড়িয়া দিলেন, বলিলেন, “তবে
বল।”

সুধা একটু হাসিয়া বলিল, “ছেলেবেলার
জোমাদের বাড়িতে যখন আসিতাম, তখন
এই পেয়ারা-গাছের পেয়ারা তুমি আমাকে
পাড়িয়া দিতে, তাই মনে করিতে-
ছিলাম।”

শরৎ হাস্ত করিয়া বলিলেন, “সেই আমা-
দের প্রথম প্রণয় এখনও ভুলিতে পার
নাই?”

আমাদের লিখিতে লজ্জা বোধ হইতেছে,

শরৎ গাছে চড়িলেন, সুধা নীচে পেয়ারা
কুড়াইতে লাগিল। এমন সময় ঘাটের নিকট

একটা শব্দ হইল, কালীদিদি ঘাটে আসি-
তেছেন। সুধা লজ্জিত ও ভীত হইল,

এবার শরৎ-বাবু কোন্ পথ দিয়া পলাই-
বেন? কিন্তু সুধা স্বামীর সমস্ত কমতা ও
গুণ জানিতেন না, শরৎ সেই গাছ হইতে
এক লাফে বেড়া ডিলাইয়া পড়িলেন, মুহূর্ত-
মধ্যে অদৃশ্য হইলেন।

শরৎ সে বৎসর সম্মানের সহিত পরী-
ক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তিনি লেখা-পড়াও
বিলক্ষণ শিখিলেন; কিন্তু বিন্দুদিদি আক্ষেপ
করিতেন, গাছে চড়া অভ্যাসটি গেল না।

সমাধি।

উৎসর্গ-পত্র ।

বঙ্গীয় সাহিত্যকে যাহারা নূতন রূপ, নূতন বল,

নূতন সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়াছেন,

বঙ্গবাসীদিগের হৃদয়ে যাহারা নূতন আশা,

নূতন উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছেন,

পद्य, গল্প ও নাটকে যাহারা বঙ্গভাষাকে

নূতন অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়াছেন,—

মধুসূদন দত্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত

ও দীনবন্ধু মিত্র,

সেই মহাত্মাদিগের নাম গ্রহণ করিয়া এই গ্রন্থ

উৎসর্গ করিলাম ।

চৈতন্য-সংক্রান্তি,

১৩০০ বঙ্গাব্দ ।

}

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত ।



সমাজ

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

চুল বাঁধা ।

মাতা । তাই তাই তাই !

শিশু । তাই তাই তাই ।

মাতা । আমার বাড়ী যাই ।

শিশু । আমার বালি দাই ।

মাতা । তাই তাই তাই ।

শিশু । তাই তাই তাই ।

মাতা । মাসীর বাড়ী যাই ।

শিশু । মাতি বালি দাই ।

মাতা । মাসী নেবে কোলে ।

শিশু । মাতি নেবে তোলে ।

মাতা । সন্দেশ দেবে গলে ।

শিশু । তনে দেবে দলে ।

মাতা । কীর দেবে পাতে ।

শিশু । থি দেবে পাতে ।

মাতা । চিনি দেবে হাতে ।

শিশু । তিনি দেবে আতে ।

মাতা । বাবা আসবেন ঘরে ।

শিশু । বাবা আবে দলে ।

মাতা । থোকা নেবে কোলে ।

শিশু । গাগা নেবে তোলে ।

মাতা । হার দেবে গলে ।

শিশু । হা দেবে দলে ।

মাতা । চুমো দেবে গলে,—

“কাকে চুমো দেবে লো ?” শিশু ও
মাতার মিষ্টালাপ হইতেছিল, এমন সময়ে

বয়স্ক একজন নারী সহসা ঘরের ভিতর
আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “কাকে
চুমো দেবে লো ? ছেলেকে, না ছেলের
মাকে ? ইস্ট্রী! আজ যে বড় ঘট !
”আয়োজন হচ্ছে যে !”

লজ্জার আরক্তমুখী হইয়া শিশুর যুবতী
মাতা মাথা হেঁট করিলেন, চক্ষু মুদিত
করিলেন । লজ্জার ললাট, গণ্ডস্থল, চক্ষুর
চৰ্ম্ম পর্য্যন্ত রঞ্জিত হইল, প্রফুল্ল পুষ্পের ন্যায়
ওষ্ঠ দুটি কাঁপিতে লাগিল ।

সত্যি আজ বড় ঘট ! শিশুর মাতা
ঘরের শানে বসিয়া সম্মুখে একটি দর্পণ রাখিয়া
চিরুণি লইয়া কেশবিষ্ঠাস করিতেছিলেন ।
একদিকে পানের ডিবে, আর একদিকে
(আমাদের লিখিতে লজ্জা হয়) মেকসর
অয়েল প্রভৃতি নানারূপ সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনের
উপকরণ রহিয়াছে । কি কি দ্রব্য আছে,
আমরা ঠিক জানি না, যৌবনোদ্ধতা সৌন্দর্য্য-
বিস্তৃতি রসিকাগণই সে উপকরণের বিশে-
ষত্ব অবগত আছেন

কাকপক্ষের ন্যায় কৃষ্ণ-কেশপাশের উপর
চিরুণি ঘন ঘন চলিতেছে, সুন্দর, সুগোল,
সুললিত বাহুলতার বলয় নন্দম্ বহু বহু
বাজিতেছে, অনাবৃত অনিন্দনীয় প্রিয় কণ্ঠে
সুবর্ণ-হার ছলিতেছে, অলঙ্কার-বিনিমিত্ত
ওষ্ঠদ্বয়ে মুহূ হাসি অনবরতই ফুটিতেছে ।
সে অপ্সরোবিনিমিত্ত প্রতিমূর্ত্তি সুন্দর দর্পণে
প্রতিফলিত হইয়াছে । সম্মুখে ঘরের দেয়ালে
একখানি ছবিতে শ্রীরাম, সীতা ও এক সিংহ

মুণ্ডি বিরাজমান রহিয়াছে, পার্শ্বের দেয়ালে
সাবিত্রী ও সত্যবান, নলরাজা ও দময়ন্তী
প্রভৃতি প্রাচীরের দলিতগণ বিরাজ
করিতেছেন। সম্মুখে একটি ছোট মন্দিরের
উপর শিশু বসিয়া খেলা করিতেছে, মাতা
শিশুকে কথা কহিতে শিখাইতেছেন, অথবা
অল্পমনস্ক হইয়া এক একটি সলীত বৃহৎ বৃহৎ
দ্বারে উচ্চারণ করিতেছেন। এই সমস্ত দেখি-
য়াই বরষা ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,
“শিশুর পিতা কাহাকে স্নেহচূষন প্রদান
করিবেন?” শিশুর মাতা লজ্জার কণেক
অধোমুখী হইয়া পরে হাসিয়া বলিলেন,
“ঠাকুরকি, তোমার কি সকল কথাই ঠাট্টা?”

ঠাকুরকি। না বোন, ঠাট্টা আর কিসে
হ'ল? বলি, মনের কথাটা খুলে বল দেখি,
যাক এত আয়োজন কি শুধু শুধু?

ব্রাহ্মবধূ। আয়োজন আবার কিসের?
মেয়েমাছুষে কি চুল বাঁধে না?

ঠাকুরকি। তা বাঁধে বৈ কি বোন,
তবে আজ তাবিজ-বাঁজুর বাহার কিছু বেশী
রকম, তাই বলছি।

ব্রাহ্মবধূ। তা ঠাকুরকি, মেয়েমাছুষে কি
গরনা পরে না?

ঠাকুরকি। পরে বৈ কি, তবে আজ
আবার স্নানর স্নানর ফুল ও ফুলের মালারও
আয়োজন দেখছি।

ব্রাহ্মবধূ। তা ঠাকুরকি, মেয়েমাছুষে
কি ফুল পরে না?

ঠাকুরকি। পরে বৈ কি, তবে আজ
আবার গুন্ গুন্ করে গান হচ্ছিল, ঠোঁটে
ভাসি যে ঘরে না গো?

ব্রাহ্মবধূ। বলি ঠাকুরকি, যাত্রার গান হই
একটা তোমার কাছেই শু শিখেছি। আর
মেয়েমাছুষে কি কখনও হাসে না, সদাঃ
কাদে?

ঠাকুরকি। তা হাসে বৈ কি বোন,
আবার আনন্দ হ'লে মেয়েমাছুষের দুকটাও
একটু খড়স খড়স করে। কেমন, ঠিক কথা
বলেছি কি না?

ব্রাহ্মবধূ পরাস্ত হইলেন, লজ্জার অভিজ্ঞতা
হইলেন। রঞ্জিতমুখী বলিলেন, “ঠাকুরকি,
তোমার পায়ে ধরি, আর ঠাট্টা করো না,-
এই নাও চুল বাঁধা রেখে দিলেম।”

ঠাকুরকি। বালাই! চুল বাঁধা রাখবি
কেন বোন? তোদের চুল বাঁধবার ত
বয়সই এই। তোরা গরনা পূর্বে নি ত
গরনা পূর্বে কে? তোদের মুখে একটু
হাসি দেখলে আমাদের প্রাণটা জুড়ের।
আর বোন, ভাল করে বোস, আমি তোরা
চুল বেঁধে দি। এমন ঘোঁপা বেঁধে দেব,
হাজার টাকা মূল।

ব্রাহ্মবধূ স্বধার আপত্তি সত্ত্বেও স্নেহময়ী
ননদিনী কালীতারা পার্শ্ব বসিয়া সহস্বে
ঘোঁপা বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন। সে ঘোঁপা
বাঁধিতে অনেকক্ষণ লাগিল, সন্ধ্যা হইয়া
আসিল, তথাপি ঘোঁপা বাঁধা শেষ হইল না।
ইত্যবসরে আমরা একবার গ্রামটা পরিক্রমণ
করিয়া আসি, গ্রামের খোসগল্ল ছই একটা
সংগ্রহ করিয়া লই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

বিবাহের ব্যবস্থা ।

আজ আট বৎসর সুধার বিবাহ হইয়াছে । অনেক গোলবোগের পর বিধবার বিবাহ হয়, বিবাহ হইয়াই যে গোলবোগ থামিবে, আমাদের সেরূপ সমাজ নহে । শরতের মাতা ব্রাহ্মণভোজন করাইলেন, সুধার জ্যেষ্ঠা-মহাশয় তারিণী-বাবু দলস্থ লোকের অনেক অল্পনয়ন করিলেন, স্বদেশবৎসল শরচ্চন্দ্র গ্রামের অনেক উন্নতিসাধন করিলেন, দমার্জ-জদয়া সুধা গ্রামের গরিব দুঃখী সকলকে রোগে, শোকে, বিপদে, দুঃখে, আত্মীয়ের হার, ভগিনীর হার সাহায্য করিতে লাগিলেন । শরৎ ও সুধার অনিন্দনীয় চরিত্র, অশেষ পরোপকার ও অকপট দেশহিতৈষিতার সকলেই মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে লাগিল । কিন্তু সদাচরণে জাতিরক্ষা,—গহিতাচরণে জাতিধ্বংস,—এ নিয়ম আমাদের প্রাচীন-কালে ছিল, এখনকার সমাজের রীতি নহে ।

তালপুকুর ও নিকটস্থ গ্রামের সমাজ-পতিগণ বৈকিয়া বসিলেন,—বসিলেন, “বিধবা-বিবাহ স্বীকার করিলে হিন্দুধর্মের আর রহিল কি ?” সর্বশাস্ত্রজ্ঞ দিগ্‌গজ পণ্ডিতগণ তারত্বরে উচ্চারণ করিলেন, “বিধবা-বিবাহপ্রথা বাতিলারমাত্র ।”

ভাগ্যক্রমে হেম ও শরৎ উক্ত সমাজ-পতি ও দিগ্‌গজদিগের সহিত জুটুখিতা পাড়াইবার জন্ত বিশেষ উৎসুক ছিলেন না এবং তাঁহাদিগের মহামতের জন্ত অনাহারে

বা অনিদ্রার কাল কাটাইতেন না । হেমচন্দ্র শিকের সম্পত্তি হইতে বৎসামাত্র আর পাই-রাও ডালপুকুর এবে বন্ধনে কালবাপন করিতে লাগিলেন এবং পুত্র ও কন্যাদিকে সবয়ে লাগন-পালন করিতে লাগিলেন । শরচ্চন্দ্র প্রজ্ঞানবান, সরলহৃদয়, যেহমরী নারীর পট্টয়া পঃম স্থখে কলিকাতার বাস করিতে লাগিলেন এবং সম্মানের সহিত একে একে কলেজের, পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হইলেন ।

সুধার জ্যেষ্ঠামহাশয় তারিণী-বাবুর বড় বিপদ ! তিনি সেকলে লোক, সমাজপতি-দিগের সহিত বিরোধ করিতে পারেন না, অথচ বিলু ও সুধা ভিন্ন তাঁহার আর এখন কে আছে ? তাহাদেরই বা পায়ে ঠেলেন কি প্রকারে ? সামাজিক বুদ্ধিমান লোকে যাহা করেন, বুদ্ধিমান তারিণী-বাবুও তাহাই করিলেন । গোপনে বিলু ও সুধার সহিত সম্পর্ক রাখিলেন, প্রকৃত্তে তাহাদের একঘরে করিলেন ।

সুধার বিবাহের তিন বৎসর পরে তারিণী-বাবু একবার তিনমাসের ছুটি লইয়া বাড়ী আসিয়া বৈঠকখানা জমকাইয়া বসিলেন । মহাজনি, তেজারতি, লয়ি, কবি সকল প্রকার ব্যবসাতে তাঁহার হৃদয়বুদ্ধি পরিচালিত হইতে লাগিল । প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তাঁহার ঘর লোকাকর্ণ—কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, কেহ হিসাব মিটাইতে আসিয়াছে, কেহ কর্ত্ত করিতে আসিয়াছে, কেহ শ্রম দিতে আসিয়াছে, কেহ বা ক্ষেতখানি ভাগে লইবার জন্ত আসিয়াছে । গ্রামের প্রধান প্রধান দল-পতিগণ তাঁহার তক্তপোষে বসিয়া অল্পপস্থিত বন্ধুগির চরিত্রের শ্রদ্ধ করিতেন, পাণ্ডিত্যভিমানিগণ সমবেত হইয়া সমাজের

* বিবাহা সুধার বিবাহের কথা ও পূর্ব-ইতিহাস জটিলিতে চাহেন, তাঁহার মংগ্রন্থ “সংসার” নামক উপন্যাসখানি পাঠ করিবেন ।

বিরুদ্ধে অপারাবিগণকে দণ্ডিত করিয়া হিন্দু-
আচার সংরক্ষণ ও নিজের উদয়পূর্তি করিতেম,
কস্তারায়গ্রস্ত পিতৃগণ কস্তাদায় উদযাপন
জন্ত পরামর্শ করিতেম এবং আদালতের
কার্যে লিপ্ত ব্যক্তিগণ বর্জমানের নাজীর
সহায়ের উপদেশ গ্রহণ করিয়া আপনাকে
কৃত্তার্থ মনে করিতেম। কলতঃ তালপুকুর
গ্রামে তারিগীরণ মল্লিকের জায় জ্ঞানী,
মানী ও সর্বজন-সমাদৃত অস্ত্র আর কে
আছে ?

এ সম্মান সত্ত্বেও বুকের হৃদয় নিশ্চিন্ত
ছিল না। একমাত্র কস্তার মৃত্যুশোক সে
বিষয়ী লোকের হৃদয়ে অধিক দিন স্থান
পাইল না। কিন্তু নিজের মৃত্যুর পর
তালপুকুরের মল্লিকবংশ নির্বংশ হইবে, এ
ভাবনা তাঁহার অসহ্য। তাঁহার পরামর্শ-
দাতারও অভাব ছিল না।

মলপতি ও সমাজপতিগণ সর্বদাই
বলিতেন, “তারিগী বাবুর এমনই কি বয়স
হইয়াছে, এই ত বিবাহের পরিপক্ব বয়স।
মানে বল, ধনে বল, জ্ঞানে বল, এরূপ বর
কি আজকাল কস্তার ভাগ্যে সহসা ঘটে ?
পুনরীর দারপরিগ্রহ করুন, নববধূ ঘরে
আনুন, আশু পুত্রমুখ দর্শন করিয়া শান্তি-
লাভ করুন। ঐ মিত্রদের বাড়ীতে নয় বৎস-
রের সুন্দরী কস্তা আছে, ঘটক পাঠান। কস্তা
ভাগ্যবতী না হইলে কি এমন উপযুক্ত পাত্র
পায় ? কস্তার পিতৃকুল এরূপ সম্বন্ধে উদ্ধার
হইয়া যাইবে।” নয় বৎসর-বয়স্ক প্রণয়িনীর
মুখমধু আশ্বাসন করিতে তারিগী-বাবুর বিশেষ
আপত্তি ছিল, এমত বোধ হয় না। গ্রামে
কেহ কেহ বলিত, তারিগী-বাবু সেই মনে
করিয়াই ছুটি লইয়া বাড়ী আসিয়াছিলেন !
বাহা হউক, এরূপ প্রস্তাবে তারিগী-বাবু শীঘ্র
কান উত্তর দিতেন না।

মোনই সম্ভূতির লক্ষণ জানিয়া ব্রাহ্মণ-
পণ্ডিতগণ ঘন ঘন বলিতে লাগিগেন, “ভা
এ ত ভাল কাজই, প্রথম সংসারের কোন
সন্তান নাই, দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিবেন,
এ ত শাস্ত্রসম্মত কার্য। আশে নয় বৎসরের
কস্তা ত গৌরীতুলা। পুরুষের বয়স সম্বন্ধে
শাস্ত্রে কোন বিধান নাই, বয়স যতই হউক
না, পুরুষ বিবাহ করিতে সমর্থ। আর
তারিগী-বাবুর এমনই কি বয়স হইয়াছে ?
তা, এ শুভ কার্যের এখনই সমস্ত আয়োজন
করুন। তারিগী-বাবু, ধর্মপরায়ণ, জ্ঞানী,
বিজ্ঞ লোক, পুত্রকামনার ও বংশরক্ষা
কামনার দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিয়া ধর্ম
চরণের জলন্ত দৃষ্টান্ত সকলকে প্রদর্শন করুন।
তারিগী-বাবু প্রকাশ্যে এ প্রস্তাবের উত্তর
দিলেন না, কিন্তু নবম-বর্ষীয়া বধূর কথা
আলোচনা করিয়া বুকের হৃদয়টা নাচিয়া
উঠিল। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ সে দিন বিলক্ষণ
পারিতোষিক পাইলেন।

তারিগী-বাবুর বিশেষ সুহৃদ-বন্ধুগণও
এই পরামর্শ দিতেন। তারিগী-বাবুর মুখে
হাসি ধরিত না, তবে একটু অসম্মতির লক্ষণ
দেখাইয়া বলিতেন, “কি জান ভায়া, আমার
এ কাজে বড় মন নাই, তবে এই মল্লিকবংশ
দীপশ্রুত হইবে, তাহা ভাবিলে বড় আক্ষেপ
হয়।”

বহু। তা বৈ কি, আপনি নিজে
নিঃস্বার্থ নিষ্পৃহ লোক, তাহা তালপুকুর ও
বর্জমানে কে না জানে ? তবে বংশরক্ষা ধর্ম
সঙ্গত কার্য ; সেই জন্য, একটু কষ্ট স্বীকার
করুন। তা আপনি বলিয়া এক কষ্ট স্বীকার
করিতেছেন, সকলে কি এরূপ করে ?

(ঘরের কোণে একটি পাড়ার ছুঁই ছেলে
বসিয়া ছিল, তারিগী-বাবুর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ-
রূপ কষ্ট-স্বীকারের কথাটা শুনিয়া হাসি

সংবরণ করিতে না পারিয়া ঘর হইতে ছুটিয়া পালাইল। ছোড়াটা নিতাই ছুট!)

তারিণী বাবু। আর কি জান ভায়া, এই দুইটা ভাইখিকে হাতে করিয়া মাহুৰ করি-রাছি, তাহাদেরও কিছু দিবে বাব মনে করিয়া-ছিলাম। তবে আজকালের ছেলে মেয়েরা সবই বেয়াড়া, ধৰ্মপথে ত কেহ চলে না।

বঙ্গুপণ। সে কথা আর বলেন কেন? আপনি ঐ বিলুপ্তবাসিনীর জন্ত আর সুখার জন্ত যা করিয়াছেন, আমরা কি আর তাহা দেখি নাই? সে ত সেদিনকার কথা। আপনি না থাকিলে দুটো অনাথা মেয়েকে খাওয়াত কে? পরাত কে? মাহুৰ করিত কে? আপনার দয়ার জদর, সেই জন্ত এত করিলেন, সকলে কি এত করে? তা, সেই মেয়ে দুইটা কি ভারী না পিশাচী? এমন দয়ান্বিত গুরুর কথা না শুনিয়া, ধৰ্ম্মে জলা-ঞ্জলি দিয়া, কি না বিধবা-বিবাহ! ছি! ছি! লুছি! তারিণী-বাবু, তাহাদের আর নাম করি-বেন না, পাপিষ্ঠাগুলার নাম করিলেও পাপ হয়। আপনি নিতান্ত অমারিক, তাই তাহা-দের এ গ্রামে থাকিতে দিয়াছেন, অস্ত্রে হইলে তাহাদের মাথা মুড়াইয়া মাথায় ঘোল ঢালিয়া গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দিত।

তারিণী বাবু। আর কি জান ভায়া,— মনের কথা তোমাদের খুলিয়া বলি, তোমা-দের না বলিলে কাহাকে বলিব? দিন দিন গৃহিণীর শরীরটা বড়ই অবসর হইয়া পড়ি-তেছে, তাঁহাকেও একজন দেখিবার শুনি-বার লোক চাই। তা আমি ত সৰ্বদা বৰ্কমানে থাকি, সৰ্বদা দেখিতে পারি না, অল্পবয়স্ক আপনার লোক একজন ঘরে থাকিলে আমার গৃহিণীরও পরিচর্যা করিতে পারে, গৃহিণীর উপযুক্ত সেবা-শুশ্রূষা হয়, এই জন্যই এ কার্যে মত দিতেছি,—

নচেৎ আমাদের এ বয়সে হার-পরিগ্রাহে একেবারেই মন নাই। এখন বৃদ্ধ হইতে চলিলাম, এখন পারমার্থিক বিষয়েই মন দেওয়া জেয়।

বঙ্গুপণ। তা সে কথা কি আর বলিতে হয়? আপনার নিম্পুহ সদয় শ্রবাব কি আমরা জানি না? আপনি যেরূপ গৃহিণীর প্রতি বহু করেন, আজকাল করজন সেক্ষপ করে? শাস্ত্রে বলে, নারী পুত্র-সন্তান এসব না করিলে পরিভাজ্য—অর্থাৎ তাহার মাথা মুড়াইয়া, ঝাঁটা মারিয়া বাজারে বাহির করিয়া দিবে। তবে যে আপনি এতদিন তাঁহাকে সযত্নে গৃহে রাখিয়াছেন, খাওয়া-ইতেছেন, পরাইতেছেন, এ আপনার দয়া। এক্ষণে যে তাঁহার পরিচর্যা করিবার বিধান করিতেছেন, সেও আপনার দয়া।

পরামর্শ অনেকক্ষণ চলিতে লাগিল। পরামর্শে কি ঠিক হইল, তাহা বলা বাহুল্য। কর্তৃকর্ত্তা যখন মত স্থির করিয়াই গ্রামে আসিলেন, তখন পরামর্শটি বিড়ঘনা মাড়।

তারিণী-বাবুর বাড়ীতে জ্ঞাতিবন্ধী বাঁহারা বাস করিতেন, তাঁহারা সৰ্বদা উমার দার শুশ্রূষা করিতেন। বাহিরে বৈঠকখানার যে কথা হইয়াছিল, তাহা তাঁহাদের অগোচর রহিল না এবং তাঁহারাও অবিলম্বে নানা অলঙ্কার সহ সে কথাটি উমার দার কানে তুলিলেন।

রোগক্লিষ্টা উমার দা এক বিশু চক্কর জল মোচন করিলেন;—বলিলেন, “যখন উমাকে হারাইয়াছি, তখন এ সংসারে সমস্ত হারাইয়াছি, সংসারে আমার আর সুখ নাই। বাবুর যদি কচি হয়, দ্বিতীয় সংসার করুন; তরঙ্গা করি, তিনি দ্বিতীয় সংসারে সুখী হইবেন।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:—

বিবাহের পাত্রী।

তালপুত্রের মিত্রদের আগে ভাল অবস্থা ছিল, এখন অবনতি। তালুক বাহা ছিল, তাহা অনেক দিনই গিয়াছে, দুই একটা জমা-জমী ছিল, তাহা ঘারা মিত্র মহাশয় কোন প্রকারে সংসার চালাইতেন। বৈ বৎসর উমাতারার মৃত্যু হয়, সেই বৎসরেই অনাথা বিধবা ও দুইটি সন্তান রাখিয়া মিত্র মহাশয় পরলোক-গমন করেন। একটি পুত্র-সন্তান, নাম গোবুলচন্দ্র, অপরটি কন্যা-সন্তান, নাম গোপবালা।

মিত্র মহাশয়ের মৃত্যুতে অনাথা বিধবা ও সন্তান দুটি বড়ই কষ্টে পড়িল এবং তাহা-দিগের সংসার চালাইবার হইয়া উঠিল। গ্রামস্থ নরাজ লোকে কিছু কিছু সহায়তা করিলেন, কিন্তু যখন কলিকাতা হইতে কিরিয়া আসিলেন, তখন মিত্র-পরিবারের যথেষ্ট সাহায্য করিলেন, মিত্রদিগের জমা-জমী বাহা ছিল, তাহা ভাগে বন্টন করিয়া দিলেন, পরিবারের খাইবার জন্তে মধ্যে মধ্যে চাউল, ডাল, তরিতকারি পাঠাই-তেন। বর্ষাকালে তাহাদের বাড়ীর উঠানে কতকগুলি বেগুনগাছ ও নানা প্রকার শবজ রোপণ করিয়া দিতেন এবং শীতকালে ছেলেদের জন্ত গরম জামা সহজে সেলাই করিয়া দিতেন। সর্বদা দেখিতে যাইতেন এবং শিশু গোপবালা সর্বদা বিন্দুর বাড়ী খেলা করিতে আসিত।

গোবুলচন্দ্র গ্রামের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত, কিন্তু পিতৃবিয়োগবশতঃ এখন অধ্যয়ন ত্যাগ করিল, কার্যের চেষ্টা

দেখিতে লাগিল। ১৫ বৎসরের অশিক্ষিত বালকের কি কাজ মিলবে? কিন্তু ছেলেটি বড় বুদ্ধিমান, ৮ টাকা ১০ টাকার বকশীগিরি বা সরকারি করিয়া কিছু টাকা করিল এবং এখন রাস্তা পথের কটাক্টি লইয়া বিশেষ উপার্জন করিতে আরম্ভ করিল। মাকে ও ভগিনীকে বড় কিছু পাঠাইত না; গোবুল বুদ্ধিমান, টাকা জমাইতে জানে।

তালপুত্রে গোবুলের মা ও ভগিনী জমী হইতে সামান্য আয় পাইয়া এবং বিন্দুর সাহায্যে কোন প্রকারে সংসার চালাইত। বিন্দুর কন্যা সুলীলার বয়স যখন সাত বৎসর, গোপবালার বয়স তখন নয় বৎসর, সুতরাং দুই জনে সর্বদাই একত্র বিন্দুর উঠানে খেলা করিত। সুলীল শ্রামবর্ণা ও বড় ভাল মানুষ, চক্ষু দুটি মার মত সুন্দর ও বিশাল, কিন্তু মেয়েটি বিশেষ সুন্দরী নহে। গোপ-বালা বড় ধারাল মেয়ে, বড় সেয়ানা, বড় সুন্দরী। মুখখানি সৌন্দর্য্য ও বুদ্ধির লক্ষণে বিভূষিত, রং যেন কাঁচা সোনা, জলতা যেন তুলি দিয়া আঁকা, চক্ষু দুটি কি উজ্জ্বল, কি তীক্ষ্ণ! তালপুত্র গ্রামের মধ্যে একরূপ ফুট-ফুটে মেয়ে আর ছিল না, গ্রামের বিস্তীর্ণ বাগানে বা বৃক্ষচ্ছায়ায় মেয়েটি যখন ছুটা-ছুটি করিয়া খেলা করিত, বোধ হইত যেন, কোন দেবকন্যা নন্দনকাননে বিচরণ করিতেছে। ক্রমবশতঃ মাঠে খাইবার সময় মেয়েটিকে দেখিলে ফিরে চাহিত, ঘাট থেকে মেয়েরা জল আনিবার সময় কলস নামাইয়া একবার মেয়েটিকে কোলে লইত।

গোপবালা যেমন সুন্দরী, তেমনি সেয়ানা। নয় বৎসরের মেয়ের যে পেটে পেটে বুদ্ধি, তাহা দেখিয়া গ্রামের বয়স্ক-গণ বিম্বিত হইতেন। সে একলা ভাবিত,

একলা মতলব স্থির করিত, একলা গোপনে সম্পাদন করিত। সুশীলার সহিত খেলা করিত, কিন্তু সুশীলা হাবা দেয়, গোপ-বাংলার মন কি বুঝবে? সুশীলাকে তুষ্ট করিয়া তাহার খেলার সামগ্রীগুলি একে একে সংগ্রহ করিত, বিন্দু ও সুধাকে মা বলিত ও কখন একটি খেলানা, কখন মিঠায়, কখন একখানি ঢাকাই কাপড় সংগ্রহ করিত। বিন্দু বলিলেন, “আহা, মেয়েটি কি শাস্ত, কি নম্র, কি সুখীর। দেখিলে চক্ষু ছুড়ায়।”

মল্লিকবাড়ী হইতে গোপবাংলার মার নিকট ঘটকী আসিল। গোপীর মা গালি দিয়া বলিলেন, “বলিস্ কি পোড়ারমুখী, আমার মেয়েকে ভুলে ভাসাইয়া দিব? ৫০ বৎসরের বুড়োর সঙ্গে আমার কচিমেরের বিয়ে দিব? টাকা নিয়ে কি মেয়ে ধরে খাবে, গরনা নিয়ে কি মেয়ে পেতে পোবে? হলেম বা আমরা গরিব, আমরা গরিবই থাক্ব, টাকা নিয়ে মেয়েকে বিক্রয় কর্ব না। ও মা, ছি! ছি! ছি! বলি, বুড়ো যে আমার গোপীর ঠাকুরদাদার বয়সী,—বাছা উমার যদি ছেলে থাক্ত, সে যে আজ প্রায় আমার গোপীর বয়সী হত, বিন্দুর মেয়ে যে প্রায় আমার গোপীর বয়সী,—আর সেই বিন্দুর জ্যেষ্ঠা, উমার বাপ, সে কি না আমার গোপীকে বিয়ে করতে চায়? বলি, যম কি বুড়োদের ভুলে থাকে না? আর বুড়োগুলোই বা কি গা? নাতনী-বয়সী জুটুছুটে যেরে দেখেও মুখ দিয়ে নালা পড়ে? ছি! ছি! অমন বুড়োর মুখে আঙুন। না গো না, অমন কথাটি মুখে এনো না,—ঐ কালীর মা এক বুড়োর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল, কি হ'ল দেখলে ত? আবার সেই ব্রকম কাজ করে? না গো না,

আমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, যার ধন, যার সংসার, তিনি আমাকে কান্দিরে চলে গিয়েছেন,—আমিও গেলেই বাঁচি, আর এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না!” বিশ্ববা স্বামীকে স্মরণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ঘটকী ফিরিয়া গেল, বালিকা গোপ-বালা বেড়ার বাহিরে দাঁড়াইয়া সকল কথা-গুলি শুনিল; মনে মনে বলিল, “আমি বড় ঘরের বোঁ হব, তাতে মা আপত্তি করুতে-ছেন। মার আপত্তি খাটবে না।”

তারিণী-বাবু মতলব স্থির করিলে সহজে ইচ্ছাবার লোক নহেন। পরদিন ঘটকী বিন্দুর নিকট আসিল, একখানা চিঠি বিন্দুর হস্তে দিল। চিঠিখানি বিন্দুর জ্যেষ্ঠাইমা লিখিয়া-ছেন। তাহাতে এই লিখা আছে,—

“মা বিন্দু, তোমার জ্যেষ্ঠামহাশয়ের সন্তানাদি না থাকার আবার বিবাহ করিবেন স্থির করিয়াছেন, এ বিবাহে আমারও মত আছে। মিত্রগোষ্ঠীর গোপবালা নামে একটি মেয়ে আছে, তাহাকেই তোমার জ্যেষ্ঠামহাশয় পছন্দ করিয়াছেন, মেয়েটি সুনিয়াছি, বড় নম্র। মেয়ের মা তোমারই আশ্রিত লোক এবং তোমার কথা শুনে। তাহার সম্মতি যাহাতে হয়, সে বিষয়ে যত্ন করিয়া তোমার জ্যেষ্ঠাইমার কথা রক্ষা কর।

পুনশ্চ—বাছা, উমা গিয়ে অবধি তুমিই আমার মেয়ে,—আবশ্যক হইলে তোমার ঘরে মাকে স্থান দিও।”

বুদ্ধিমতী বিন্দু পত্রের প্রথম ভাগ পড়িয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িলেন, শেষ ছত্রটি পড়িয়া একবিন্দু অশ্রুবর্ষণ করিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠাইমার এ বিবাহে কিরূপ মত আছে, শেষ ছত্রে বুঝিতে পারিলেন। পত্রের উত্তর লিখিলেন—

জ্যেষ্ঠাইমা, জ্যেষ্ঠামহাশয় জান হারাইয়া,

ছেন,তুমিও কি জ্ঞান হারাইবে? কালীতারার অবস্থা চক্ষে দেখিয়াও গ্রামের আর একটি মেরেকে জলে ভাসাইবে? জ্যোতাইমা,আমি ছেলেমানুষ, তোমাকে কি পরামর্শ দিব? তুমি বুঝিয়া দেখ,জ্যোতামহাশয়ের কি এ বিবাহে সুখী হইবেন? তুমি যেরূপ শরীর মাটি করিয়া জ্যোতামহাশয়ের শুশ্রূষা করিতেছ, অল্পবয়স্ক স্ত্রী কি জ্যোতামহাশয়ের সেইরূপ পরিচর্যা করিবে? যদি সে স্ত্রী ক্লেশদায়িনী হয়, জ্যোতামহাশয়ের এই শেবাবস্থার ক্লেশ তোমাকে চক্ষে দেখিতে হইবে।

জ্যোতাইমা,এ কাজটি হইতে দিও না, এ কাজে আমি সাহায্য করিব না।”

বিন্দু চিঠিখানা একবার দুইবার টেঁচিরে পড়িলেন। চিঠিখানি মনোমত হইয়াছে। ঘটকীর হাতে দিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

ঘটকী বাড়ী হইতে চলিয়া গেল। তাহার অল্পকণ পরে আর একজন বেড়ার পাশ হইতে আস্তে আস্তে সরিয়া গেল। গোপ-বালা দাঁড়াইয়া দুইখানি চিঠি আছোপাস্ত শুনিয়াছে,মনে মনে বলিল, “আমি বড়ঘরের বৌ হব,তাহাতে স্ত্রীলার মা বাধা দিতেছে। বাধা খাটিবে না।”

সন্ধ্যার সময়ে সুধা বিন্দুর সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। সুধাকে দেখিয়াই বিন্দু হাসিয়া বলিলেন, “বলি ওগো সুধা,আমাদের নূতন জ্যোতাইমাকে দেখেছিস্?”

সুধা। না দিদি, নূতন জ্যোতাইমা আবার কে?

বিন্দু। ওলো, তা জানিস্ নি? তবে জানিস্ কি? ঐ দেখ, বাগানে স্ত্রীলার সঙ্গে খেলা করছে।

সুধা। সে কি দিদি? ও যে গোপী, ওর সঙ্গে জ্যোতাইমা সম্পর্ক পাতালে না কি?

বিন্দু। ওলো, আমি পাতাব কেন? সম্পর্ক পাতাবে, পাতাবে,—বার পাতাবার, সে পাতাবে:

সুধা। এ তোমার কি ঠাট্টা দিদি, আমি ত কিছুই বুঝতে পারি নি; তুমি যে ছেলে গড়িরে গেলে দিদি! সত্যি সত্যি বল না দিদি, হয়েছে কি?

বিন্দু। না, কিছু হয় নি, বোধ হয়, মাস-খানেকের মধ্যেই হবে।

সুধা। কি হবে, কি হবে?

বিন্দু। ঐ যে বল্লেম, ঐ গোপী আমা-দের নূতন জ্যোতাইমা হবে, জ্যোতামশাই যে ওকে বিয়ে করবার জন্য ঘটকী পাঠিয়েছেন! ও গোপী, গোপী, বলি, জ্যোতামশাইকে বিয়ে কর্বি লো?

গোপী। বড়-মা ডাকছ?

বিন্দু। হাঁ,ডাকছি,একবার কোলে আর।

বিন্দু। বালিকাকে কোড়ে করিয়া, সেই নন্দমুখী সৌন্দর্য্যপূর্ণা ফুটফুটে মেয়ের ঠোটে চুমো খেয়ে, তাহার উজ্জল কৃষ্ণ চক্ষু দুটিতে চুমো খেয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বলি, জ্যোতামশাইকে দেখেছিস্?”

গোপী। হাঁ বড়মা, দেখেছি ঠিক।

বিন্দু। কবে দেখ্‌লি লো?

গোপী। ঐ যে কা’ল বিকালে আমি পুকুরধারে থেলা করত গিয়েছিলেম,তারিণী বাবুও গিয়েছিলেন।

সুধা। ও হরি! তবে বর-কনের চোখা-চোখি হয়ে গিয়েছে! হেলা, জ্যোতামশাই তোকে আদর করেছিল?

গোপী। ই্যা ছোট মা,তারিণী-বাবু এক-বার চারিদিকে মেয়ে দেখলেন। দেখলেন, কেউ কোথাও নেই, তখন আমাকে কোলে তুলে নিয়ে কত আদর করলেন।

বিন্দু হাসিতে হাসিতে ভূমিতে নুতন

হইলেন ; উঠিয়া সুধাকে বলিলেন, “বলি শুনিয়া সুধা, এই কালেই বর-কনের মিষ্টালাপ হয়ে গিয়েছে ! বলে, সে কালের বুড়োরা নাতনীদেব সঙ্গে ঠাট্টা কর্তো, আজকাল কি সত্য সত্যই নাতনীদেব সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করে ? হি হি হি ! এ লজ্জার কথা বখন জগতে রাষ্ট্র হবে, তখন আমাদের কালামুখ দুকাব কোথায় ? জ্যেষ্ঠামশায় কি সত্যি এ বয়সে লোক হাসাবেন ? বলি, গোপা, জ্যেষ্ঠামশাইকে তোব মনে ধরে ?”

“ধরে।” এই কথাটি বলিয়া বালিকা ছুটিয়া পলাইয়া গেল। বিন্দু বলিলেন, “বালিকা কি সরলা, বিষয়ের কথা কিছু জানেও না, বুঝেও না, জ্যেষ্ঠামশাই উহাকে কোলে ক’রে আদর করেছেন, সরলা মেয়েটি তাতেই আনন্দিত হয়েছে। হি ! হি ! জ্যেষ্ঠামশায়, তুমি বিজ্ঞ, তুমি বহুদর্শী, তুমি বুদ্ধিমান, এই সরলা বালিকাকে অকূল সমুদ্রে ভাসিও না।”

বিন্দু একটু ভুল করিয়াছিলেন, বালিকা নিতান্ত সরলা নহে। বিষয়ের কথা কিছু কিছু জানে, ধনগৌরবের একটু লালসা রাখে, সুবর্ণ ও মণিসুতার দিকে দৃষ্টি রাখে এবং দারিদ্র্য হইতে উত্থান করিয়া একবার বড়-ঘরের বোঁ হইবার চুর্দ্দমনীয়া আকাঙ্ক্ষা বাল্যরুদ্ধরে ধারণ করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

“বিবাহের কথাবার্তা স্থির।

তারিণী-বাবু একবার মতলব স্থির করিলে শীঘ্র হাটবার লোক নহেন। বর্ধমান

গোকুলচন্দ্রের নিকট লোক পাঠাইলেন। গোকুল লোকযুগে বিশেষ কোন কথা জানিতে পারিল না, তবে কোন কারণে তারিণী-বাবু জুড় হইয়াছেন শুনিয়া কিছু ভীত হইল। নাজীর মহাশয়ের বর্ধমান প্রভুত্ব ও সাহেবদের নিকট খাতির, এসকল বিষয় গোকুল বিশেষ জানিত। নাজীর মহাশয় একবার সাহেবদের নিকট তাহার বহান করিলে তাহার কণ্ট্রাঙ্কিত হুটিবে, অরও হুটিবে। সভয়ে পরদিনই গাঙ্গী করিয়া ভাল-পুতুর গ্রামে আসিয়া, ঘরে না গিয়া একেবারেই তারিণী-বাবুর গৃহে উঠিয়া, নাজীর মহাশয়ের শ্রীচরণে প্রণাম করিল।

নাজীর মহাশয় বড় রুঠ, মুখ ফিরাইয়া কথা কহেন না। সভয়ে ও সম্মানে গোকুল অনেক মিষ্টকথা দ্বারা তারিণী-বাবুর মন তিজাইয়া বলিল, “আমি চিরকালই আপনায় আজাদীন, আপনায়ই অয়ে পালিত, আপনায় অহুগ্রহে জীবিকা নির্বাহ করিতেছি। এ অধীনের প্রতি কি জন্ত বিরক্ত, একবার বলুন, কি আদেশ পালন করিতে হইবে বলুন, অধীন কি কখন আপনায় অবাধ্য হইতে পারে ?”

তারিণী-বাবু। না হে ভায়া, (এতদিন বাবাজী বলিয়া সম্বোধন করিতেন, এখন নূতন সম্বন্ধ) এখন আর তোমরা অধীন কৈ ? এখন ঢের কণ্ট্রাঙ্কিত পাও, ঢের টাকা রোজগার কর, এখন আমাদের কি আর মানিবে, না আমাদের কথা শুনিবে ? আচ্ছা দেখা বাবে, দেখা বাবে, কে সাহেবদের বলিয়া তোমাকে এত কণ্ট্রাঙ্কিত দেওয়াইয়াছে, তাহা দেখি, আর ভবিষ্যতে কিরূপে কণ্ট্রাঙ্কিত পাও, তাহাও দেখি।

গোকুল। সে কি ? বলেন কি ? আস-নারই অহুগ্রহে, আপনায়ই খাণ্ডের আশ্রয়

বখাসর্ব্ব উপায়, তাহা কি আমি জানি না? বর্দ্ধমানে এ কথা কে না জানে? আপনাকে অবহেলা করিব? আপনার পাতৃকা বহন করিতে পারিলে কৃতার্থ হই, আপনার কথা শুনিব না ত কাহার কথা শুনিব?

তারিণী বাবু। না, আর আমাদের কথা কই খাটে? যাও ভায়া, বাড়ী যাও, তোমার মা আমার কিরূপ অপমান করিয়াছেন, গিয়া শুন। বাঁটা মারিয়া আমার লোক বিদায় করিয়াছেন। মিত্রজ্ঞা আমার সম্মান জানিতেন, এখন কি না, তাঁহার বিধবা—মাঁহাকে কষ্টের সময় অন্নবস্ত্র দিয়া পালন করিলাম, সে আমার এমন অপমান করে? আজ্ঞা, দেখিব, দেখিব, কোথাকার জল কোথায় ঝাড়ায়?

গোকুল। বলেন কি? মা আমার পথের কান্দালী, সে তালপুকুরের ধনাঢ্য মল্লিক-বংশের অপমান করিবে? কথাটা কি, ভেঙ্গেই বলুন না।

তারিণী বাবু। আর ভেঙ্গে বলিয়া কি তোমার কাছে অপমানিত হইব? না হে ভায়া, তাহাকে কাজ নাই। এখন তোমরা বড় মাহুড়, তোমরা বড় ধর, আমরা ছোট লোক, এখন কি আর আমাদের দিকে ফিরে চাহিবে, না আমাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করিবে?

গোকুল। কি বলিলেন? কি বলিলেন? আপনাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা? এ বে আকাশের চাঁদ হাতে পাইলাম। এ দরিদ্র আপনাদের হাতের এক মুষ্টি ভিক্ষা পাইলে সম্মানিত হয়, আমরা আপনাদের সহিত কুটুম্বিতা করিব, এমন দিনও হবে?

মিষ্টকথার দেবতারাও তুষ্ট হন, তারিণী-বাবুর মন একটু ভিজিল। আজ্ঞা করিলেন, “হরে, হরে। তামাক দে ত। ব’স ভায়া ব’স,

অনেক দূর থেকে আসিয়াছ, দেখাছ, এখনও বাড়ী যাওয়া হয় নি, একেবারে এইখানেই উঠেছ। তা ব’স ভায়া ব’স, তোমার মত বিনীত ছেলে একজন দেখলেও আনন্দ হয়।”

গোকুল। আজ্ঞা না, আমি পাড়ায়েই রহিলাম, বতকণ আপনার আদেশ না পাইব, বতকণ আপনার আদেশ তামিল না করিব, ততকণ আসন গ্রহণ করিব না, জলগ্রহণও করিব না।

তারিণী-বাবুর মুখে এখন হাসি দেখা দিল, হৃদয়ে উল্লাসের সঞ্চার হইল। গোকুলের হাত ধরিয়া বসাইয়া, একবার কল্কেতে হুঁ দিয়া আগুনটা ধরাইয়া তাল করিয়া তামাক টানিয়া গলায় সাড়া দিয়া পরিকার করিয়া লইয়া বলিলেন, “না, বল্ছিলাম কি, তোমার পিতা মিত্রজ্ঞার সহিত আমার কিরূপ প্রণয় ছিল, তাহা ত তুমি জানই।”

গোকুল। আজ্ঞা হাঁ, তাহা জানি বৈ কি।

তারিণী বাবু। তাঁহার বিপদ আসিলে সময় সাহায্য দিতে গ্রামের মধ্যে কেহ ছিল না, তিনি আমার কাছেই আসুতেন, তাহাও ত তুমি জান।

গোকুল। আজ্ঞা হাঁ, জানি বৈ কি।

তারিণী বাবু। তাঁহার মৃত্যুর পর, মাঠা কুরুণকে সাহায্য দেওয়া, তোমাকে বর্দ্ধমান সাহেবদের নিকট পরিচিত করিয়া দেওয়া, তোমার ছোট বোনটিকে কাপড়-চোপড় দেওয়া,—এ সব কথা ত তুমি জানই। নিজের গুণ নিজমুখে বলা সাজে না, কিন্তু মিত্রবংশের জন্ত কি করিয়াছি না করিয়াছি, তাহা ত তুমি জান।

গোকুল। আজ্ঞা হাঁ, জানি বৈ কি।

তারিণী বাবু। তা করিব না কেন বল ? আমাদের কুল ভাল, বংশ ভাল, আচরণ ভাল, তোমাদের জন্ত করিব না ত কি আমার ন্তিক ভাই-ঝি-জামাইদের জন্ত করিব ? । আমার নিজের মাতাল জামাইয়ের জন্ত রিব ? না হে ভায়া, এ ঘোর কলিতেও র্ম আছে, এখনও সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদয় হয়, ধনও তোমাদের স্তায়/সম্বংশের উন্নতি বশ্তই হইবে।

গোকুল। সে আপনার অগ্রহ।

তারিণী বাবু। তাই মনে করু-
হলাম, বিষয়-সম্পত্তি যৎ-বিধিৎ করেছি,
গলুক, জমা, মহাজনি, তেজারতি, লয়ি,
ফারবার, বাড়ী, ঘর, গহনাপত্র সমস্তই
মাছে। এ আর কাহাকে দিয়া যাব ?
কত্যা উমা ত আমাকে কাদিয়ে চ'লে
গিয়েছে, গৃহিণীও সেই শোকে যায় যায়
হয়েছেন। তা ভেবে চিন্তে দেখলেম,
তালপুকুর গ্রামের মধ্যে কুলে, মানে, সদা-
চরণে মিত্রবংশই শ্রেষ্ঠ, তা যদি মিত্রবংশের
সঙ্গে একটা কুটুম্বিতা স্থাপন ক'রে যাই,
তা হ'লে যা রেখে যাব, এ সমস্তই তোমা-
দের, তোমার ভগিনীরও বা, তোমারও
তাই।

গোকুল বুদ্ধিমান ছেলে, কথার আভাষে
তারিণী-বাবুর মতলবটা বুঝিল, মনে মনে
বুদ্ধিমানের স্তায়ই নিষ্পত্তি করিল। ঝেরে-
ছেলের আবার পছন্দ অপছন্দ কি ? যেরে-
গুলো হয়েছে পুরুষের স্ত্রীর জন্ত এবং
বংশের উন্নতির জন্ত, তাহাদের আবার
সুখই কি, উন্নতিই কি ? যদি ভগিনীটাকে
মন্ত্রিকবংশে ভাসিয়ে দিলে মিত্রবংশের
(অর্থাৎ নিজের) কোন উন্নতি-সাধন হয়,
তবে ত.সে পরম মঙ্গল। প্রকাশে বালাল,
“মহাশয়, বাহা আজ্ঞা করিতেছেন, এ ত

আপনার অগ্রহই মাত্র। ইহার বাড়ী কি
সন্মান আর আমাদের আছে ? আমরা
পথের কাঙ্গালী, আপনাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা
ত আমাদের সশরীরে স্বর্গলাভ।”

তারিণী বাবু। আহা, তোমার মত
বিনীত মিষ্টভাবী ছেলে কি আজকাল দেখা
যায় ? আর দেখছি কি ভায়া, আমার যথা-
সর্বস্ব তোমাদেরই। তোমার বংশের উন্নতি
হউক, তোমার ভগিনী আমার গৃহের গৃহ-
লক্ষ্মী হউক, তোমার মাতাঠাকুরাণী দীর্ঘজীবী
হউন এবং তোমারও ত উপার্জন হউছে,
তুমিও একটা বিবাহ করিয়া তোমাদের পুরা-
তন ঘর বজায় রাখ।

গোকুল তখন অনেকক্ষণ মাথা চুলকা-
ইয়া আত্মা আত্মা করিয়া শেষে মুখ
ফুটিয়া বলিল, “আমরা ত আপনাদেরই দাস,
যখন আজ্ঞা করিবেন, আমার ভগিনী আপ-
নার পরিচারিকা হইবে। তবে আমরা
আপনার সহিত কুটুম্বিতা করি, এরূপ আমা-
দের অবস্থা কৈ ? পৈতৃক ভাঙ্গা ঘরে আমরা
বাস করি, তাহার ইটকাঠ নাই। তা আমা-
দের ঘর বজায় থাকে যে বলছেন, সে আপ-
নারই অগ্রহের উপর নির্ভর। যখন এ
দৌনের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কুটুম্বিতায় স্বীকার
হইয়াছেন, তখন বাহাতে আমাদের ঘর
বজায় থাকে, পুরাতন গৃহটির সংস্কার হয়,
আপনার কুটুম্ব বলিয়া লোকের নিকট পরি-
চয় দিতে পারি, এরূপ উপায় অবশ্যই আপনি
করিয়া দিবেন।”

বুদ্ধিমান তারিণী-বাবু দেখিলেন, বালক
গোকুলজ্ঞে এত দিন বৃথা বর্ধমান নগরীতে
কাজ করে নাই, সেও বিশ্ববুদ্ধিতে নিপুণ
হইয়াছে, ভগিনীকে বিক্রয় করিয়া কিছু
টাকা আদায় করিবার উপায় করিতেছে
টাকার কথা উত্থাপন হওয়ার নাজীর

মহাশয়ের বুকটা একবার হামিয়া গেল, কিন্তু আবার সেই ফুটফুটে ঘেরেটির প্রফুল্ল ওষ্ঠ (হুই দিন পূর্বে বাহার মধু আদান করিয়া-ছিলেন) তাহার মনে পড়িল, বুদ্ধের ঠোঁট দিয়া নাল পড়িতে লাগিল। হান্তগননদ্বয়ে বলিলেন, “বল বল ভায়া, তোমার কি বতলব, তাহাই বল। আমার সমস্ত সম্পত্তি ত তোমাদেরই দিতে বসেছি, তা, এখনই দি, আর পরেই দি।”

গোকুল। যদি আজ্ঞা করেন ত বলি, আপনি সমস্তই জানেন। আমাদের বাহিরের ও ভিতরের ইষ্টকাবশিষ্ট ঘর—যাহা আপনার পদধূলিতে পবিত্র হইবে,—সেই ঘর পুনঃসম্ভার করিতে হইবে। খিড়কীর পুকুরটি, বাহাতে আপনি পুণ্যশরীরে অবগাহন করিবেন,—তাহাও সংস্কার করিতে হইবে। গৃহে কোন উপকরণাদি নাই, আপনি গেলে একটি আসন দিব, তাহারও উপায় নাই, চৌকি, তক্তপোষ, ষাট, বিছানা এ সমস্তই আবশ্যক। তত্ত্বিন্ন আপনার স্ত্রায় জামাতা পাইলে মাতা ঠাকুরাণী রূপার বাসন না করিয়া কিরূপে থাকিয়াইবেন, আর মল্লিক-বংশের সহিত কুটুম্বিতা হইলে আমাদের একটু মান রাখিয়া চলিতে হইবে, ভাল করিয়া তত্ত্ব করিতে হইবে, লোকজন জ্ঞাতি-কুটুম্ব সকলকে তুষ্ট করিতে হইবে, এ সমস্ত কথা কি আপনার স্ত্রায় বহুদর্শী লোকের নিকট আমার স্ত্রায় বালকের বলা সাজে? তা আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমি আর কি বলিব? (পরে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) আজ্ঞে, পাঁচ হাজার টাকার কমে যে এ কার্য সম্পাদন হয়, এমন ত বোধ হয় না।

বৈজ্ঞানিক বলেন, পৃথিবীর উদরস্থ ত্রক-পদার্থ সর্বদাই কল্কল করিতেছে, যখন

অতিশয় বাষ্পের তেজ হয়, তখনই আগ্নেয়-গিরি দিয়া ফুটিয়া বাহির হয়। টাকার কথা উত্থাপন হওয়াতেই তারিণী-বাবুর উদরস্থ রাগটা একটু কল্কল করিতেছিল, কিন্তু স্থির করিয়াছিলেন, গরিবদের হাজারটা টাকা কি ভোর পনের শত টাকা দিয়া কত-রহাট ক্রম করিবেন। কিন্তু যখন গোকুল পাঁচ হাজার টাকার উল্লেখ করিল, তখন আগ্নেয়-গিরি কোথায় লাগে! উচ্চৈশ্বরে বলিলেন, “কি বললে মিত্রের দেশ? পাঁচহাজার টাকা? বলি, বত বড় মুখ, তত বড় কথা? বলি, আমি কি তোমাদের বংশ চিনি না? তোমার ঠাকুরদাদা প্রথম হাড় জালিয়ে গিয়েছে, তোমার বাবা হাড় জালিয়ে গিয়েছে, আবার তুমি হাড় জালাতে এসেছ? পাঁচ হাজার টাকা বলে ভেবে আসে, না পাঁচ হাজার টাকা কখন মিত্র-বংশে দেখেছে? বলি, এক রত্তি ছেলে, সে দিন হাতে ক’রে মাছুষ করেছে, আমাদের সম্মুখে এমন কথা বলতে ভয় হয় না? এমন বিধর্মীর সঙ্গে কুটুম্বিতা করলে নরকভোগ করতে হয়! এমন কুলাবাদের মুখ দেখলেও পাগল হয়।” ইত্যাদি, ইত্যাদি। গোকুল কিছুমাত্র অপ্রতিভ বা ক্রুদ্ধ না হইয়া নাজীর মহাশয়ের মেজাজ একটু গরম হইয়াছে দেখিয়া, একটি প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

বলা বাহুল্য যে, নাজীর মহাশয়ের গরম হওয়া বৃথা, বুড়ো বয়সে বালিকা-বিবাহ লালস মনে উদয় হইলে সে রোগ আর ছাড়বে না। আবার তাহার উপর সেই বালিকাটিকেও মধ্যে মধ্যে পুকুরধারে দেখিতে পাইতেন, উঃ, কি চোক! কি জ্বক! কি ঠোঁট! বিধাতা কি তুলী দিয়া লিখিয়াছেন? চকটকে রং কি আনুত দিয়া আঁকিয়াছেন? কি ললিত বাহুলতা

কি কুটুপটে শরীর জার শরীর! একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে বুদ্ধ গৃহে কিরিয়া আসিলেন, মনে মনে হির করিলেন, “টাকা আমার শরীরের রক্ত, কিন্তু শরীরের রক্তপাত করেও এ রক্তটি লাভ করুব। বংশটা বড় হারামজাদা, কিন্তু যেহেতুকে একবার ঘরে আনতে পাব্লে হয়, টাকা শুদ্ধ আদায় করুব, মিছাদের ঘর-ভিটে যদি বিক্রয় করে না লই, তবে আমার নাম তারিণী মল্লিক নয়!”

আর কয়েক দিন ঘটকী ইটাইটি করিল, দুই হাজার টাকা,—আড়াই হাজার টাকা—তিন হাজার টাকা, উহ! গোহুল প্রকাশে বলিল,—“আমরা নিতান্ত গরিব, তারিণীবাবু অল্পগ্রহ না করিলে কে করিবে?” মনে মনে বলিল, “বুড়ো বরসে খেড়ে রোগ ধরি-রাছে, টাকা দেবে না? নাকে দড়ী দিয়া টাকা আদায় করিব!”

অবশেষে নাজীর বাবু ঘটকীকে চারি হাজার টাকা পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া বলিলেন, “ইহাতে যদি না হয়, তবে ঐ সনাতনবাটী গ্রামে বহুদের বাড়ীতে যে যেহেতু আছে, দেখতে শুনে ভাল, বরসও শুনেছি দশ বারো বৎসর হইয়াছে, তাহাদের বাড়ী বাইও, এই মাসেই জিন্দা সমাপন হইবে, ঠিক করিয়া আসিও।”

গোহুল দেখিল, নাজীর মহাশয়ের মানরকার জন্তও তাঁহার কথাটা কতক রাখা চাই। অতএব সেই চারি হাজার টাকাতেই সম্মত হইল, আর ভিক্ষা বলিয়া দেড়শত টাকা, আর চেলীর কাপড় বলিয়া পঞ্চাশ টাকা, আর খাওয়ান দাওয়ান বলিয়া একশত টাকা, আর তত্ত্ব বলিয়া পঞ্চাশ টাকা, আর সভাধরচ পঞ্চাশ টাকা, আর বিবাহের অন্ত্যস্ত ধরচ বলিয়া একশত টাকা আদায়

করিয়া হইল। বলা বাহুল্য যে, এই ভিক্ষা ইত্যাদি ধরচেই গৃহে চুপকাম করা, পুঙ্খ সংকার করা ও বিবাহের সমস্ত ব্যয়ের আয়োজন হইল, চারি হাজার টাকার গোহুল-বাবুর কোম্পানীর কাগজ হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

বিবাহের আয়োজন ।

তালপুকুরে হলহুল পড়িয়া গেল। ধন-শালী বিষয়ী বিজ্ঞ মহামান্ত্র নাজীর মহাশয় আবার দারপরিগ্রহ করিবেন, গ্রামের মধ্যে জুন্দরী যেহে বাছিয়া তাহাকে জুন্দরীরী করিবেন, মিত্রবংশ সম্মানিত করিবেন, মল্লিকবংশ উজ্জল করিবেন, বিবাহে বড় ঘট হইবে, দেশের সমস্ত উজ্জলোক সমবেত হইবে, মুলকের কাকালী ডিখারী বিদায় পাইবে,—এইরূপ কথা ঘরে, ঘারে, পথে, ঘাটে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কুবকেরা মল্লিক বাড়ীর নিকট দিয়া যাইবার সময় একবার দাঁড়াইয়া ছুটা খোসগল্প শুনিয়া যাইত, রমণীগণ মিত্র-বাড়ীর নিকট কলস নামাইয়া একবার মেয়েকে দেখিয়া যাইত।

তারিণী-বাবুর বৈঠকখানা প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন-সময় পর্য্যন্ত, মধ্যাহ্ন হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত লোকারণ্য; কত বন্ধু, কত পরামর্শ-দাতা, কত সমাজপতি ও দলপতি, কত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আসিত, তাহার ঠিক নাই। দিবারাত্রি সাধুবাদ, স্তুতিবাদ ও নাজীর মহাশয়ের বিজ্ঞতার প্রশংসা চলিত। দলপতি ও সমাজপতি বলিতেন,—“এত তারিণী-বাবুরই উপযুক্ত কাজ। এরূপ বোগ্য লোক কি

আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়? লক্ষী-সরস্বতী ঘারে বাঁধা। বিত্তা-বুদ্ধি-বলে সাহেব-মহলে তারিণী-বাবুর কত মান, কত রাজ্য। রায়বাহাদুর হার মানিয়া যায়। আর বিষয়ের ত কথাই নাই, ভালপুত্রের মধ্যে দীন-মরিদ্র, ইতর-ভদ্র যে যখন বিপদে আপদে পড়ে, তারিণী-বাবু ভিন্ন আর সহায় কে? তারিণী-বাবু দীর্ঘজীবী হউন, আমাদের সমাজ বজায় রাখুন, আশু পুত্রমুখ দেখিয়া পরম সুখ ভোগ করুন” ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ তারম্বরে कहিলেন, “তারিণী-বাবুর সদাই ধর্মে মতি, তিনি ধর্মনিষ্ঠ লোক, তাঁহার ত এ যোগ্য কাজই বটে। সংকুল দেখিয়া, ভদ্রবংশ দেখিয়া স্নলক্ষণা কতাই স্থির করিয়াছেন, শাস্ত্রসম্মত কাজ করিয়া হিন্দু আচার বজায় রাখিয়াছেন। আজকাল বেক্রপ সময়, নাস্তিকগণো কি কি করে, তাহার ঠিক আছে? কেহ বরষা কতাই ধোঁজে, কেহ বিধবা বিয়ে করিতে চায়, কেহ বা আবার জাতি ছেড়ে অন্য জাতিতে বিয়ে করে। ছি! ছি! সমাজ, তারিণী-বাবুকে দেখিয়া শিক্ষা লাভ কর! পুত্রসন্তান-কামনার সম্বংশজা, স্নলক্ষণা, নবমবর্ষীয়া বালিকা গ্রহণ করিয়া তারিণী-বাবু আজ স্বজাতির নাম উজ্জ্বল করিলেন, সমাজের গৌরব বর্দ্ধন করিলেন।”

তারিণী-বাবুর বন্ধুগণ বলিলেন, “তা নবমবর্ষীয়া বালিকা গ্রহণ করিবেন না কেন? তারিণী-বাবুর বয়সই বা কি? এখনও চল্লিশ পার হয় নাই, এই ত বিবাহের উপযুক্ত কাল। আহা, মুখখানি যেন কাস্তিকের মত, শরীরখানি যেন গণেশের মত, কত কাল তপস্বী করিয়া কতাই একরূপ বরলাভ করে,” ইত্যাদি।

এই সকল কথা শুনিয়া তারিণী-বাবুর

মুখে আর হাসি ধরিত না, লুকাইয়া দর্পণে ঘন ঘন আপনার মুখখানি দেখিতেন, চুলে ঘর ঘন কলপ দিতেন, কাহার সাধ্য একগাছি পাকা চুল বাহির করে? নাগিতের মাহি-রানা ঘিঙণ করিয়া প্রত্যহ কৌরকাব্য সম্পাদন করিতেন, দাড়ী-গোপ এখনও উঠে নাই বলিলেও চলে।

শ্রবণকার দিনে দুই তিনবার করিয়া তারিণী-বাবুর বাড়ী হাটাইটি করিতেছে, পুরাতন গহনা ভাঙ্গিয়া নূতন ধরণের গহনা করিবার ক্ষরমায়েশ হইয়াছে, সেই নূতন গহনাতে প্রেমিক তারিণী-বাবু নব-বধূর অঙ্গ ভূষিত করিয়া দিবেন! কথাটা এক একবার মনে হইতেছে আর বৃদ্ধের বুকটা নাচিয়া উঠিতেছে। বালিকার স্মরণ লগাটে সিঁতি পরাইয়া দিবেন, ললিত বাহুল্য হাতে ধরিয়া আঁদর করিয়া তাবিজ-বাজু পরাইয়া দিবেন, কুসুমকলি-বিনিমিত বক্ষের উপর সখের হার ঝুলাইয়া দিবেন, কটিতে রসের চন্দ্রহার দোলাইবেন! ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধের শরীরটি রোমাঞ্চিত হইল,—বুড়ো বুদ্ধি পাগল হয়।

তারিণী বাবুর বাড়ী আজ লোকাকুল, এবং জাতিহুঁষে পরিপূর্ণ। দাসদাসী গোলাপী কাপড় পরিয়া ছুটাইটি করিতেছে, পুত্র হইতে বড় বড় মাছ, হাট হইতে চাকারী করিয়া শাক-সবজী, বর্দ্ধমান হইতে খাজা, সীতাভোগ ও মিহিদানা, কলিকাতা হইতে সন্দেশ ও রসগোল্লা সংগৃহীত হইয়া বাড়ী পূর্ণ হইয়াছে। বাড়ীতে যেন দিবা-রাত্রি উৎসব হইতেছে, বাহিরে দিবা-রাত্রি বাজ ও লোকের কোলাহল, সমস্ত গ্রামে হলহুল পড়িয়া গিয়াছে।

দরিদ্র বিন্দু ও সুধা গলা ধরাধরি করিয়া কাদিল, একদিন সন্ধ্যার সময় লুকাইয়া

জ্যোতাইম'

কাঁদিল

হুঃখিঁ

সঙ্গে

গ্রাম

প্রচার

আজ মা

এদিকে

মিজগণ এ

তালপুকুর

জাতি-কুটুম্বের অভ্যন্তরে

সন্ধ্যার অন্ধকারে যেমন পক্ষিকুল নিজ নিজ কুলায়ে লীন হইয়া থাকে, মিজদিগের দরিদ্র ও দুরবস্থার সময় সেইরূপ জাতি-কুটুম্বগণ নিজ নিজ কুলায়ে লীন হইয়াছেন, কেহ সাড়াশব্দ করেন নাই, একবার তত্ত্বতল্লাস করেন নাই। আবার সূর্য্যের উদয়ে যেরূপ পক্ষিকুল মহা আনন্দে শব্দ করিয়া পুনরায় আকাশ আচ্ছন্ন করে, আজি মিজদিগের সৌভাগ্যবির উদয়ে দশ গ্রাম হইতে জাতি-কুটুম্ব আসিয়া গোপীর মার পুরাতন গৃহ আচ্ছন্ন করিল।

চারুর মা সম্পর্কে গোপবালার মাসী হয়। বড় ঘরে বিবাহ হইয়াছে, স্থূল শরীর-খানি গহনা-ভরা, মুখে সদাই হাসি। এত দিন পরে বোন্খিকে মনে পড়িল, পাকী করিয়া মিজদের বাড়ী আসিলেন। হেসে হেসে গরবিলী বলিলেন, “তা বোন, আমার চারুও যে, গোপীও সে—আহা! এত দিনে বাছা গোপীকে দেখিতে পাই নাই, মনে করি আসি আসি, তা আমাদের যে সংসার, সহজে কি আসা হয়? বেঁচে থাকুক, বস্তুরবাড়ীর গৃহলক্ষী হয়ে থাকুক, সোনার ঠাঁদের যজ্ঞ হেলের মুখ দর্শন করুক। মল্লিকদের বাড়ী সর্ব্বদাই বাতায়ত আছে, বাছা গোপীকে

গলা ধরিয়া

দর দিন,—

কে দেখে?

চোকির সঙ্গে

সমস্ত গ্রামে

নিম্নের দিন,

শুভ বিবাহ!

লোকারণ্য।

শাক ছিলেন,

হ তাঁহাদের

না, তবে

সর্ব্বদাই কোঁখে বাব। আমরা আসব না ত কে আসবে? কথার বলে, যাও যে, মাসীও সে, মা-মাসী বাছাকে দেখে বোনা ত দেখবে কে?” ইত্যাদি।

হরির মা সম্পর্কে গোপীর পিসী হয়। সামান্ত গৃহস্থঘরে বিবাহ হইয়াছে, শরীর ঈর্ষ, স্বভাবটি ক্রুদ্ধ। ভ্রাতার মরণের পর মিজ-বাড়ীতে পা দেন নাই, তবে গোপীর মা অন্ন কষ্টে লালায়িত হইয়া অনেক অহুন্নর-বিনয় করার একবার পাঁচ টাকা ধার দিয়াছিলেন, তাহাও ঘটা-বাটি বিক্রয় করাইয়া, সুদশুড় আদায় করিয়া লইয়াছেন। আজ পিসীমার শরীর স্নেহে গলিয়া পড়িতেছে। গোপীর চুল বেঁধে দিতেছেন, গহনা পরাইয়া দিতেছেন, কত সেবা-শুশ্রূষা। বলিলেন, “তা আমরা করুব না ত করবে কে গা বোন? থাকতেন আজ দাদা বেঁচে, আহা, এ আনন্দের দিনে কতই আনন্দ করতেন! আহা, দাদা যখন যে কাজটি করতেন, আমাদের না জিজ্ঞাসা করে ত করতেন না, আমাদের না ডাকাইয়া কি বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম্ম হবার যো ছিল? তা দাদা যেমন পুণ্যাত্মা ছিলেন, বাছা গোপীও সেই রকম গো। আহা, মেয়ের মুখে কথাটি নাই। তা এমন মেয়ের বড় ঘরে বিয়ে হবে না ত কার হবে? বেঁচে থাক বাছা, গা ভ'রে গহনা পরবি, পাকী চড়বি, বারানসী শাড়া প'রে যোগ্গিবাড়ী যাবি,—এর বাড়ী কি সুখ আছে? বাছা, তোদের সুখ কোঁখে মরতে পাল্লই বাঁচি।” ইত্যাদি।

ভ্রামের মা সম্পর্কে গোপীর খুড়ী হন। তাঁহার স্বামীর সহিত গোপীর বাপ বিষয় লইয়া অনেক বিবাদ করিয়াছেন,—গোপীর বাপের মৃত্যুর পর ভ্রামের মা বিধবা জার উপর সে কলহের বিলক্ষণ প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। ষোকদমা করিয়া দরিদ্র জার

জমা-জমী বিক্রয় করিয়া তাঁহার বটী-বাটি বিক্রয় করিয়া লইলেন, সন্দেশ হাতে করিয়া ছেলেদের পাঠাইয়া দিতেন ; বলিয়া দিতেন, “গোপীকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাবি।” গোপীর মা গরিব ও ভালমাহুষ, সমস্ত সঙ্ক করিত ও কাঁদিত। টাকার কি মধুমরী ক্ষমতা! গোপীর মার সোভাগ্য-উদরে শ্রামের বা সমস্ত বৈরি-ভাব ভুলিলেন, শ্রির জার প্রতি তাঁর কত মায়া, কক মমতা, কত যত্ন! বলিলেন, “আহা বোন্! পুরাতন কথা কি ভূলা যায়? সেই তোমার আমার একই! বৎসরে বিয়ে হয়, আহা, আমরা যেন বোনের মত ছিলেম গো। এক মন, এক প্রাণ, কেবল শরীর ভিন্নবৈ ত নয়। তোমার গোঁকুল যখন পেটে, তখন বাছা শ্রামলাল হয়, তা আমার শ্রামলাল যে, গোঁকুলও সেই। তা গোঁকুল বেঁচে থাকুক, গুণবান বুদ্ধিমান্ ছেলে হয়েছে, দু পরসা যোজ্ঞার কর্ণে, মিত্রকুলের নাম রাখবে। আর বাছা গোপীর বড় বরে বিয়ে হতেছে, বড় মাহুষের বৌ হবে, গা-ভঁরা গহনা পরবে, সুখে থাকবে! আহা, ওদের সুখ দেখলে আমাদের চক্ষু ভঁড়ার,”—ইত্যাদি।

এইরূপ আত্মীয়দিগের যত্ন, শুক্রবা, আশী-রুদ্র ও মঙ্গলকামনার গোপীর মা বড়ই আপ্যায়িত হইলেন। তাহাদের বাড়ী হইতে বড় বড় তত্ত্ব আসিয়া মিত্র-বাড়ী ভরিয়া গেল। এক কয়েক বৎসর ইহার চতুর্থাংশ অল্পগ্রহ পাইলে গোপীর মা অববস্ত্রের অস্ত্র বিন্দু ও সুখার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইত না। গোপবাল্য-মার চেয়ে সেরানা মেয়ে, বাপের বুদ্ধি পাই-রাছে। বৃদ্ধাদিগের কাছে মেয়ের মুখে কথাটি নাই, তাহাদের মমতা ও স্নেহবাক্যে মেয়ের চক্ষু ছল ছল করিতেছে। চক্ষু মুছিয়া পুতুর-ধারে সমবয়স্কদিগের কাছে আসিয়া একবার প্রণামখলিয়া হাসিল।

সমবয়স্কারা বলিল, “কি লো, তুমি বরে-বিরে হবে ব’লে বড় আত্মলাভ দেখে—মুখে হাসি ধরে না যে।”

গোপী। না লো, তার অস্ত্র হাসি নয়। বয়স্তাগণ। তবে কি অস্ত্র, মনে দাঁড়াটা খুলে বল না।

গোপী। এই আমার মাসীমা, পিসীমা, খুড়ীমাদের যত্ন দেখে হাসছিলাম। বয়স্তাগণ। ইস! হেসে যে গড়িয়ে গেল। মেয়ের রকম দেখ না। তোমাসীমা বিয়ের সময় এসেছেন, তাদের ভালবাসেন ব’লে যত্ন করছেন, তাতে আবার হাসি কিসের লা?

গোপী বলিল, “না, না, তা নয়, তবে মাসীমা পিসীমার যত্ন দেখে একটা রূপকথা মনে পড়ল, তাই হাসছিলাম। রূপকথাটি বল শুন।

দুই ভাই ছিল, বড় ভাইটি বড়লোক আর ছোট ভাইটি গরিব। তা বড় ভাইয়ের স্ত্রী-বড়মাহুষী চাল, সে গরিব ছোট ভাইটিকে একবার ডেকে জিজ্ঞাসাও করে না, দেখা হ’লে কথাও কয় না। গরিবরা দুখে থাকে, কাঁদাকাটি করে, কিছু দিন পরে সে গ্রাম থেকে উঠে গেল।

বিশেষে চাকরী-বাকরী ক’রে গরিবদের শেষে অনেক টাকা হ’ল। তখন তারা গ্রামে ফিরে এসে পাকা বাড়ী করলে, নতুন পুতুর কাটালে, জমিদারী কিনলে আর অনেক চাকর-বাকর রেখে বড়মাহুষী চালে চলতে লাগল।

বড়জা তখন ছোটজাকে অনেক আদর ক’রে নিমন্ত্রণ ক’রে পাকী পাঠালে। ছোট জা দেখে এসে দেখে—রূপার খালে ভাত বাড়ী, রূপার বাটিতে ব্যঞ্জন-সাজান, রূপার রেকাবিতে লেশ-মণ্ডা।

ছেটি আ আসনে বসল। ভাতগুলি চার ভাগ করলে, ব্যঞ্জনগুলি চার ভাগ করলে, সন্দেশ-মণ্ডাগুলি চার ভাগ করলে। এই রকমে ভাগ করে আসন থেকে উঠে হাত ধুলে।

বড় জা বললে, ‘এ কি বোন, খেলে কৈ?’
ছেটি জা বললে, ‘বাদের জন্ত খাবার করেছি দিদি, তাদের জন্ত ভাগ করে দিলেম। এ ত আমার জন্ত খাবার করনি দিদি।’

বড় জা বললে, ‘তোমার জন্ত নয় ত কার জন্ত বোন?’ ছেটি জা বললে, ‘এই এক ভাগ আমাদের পাকা বাড়ীর জন্ত, এই একে ভাগ আমাদের পুকুরের জন্ত, এই এক ভাগ আমাদের জমিদারীর জন্ত আর এই একভাগ আমাদের লোকজনের জন্ত। এই সব দে’খে রান্না-বান্না করেছি দিদি, খাওয়া-দাওয়া এদের সমর্পণ কর। আমাদের যদি খাওয়াতে ইচ্ছা থাকত, তা হ’লে যখন গরিব অবস্থায় অন্নের জন্ত লাগানিত ছিলাম, তখন একদিন ভেকে খাওয়াতে।’

সন্ধ্যার সময় শাক বাঁজিয়া উঠিল। ঘরে ঘরে প্রদীপ বাতি জলিল, বাহির-দরজার বাত্ম আরম্ভ হইল, বৃদ্ধাগণের ডাকাডাকি, তরুণীগণের খোসগল্প ও হাস্তধ্বনি, দাসীদিগের ছুটোছুটিতে বাড়ী পুরিয়া গেল। বাহির বাড়ীতে কত্কাবর্তী গোবুল-বাবু কোমরে চাদর বাঁধিয়া ডাবা হুক হাতে লইয়া, সভা প্রস্তুত করিতেছেন, বাতি জ্বালাইতেছেন, হাক-ডাক দিতেছেন, আশ্বাসন করিতেছেন। ভিতর-বাড়ীতে সমস্ত প্রস্তুত, কত্কা সাজা-ইবার জন্ত ডাক হইল। ঘের সাজিতে বসিল। মুখখানি নয় ও শাক, ছদরখানি আনন্দে নৃত্য করিতেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

—*—

শুভ বিবাহ ।

তুবারমণ্ডিত বিশাল হিমালয় পর্বতের স্তায় চৌপদ-মণ্ডিত তারিণী-বাবুর বিশাল শরীর সভাস্থল জম্কাইয়া রহিয়াছে। পাখুরে-কাল হুল শরীরের উপর রক্তবর্ণ চেলির কাপড় শোভা পাইতেছে। পঞ্চাশ বৎসরের গোপ-কামান বরের মাথায় বিরাট চৌপদ শোভা পাইতেছে। কোথায় গেলেন কবি কালিদাস, তিনি সে মনোহর-রূপ বর্ণনা করুন,—আমরা অক্ষম।

বাড়ী লোকারণ্য, চারিদিকের গ্রামসমূহের কায়স্থকুলের কেহ নিমন্ত্রণে বাদ পড়ে নাই। বাড়ীর ভিতর একেবারে মেয়েতে ভরিয়া গিয়াছে, তাহাদের কল কল শব্দ, তাহাদের হাস্তধ্বনি ও তাহাদের কথারহস্তে বাড়ী আনন্দপূর্ণ। কোন নবীন উকি-ঝুঁকি মারিয়া সখীকে ডাকিতেছে, “ওলো দেখবি আর লো দেখবি আর। ও মা, এ কি বিয়ের বর, না মুশকো যিন্বে লো?”

ষষ্ঠীয়া। দূর গোড়াকপালী, বিয়ের রাজি বরকে অমন কথা বলে? কেন লো, বরের রূপ মন্দই বা কি? রংটা একটু কাল বই ত নয়, মুখের ছিঁরি আছে।

প্রথম। হা, ছিঁরি আছে বৈ কি,—কেবল গাল দুটি যেন পাকা বেগুন রুলে রয়েছে।

ষষ্ঠীয়া। দূর গোড়ারমুখী। শুকনো চড়ান গাল বুঝি ভাল?

প্রথম। আর ঠোঁট দুটি যেন বোলভার কামড়ে দিচ্ছে।

ষষ্ঠীয়া। দেখিস,—দেখিস, ঐ ঠোঁট

য়ে গোপী বলে বাবে। বস্তুরবাড়ী একবার
লে হয়, এমন গোলগাল আমি পেয়ে
রি এ-মুখে হবে না।

প্রথমা! আর বুকে কি চুল দিদি,
ক যেন আমাদের বাড়ীর আঁতাকুড়ের
চুল।

দ্বিতীয়া। দূর হতভাগী! অমন কথা
নুতে নেই।

প্রথমা। ও বাবা। পেটটা কি ফুলো গা।
মন্থের পেট ফুলেছে না কি?

দ্বিতীয়া। যা যা, তোর আর বরের নিন্দে
বুতে হবে না। গোপী শুনে রাগ করবে।
দেখিস, ঐ নাদোস্ নোদোস্ শরীর পেয়ে
যমাদের গোপীর মন ভুলে যাবে।

প্রথমা। না, সত্যি দিদি, বরের পা
খানা দেখ, ও মা, পায়ে গোদ হয়েছে
কি? গোদা পা নিয়ে কোন্ লজ্জার
মন্থে বিয়ে করতে এল? কোন্ এক
জাড়া মোজা প'রে ঢেকে এল দিদি?

দ্বিতীয়া। দেখিস, দেখিস, ঐ পা গোপী
মত বস্ত্রে পূজা করবে।

প্রথমা। ইস! তা আর হ'তে হবে না।
গোপী আপনার খুদে খুদে আলতা-মাখা পা
চুখানি যদি মিন্থের টোপরের উপর না
রাখে, তবে আমি আর কি বলেছি। আমি
গোপীকে জানি, সে চাপা মেয়ে, মুখে ভাল-
মাহু, মনখানি ক্রুরের মত খারাল।

বর গাত্রোখান করিলেন, যেন হিমালয়-
পর্বত শিকড় ছিঁড়িয়া উঠিলেন! বাড়ীর
ভিতরে স্ত্রী-আচার, রসিকাগণ সে আচার
বর্ণনা করুন, আমরা তাহার কি জানি?
বাড়ীর উঠানে একেবারে মেয়ে পিল্ পিল্
করিতেছে, তারিণীবাবুর বিশাল শরীরের
চারিদিকে ঘুরিতেছে কিরিতেছে, নিলজ্জ
হইয়া থল থল করিয়া হাসিতেছে, যেন

একটি বিশাল তমালবৃক্ষের টুছাটিকে মননা
পাখীগুলি উড়িতেছে। কোন মেয়েটি ডিকি
য়ারিয়া তারিণী-বাবুর থলথলে কানটি
একবার মলিয়া দিল। কেহ কেহ বা সেই
প্রকাণ্ড উদরের উপর দৈবের হাতের ছাপ
লাগাইয়া গেল এবং কোন রসিকা সেই
বিশাল পৃষ্ঠদেশে আলপানার দাগ দিয়া
যেন দূরবিলম্বী মেঘরাশির উপর বিদ্যুতের
শোভা করিয়া দিল।

ক্ষুদ্র গোপীকে পিঁড়ার বসাইয়া বরের
চারিদিকে সাতবার পাক দেওয়া হইল,
তারিণী-বাবুর মনটি নৃত্য করিতেছে, নজরটি
সেই পিঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিরিতেছে।
যখন “বর বড় না ক'নে বড়” প্রশ্ন হইল,
তখন গোপীর পরমবন্ধুগণও স্বীকার করিল,
বর বড় বাটে। যখন বরণভালা লইয়া পতি-
পুত্রবতী কোন গৃহিণী নাজীর মহাশয়কে
“ভ্যা” করিবার অহরোধ করিলেন, তখন
রসিকাগণ কানাকানি করিতে লাগিল,—
“ভ্যা করিবেন দিন কত পর—গোপী
তেমন মেয়ে নয়!”

তাহার পর বর-কন্যা একত্র বসিলেন,
পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করাইলেন। তারিণী-বাবু
স্বৈদপূর্ণ হুলহুলে কন্যার সেই স্তম্ভিত স্তম্ভর
পুষ্পবিনিন্দিত হস্ত গ্রহণ করিয়া রোমাঞ্চিত
হইলেন—অবগুণ্ঠনশূন্য বধূর মধুমাখা মুখ,
মুক্তাবিভূষিত ললাট এবং অলঙ্কার-রঞ্জিত
ওষ্ঠ দেখিয়া বুড়ো বুঝি, বিবাহ-সভার মুচ্ছা
যায়।

তাহার পর বাসরঘর! বাসরঘরে আজ
বড় তামাসা—তারিণী-বাবুর মত নাদস-
নোদস, গোল-গাল, বরক্ক রসিক বর তাল-
পুতুরের সুন্দরীগণ সর্বদা পান না, আজ
বুঝি, বরকে আশুই খেয়ে ফেলেন। বর ঘরে
আসিবামাত্র একজন শ্রামা, হুলাকিনী, মধ্য

ধরনা রসিকা তাঁহার হাত ধরিয়া বলাইয়া বলিলেন, “এস এস গোপীবল্লভ এস, তোমার বিরহে গোপবালা যে একেবারে শুকিয়ে গিয়াছে।” রসিক তারিণী-বাবু ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, একজন নয়, যেন বোল শত গোপিনী সেই নিকুঞ্জে বসিয়াছেন।

বাসরঘরের রং-তামাসা আমরা কেমন করিয়া বর্ণনা করিব? বাসরঘরের কথা আমরা কি জানি? কোথা গেলে রসিকা সন্দর্ভাগণ,—তোমরা সে গৃহ আচার জান, তোমরা সে রসের কথা জান,—তোমরা যাঁহা করিবার কর। গোবর্দ্ধন পর্ত্তের স্তার তারিণী-বাবুর কোলে ময়না পাখীটির স্তার কতটিকে বসাও, আমরা বিদায় এইলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দম্পতি-প্রণয়।

মুখের স্বপ্নের মত তারিণী-বাবুর ছুটি ফুরাইল, তিনি পুনরায় বর্ধমানের কার্যে যোগ দিলেন। মধ্যে মধ্যে গ্রামে আসিয়া নব-বধূটিকে দেখিয়া জীবন সার্থক করিতেন, আবার অনিচ্ছক বলদের মত ফিরিয়া বর্ধমানের যাইয়া আপিসের ঘনিগাছে বাঁধা হইয়া ঘুরিতেন।

তিন চারি বৎসর এইরূপে কাটিয়া গেল। তারিণী-বাবুর আর কাজ করা পোষায় না। বয়সে শরীর দুর্বল হয়, মন নিস্তেজ হয়, কাজে সর্বদাই ভুল হইত। সাহেবেরা অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “নাজীর বাবুর পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইয়াছে, পেন্সন

দেউক।” অত্যন্ত আশ্চর্য্য কানাকান করিত, নাজীর মহাশয়ের মন নতুন বৌয়ের দিকে পড়িয়া রহিয়াছে, কাজ করিবেন কিরূপে?

চাকরীর মায়া শীঘ্র ছাড়া যায় না—অনেক গল্পনা সহ করিয়াও আরও এক বৎসর কাজ করিলেন, শেষে অগত্যা পেন্সন লইয়া গ্রামে আসিয়া বসিলেন। তখন গোপবালার চতুর্দশ বৎসর বয়স, ঘোবনের কান্তিতে শরীর কাটিয়া পাড়তেছে, রূপে ঘর আলো করিয়াছে, গা ভারী গহনা পরিয়া রূপাভিমনিনি গৃহিণী গৃহ জমকাইয়া বসিয়াছে। বার্ককো রূপ-তুফার্ত তারিণী-বাবু মনে করিলেন, “চাকরীর মুখে আগুন, এবার নববধূকে লইয়া জীবন সার্থক করিবা।” নব-বধূ মনে করিলেন, “এবার বড়ো মিন্‌ষেকে ঘরে পাইলাম, নাকে দড়ী দিয়া ঘুরাইব, কতটি আর যাবেন কোথায়?”

উমার মা রোগক্রিষ্টা, সংসার দেখিতে পারেন না, হু-বেলা ছপেট খান, আর প্রায়ই আপনার ঘরে শুইয়া থাকেন। বিন্দু সর্বদাই জ্যোঠাইমাকে দেখিতে বাইত, কিন্তু নববধূ তাহাতে মুখ ভার করিতেন। লোকের কাছে বলিতেন, “ওদের জাত গিয়েছে, ওদের আচার-ব্যবহার ভাল নয়, উহার ঘন ঘন আসা যাওয়া করিলে আমাদের নিন্দা হয়।” যে নম্রমুখী দরিদ্র-বালিকা নবাবদেবী, বিন্দুর উঠানে সেদিন খেলা করিয়া তারিণী-বাবু আর একটি সপ্নের সন্ধান লালায়িত, সে এখন বড়কালাশীর গৃহিণী, সম্পদে তাহার এই কলংগলেন। শুনিয়া বিন্দু গোলিলেন, “জ্যোঠাইমার বাড়ী যাওয়া কতকটা বন্দী বলি করিলেন।

৬ কেব উমার মার একটি পুত্রসী ছিল, তারিণী সন্তোষা করিত। বড়ার প্রতি

দাসীর এ মায়া দেখিয়া নববধূ সে দাসীর প্রতি বিরক্ত হইলেন, অভিমানে স্তম্ভর চক্ষে জল আনিয়া লাল ঠোঁট ফুলাইয়া কর্তার কাছে লাগাইলেন, “আমার ঘর-সংসারের কাজ চলে না, আমি খেটে খেটে হাড় কাশী করছি আর দিদি গিদে ঠেসান দিয়ে থাকেন, তাঁর দাসী না হ’লে চলে না। তা দিদিকে নিরেই থাক, দিদি সংসার চালান, আমি বাপের বাড়ী চল্লেম।” বলা বাহুল্য, পুরাতন দাসী সেই দিনই বিদায় হইল। উমার মার মুখে জল দেয়, এমন একজন লোক রহিল না।

পড়সীর লোক সর্কদাই উমার মার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে আসিত, ছোট-মার মেজাজ ও ভাবগতিক দেখিয়া তাহারাও আসা প্রার বন্ধ করিল। উমার মার কাপড়-চোপড় ও পূজা-আছার খরচের জন্য তারিণী-বাবু আলাদা কিছু টাকা মাসে মাসে দিতেন, নববধূর চক্ষে জল দেখিয়া তাহাও বন্ধ করিলেন।

কিন্তু এত করিয়াও তারিণী-বাবু নব-বধূর মন পাইলেন না। স্তম্ভরী গোপবালা স্বামীর নিকট সর্কদাই বিমর্ষ, সর্কদাই অভিমানিনী। সুবতী নাগরীর অভিমান-অশ্রুর প্রভাব গোপবালা জানিতেন, বুদ্ধিমতী সুযোগ পাইয়া এখন ধরুকে সেই অস্ত্র ফুড়িলেন।

সেই মনশা-বলেন, বর্জমান সাহেবদের দোষে ত্রোথান বক্রগী ভার্যার পরিচয় আপেক্ষা উঠিলে, ক হাবুড়ুর কাজ। সে কার্যে ব্রজ সে মন উঠে থাকিলেন, তবু ত তরুণীর মন উঠে না, দ্বন্দে না। নূতন বন্ধ, নূতন অলংকার প্রকার উপাদেয় বস্ত্র দি-রা সে মনের সেবা করিতেন, তবু ত মন উঠে রাধা প্রসাদ পান না। তালুক হইতে

তোড়া তোড়া টাকা আনিয়া দেন, তরুণী টাকাগুলি বাজে বন্ধ করিয়া মুখ কিরাইয়া বসেন। জিজ্ঞাসা করিলে তরুণী কথা কহেন না অথবা ঘোর অভিমানে ব্যঙ্গ করিয়া বলেন, “তবু যে জিগংগস্ করুলে, এই আমার ভাগ্য। আমার প্রতি ত তোমার মায়া নেই, মায়া দিদির প্রতি! আমি গরিবের মেয়ে, আমাকে তাচ্ছিল্য করবে না ত কি?” (ক্লম্বন)

বুড়ো চন্দ্রের জল মুছাইয়া বলিতেন, “সে কি, সে কি, তোমাকে মাথার ক’রে রাখব,—তুমি কি আমার অযত্নের ধন? কি করলে তুই হবে বল, আমি এখনই করছি।”

বিনাইয়া বিনাইয়া নবীনা বলিলেন, “তা আমি মেয়েমানুষ, কি করলে ভাল হয়, আমি কি রকমে জানব? ঐ চাটুযোনের বাড়ীর কর্তাটি বুড়ো বয়সে আবার একটা বিয়ে করেই কিছুদিন পরে তাঁর কাল হ’ল, ছোট মেয়েটাকে সতীনের হাতে ফেলে গেলেন। বড় সতীন তাকে উঠতে বসতে গাল দেয়, দিবারাজি মজুরের মত খাটায়, ছবেলা খেতে দেয় না। ছোট বোটি যেন মড়ার মত হয়ে গিয়েছে—পথের কাকালীর মত কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে; তা আমারও সেই দশা হবে। কেনই বা হবে না? কাকালীর ঘরে জন্ম, আমি পথে ভিক্ষা করব না ত কে করিবে?” (ক্লম্বন)।

তারিণী বাবু। সে কি? উমার মার সাধ্য কি তোমাকে কিছু বলে?

গৃহিণী। হাঁ, উমার মার ত আমার প্রতি বড় মায়া। এখনই ছুচক্ষে দেখতে পারে না,—এর পরে আমাকে কি আর আশা রাখবে? (ক্লম্বন)

এইরূপ প্রায়ই মধ্যে মধ্যে কানাকাটি হইত, দিবারাজি অভিমান হইত, তারিণী-বাবু আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। গৃহিণীর কথা-বার্তার বুঝিলেন যে, গৃহিণী ভবিষ্যতের জন্ত কিছু সংগ্রহ করিতে চাহে। এতটুকু মেয়ের পেটে এত বুদ্ধি কেমন করিয়া হইল, বুঝিতে পারিলেন না। তারিণী-বাবু জানিতেন না যে, গৃহিণীর পরামর্শদাতা পরম বুদ্ধিমান গোঁকুলচন্দ্র ঘন ঘন বর্দ্ধমান হইতে আসা-যাওয়া করিত এবং গোপনে ভগিনীর সহিত পরামর্শ করিত।

তরুণী ভার্যার তীব্র অভিমান ও অশ্র-জল দেখিয়া হৃদয়ে দৈর্ঘ্য ধরিতে পারে, এক্রপ বীর-পুরুষ সংসারে অল্প। তারিণী-বাবুর মন ক্রমে টলিতে লাগিল, তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, “আমার ভাল মন্দ হইলে কিছু বিষয় ছোট গৃহিণীর হাতে থাকে, এক্রপ একটা বন্দোবস্ত করিয়া যাওয়া ভাল। উহাকে বিষয় দিব না ত কাহাকে দিব? সেই মাতাল জামাইটা শেষকালে সমস্ত বিষয়টা কাড়িয়া লইবে? না, না, সে কথা নহে, আমার প্রাণের গোপবালাকে কিছু দিয়া যাইব। আর যদি ছোট গৃহিণী দ্বারা আমার পুত্র-সন্তান হয়, তাহা হইলে ত সে-ই পাইবে, মাকে দেওয়াও বা, ছেলেকে দেওয়াও তাই।”

অনেক বিবেচনা করিয়া বুদ্ধ বর্দ্ধমান গেলেন। তথায় উকীল-মোক্তারগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, রেজিষ্টারী-আপিসে হাটাইটি করিয়া শেষে একখানি দলীল লইয়া বাড়ী আসিলেন এবং বাড়ীতে পৌঁছিয়াই নব-বধূর রাঙ্গা চরণে পূজা দিতে আসিলেন। হস্তগতগদ্যবস্তুর তরুণী ভার্যাকে সন্তোষ করিয়া দলীলখানা তাঁহার হস্তে দিলেন, বনে করিলেন, “এবার উড়া পাখী পিঞ্জরে

পূরিলাম,—এ কুক-ময় এড়াইবার নহে, দেখিব, মন গলে কি না গলে!”

অভিমানিনী বধু স্বামীর দিকে একবার কিরিয়াও চাহিল না।

তারিণী-বাবু। বলি, চুপ করে রইলে? যে?

বধু। তবে কি করব?

তারিণী-বাবু। দলীলখানা কি জান?

বধু। কেমন করে জানব?

তারিণী-বাবু। এখানা উইল।

বধু। শুনলেম।

তারিণী-বাবু। বড় মূল্যবান দলীল।

বধু। তোমার বাক্সে রেখে দাও।

তারিণী-বাবু। আমার ভাল মন্দ হইলে আমার বিজয়পুর তানুকখানি তোমারই হইবে।

বধু। আমার চাই না।

তারিণী-বাবু। সে কি? সে কি? এত অভিমান কিসের?

বধু। অভিমান আবার কি? যে মানে রেখেছ, ঢের হয়েছে।

তারিণী-বাবু অবাক হইয়া রহিলেন। বধু চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

তারিণী-বাবু দলীলখানি জোর করিয়া বধুহস্তে দিলেন। বধু দলীলখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ক্রোধে হনু হনু করিয়া চলিয়া গেলেন।

রাজি হইয়াছে। ছোট গৃহিণী-খান নাই, দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়াছেন। তারিণী-বাবুর মাথায় বজ্রাবাত পড়িল। বুদ্ধ দ্বারদেশে কালীঘাটের কালার মত বসিয়া মিনতি করিতে লাগিলেন।

এক ঘণ্টা মিনতির পর দরজা খুলিল।

বধু বলিলেন, “আবার হাড় জালাতে এসেছে কেন?”

তারিণী-বাবু সেই রাঙ্গা চরণ চুইটি

তালপুকুরের মধ্যে বড়লোক, বড়লোকের কথা কি শীঘ্র শেষ হয়? তথাপি তালপুকুরে সামান্য অবস্থার লোক বাস করিত, তাহাদের সম্বন্ধেও দুই একটি কথা লেখা আবশ্যিক।

বিন্দু চিরকালই দরিদ্র, কিন্তু এই দরিদ্র অবস্থাতেই বন্ধনে সংসার-বান্ধা করিত ও ছেলে দুইটিকে মানুষ করিত। মেয়ে সুনীলার বয়স এখন দ্বাদশ বৎসর হইয়াছে, দেখিতে একটুকাকালি ও স্ত্রীমূৰ্খ, কিন্তু মেয়েটি স্ত্রী, শান্ত এবং মায় মত চক্কু দুটিকাল, প্রশান্ত ও বড় সুন্দর। ছেলে সুবোধটির বয়স নয় বৎসর হইয়াছে, নিকটস্থ সনাতনবাটী গ্রামের ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে যায়, এবং পিতার স্তায় শান্ত। বিন্দুর আর সন্তান হয় নাই।

হেমচন্দ্র প্রায় গ্রামেই বাস করেন, জমীর চাষবাস দেখেন, আর বাড়ী বসিয়া দুই একখান বৈ পড়েন। বাঁল্যকাল হইতেই তাঁহার স্বপক্ষে আস্থা ছিল, কিন্তু আমরা বিদ্যালয়ে যে লেখা-পড়া শিখি, তাহাতে আমাদের নিজের শাস্ত্রে কিছুই শিক্ষা পাই না। হেমচন্দ্রের সংস্কৃতশাস্ত্রাদি পড়িতে বড়ই ইচ্ছা হইত।

এ বয়সে তিনি টোলে গিয়া শিক্ষা করিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহার ভাগ্যক্রমে শাস্ত্রশিক্ষার একটি সুযোগ ঘটিল। সনাতনবাটীতে সম্ভ্রান্তি রমাশ্রমাদ সরস্বতী নামে একজন বহুশাস্ত্রবিদ্যার পণ্ডিত আসিয়া বাস করিতেছেন। অনেক শিক্ষার্থী তাঁহার কাছে শাস্ত্র পাঠ করিতে বাইত, হেমচন্দ্রও পঞ্চদশ বৎসর বয়সে তাঁহার নিকট কিছু কিছু সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেন এবং সৰ্বদা শাস্ত্রের আলোচনা করিতে ভাল বাসিতেন।

ক্রমে হেমচন্দ্রের সহিত রমাশ্রমাদের বড়ই সৌহার্দ্য জন্মিল। রমাশ্রমাদের বয়স ৪৭ বৎসর পার হইয়াছে, কিন্তু তিনি বৃদ্ধ-বৎসরাবধি কান্দিধামে বাস করিয়া অধ্যয়নাদি করিয়াছেন, এবং পশ্চিমদেশের অনেক তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার শরীর এখনও তেজঃপূর্ণ ও বলিষ্ঠ। তিনি মৃত্যুকে ভীতি ধারণ করিতেন, দীর্ঘ অশ্রু রাখিয়া ছিলেন, হারিত্র-বসন পরিধান করিতেন এবং প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে শিক্ষা-দান করিয়া দিন কাটাইতেন। তাঁহার দেবীশ্রমাদ নামে পঞ্চদশ বৎসরের একটি সন্তান ছিল, সে পিতার সহিত পশ্চিমে অনেক ভ্রমণ করিয়াছে, পিতার স্তায় তেজঃপূর্ণ ও উদারচেতা। সে এখন সনাতনবাটীর বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষা করে এবং পিতার নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করে। দেবীশ্রমাদ বালক সুবোধকে বড় ভালবাসিত, সৰ্বদা আপন গৃহে লইয়া বাইত এবং তালপুকুরেও মধ্যে মধ্যে আসিয়া সুবোধ ও সুনীলার সহিত খেলা করিত।

সুখা বিবাহের পর কয়েক বৎসর পরে সবে কলিকাতায়ই বাস করিতেন, কখন কখন গ্রামে আসিতেন। শরচ্চন্দ্র একে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হইলেন, পরে একটি উপযুক্ত চাকরীর সন্ধান করিতে লাগিলেন। একবার ইচ্ছা হইল, বিলাতে বাইরা বড় পরীক্ষা দিয়া ভাল চাকরী লইয়া আইসেন, কিন্তু শরচ্চন্দ্রের সেরূপ আর নাই, বে, বিলাতে বাইরা কয়েক বৎসর থাকেন। শুনিলেন, দেশেও ভাল পরীক্ষা দিতে পারিলে, "ট্যাটুটারি সিভিল সার্ভিস" প্রবেশ করিয়া উচ্চকর্ম পাওয়া যায়, সুতরাং সেই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

তাঁহার স্ত্রীর বুদ্ধিমান, উৎসাহী, কৃতবুদ্ধি লোক পরীক্ষার বার্থ-প্রবৃত্ত হইলেন না। যে বৎসর পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলেন, সেই বৎসরই ভালপুকুর গ্রামে সন্ধ্যার একটি পুত্র সন্তান হইল। সন্ধ্যা এটি স্নানক্ষণ মনে করিয়া বড় মেহে পুত্রের মুখচূষন করিলেন। খোকার মাসী বড় বড় খোকার শুক্রবা করিতেন এবং খোকার বাপ সহর্বে পুত্রমুখ দেখিয়া চাকরীস্থান পশ্চিম অঞ্চলে চলিয়া গেলেন।

সেই অবধি দুই বৎসর শরচ্ছত্র বিদেশে বিদেশেই রহিলেন, দুই বৎসরের মধ্যে বাড়ী আসিতে পারেন নাই। স্বামীকে এত দিন ছাড়িয়া থাকা সন্ধ্যার পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইয়াছিল, গোপনে গোপনে চিঠি দিতেন, দিদির কাছে গিয়া অশ্রু বরিষণ করিতেন, আবার পুত্রটিকে চূষন করিয়া অশ্রু মুছিতেন। এবার শরৎ-বাবু কার্ধ্যস্থানে সন্ধ্যাকে লইয়া বাইবেন; এক্ষণে দুই মাসের ছুটি লইয়া বাড়ী আসিতেছেন, আজ তাঁহার ভালপুকুরে আসিবার কথা,—সেই জন্ত সন্ধ্যা এত প্রকল্পল্পদয়া হইয়াছেন,—সেই জন্ত স্বামি-সোহাগিনী সন্তোষে বেষভূষা করিতেছেন।

নবম পরিচ্ছেদ ।

ঠাকুরমার পরামর্শ ।

বিন্দু। বলি, ও সন্ধ্যা, সন্ধ্যা, তোর কি আজ খোঁপা বাঁধা হবে না বোন? সন্ধ্যা হয়ে গেল, এখনও কি তোর চুল বাঁধা শেষ হয় না? এমন চুলবাঁধা ত বাপের সঙ্গেও দেখিনি।

সন্ধ্যা। দেখ না দিদি, এই ঠাকুরমার বসুগেম, একরকম ক'রে চুল বেঁধে দিতে, তা ঠাকুরমি যে কি ক'রছেন, তার ঠিক নেই।

কালীতারা। হেঁ লো হেঁ, ঠাকুরমিরই বড় সাধ, তোর মনে কিছু সাধ নেই, কেমন? লোকের ভাল ক'রলে বন্দ হয়, না? তা এই নে বোন, এই খোঁপা বাঁধা শেষ হ'ল এখন রূপার ফুল ছুটি ব'লে দি, বসিয়ে দি।

সন্ধ্যা। না ঠাকুরমি, রূপার ফুলে কাজ নেই, ছেড়ে দাও, তোমার ছুটি পারে বসি।

কালী। আর নেকামিতে কাজ কি লো? এই নে, ফুল দিয়ে দিয়েছি, এখন একবার তোরা লেখানা দাও ত বিন্দু দিদি, সন্ধ্যার মুখখানা ভাল ক'রে মুছিয়ে দি।

কালীতারা ছাড়িবার মেয়ে নয়। মুখখানি বেশ করিয়া মুছাইয়া দিয়া, গলার হার পরাইয়া দিয়া, হাতে দুখানি গরনা পাইয়া দিয়া একখানা কালাপেড়ে কাপড় পরাইয়া পরে আরসীখানি স্নর্ধরে সমুখে ধরিয়া বলিলেন, “এখন শরৎ বাড়ীতে এসে বলুক, মনের মত বো হয়েছি কি না?”

লজ্জার সন্ধ্যা আরক্তমুখী হইয়া ছুটিয়া পলাইলেন, বিন্দু ও কালীতারা হাসিতে লাগিলেন।

কিন্তু সন্ধ্যার আয়োজন এখনও শেষ হয় নাই। শুইবার ঘরে গিয়া একটি প্রাণীপ জালিলেন, হাসি হাসি মুখে বিছানা করিলেন, বিছানার ভিতর দুই একটি ফুলের মালা লুকাইয়া রাখিলেন ডিবে ভরিয়া পান সাজিয়া রাখিলেন। কালীতারা ঘরে থাকিতে রন্ধন-কার্য আর কাহাকেও দেখিতে হইত না, তবে সন্ধ্যা মিছরিপানা, ফল-মূল, মৃগের ভাল ভিজান প্রভৃতি যে সকল উপায়ে প্রথমে শরৎ বাবুকে বশ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত আয়োজন করিতে কান্স হইলেন না।

রেকাবি করিয়া সমস্ত সাজাইতেছেন, এখন সবরে সেই ঘরে ঠাকুরমাকে লইয়া বিন্দুদিগি প্রবেশ করিলেন। ঠাকুরমা সুধাকে দেখিয়া বলিলেন, “বলি, আজ বড় আরোজন যে লো!” সুধা লজ্জার হেটুয়া হইলেন।

ঠাকুরমার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। বিন্দু ও সুধার সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল কি না, জানি না, গ্রামের কোন ঘরের সহিত তাঁহার কি সম্পর্ক, তাহাও জানি না, তবে বৃদ্ধা বিধবাকে গ্রামের বৃদ্ধগণ আদর করিয়া বা বলিয়া ডাকিত, সুতরাং তিনি গ্রামের মধ্যবরক ও সুবক-সুখতীদিগের ঠাকুরমা হইতেন। বাল্যকাল হইতেই বিধবা, সুতরাং স্বামিঘর কখনও করেন নাই। মনটি সাদা, জ্বর মমতাপূর্ণ, আর ছেলে দেখিলেই ঠাকুরমা কোলে লইতেন। সকল বাড়ীতেই তাঁহার বাতায়নাত ছিল, সকল বাড়ীতেই তাঁহাকে ভালবাসিত, সকল ঘরের ছেলেরা তাঁহাকে ভালবাসিত, সকল গৃহের গৃহিণীরা ঠাকুরমাকে বসাইয়া দুইটি গল্প করিতেন। তবে ঠাকুরমা একটু রসিকা ছিলেন এবং কথাগুলি একটু অরমধু, নিতান্ত মিছরি-মাখান নয়।

আজ অনেক দিন পর শরৎ-বাবু বাড়ী আসিবেন, শরৎ-বাবুকে ঠাকুরমা ছেলেবেলা বড় ভালবাসিতেন, তাই আজ একবার দেখিতে আসিয়াছেন। শরৎ-বাবুকে গ্রামের লোক একঘরে করেছে, কিন্তু ঠাকুরমা মায়া ও মমতা কাটাইতে পারেন নাই।

হাসিতে হাসিতে ঠাকুরমা বলিলেন, “বলি, আজ বড় আরোজন যে লো, বিশেষ কি আর কারও বামী চাকরী করে না, না বিশেষ খেকে কেউ কিরে আসে না! এত আরোজন কিসের লো? বড়ী ঠাকুরমা এসেছে, তা কি একবার চেরে দেখতে নেই?”

সুধা। না ঠাকুরমা, তুমি এসেছ বলে জানি না। আরোজন আর কি ঠাকুরমা, একটু জলবাহার তৈয়ার করে রাখছি। তা ঠাকুরমা, তুমি রেকাবিখানা সাজিয়ে দাও না।

ঠাকুরমা। দেখি দেখি, কি রেখেছিস। ইস, এ যে পানকল, আক, মুগের ডাল, আর এ পাখরের গেলাসে বুঝি মিছরিপানা? বিন্দু। হেঁ গো ঠাকুরমা, শরৎ-বাবু মিছরিপানা বড় ভালবাসেন।

ঠাকুরমা। আর এ বাটিতে কি? ও মা, এ যে চিনির রসে রসবড়া রে! এ বুঝি তুই আপনার হাতে করেছিল? এ যে ভারি যত্ন লো! দেখিসু বাছা, এত যত্ন-টত্ন করে বেন শরতের মাখাটি খাসু নি।

বিন্দু। কেন ঠাকুরমা, শরতের মাখা খেতে বাবে কেন? অনেকদিন পরে শরৎ বাড়ী আসছে, তা সুধা একটু যত্ন করবে না ত কে করবে?

ঠাকুরমা। তা করবে বৈ কি বাছা! সুধা ভাল মেয়ে, শরতের যত্ন-টত্ন করবে কি। তবে কি জানিসু, আজকাল বে কেম সময় পড়েছে, জেরাদা যত্ন-টত্ন করলেই পুরবমাহুর আবার মাথার চড়ে, তা বুঝি জানিসু নি?

বিন্দু। না ঠাকুরমা! সে আবার কেমন, বল না ঠাকুরমা!

ঠাকুরমা। ওলো দেখুবি, দেখুবি, যখন আমার মত বয়স হবে, দেখে শিখুবি। আমি বাড়ী বাড়ী বাই, চেরে দেখেছি লো, তাই শিখেছি।

বিন্দু। তা আমাদের শিখাও না ঠাকুরমা, আমরা শুনি।

ঠাকুরমা। ওলো শুনি ত শোনু। ঐ যে তোরা বিরে বিরে করে পাগল হস, ছেলের

বিয়ে দাও, মেয়ের বিয়ে দাও বলে পাগল হ'ল, আমি ত বলি, ছেলে-মেয়ের বিয়ে হয় না ত, ছেলে মেয়ের নড়াই নাগে। এই যেমন রাজার রাজার নড়াই হয় না? সেই রকম নড়াই নাগে। নে, তোরা যে হেসে গড়িয়ে গেলি। বুড়ীর কথা শুনে যদি অমন ক'রে হাসিস ত আমি এই চলেম।

বিন্দু। না ঠাকুরমা, হাসব না, সত্য হাসব না, বল, বল, বল, তোমার পারে ঘরি।

ঠাকুরমা। বলছিলাম কি, বিয়ে নয় ত, ছেলে-মেয়ের নড়াই নেগে যায়। যে যত আদার করুতে পারে, বুঝি কি না, মে'রে ধ'রে, ব'কে ঝ'কে, যে যত আদার করুতে পারে। ঐ আমাদের পাড়ায় ঐ ঘোষালদের পো আছে না? তার দুটো ছেলে হয়েছে, তা জানিস বাছা! তা ঘোষালদের বোটি রোগা ছেলে নিয়ে দুই ছেলে কাকে ক'রে সমস্ত দিন খাটছে গো, সমস্ত দিন খাটছে। বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, জল আনা, রাঁধা-বাড়া, সমস্ত সংসারের কাজ করুছে, তার উপর দুবেলা গাল খেতে খেতে প্রাণটা যায়। বাবুর যদি গরম দুধটুকু পেতে একটু দেয়ী হ'ল, তা অম্নি গালাগালি, সে ত এমন গালি নয়, আমাদের কানে আঙ্গুল দিতে হয়। বোটি নিতান্ত ভাল-মাহুয, মুখে রক্ত উঠিয়ে বাবুর ঘর করে, তবু ত উঠতে না-বতে গাল খায়। ভাল-মাহুয হ'লে অম্নি হয় লো, পুরুষের হাতে প্রাণটা যায়। তাই বলি, অধিক ভালমাহুয হওয়া কিছু নয়, একটু আদর করুতে দেখ।

বিন্দু। তা সব পুরুষ কি ঐ রকম ঠাকুরমা?

ঠাকুরমা। না, তা বলছিনি, তা বলছিনি, আদার মেয়েও ভেম্নি আছে। ঐ যে

বড়ালদের বোটি কেমন শাকা মেয়ে! স্বামীকে ঠিক যেন ভেড়া ক'রে রেখেছে। কর্তাটি বৌয়ের কথার উঠে, বৌয়ের কথার বসে, মুখে কথাটি কবার বো দাই। তবু ত বড়ালের বৌয়ের বহুনি খানে না, সকাল থেকে পিটু পিটু ক'রে বকছে, আর রাত দুই প্রহরের সময় সে বহুনি শেষ হয়। বাবুটি কলুর বলদের মত চৌক কান ঢেকে মুখ বুজিয়ে বৌয়ের বোঝা ঝাড়ে নিয়ে সারাদিন ঘুমেছন। সাধাস মেয়ে বা ইউক! কেমন স্বামীকে বশ করেছে! কেমন কাজ আদায় ক'রে নিচ্ছে। গহনা বল, কাপড় বল, টাকা বল, মানটুকু বল, কেমন আদার ক'রে নিচ্ছে। কোন কথার কর্তাটির কি কিছু বলবার বো আছে?

বিন্দু। তা ও রকম কি আদার করা ভাল? ওতে কি সংসারের সুখ হয়? এই দেখ না, জ্যোঠামহাশয়ের সংসার কি হয়ে গেল।

ঠাকুরমা। ঠিক বলেছিল বাছা, আহা! ঠিক ধরেছিল। তারিগী-বাবুর সোনার সংসার ছিল, উমার মাকে কখন একটা রেগে কথা কইতে শুনিনি গো। তা তাকে ভাল-মাহুয পেয়ে তোর জ্যোঠামশাই তাকে পারে ঠেললেন, দেখলি ত! আহা, তাকে দড়ে মারলেন গো, দড়ে মারলেন! এ নড়াই শো নড়াই,—বে ভালমাহুয, তারই মরণ, যে শক্ত; তারই জিত। আবার এখন কেমন নড়াই বেখেছে! সেই ত তারিগী-বাবু,—পাড়ার পাড়ার বাঁড়ের মত করেন, সকলকে শাসন করেন,—বাড়ীতে প্রতুধ করুন দেখি! কৈ, এবার ত ছেলে হ'ল না, আর একটা বো করুন দেখি! তার বো নেই, ছোট গিন্নী তায়ে বাড়ী শক্ত, নড়াইয়ে তারিগী-বাবুকে হারিয়ে

বলিস কেনে নিজেই। কেনে করেছো! খুঁ করেছো! সেয়েষ যত যেরে বটে। বেশ করেছো, আদার করুণো। অসুখম মেয়ে না হ'লে কি পুঙ্খ অসুখ হয়?

বিন্দু হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তা সোশী কোঠাই বা করুণে, সে কি ভাল কাজ ঠাকুরমা? ও রকম কাজে কি সংসারে সুখ হয়?”

ঠাকুরমা। ভাল আর কি? এই সংসারের রীতি, চিরকাল এই হয়ে আসছে। সুখ আবার কি? নড়াইতে সুখ হয়, না বিয়েতে সুখ হয়? যে যত কেড়ে নিতে পারে, মেয়ে ধ'রে ব'কে ব'কে যে যত আদার করুতে পারে। আমি ত এই সংসারে দেখি, তোরা বাছা লেখা-পড়া শিখিছিস, কি ভাবিস জানি না।

সুখা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “আচ্ছা ঠাকুরমা, দিদি ত হেম-বাবুকে সেবা-টেবা করে, আর হেমবাবুও দিদির বদ্ব করে। কৈ, দিদি ত আদার করুতে শিখে নাই।”

ঠাকুরমা। ওলো, ওদের কথা বলিস কেন? হেমবাবুটি ত সন্ন্যাসী! আর বিন্দু চিরকালই একটু বোকা-সোকা মেয়ে, ওদের কথা ছেড়ে দে। তা ও রকম বোকা-সোকা ভালমাহুয লোক সংসারে কটা আছে? আমি ত দেখি, সংসারে প্রায় নড়াই, যে ভালমাহুয হয়, তারই সর্বনাশ। তা পুঙ্খের কি বল? তারা রোজগার করে, তাদের বিষয়-সম্পত্তি আছে, তাদের আর আছে, তারা পায়ের উপর পা দিয়ে বসে, আর বৌগুলোকে দাসীর মত খাটাতে চায়। তা বৌগুলো যদি একটু ধারাল না হয়, একটু রাঁধুনী না হয়, তোর কোঠাইয়ের মত শক্ত না হয়, তা হ'লে কেবল খেটে খেটে তাদের প্রাণটা বার। পুঙ্খের নাখি-কাঁটা খেতে

হয়। কেমন? তাই বলি বাছা, একটু ধারাল হবি, একটু রাঁধুনী হবি, একটু শক্ত হবি। তা হ'লে যানে মানে থাকবি, আদার করুতে শিখবি, কাপড়খানা, গয়নাখানা, টাকা ও প্রত্নতটুকু আদার করুবি। পুঙ্খকে ভরে ভরে রাখবি, পুঙ্খের পর পর খাটিয়ে আদার ক'রে নিবি, তবে ত বলি, সব্বের মত মেয়ে। আদার করুতে শিখ'বিনি ত মেয়ে-জন্ম নিয়ে এসেছিল কেন?

বিন্দু। ঠাকুরমা, আদার করুতে গিয়ে যদি সব নোকসান হয়?

ঠাকুরমা। যে রাঁধুতে জানে, তার হাতে কি বেয়ন খারাপ হয়?

বিন্দু। ঠাকুরমা, এই বয়সেই আমি কত নোকসান দেখে লেম। কত পরিবার ঝগড়া-কাঁটি ক'রে যেন আশানের মত হয়ে গিয়েছে।

স্বামী কিংবা স্ত্রী একটু সহ করুলে সোনার সংসার থাকত, কিন্তু সেইটুকু সহ না করাতে সংসারসুখ গোন্নায় গিয়েছে। অধিক আদার করুতে গিয়ে নোকসান হয়েছে, ঠাকুরমা, শেষে যে আদায়ের চেষ্টা করেছিল, সেই মাধার হাত চাপড়েছে!

ঠাকুরমা। ওলো, সে রাঁধুনীর দোষে। বলি, ঐ যে এক একটা রাঁধুনী বেয়নে জেরাদা ছুণ দিয়ে ফেলে,—তাই ব'লে কি ছুণ না দিলে রান্না হয়? তুই ত একজন ভাল রাঁধুনী, কৈ ছুণ না দিয়ে কেবল মিছকি দিয়ে সব বেয়নগুলো রাঁধ দেখি?

দশম পরিচ্ছেদ ।

প্রিয় সমাগম ।

রাজ্য প্রায় আটটার সময় শরচ্ছত্র বাজি আসিয়া পৌঁছিলেন । তাঁহাকে হুই বৎসর পর দেখিবার জন্ত আজ বাড়ী লোকে পূর্ণ । হেমচন্দ্র এতদিন পর ভ্রাতৃসম শরৎকে আলিঙ্গন করিয়া বথার্থই আনন্দ লাভ করিলেন । অস্তান্ত বরস্ত-বকুগণও শরৎকে মানন্দে অভিবাদন করিলেন । গ্রামের বৃদ্ধগণ (বাহারা শরচ্ছত্রকে একঘরে করিতে অগ্রগামী ছিলেন), তাঁহারা উচ্চপদাভিষিক্ত বহুকমতা-শালী যুবককে “বাবাজি” বলিয়া বড়ই শ্রীতি, স্নেহ ও যত্ন দেখাইলেন । শরৎ সকলকে সম্মানিত করিয়া মার ঘরে গেলেন ; ভূমিষ্ঠ হইয়া স্নেহময়ী মাতাকে প্রণাম করিলেন । গুরুকেশী গুরুবসনা বৃদ্ধা সজল-নয়নে পুত্রের শিরশ্চন্দন করিয়া আশীর্বাদ করিলেন ।

অনেকক্ষণ মাতার কাছে বসিয়া মাতার কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন । শরতের মাতা সংসার হইতে প্রায় অবসর লইয়াছেন, সংসারের কাজকর্ম কিছুই দেখেন না । প্রাতঃকালে স্নান করিয়া বিপ্রহর পর্যন্ত পূজা আত্মিক করেন, সন্ধ্যার সময় আবার আত্মিক করিয়া নিরামিষ-ভোজনানন্তর শয়ন-গৃহে প্রবেশ করেন ।

শরৎকে যখন সকলে একঘরে করে, তখন শরতের মাতা হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইয়া ছিলেন ; কিন্তু তাঁহার গুরুদেব বলিলেন, “মা, কিছু ভাবিবেন না, ব্রাহ্মণ পুত্রারী আপনার বাড়ীতে আসে বা না আসে, তাহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই । আপনি যে নিয়মে পূজা আত্মিক করেন, সেই নিয়মেই করিতে থাকুন ;

পুত্রারী ব্রাহ্মণের সাহায্য পানাবশতক । দানের সহিত ভগবানকে ডাকিলেই ভগবানের আরাধনা হয়, ভগবানের আরাধনার যোক্তারদ্বারা আবশ্যক হয় না ।”

শরতের মাতা সেই পরামর্শই গ্রহণ করিলেন । তাঁহার পূণ্যবলে শরৎ সকল পরাকার উত্তীর্ণ হইয়া উপযুক্ত কার্য পাঠরা-ছেন, আজ বিশেষ হইতে আসিয়া ভক্তি-ভাবে মাতার চরণ ধরিয়া প্রণাম করিলেন ।

বিশু ও কালীতারা শরতের কাছে বসিয়া কত যত্ন করিলেন, কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, শরৎও তাঁহাদের যথেষ্ট সন্তোষ করিলেন । পার্শ্বদণ্ডায়মানা অবগুষ্ঠনবতী সুধার কোড় হইতে প্রিয় শিশুকে কোড়ে লইয়া ঘন ঘন চুষন করিলেন,—আনন্দে সুধার নয়ন হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল ।

রাজপুরুষদিগের আহ্বানার্থ নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে বড় ধুম হয় । পুণ্যচরিত্র পুণ্য-হৃদয় শরচ্ছত্রকে আহ্বান করিবার জন্ত আজ সেই ক্ষুদ্র কুটার যেরূপ স্নেহের লহরীতে ভাসিল, তদপেক্ষা প্রকৃত স্নেহ, প্রকৃত প্রেম, প্রকৃত ভালবাসা এ জগতে দৃষ্ট হয় না ।

শরৎ অনেকক্ষণ পর যুধ-প্রক্ষালন করিলেন । অবগুষ্ঠনবতী সুধা সযত্নে জলধাবার আনিয়া দিলেন । জল খাইয়া পুনরায় হেমচন্দ্রের সহিত বাহিরের ঘরে বাইরা সমবেত বন্ধুদিগের সহিত গল্প করিতে লাগিলেন । গ্রামের সকলের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, দরিদ্র ও বিপদগ্রস্তদিগকে আশু সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হইলেন, সাধারণের সাবহায্য পুষ্করিণী ও পথ-বাট-সংস্কারের জন্ত রুতসকর হইলেন, পীড়িতদিগের ঔষধাদি দানের ব্যবস্থা করিলেন, দরিদ্র বালকদিগের বিদ্যালয়ের মাতিয়ানা দিতে স্বীকৃত হইলেন । বৃদ্ধদিগের কাহারও ছেলের পড়িবার পুস্তক চাই,

কাহারও কিছুমাত্রে কিছু সাহায্য চাই, কাহারও ধরতি ছাইবার ভয় কিছু বড় চাই, শরৎ হই বৎসর পর গোপে আসিয়াছেন, কাহারও ব্যক্তি করিলেন না, সকলকেই সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হইলেন ।

রাজি প্রায় দেড় প্রহরের সময় আহার প্রস্তুত হইয়াছে । হেম ও শরৎ আহারে বসিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কাছে বসিলেন, কালীতারা রন্ধনে অতুল্যা, তিনি ভাইকে মনের মত খাওয়াইয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন ।

পরে বেদেরের খাওয়া লাওয়া হইল । রাজি বিপ্রহরের পর হেম ও বিন্দু বিদায় হইলেন । বিন্দু বিদায় হইবার পূর্বে শরতের হাতে ধরিয়া তাঁহার শরনঘর পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া বসিলেন, “এখন তোমার ধন তুমি বুঝিয়া লও, আমরা চলিলাম ।” ঘরে প্রবেশ করিয়া শরৎ দেখিলেন, শব্যার শিশু নিদ্রিত রহিয়াছে, পার্শ্বে একটি প্রাণীপ জলিতেছে, এবং শিশুর নিকটে পূর্ণবোঁরা, পতিপ্রাণা, লজ্জাবনতাঃসুখা রঞ্জিত মুখখানি হেঁট করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন ।

এক মুহূর্ত্তকাল সেই পুণ্য-ছবিটি দেখিলেন, প্রাণীপের স্থিতিত আলোকে জ্বরের সর্ব্ব-রক্তকে নিরীকণ করিলেন,—ধীরে ধীরে সুখার পার্শ্বে আসিয়া সেই কোমল প্রেমবিলসল মেহলাতা জ্বরে ধারণ করিয়া সেই কম্পিত ওষ্ঠদ্বয়ে গাঢ় চুষন করিলেন ।

সুখা চক্ষু মুদিত করিলেন, সংজ্ঞাশূন্য হইয়া কোমল বাহুদ্বারা ছায়া পতির গল-দেশ জড়াইয়া ধরিলেন,—বহনিনের জ্বরের ব্যথা ভুলিলেন । পতিপ্রাণা সুখার পূর্ণ জ্বর জ্বাট হইতে লাগিল, নয়ন দুটি আনন্দ-বারিতে আশ্রুত হইল ।

সাহরে সে জল মুছাইয়া দিয়া, সে সুখার নয়নদ্বয়ে বার বার চুষন করিয়া শরৎ

হইলেন, “সুখা, আমি জ্বরের মধ্যে ভাগ্য-বান যে, তোমার মত রমণী-রত আমার হৃদয়াকাশে শোভা পাইতেছে, আমার জীবন-কাণ্ডে চিরকাল দীপ্ত রহিয়াছে । বদেপে, বিবেপে, সুপে, শোকে, সন্তাপে তুমিই জ্বায়ায় নয়নযশি, তুমি আমার বৃহলক্ষী ।”

সুখা কিছু উত্তর দিতে পারিল না,—স্বামীর স্নিগ্ধ প্রেমপূর্ণ মুখের দিকে আবার সজল-নয়নে চাহিল, আবার স্বামীর ধ্বংস মুখ লুকাইয়া বর বর করিয়া নয়ন-জল ত্যাগ করিল ।

পতিপ্রাণা সুখার মনের কথা যদি বাক্যে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা থাকিত, তবে সে বলিত, “পথের কাদালিনীকে জুড়াইয়া জ্বরে হান দিয়াছ,—দুঃখিনীর কত কত নিশা ও কষ্ট সহ করিয়াছ—জ্বরেখর ! আমি কি তোমার রক্ত হইলাম ? চিরজীবন তোমার দাসী হইয়া থাকিব, জ্বরে জ্বরে এই পুণ্যপদ সেবা করিব ।”

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

দাদামহাশয়ের পরামর্শ ।

ঠাকুরমা । কৈ লো সুখা, উঠেছিল ?

সুখা । উঠেছি ঠাকুরমা, এত সকালে বে ?

ঠাকুরমা । এই সকালে একবার এলেম গো, শরৎকে দেখতে । আর এই বে কাল রাজিতে একখানা বৈ পেতেছিলে, শরতের জন্ত নিয়ে এলেম ।

সুখা । এ কি ঠাকুরমা ? এত বড়-উড় করলে পুরুষমানুষ মাখার চড়বে বে !

কালীতারা । ঠাকুরবার এই রকম থায়া ।

অল্প লোককে বশেন, আদার করে নে, আদার করে নে, আর আপনি পরের অল্প করে করে গতরখানি বাঁচা করুন। আহা, ঘোষালদের অল্প ঠাকুরমা যদি না করত ত সে বোটা কি বাঁচত, সংসারের অর্ধেক কাজ ঠাকুরমা গিয়ে করে দিয়ে আসে। ঐ বড়ালদের বাড়ীর কঁঠাটির যখন ব্যারবার হ'ল, ঠাকুরমা ত পাঁচ সাত দিন ঘরে আসে নি, রোগীর কাছে ব'সেই ছিল। আহা, উমার মার শেষ দশায় ঠাকুরমা না থাকলে কে করত, দিন নেই, রাত নেই, রোগীর যত করত। পাড়ার বত ছেলে ত ঠাকুরমাকে পেয়ে বসেছে, পাটালি গুড় আর দৈ কারও ঘরে কিনতে হয় না।

ঠাকুরমা। না লো না,—তবে লোকের ব্যারবার স্মরণীয় হ'লে করত হয়। বলি সুধা, কণাল রাত্রিতে একটু মান করেছিলি না? হুই একটি ঝাল ঝাল কথা শুনিয়া দিয়েছিলি? এতদিন পর বিদেশ থেকে এল, একবার অভিমান করে বৈকে বসেছিলি ত? পারে চায়ে ধরিয়েছিলি?

সুধা। না ঠাকুরমা, ভুলে গিয়েছিলেম।

ঠাকুরমা। ও মা! কোথাকার হাবা মেয়ে গা? বলি, একটু মুখ ভারি করে হুই একখানা গরনা আদার করি নি? তোর অল্প হুই একখানা গরনা এনেছে?

সুধা। জানিনি ঠাকুরমা, জিজ্ঞাসা করত ভুলে গিয়েছিলেম।

ঠাকুরমা। ও হরি! বলি, তুই কি একেবারে কচি খুকী লো? এই রকম করে সংসার করবি? বলি, এতদিন যে বিদেশে চাকরী করলে, টাকাগুলো কি করলে, তার খোঁজ-খবরও নিলিনি? তুই এমন ফুটফুটে বোঁ, তোর নামে কোম্পানির কাগজ হুই একখানা করে দিক না? তা বলেছিলি?

সুধা হাসিতে হাসিতে পুনরায় বলিলেন, “বলতে ভুলে গিয়েছিলেম ঠাকুরমা।”

ঠাকুরমা। হয়েছে। নে বাছা, তোর মিছরি দিয়ে বেরন রাখ গে,—আমি তোর নতুন জোঠাইয়ার বাড়ী একবার বাই। সে বাড়ীর বেরনে বেশ একটু হুপ নকা পড়ে।

এইরূপ কথা হইতেছিল, এমন সময় শরৎ-বাবু সেই ঘরে আসিয়া পড়িলেন। ঠাকুরমাকে দেখিয়া একটি গড় করিয়া বলিলেন, “ঠাকুরমা, এত সকালেই এসেছ, আমি মনে করছিলাম, একবার তোমার বাড়ী আজই বাব।”

ঠাকুরমা। না বাছা, তোরা যাবি কেন, আমি এসে এসে দেখব। ক'ল সন্ধ্যার সময় আমি এসেছিলাম, তোর আসতে রাত হ'ল দে'খে'চ'লে গেলেম। আহা, বেঁচে থাক, আমার মাথার চুলের মত তোর বরস হউক, ডগবানু তোর মঙ্গল করুন। আহা, তোর বাতুড়ী যদি আজ বেঁচে থাকত, সোনার চাঁদের মত হুটি জামাই দে'খে তার চক্ষু জুড়াত।

ঠাকুরমা কাপড়ের খোঁট দিয়া চক্ষু মুছিলেন। ক্ষণেক পর একটু হাসিয়া বলিলেন, “তা বাছা, এতদিন পর এলি, কৈ, বৌয়ের গরনা কৈ? ভালমাত্র বৌ ব'লে কাকি দিলে ত হবে না, আমি এই বৌয়ের অল্প কোমর বেঁধে ঝগড়া করত এসেছি।”

শরৎ হাসিয়া বলিলেন, “বৌ আগে, না ঠাকুরমা আগে?” এই বলিয়া ঠাকুরমার অল্প যে তসরের শাটী আনিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন।

ঠাকুরমার চক্ষে আবার জল আসিল; বলিলেন, “এ সব কেন বাছা, আমাদের অল্প এ সব কেন? আমি বুড়ো বুড়ো হয়েছি, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে,

আহার তসর-গররের কি কাজ বল দেখি ? তা ঠাকুরমাকে মনে ক'রে এনেছিল, বেঁচে থাক বাছা, বেঁচে থাক । কিন্তু দেখ, শরৎ, আর আহার জন্ত এমন ক'রে খরচপত্র করিস্ নি ।”

শরৎ ঘরে আসতে সুধা ঘোমটা দিয়া কোণে টাড়াইয়াছিলেন, কানে কানে কালী তারাকে কি বলিলেন । কালীতারা হাসিয়া ঠাকুরমাকে বলিলেন, “বৌ বলছে, ঠাকুরমা, তসরের কাপড়খানা নাও, আরও খুব আদার ক'রে নাও, না হ'লে পুরুষমানুষ মাথার চড়বে বে ।”

শরৎ হাসিয়া বলিলেন, “ঠাকুরমা বুঝি আদার কবুবার মন্ত্র শিখাছিলেন ? ঠাকুরমার মত সকলে যদি জগতে ঘেহ, ভালবাসা, মমতা আদার করিতে পারিত, তা হ'লে জগৎ স্বর্গ হত ।”

ঠাকুরমার পর গ্রামের দ্বিদিমা শরৎকে আশীর্বাদ করিতে আসিলেন । তাহার পর জ্যোষ্ঠাটীমা, খুড়ীমা, পিসীমা, মাসীমা, বত বুদ্ধাগণ সকলে শরতের মুখচক্রে দেখিতে আসিলেন । সমাজের নিম্নম অহুসারে তাহার শরৎ ও সুধাকে একঘরে করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের শেবভুল্য অনিন্দনীয় চম্বিত্র, তাঁহাদের অসীম পরোপকারিতা, তাঁহাদের দয়া, মার্জা ও সংকার্য্য কাহারও অবিসিত ছিল না । গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁহাদের সাধুবাদ করিত, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আজ ভালপুত্র গ্রামের যৌববধূরূপ শরৎকে সম্ভাবণ করিতে আসিল । শরৎও সন্মুখকে প্রিয়-সম্ভাষণে ভুট্ট করিলেন, বৃদ্ধদিগকে প্রণাম করিয়া বস্ত্রাদি দিগেন, বন্ধুদিগের সুখলবার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, কৃষকদিগের ছোট ছোট ছেলে-যেদের হাতে এক একটা টাকা দিগেন । কৃষকপত্নীগণ সজল-

নরনে ছেলে কোলে লইয়া বাবুকে সাধুবাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল ।

আহারাদির পর সমস্ত দিন শরৎ গ্রাম পর্য্যটন করিয়া সকলের বাড়ী গিয়া সাক্ষাৎ করিয়া আসিলেন, শত্রু-মিত্র বিচার করিলেন না । অবশেষে বৈকাল বেলা তারিণী বাবুর বাড়ীও গেলেন । তারিণী-বাবু শরৎকে সমাদর করিলেন, শরৎ-বাবু প্রস্থান করিলে তারিণী-বাবুর গরবিণী গৃহিণী ঠোঁট তুলাইয়া বলিলেন, “তা চাকরী হয়েছে, বাক্, চাকরী করুক গিয়ে । আমাদের বাড়ীতে আসা যাওয়া কেন ? হার জাত নেই, কুল নেই, তার সঙ্গে মিশলে আমাদের পুণ্যের সংসারে কলঙ্ক পড়বে বে ।”

সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে কিছু জলযোগ করিয়া শরৎ দাদামহাশয়ের বাড়ীতে গেলেন । দাদামহাশয় গ্রামের মধ্যে বুড়ো, কিন্তু এখনও খুব শক্ত—লাঠি ধরিয়া পাড়ায় পাড়ায় ফিরেন, সকল বাড়ীর খবর রাখেন । গ্রামের বয়স্কা গৃহিণীদিগকে কখন মা বলিয়া সম্বোধন করেন, কখন কখন “বেটা” বলিয়া গালি দেন, এবং গ্রামের যুবতীদিগকে নাংনী বলিয়া উপহাস করেন । যুবতীগণ ঘাট হইতে কলস লইয়া আসিবার সময় বুড়োকে দূর হইতে দেখিতে পাইলে ভয়ে পলায়—“দাদামহাশয়ের” জালায় গ্রাম অস্থির ।

শরৎকে ছেলেবেলা হইতে দাদামহাশয় বড় ভালবাসিতেন । শরৎও দাদামহাশয়কে বড় সম্মান করিতেন এবং গ্রামে আসিলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন ।

গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যার সময় বাড়ীর বাহিরের রকের উপর দাদামহাশয় একাকী বসিয়া আছেন, পূর্বকালের কথা স্মরণ করিতেছেন, পূর্বস্মৃতি রোমন্বন করিতেছেন । দাদামহাশয়ের

মুখখানি রসিকের মুখ, নয়নের কোণে উপহাসের ভাব লুক্কায়িত রহিয়াছে। দাদামহাশয়ের মনটি ভাল, কিন্তু মুখে কিছু আটকায় না।

শরৎকে দেখিয়া দাদামহাশয় প্রকৃত আনন্দিত হইয়া বলিলেন, “এস ভায়া এস— অনেক দিন পর তোমাকে দেখিলাম। বলি, ভাল আছ ত?”

শরৎ। আপনার প্রসাদে ভালই আছি।

দাদা। তোমার মা ভাল আছেন? কালীতারা ভাল আছে? আর আমার সেই ফুটফুটে নাতবোটি ভাল আছে? থোকা ভাল আছে?

শরৎ। আপনার আশীর্ব্বাদে সকলেই ভাল আছে।

দাদা। তা এত দিন পশ্চিম অঞ্চলে কেমন ছিলে? সে দেশের জল-হাওয়া কেমন?

শরৎ। ভালই ছিলাম। বিহারের জল-হাওয়া ভাল। তবে এখন এই বর্ধমানের মত মেলেয়া-জর সেখানেও হইতেছে। মেলেয়াতে দেশটা উজ্জর হইল।

দাদা। বল কি? আমরা চিরকালই জানি, পশ্চিম-প্রদেশ বড়ই ভাল, কালী-প্রয়াগ যেমন পুণ্যস্থান, সেইরূপ শরীরের পক্ষেও উত্তম স্থান।

শরৎ। শুনিয়াছি, কালী, প্রয়াগ এবং দিল্লী, আশ্রা পর্য্যন্ত মেলেয়া-জর বিস্তারিত হইয়াছে, পঞ্জাব প্রদেশেও না কি মেলেয়া হয়। আমি এই দুই বৎসর বিহারে ছিলাম, সেখানে অভিশয় মেলেয়া হয়। তবে ভাগ্যক্রমে আমার এ পর্য্যন্ত জর হয় নাই।

এইরূপে দাদামহাশয়ের সহিত অনেককাল পশ্চিমবঙ্গের কথা, চাকরীর কথা, ভাল-

পুস্তকের কথা ইত্যাদি নানা কথা হইতে লাগিল। দাদামহাশয় পূর্বকালের চাকরীর রহস্য-গল্প বলিলেন, পূর্বকালের গৃহসংসারের রহস্য-গল্প বলিলেন। কেমন করিয়া সাহেব-ঘের বশে রাখিতে হয়, তাহা বলিলেন, কেমন করিয়া বোকে বশে রাখিতে হয়, তাহাও বলিলেন। সেই সমস্ত কথা কহিতে কহিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বলি, এখন ছুটি লইয়া আসা হইয়াছে কি মনে করিয়া? নাতবোকে নিয়ে যেতে চাও বুঝি? তা হবে না ভায়া, নাতবোকে শীঘ্র ছাড়ব না।”

শরৎ। তা আপনারা অহুমতি না দিলে কি প্রকারে পরিবার লইয়া যাই?

দাদা। তা অহুমতি দি কেমন করে? তোমরা কালেজের ছেলে, বোকে মাথায় করে রাখবে, আপনারও চাকরী সূচাবে, বোয়ের মাথাটিও থাকবে!

শরৎ। সে কি দাদামহাশয় মাথা থাক কেন?

দাদা। তা নয় কি? তোমাদের বো-ঠাকুরদারা না কি কলুর মত ঘনিগাছের উপর বসিয়া থাকেন, আর তোমাদের চোখে ঠুলি দিয়া ঘোরান। ভায়া! সেকালে ত এমন রীতিটি ছিল না, সেকালে অস্ত্র রীতি ছিল।

শরৎ। কি রীতি দাদামহাশয়? বল না, দুই একটা পুরাতন কথা শুনি, দুই একটা পুরাতন রীতি শিখিয়া লই।

দাদা। বলি, সে কালে কি বোদের গায়ের উপর পা দিয়া বসিবার উপর ছিল। ঐ সকাল থেকে উঠে বাসন মাঝা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, কুটনা কোটা, বাটনা বাটা, রাঁধা-বাড়া, পুরুষদের খাওয়ান, ছেলেদের খাওয়ান, এ সব কাজ হ'লে তবে বোয়েরা মুখে জল দিতে পারত। কাজ না করলে কি

বোঁ তৈয়ের হয়? সে কালের খাণ্ডীরা বোঁ তৈয়ের কর্তৃক জান্ত। তোমরা ভাবা কালেজের ছেলে, তোমরা তার কি জানবে বল?

শরৎ। শুনেছি না কি সেকালে খাণ্ডীরা কখন কখন হাতা পুড়িয়ে ছেঁকা দিয়ে বোঁ তৈয়ের কর্তৃক!

দাদা। ওহে ভায়া, চাই—চাই, একটু শাসন চাই। তোমরা সব বগী গাড়ী হাঁকাও না? বলি, গাড়ী হাঁকাবার সময় ঘোড়ার রাশ একটু টেনে রাখলে ঘোড়া বার ভাল, কেমন? আর তা না হ'লে ঘোড়া মুখ খুবড়ে পড়ে যায়। দেখ ভায়া! তোমার যেমন রাশ আলুগা,—যেন নাংবোটি শেষে মুখ খুবড়ে পড়ে যায় না!

শরৎ। দাদামহাশর! মেয়েমানুষ কি ঘোড়া? তারা কি আপনাদের কর্তব্য জানে না? তাদের কি ঘোড়ার মত মুখে রাশ দিয়া কিরাতে হয়?

দাদা। হাঁ হে ভায়া, কর্তব্য সকলেই জানে, তবু মুখে রাশটা থাকলে কর্তব্যটা হয় ভাল। এই তোমরা যে সরকারী চাকরী কর, কেমন কড়া নিয়ম? কোম্পানী কৈ একটু আলুগা দিক দেখি? সব বিশ্বাস্য হয়ে বাবে!

শরৎ। দাদামহাশর, গভর্ণমেন্ট আমাদের মাহিনা দিয়া চাকর রাখিরাছে, চাককের মত খাটাইয়া লয়। মেয়েমানুষ কি আমাদের মাহিনা-করা দানী? কাজ ত সকলেরই করা উচিত, আমরা বাহিরের কাজ করি, ভায়া! সংসারের কাজ করিবে। কিন্তু তাদের প্রতি কি দাসীর মত ব্যবহার করা উচিত?

দাদা। ঐ! কালেজের ছেলেদের বুলি ঐ। বলি, বাড়ি জোরাল দিলে যেমন কাজটি হয়, অমনি কি তেমন হয়? সংসারের রীতি

এই,—বাড়ি জোরাল দিলে, খুব শাসন করবে, তবে বোল আনা কাজ আদার হবে।

শরৎ। আর যদি বাড়ি জোরাল না দিয়া বার আনা কাজ পাওয়া যায়, আর তার সঙ্গে যদি একটু ভালবাসা পাওয়া যায়, সেটা ভাল নয়?

দাদা। ঐ! কালেজের ছেলেদের বুলি ঐ! ওহে বাপু, জোরাল না দিলে কাজও পাবে না, ভালবাসাও পাবে না, তা বুঝি জান না? বলি, মেয়েমানুষদের মননা পাখীর মত সোনার দাঁড়ে বসিয়ে রাখলে কি তাদের যত্ন পাওয়া যায়, না ভালবাসা পাওয়া যায়? তা নয়, তা নয়! চারিদিকে চেয়ে দেখ ভায়া,—যে বাড়ীর গৃহিণী পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থাকেন, তাঁর কাজও কম, যত্নও কম, ভালবাসাও কম। আর যে বাড়ীর কস্তা খুব শক্ত, খুব কড়া, খুব স্বার্থপর, কাজে একটু ক্রটি হ'লে শাসন করে, বোকে খুব খাটিয়ে খাটিয়ে আপনার বোল আনা বাবুগিরি বজায় রাখে, দেখবে ভায়া, সেই বাড়ীর বোয়েরই অধিক যত্ন, অধিক মায়া, সেই বাড়ীর কাজও ভাল হয়, সেই বাড়ীর রান্নাটাও ভাল হয়। পাকা আমের মত মেয়েমানুষের ভালবাসা গাছে কলে না,—যে একটু শাসন কর্তৃতে পারে, একটু কড়া হয়, একটু স্বার্থপর হয়, মেয়েমানুষের কেমন তার দিকেই জোরাল টান হয়,—মেয়েমানুষের মনের রীতি এই।

শরৎ হাসিতে হাসিতে বলিল, “দাদামহাশর, এক দোশে এক রাজা ছিল, সে বলিত, মাংস যত পিষিবে, কাটলেট তত নরম হইবে,—মেয়েমানুষকে যত প্রহার করিবে, তার মনটি তত নরম হইবে! দাদামহাশরেরও সেই মত না কি?”

দাদা। ওহে ভান্স, কট্লেট ত কখনও খাই নি, কেমন করে বল? তোমরা কালেক্জের ছেলে, তোমরাই বলতে পার। তবে ময়লাটা শিথ্লে জুটিটি বেশ নয়ম হয় না? গরম গরম আলুর দইয়ের সঙ্গে মুখে দিলেই গ'লে যায়! বলি না তবোয়ের রান্নার বড় হাতবশ আছে না?

শরৎ। কিছু কিছু রান্ধিতে জানে বৈ কি।—তাহার দিদির কাছে শিখিরাছে

দাদা। আহা, বেশ বেশ। আরও শিখিবে, বেশ করে ছুবেলা কাজ করাবে, তবে ত বোঁ তৈয়ের হবে। বেশ একটু মিঠেকড়া মেজাজ রাখলে বোঁ ভরে থাকবে, বেশ হুকুম-হাকাম চালালে বোঁ বস্ত কর্তে শিখবে। দেখতে পাও না? যে বাড়ীর কর্তার রান্ধিতে ঘুম হয় না, সে বাড়ীর বোঁ পা টিপতে শিখে। আর যে বাড়ীর কর্তা পেট-রোগা, সে বাড়ীর বোঁ ভাল রান্না শিখে!

শরৎ। তা এ বড় মুন্সিল দাদামশাই! বোঁকে পা টিপিতে শিখিবার জন্ত ঘুম বন্ধ করব? না বোঁকে রান্না শিখিবার জন্ত পেট-রোগা হ'তে হবে?

দাদা। না, কথার কথা বলছি,— পেট-রোগা যে হ'তে হবে, তা নয়, তবে একটু পিট্‌পিটে, একটু খিট্‌খিটে, একটু গরম মেজাজ হ'লে বোঁ থাকে ভাল, নৈলে মাথার চ'ড়ে বসে! দেখতে পাও না? আমরা যে কুকুর-বেরাল পুঁবি, তাদের কেবল ছুধ-ভাত খাইরে বিছানার শুইরে রাখলে কামড়াতে আসে। আর মধ্যে মধ্যে লাধি-ঝেঁটা মারলে কেমন পোষ মানে।

শরৎ। দাদামহাশয়, মেয়েমানুষকে বাহারী কুকুর-বেড়ালের মত দেখে, তাহার

সেইরূপে পোষ মানায়, আর বাহারী মেয়ে-মানুষকে সন্মানের বোঁগা বলিরা মনে করে, তাহার অন্তরূপে পোষ মানায়।

দাদা। ঐ! কালেক্জের ছেলের বুলিই ঐ! ওরে, সম্মান কি রে? সম্মানে কি কাজ পাওয়া যায়, না সম্মানে পেট ভরে? কাজ আদায় করা চাই, তবে ত সংসার চলে! বলি, ঐ ঘোবালের পো যে ও পাড়ায় থাকে, তাকে তুমি জান?

শরৎ। জানি।

দাদা। ঘোবালের পো কেমন পাকা ছেলে। কেমন বোঁকে তৈয়ের করেছে! ঠিক যেন ময়না পাখী পড়িয়েছে, ঘোবালের পো বা হুকুম দিবে, বোঁমা চুঁ শব্দ না করে তাই করবে! বোঁকে ত এমন তৈয়ের করে নি! মাঘমাসের শীতে দেখিছি, কাঁপতে কাঁপতে ঠাটা রান্ধির সময় ঘাটে ব'সে বাসন মাজছে, আর চৈত্রমাসের ঠিক দুই-প্রহরের রোদে দেখিছি, এক কোলে ছেলে, এক কোলে কলসী করে পুকুর-ঘাটে দশবার উঠা-নামা করছে! স্বামীর নাওয়া খাওয়া হ'লে, ছেলেরা ছুই প্রহরের বেলা ঘুমালে, তবে বোঁমা স্নান করতে পার, মুখে একটু জল দিতে পার। একে বলে হিন্দুর বাড়ীর বোঁ! ঘোবালের পো কেমন বোঁ তৈয়ের করেছে! মুখফুটে বোঁমা একটি কথা কহিতে পারি?

শরৎ। দাদামহাশয়, বোঁকে ঐ প্রকারে তৈয়ার করা কি ভাল? তাহাতে কি স্ত্রী সুখে থাকে, না স্বামী সুখে থাকে?

দাদা। মেয়েমানুষের আবার সুখ কি? পুরুষের লাধি-ঝেঁটা খেলেই তার সুখ! আর এমন করে বোঁটিকে তৈয়ের করলে পুরুষের কেমন সুখটুকু হয় বল দেখি ভান্স? ঘোবালের পো ঘুম থেকে উঠে

উঠতে পেরে হুটুই বসে, বেড়িয়ে না পানতে আনতে বোমা পাঁচোয়ার জল নিয়ে হানির, পান না হ'তে হ'তে গরুর ডাঙ প্রস্তুত। একটু একটু ওদিক্‌ তোক দেখি, একটু খেরন খায়াল হোক দেখি। আঁচাবার পর পান আনতে একটু দেরি হোক দেখি, আহারের পর বিছানা প্রস্তুত হ'তে একটু বিলম্ব হোক দেখি, বোমা সেদিন সমস্ত দিন চৌক পুকুরের প্রশংসা শুনেল, তাঁর সেদিন ভাত খেতে হবে না। সেদিন বোমার না কি শরীরটা খায়াল ছিল, র'থতে একটু দেরি হয়েছিল, খোবার পো গলা নাড়া দিয়া বল্লেন, বোয়ের যদি বাড়ীর কাজ একলা করতে এতই কষ্ট হল, তা হ'লে আর একটি বো আনাবার ব্যবস্থা করতে হবে। কথাটা শুনে বোমা না কি আছাড় খেয়ে কেঁদেছিল, তার পর দিন ৪টা রাজির সময় রান্না চড়িয়ে দিয়েছিল। জানলে ভায়া, এই রকম করে বো তৈয়ের করে। আনাদের হিন্দুধর্মের রীতি এই, ভোমরা কালেকের ছেলে, এ সব রীতি কি জানবে?

শরৎ। তা দাদামহাশয়, খোবাল মহাশয়ের স্ত্রী ছুই ছেলেকে লইয়া এরূপ খামীর কাজ করিয়া উঠিতে পারেন?

দাদা। পারা পারি আবার কি? কাজ করতেই হবে। শুনেছি না কি বোমা ইদানীং বড় কাহিল হয়ে পড়েছে। পুকুর থেকে জল তুলতে সেদিন আছাড় খেয়ে পড়েছিল, সিঁড়িতে উঠতে ইপা পায়, একদিন না কি র'থতে র'থতে মুছাঁ গিয়েছিল। তবু ত কাজ বন্ধ হবার যো নেই। খোবালের পো না কি বলছে, এক বো ময়ূলে আর এক বো হবে, কিন্তু ঠিক সময়ে

গরম হুটুই বসে হবে না। শুনেছি না কি এ বোটা বড় অধিক দিন টিকবে না; খোবালের পো পোপনে না কি একটু ওদিক্‌ বটকী পাঠাচ্ছে। খোবালের পো পাকা ছেলে, যদি এ বোটি যত্নে, ছয় মাসের মধ্যে আবার নতুন বোটি তৈয়ারি করে নেবে।

শরৎ দাদামহাশয়ের সঙ্গে একটু মিঠা লাগ করিতে আসিয়াছিলেন, শোণ করিতে আটসেন নাই, কিন্তু খোবা নারী কথা শুনিয়া পোপনে বর বর করিয়া অশ্রুজল বোচন করিলেন। সে মেয়েটিকে বাংলাকাল হইতে আনিতেন, ছেলেবেলা একজু খেলা করিয়াছেন, তাহার বিবাহ হওয়া দেখিয়াছেন, কবে তাহার দুইটি সন্তান তওয়ার কথা শুনিয়াছেন। তাহার পর শরৎ বিদেশে ছিলেন, অল্প কথা বিশেষ শুনিতে পান নাই। ছুই বৎসরের পর গ্রামে আসিয়া এ সমস্ত কথা শুনিয়া শরতের মনে আঁর ব্যথা লাগিল, অনেকক্ষণ চুপ করিয়া হলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, “দাদামহাশয়, নারীর অসম্মান করা ও নারীকে বাতনা দেওয়া হিন্দুধর্মও নহে, হিন্দু-আচারও নহে। আজকালকার স্বার্থপর লোকে স্বার্থপরতা অবলম্বন করিতে চাহিলে হিন্দুধর্মের দোহাই দেয়,—প্রবঞ্চকেরা প্রবঞ্চনা করিতে চাহিলে দেশীয় আচারের দোহাই দেয়,—ক্ষয়শূন্য লোকে স্ত্রী-পরিবারের প্রতি নৃশংস আচরণ করিয়া স্বার্থ-রীতির দোহাই দেয়। দাদামহাশয়, বাহারা স্বার্থসাধনের জন্য দেশীয় আচারের দোহাই দেয়, বিলাসী হইয়া ধর্মশাস্ত্রের দোহাই দেয় এবং আত্ম-স্বার্থের জন্য কীর্ণ, চুরি, বহুশ্রমক্ৰীড়া, বহুদুঃখ-ভাগিনী নারীর প্রতি নির্দয় হয়—তাহার স্বার্থও নহে, হিন্দুও নহে, তাহাদের স্পর্শ

করিলে ধর্মপরায়ণ হিন্দুদিগের আতি বার।
 আর্থগরতা, প্রবন্ধতা ও নির্ভরতা হিন্দু-
 আচার নহে,—প্রকৃত হিন্দু-ধর্ম উদার, মহৎ
 ও নিঃস্বার্থ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—:—:—

সনাতনবাটার জমিদারবংশ।

ভালপুরের অনতিদূরে সনাতনবাটা
 নামে একটি বড় গ্রাম ছিল। তথায় এক-
 কালে সহস্র ঘর লোকের বাস ছিল, কিন্তু
 বর্জমানের ম্যালেরিয়া-অরে গ্রাম উৎসন্ন হইয়া
 গিয়াছে। এখনও তথায় পাঁচ ছয় শত
 লোকের বাস আছে, তাহার মধ্যে প্রায় এক
 শত ঘর শুদ্ধলোক, কয়েক ঘর কলু, ময়রা,
 কামার, কুমার, তাঁতি প্রভৃতি ব্যবসায়ী
 লোক, আর অবশিষ্ট চাষী প্রজা। প্রাত্যহ
 প্রাতঃকালে গ্রামে বাজার বসিত এবং চারি-
 দিক্ হইতে মাছ, তরিতরকারী বিক্রয় হইতে
 আসিত। তত্তির কয়েকখানি স্থায়ী দোকান
 ছিল। একটি ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রায় ৭০৮০
 জন ছেলে পড়িত, তাহা ভিন্ন বড়
 পাঠশালার ব্যবসায়ী ও ইত্তরলোকদিগের
 প্রায় এক শত ছেলে পড়িত।

সনাতনবাটার জমিদার মুখোপাধ্যায়বংশ
 পুরাতন ঘর, পাঁচ ছয় পুরুষ হইতে তাঁহাদের
 জমিদারী, এবং বংশটিও বিপুল হইয়াছে।
 প্রাচীন জমিদার-বংশে যেমন হইয়া থাকে,
 ঘুরিকে ঘুরিকে অনেক মামলা-মোকদ্দমা
 হইয়া গিয়াছে এবং এখনও চলিতেছে।
 কোন কোন অংশীদিগের মধ্যে কেহ কেহ
 একেবারে নিঃস্বয় হইয়া গ্রাম ছাড়িয়া

বর্জমান বা কলিকাতার চাকরী লইয়াছেন।
 কোন কোন সরিক দরিদ্র হইয়াও কোন-
 একারে সাধক উদ্ভাসনে এখনও জমিদার
 নামটা বজায় রাখিয়াছেন। আবার কোন
 কোন তরক এখনও বেশ সজ্জতিপর আছেন,
 আর বখেই আছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে
 মামলা-মোকদ্দমাও চলিতেছে।

বংশের বৈরাগ্য অবস্থা, পুরাতন জমিদার-
 বাড়ীরও সেই অবস্থা। প্রকাণ্ড হাতার
 মধ্যে অতি প্রাচীন ইয়ারত, কোথাও ভাঙিয়া
 গড়িয়াছে, কোথাও বা নূতন মেরামত করা
 হইয়াছে। প্রাচীন সিংহদ্বার এখন সিংহ-
 শুল্ক, প্রাচীন উদ্যান এখন জঙ্গল, প্রাচীন
 শিড়কীর পুরুষিণী সরিকী, অতএব পানার
 পরিপূর্ণ।

এজমালির বাড়ীতে কেহ বড় টাকা খরচ
 করিয়া সংস্কার করেন না, কিন্তু সজ্জতিপর
 অংশিগণ স্থানে স্থানে নূতন দালান তুলিয়া-
 ছেন। বাঁহার বৈরাগ্য ক্রমতা, তিনি সেই-
 রূপ গৃহ-সংস্কার বা নূতন প্রস্তত করিয়াছেন।
 কোন গৃহ অতি সামান্য, আবার সজ্জতিপর,
 কোন অংশীর নব্য-গৃহ প্রাসাদতুল্য শোভা
 পাইতেছে।

এইরূপ সনাতনবাটার জমিদারী-আবাস
 অনেক পুরুষের সৃষ্টি, অনেক ধাঁচার নিশ্চিত,
 অনেক অবস্থার পরিণত। কিন্তু তথাপি
 সেই বিস্তীর্ণ আবাসস্থান, সনাতনবাটার
 জমিদার-ঘর বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং সেই বিস্তীর্ণ
 আবাসে বাসিগণ, কি ধনী, কি দরিদ্র,
 সনাতনবাটার জমিদারবংশীর বলিয়া মর্যাদা
 প্রাপ্ত হইতেন। ছেলে-মেয়ে লইয়া প্রায়
 শতাধিক লোক সেই বিস্তীর্ণ জমিদার-
 বাড়ীতে বাস করিতেন, কেহ বা পুরাতন
 এজমালী বাড়ীর ভগ্ন ঘরে, কেহ নূতন
 নিশ্চিত প্রাসাদে। কেহ বা রাজার তুল্য

আর ভোগ করিতেন, কেহ না প্রকার উপর উৎপাত করিয়া চালের কুমড়াটি কাড়িয়া আনিতে তবে গৃহিণী রান্না প্রস্তুত করিতেন। কোন গৃহিণী নিজ হাতে খিড়কীর পান্য-পুষ্করীতে বাসন যাজিতেন, আর কেহ অন্যর বাহুল্যের হীরকখচিত বলয় ও কঙ্কণ ধারণ করিয়া কর্তার মন আকর্ষণ করিতেন। সকলেরই দেশবিদেশে সনাতনবাটীর জমিদারবংশীর বলিয়া মান-সম্মান আছে।

এই বহুজাতিপূর্ণ বাড়ীর মধ্যে কামিনী-কান্ত মুখোপাধ্যায়ই আজ প্রধান বলিতে হইবে। তাঁহার পিতা বড় বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, ছলে, বলে বা কৌশলে ভর দেখাইয়া, ঠকাইয়া বা অর্থ হারা ক্রম করিয়া অনেক ক্ষুদ্র অংশ নিজের হস্তগত করিলেন ও অবশেষে সমস্ত জমিদারীর চারি আনা অংশের মালিক হইলেন। কামিনীকান্ত-বাবু নিজ বুদ্ধি ও প্রতিভাবলে আর তিন আনা বাড়াইলেন, সুতরাং তাঁহাকে সাত আনার জমিদার বলিত। তাঁহার পিতা তাঁহাকে কলিকাতায় লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন, —লেখা-পড়া ধনাঢ্য জমিদারের বেক্রপ হয়, সেইরূপই হইল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার বাবুগিরি শিখিলেন। পিতার মৃত্যুর পর কামিনীকান্ত-বাবু নিজের অংশের অট্টালিকা ভাঙ্গ করিয়া সাজাইলেন, বাড়ি, গঠন, দেয়ালপিরি, পাখা, স্বর্ণ-প্রস্তরের টেবিল, সোফা, চৌকি, কাপেট প্রভৃতি নানা উপকরণদ্রব্য নব্য জমিদারের ঘর আগে করিল। সম্মুখে একটি বাগান করিলেন, মধ্যে পুষ্করী, চারিদিকে মঞ্চ-প্রস্তরের মূর্তি। বাগানে একটি নাচঘর নির্মাণ করিলেন, তাহাতে কখন কখন সাহেবদের খালা দিতেন, কখন বা কলিকাতা হইতে বাই আনিয়া বাইনচ দিতেন। কলিকাতার তাঁহার

দরবার বাড়ারাত ছিল এবং কতিকাতার মনস্তা বহুসংখ্য কখন কখন তাঁহার ইচ্ছাপূরীতে আসিয়া বসন্তুখ ভোগ করিতেন।

কামিনীকান্ত-বাবুর দোদীও প্রতাপ। প্রজাগণ তাঁহার নাম শুনিতে কাঁপে, ক্ষুদ্র অশ্লিষণ তাঁহার অত্যাচার বহন করেন, দরিদ্রা অশ্লিষণ তাঁহার দ্বারা অবমানিত হইলে ঘরে গিয়া কাঁদেন, জমিদারবাড়ীর ছেলে-যেদেরা তাঁহাকে দেখিলে পলায়। সাহেব-সুবেদারের নিকট তাঁহার বখেই নাম, পুলিশ তাঁহাকে বখেই ভর করে, তাঁহার বাড়ীতে একটা ঘটন। হইলে শীঘ্র বেসে না। গ্রামের বুড়ো লোক বলিত, অনেক বৎসর পূর্বে একটা হাকামা হইয়া জমিদারদের বংশেরই একটা ছেলে খুন হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু লাসও পাওয়া গেল না, পুলিশ কোন কিনারাও করিতে পারিল না। আধ্যাতিক-বিবৃতসময়ে কামিনীকান্ত-বাবুর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স, কিন্তু এখনও বৌবনের তেজ ও প্রতাপ কমে নাই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

জটাধারী।

একদিন সন্ধ্যার সময় কামিনীকান্ত-বাবু একাকী উজানে পাইচারি করিতেছেন, এমন সময় সহসা একজন দীর্ঘকায় জটাধারী সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। জটাধারী কামিনীবাবুকে আশীর্বাদ করিলেন, পরে জমিদারের প্রাসাদ, উজান, নাচঘর প্রভৃতি চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

কামিনী-বাবু। আপনি কে?

রমাশ্রম। আমি বিজ্ঞানী নই। কালীধারে ও ভক্তভক্ত হানে বহু বৎসরকালি শাস্ত্রাধি অধ্যয়ন করিয়াছি, অথবা এই পুস্তিকে লইয়া বঙ্গদেশে উপনীত হইয়াছি। নাম রমাশ্রমাদ সরস্বতী।

কামিনী-বাবু। এ গ্রামে কবে আসা হইল? এখানে কি উদ্দেশ্য?

রমাশ্রম। এ গ্রামে অসুস্থ আসিয়াছি, সনাতনবাগীতে কিছুদিন থাকিয়া শিষ্যদিগকে শাস্ত্রাধি পাঠ করাইব, আপাততঃ এই উদ্দেশ্য। শুনিলাম, এই বিত্তীর্ণ জমীদার-গৃহে অনেক অতিথি আশ্রয় লাভ করে, অতএব আপনার যদি অস্থমতি হয়, আমিও একটা ভগ্ন ঘরে আশ্রয় লইয়া কিছুদিন বিশ্রাম করি।

কামিনী-বাবু। আপনার এ প্রস্তাবে আমি সন্মানিত হইলাম। শাস্ত্রব্যবসারী-দ্বীগকে আশ্রয়দান করা ও সমাদর করা আমাদের বংশের রীতি।

রমাশ্রম। আপনার স্বর্গীয় পিতা শাস্ত্রজ্ঞদিগের বিশেষ সমাদর করিতেন।

কামিনী-বাবু। আপনি আমার স্বর্গীয় পিতাকে জানিতেন?

রমাশ্রম। তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া সম্ভ্রান্ত করিতেন, কালীধারেও সে ক্রিরাবান্ জমীদারের নাম অনবগত ছিল না।

কামিনী-বাবু। আপনার কথার বড় আশঙ্কলাভ করিলাম। আপনি যখন এ গ্রামে আসিয়াছেন, ভরসা করি, কিছুদিন অবস্থান করিয়া এ গৃহ পরিভ্রম করিবেন।

রমাশ্রম। অবস্থান করিবার মানসেই আসিয়াছি। এক্ষণে আপনার অস্থগ্রহ।

কামিনী-বাবু। ইচ্ছামত ঘর বাছিয়া লউন, সপুত্র অবস্থান করুন, তাহাতে আমি

অস্বস্তিতে হইব। আমার একজন কৃত্য আপনায় আবশ্যকীয় বোধাইবে।

রমাশ্রম ও তাঁহার পুত্র দেবীশ্রম। সেই বিত্তীর্ণ অষ্টাধিকার নীচের একটি ভগ্ন ঘরে আশ্রয় লইলেন। সন্ধ্যার সময় কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া ভূমিতে কথন বিছাইয়া শয়ন করিলেন।

পরদিন প্রাতে জমীদার-বাড়ীর সকলে শুনিল, পশ্চিমদেশ হইতে একজন বড় সাধু আসিয়াছেন। বাবুগণ একে একে আসিয়া সাধুর সহিত হু-চারিটি কথা কহিলেন, মেরেরা ষিড়কীর পুত্র হইতে আসিবার সময় কলসী কাকে করিয়া কণেক পাড়াইয়া জটাধারীকে দেখিয়া গেল, ছেলেগুলো উৎকি-বু কি মারিয়া পলাইয়া গেল। হুই একদিন পর আর কেহ বড় দেখিতে আসিল না, মেরেরা বলাবলি করিত, “ও সাধুও নয় সন্ন্যাসীও নয় নো, ও হাত দেখতেও জানে না। কেবল পশ্চিমে একটা পণ্ডিত, একটা টোল খুলবে বুঝি, তাই এসেছে। দিন-রাতই পুঁথি পড়ে, আর ছেলেটাকে পুঁথি পড়ার। আহা, ছেলেটি যেন সোনার চাঁদ।”

জমীদার-বংশের মধ্যে বোংমাঙ্গ নামেই একজন বরফা বিধবা ছিলেন, তিনি পণ্ডিত-ঠাকুরকে জলটল আনিয়া দিতেন, একটু সেবা-সুক্রবাও করিতেন। বোংমাঙ্গার ছেলে-বেলায় বড় ঘটায় এই জমীদার-ঘরে বিবাহ হইয়াছিল, কেন না, তাঁহার স্বস্তর এই জমীদারীর একজন প্রধান অংশীদার ছিলেন। শুনা যায়, তাঁহার বিবাহের পরই স্বস্তরের মৃত্যু হয়, হতভাগিনীর স্বামীও অচিরে মারা যায়,—অনাথা বিধবার বধাসর্ব্ব অস্ত অংশীদারগণ দখল করিয়া লইলেন। সেই অবধি বিধবা বিত্তীর্ণ স্বস্তরকুলে অস্ততমা দাসীর ভায় শোকে হুখে বাস করিতেন। হু-বেলা

হুগোইট বসিয়ে পাইকজন, দুপ করিয়া পরের
গন্ধনা শুনিতে, যে কখন বলিত, তখনই
জাহার করা আনিয়া, বাসন মাঝিরা, ঘর
কাটিয়া বিক্রেতা। ইহাশ্রমণার গ্রিৎ
বৎসর এইরূপে কাটাষ্টাইছেন,—খরীদখানি
কিছু, কিন্তু কখন যুগ্মী এখনও অপনীত হয়
নাই। চকু দুটি কোমল ও শান্ত, বাহুলতা
কিন্তু হইলেও এখনও লাবণ্যমুগ্ধ নহে, সমস্ত
অবস্থানে এখনও উজ্জ্বলশোভিত মাধুর্য্য বিবাহ
করিতেছে। ত্রিশৎ বৎসর কষ্টে কাটাষ্টাই-
ছেন, আর কয়েক বৎসর এইরূপে কাটাষ্টাইরা
সংসার-দুঃখ হইতে মুক্তি পাইবেন, মনে মনে
এই আশা করিতেন এবং ভগবানের নাম
লইতেন।

যে দিন সন্ধ্যার সময় সরস্বতী ঠাকুর সেই
জাহার-পূহে আচ্ছন্ন লইলেন, সেই দিনই
বোগমায়া ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছিলেন।
ঠাকুরের সময়, শান্ত, উন্নত বৃত্তি দেখিয়া,
বালক বোম্বাইপ্রসাদের উজ্জল, প্রশান্ত, তেজঃ-
পূর্ণ মুখখানি দেখিয়া বিস্ময়ের ক্রমে হারার
উন্নত হইল। বোগমায়া ঠাকুরের ঘরটি
খাট দিয়া পরিষ্কার করিয়া দিলেন, জল
আনিয়া দিলেন, আবস্তকীয় সমস্ত আরোজন
করিয়া দিলেন। ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া
সেই কীণকার্য্য হুঃখিনীর দিকে দেখিলেন,
চকুর একবিম্ব জল হুঃখিলেন, শেষে বলিলেন,
“ভগ্নে! তোমার মনটি বরিত্রের প্রতি সময়,
তুমি আমার অনেক সেবা করিলে, ভগবান
তোমার উপকার করিবেন। জীবনে
অনেক কষ্ট পাইয়াছ, কিন্তু তোমার কষ্ট
অবসান হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু হুঃখিনি
প্রভাত হইবে।”

সেই অবধি বোগমায়াই সরস্বতী ঠাকু-
রের গুপ্তদ্বারা করিতেন, সমস্ত আরোজন
করিয়া দিতেন। ঠাকুর নিজেই পাক করি-

তেন, যাক্রিকে পিতা-পুত্র কখন পাত্তিরা
তাইতেন,—অল্প বিধানা ব্যবহার করিতেন
না।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ।

শাস্ত্রপ্রচার।

অল্পদিনের মধ্যে সন্ধ্যারপাটী ও চকু-
দ্বিকৃৎ অনেক গ্রামে রম্যপ্রসাদ সরস্বতীর
নাম প্রকাশ হইল। তিনি বোগী সন্ন্যাসী
নহেন, হাত দেখেন না, যাহু করেন না,
কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পা র
দর্শিতা, শাস্ত্রপ্রচারে আনন্দনীর উৎসাহ,
শাস্ত্রব্যাক্য্যার অনিরুদ্ধচরিত্র কমতা গ্রামে গ্রামে
প্রকাশ পাইল। প্রাতঃকালে দ্বান করিবার
সময় উন্নতস্থরে তিনি যখন বেরগান করি-
তেন, নারীগণ কলস নামাইয়া তাঁহাকে
কোন দেবের অবতার বলিয়া প্রণাম করিয়া
হাইত। মধ্যাহ্নে বৃক্ষতলে শিব্য পরিবেষ্টিত
হইয়া যখন উপনিষদের অনন্ত চিন্তা ও
অনন্ত ভাবের ব্যাখ্যা করিতেন, বিভাগের
বালকগণ নিজ নিজ পাঠ ছাড়িয়া তাঁহার
কথা শুনিতে আসিত। আর সন্ধ্যার সময়
নিজ ভগ্ন আবালা, যখন মহাভারতের বা
রামায়ণের বা পুরাণের শিকাপ্রদ উপাখ্যান-
গুলি বলিতেন, গ্রামের বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত ও
মুগ্ধগুণও সেই অমৃতধারা পান করিয়া
জীবনের পাপক্ষণন করিত, জীবনের সারৎ-
কাল পবিত্র করিত।

চারিদিকে গ্রামের লোক যে দিন
অবসর পাইত, ঠাকুরের অমৃতকথা শুনিতে
আসিত। যেমত প্রারম্ভ সন্ধ্যার সময় ভাল-

পুত্র হইতে আসিলেন, অবশেষে শরৎ বাটা আসিলেন তাঁহাকেও একদিন সন্ধ্যার সময় সনাতনবাটিতে হইয়া আসিলেন।

সরস্বতী ঠাকুর নিজ আবাসের সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষতলে কখন বিছাইয়া বসিয়াছেন, তাঁহার চারিদিকে তাঁহার করেকজন শিষ্য ও বন্ধুগণ বসিয়া শাস্ত্রকথা শুনিতেছেন। প্রথমে দুই একটি বেদগান গাইলেন, শিষ্যগণ বাহারা বাহারা গাইতে জানিত, গুরু সহিত তারতরে সেই অনন্ত গীত গাইয়া নৈশ আকাশ সজাতে পূর্ণ করিল। গ্রামের গৃহে গৃহে সে শব্দ প্রবেশ করিল, বাতীর কোড়ে সুপ্ত বালক সে সঙ্গীত শুনিয়া নিদ্রাবশে হাসিল।

তাঁহার পর উপনিষদব্যাখ্যা। উপনিষদের গভীর অর্থ কাশীধামে বৈরাগ্য শিক্ষা করিয়াছিলেন, উপনিষদের উপাস্ত পরব্রহ্মের স্বরূপ ও তত্ত্ব বৈরাগ্য জানিয়াছিলেন, উপনিষদের সারগর্ভ আখ্যানগুলির সরল অর্থবৈরাগ্য বৈরাগ্য বুঝিয়াছিলেন, সেইরূপ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। সত্যকাম উপাধ্যানের অর্থ, মাটিকৈতা উপাধ্যানের অর্থ, মৈত্রেয়ী উপাধ্যানের অর্থ,—ইত্যাদি নানারূপ উপাখ্যানকথার প্রারম্ভ এক প্রহর কাল অতিবাহিত হইল। প্রোত্বর্গ নিস্তক হইয়া সে অব্যতকথা স্তনিত লাগিল সে অব্যতকথা সকলের হৃদয় বর্জজ্ঞান ও পবিত্রভাবে প্রাণিত করিল।

তাঁহার পর সকলে একত্রিত হইয়া বেদের বিম্বকথা, উপনিষদের পরব্রহ্মকে স্তুতিবাদ করিলেন। স্তুতিবাদ সাজ হইল, বন্ধু বন্ধুকে, গুরু শিষ্যকে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া সভা-ভঙ্গ হইল।

পরচন্দ্র অনেককক্ষ পর্য্যন্ত বাক্যশূন্য হইয়া বসিয়া রহিলেন, শেষে উঠিয়া রম্যপ্রদানের পদগুলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন,

“গুরুদেব! আপনি আজ আমাকে যে শিক্ষা দিলেন, তাহা পিতৃগৃহে শিখি নাই, বিদ্যালয়ে শিখি নাই, কার্যক্ষেত্রে শিখি নাই। আমার দেহ এরূপ শাস্ত্র-কথা, নীতি-কথা থাকিতে আমার বিদেশীরসিগের নিকট পায়ের কাঁদানী হই। গুরুদেব! সাহসে দণ্ডারমান হউন, উৎসাহে অগ্রসর হউন, কৃতি ও অজ্ঞান-ভিমির তিরোহিত করিয়া আমাদের সনাতনধর্ম প্রকাশ করুন, সনাতন শাস্ত্র প্রচার করুন, সনাতন নীতি-শিক্ষা দান করুন। পুরুষসিংহ! আপনার এ উত্তম সার্থক হইবে, হুম্বু কু-প্রাণ-পীড়িত জাতি আপনার সজীবনী কথার জীবন পাইয়া পুনরুত্থান করিবে।”

স্বকের উৎসাহ দেখিয়া সরস্বতী ঠাকুরের চক্ষে জল আসিল। তিনি শরৎকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “শরৎ! তুমি আমাকে চিন না,—আমি তোমাকে চিনি। তোমার কার্যকলাপ আমি জানি। তোমার উৎসাহ ও উত্তম আমি জানি। তোমাদের স্তার লোক থাকিলে আমাদের ব্রহ্মদেশের মঙ্গল।”

তৎপরে সরস্বতী ঠাকুর হেম ও শরৎকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার ঘরের ভিতর লইয়া গেলেন।

ঠাকুরের ভগ্ন ধরটি যোগমায়া পরিচার্য করিতেছিলেন,—বাহিরের দুইজন লোক দেখিয়া যোগমায়া সরিয়া গেলেন। সরস্বতী ঠাকুর বলিলেন, “ভগ্নে যোগমায়া, সরিয়া বাট-বার আবৃত্তক নাই। হেম-বাবু ও শরৎ-বাবু আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাধরূপ,—অল্পদিনমধ্যে তুমিও ইহাদিগকে চিনিবে। আজ উইয়া আমার এইখানেই কিঞ্চিৎ আহার করিবেন, তিনটি পাত কর।” যোগমায়া সেইরূপই করিলেন।

পবিত্র শাস্ত্রের পরিচয়।

শাস্ত্রশিক্ষা।

শরৎ। আজ আমাদের শাস্ত্রশিক্ষা।
তুমি আমাদের জন্যে নতুন আশার সঞ্চার
হইল। এই নতুন শিক্ষা কবে এ দেশে প্রচ-
লিত হইবে?

শরৎ। শরচ্চন্দ্র! এ শিক্ষা নতুন নহে,
আমাদের শাস্ত্র বহু দিনকার, বেদ বহু দিন-
কার, এ শিক্ষা তত্ত্ব দিনের। তবে আধুনিক
কালে জনসাধারণের অজ্ঞানতাবশতঃ তাহারা
এ পবিত্র প্রথা হারাইয়াছে, ভ্রান্ত হইয়া
কুশল অবলম্বন করিয়াছে। তুমি যদি বায়া-
দগী নগরে কখন বাও, বিশেষর-মন্দিরে
বাইও, দেখিবে, তথায় শাস্ত্র পণ্ডিতগণ
এখনও বেদপাঠ করেন, সে পবিত্রীকৃত
তুলিলে পাণমোচন হয়, সুকৃতিলাভ হয়।

শরৎ। আমি কান্ধিতে কখনও বাই নাই,
কিন্তু তুমি যদি, তথায় এখনও বেদবেদান্তের
চর্চা আছে। কিন্তু সে কয় জনের মধ্যে?
প্রকৃত শাস্ত্রকথা আমাদের দেশে কয় জন
জানে?

শরৎ। অতি অল্পই বটে এবং সেই
তত্ত্বই আমাদের প্রাচীন আচার-ব্যবহার,
ধর্ম ও নীতি, সকলই বিকৃত রূপ ধারণ করি-
য়াছে। শরৎ, তুমি ত ভিন্ন ভিন্ন দেশের
ইতিহাস অবগত আছ, তুমি কি জান না যে,
জনসাধারণ অজ্ঞান ও অর্থহীন হইয়া থাকিলে
কোন্সাচার বিকৃত হইয়া যায়? তুমি কি জান
না যে, জ্ঞানের আলোক বিকাশ পাইলে
তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে রীতি ও দেশাচারের
পুনঃসংস্কার হয়?

শরৎ। শরৎ! ঠাকুর! তাহা আমি
জানি, কারণে একরূপ অনেকবার বলিয়াছি।

কিন্তু আমাদের দেশে কি সেটি ঘটবে?
আমাদের দেশে কে প্রকৃত শাস্ত্র-প্রচার
করিবে? বাহ্যিক শাস্ত্রজ্ঞ, বাহ্যিক শিক্ষা-
ইষ্ট শিক্ষাইতে পারেন, তাঁহারাও আর্থের
জন্যে সেগুলি বর্জ্য করেন। হতভাগ্য
দেশে কি পুণ্যের শাস্ত্রজ্ঞান-প্রকাশের উপায়
আছে?

শরৎ। শরৎ, বাহ্যিক শাস্ত্রজ্ঞ, তাঁহারা
স্বার্থপর নহেন, তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞান গোপন
করেন না। শাস্ত্রজ্ঞ রাজা রামমোহন রায়
প্রথমে উপনিষৎগুলি অনুবাদ করিয়া বঙ্গ-
বাসীদিগের হস্তে অর্পণ করেন। শাস্ত্রজ্ঞ
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমুদ্রতুল্য শাস্ত্রময়ন
করিয়া সমাজ-সংস্কারে পবিত্র জীবন অতি-
বাহিত করেন। তুমি যদি, এখনও মলিকাতার
শাস্ত্রজ্ঞ বসন্তচন্দ্র মহাভারতে পুণ্যকথার
অনেকগুলিকে উদ্ধার শিক তেছেন।
শরচ্চন্দ্র! ইহাদের উপদেশ, ইহাদের কার্য,
ইহাদের চেষ্টা ফলপ্রসবিনী হইবে, বঙ্গ-
সমাজ ইহাদের আহুত রত্নের উত্তরাধিকারী।
কিন্তু এরূপ অসাধারণ পণ্ডিতের কথা
ছাড়িয়া দাঁও, শাস্ত্র প্রকাশ করা শিক্ষিত
লোকমাত্রেই কর্তব্য, যে যতটুকু পারে,
তাঁহার সেইটুকু করা কর্তব্য। কে শাস্ত্র
প্রকাশ করিবে জিজ্ঞাসা করিতেছ? শরৎ!
তুমি প্রকাশ করিবে, আমি প্রকাশ করিব,
হেম-বাবু প্রকাশ করিবেন, যে দেশাতুরাগী,
সে যতটুকু পারে, প্রকাশ করিবে। এইরূপে
দেশে দেশে প্রকৃত শাস্ত্রশিক্ষা প্রচার হইবে,
অজ্ঞান তিরোহিত হইবে, কু-রীতি কু-প্রথা
উন্মীয়া যাইবে। উৎসাহী উত্তমশীল যুবক,
তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, এ কার্য কাহার
দ্বারা সম্পাদিত হইবে? সৈন্যদের সৈনিক-
পুত্রক যুদ্ধসময়ে জিজ্ঞাসা করে, কে বিজয়লাভ
করিবে?—অগ্রসর হও, আমরাই জয়লাভ

করিব! এ কারো রাজার ঘর চাহিয়া থাকিব না, রাজপুরুষদিগের ইহাতে অধিকার নাই—কষড়াও নাই,—হিন্দুদিগের মধ্যে শাস্ত্র-প্রচার হিন্দুদিগেরই করিবে।

শরৎ। আপনার বুঝে পুণ্যচন্দ্র ন পড়ুক, আপনার কথা সকল হউক। কিন্তু এ যুদ্ধে আপনার মত কর জন বোগদান করিবেন? তিন জন শাস্ত্রজ ব্রাহ্মণের নাম করিয়াছেন, তাঁহারা শাস্ত্রশিক্ষা প্রচার করিয়াছেন, হিন্দু-জাতির ঐক্যসাধনে, উন্নতিসাধনে যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু কত সহস্র সহস্র শাস্ত্রজ পণ্ডিত স্বার্থসাধনার্থ শাস্ত্রজ্ঞান একচেটিয়া করিয়া রাখেন, নিজ প্রভু বজার রাখিবার জন্য হিন্দু-জাতিকে অবনত ও বিভিন্ন ও দুর্বল রাখিবার প্রয়াস পান।

সরস্বতী। শরৎ, তুমি শিক্ষিত, তুমি ইতিহাসজ্ঞ, তুমি কি জান না যে, স্বার্থ-পরদিগের প্রয়াস তাহাদিগের জীবনের সহিত নীল হয়, নিঃস্বার্থ মহাবীর চেষ্টা ফলপ্রসবিন? নিঃস্বার্থ বুদ্ধ-দেবের উত্তমফল অজ্ঞাবধি জগৎ-সংসারে দেখা পায়মান, যে স্বার্থপর লোকে তাঁহার প্রতিরোধ করিয়াছিল, তাহারা কোথায়, তাহাদিগের কর্মফল কোথায়? ইউরোপে নিঃস্বার্থ লুণ্ঠের চেষ্টা ফলপ্রসবিনী হই-
রাছে, যে সহস্র সহস্র পুরোহিত তাঁহার প্রতিরোধ করিয়াছিল, তাহাদিগকে কে জানে? ক্ষুদ্র জঘন পতঙ্গরাশির দ্বারা ক্ষুদ্র স্বার্থপর লোকের চেষ্টা কালের করাল দ্বারে বিলীন হইয়া বাইবে—রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র ও বাসুদেবের চেষ্টা ফলপ্রসবিনী হইবে। তাঁহাদের চেষ্টার অবনত হিন্দুজাতি উন্নত হইবে, জাতিনির্ধিনেবে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিবে।

শরৎ। হিন্দুধর্ম জাতিনির্ধিনেবে এই শাস্ত্রশিক্ষা লাভ করে, এইরূপ আপনার উদ্দেশ্য?

সরস্বতী। হী শরৎ, সকল হিন্দুই শাস্ত্র-শিক্ষার অধিকার আছে, সকল হিন্দুই এ মহৎ শিক্ষা লাভ করুক, কলসাধারণের শিক্ষা ভিন্ন উন্নতির উপায়ান্তর নাই। পুরাকালে কত্বেদ বৈদ্য সকলেরই শাস্ত্রশিক্ষার অধিকার ছিল, এখন সেই কত্বেদ বৈদ্য জাহিয়া গোয়রা শত শত ভিন্ন জাতিতে পরিণত হই-
রাছে, তোমাদের পৈতৃক অধিকার কে কাড়িয়া লয়? প্রাচীন শাস্ত্রাহুসারে শূদ্র অর্থে অনার্য্য, যদি ভোমরা অনার্য্য হও, তাহা হইলে আমরা কি আর্য্য? আর তোমরা যদি আর্য্য হও, তোমরা যদি মিতসন্তান হও, তাহা হইলে আর্য্যশাস্ত্ররূপ পৈতৃক ধন কে তোমাদের নিকট কাড়িয়া লইতে পারে?

শরৎ। তবে এতদিন শাস্ত্রজ্ঞান কেবল ব্রাহ্মণগণ একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন কেন?

সরস্বতী। তোমরা কত্বেদ-বৈদ্য-সন্তান হইয়া নিজ পৈতৃক ধন তুলিয়াছিলে, এই জন্য ব্রাহ্মণেরা তোমাদের গচ্ছিত ধন রক্ষা করিয়াছেন! তোমরা যখন মৃত ছিলে, ব্রাহ্মণেরা জাগরিত থাকিয়া সে শাস্ত্রধন রক্ষা করিয়াছেন, তোমরা যখন বেদবেদান্ত তুলিলে, ব্রাহ্মণেরা সহস্র বৎসরের পর সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত সেই বেদবেদান্ত কণ্ঠস্থ করিয়া রক্ষা করিয়াছেন। স্বাধীনতার, পরাধীনতার, শোকে, সন্তাপে, ব্রাহ্মণেরা সে অমূল্য ধন রক্ষা করিয়াছেন। জ্ঞানপ্রদীপ যখন ভারত-
বর্ষে নির্বাপিত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণদ্বয়ের সে প্রদীপ নিঃশব্দ অধিনবর ভেঙ্গে জলিতেছিল, আধ্যাত্মিক, আধ্যাত্মিক যখন আধ্যাত্মিক

বিদ্যুৎ, বারানসিগের আশ্রয়স্থল অহুতানে
কেই রীতি ও ক্রিয়াকলাপ সীমিত ছিল।
এখন তোমরা পুরাতন নিয়ম হইতে উদ্ধার
করিয়াছ, শৈশবক বয়স তিরিয়ার, মানসে
অগ্রসর হইয়া সে ঘন অধিকার কর এবং যে
অন্যথা ইত্যর আভিসমূহ হিন্দুধর্ম ও সভ্যতা
গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগেরও ঐ শাস্ত্রঘন
দান করিয়া উন্নত কর।

শরৎ। আপনার মহৎ কথা শুনিয়া
আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল, উৎসাহে
পূর্ণ হইল। আপনার বাসনা পূর্ণ হউক।
সকল প্রদেশে সকল জাতীর হিন্দু যখন
একত্র হইয়া একই আচার্য্য পুরোহিতের
শিকার এক ঈশ্বরকে পূজা দান করিবে,
তখন আমরা ঐক্য পাইব, বল পাইব, সাহস
পাইব। ভগবন্! এ অপূর্ণ মন্ত্র আপনি
কোথা শিখিলেন, কে আপনাকে শিখাইল,
জানিতে বড় ইচ্ছা হয়। করেক মাস হইতে
আপনার ঐশ চারিদিকে ঞ্জত হইতেছে,
আমি অল্প আপনার পবিত্র কার্য্যের যে
পরিচয় পাইলাম, তাহাতে বিম্বিত হইরাছি।
সেই ক্ষম্ত ইচ্ছা হয়, আপনার পবিত্র জীবনের
ইতিহাস কিছু জানি।

সরস্বতী। শরৎ, আমার জীবনের ইতি-
হাস বৎসারাজ। যদি ক্রটি হয়, আহা রাস্তে
প্রবণ করিও।

বোগমারা তিনজনকার আহারের জন্ত
পাত পাতিয়া দিলেন, জল আনিয়া দিলেন,
এবং সমস্ত আরোজন করিয়া দিলেন। বালক
দেবীপ্রসাদ সামান্ত আহার গ্রহণত করিয়া-
ছিল, তাহা আনিয়া দিল। তিনজন আহারাদি
সমাপন করিলেন। বালকও পিতার পাতের
অবশিষ্ট কিছু আহার করিয়া পার্শ্বের ঘরে
পুস্তকপাঠে রত হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

রমাপ্রসাদের ইতিহাস।

“আমি বনাজের সন্তান ছিলাম, কিন্তু
অষ্টাদশ বৎসর বয়সের সময় একটি বিবম
সকটে পড়িয়া সমস্ত হারাইয়া তীর্থপর্যটন
করিতে বাই। অনেক স্থান দর্শন করিয়া
শেষে কাশীধামে বেদশিক্ষার জন্ত অনেক
বৎসরব্যধি অবস্থান করি।

“কাশীধামে অনেক ব্রহ্মপুত্র
আছেন, আমার গুরুদেব তাঁহাদের মধ্যে
প্রধান বলিয়া সকলেই স্বীকার করিতেন।
বেদপাঠ ও বেদশিক্ষাদান ভিন্ন তাঁহার অন্য
কাজ ছিল না, দেশ-বিদেশ হইতে—ব্রাহ্মণ,
মহারাষ্ট্র, রাজস্থান ও কাশ্মীর হইতে শিষ্যগণ
তাঁহার নিকটে বোনাধায়ন করিতে আসিত।
তিনি আমাকেও শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন,
তাঁহার নিজের অহুগ্রহে, আমার গুণে
নহে।

“নয় বৎসর ধরিয়া আমি তাঁহার নিকট
বোনাধায়ন করি। এই কালের মধ্যে কাশীর
অনেক বনাজ বণিক ও মহাজন, আমি
দরিদ্র, অনাথ, বিচার্য্য বলিয়া আমাকে দয়া
করিতেন। আমি অনেকের বাড়ী যাতায়াত
করিতাম, অনেকের নিকট পরিচিত হইলাম,
অনেকের অহুগ্রহভাজন হইলাম।

“পঞ্চাব-দেশীয় কৃপাল সিংহ নামে এক-
জন ক্ষত্রিয় কাশীতে সপরিবার বাস করি-
তেন এবং আমাকে নিজের সন্তানের জায়
ভালবাসিতেন। বিদ্যার্থীর প্রয়োজন অতি
অল্প, আমার প্রয়োজন বশতঃ নহে, তাঁহার
দয়া বশতঃই তিনি আমাকে অহুগ্রহ করি-
তেন। ব্রহ্মচারি-বেশে যখন তাঁহার আলয়ে
বাইতাম, তাঁহার গৃহিণী আমাকে পুত্রবৎ রত

করিতেন, আমিও তাঁহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতাম। তাঁহার ছোট ঘেরেরীও আমাকে বড় বড় করিত।

“কালক্রমে কৃপাল সিংহ সেই একমাত্র কস্তা-সন্তান রাখিয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তখন আমার পাঠ শেষ হইয়াছে, আমি নিজে একটি মঠ খুলিয়া কয়েক জন শিষ্য গ্রহণ করিলাম। কালীতে কৃপাল সিংহের আত্মীয় কেহ ছিল না। তাঁহার বিধবা আমার মঠে বাস করিতেন, তাঁহার অল্প বাণী সম্পত্তি ছিল, তাহা আমারই হস্তে অর্পণ করিলেন। এইরূপে আরও একবৎসর অতিবাহিত হইল।

কৃপাল সিংহের একমাত্র বালিকা আমাকে অতিশয় স্নেহ করিত, তাহার নিরাশ্রয় অবস্থা, শাস্ত্যুত্তি এবং অনির্ভরচরিত্র স্নেহ দেখিয়া আমারও তাহার প্রতি অহুরাগ জন্মিল। বালিকা যৌবনলক্ষণ প্রাপ্ত হইল, আমি মনের ভাব আর গোপন করিতে না পারিয়া সেই লাবণ্যময়ী সুলক্ষণা বালিকাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলাম। আমার বরাক্রমে তখন অষ্টাবিংশ বৎসর, বালিকার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর।”

সরস্বতী কণেক নিমন্ত্রণ করিলেন। শরচ্চন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি ব্রাহ্মণ-সন্তান, কস্ত্রিয়-বালিকাকে কিরূপে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন?”

সরস্বতী। শরৎ, এরূপ ক্রিয়া আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, নীতিবিরুদ্ধও নহে। এটি কি নীতিবহির্গত কাজ বলিয়া তোমার মনে হয়?

শরৎ। ভগবন্! আমি এ কার্য নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করি না। আমি নিজে বিধবাবিবাহ করিয়াছি; তাহা বোধ হয়, আপনি জানেন না।

সরস্বতী। শরৎ, সে কথা আমার অজান্তে নহে। তোমার মাতা ঠাকুরানীকে বিজ্ঞাসা করিও, রবীন্দ্রসান সরস্বতীই সে বিবাহে ব্যবস্থা দান করিয়াছিল। আমি কালীয়ার হইতে যথো যথো বন্ধনেশে আসিতাম। তোমাদের ইতিহাস কিছু কিছু অবগত আছি।

শরৎ বিস্মিত হইয়া রহিলেন, এরূপ প্রশ্ন সরস্বতী কে? সরস্বতী পুনরায় আপনার ইতিহাস বলিতে লাগিলেন।

“কৃপাল সিংহের বিধবা আমাকে ধর্ম-পরায়ণ শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া মনে করিতেন, আমি যখন এ বিবাহ ধর্মসম্বন্ধ বলিয়া তাঁহার নিকট বার বার উপদেষ্টা করিলাম, তখন তিনি অবশেষে সম্মত হইলেন। তাঁহার জ্ঞাতি-কুটুম্ব কালীতে এরূপ কেহ ছিল না যে, এ কার্যে আপত্তি করে। আমার বন্ধুবান্ধব আমাকে অনেক ভৎসনা করিলেন, আমার মঠ ভাঙ্গিয়া গেল, শেষে আমি নববধূ ও তাহার মাতাকে লইয়া কালী হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলাম; কিন্তু কার্য অস্তার বা শাস্ত্রবহির্গত বলিয়া আমার বোধ হয় না, হেম-বাবুর এ বিষয়ে কি মত, তাহা জানিতে বাসনা করি।”

হেমচন্দ্র। আপনি নিরাশ্রয় কস্ত্রিয়-বালিকাকে বিবাহ করিয়া আপনার দর, আপনাদের সাহস, আপনার ধর্মপ্রিয়তা দেখাইয়াছেন।

সরস্বতী। হেম-বাবু, তোমার ভ্রাতৃ আদর্শচরিত্র লোকের এইরূপ মত হওয়া সম্ভব। ভগিনী বিন্দুবাসিনী যখন অনাথা দরিদ্রা বালিকা ছিলেন, তুমি তাঁহাকে বিবাহ করিয়া নিজের দর, সাহস ও ধর্মপ্রিয়তা প্রদর্শন করিয়াছিলে। ভগিনী বিন্দুবাসিনীকে জিজ্ঞাসা করিও, তাঁহার বাস্তবস্থায় রম্য-

এসার সন্ন্যাসী তাঁহার হাত-পেরিমা পরিমাপ
বলিয়াছিল।

হেমচন্দ্র বিস্মিত হইয়া রহিলেন। বুঝা-
এসার সন্ন্যাসী কে?

কয়েক পর, সন্ন্যাসী আমার বলিলেন,
“হেমচন্দ্র! তুমিও অনাথা বালিকা বিবাহ
করিয়াছিলে, কিন্তু তিনি বজাতীরা,
আমার জ্ঞান অভজাতীরা বালিকা বিবাহ
করিলে কিছুমাত্র আশ্রয়াদি বোধ
করিতে না?”

হেঁ। কিছুমাত্র না।

সন্ন্যাসী। আশ্রয় কি পরিবারের মধ্যে
যদি কেহ ভিন্নজাতির সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ
স্থাপন করে, তাহাকে কিছুমাত্র নিন্দা
করিবে না?

হেম। কিছুমাত্র না।

সন্ন্যাসী। তোমার নিজের এরূপ অবস্থা
হইলে এরূপ কার্য করিতে সম্ভব হইবে?
অস্বাস্থ্য শাস্ত্রজ্ঞরা তোমার বাদশ-বর্ষীয়া
সুশীলা নামী বোক্তা আছে, তাহার সহিত
অভজাতীর উপযুক্ত পাত্রের সহিত শুভ-
বিবাহে তোমার কোনরূপ আপত্তি হইবে
না?

হেমচন্দ্র এ প্রাণে বিস্মিত হইলেন; উত্তর
করিলেন, “গুরুদেব! পাত্র যদি উপযুক্ত
হন, এ কার্যে আমি কিছুমাত্র আপত্তি
করিব না।”

সন্ন্যাসী তখন হাসিয়া বলিলেন, “নিশ্চিন্ত
হও। আমি আপাততঃ সুশীলা যাতার সহিত
আমার পুত্রের বিবাহ প্রস্তাব করিতেছি না,
তোমার মনটি জানিবার জন্য এ কথা
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।”

সকলে কণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।
পরে হেমচন্দ্র বলিলেন, “গুরুদেব, আপনার
ইতিহাসের শেরাংশ জানিতে বড় উৎসুক

হইতেছে, আপনার মন ও বস্তুতঃ এক্ষণে
বোধায়?”

সন্ন্যাসী একটি হীর্ষনিষ্ঠাশ্রম ত্যাগ করিয়া
বলিলেন, “আমার ইতিহাস যথার্থ,
আমার জীবনের আশা-ভরসাও সার হই-
যাছে। বিবাহের দুই বৎসর পরই সৌহার্দ্য
যুগ দেখিয়া আমার দ্বন্দ্বভীতাকুরাণী মানস-
লীলা সংবরণ করেন। তাহার পর আমি
পুত্র-কলঙ্ক লইয়া মধুরার ১৫ বৎসর বাবৎ
বাস করিতেছিলাম। সেখানে প্রত্যহ প্রাতে
বসুনাভীতের অনন্তমহিমা পূর্ণ গায় উচ্চারণ
করিয়া পরমাত্মার বিকাশার্থ স্বর্ঘ্যদেবকে
আরাধনা করিতাম, সায়ংকালে বসুনাভীতে
বসিয়া শিষ্যদিগকে উপনিষৎগুলির অচিন্ত-
নীয় অর্থ শিখাইতাম। শ্রীর পুত্রকে নিজেই
সংস্কৃত ভাষার শিক্ষাদান করিতাম এবং
তথাকার বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিখাইতাম,
এবং স্নেহময়ী ভার্য্যার ঘরে আমার সেই ক্ষুদ্র
কুটারে স্বর্গস্থভোগ করিতাম। সে স্নেহময়ী
অস্বহিতা হইলেন, আমার মন বিচলিত
হইল, পুত্রকে সঙ্গে লইয়া দেশে দেশে পর্য্য-
টন করিতেছি।”

সন্ন্যাসী নিস্তব্ধে চক্ষু হইতে দুই একটি
অশ্রুবিন্দু ত্যাগ করিলেন। হেম ও পরং
অচিরে বিদায়গ্রহণ করিয়া তালপুকুরে
প্রত্যাবর্তন করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

—

গ্রামে মহৎ আন্দোলন।

স্বাধীনতার নূতন প্রধার শাস্ত্রপ্রচার
লইয়া গ্রামে অনেক আন্দোলন হইতে
লাগিল। নানারূপ লোকে নানারূপ কথা
কহিতে লাগিল। বাহারা প্রকৃত পণ্ডিত,

তাহারা রমাশ্রমাদেয় পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তাহারা পাণ্ডিত্যের ভাণ করেন, তাহারা রমাশ্রমাদেকে বিরুদ্ধভিত্তি বলিয়া হুটা গালি দিলেন। পরের একটু উপকার করিলে বাহাদেয় স্বয়ং আনন্দ হয়, তাহারা রমাশ্রমাদেয় সাহায্য করিলেন, পরের নিন্দা রুটাইরা বেড়াইরা বাহারা হু-পরগা আর করেন, সে ক্ষুদ্রভাগ্যগণ রমাশ্রমাদেয় নিন্দা রুটাইরা হুপরগা আর করিলেন। শাস্ত্রশিক্ষা দিয়া দেশের লোকের স্বয়ং উন্নত করা, চরিত্র গঠিত করা বাহাদেয় উদ্দেশ্য, তাহারা রমাশ্রমাদেয় সহিত সহানুভূতি করিতে লাগিলেন, এবং শাস্ত্রপ্রচার হইলে বাহাদেয় ব্যবসা উঠিয়া যায়, অন্ন উঠিয়া যায়, তাহারা রমাশ্রমাদেয় বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। গ্রামের উন্নতি, দেশের উন্নতি হইলে বাহারা তুষ্ট হন, তাহারা রমাশ্রমাদেয় শিক্ষাদানে আনন্দিত হইলেন এবং দেশের সামাজিক বা ধর্মবিষয়ক উন্নতি হইলে বাহাদেয় একচেটিয়া উঠিয়া যায়, তাহারা রমাশ্রমাদেয় ধর্মসম্বন্ধীয় উন্নতি-চেষ্টা দেখিয়া—বেহুদ গালি দিলেন।

এইরূপে পাড়ার পাড়ার সরস্বতী ঠাকুরের কথা লইয়া আন্দোলন বাড়িতে লাগিল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটি নিন্দার কথা স্রষ্টিল। হেমচন্দ্র ও শরতের সহিত সরস্বতী ঠাকুরের যে কথাবার্তা হইয়াছিল, জমীদার-বাড়ীর কেহ কেহ আড়ালে থাকিয়া তাহা শুনিয়াছিলেন। তাহারা এখন অল্পগ্রহ করিয়া রুটাইলেন যে, সরস্বতী ঠাকুর অল্পজাতীয়া শাস্ত্রী বিবাহ করিয়া জাতি হারা ইয়াছেন, নবানতনবাসীর লোকের সর্বনাশ করিতে আনিয়াছেন, ভালপুত্রের হেম-বাসুর কস্তার সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ দিতে বলিয়াছেন। লক্ষ্য রাতিবোগে গ্রামে অগ্নি লাগিলে নৈশ

আকারের রক্ত-আলোকে পূর্ণ হয়, ভালপুত্র ও নবানতনবাসী গ্রাম এই নিন্দা-কথার পূর্ণ-হইল।

নবানতনবাসীর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা এই অব-ধাচারী তত্ত্ব জটাবারীকে লক্ষ্য করিয়া বহুই নিন্দাবাদ করিলেন। প্রাচীনসম্প্রদায় প্রাচীন হিন্দু আচার-ব্যবস্থা গ্রহণ হইতেছে বলিয়া আক্ষেপ করিলেন। নব্য-সম্প্রদায় আধ্য-রীতির ব্যতিক্রম হইতেছে বলিয়া ইরোপী ভাবার অনেক তত্ত্ব-বিতর্ক করিলেন। জমীদার-বাড়ীর মেয়ে-মহলে কস্ত্রিয়া-প্রথা-বিদগ্ধ ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া অনেক ব্যঙ্গ করা হইল। ভালপুত্রের দানামতানয় সম্ভার সময় বা হুঁকা টানিতে টানিতে বলিলেন, “এ আর কিছুই নয়,—মেয়েগুলো বড় স্বাধীন হইতেছে, তাই যত বিশৃঙ্খলা।” গরবিণী গোপবালা গরবের খোঁপা বাঁধিতে বাঁধিতে বলিলেন, “কি হয়েছে, কি হয়েছে? স্ত্রীলোক মা বাবুনের ছেলের সঙ্গে স্ত্রীলোক বিয়ে দিবে? বাবুন না চণ্ডাল? তা হবে না কেন? ওদের ত আর ধর্মার্থ-জ্ঞান নাই, তা না হইলে বিধবার বিয়ে দেয়?” বুদ্ধিমান বোবালের পো দটকীর সঙ্গে কি কথা কহিতেছিলেন এবং নূতন বৌ বাড়ীতে আনিবেন মনে করিয়া মুচুকে মুচুকে হাসিতেছিলেন,—এমন সময় রমাশ্রমাদেয় কথা শুনিয়া একেবারে দেশহিতৈষিতার অবশ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ হুঁকা হস্তে লইয়া সমাজ-সংস্কারার্থ দলবল জটাইতে বাহির হইলেন। এদিকে রুক্মবদনা রুক্মচিন্তা বড়ালের বৌ ছাদে বসিয়া পারে আলতা পরিতেছিলেন, তিনিও নাশতিনীর নিকট এই কলঙ্ক কথা শুনিয়া একেবারে লাগিনীর ভায় কোঁস করিয়া উঠিলেন ;—বলিলেন, “আর কিছু নয়, এখনকার মিন্বেগুলো একে-

বারে সোনার নিরেছে। আত্মক না আত্ম, একবার বেশ শিকার বেশ এখন।" সে দিন রাত্রিতে বড়লোক দুইজনকে যে অসুতবচন শুনি-লেন, তাহা বর্ণনা করিতে আমরা অক্ষম।

কিন্তু এ কথা জমিদার কামিনীকান্ত বাবুর কানে উঠিল। হিন্দুধর্ম-সংরক্ষণের জন্য তিনি বিশেষ শিরোবেদনা ভোগ করিতেন না, কিন্তু তথাপি তিনি দেশের জমিদার, তিনি হিন্দু-আচার বজায় না রাখিলে কে রাখবে? অতএব তিনি আদেশ দিলেন, সন্ন্যাসী ঠাকুরকে জানাইবে, তিনি থাকিতে জমিদার-গৃহে বড় গোলযোগ হইতেছে, এবং দেশাচাররত বর্ধম্পরাগণ বংশেও কিছু কলহ পড়িতেছে। ঠাকুর অন্তহানে বাসা ঠিক করুন।

বৈদ্যনাথরত্ন তেজঃপুত্র রমাশ্রাসাদকে সহসা এ কথা কেহ বলিতে সাহস করিল না। জমিদার-গৃহে লোক বকাবকি করে, কানায়সো করে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলে না। অবশেষে বাড়ীর একজন বৃদ্ধ ভৃত্য একদিন অনেক কষ্টে, অনেক কথার পর, কোন প্রকারে প্রভুর আজ্ঞা ব্যক্ত করিল। রমাশ্রাসাদ শুনিয়া হাসিলেন, আবাসস্থান ত্যাগ করিলেন না।

জমিদার মহাশয় নিজ আজ্ঞা লজ্জিত হইয়াছে শুনিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। দুর্জয়সিং, রামখালাওল সিং, অর্জুন দোবে, বলবন্ত চোবে প্রভৃতি বৃহৎ লাঠিধারী দারবান্গণ আসিয়া রমাশ্রাসাদের দ্বরের সম্মুখে আক্ষালন করিল, তাঁহার কবল টানিয়া ফেলিয়া দিল, তাঁহার হাঁড়ি ভাঙিয়া দিল। দারবান্গণ এতটা বীরত্ব প্রকাশ করিয়া বিজয় করিতে গেল, — রমাশ্রাসাদ পুনরায় কবল বিছাইয়া পুঁবি পাঠ করিতে বসিলেন, দেবীপ্রসাদ নূতন হাঁড়ি কনিয়া আসিল।

যোগমায়ার দক্ষার সময় পাত পাড়িয়া বিহার সময় অশ্রুজল ঘোচন করিলেন। অমায় হৃৎকপূর্ণ জীবনে তিনি এই সন্ন্যাসী ভিন্ন আর কাহারও নিকট মিষ্টকথা বড় শুনে নাই, সন্ন্যাসীর বালক ভিন্ন আর কাহারও নিকট অপভ্রামর শ্রুতি পান নাই। ইহারা শ্রীচলিয়া বাইবেন শুনিয়া যোগমায়ার নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিলেন।

রমাশ্রাসাদ মনের ভাব বুঝিলেন, কহিলেন, "যোগমায়ার ভূমি অতি দুখিনী, তোমাকে এ দুখে ফেলিয়া আমি চলিয়া বাইব না, নিশ্চিন্ত হও।"

যোগমায়ার জমিদার-গৃহিণী আদেশ দিয়াছেন, ভৃত্যগণ প্রভুকে কাল গৃহ হইতে বলপূর্বক বহিষ্কৃত করিবে।

রমাশ্রাসাদ। যোগমায়ার আমি তোমাকেই জমিদার-গৃহিণী ব'লে জানি।

যোগমায়ার। তগবন! আমি এককালে জমিদার-গৃহিণী ছিলাম, এখন অনাখিনী। আমার কুমতা কোথায়? সম্পত্তি কোথায়?

রমাশ্রাসাদ। এই গৃহ তোমার স্বত্ত্বের সম্পত্তি, তোমার স্বামীর সম্পত্তি।

যোগমায়ার উত্তর দিলেন না। বলয়শূন্য হস্ত হস্তের দ্বারা মুখ আবরণ করিয়া অনেকক্ষণ নীরবে যোদন করিলেন। তাঁহার শরীর কাঁপিতেছিল, হৃদয়ে কি একটি ভাব উদয় হইতেছিল, মুখে কি একটা কথা আসিতেছিল, কিন্তু তাহা বাক্যে প্রকাশ পাইল না। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি জীলোক, সম্পত্তির কি জানি।"

রমাশ্রাসাদ। আমি তোমার সম্পত্তি জানি। আমি সে সম্পত্তি রক্ষা করিব।

যোগমায়ার। জমিদারের প্রভূত কুমতা, আপনি আমার সম্পত্তি রক্ষা করিবেন কিরূপে, আমাকেই বা রক্ষা করিবেন কিরূপে?

রমাশ্রমাদ । দুর্বলকে রক্ষা করা আমাদের ধর্ম, ধর্ম্যাচরণে ইহঁদের বলদান করিবেন ।

বোঁগমারা । তবে আপনি বাঁহা বুঝেন করুন, আমি অবলা, আমি—আমি—আমি আপনার আশ্রিতা, আপনি আমার দেবতা ।

রমাশ্রমাদ । নিশ্চিত হও । কামিনীকান্ত-বাবুর গৃহিণীকে একবার বল, সন্ন্যাসী ঠাকুর একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করে,—কামিনীকান্ত-বাবুর মঙ্গল অমঙ্গল তাহার উপর নির্ভর করে ।

বোঁগমারা এই কথা গৃহিণীকে জানাইলেন । গৃহিণীর মনে একটু ভয় হইল । তিনি সন্ন্যাসী ঠাকুরকে ডাকাইরা পাঠাইলেন ।

রমাশ্রমাদ । একজন দরিদ্র শাস্ত্রব্যবসায়ী আপনাদের বিতর্পিত জমীদার-গৃহে আশ্রয় লইয়াছে, তাহাকে তাড়াইরা দেওয়া কি আপনার মত হইয়াছে ?

গৃহিণী । বাবু এরূপ মত করিয়াছেন ।

রমাশ্রমাদ । এই প্রকাণ্ড বাড়ীতে এ দরিদ্র থাকিবার জন্ত কি একটি ঘর পার না ?

গৃহিণী । ঘরের অভাব নাই ।

রমাশ্রমাদ । ছবেলা দরিদ্রকে খাওয়াইবার অন্নের অকুলান ?

গৃহিণী । অন্নের অভাব নাই ।

রমাশ্রমাদ । তবে দরিদ্রকে তাড়ান কেন ?

গৃহিণী । অনেক গোলযোগ হচ্ছে, আমাদের বড় নিষ্ঠা হচ্ছে, আমাদের দেশাচার দেখে চলতে হয়, সেই জন্ত বোধ হয়, বাবু এরূপ আদেশ দিয়াছেন ।

রমাশ্রমাদ । দেশাচার কি আমি অস্তথা করিলাম, না খোজেন্তা বিধি ?

গৃহিণী কোন উত্তর করিলেন না,—তিনি

খোজেন্তা নারী একজন মুসলমান-মন্ডকার কথা শুনিয়াছিলেন,—নীচবে চক্ৰ বল যুছিলেন ।

রমাশ্রমাদ । তবে এ উপদ্রব কেন ?

গৃহিণী । বাবুর আদেশ ।

রমাশ্রমাদ । দরিদ্রের উপর উপদ্রব করিলে কি বাবুর মঙ্গল হইবে ?

গৃহিণী সঙ্কতিত হইয়া বলিলেন,—“আমিও বাবুকে তাই বলিয়াছিলাম, বাবু শুনিলেন না ।”

রমাশ্রমাদ । বাবুকে আর একটু বুঝাইয়া বলিবেন যে, দরিদ্রের উপর অত্যাচারে বড় লোকের অমঙ্গল হয় ।

গৃহিণী । বলিয়াছিলাম, বাবু শুনিলেন না ।

রমাশ্রমাদ । তবে বাবুকে জিজ্ঞাসা করিবেন, রমণীকান্ত নামে এক জমীদার-পুত্র এই জমীদার-গৃহে বাস করিতেন, বাবু তাঁহাকে জানিতেন কি ?

গৃহিণী শিহরিয়া উঠিলেন । কোন উত্তর করিলেন না ।

রমাশ্রমাদ । তাঁহাকে আপনি দেখিয়াছিলেন কি ?

গৃহিণী । দেখিয়াছিলাম । তখন আমার নূতন বিবাহ হইয়াছে ।

রমাশ্রমাদ । তিনি কোথায় গেলেন ? জানেন কি ?

গৃহিণী । তাঁহার অনেক দিন হইল, কাল হইয়াছে ।

রমাশ্রমাদ । কিরূপে তাঁহার মৃত্যু হয় ?

গৃহিণী আবার শিহরিয়া উঠিলেন ।

রমাশ্রমাদ । তাঁহার কিসে মৃত্যু হয়, শুনিয়াছেন কি ?

গৃহিণী । মরা মানুষের কথার প্রয়োজন কি ?

রমাশ্রমাদ । তবে বাবুকে বলিবেন,

দরিত্রের উপর উৎসাহিত করেছিল কি? পাণের পরিমাণ অধিক হইলেই প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়।

গৃহিণীর সহিত রম্যপ্রসাদের বাহা বাহা কথা হইয়াছিল, বোগমায়া একপাশে দাঁড়াইয়া সমস্ত অনিরা ছিলেন। সে দিন বন্ধ্যার সময় বোগমায়া রম্যপ্রসাদের আহ্বারের সময় আসিলেন। নিশীথে রম্যপ্রসাদ উঠিয়া বসি দেখিতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন যে, সেই নীর্ণকারা হস্তভাগিনী তাঁহার মাথার নিকট বসিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন।

প্রাতঃকালে বোগমায়া যখন জল-টল লইয়া আসিলেন, সন্ন্যাসী ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন, “এ জমিদার-গৃহের লোক-জন সব ভাল লোক ত? রাত্রিতে আসিয়া সন্ন্যাসীর স্ত্রীলি, গরিবের বাসটি নাড়া-চাড়া করে কে?”

বোগমায়া হেঁটমুখী হইয়া রহিলেন, ক্ষণেক পরে বলিলেন, “ঠেক, এ বাড়ীর লোক-জনের কোন বদনাম শুনি নাই; আপনার কোন দাসী আপনার দ্রব্য মাড়িয়া চাড়িয়া থাকিবে।”

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

খিড়কীর পুকুরের খোসাগল।

পরদিন প্রাতে সন্ন্যাসী ঠাকুর চলিয়া যাইবেন, সকলে প্রত্যাশা করিয়াছিল, দেখিল, তাহার বিপরীত। সন্ন্যাসী ঠাকুরের সেবার জন্য বড় কর্তার খাস ভূতা প্রাতঃকাল

হইতে ছুটাছুটি করিতেছে। সন্ন্যাসী ঠাকুরের বাইবার জন্য সন্ন্যাসী-মথ-নাথন আনিয়া দিল, ময়রা খিড়কীর আনিয়া দিল। সন্ন্যাসী ঠাকুরের কতক খাবারের জন্য একজন দারবান সন্ন্যাসী দ্বারে দণ্ডায়মান। বড় গৃহিণীর খাস-খালী সন্ন্যাসী ঠাকুরের ঘর খাঁটি দিতেছে, বড় গৃহিণীর খাস-খালী রন্ধনের আয়োজন করিতেছে।

জমিদার-বাড়ীর খিড়কী-পুকুরের ঘাটে আজ বড় হলহুল। মেয়েমহলে খোসাগলের শেব নাই। জুংখর বিষয়, কোন সংবাদ-পত্রের সংবাদমাতা খিড়কীর পুকুরঘাটে দণ্ডায়মান ছিলেন না, এবং কোন নব্য লেখকও সেই ঘাটের কথাবার্তার “শট” হেণ্ড রিপোর্ট” লয়েন নাই। যদি লইতেন, তাহা হইলে “মেয়ে-মহলে চরিত্র-সমালোচনা” নামক অপূর্ণ উপন্যাস লিখিয়া বঙ্গীয় পাতক-বন্দকে তৃপ্ত করিতে পারিতেন।

প্রথমে মল পায়ে, গছনা গারে, হাসি-মুখে, নবীনাদিগের দল সেই ঘাটে ঝুম্ ঝুম্ করিয়া আসিলেন। রসিকা ফুলক-না-তাঁহারের নেত্রী, কলসটি নামাইয়া আর একটি ছড়া কাটিলেন—

“ও লো, এতদিনের পর সন্ন্যাসীর

কপাল ফিরেছে।

কর্তাটি কর্তাটি ব’লে বড় গিন্না ডেকেছে।”

বসন্তকুমারী। ছুর গোড়ারমুখী, বড়গিন্নার উপর ঠাট্টা। শুনতে পেলে মাথা মুড়িয়ে বাড়ী থেকে বের ক’রে দেবে।

ফুলকুমারী। ঠাট্টা আবার কি? বড় গিন্নার দাসী এখানে কাজ করছে, রান্ধুনী রান্নার আয়োজন করছে, তা বড় গিন্না সন্ন্যাসীর উপর সদর হয়েছেন নয় ত কি? হুম্বহুম্বারী। না লো না, তা নয়। বড়

গিন্নী একটা বড় কাঁড়া ছিল, সন্ন্যাসী স্বপ্ন-
রন করে তাই কাটিয়ে দিয়েছে, তাই সন্ন্যাসী-
র এত আনন্দ।

হেমকুমারী। তা নয় লো তা নয়, তোরা
জানিস নি শুনিস নি, কথা ক'স কেন?
কর্তার একটা বড় কাঁড়া ছিল, তাই গিন্নী
সন্ন্যাসীকে কা'ল সন্ন্যাসীর সময় ডাকিয়ে
পাঠিয়েছিলেন।

বর্ণকুমারী। ওলো, আমি যদি শোন।
সন্ন্যাসীকে ঔষুধ করতে ডেকেছিল।

ফুলকুমারী। কিসের ঔষুধ লো? বড়
গিন্নীর এ বগসে আবার ছেলে হবার সাধ
আছে না কি?

বর্ণকুমারী। দূর পোড়াকপালী! তা
নয় লো তা নয়, এ অস্ত্র ঔষুধ।

সকলে। কি? কি? কি ঔষুধ?

বর্ণকুমারী। বড় গিন্নীর একটা শত্রু
আছে, তাকে বাণ মারবার ঔষুধ। এখন
শুনলি?

সকলে। কে? কে? কে? শত্রু কে?

বর্ণকুমারী। ওলো, বলি শোন। ঐ যে
একটা মুছনমানী কলকাতার আছে না?
তার নাম খোজেন্তা, তাকেই বাণ মারবে।
আমাদের খোকার খি লুকিয়ে লুকিয়ে শুনে
এসেছে। সন্ন্যাসী না কি বলেছে, সেই
মুছনমানীকে গীত্র ধ্বংস করবে।

নবীনাদিগের দল চলিয়া না যাইতে
বাইতে মধ্যবরদ্ধা এক হল আসিয়া সেই
বাটে কলস নামাইলেন।

মাতঙ্গিনী। ওলো, আজ বে বড় ঘট
দেখছি। কি, হয়েছে কি?

তরঙ্গিনী। ওলো, তা জানিস নি, আরা-
ধের ষোণমাঙ্গার যে কপাল দিয়েছে।

মাতঙ্গিনী। সে কি? সে কি? কি
হয়েছে?

তরঙ্গিনী। হবে আবার কি? কা'ল
যোগমাঙ্গা না কি বড়গিন্নীর কাছে সন্ন্যাসীকে
নিরে গিরে ঢের কাঁচাকাটি করেছে;
বলেছে, সন্ন্যাসীকে বাড়ী থেকে বার করে
দিলে আমি খুনি নিয়ে তার সঙ্গে বৈরবী
হয়ে বেরিয়ে যাব।

মাতঙ্গিনী। অধাক করে যা! কোথা
যাব মা! ও মা, চল্লিশ বৎসরের বুড়ী বৈরবী
হবে! কলিতে কতই না কি হবে!

রাধারঙ্গিনী। ওলো, তা নয়, তোরা
আসল কথা শুনিস নি।

সকলে। কি? কি? আসল কথাটি
কি?

রাধারঙ্গিনী বলিল, “ঐ যে তালপুকুর
থেকে ছুটা বাবু আসে না, হেম-বাবু আর
শরৎ-বাবু? তাদের মধ্যে শরৎ-বাবুটি
একটি বিধবা-বিয়ে করেছে, সে না কি
হেম-বাবুর স্ত্রী হয়। তা তারাই না কি
সন্ন্যাসীকে ভজিয়েছে যে, বিধবার বিয়ে
হয়। এই আর আমাদের যোগমাঙ্গা কোথায়
যায়? একেবারে নেচে উঠেছে। এইজন্য
সন্ন্যাসীর এত গুরুত্ব করে, সন্ন্যাসীর পাত
পেতে দেয়, জল এনে দেয়, কত সেবা
করে।

কুকসজিনী। ওলো, তা নয় লো তা
নয়, তোরা আসল কথা শুনিস নি।

সকলে। কি? কি? কি? কি হয়েছে?
কুকসজিনী। হবে আর কি? ঐ সন্ন্যাসীর
ছেলেটির সঙ্গে হেম-বাবুর মেয়েটির বিয়ে
হবে, সব ঠিক হয়ে গিয়েছে।

সকলে। বলিস কি লো? সত্য না কি?
অধাক করে যা! কোথা যাব মা!

রামরঙ্গিনী। তাও কি হয় লো? সন্ন্যাসী
হ'ল বাবু, হেম-বাবু হ'ল কারেত, এদের কি
বিয়ে হয়?

কুকস্বন্দরী। কিসের বাবুন? বাবুনের
মুখে আঙন!

সকলে। অবাক করে যা! কোথায় বাব
মা! ইত্যাদি।

মধ্যাহ্নকার দল বিদায় না হইতে হইতে
ব্রজার দল কলস নামাইয়া সেই ঘাটে সন্তোর
আবিষ্কার করিতে বসিলেন।

শ্যামাস্বন্দরী। আজ যে সন্ন্যাসী ঠাকুরের
বড় সন্মান।

বামাস্বন্দরী। এখন হয়েছে কি? আরও
সন্মান হবে।

শ্যামাস্বন্দরী। কেন লো? কি হয়েছে?

বামাস্বন্দরী। ওলো, তা বুঝি জানিস
নি, তবে শোন, চুপি চুপি শোন। কর্তা
দ্বিতীয় শুনলে আমাদের কেঁটা ঘেয়ে বের
ক'রে দেবে।

শ্যামাস্বন্দরী। কি? কি? কি? কি
হয়েছে?

বামাস্বন্দরী। বলি, এই জমিদার-বাড়ীর
একটা ছেলে খুন হয়ে গিয়েছিল, তা কি
তনিস্ নি?

জিপুরাস্বন্দরী। হাঁ, হাঁ, হাঁ! ও মা, সে
যে আজ ত্রিশ বছর হ'তে গেল গো।
আমার বিলাসকামিনীর সেই মাসে বিয়ে
হয়, ও মা, সে কথা কি আমরা ভুলতে পারি?
ও মা, কি ভয় পেয়েছিছ গো! বিয়ের সখ
বুঝি ভেঙ্গে যায়! তা বিয়ের ঘট। সব বন্ধ
হয়ে গেল, বাজনা বন্ধ হয়ে গেল, নিমন্ত্রণ
বন্ধ হয়ে গেল, চুপি চুপি বাবুন ডাকিয়ে
আমার মেয়ের বিয়ে হয়। হা আমার পোড়া
কপাল রে!

হরস্বন্দরী। ও মা, সে কথা আর মনে
নেই? সে যে বৈশাখ মাসে। আমার
নাড়ু গোপালের সেই মাসে তাত, সে কথা
কি আমি ভুলতে পারি? বাছা নাড়ু গোপা-

লের ডাঙের সব আয়োজন বন্ধ হয়ে গেল,
লোকজনকে ভাল ক'রে খাওয়াতেও পার-
লেম না! হা আমার ডালা কপাল রে!

কুকস্বন্দরী। ও মা, সে কথা জানি বৈ
কি? ঐ যে ঠিক সেই মাসে আমার বড়
বৌয়ের সাথ, সাথের কত আয়োজন, কত
বগ্গি, কত নৌকজন জড় হয়েছে,
রাজ্যের মেয়ে আমার বড় বৌর সঙ্গে
এসেছে! ও মা, এমন সময় আমার থেকে
খবর এল যে, বড় হাঙ্গামা হয়ে গিয়েছে,
রমণী-বাবু খুন হয়েছে! ও মা, কি সর্বনাশ!
কি সর্বনাশ! আমার বড় বৌ ত শুনে প্রায়
মুছ! যায়, আমি ত অবাক, বাড়ী মুছ মেয়ে
ভয়ে আড়ট! কেবা বগ্গিতে যায়, কেবা
খাওয়ার?

বামাস্বন্দরী। ঠিক বলেছ দিদি! ছেলে-
টির নাম রমণী-বাবুই বটে। আহা, যেন
সোনার টাকটি।

জিপুরাস্বন্দরী। আহা! এমন ছেলেও
যা! যার গা? কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ!
আহা, রমণী-বাবু আমাকে কত সন্মান করত,
আমার বিলাসকামিনীকে ঠিক বোনের মত
ভালবাসত।

হরস্বন্দরী। আহা! তার কথা মনে
হ'লে এখনও চোখে জল আসে। রমণীবাবু
আমার নাড়ু গোপালকে কত কোলে করত,
নাড়ু হাতে দিত, আর কত আদর করত।
আহা, বাছা রে, এমন সোনার টার ছেলেও
যা! যার!

কুকস্বন্দরী। আহা, ম'রে বাই, সে কথা
তুলো না গো, সে কথা তুলো না। বাছা
রমণী আমার ছেলের মত ছিল গো,
আমার বড় বৌ তাকে দেবর ব'লে কড়ই
ঠাট্টা করত। আর সে ত এমন দেবর ছিল
না, কাপড়খানি, গরনাখানি, বর্জমান

থেকে খাড়া যেমতই সর্দার আমার বড় বোনের অস্ত্র পাঠিয়ে দিত! আমার বড় বোনের খোকা হবে খোকা হবে বলে কতই আশ্বাস করত! তা বাছা, খোকাকেও দেখে গেল না।

বায়াহন্দরী! তা সে খুন ত পুলিশ কিছু কিনারা করতে পারলে না, লাশ রাতারাতি আলিয়ে ফেলেছিল। এতদিন ত কেউ বলতে পারে নি, এখন না কি, সন্ন্যাসী মন পড়ে তাই বার করেছে! কর্তা বাবু না কি বড় ভর পেয়েছেন, তাই সন্ন্যাসীর এত খোসামোদ!

এইরূপে সমস্ত দিন ধরিয়া জমীদার-বাটীতে বড়গিরীর চরিত্র, বোগমারার চরিত্র, কর্তা মহাশয়ের চরিত্র এবং সন্ন্যাসী ঠাকুরের চরিত্র লইয়া অনেক সমালোচনা হইতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় দেবীপ্রসাদ পিতাকে বলিল, “বোধ হয়, জমীদার মহাশয় আমাদের উপর আজ সদয় হয়েছেন, আপনার প্রতি যত্ন তুল্য ব্যবহার করুছেন।”

রমাপ্রসাদ। দেবী, তুমি ভুল বুঝেছ। আজ জমীদার মহাশয় আমাদের পরম শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছেন, সতর্ক থেকো।

দেবীপ্রসাদ। সে কি? তিনি আমাদের আহারের অস্ত্র দ্রব্যাদি পাঠিয়েছেন, আমাদের সেবার অস্ত্র দাস-দাসী রেখেছেন।

রমাপ্রসাদ। তাঁহার দত্ত আহার স্পর্শ করিও না,—তাঁহার দাস-দাসী,—আমাদের দিগকে পাহারা দিবার অস্ত্র!

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা যাত্রা।

যে দিন রমাপ্রসাদ গৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাহার পরদিন হইতে কামিনীকান্ত জমীদার মহাশয়ের কেহ বড় মর্শন পাইত না। তিনি সর্দারই ঘরের ভিতর থাকিতেন, গোপনে কি পরামর্শ করিতেন, বর্জয়াম ও কলিকাতার লোক পাঠাইতেন, সর্দার নানা দিক হইতে পত্র পাইতেন, নানা স্থানে পত্র পাঠাইতেন। ভূতাপ বনিত, জমীদার মহাশয় স্নানকৃত্য হইয়া গিয়াছেন, দাসীগণ বনিত, কর্তাবাবুর শরীর আশ্বাসি হইয়া গিয়াছে।

এইরূপে ছই তিন মাস অতিবাহিত হইলে পর, তালপুতুর হইতে সংবাদ আসিল, বৃদ্ধ তারিণী-বাবুর মৃত্যু হইয়াছে। আরও সংবাদ আসিল যে, মৃত্যুর পূর্বে তারিণী-বাবু রমাপ্রসাদ সরস্বতী ঠাকুরকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন, সরস্বতী ঠাকুর মুমূর্ষু হয়ে সমস্ত রাত্রি ছিলেন। সুধা এবার শরভের সহিত পূর্বদেশে গিয়াছেন, শরৎ সেই দেশে বদলি হইয়াছেন, স্ত্রতরাং বিন্দু একাকী জ্যোতা মহাশয়ের অনেক সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছেন। গোপী জ্যোতাই বিন্দুর আসা-বাওয়া ইচ্ছা করিতেন না, কিন্তু বাবুর কঠিন পীড়ায় মুখ ফুটিয়া কোন আপত্তি করেন নাই। আরও সংবাদ আসিল যে, মৃত্যুর সময়ে তারিণী-বাবুর নিকট রমাপ্রসাদ ছিলেন,—মৃত্যুতঃ স্ত্রীকে উইল দ্বারা যে সম্পত্তি দান করিয়াছেন, সে উইল অস্ত্রা করিয়া সম্পত্তি বিন্দুবাগিনীকে ও স্ত্রীকে উইল করিয়া দিয়াছেন।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া কামিনীকান্ত-বাবু গর্জন করিয়া উঠিলেন। যে দিন খাওয়া, ঘুম ত্যাগ করিলেন, সমস্ত দিন কামিনী অতি ধোঁপনে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তারিখী-বাবুর সম্পত্তিটুকু হেরা ও শরৎকে না দিয়া আপাততঃ গোপবালার হস্তে রাখেন এবং ক্রমশঃ নিজে আয়সাৎ করেন; অর্থদ্বারা রমাপ্রসাদের উপরে কোন প্রকারে বৈর-নিবারণ করেন, উক্ত হেমকে একটু শিক্ষা দান করেন, ভাবী যৌকন্দ্যার একটা হলদুল করিয়া আপন ক্রমতা প্রচার করেন; সুনীলা ও দেবীপ্রসাদের বিবাহ বন্ধ করিয়া আপন ধর্মপ্রিয়তা ও দেশাচারপ্রিয়তা প্রকটিত করেন;—এইরূপ নানা চিন্তা ও প্রলোভনে বিষয়ী কামিনীকান্তের মন একেবারে বিপর্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইল। দুই প্রহর, আড়াই প্রহর, তিন প্রহর হইয়া গেল,—স্নান নাই, আহার নাই, কেবল ভূতাগণ ঘন ঘন তাহার আনিয়া দিতেছে এবং জিলিপির পাকের মত কামিনীকান্ত ও বন্ধুবর্গের মন্ত্রণার পাক চলিতেছে।

সন্ধ্যার সময় উল্লাসপূর্ণমুখে কামিনীকান্ত-বাবু বারান্দায় দাঁড়াইয়াছেন, দূর হইতে দেখিলেন, তালপুকুর হইতে রমাপ্রসাদ কিরিয়া আসিতেছেন। একটু হাসিয়া মনে মনে বলিলেন, “সন্ন্যাসী ঠাকুর! তুমি ভারী খেলোয়াড়! খুব এক চাল চালিয়া কিস্তি দিয়াছ। আমিও খেলার কিছু জানি, আমিও একরার একচাল চালিব,—সাবধান!”

পরদিন প্রাতে সনাতনবাটার জমিদারগৃহ হইতে পাকী ও রি তালপুকুরে উপস্থিত হইল, জমিদারগৃহিণী বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তারিখী-বাবুর স্ত্রী পতিশোকে বড় কাতর হইয়াছেন, তালপুকুরে তাঁহাকে দেবিবার শুনিবার কেহ নাই, বিষয়-রূপের পরামর্শ দিবারও কেহ

নাই, সন্ধ্যায় দুইটিবই ইচ্ছা যে, গোপবালার কয়েক দিন সনাতনবাটা গিয়া থাকেন। শোক একটু হ্রাস হইলে, বিষয় শকতিগের হস্ত হইতে নিরাপদ হইলে, গোপবালার পুনরায় নিজগ্রামে আসিবেন। আর যদি কথা এই তারিখী-বাবু উইল করিয়া বিষয় ভাই-বিশেষের দ্বিগা থাকেন, তাহা হইলে ত সে বিষয় লইয়া একটা যৌকন্দ্য হইবেই। সনাতনবাটার জমিদার মহাশয় সে যৌকন্দ্যায় নিরাশ্রয় বিষবার পক্ষ হইয়া যথেষ্ট সাহায্য করিতে সম্মত আছেন।

এরূপ দ্বন্দ্বার্জ জমিদারের নিয়ন্ত্রণে নিত্যন্ত সন্তানিত হইয়া গোপবালার তৎকথায় সনাতনবাটা উপস্থিত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

দশ পনের দিন ধরিয়া পরামর্শ চলিতে লাগিল। বর্দ্ধমান হইতে গোবুলচন্দ্রে আসিল, কামিনী-বাবুর অজ্ঞাত পরামর্শদাতা আসিল, অনেক পরামর্শ করিয়া কার্য্যপ্রণালী স্থির হইল। বর্দ্ধমানে ঘন ঘন দরখাস্ত পড়িল, পুলিশের থানায় ঘন ঘন লোক বাইতে লাগিল। সমস্ত ঠিক হইল, গোপবালার তালপুকুরে কিরিয়া গেলেন, এবং সেই দ্বিমই সন্ধ্যায় সময় কামিনীকান্তবাবু মহা সমারোহে শিবিকায় আরোহণ করিয়া সনাতনবাটা ত্যাগ করিলেন।

রমাপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ খাইতে বসিয়াছেন, এমন সময় মহাসমারোহে শিবিকা চলিয়া গেল। দেবীপ্রসাদ বলিল, “ঐ জমিদার মহাশয় যাইতেছেন। কয়েকমাস হইতে তাঁহার শরীর নিত্যন্ত অসুস্থ ও দুর্বল হইয়াছে। শুনিয়াছি, বাবু-পরিবর্তনের জন্য পশ্চিম বাইতেছেন।”

রমাপ্রসাদ। দেবী, তুমি ভুল শুনিয়াছ। আমাদিগকে একটি ঘোর সন্ধ্যা

কেলিবার লজ বুদ্ধিমান কলিকাতা
বাইতেছেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

সুমতি-বাবুর বৈঠকখানা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ এটর্নী সুমতি-বাবুর
বৈঠকখানাটি বড় ফিটকাট। অধিক বাড়ল-
নের আড়ম্বর নাই, কেবল ঘরের মধ্যে তিন
ডালওয়ারা শেঙেলীরে গ্যাস জলিতেছে
আর লিথিবার টেবিলের উপর অসলরের
বাড়ীর একটি পরিষ্কার সিডিং-ল্যাম্প।
দেয়ালে বিবস্ত্রা অস্ত্রাদিগের ছবি ধুমধাম
নাই, ধানচারেক সুন্দর দৃশ্যের ছবিমাত্র,—
পর্বত, সমুদ্র, হ্রদ ও পল্লীগ্রামের ছবি। মর্ষর-
প্রস্তরের উপকরণাদির অধিক ছড়াছড়ি
নাই, কেবল একটি পরিষ্কার লিথিবার
টেবিল, কয়েকখানি চৌকি, দুইটি সোফা
ও একখানি ইজি চেয়ার। কার্পেট-গালিচার
আড়ম্বর নাই, ঘরের মেজে নূতন মাছর
দিয়া ঢাকা। নানাপ্রকার মুনাহেব ও গীত-
বান্ধ-কুশল লোক দ্বারা সে ঘর পূর্ণ নহে।
সুমতি-বাবুর ঘরে অল্প কয়েক জন বাছা
বাছা বন্ধু মাত্র। ধনী বলিয়া সুমতি-বাবু
পরিচর দেন না। দেখিলে শুনিলে তাঁহাকে
বুদ্ধিজীবী লোক বলিয়া বোধ হয়।

সন্ধ্যা হইয়াছে, বাতি জলিতেছে, বন্ধুগণ
কথাবার্তা ও মিষ্টালাপ করিতেছেন। তাঁহা-
দের মধ্যে দুইজন বন্ধু আমাদের পরিচিত।

ধনপূরের ধনঞ্জয়-বাবুর আর পূর্বের স্ত্রার
ধন নাই। বিষর অনেক হাতছাড়া হইয়াছে,
অবশিষ্ট বিষর ঋণের জন্ত আবদ্ধ হইয়াছে,
লোকে কাণাকাণি করে, ধনঞ্জয়-বাবুর অধি-
কাংশ ধনই সুন্দরুদ্ভি সুমতি-বাবুরই হস্তগত

হইয়াছে, ধনঞ্জয়-বাবু এই দ্বিতীয় গৃহীণ্ডে
সুখী হন নাই, উপগৃহীণ্ডগণ গৃহপালের স্ত্রার
মাসেপুত্র শব ত্যাগ করিয়া অস্ত্র শর অব্যবহে
উড়িয়া গিয়াছে, সপের বাগান বিক্রয় হইয়া
গিয়াছে, স্ত্রার ধনঞ্জয়-বাবু এই সুমতি-
বাবুর বৈঠকখানাতেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া-
ছেন। সুমতি-বাবু অত্যন্ত লোক নহেন, বাঁহার
সর্ব্ব শোষণ করিয়াছেন, তাঁহাকে একেবারে
তাচ্ছল্য করেন না, বৈঠকখানার একপার্শ্বে
ধনঞ্জয়-বাবু বলিয়া থাকেন, সুমতি-বাবুর
অল্পগ্রহে একটু একটু হইয়া পান করেন,
সুমতি-বাবুর মিষ্টকণ্ঠ আপনাকে সম্যক
বোধ করেন, ধনঞ্জয়-বাবুর পূর্ববৎ রূপ নাই,
বৌবন-লক্ষণ নাই, অকালেই চকুর জ্যোতি:
কমিয়া গিয়াছে, মাথার চুল কিছু বেতবর্ণ হই-
য়াছে, হাতে হইকীর মাস একটু একটু কাঁপি-
তেছে। ধনঞ্জয়-বাবুর পূর্বের কালজুড়ী ও
লালা জুড়ীর পরিবর্তে একটি অনাহারী ষোড়ার

গাড়ী টানে, সেইস কোচম্যানগণও প্রায় অনা-
হারী হইয়া আসিয়াছে, স্ত্রার বেশ ছিন্ন,
তকুমা মলিন। সম্ভ্রতি তারিণী-বাবুর বৃদ্ধা
হইয়াছে শুনিয়া ধনঞ্জয়-বাবুর নূতন বিষর-
লাভের একটু আশা হইয়াছে। সুমতি-বাবুর
নিকট পরামর্শ লরেন, সুমতি-বাবুর স্ত্রার
পরামর্শদাতা কলিকাতার কয় জন আছে ?

কয়েক জন নব্য জমীদারও আজ সুমতি-
বাবুর নিকট আসিয়াছেন। কেহ এখনও
নাবালক, কীট্রই বয়ঃপ্রাপ্ত হইবেন, ইতিমধ্যে
টাকার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, সে প্রয়ো-
জন-সাধনে সুমতি-বাবুর স্ত্রার আর কে পণ্ডিত
আছে ? কেহ বৃত্ত আতির বিষয়টুকু লইবার
জন্ত লোলুপ হইয়াছেন, মানারূপ মোক-
দমার আরোজন করিতেছেন, একখানি উইজ
কিরূপে স্ট্র, তাহা আমরা জানি না, সুমতি-
বাবুকে দেখাইতে আসিয়াছেন। কেহ বিলাস-

সকলের নবীন শরীর ভাঙাফাটা নিম্নাঙ্গের, নীচাঙ্গলার পেশের সুন্দর বিলম্বিতীয় হস্তে মুখ হইয়া সেই বিদ্যার তত্ত্বপূর্ণতারি সুমতি-করুণ শরীরে স্থাপিত করিতে আনিয়াছেন। কেহ আশঙ্কী বসিয়াই বাগানে পাঠ দিবে, সুমতি-বাবুকে নিমন্ত্রণ করিতে আনিয়াছেন। কেহ এই গাছ ছাড়া হইতে-ছিলেন, কেবল সুমতি-বাবুকে দেখিবার জন্য ঐ এক গ্রাস হইত। পানার্থে) একবার পাতা থেকে নামিয়াছেন।

এইরূপ নানাপ্রকার-বিভূষিত সুমতি-বাবুর বৈঠকখানার পারিজাত-পুষ্পের দ্বার কামিনী-কান্ত-বাবু শোভা পাইতেছেন। কিছু এ হস্তপূর্ণ ঘরে তাঁহার মুখখানি আজ গভীর, নানা কথাবার্তার মধ্যে কামিনী-বাবু আজ নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি সুমতি-বাবু মিলেন, বিবরণী কিছু গুরুতর।

অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা ও গল্পবহন হইতে লাগিল। স্বামী প্রায় দশটার সময় সকলে গাছোখান করিয়া বিদায় লইলেন। কেবল ধনঞ্জয়-বাবু ঘরের একপাশে হইবীর গ্রাস লইয়া একটু তল্লা ভোগ করিতেছেন। তাঁহাকে নিদ্রিত দেখিয়া কামিনীকান্ত আপন-নার কথা সংক্ষেপে বলিলেন। গ্রামে এক ঘোর অর্থহাচারী জটধারী আসিয়াছে, সে ব্রাহ্মপুঞ্জের সহিত কারস্থ-কস্তার বিবাহ দিতে চায়, তারিণী-বাবুর বিধবাকে স্বামীর বিষয় হইতে বঞ্চিত করিতে চায়। তারিণী-বাবুর পীড়ার সময় নে-ই ঐ বধ খাওয়াইয়া-ছিল, তারিণী-বাবুর স্বতার পর নে-ই আল উইল প্রস্তুত করাইয়াছে। হিন্দু-ধর্ম ও হিন্দু-আচার রক্ষা করা হিন্দুমানুষেরই কর্তব্য, এবং নিরাশ্রয় বিধবা জমীদার-পত্নীকে সাহায্য করা জমীদারমানুষেরই কর্তব্য। অন্তএব জটধারীকে কৌশলগতীমোকদ্দমার ফেলায় যে

আমোজন হইয়াছে, সে সমস্ত কথা সন্দেশে কামিনী-বাবু বিবৃত করিলেন।

বিবৃত করিতে করিতে স্বামী এগারট বাজিল, পরামর্শের পর বাই, সুজ্ঞান আর একদিন কথা হইবে বলিয়া কামিনী-বাবু বিদায় লইলেন। বিদায় লইবার সময় বলিলেন, “আপনার সহিত আত্মবলী কত দেখা হইবে? এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ আবশ্যক, সেই জন্তই আনিয়াছি।”

সুমতি। তবে আপনি আজ্ঞা করেন।

কামিনীকান্ত। কল্য সন্ধ্যার সময় স্নান-কাশ হইবে? আমার বাগানবাগীতে বসি আসেন, তাহা হইলে কিছু গীতবাত্তও হইবে, কথাবার্তাও হইবে।

সুমতি। অবশ্য আসিব। আপনার সেই কোকিল-মিঠভাষিণী স্বপ্ন-সুন্দরীটি আজ্ঞা ত? তাহার “ভাড়া ব ভাড়া” গানটি আর একবার শুনিবার ইচ্ছা আছে। গায় কেন তানদান, নাচে যেন পরাট।

কামিনীকান্ত হাসিয়া বলিলেন, “আপনার আদেশে সে সন্মানিত হইবে! সন্ধ্যার সময় আসিবেন, গানটানও হইবে, আশাদের বিষয়ের কথাও হইবে।”

এই বলিয়া কামিনী-বাবু প্রস্থান করিলেন,—চাহিয়া দেখিলেন, ধনঞ্জয়-বাবু তখনও নিদ্রিত।

কামিনী-বাবু একটি ফুল করিয়াছেন, ধনঞ্জয়-বাবু স্বপ্নের উইলের কথা শুনিয়া, কান খাড়া করিয়া, চক্ষু বুজিয়া, সমস্ত কথা শুনিয়াছেন।

একদিন পরিচ্ছেদ।

—২৭—

কামিনী-বাবুর বাগানবাড়ী।

“আজ কামিনী-বাবুর বাগানে বাই-নাচ।
কোকিল-বিনিমিত-বরে খোজেছা বিবি
“তাজা ব তাজা” গাইল, অঙ্গুরোধিনিকিত
ভালে নৃত্য করিল, যুগনয়ন-বিনিমিত
কটাকে তীর শর বর্ষণ করিল। সুমতি-বাবু
অনিবেশ-নয়নে, স্নিতকুল-বসনে সে নর্তকীর
দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু কামিনীকান্ত-
বাবুর লগাট হইতে চিন্তা-রেখা আজ অগ-
নীত হইল না।

নৃত্যান্তে খাওয়া দাওয়া হইল। বলা
বাহলা, থানা ইংরাজি ধরণে। মুসলমান
খামশামা নানাপ্রকার সুস্বাদু খাদ্য মেজের
উপর অনিয়া দিল, খোজেছা বিবি থান-
সামার হাত হইতে শেম্পোন-বোতল লইয়া
স্বহস্তে বাবুদের পাত্র ভরিয়া সুখা চালিল
এবং হাকেজ কবির “সাকী মর বাকী”
সামক অপূর্ণ সঙ্গীত গাইল। গীত সাদ
করিয়া খোজেছা বিবি বিদায় লইল, কিন্তু
কামিনীকান্ত-বাবুর অনাবাদিত সুরা সমু-
খেই রহিল, তাঁহার লগাট হইতে চিন্তা-
রেখা অপনীত হইল না।

তখন দুইজনে নিকটে বসিয়া যুদ্ধস্বরে
কথা কহিতে লাগিলেন।

সুমতি। এখন আপনার কথাটি পুনরায়
বলুন দেখি। কল্য সমস্ত বলা হয় নাই।

কামিনী। সমস্ত কথাই প্রায় কল্য বলি-
য়াছি। আমাদের গ্রামে কয়েক মাস হইতে
যে একজন জটাধারী ব্রাহ্মণ আসিয়া হুলস্থূল
বাধাইয়াছে, তাহার কথা কলাই বলিয়াছি।
সে উপনিষদ পড়ে, সে বেদগান গায়, সে
জনসাধারণকে ডাকিয়া শাস্ত্রশিক্ষা দেয়,

আজিও যেন ও শরদের মত আহার্যনি
কর, ভরিয়াছি, সে কাছ-করার সন্তো
আপনার পুত্রের বিবাহ দিতেও চেষ্টা করি-
তেছে। উঃ, কি অবস্থাচরণ! সনাতন-
যজ্ঞি গ্রামে বৃদ্ধি হিন্দুরানী ও হেশায়া
আর থাকে না।

সুমতি। আপনি হিন্দুরানীর শুভ-বরূপ,
আপনি থাকিতে জটাধারী বেটার কত
বিক্রম? আপনি কেন একটি সত্‌পার লব-
লখন করুন না?

কামিনী। আদেশ করুন।

সুমতি। আপনি আজ বে বাই-নাচ
দিলেন, আপনার গ্রামে সেই বাই-নাচ দিল।
যবন-সুন্দরীর প্রতাপে জটাধারী বেটা বলা
বাপ করিয়া দেশ ছাড়িয়া পলাইবে!

কামিনী। না হে, সে কাজের কথা
নয়। আমাদের গ্রামের লোকদের এতকণ্ড
কুসংস্কার আছে, তেমন উন্নতি হয় নাই।
মুসলমানীকে গ্রামে লইয়া গেলে নিন্দা ছই-
বার সম্ভব।

সুমতি। তবে বিত্তীয় উপায়টি অব-
লখন করুন।

কামিনী। সে কি উপায়, বলুন।

সুমতি। আপনার বলবন্ত নামে
লাঠিধারী দ্বারবান আছে, তাহাকে বন্ধন,
জটাধারী বেটার জটা ধরিয়া গ্রামের বাহির
করিয়া দেয়। এই সামান্ত বিষয় লইয়া
আপনি এরূপ চিন্তিত হইয়াছেন?

কামিনী। সে উপায়ও অবলম্বন করিয়া-
ছিলাম। কিন্তু সে উপায় বার্থ হইয়াছে।
কলাই বলিয়াছি, সে জটাধারী বোণ হয়,
আমাদের গ্রামের পুর্বের ঘটনার কথা কিছু
জানে! তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে সে
পুর্বের কথা জিজ্ঞাসা আমাদেরই সকলকে
বিপদে ফেলিবে, আমার এইরূপ বিশ্বাস

সুমতি । আপনার গ্রামের পূর্ব-ইন্ডি-
হাসটি যদি ভাঙিয়া বলেন, তাহা হইলে
আমি সমস্ত বুঝিতে পারি ।

কামিনী । তবে পুরাতন কথা প্রবণ
করুন । আমার পিতা অতি বুদ্ধিমান লোক
ছিলেন, আমাদের বিপুল জমিদারীর
অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ ক্রয় করিয়া চারি
আনার মালিক হইয়া পরলোকগমন করেন,
তাহা আপনি জানেন । আমি সেই চারি
আনা দখল করিলাম এবং রমণীকান্ত নামে
আমার জাতি-ভাই ছিল,—সে তখন নাবা-
লক,—তাহার তিন আনা অংশও আমাদের
হাতেই ছিল ।

সুমতি । আপনি বুদ্ধিমান,—সুতরাং
সে নাবালকের তিন আনা অনান্যসেই
আপনার হাতেই রহিয়া গিয়াছে ।

কামিনী । বড় অনান্যসে নহে । সে
নাবালক রমণীকান্ত ডয়ানক গৌরার ছেলে
ছিল । তাহার অংশ আমার হাত-ছাড়া
করিতে চার । ইন্ডিহা বর্দ্ধমানে গিয়া কালে-
ক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করে যে,
তাহার অংশ কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে
বার, কিন্তু কালেক্টর সাহেব আমার হাত-
ধরা—দরখাস্ত নামজুর হইল, নাবালকের
সম্পত্তির ভার আমারই হস্তে রহিল ।

গৌরার রমণীকান্ত তার পর বীরগ্রামে
গিয়া প্রজাদিগকে খাজনা দিতে রহিত
করিল, নিজে লাঠি লইয়া আমার নগদী-
পক্ষে বীরগ্রাম হইতে তাড়াইয়া দিল, প্রায়
একশত প্রজার হস্তে লাঠি মিয়া সেই গ্রামের
রাজা হইয়া বসিল ।

এখনকার কালে সেরূপ হইলে পুলিশে
খবর দিতে হয়, সে কালে আমরা নিজের
হাতেই অনেক কাজ করিতাম । আমিও
সে বয়সে একটু নির্যোদ্ধ ও গৌরার ছিলাম,

পাঁচ শত লাঠিয়াল লইয়া সেই গ্রাম আক্র-
মণ করিলাম । তাহার পর কি হইয়াছে
আপনি বোধ হয় শুনিরাছেন ।

সুমতি । শুনিরাছি, সেই হান্দামার
রমণীকান্ত খুন হইয়াছিল । তাহা লইয়া
পুলিস আপনাদিগকে অনেকদিন অবধি
দিক করিয়াছিল ।

কামিনী । পুলিশকে গরিবেরা ভয় করে,
ধনীলোকে ভয় করে না । তবে কাহাকেও
চালান না দিলে দারোগা বাবুর চাকরী থাকে
না, তাই পাঁচ সাত জন আমাদের মাহিনা-
করা লাঠিয়াল ধরিয়া দিলাম, তাহাদের
শান্তি হইয়া গেল, তজ্জন্ত তাহাদের স্ত্রী-
পুত্রকে যথেষ্ট পুরস্কার দিলাম । বাহারা
প্রকৃত আসামী, তাহাদের সরাইয়া দিলাম,
এবং হীরাসিং, লালসিং আর জওহর সিং
ইহারা রাজির মধ্যে রমণীকান্তের লাশ দাহ
করিয়া ফেলিল এবং দেশান্তর হইল ।

সুমতি । সুন্য বন্দোবস্ত । ইতার পর
আপনার ভাবনার কারণ কি আছে? হান্দা-
মার আপনি ছিলেন না, প্রমাণ করিয়াছেন
বাহাদের কথা প্রমাণ করিলেন, তাহারা
জেলের গেল, আর চিন্তা কিসের? জটা-
ধারী কি জিংশং বৎসর পর আপনার
বিকক্ষে সেই মোকদ্দমা আবার উঠাইতে
চাহে?

কামিনী । জটাধারী যে সেই হান্দা-
মার কথা জানে, তাহা আমার স্থির-বিশ্বাস,
সে সমস্ত শুনিরাছে, সমস্ত জানে । কিন্তু
সে জন্ত আমি ভয় করি না । জিংশং বৎসর
পর পুরাতন মোকদ্দমা উত্থাপন করিতে
পারিবে, সে ভয় আমি করি না ।

সুমতি । তবে কিসের ভয়?

কামিনী । রমণীকান্ত আমার সহিত
নিরোধ আশ্রয় করিয়া অবধি তাহার ক্রীকে

পোষাপত্র লইবার অহুজাপত্র দেয়।
শোয়ার ছেলে বোধ হয়, বুঝিয়াছিল যে,
কোন দিন লাঠালাঠিতে তাহার প্রাণ
বাইবে।

সুমতি। আপনি বুদ্ধিমান জমীদার
হইয়া একটা বিধবা মেরেমাছুষকে ভর
করেন? আপনি সনাতনবাটিতে থাকিতে
রমণীকান্তের বিধবা পোষ্য গ্রহণ করিবে?

কামিনী। সে পথ আমি বন্ধ করি-

রমণীকান্তের মৃত্যুর পর তাহার
বিধবা যোগমারার নিকট সে অহুজা-পত্র
কাড়িয়া লইয়াছি এবং তাহার স্বামীর
সমস্ত সম্পত্তি তাহার নিকট লিখাইয়া
লইয়াছি; কিন্তু আমি গুপ্ত অহুসন্ধানে
জানিয়াছি, এই জটাধারী সেই অহুজা-
পত্রের কথা জানে, এখন সেই কথা আদা-
লতে প্রমাণ করাইবে এবং আপন ছেলে-

পোষ্যস্বরূপ যোগমারাকে দিবে।

তাহার পর পুত্রের স্বস্ত্রে তিন আনা জমী-
দারীর মালিক হইয়া বসিবে। যেৰূপ
যোগমারার আচার-ব্যবহার দেখিতেছি,
বোধ হয়, সেই নিলজ্জ বিধবাও বুঝি জটা-
ধারীর গৃহলক্ষী হইয়া বসিবে। যেৰূপ জটা-
ধারীর আচার-ব্যবহার দেখিতেছি, তাহার
ধৰ্মপ্রচার ষোল আনা ভণ্ডামী, উদ্দেশ্য জমী-
দার হইয়া বসিবে। থাকিত সাবেক কাল,
এমন বিধবী দেশাচারপ্রভি স্ত্রী-পুরুষকে
আন্তো মাটিতে পুতিয়া কেলিতাম। কিন্তু
এখন কি আমাদের ক্ষমতা আছে, না হিন্দু-
রানী আছে?

অনেকক্ষণ কথা কহিয়া কামিনী-বাবুর
গলা শুকাইয়া আসিয়াছে এবং হিন্দুরানীর
ভৃদংশর জন্ত হৃদয়ও ব্যথিত হইয়াছে, সুতরাং
এক গ্রাস সুরা পান করিয়া গলাটা সিক্ত
করিলেন এবং হিন্দুরানী বজার রাখিলেন।

পরে ধীরে ধীরে আবার বলিতে লাগিলেন,
“এই আমাদের বিপদ, এখন যে উপায় অব-
লম্বন করিয়াছি, তাহা সমস্ত কল্যাণ বিনাশ,
প্রবণ করুন।

তালপুকুরের তারিঙ্গী মল্লিকের সম্পত্তি
কাল হইয়াছে। তাহার সম্পত্তি সে পুর্বেই
জীকে উইল করিয়া দিয়াছিল। তনুলায়
না কি মরিবার সময় আর একটা উইল
করিয়াছে, তদ্বারা আপনার সমস্ত সম্পত্তি
হেম ও শরৎকে দিয়া গিয়াছে। কি সর্ব-
নাশ! অনাথা বিধবাকে কি কেহ এরূপ
করিয়া ভাসাইয়া যায়?”

সুমতি। ভাসিয়া আসিয়া না কি সে
বিধবা সনাতনবাটিতে কুল-কিনারা পাই-
য়াছে?

কামিনী। গোপবালা নিরাশ্রয় হইয়া
পর্যামর্শ লইতে আসিয়াছিল। আমিও
সুপারামর্শ দিয়াছি।

সুমতি। এ অবস্থায় পর্যামর্শ ত সহজ।
উইল রদ করিয়া নিরাশ্রয় বিধবার সম্পত্তি-
রক্ষার ভার গ্রহণ করুন এবং সেই যৌবন-
ক্রিষ্টা বিধবাকে আপনি স্নেহদান পূর্বক
সাহসনা করুন।

কামিনী। না হে, এ ঠাট্টার কথা নহে,
এর ভিতর গুরুতর কথা আছে। সেই জটা-
ধারী তারিঙ্গীর মৃত্যুর সময়ে ছিল, বুঝো
উইল করিয়াই যে হঠাৎ মরিল, তাহাতে
সন্দেহের কারণ আছে। জটাধারী বড় সহজ
লোক নহে।

সুমতি। এ দেখিতেছি, আপনাদের
পড়াগেরে বুঝি কলিকাতা আপনাদের
কাছে হার মানিয়াছে। তা জটাধারীর
উপর খুনের দাবী চাপাইয়াছেন না কি?
সাবাস পাড়াগেরে বৃদ্ধি! বীরপ্রাচীর
হাঙ্গামা লইয়া সে আপনার উপর খুনের

করী আনিবে,—আ আপনি আমায় থাকিতে
তাহার নামে খুনের দাবী আনিয়াছেন।
সম্মান।

কামিনী।—আমি দাবী আনিব কেন?
দেবে বড় কাটা করে হয়।—পোশাকসম
কোনো পরখান্দ পাঠাইয়াছে যে, তাহার
কায়ীর হঠাৎ মৃত্যুতে সম্বন্ধের কারণ
আছে, সুতরাং যে বিষয়ে তদন্ত হওয়া
উচিত। সুতরাং পুলিশ তদন্ত করিবে,—
এক পুলিশ আমাদের হাতে। জটাধারী যদি
খুনের দাবীতে চালান না হয়, তবে আমি
এত দিন বুধা বিষয়কর্ম করিলাম।

সুমতি। কামিনী-বাবু, আপনি আমার
নিকট বস্তুস্বরূপ পরামর্শ লইতে আসিয়াছেন,
আমি বন্ধু হইয়া মিথ্যা পরামর্শ দিব না,
—আপনি এ কার্যে একটু ভুল করিয়াছেন।
এখনকার কালে এরূপ মিথ্যা খুনের দাবী
বোধ হয়, টিকিবে না, শেষে আপনি বিপদে
পড়িতে পারেন।

— কামিনী। এটি আপনার ভুল।
কলিকাতার কি হয়, জানি না, কিন্তু পাড়া-
পায়ে আবাদবুদ্ধবনিতা সকলে যে কথা
জানে, বিচারাসন পর্যন্ত সে কথা পৌছে
না,—এই আমাদের আধুনিক বিচারের
বিষয়। কার্য দান কে কাটিয়া লইল, গ্রাম
ভুক্ত সকলে জানে, বিচারক মাথা চুলকাইয়া
বুঝিতে পারিলেন না, বিপরীত বিচার করি-
লেন। জটাধারী নির্দোষী বলিয়া দেশ-
কিনেশে পরিচিত হউক না কেন, বিচার-
পতি তাহা জানিবেন না,—শিক্ষিত সাক্ষী
যেমন বলিবে, অর্থহীন পুলিশ যেমন
রিপোর্ট দিবে, তাহার বাহিরে বিচারকের
বাইবার উপায় নাই, এই আধুনিক বিচারের
বিষয়। সাহেবেরা বিচারদেবীকে একটি
ঠুলি পরাইয়া তাহার মূর্তি করেন

না। আমাদের বিচারপতিগণও তদ্বৎ ঠুলি
পরিয়া এবং খানে খুশী সিয়া আসিন এবং
করেন।

সুমতি। এ কথা সত্য, কিন্তু তথাপি
কামিনী-বাবু সারধান। বইজ্ঞচরককে খুশী
বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিবে কি?

কামিনী। যদি নাই পারি, তথাপি শু
কয়েক মাল জটাধারী মহাশয়কে হাবুডু
বাওয়াইব, একটু বিলকণ শিক্স দান
করিব।

সুমতি। এ আপনাদের পাড়াপেয়ে
বুদ্ধি। মোকদ্দমার শেষে কিছু হইবে না,
কেবল হায়রাণ করিবার জন্য মোকদ্দমা
করা, এও আপনাদের পাড়াপেয়ে বুদ্ধি!

কামিনী। আর আপনারা কলিকাতার
লোক বড় হায়রাণ করেন না, এক কোপে
কাটেন। কেমন?

সুমতি। তা আমরা হিন্দুর ছেলে হয়ে
আর কি করি? এক কোপেই কাটিতে
হয়। তা এখন সমস্ত অবস্থা বুঝিলাম, এখন
কি করিতে হইবে, বলুন।

কামিনী। বাল্যকাল হইতে আপন
আমার সুহৃদ, আমার পরামর্শদাতা, বিপদ
আপদে আমার বন্ধু, এই মোকদ্দমার আপ-
নাকে সাহায্য দান করিতে হইবে। আপ-
নাকে বর্জন যাইতে হইবে, আমার
উকীলগণকে শিক্ষা দিতে হইবে, এই বিষয়
মোকদ্দমাটি আপনাকে সহজে চালাইতে
হইবে। আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, আপনার
অসাধারণ উদ্ভাবন-কমতা, আপনার অসংখ্য
বন্ধু ও আশাপ্রী লোক, এ সমস্ত আমার
অপরিচিত নহে। আপনি কলিকাতার মধ্যে
অধিতার ধীসম্পন্ন এটর্নী এবং আমার পরম
সুহৃদ, এই জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি।
অনেকজন ধরিয়া মোকদ্দমার কথা হইতে

সামান্য, অনেক আয়োজনার পর সবচেয়ে
কবীরাংশী-টিক হইল। বাকি দুই প্রহরের
পক্ষ অক্ষয়্যাবু বিদ্যার হইলেন, বাইবার
সময় কামিনী-বাবুকে বলিলেন, “আপনি স্ব-
কাম্যে যান, আমি হইতের কাজ করাপন করি-
বুই আসিভেছি, তাহাতে আর চিন্তা কি?”
বুদ্ধিমান্ ভ্রমতি-বাবু মনে মনে ভাবিলেন,
“কামিনী-বাবু এ কাজটিতে সহসা হাত
কেঁড়াইবে না। নির্দোষী লোকের উপর
খুলী মোকদ্দমা চাপান,—কাজটা কি পাড়া-
পেরে রকম হইয়াছে? প্রথমে জজ সাহেবের
নিকট উইলবানা জাল প্রমাণ করিলেই
হইত। তাহার পর জজ সাহেবের অজুযতি
বইরা জটাধারী বেটাকে জালের মোকদ্দমার
কেলাইলেই হইত। তাহানা করিয়া গোঁয়ারের
মত একেবারে খনের মোকদ্দমা চাপাইয়া-
ছেন। কামিনী-বাবুর শরীরখানিও যেমন
হুল, বুদ্ধিখানিও সেইরূপ হুল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

খিড়কীর পুকুরে খোসগল্প।

কলিকাতার যখন এই সমস্ত আরোজন
হইতেছিল, সে সময়ে সনাতনবাটিতে অনেক
খটনা হইয়া গিয়াছিল। কাহার নিকট সে
সমস্ত ঘটনার সংবাদ পাইব? কে আমাদের
যে সমস্ত কথা জানাইবে? হুংথের বিষয়,
সনাতনবাটিতে সংবাদগজ্ঞও নাই, সংবাদ-
দাতাও নাই। অগত্যা আমরা আর একবার
জব্বান-বাড়ীর খিড়কীর পুকুরে যাই,—
তখনই প্রত্যহই গ্রামের সংবাদ রটনা হয়
এবং গ্রামের লোকদিগের চরিত্রের সর্বাঙ্গ
কথাবোচনা প্রকাশিত হয়।

এতকালে খুঁয়া না উঠিতে উঠিতেই
আমাদের পূর্ব-পরিচিতা নবীনার হল যত
কম কম ধবে বাট প্রতিক্রমিত করিলেন,
রশে বাট আসিলো করিলেন। স্বামী, সিন্ধা
ফুলহুমারী কাকাল হইতে কলস নানাইরা
একটু হুঁকে হাসিয়া বাজার ছড়া কাটিতে
আরম্ভ করিলেন,—

“ওলো, রাজবাড়ীতে কেমন কেমন কথা
জনতে পাই,
ভয়মাথা জটাধারী না কি হবে
নাতজামাই।”
বসন্তকুমারী। কে লো, কে জামাই
হবে? তোর বে আজ বড় রঙ্গ দেখছি।
বলে,—

“মালিনী তোর রঙ্গ দেখে অঙ্গ অঙ্গে যায়।”
ফুলকুমারী। আমার আবার রঙ্গ কি?
যার রঙ্গ কদুবার সময় হয়েছে, সে রঙ্গ
কদুবে।

কুমুমকুমারী। সে কে লো! ভেদেই বল
না, অত ঠেকার কিসের?

ফুলকুমারী। আমার আবার ঠেকার
কিসের লা? যার ঠেকার হবার, তার
ঠেকার দেখে গে বা।

হেমকুমারী। বুঝি, বুঝি! তাই
বুঝি বিভাসুন্দরের ছড়া কাটছিলি? তা
কথাটা কি সত্য না কি? আমাদের বিভা
ঠাকরুণ সত্য সত্য বৈষ্ণবী হয়ে বেরিয়ে যাবে
না কি? বলে,

“পান চিবুতে জ্ঞান না ধনি। শিখতে
হবে সিদ্ধি বোঁটা।”

বর্ণকুমারী। আর “বিভা” “বিভা” ক’রে
চাকলে কি হবে? আগুন কি আর চাই
দিয়ে ঢাকা যায়? না আমাদের যোগমাষ্টার
আচরণের কথা কাপড় বুখে বিরা বন্ধ রাখা
যায়?

হেমকুমারী। ওলো, নাম-টায় করিস
নি লো,—তুন্ডে পেলে এখনই মহা কুল-
কেজ লাগিবে দেখে।

স্বর্ণকুমারী। কিদের কুলকেজ ? যে দিন
সন্ধ্যার সময় সন্ন্যাসী ঠাকুর মাথা ঘরিয়াছে
বলিয়া ভয়েন, আর যোগমায়া-দিদি ঘোড়া
দিয়ে পায়ে ঠিকিবে পাখা কহুতে লাগ-
লেন,—তা কি কেউ দেখে নাই ? আমরা
কি চখে তুলিবেবেছিলেম ?

বসন্তকুমারী। সত্য না কি লো ? সত্য ?

স্বর্ণকুমারী। সত্য নয় ত কি ? আর
যোগমায়া-দিদি সন্ন্যাসী ঠাকুরের অস্ত
বাস্তাসা তিজিয়ে রাখেন, পানকল ছাড়িয়ে
রাখেন,—তুই দেখেছিস কি ? সন্ন্যাসীর
ঘরের লম্বী হয়েছেন, কবে মালা বদল ক'রে
গেকরা বসন প'রে সন্ন্যাসিনী হয়ে বেরিয়ে
যায় দেখে !

হেমকুমারী। না লো না, যোগমায়া-দিদি
আবার গেকরা-বসন প'বে ! তোরা তবে
সব দেখিস্নি বুঝি ?

সকলে। কি ? কি ? কি ?

হেমকুমারী। সব চখ বুজিয়ে থাকবি ত
দেখবি কি ? আমি সে দিন সন্ধ্যার সময়
যোগমায়া-দিদির ঘরে উঁকি মেয়ে দেখি, ও
মা ! দেখি না, দড়ীতে একখানি নতুন কালা-
পেড়ে শাড়ী বুলছে,—ও মা, আমি ত দেখে
অবাক ! আজ তিরিশ বছর বিধবা হয়েছে,
খান কাপড় পরেছে, এখন কি না পাড়ুলা
কাপড় প'বার সাথ হয়েছে ? ও মা, কোথা
যাব মা ! যোগমায়া-দিদির মনে এত ছিল ?

স্বর্ণকুমারী। আরও কত দেখবি লো,
আরও কত শুনিবি ! তোরা কানে তুলা দিয়ে
ধাকিস, তা সব কথা শুনিবি কোথা থেকে ?
সব কথা ত শুনিবু নি।

সকলে। কি কি, বল না স্বর্ণদিদি।

স্বর্ণকুমারী। রদি, ঐ যে বেণেবো আমা-
দের বাড়ীতে আসে না ? তাকে জিজ্ঞাসা
করিস। যোগমায়া-দিদি না কি বেণের
লোকান থেকে মায়াঘরা এনেছে, যেতি
এনেছে, আরও কত কি কিনিছে। আর,
বেশ ! বেশ ! বেশ ! ওলো, বুঝে হ'লে কি
মনের সাধটুকু যেটে, তা যেটে না ! যোগ-
মায়া-দিদির সাধটুকু আবার গজিয়ে উঠছে !

স্বর্ণকুমারী। ওলো, শুধু মাথা-ঘরা নয়
লো, আরও কত কি দেখবি।

সকলে। আর কি গো দিদি ?

স্বর্ণকুমারী। ওলো, ঐ নাপতে-বো
আমাদের বাড়ী আসে না ? তাকে জিজ্ঞাসা
করিস, কত শুনিবি এখন ! কোন্ দিন বা
যোগমায়া-দিদি পায়ে আলতা দিয়ে, দাঁতে
মিশি দিয়ে দর্শন দিবেন ! দিদির কাঁচা বয়স
কিয়ে আসছে লো ! কথায় বলে,

“জীবন যৌবন গেলে, কি করে।” তা
যোগমায়া-দিদির কিরেছে ! যোগমায়া-
দিদির বড় কপালের জোর লো, বড় কপা-
লের জোর !

স্বর্ণকুমারী। সত্য লো, সে কথা সত্য।
যোগমায়া-দিদির চূলে এখন একটু বেশ
তেল পড়ে, আবার শুনেছি, নানারূপ বেশ-
ভূষার আয়োজন হচ্ছে। ঐ তাঁতিবো
আমাদের বাড়ী আসে না ? তাকে জিজ্ঞাসা
করিস। ও মা ! যোগমায়া-দিদি না কি
তাঁতিবোকে রান্না পেড়ে শাড়ী, কালাপেড়ে
শাড়ী, সব আনুতে বলেছে। অবাক ক'লে
মা ! কোথা যাব মা ? ইত্যাদি।

নবীনার দল কলস লইয়া চলিয়া না
বাইতে বাইতেই একদল মধ্যবয়স্ক নারী
উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদেরও আজ চের
কথা—সনাতনবাটীতে আজকাল নানা
বিষয় লইয়া বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে।

মাতঙ্গিনী । ও লো, আজ যে বড়
তোদের হাসি-খুশী দেখছি, কি, কথাটা কি ?
তরঙ্গিনী । ওলো, তা জানিস্ নি ? এই
যে বিয়েতে আমরা অল সহিতে যাব ।

মাতঙ্গিনী । কার বিয়ে লো, কার বিয়ে ?
রাধারঙ্গিনী । ও মা, তা জানিস্ নি ? তুই
কি এই বয়সে চখের মাথা খেয়েছিস না কি ?
বলি, কিছু ঠাণ্ড কর্তে পারিস্ নি ?

মাতঙ্গিনী । কে, আমি ত বাড়ীর কারও
বিয়ের কথা শুনি নি ।

রুক্মসঙ্গিনী । ঠাঁঃ ওলো, এ সব বিয়ের কি
কথা হয়, এ সব বিয়ে আগে হয়, তার পর
কথা উঠে । ঐ যে তালপুকুরে মল্লিকদের
বাড়ী একটা মেয়ে বিধবা হয়ে আবার বিয়ে
করেছিল না ? এবার আবার আমাদের
জমীদার-বাড়ীতেই তাই বুঝি হয় ।

মাতঙ্গিনী । সে কি ? সে কি ? বিধবা
হ'লে কি আবার বিয়ে হয় ? তালপুকুরে
তারা না কি একঘরে হয়ে আছে ?

তরঙ্গিনী । তা হ'লই বা একঘরে । অমন
রূপবান্ সন্ন্যাসীকে নিয়ে সে ত বেরিয়ে
যাবে,—তার পর গাঁয়ের লোক একঘরে
কবুলেই বা !

মাতঙ্গিনী । সন্ন্যাসীর সঙ্গে কার বিয়ে ;
হবে লো ?

রাধারঙ্গিনী । বলি, তুই কি কচি খুকী
লা ? আমাদের বোণমারার রকম-সকম
দেখিস্ নি ? ছি ! ছি ! অমন মেয়ের মুখে
আগুন, সন্ন্যাসীর মুখে আগুন !

রুক্মসঙ্গিনী । কচি খুকী না কচি খুকী ।
বলি, ঐ সেকরাদের ছেলেরা আমাদের
বাড়ী এসেছিল, তা তুই কি দেখিস্ নি ?

মাতঙ্গিনী । হাঁ হাঁ, তা দেখেছি । সে
ছোঁড়াটা এসেছিল কেন ?

রুক্মসঙ্গিনী । ও মা, তা জানিস্ নি ?

সেকরাদের ছেলেরা এসে কিস্ কিস্ করে
অনেকক্ষণ ধরে আমাদের বোণমারার সঙ্গে
কথা কচ্ছিল । আমি অবশি খোঁকার ঝিকে
পাঠিয়ে দিলেম, বলি, বা ত, কি বলছে শোন
ত । খোঁকার ঝি কলাসাহেব আড়াল থেকে
সব শুনেছে ।

মাতঙ্গিনী । কি বল্ছিস্ দিদি, বোণ-
মারা কি গয়না কর্তে গিয়েছে ?

রুক্মসঙ্গিনী । ওলো, গয়নার বাড়া লো, !
গয়নার বাড়া ! সেকরাকে একগাছা হাতের
নো তৈয়ার কর্তে বলেছে । বিধবা হয়ে
আবার বিয়ে করবে, আবার ঘোমটা দিয়ে
বৌ হবে, আবার হাতে নো পর্বে, গারে
গহনা পর্বে, এ বয়সে আবার ছেলের মা
হবে ! মুখে আগুন ! মুখে আগুন ! যম কি
এমন বিধবাদের ভুলে থাকে ? পোড়ামুখী
চল্লিশ পেরোয়, আবার নাকে নথ পর্বে, পায়ে
মল পর্বে, কালাপেড়ে সাজী পরে সন্ন্যাসীর
ঘর করবে ! মুখে আগুন ! মুখে আগুন !

রাধারঙ্গিনী । ওলো, মল পরাবে লো,
মল পরাবে । কা'ল সন্ধ্যার সময় লোহার
মল নিয়ে সব এসেছে, মল পর্ব্বার আশা
মেটাবে ।

সকলে । কে এসেচে দিদি ? কে
এসেচে ?

রাধারঙ্গিনী । তা বুঝি জানিস্ নি ? ঐ
যে পুলিশের দারোগা এসেছে, লালপাগড়ী
বেঁধে সব পাহারাওরা এসেছে ।

সকলে । কি সর্কনাশ ! ও মা, কি হবে
গো ? দারোগা কেন এসেছে দিদি ?

রাধারঙ্গিনী । শুনিছি না কি কর্তা-বাবু
দারোগা মশাইকে ডাকিয়েছেন, ঐ সন্ন্যাসী
ঠাকুরকে বেঁধে বর্জমানের নিয়ে যাবে । বোণ-
মারার রকম-সকম দেখে কর্তা-বাবু না কি
বড়ই রেগেছেন, বোধ হয়, বর্জমানের সাহেব-

দের কাছে বলেছেন, সাহেবেবো! হুকুম দিয়েছে—সন্ন্যাসীকে আর বোগমারাকে বেঁধে বর্জমানে নিয়ে আর।

সকলে। কি সর্কনাশ! কি সর্কনাশ! হি! হি! জমীদারের বাড়ীর বৌ হয়ে বোগমারা এমন চলানটা চলালে! শেষে পুলিশ পর্যন্ত এ কলঙ্ক রাষ্ট্র হ'ল! হি! হি!

মধ্যমবয়স্কাদিগের দল কলস লইয়া চলিয়া গেলেন,—তাহার পর প্রাচীনাদিগের দল আসিলেন। তাঁহাদেরও ঐ কথা-বার্তা, সনাতনবাটীতে পুলিশ আসিয়াছে, স্ত্রতরাং ঐ বিষয় ভিন্ন গ্রামে আজ অল্প কথা নাই।

শ্রামাসুন্দরী। ওলো, আর শুনেছি! ঐ তালপুকুরে পুলিশের দারোগা বাবু এসে-ছিল, সে না কি কা'ল সন্ধ্যার সময় আমাদের গ্রামে এসেছে?

বামাসুন্দরী। কেন লো? পুলিশ আবার কেন? ও মা, শুনে যে গা কাঁপে।

শ্রামাসুন্দরী। তা আসবে না ত কি? গ্রামের যেমন রীতিপদ্ধতি হয়েছে, পুলিশ না এসে আর কি করে? ঐ সে বছর না কি তালপুকুরের হেম-বাবুর ঘর থেকে একটা বিধবা মেয়েকে বার ক'রে শরৎ-বাবু বিয়ে করেছে। আবার এখন জমীদার-বাড়ীতে শুদ্ধি, ঐ পোড়ামুখো সন্ন্যাসীটা না কি সেই তলাসে ঘুরছে। কর্তা-বাবু গ্রাম থেকে গিয়ে অবধি সন্ন্যাসীটার স্পর্ধা বেড়েছে, এখন না কি বলেছে, আমাদের বোগমারার গলায় মালা দিয়ে তাকে বের ক'রে নিয়ে যাবে। ও মা হি! হি! হি! তা কর্তা যশাই না কি সাহেবদের ছাই ব'লে দিয়েছেন!

বামাসুন্দরী। ও মা, কি লজ্জার কথা! কি ঘোর কথা!

শ্রামাসুন্দরী। তাতে আবার লজ্জা কি লো? কলির বে রীতিই এই।

হরসুন্দরী। ওলো, তা নয় লো, তা নয়, সেজন্য পুলিশ আসেনি! লো, সে অল্প নয়।

সকলে। তবে কিসের জন্ত দিদি?

হরসুন্দরী। কর্তাবাবু আমার বাড়-শোপালকে একদিন বলেছিলেন, সন্ন্যাসী না কি দালা করে, খুন করে, লোককে ঔষধ খাওয়ার, সব করতে পারে। তাই পুলিশ এসেছে লো!

হরসুন্দরী। না লো, তা ত নয়, তা নয়, ঐ যে তালপুকুর থেকে মল্লিকদের বৌ আমাদের বাড়ী এসেছিল না?—আহা, বাছার কপাল ভেঙে গেছে। এ বরষে বিধবা হয়েছে!—তার সঙ্গে বড় গিন্নী একদিন কথা-বার্তা বলছিলেন, তখন আমার বড় বৌ সেইখানে ছিল। তা মল্লিকদের বৌ বলছিল যে, ঐ ওদের গ্রামে যে হেম-বাবু আছে, সে না কি মল্লিকদের সব বিষয় ঠকিয়ে নিয়েছে। তাই পুলিশ এসেছে লো, তাই পুলিশ এসেছে।

ত্রিপুরাসুন্দরী। ওগো, না গো, তা নয়! আমাদের বিলাসকামিনী এর ভিতরের কথা সব জানে। আমার বিলাসকামিনীর যে বছর বিয়ে হয়, সেই বছর আমাদের বাড়ীর রমণী-বাবু খুন হয় না?

হরসুন্দরী। হী হী, আর বাছা লাড়-গোপালের সেই মাসে ভাত হয় লো, সেই মাসে তার ভাত হয়। তা ভাতের সব আয়োজন,—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

হরসুন্দরী। ঠিক বলেছ দিদি, ঠিক বলেছ, সেই মাসে আমার বড় বৌয়ের সাথ হয়। আহা, রমণী আমার বৌকে কত সামগ্রী দিত,—তা সে খোকার হুঁৎ দেখেও যেতে পারতেন না গো,—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

জিপুরাস্থানবরী। তা সেই খুনী মোকদ্দমা পুলিশ না কি এতদিনে সন্ধান পেয়েছে, তাই এসেছে। আহা, এমন ছেলেও খুন হয়, সে আমার বিলাসকাছিনীকে কত ভালবাসত, বাছা বিয়েটাও দেখে বেতে পেলো না গো— ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সন্ধ্যার সময় জমাদার মহাশয় খানার কিরীয়া গেলেন।

দারোগা। কি হইল?

জমাদার। মৃত্যুতে বহুত সন্দেহ আছে।

দারোগা। কিরূপ সন্দেহ?

জমাদার। বোধ হয়, লাগুয়াই দেখে খুন কিয়া হোঁগা।

দারোগা। কে খুন করিয়াছে?

জমাদার। বোধ করি, রমাপ্রসাদ নামে একটো সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীটো বহুত বদমাস আছে। সাহেবকো পাস আপনি রিপোর্ট লিখুন যে, বদমাস রেজিষ্টারিমে উস্কো নাম লিখা যায়।

দারোগা। কি বদমাসী করিয়াছে?

জমাদার। সে পুলিশ ডরায় না। হামাকে দেখ্কে সবকোই ডরায়, সে কিছু ডরায় না। জমাদারের সম্বন্ধে সে হালে, এরসা বদমাসী।

দারোগা। তা তদন্তে স্থির হইল কি? খুন মিথ্যা?

জমাদার। ঠিক কেমন ক'রে হইবে? শুদ্ধলোক আসামী হইলে কি খুন আসকারা হোয়? গরিবলোক হোয় তো ডুবুসে জলদি কবুল করান যায়,—বল কবুল জবাব লিখ্কে খুনি মুকদ্দমা চালান দে।

দারোগা। হুঁ মেডুরাবাদী! এখন কেবল কবুলে কি খুনী মোকদ্দমা প্রমাণ?

জমাদার। হয় না ত কি? খুনী মোকদ্দমায় কবুল আসামী লোককো ডিপুটী বাবু ছোড়া দেনে শক্ত।

দারোগা। আরে, ডিপুটী-বাবু যেন দায়রায় সোপর্দি করিলেন। দায়রায় কি হয়? জঙ্গ-সাহেব বখান ছাড়িয়া দিবেন, তখন কি হবে?

জমাদার। আরে, আসামী দায়রা-সোপর্দি

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

পুলিস-তদন্ত।

খিড়কীর পুকুরের খোসগল হইতে আমরা জানিয়াছি যে, প্রথমে তালপুকুরে, তৎপরে সনাতনবাগিতে পুলিশের আগমন হইয়াছে; সুতরাং এক্ষণে পুলিশের তদন্ত-সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যিক।

বর্দ্ধমানের ভূতপূর্ব নাজীর তারিণী মল্লিকের সহসা মৃত্যু হইয়াছে, গ্রামের লোকে সন্দেহ করে, মৃত ব্যক্তির স্ত্রী সন্দেহ করে যে, এ মৃত্যু স্বাভাবিক নহে, তদন্ত আবশ্যিক। মৃত্যু স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক,—শিক্ষিত, উন্নতচরিত্র রমাপ্রসাদ সরস্বতী ঘোষী কি নির্দোষী, এ গুরু বিষয় তদন্ত করিতে অসীম-ক্ষমতাশালী জমাদার মহাশয় গ্রামে উপস্থিত হইলেন।

জমাদার পশ্চিমে লোক, তিনি বাঙ্গালীও জানেন না, ভাল হিন্দীও জানেন না,— তাঁহার বৃহৎ শরীর ও বৃহৎ গোঁপ দেখিয়া বোধ হয়, কর্তৃপক্ষীরেরা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে জমাদার করিয়াছেন! তাঁহার বেতন ১৫৮ টাকা, ১৫৮ টাকার উপযুক্ত তদন্ত হইল। অনেক সাক্ষীর জবানবন্দী হইল, সরস্বতী ঠাকুরকে দুই চারিটা তিরস্কার করা হইল,

হইলে তো হাম লোককে কাম তামাম হইল। ছুরি লোক ধর আসামী খালাস দেব, তব হামলোককা সাহাব সর্বমেট্টমে রেপোট করোগা কি, ছুরি লোক গাথা আছে।

দারোগা মহাশয় দেখিলেন, জমানার মেয়দাবাদী হইলেও বুদ্ধিমান বটে। বাহা হউক, এ মোকদ্দমার বিশেষ সন্দেহের কারণ থাকায় দারোগা মহাশয় নিজেই তদন্তে বাহির হইলেন।

জমানার বেরূপ দেখিতে পালোয়ান, দারোগা মহাশয় সেইরূপ ক্ষুদ্র, ক্ষীণ ও দুর্বল, কিন্তু বুদ্ধিটুকু বড়ই তীক্ষ্ণ। দারোগা বাবু বাথরগঞ্জের লোক, বাথরগঞ্জের কোন পুলিশ-কর্মচারীর ভৃত্য থাকিয়া পুলিশ-কার্যে দীক্ষিত হইয়াছেন। তার পর কিছুদিন কুলীর রিকুটর হইয়াছিলেন, শেষে তীক্ষ্ণবুদ্ধিবলে পুলিশে চাকরী পাইলেন। কয়েক বৎসর জমানারী করিয়া দারোগাগিরী কাজ পাইলেন এবং কার্য-দক্ষতার কর্তৃপক্ষদিগকে সর্বদাই সম্মতি রাখিতেন। নিজ গ্রামে পাকা ইমারত প্রস্তুত হইতেছে। পুঙ্খরিণী, বাগান প্রস্তুত হইতেছে। বাড়ীতে যথেষ্ট টাকা পাঠান, গৃহিণীর সোনার গহনার অভাব নাই, ছেলে-পুলেদের কাপড়-চোপড় অতি উৎকৃষ্ট। তন্নিম্ন খানার মিকট একটি সদোগাপ-বিধবা বাস করিত, তাহার জন্ত ১২ ভরির সোনার চক্রহার সেকরা তৈয়ারি করিতেছে। দারোগা মহাশয়ের একটি বোঝা আছে, এবং বাঘন, চাকর ও সহস খানার বাস করে। দারোগা মহাশয়ের বেতন মাসে ৩০ টাকা।

দারোগা মহাশয় বিশেষ তদন্ত করিতে লাগিলেন। ঘন ঘন ডাইয়ারি পাঠাইতে

লাগিলেন, ডাইয়ারির লেখা অতি সুন্দর, অতি পরিষ্কার এবং অনিন্দনীয়। তদন্তে স্থির হইল যে, রমাপ্রসাদ তারিণী-বাবুকে ঐযুগির পরিবর্তে বিব বাওয়াইয়াছেন, তাহা-তেই তারিণী-বাবুর সহসা মৃত্যু হইয়াছে। প্রমাণ সমস্ত সংগ্রহ করিয়া পশ্চিমে সন্ন্যাসী-টাকে হাতে হাতকড়ি দিয়া বদ্ধমানে চালান দিতেছেন, এমন সময় ইন্সপেক্টর-বাবু গ্রামে উপস্থিত হইলেন।

ইন্সপেক্টর বাবু শিক্ষিত যুবা, কলেজে পড়িয়াছেন, উদ্বোধন জন্ম, ধর্মার্থজ্ঞান আছে। বদ্ধমানে সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত, তাহার দ্বারা মোকদ্দমা তদন্ত হয় বলিয়া পক্ষেরা সর্বদা আদালতে আবেদন করিত। তিনি তালপুকুরে মল্লিকদের বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, দারোগা-বাবু বসিয়া ধূম-পান করিতেছেন,—সন্মুখে রমাপ্রসাদ দণ্ডায়মান,—হাতে

দেখিয়াই তাহার আগদ-মস্তক শরীর জলিয়া গেল, কর্মমস্তক জুতার আঘাতন দারোগা মহাশয়কে কিঞ্চিৎ দান করিতে, তাহার বড়ই প্রবৃত্তি হইল,—কিন্তু তিনি সে ইচ্ছা সংবরণ করিলেন,—জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কি?”

দারোগা তখন মাথা চুলকাইয়া অক্ষুট-স্বরে বলিলেন, “খুনী মোকদ্দমার আসামী চালান দিতেছিলাম,—তা আপনি আসিয়াছেন,—বাহা আজ্ঞা হয়, করিব।”

ইন্সপেক্টর বজ্ঞানাদে জিজ্ঞাসা করিলেন, “রমাপ্রসাদ সরস্বতী খুনের অপরাধী? এই তুমি তদন্তে জানিয়াছ?”

দারোগা বড় কিছু উত্তর দিতে পারলেন না।

ইন্সপেক্টর স্বয়ং আসামীর হাতকড়ি খুলিয়া দিয়া বলিলেন, “কমা করুন, আপনার

উপর যে অভিজ্ঞাচরণ করা হইয়াছে, তাহার
জন্ত আমি কমা প্রার্থনা করিতেছি।”

রমাশ্রদাস । কমা প্রার্থনার কিছুই নাই ।
দারোগা মহাশয় বোধ হয়, নিজের কর্তব্য-
সাধন করিতেছিলেন মাজ ।

ইন্সপেক্টর । ঐ কথাটি উচ্চারণ করিবেন
না । দেশের যত বড়জাত প্রত্যেক লোকে
আজকাল “কর্তব্যসাধন” কথাটি শিখি-
য়াছে,—“কর্তব্যসাধন” করিবার ভাণ করিয়া
দেশে প্রতারণার উচ্ছুর করিল । বাহা হউক,
আপনি আজ জামিন দিয়া গৃহে যান, আমি
মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখি, আপনাকে
আবশ্যক হইলে পুনরায় তলব করিব।

ইন্সপেক্টর-বাবু দারোগাকে থানার পাঠা-
ইয়া দিলেন, আপনি সমস্ত প্রমাণের কাগজ
তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিলেন । সেই প্রমা-
ণের কথা রিপোর্ট করিয়া কৰ্ত্তৃপক্ষীয়দিগের
নিকট আপন মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইলেন যে,
বিষ-প্রয়োগ-সম্বন্ধে প্রমাণ আছে, কিন্তু সে
প্রমাণ সমস্ত মিথ্যা এবং গ্রামের জমাদার
দ্বারা সৃষ্ট ; তারিগী-বাবুর রোগে মৃত্যু হই-
য়াছে । কৰ্ত্তৃপক্ষীয়গণ আদেশ পাঠাইলেন,—
বিষপ্রয়োগ দ্বারা হত্যা মোকদ্দমার যখন
প্রমাণ হইয়াছে, ইন্সপেক্টর অবিলম্বে বিচা-
রার্থ মোকদ্দমা চালান দিবেন । প্রমাণ সত্য
কি মিথ্যা, আদালতে প্রকাশ পাইবে ।

রোষে ও হুঃখে অক্লান্ত মোচন করিয়া
ইন্সপেক্টর-বাবু মোকদ্দমা চালান দিলেন,
নিজের ব্যয়ে গরুর গাড়ী করিয়া আসামীকে
বর্ধমানে পাঠাইয়া দিলেন ।

বিপদে আপদে রমাশ্রদাসদের যুগ এক
মুহুর্তের জন্ত কেহ যান দেখে নাই, ভরে সে
গম্ভীর প্রসন্নমুখ একদিনের জন্ত দেখাচ্ছন্ন
কর নাই । বর্ধমানে গমনকালে পুত্রকে
আলিঙ্গন করিয়া হাসিয়া বলিলেন, “বৎস,

বড় সমারোহে বর্ধমানে বেড়াইতে যাই
তেছি, চিন্তিত হইও না, কৃশমে কিরিয়া
আসিবি।” সজলনয়নে দেবীশ্রদাস পিতা-
চরণ ধরিয়া বিদায় লইল ।

পরে রমাশ্রদাস হেমচন্দ্রের চক্ষে জল
ধেখিয়া বলিলেন, “হেমচন্দ্র, অক্লান্ত মোচন
কর, শত্রুরা যেন মুহুর্তের জন্তও আমাদের
কাতরতা-চিহ্ন না দেখিতে পায়,—পাপভি-
ভরের অস্ত কারণ নাই।” পরে হেমচন্দ্রকে
একপার্শ্বে ডাকিয়া লইয়া এই বোকদ্দমা-
সম্বন্ধে বাহা বাহা করিতে হইবে, অবিচলিত-
চিত্তে তাহা বুঝাইয়া দিলেন ।

হেম বিন্দুর নিকট বিদায় লইয়া সেই
রাত্রেই বর্ধমানে আসিলেন এবং পর-
দিন প্রাতের গাড়ীতে কলিকাতায় চলিয়া
গেলেন ।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ ।

বিচারের গৃহ ।

বর্ধমানের বিচার-গৃহ আজি বড় শোভা-
ময় । তারিগী-বাবুর মৃত্যুর মোকদ্দমা আজি
বিচার হইবে । জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব
তারিগী-বাবুকে জানিতেন, বড় অহুগ্রহ
করিতেন, পেলন লইতে তারিগী-বাবু
বর্ধমানে আসিলে তাঁহাকে আপনার ধান
কাষরায় ডাকিয়া বসাইতেন, তাঁহাকে
অনার্য্যি মাজিষ্ট্রেট করিবেন, এক্ষণ মতও
প্রকাশ করিয়াছিলেন । তারিগী-বাবুর
মৃত্যুর সংবাদে স্কন্ধ হইয়াছিলেন, তারিগী-
বাবুর বিধবার দরখাস্ত পাইয়া অভিযত
ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন । বৃদ্ধ-বয়সে সঙ্গীত

ভালুকদার ও ভবীদারকে ঘিষ খাওয়াই
মারিরাছে? এক অজ্ঞাত পশ্চিমে সন্ন্যাসী
এই নৃশংস কার্য করিরাছে? নিরাজ্ঞার
বিধবাকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া মুহুর্ত
মিকট উইদু দ্বারা সমস্ত সম্পত্তি অস্ত্রের
নাথে লিখাইয়া লইয়াছে? তারিণী-বাবুর
মৃত্যু না হইতে হইতেই সে বিধবাকে গ্রাম
হইতোসনাতনবাসীতে তাড়াইয়া দিয়াছে?
এরূপ নৃশংস হৃদয়শূন্য মানবাকৃতিধারী
চিত্রক পশু কি অগতে থাকিতে পারে?
যোবে তাঁহার শরীর কল্লিত হইল,
তিনি ভাল করিয়া পুলিশ-তরস্তের আদেশ
দিলেন।

দারোগা-বাবু যে ডাইয়ারি পাঠাইয়াছি-
লেন, মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমস্ত আত্মোপাস্ত
পড়িলেন,—পড়িয়া তুষ্ট হইলেন। ইন্সপেক্টর-
বাবু যে রিপোর্ট পাঠান, তাহা তিনি ক্ষোধে
কেলিয়া দিলেন,—বলিলেন, “এ মোকদ্দমার
বিচার হওয়া নিত্য কৰ্তব্য, এখনই চালান
দাও।” সন্ধ্যার সময় থেলিবার স্থানে পুলিশ-
সাহেবের সহিত তাস থেলিতে থেলিতে
বলিলেন, “তোমার ঐ দারোগাটি আমার
জেলার মধ্যে কার্যদক্ষ, তোমার ইন্সপেক্টরটি
বড় গাধা।”

গুডফ্রাইডের ছুটিতে মোকদ্দমা আসিয়া
পৌছিল। দারোগা মহাশয় সাক্ষী লইয়া
নিজেই হাজির; মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠীতে
গিয়া আবেদন করিলেন, অষ্টই প্রমাণ লেখা
হউক, নচেৎ সাক্ষী ধারাপ হইয়া বাইতে
পারে, আসামী বড় ফেরেকাজ ও কুলোক,
সাক্ষী হাত করিতে পারে। পুলিশের মোক-
দ্দমা গোলাওয়ের মত তত্ত্ব তত্ত্বই ভাল, ঠাণ্ডা
হইলে ধারাপ হইয়া যায়। মাজিষ্ট্রেট সাহে-
বেরও ইচ্ছা, তখনই বিচার আরম্ভ

হিলেন না। ছুটিতে উকীল-মোক্তার বীড়া
গিয়াছে, এই ছুটির সময় মোকদ্দমার বিচার
করিলে আসামীর প্রতি নিত্য অজ্ঞার
হইবে জানিয়া বিচার তিন দিনের জন্য
মুলতুবা রাখিলেন।

আসামীদের জামিনে ছাড়িয়া দিবার
জন্ত একজন ক্ষুদ্রকার কীর্ণজীবী মোক্তার
স্বরখান্ড করিলেন,—তর্ক করিলেন যে,
প্রমাণ লিপিবদ্ধ হইবার পূর্বে আসামীকে
হাজতে দেওয়া আইন ও হাইকোর্টের মতের
বিরুদ্ধ। সাহেব তীব্রস্বরে ক্রিঙ্কাসা করি-
লেন, “কি? খুনী-মোকদ্দমার আসামীর
জামিন প্রার্থনা? তোমার স্বদেশীয় সন্ন্যাস্ত
লোককে হত্যা করা হইয়াছে, সেই মোকদ্দ-
মার আসামীকে উচিত দণ্ডবিধানের জন্য
মোকদ্দমা হইতেছে, আর তুমি তারিণী-বাবুর
বন্ধ,—তুমি তারিণী-বাবুর স্বদেশীয় লোক,—
তুমি সেই তারিণী-বাবুর হত্যা-মোকদ্দমার
আসামীকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছ?
তাঁহার জামিন প্রার্থনা করিতেছ? জামি
বিস্মিত হইলাম।” সাহেবের ভাবগতিক
দেখিয়া ক্ষুদ্রকার মোক্তার মহাশয় চারিদিকে
সদৃশ-ফুল দেখিলেন, আর অধিক বাক্যব্যয়
না করিয়া বামহস্তে শায়লা ধরিয়া সেলাম
ঠুকিয়া চম্পট দিলেন।

ছুটির কয়েকদিন অতিবাহিত হইল।
দারোগা মহাশয় বড়ই চিন্তায় সে কয়দি
কাটাইলেন, পাছে সাক্ষীদিগকে কেহ হাত
করে, পাছে তালপুতুর হইতে কোন
লোক সাক্ষীদের সহিত দেখা করে, পাছে
রমাপ্রসাদের দেবভুল্য চরিত্র ও নির্দোষিতা
আন্দোচনা করিয়া সাক্ষীদের মন আপনায়
হইতেই কিরিয়া যায়। ছোট ডিকীতে
চড়িয়া জাল ফেলিয়া জেলোভায়া বন্ধন

যখন ঝড়কড় করিতে থাকে, জানই ছেড়ে
কি ডিকৌই ভাবে,—তখন কেলে ভায়
বেরপ উৎসুক হন, দারোগা মহাশয় আজ
সেইরূপ উদ্বিগ্ন। যে কাতলামাছ তাঁহার
জালে পড়িয়াছে, ইহা নিরাপদে ডিকৌতে
ভুলিতে পারিলে তাঁহার লাভের শেষ নাই,
বোধ হয়, দুই এক মাসের মধ্যে পদ ও
বেতন বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু এ বিষয় কাতলা
জটাবারীকে কেহ চিনে না, উহাকে সন্দেহ
লোক বলিয়া প্রমাণ করা বড় কঠিন নহে,
দারোগা মহাশয় এইরূপ মনে করিয়াছিলেন,
কিন্তু মোকদ্দমা হইয়া অবধি সরস্বতী ঠাকুরের
বশ আরও চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল।
দারোগা-বাবুর ভিকী বুরি ভেবে !

ছুটির কয়েক দিন অতিবাহিত হইল।
সাহেবমহলে সে কয়েকদিন ঐ মোকদ্দমার
অনেক কথা হইত। তারিগী-বাবুকে সাহে-
বেরা চিনিতেন, তারিগী-বাবুর হত্যার
সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন, আগমাদিগের
শাসনকার্য্যের গ্লানি বলিয়া জ্ঞান করিয়া-
ছিলেন। তীব্ররূপে পুলিশ-সাহেব ক্রুদ্ধ
হইয়া বলিলেন, “সেই হত্যাকারী সন্ন্যাসী
যদি এ মোকদ্দমার খালাস পায়, তাহা হইলে
বঙ্গদেশে মহাব্যব্র জীবন ও সম্পত্তি আর
নিরাপদে থাকিবে না।”

ছুটির কয়েক দিন অতিবাহিত হইল।
সে কয়েক দিন বর্ধমানের দোকানে, বাজারে,
ডহলোকের গৃহে গৃহে এই গাইয়া
বিশেষ আন্দোলন। তারিগী-বাবুর খুনের
কথা শুনিয়া প্রথমে সকলেই বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ
হইয়াছিল, ক্রমে আসল কথা প্রকাশ
পাইতে লাগিল, লোকে কামিনীকান্ত-বাবুর
নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল, দারোগা-
বাবুর চালাকীর উল্লেখ করিতে লাগিল।
দারোগা-বাবুর মুখ দেখান ভার

হইল,—তিনি সাহেব-মহলেই প্রায় মুখ
দেখাইতেন।

ছুটির কয়েক দিন অতিবাহিত হইল।
আজি মাজিষ্ট্রেট সাহেব বিচারাসনে বসিয়া-
ছেন, তিনি স্বয়ং এই মোকদ্দমা বিচার করি-
বেন। ইতর ডহর অনেক লোকে আজ
বিচার-গৃহ পূর্ণ। বর্ধমানের ভূতপূর্ব নাজী-
রের মৃত্যুর মোকদ্দমা সকলেই দেখিতে
আসিয়াছে, রাজারের লোক বারান্দার ও
চারিদিকের মাঠে ভাজিয়া পড়িয়াছে।
মাজিষ্ট্রেট সাহেব গভীরমুগ্ধি ধারণ করিয়া
বসিয়াছেন, তাঁহার পার্শ্বে পুলিশ-সাহেব
বসিয়াছেন, তিনি মোকদ্দমা চালাইতে আসিয়া
ছেন। কোর্ট-বাবু কন্টেবল সহ বর্তমান,
আমলা, কেরানী আজ কাজকর্ম ফেলিয়া এই
বুহং মোকদ্দমা দেখিতে আসিয়াছে। উকীল
মহাশয়ের মধ্যে কেহ বাকী নাই। মাজিষ্ট্রেট
সাহেবের আদেশ অমুসারে উকীল-সরকার
মহাশয় এই মোকদ্দমা চালাইবার জন্য উপ-
স্থিত। তাঁহার বিজ্ঞ আকৃতি ও বিজ্ঞ প্রকৃতি
বর্ধমানে কে না জানে, তাঁহার সূক্ষ্ম শরীর
ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি, বর্ধমানে কাহার অপরিচিত ?

তাঁহার নিকট গভীরাকৃতি উমাপ্রসন্ন-বাবু
আসীন রহিয়াছেন,—বর্ধমান জেলার উমা-
প্রসন্ন-বাবুর জায় কাহার বশ, কাহার নাম,
কাহার অভিজ্ঞতা ? লক্ষী তাঁহার প্রতি সম্মত,
সরস্বতী তাঁহার কণ্ঠে বাস করেন, মান-
মর্যাদা, বিজ্ঞা, ধন-গৌরব সকল বিষয়েই
উমাপ্রসন্ন-বাবু ভাগ্যবান। উমাপ্রসন্ন-বাবুর
সমকক্ষ হওয়া উকীলদিগের উচ্চাভিলাষ,
উমাপ্রসন্ন-বাবুকে নিযুক্ত করা, ধনী জমীদার-
দিগের আকাঙ্ক্ষা, উমাপ্রসন্ন-বাবুর জায় বড়
লোক হওয়া বর্ধমানের বিভাগের বাল্যক-
দিগের বাল্যস্বপ্ন।

তাঁহার পার্শ্বে কীর্ণশরীর সূক্ষ্মবুদ্ধি, সূক্ষ্ম

পদ্মশোভন-বাবু বসিয়াছেন,—কার্যদক্ষতার বল, ক্মতার বল, সাহেবদিগের নিকট যান-মধ্যাদার বল, গবর্ণমেন্টের নিকট সুনামের বল,—পদ্মশোভন-বাবুর দ্বায় বদ্ধমানে কে আছে? বর্কমান সহরের লোক তাঁহার আদেশ শিরোক্ষণ করিয়া মনে, পল্লীগ্রামের লোকে তাঁহার অল্পগ্রহ অপেক্ষা করে।

তাঁহার নিকট প্রবীণ, বুদ্ধিমান, অমায়িক, মিষ্টভাষী শ্রামলাল-বাবু, শ্রামলাল-বাবু সকলের প্রিয়, যে তাঁহাকে জানে, সে তাঁহাকে আদর করে, তাঁহাকে ভালবাসে, তাঁহার প্রিয়কথার ভুট হয়, তাঁহার সংপরা-মর্শে উপকৃত হয়। তাঁহার পার্শ্বে আর,—আর কত নাম করিব? পদ্মসরোবরের দ্বায় আজ বিচার-গৃহ শোভা পাইতেছে—শ্রামলা-পরিধারী উকীল মহাশয়গণ যেন পদ্মফুল ফুটিয়া রহিয়াছেন?

রমাশ্রমাদেয় দীর্ঘজটাম্বাদিত তীত্র নয়ন দেখিয়া লোকে আরও বিস্মিত হইল। বাঁহার শাস্ত্রশিক্ষা অসাধারণ, বেদ-বেদান্ত বাঁহার কর্তৃত্ব, সরস্বতী বাঁহার ওষ্ঠে বাস করেন, যিনি কান্ধী ব্রহ্মাবন পর্য্যটন করিয়াছেন, যিনি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরব্যয়ক্রমেও দৈববল ধারণ করেন, যিনি জীবনের শেষাবস্থা ধর্ম-শিক্ষাদানে অতিবাহিত করিতেছেন, সেই প্রাচীন ঋষিভূত্য মহত্ব কি তারিণী-বাবুর হত্যাকারী? এই প্রশ্নান্ত দেবভূত্য ললাটে কি হত্যাকারীর শব্দ অঙ্কিত আছে?

বড় বড় উকীল সমস্ত বাবীর পক্ষে—আসামীর পক্ষে সেই ক্ষুদ্রকার কীপজীবী বোক্তার। তিনি মাজিষ্ট্রেটের ভাবগতিক দেখিয়া অনেক কষ্টে একখানি দরখাস্ত দাখিল করিলেন।

দরখাস্ত এই যে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব দ্বয় তারিণী-বাবুকে জানিভেন, সনাতনবাদীর

জমীদার কামিনীকান্ত-বাবুকেও জানেন, তারিণী-বাবুর বিশ্বাস ও কামিনীকান্ত-বাবু এই মোকদ্দমায় প্রকৃত বাদী। অতএব মোকদ্দমটি মাজিষ্ট্রেট সাহেব নিজে বিচার না করিয়া অন্য বিচারকের হস্তে দিলে ভাল হয়। যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা না করেন, তবে আসামীকে অবকাশ দিন,—আসামী এ বিষয়ে হাইকোর্টে আবেদন করিতে চাহে।

দরখাস্ত শুনিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব গরম হইলেন, পুলিশ-সাহেব হাসিয়া উঠিলেন, তদন্তকারী দারোগা কাঁপিতে লাগিল,—মোকদ্দমা মূলভূত্বী হইলে বা হস্তান্তর হইলে দারোগা মহাশয়ের ডিকী বৃথি ডোবে! অথচ ক্ষুদ্রকার মোক্তার নাছোড়বন্দ, আইনের পুস্তক খুলিয়া বসিয়াছে!

ইতিকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব আসামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ মোকদ্দমা অভিযন্ত্র ওকৃতর বলিয়া আমি নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছি। আমি বিচার করি, ইহাতে তোমার কোন আপত্তি আছে?”

প্রশান্তহৃদয় রমাশ্রমাদ উত্তর করিলেন, “আপনি বিচারপতি, সুবিচার আপনাব অন্ত্যস্ত কার্য। সুবিচারে আমার ভয় নাই, আপনিই বিচার করুন।”

ক্ষুদ্রকার মহাশয় অপ্রতিভ হইয়া বসিলেন, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তিরস্কারে ভীত হইলেন, বাদীর সাক্ষীদিগকে জেরা করিতেও সাহস পাইলেন না। কেবল কোন্ সাক্ষী কি বলিতেছে, একপার্শ্বে বসিয়া লিখিয়া লইলেন।

বিচার আরম্ভ হইল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ।

বিষকচুর মোকদ্দমা ।

প্রথম সাক্ষী,—সনাতনবাটীর একজন ডাক্তার-বাবু । তিনি বলিলেন, “তারিঙ্গী-বাবুর পীড়ার সময় মধ্যে মধ্যে আমি আসিয়া দেখিতাম এবং ঔষধের ব্যবস্থা করিতাম । তারিঙ্গী-বাবুর কোন সাম্প্রতিক পীড়া হয় নাই, কেবল বাত এবং জ্বর । তাঁহার বয়স অল্পমান ৫৫ বৎসর হইয়াছিল, এ বয়সে ঐরূপ সামান্য পীড়ার মৃত্যু হওয়া অসম্ভব । মৃত্যুর পূর্বেক দিন সন্ধ্যার সময় দেখিতে আসিয়াছিলাম, জ্বর বিশেষ বাড়ে নাই, মৃত্যুর কোনই সম্ভাবনা ছিল না । তাহার পরদিন মৃত্যুর কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম, লাশ দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু শুনিলাম, রমাপ্রসাদ রাতারাতিই লাশ দাহ করাইয়াছেন ।”

তারিঙ্গী-বাবুর সাক্ষ্য পীড়া ও সহসা মৃত্যু-সম্বন্ধে তাঁহার বাড়ীর দুই তিন জন লোক প্রমাণ দিল ।

তাহার পর সনাতনবাটীর বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক । তিনি বলিলেন, “মৃত্যুর পূর্বে সন্ধ্যার সময় তারিঙ্গী-বাবু পূর্কের উইল রদ করিয়া নূতন একখানি উইল করেন । সে উইলখানি দ্বারা সমস্ত সম্পত্তি আপন ব্রাতৃকন্যা বিন্দুবাসিনীকে ও সুধাহাসিনীকে দান করিয়া যান । উইলখানি করিবার কয়েক দিন পূর্বে হইতে সরস্বতী ঠাকুর ঐরূপ উইল করিবার জন্য দ্বিবারাত্র বিরক্ত করিতেন এবং দুই একজন লোকের কাছে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, বৃদ্ধ অধিক দিন বাঁচিবেন না । যে সময়ে নূতন উইল হইল, সে সময়ে রমাপ্রসাদ উপস্থিত

ছিলেন, এবং তিনি উইলের একজন সাক্ষী । তার পর রমাপ্রসাদ সেই ঘরে বহিলেন, সে রাতে ঘরে আর কেহ ছিল না, সেই রাতেই তারিঙ্গী-বাবুর সহসা কাল হয় ।”

তারিঙ্গী-বাবুর ভৃত্যেরা প্রমাণ দিল যে, রাতে তারিঙ্গী-বাবু নিজা ঘাইতেছিলেন, সে ঘরে রমাপ্রসাদ ছিলেন । হঠাৎ দুই প্রহর রাজির সময় মৃত্যুর গোল উঠিল, ভৃত্যেরা ঘাইয়া দেখিল, বাবু হাত-পা খেঁচিতেছেন, মুখে কেনা উঠিতেছে, ঠিক বিষ খাইয়া মরিগে ঘেরূপ মৃত্যু হয়, সেইরূপ আকার হইয়াছে । ভৃত্যেরা মাঠাকুরাণীকে এ কথা বলিয়াছিল, অল্প লোককে ঐরূপ জানাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু রমাপ্রসাদ তাহাদের নিষেধ করিয়া সেই রাতে লাশ জালাইয়া দিলেন ।

গোপবালার বাপের বাড়ীর প্রিয় পরিচারিকা আসিয়া প্রমাণ দিল যে, রমাপ্রসাদ তারিঙ্গী-বাবুকে ঔষধি খাওয়াইতেন । ঘটনার রাতে রমাপ্রসাদ ঠাকুর আমাকে ডাকিয়া কতকগুলি শিকড় বাটিতে বলিলেন, আমি সেই শিকড়গুলি বাটিয়া দিলাম, তাহাতে প্রায় দুই ছটাক রস বাহির হইয়াছিল । শিকড়গুলি দেখিতে এক প্রকার বিষকচুর শিকড় । সে রস পান্ন করিয়া রমাপ্রসাদ ঠাকুরের নিকট রাখিয়া আমি চলিয়া যাই, রস খাওয়ার দেখি নাই । মৃত্যুর পর আমার মনে সন্দেহ হয়, সুতরাং সেই পান্নটি ও শিকড় বাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা দারোগা মহাশয়কে দিয়াছি । রমাপ্রসাদ অনেক রকম ঔষধ জানে, রোগীকে ভাল করিতে পারে, জীবন্ত মানুষকে মারিতেও জানে । উহার নিকট ঔষধের জন্য অনেক লোকে আইসে । সেই ঔষধপাত্র ও শিকড় পাওয়াও

ডাক্তার সাহেবের নিকট পাঠান সময়ে দারোগা-বাবু স্বয়ং ও দুই একজন কনেটবল জবাবদারী দিল। তাহার পর ডাক্তার-সাহেব জবাবদারী দিখেন যে, তিনি ঐ পাত্রদ্বয়স ও নিকট পরীক্ষা করিয়াছেন, উহা শরীরের অতিশয় অগকারজনক। ঐ রস অধিক পরিমাণে খাইলে মজুবোর মৃত্যু হইতেও পারে।

শেখ সাকী সনাতনবাটীর একজন ভক্তলোক। তিনি বলিলেন, “তারিণী-বাবুর লাশ-দাহের সময় আমি ছিলাম। রমাপ্রসাদ ও হেম-বাবু আস্তে আস্তে কথোপকথন করিতেছিলেন। হেম-বাবু বলিতেছিলেন, আজ কটকোদ্ধার হইল, বিন্দুর ও সুধার পিড়কুলের সম্পত্তি বিক্র ও সুধা ফিরিয়া পাইল। রমাপ্রসাদ উত্তর করিলেন,—“বিষকচু চমৎকার ঔষধি,—উহার প্রয়োগে অনেক সুকল কলে।”

বাণীর পক্ষের প্রমাণ সাক হইল। বেলা পাঁচটা বাজিয়াছে, প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব পরদিন চাক করিয়া আসামীর জবাব গ্রহণ করিবেন, অত যোকদ্দমা মূলত্বী রাখিয়া গাত্রোথান করিলেন। আসামী পুনরায় হাজতে গেলেন।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ।

যোকদ্দমা বিচারার্থীন।

পরদিন ১১টার সময় পুনরায় বিচারখর লোকারণ্য, পুনরায় উকীলগণ উপস্থিত হইরাছেন, আসামী রমাপ্রসাদ আসামী-

দিগের স্থানে দণ্ডায়মান হইরাছেন, মাজিষ্ট্রেট সাহেব বিচার-আসনে বসিয়াছেন।

পেশকার একথানা চার্জসিট প্রদান করিল,—সাহেব দণ্ডবিধি আইন খুলিয়া দেখিতেছেন, কলম লইয়া মাড়াচাড়া করিতেছেন।

এমন সময় কাছারীর বাহিরে একটা গোল হইল, একথানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী হইতে দুইজন লোক নামিয়া অতি বেগে বিচারখরে প্রবেশ করিলেন।

একজনকে বর্তমানের উকীলগণ জানিতেন,—তিনি হাইকোর্টের বশখী উকীল চন্দ্রনাথ। মাজিষ্ট্রেট সাহেব কলম রাখিয়া একবার তাঁহার দিকে দৃষ্টি করিলেন, মনে মনে ভাবিলেন, এ আবার কোথা হইতে বিপদ আসিল! উকীলের সঙ্গে হেমচন্দ্র,—রমা প্রসাদ তাঁহাকে দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন।

চন্দ্রনাথ সাহেবকে জানাইলেন, “আমি আসামীর পক্ষে উপস্থিত হইতেছি, বাণীর সাক্ষীদিগকে কূটপ্রস্তর করা হয় নাই, আদালত যদি অহুমতি করেন ত সে সাক্ষীদের ডাকিয়া একবার জেরা করিতে ইচ্ছা করি।”

মাজিষ্ট্রেট। সাক্ষীর কল্যাণ প্রমাণ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের পুনরায় তলব করিয়া যোকদ্দমা-কার্যে বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই, যোকদ্দমা দায়রার বিচার হইবে, তুমি ইচ্ছা করিলে দায়রার বিচারের সময় জেরা করিতে পার।

চন্দ্রনাথ। সাক্ষীরা চলিয়া যায় নাই, এই আদালতের নিকটেই বর্তমান আছে। যদি অহুমতি করেন, আমি এখনই দেখাইয়া দিতেছি। জেরা করিতে আমার এক ঘণ্টার অধিক সময় লাগিবে না, অতি গুরু অপরাধে দায়রার প্রেরিত হইবার পূর্বে আসামী এই সাক্ষীরা অহুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছে। জেরার

পর যদি মোকদ্দমা দায়রার পাঠান আবশ্যক বিবেচনা করেন, সে বিষয়ে আদালতের সম্পূর্ণ অধিকার ।

মাজিষ্ট্রেট অগত্যা অহুমতি দান করিলেন । সনাতনবাটীর সাক্ষিগণ চলিয়া যাব নাই, কাছারীর বাহিরে সনাতনবাটীর সদর-দারের মহাশয়ের সহিত মিষ্টালাপ করিতেছিল এবং ধূমপান করিতেছিল । তাহাদের পুনরায় আনা হইল ।

প্রথম সাক্ষী ডাক্তার-বাবু । কূটপ্রশ্নে প্রকাশ হইল, তিনি ডাক্তার-বাবু নহেন । কোন কালে ডাক্তারী পড়েন নাই, কোন পরীক্ষা দেন নাই, এক ডাক্তারখানার কয়েক মাস কশাউগর ছিলেন, শেষে মাতলামী দোষে সে কর্কট হারান । এখন সনাতনবাটিতে থাকেন, লোকের অর-টর হইলে কুইনাইন বাজারের দরের দেড়া দরে বিক্রয় করেন এবং কামিনীকান্ত-বাবুর মুসাফেরী করেন, কলিকাতা হইতে বাই-নাচ আনিতে হইলে তিনিই কলিকাতায় গিয়া আয়োজন করেন । ডাক্তার-বাবু আরও স্বীকার করিলেন যে, তারিণী-বাবুর মৃত্যু বড় সহসা হয় নাই, সন্দেহের বিশেষ কারণ ছিল না, বিশেষ কারণ থাকিলে আমি থানায় সংবাদ অবশ্য দিতাম ।

তার পর উইলের সাক্ষী কূটপ্রশ্নে প্রকাশ করিলেন, “আমি সনাতনবাটিতে থাকি, কামিনীকান্ত-বাবুর আশ্রিত লোক । ভালপুকুরে বড় বাই না, কেবল উইল করিবার দিন গিয়াছিলাম মাত্র । রমাপ্রসাদ তারিণী-বাবুকে উইল করিতে অহুরোধ করিয়াছিলেন, তাহা নিজের কর্ণে শুনি নাই, সনাতনবাটিতে এইরূপ লোকের মুখে শুনিয়াছি মাত্র ।”

যে পরিচারিকা সুলতানী, বিবকচু বাটীর

প্রমাণ দিয়াছিলেন, তিনি কূটপ্রশ্নে প্রকাশ করিলেন, “আমি কামিনীকান্তে তারিণী-বাবুর বাটিতে দাসী ছিলাম না, পোপবালার বাণের বাড়ীর দাসী । তারিণী-বাবুর মৃত্যুর দিন সে বাড়ীতে গিয়াছিলাম, এবং সেই মল্লিকদের বাটিতে শয়ন করিয়াছিলাম । বি-প্রহর রাতে বিবকচু বাটিবার আবশ্যক হওয়ার বাটীর দাসীদের না বলিয়া সম্যাসী ঠাকুর আমাকেই ডাকিয়া বিবকচু বাটিতে বলিয়াছিলেন, কেন না আমি বড় বিখ্যাসী পুরাতন ঝি ! তাহার পর পাত্র কোথায় ছিল, জানি না, বিবকচুর শিকড় কোথায় ছিল, জানি না, দারোগা মহাশয় বাটি ও শিকড় খুঁজিয়া বাহির করাতে আমি তাহা সনাক্ত করিয়াছি মাত্র ! কাছারীতে যে পাত্র আছে, সে সেই পাত্র বলিয়া বোধ হইতেছে, ঠিক বলিতে পারি না ।”

তাহার পর দারোগা মহাশয়ের জবান-বন্দী,—বর্দ্ধমানের সমস্ত লোক সে জবান-বন্দী শুনিতে কাছারী-ঘরে যেকৈ আসিল । দারোগা মহাশয় কূটপ্রশ্নে প্রকাশ করিলেন, “আমার বাড়ী বাথরগঞ্জ জেলা । আগে বাথরগঞ্জের কোন দারোগার ভাণ্ডারী অর্থাৎ ভৃত্য ছিলাম । সেই দারোগা বাঁকুড়া জেলার বদলী হইলে তাহার সহিত আইসি এবং তথায় ভাণ্ডারী-কাজ ছাড়িয়া দিয়া কুলীর কণ্টাক্টর হই । তাহাতে বিস্তর লাভ হয়, কিন্তু একটি বিবাহিতা স্ত্রীকে বাহির করিয়া কুলী করিয়া চালান দেওয়ার ধরা পড়ি ও সে বিষয়ে মোকদ্দমা হয় । মোকদ্দমার অব্যাহতি পাই, কিন্তু কুলীর কাঁবা ছাড়িয়া দিয়া পুলিশে কনেইবল হইলাম, এই মোকদ্দমা তদন্ত সনাতনবাটিতে বসিয়াই হইয়াছে, তথাকার সদর দারোগা মহাশয় সমস্ত সাক্ষী জোগাড় করিয়া

দিয়াছেন এবং তদন্তে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। বিবকচূর শিকড় তারিগী-বাবুর বাড়ীতেই পাওয়া যায়, পাত্রও তথায় পাওয়া যায়। হাসী দিয়াছিল কি, কি প্রকারে। ওয়া যায়, তাহা ঠিক স্মরণ নাই। বাথর-পঞ্জের দারোগার নিকট দশ বৎসর ভাণ্ডারী-কার্য্য করিয়াছি, সে অবকাশে তথাকার পুলিশের কার্য্য অনেক দেখিয়াছি।”

শেখ সাকী, যিনি লাশ জালাইবার ময় রমাপ্রসাদ ও হেমের কথোপকথন শুনিয়াছিলেন, তিনি তালপুকুর গ্রাম কিরূপ, স্থানভূমি কেথায়, কিছুই বলিতে পারিলেন না। আরও কূটপ্রশ্নে প্রকাশ পাইল, তিনি কলিকাতার কামিনীকান্ত মহাশয়ের বাগান-বাড়ীর একজন ভৃত্য।

এইরূপ সমস্ত কথা প্রকাশ হওয়াতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কলম রাখিয়া দীর্ঘ শব্দ কত্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি স্বভাবতঃ কিছু উগ্র, কিছু ক্ষিপ্ত, কিছু ব্যস্ত-চিত্ত, কিন্তু তিনি বুদ্ধিশূন্যও নহেন, স্বদয়শূন্যও নহেন,—মোকদ্দমার রূপ অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইলেন, আসামীর প্রশাস্তমুষ্টির দিকে বার বার চাহিতে লাগিলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ভাবগতিক দেখিয়া দারোগা বাবুর মুখ শুকাইল, বারাক্দার গিয়া বসিয়া পড়িলেন, দীননাথ কনষ্টেবলকে পুতুর খেকে এক ঘটা জল আনিতে বলিলেন।

চন্দ্রনাথ তখন আদালতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “আসামী নিরপরাধী, নিতান্ত ধর্ম্মপরাগ লোক, অভিশয় কুলোকের মিথ্যা চক্রান্তে পড়িয়া এই কষ্টভার, এই কলঙ্কার বহন করিতেছেন। আদালত অহুমতি দিন, কয়েকজন সাকীই সাকী দ্বারা তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করি।”

মাজিষ্ট্রেট সাহেব তখনও ঈর্ষ কত্থন ও চিন্তা করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রনাথ পুনরায় বলিলেন, “সাক্ষিগণ সকলেই কামিনীকান্তের অল্পগত লোক, কামিনীকান্তের উত্তেজনার এ মোকদ্দমার সৃষ্টি, কামিনীকান্তের উত্তেজনার সকল সাকী আগাগোড়া মিথ্যা বলিয়া গিয়াছে। বিবকচূর গল্প সম্পূর্ণ মিথ্যা, বাথরগল্পবাগী এই দারোগা সে গল্পটি সৃষ্টি করিয়াছে! সে বিষয়ে যদি কিছু সন্দেহ থাকে, অহুমতি দিন, আমি কয়েকজন সাকীই সাকী ডাকি।”

মাজিষ্ট্রেট তখন উত্তর করিলেন, “বাদীর প্রমাণ যদি সন্দেহযুক্ত হয়, তাহা হইলে আসামীর সাকী ডাকিবার কিছু আবশ্যক আছে কি?”

চন্দ্রনাথ বলিলেন, “সচরাচর মোকদ্দমার আবশ্যক নাই বটে, কিন্তু এ মোকদ্দমার আছে। এ মোকদ্দমার একজন ধর্ম্মপরাগ উন্নতচরিত্র ভদ্রলোকের নামে একটি সম্পূর্ণ মিথ্যা অপরাধ আরোপিত হইয়াছে। বার্ডকো, রোগে বে লোকের মৃত্যু হইল, তাহাকে বিধ বাওয়ানর একটি অদ্ভুত গল্প সৃষ্ট হইয়াছে। বিবকচূর বলিয়া কি পদার্থ আছে, তাহা সচরাচর লোকে জানে না, পুলিশ সেই বিবকচূর শিকড় পাঠাইয়াছেন, পাত্রটি পর্য্যন্ত ডাক্তারের পরীক্ষার জন্য পাঠাইয়াছেন। যদি এ তরফর অপরাধ সত্য হয়, তাহা হইলে আসামীর প্রাণকণ্ড বিষয়। যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে বে নুশংস মিথ্যাব্যবহারী রূপে মোকদ্দমা সৃষ্টি করিতে পারে, তাহার সমুচিত দণ্ডবিধান আপনাদিগের কর্তব্য। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, এরূপ নুশংস, মিথ্যাব্যবহারী পুলিশ-কর্ম্মচারী বন্দোবশে আজকাল অধিক

নাই,—যদি এরূপ থাকে,—যদি তাহা-
দিগের শঠতা ও নৃশংসতা প্রমাণ হয়,
তাহা হইলে সেই পুলিশ কুলাদার-
দিগকে তিরোহিত করিয়া প্রজাদিগকে
রক্ষা করা রাজার সমুচিত কার্য্য। আপনি
কেবল বিচারপতি নহেন, এ জেমার শাসন-
কর্ত্তা, সুশাসনের ভার আপনার হস্তে।
বিচারের সহায়তার জন্ত, সুশাসনের সহায়-
তার জন্ত, আমার স্বদেশবাসীদিগের মঙ্গলের
জন্ত আমি অনুরোধ করিতেছি, আমাকে
ছই বটা মাত্র সময় দিন। আদালতের সময়
মূল্যবান, কিন্তু ছই বটা মাত্র পরিশ্রম
করিলে আপনার মনের সম্পূর্ণ সন্বেহ
দূর হইবে, আপনি জানিতে পারিবেন, এ
মোকদ্দমা সম্পূর্ণ সত্য কি সম্পূর্ণ মিথ্যা,
এ কথা আপনার হৃদয়ঙ্গম হইলে আপনিও
কর্ত্তব্যকার্য্য সাধন করিয়া সন্তোষলাভ করি-
বেন,—আসামীও প্রমাণ দিয়া সন্তোষ লাভ
করিবে। তাহার পর আপনি যাহা আদেশ
দিবেন, আসামী শিরোধার্য্য করিয়া মানিবে।
আমার সাক্ষী আমি স্বয়ং অনিয়াজি, বাহিরে
উপস্থিত আছে, আদেশ করুন, তাহাদের
ডাকি।”

মজিষ্ট্রেট সাহেব সাক্ষী সাক্ষীদের
ডাকিতে আদেশ দিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ।

মোকদ্দমার শেষ ।

কামিনীকান্তের ভায় জমীদার কাছা-
রীতে মোকদ্দমা দেখিতে আইসেন না।
কিন্তু অল্প চাচ্চ হইয়া দুই জটাধারী দায়রার
প্রেরিত হইবে, ডাও প্রত্যেক জমীদারের

কমজা বুরিতে পারিবে, এই উল্লাসে
কামিনীকান্ত-বাবু নিজে উকীলদের সহিত
আসিয়া * উকীলদিগের সহিত বসিয়া-
ছিলেন। যখন চন্দ্রনাথ-বাবু হেমচন্দ্রকে
লইয়া বিচার-ঘরে প্রবেশ করিলেন, তখন
কামিনী-বাবুর ক্রংকল্প হইল, চন্দ্রনাথ-
বাবুর কুটপ্রস্তাবে মোকদ্দমার আসল অবস্থা
প্রকাশ হইতে লাগিল, তখন কামিনী-বাবু
মূর্ছা বাইবার উপক্রম হইল। তিনি বার
বার বাহিরে চাহিতে লাগিলেন, সুমতি-
বাবুর বর্জমান আদিবার কথা ছিল, এ
বিপত্তির সময় সুমতি-বাবু কোথায়? সুমতি-
বাবু কলিকাতার বুদ্ধিমান এটর্নী, পাড়ানৈরে
মোটা বুদ্ধিতে বেরূপ মোকদ্দমা স্থাপন করা
হইয়াছে, তাহাতে বড় হাত দেন নাই, পরে
হাইকোর্টের চন্দ্রনাথ-বাবু এ মোকদ্দমার
আছেন শুনিয়া মোকদ্দমায় কি হইবে,
তখনই বুঝিয়াছিলেন। ডুবন্ত ভিকীকে পদা-
ঘাত করিয়া ডুবাইয়া দোঁওরা সুমতি-বাবুর
রীতি ছিল, তিনি হেমচ ও যশরী চন্দ্রনাথ-
বাবুর পরম বন্ধু হইয়া রথতী ঠাকুরের
সাক্ষীহরের অনেক আরোজন করিয়া দিলেন।
এদিকে কামিনীকান্ত-বাবুকে তারে সংবাদ
পাঠাইলেন,—“বিশেষ কার্য্যে ব্যস্ত থাকান্তে
আমি বর্জমান আসিতে অশক্ত, ভরসা
করি, আপনার কার্য্য সিদ্ধ হইবে।”

সাক্ষী সাক্ষীর জবানবন্দী হইল
লাগিল।

আসামীর প্রথম সাক্ষী উপস্থিত হইলেন
তিনি ভারিগী-বাবুর গুরুদেব, সমাতনবাসীর
একজন ভক্ত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। টোলে শিষ্য-
দিগকে স্বতিশাস্ত্র পাঠ করার, জমীদার-বৃদ্ধ
কিরাকর্ষ-সম্পাদনার্থ যান, সমস্ত গ্রামে
আবৃত্ত ও সম্রাস্ত। ৭০ বৎসর বয়স্ক হই-
রাছে, কখনও আদালতে পদক্ষেপ করেন

রমেশচন্দ্রের গ্রন্থাবলী।

১. আমি বিষ্ণুবাসিনী ও বোগমায়ার
দুই গ্রন্থইতে না পারিয়া আসিতে বাধ্য
হইছেন।

তিনি প্রকাশ করিলেন, “রমাগ্রসাদ
কয়েক মাস অবধি সনাতনবাটিতে বাস
করিতেছেন, জমীদার মহাশয় ক্রুদ্ধ হইয়া
তাঁহাকে বাহির করিয়া দিবার আদেশ
করিয়াছিলেন। তাহার পর রমাগ্রসাদ
জমীদারকে ভয়প্রদর্শন করেন, তাহাতে
কামিনী-বাবু কয়েকজন বিষয় বন্ধুকে
ডাকিয়া শপথ করিয়া বলেন, যদি রমাগ্রসা-
দকে উৎসন্ন না করি, তাহা হইলে আমি
নিজ দেশ ত্যাগ করিব। তারিণী-বাবু
মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে হইতে তাঁহার নতন
গৃহিণীর সহিত বড় কথা কহিতেন না,
কেবল তাঁহার মৃত পত্নীর কথা ভাবিতেন,
বিনু ও সুধার কথা ভাবিতেন, এবং চন্দ্র
জল কেলিতেন। তারিণী-বাবু আমাকে
ডাকিয়া অনেকবার বলেন,—বিষয় আমার
প্রাণকল্যাণেরই দিব, গৃহিণীকে দিব না।
হেমচন্দ্র এক কথা শুনিয়া তারিণী-বাবুকে
স্পষ্টই বলিতেন,—আপনার স্ত্রী বর্তমান
ধাকিতে এ বিষয় আমরা লইব না। শরৎ
মৈমনসিংহ বাইবার আগে তারিণী-বাবুকে
বলিয়া গেলেন,—আপনার বিষয় জ্যেষ্ঠাই-
মাকেই দিন, আমরা লইতে স্বীকৃত হইব
না। তথাপি বুদ্ধের মন ফিরিল না, মৃত্যুর
পূর্বসংস্কার উইল করিয়া বিনু ও সুধাকে
সমস্ত সম্পত্তি দিয়াছেন, রমাগ্রসাদ ঠাকুর
এবং আমি সে উইলের সাক্ষী। তারিণী-বাবুর
মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা সনাতনবাটিতে
আসিয়া অবস্থান করেন। যখন গোপবালা
বাহীর মৃত্যু-সম্বন্ধে দরখাস্ত করিলেন, তখন
তিনি কামিনীকান্ত-বাবুর বাটিতে অবস্থিত
করিতেছিলেন।”

সনাতনবাটির পুরাতন একজন দাস,
(সে বোগমায়াকে বাল্যকাল হইতে বন্দ
করিত) আসিয়া প্রকাশ করিল, “আমি
৪০ বৎসর ঐ বাটিতে আছি, ৩০ বৎসর
পূর্বে রমণীকান্ত নামে নাবালক জমীদার
বাস করিতেন, কামিনীকান্তের সহিত হাঙ্গা-
মায় তাঁহার কাল হয়। সে কথা সকলে গ্রাহ্য
ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সন্ন্যাসী ঠাকুর সেই
কথার উল্লেখ করিয়া কামিনীকান্তের গৃহি-
ণীকে ভয়-প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা আমি
আপন কর্ণে শুনিয়াছি। সেই অবধি জমী-
দার-বাবু সন্ন্যাসী ঠাকুরকে বড় যত্ন করি-
তেন, অচিরে কলিকাতায় চলিয়া
গেলেন।”

ধনপুরের ধনঞ্জয়-বাবু তাহার পর উপ-
স্থিত হইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া কামিনীকান্ত-
বাবু চমকিত হইলেন। তিনি বলিলেন,
“তারিণী-বাবু আমার স্বপ্ন হইতেন, মৃত্যুর
কয়েক মাস পূর্বে আমি একবার তারিণী
বাবুকে দেখিতে আসিয়াছিলাম। তারিণী-
বাবুর সাক্ষী পতিপ্রাণা প্রথমা স্ত্রী শোকে ও
যোগে প্রাণত্যাগ করেন, তারিণী-বাবু
দ্বিতীয়া স্ত্রী অতিশয় প্রথরা ও উদ্ধতস্বভাবা,
তারিণী-বাবুকে জ্বালাতন করিয়া সমস্ত
সম্পত্তি উইল করিয়া লইয়াছিলেন। তারিণী-
বাবুর মৃত্যুর পর কামিনীকান্ত-বাবু কলি-
কাতার স্মৃতি-বাবুর নিকট গিয়াছিলেন, সে
দিন সে সময়ে আমিও স্মৃতি-বাবুর বাটিতে
ছিলাম। কামিনী-বাবু বলিলেন যে, রমা-
গ্রসাদ সন্ন্যাসী একটি হাঙ্গামার মোকদ্দমার
কথা উত্থাপন করিয়া কামিনী-বাবুকে শাসন
করিয়াছেন এবং তারিণী-বাবুর নিকট নতন
উইল করিয়া লইয়া বিষয় তাঁহার প্রাণকল্যা-
ণগণকে দেওয়াইয়াছেন। ঐ সকল কার্যকে
কামিনী-বাবু তারিণী-বাবুর বিধবাকে দিয়া

রম্যপ্রাসাদের মাঝে একটি খুনের মোকদ্দমা স্থাপন করিয়াছেন।” ধনঞ্জয়-বাবু আরও বলিলেন, “আমি স্বত্ত্বের বিষয় পাইতে এক সময়ে লুন্ড ছিলাম, এখন আর নাই। আমি নিজের দোষে বিপুল সম্পত্তি হারাইয়াছি, পতিব্রতা, সাক্ষী, স্নেহ-ময়ী স্ত্রী (তিনি হেম-বাবুর ভগ্নী হইতেন), তাঁহাকেও হারাইয়াছি। সে সময়ে হেম-বাবু আমাকে অনেক সংপরামর্শ দিয়াছিলেন, হেম-বাবুর স্ত্রী আমাদের বাড়ী আসিয়া অনেক উপকার করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের দোষে আমি সে পরামর্শ গ্রহণ করি নাই; হেমচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র তারিণী-বাবুও বিষয় পাইয়াছেন তুমিরা তুচ্ছ হইয়াছি, আমার অধিক দিন বাঁচিবার নাই, আর একটি সম্পত্তি লাভ করিয়া অপব্যয় করিবার ইচ্ছাও নাই। বাল্যকাল হইতে সুরাপান শিখিয়াছি, তাহাতেই শীঘ্র আমার মৃত্যু হইবে, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।”

ধনঞ্জয়-বাবুর এইরূপ আত্মদানি ও আত্ম-দোষ-স্বীকার শুনিয়া সকলের চক্ষুতে জল আসিল, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হৃদয়ও দ্রবীভূত হইল।

তাহার পর খোজেন্দা বিবি নর্তুকী। তাহাকে দেখিবামাত্র কামিনী-বাবুর প্রাণ উড়িয়া গেল, কাছারীর লোক একেবারে কাঁকিয়া আসিল। সে প্রকাশ করিল যে, “আমি কলিকাতার একজন নর্তুকী। কামিনী-বাবু বাইনাচপ্রিয়, বাইনাচ হেথিবার জন্ত আমাকে সর্বস্বা ডাকিয়া পাঠান। সম্প্রতি কামিনী-বাবুর বাগানে একদিন ডাকাইরা-ছিলেন, তথায় স্মৃতি-বাবু ছিলেন।” তাহার পর স্মৃতি-বাবুর নিকট কামিনী-বাবু যে কথা বলিয়াছিলেন, খোজেন্দা সমস্ত প্রকাশ করিল। সমস্ত আদালত নিষ্পত্ত, অব্যবহৃত ও হতজ্ঞান।

কামিনী-বাবুর উকীল প্রশ্ন করিলেন, “তুমি মুসলমানী, কামিনী-বাবু তোমার হস্ত হইতে সুরা পান করিয়াছিলেন, এইরূপ বলিয়াছ?”

খোজেন্দা। বলিয়াছি।

উকীল। কামিনী-বাবু সনাতনবাণীক জাতি-রক্ষা-সভার অধ্যক্ষ, তাহা তুমি জান? খোজেন্দা। শুনিয়াছি।

উকীল। কামিনী-বাবু তালপুতুরের শরৎ ও হেমকে একঘরে করিয়াছেন, তাহা তুমি জান?

খোজেন্দা। শুনিয়াছি।

উকীল। কামিনী-বাবু জাতি-রক্ষা-সম্মে এতদূর উৎসাহী হইয়া তোমার স্পষ্ট সুরা পান করেন কিরূপে?

খোজেন্দা। তাহা আমিও বাবুজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।

উকীল। বাবুজী কি বলিলেন?

খোজেন্দা। বলিলেন, “গোপনে কিছু করিলে তাহাতে জাতি যায় না।” বাবু মহশয়, আপনি কি তাহা জানেন না?

উকীল মহাশয় অপ্রতিভ হইয়া বলিয়া পড়িলেন। শেষ সাক্ষী মৈমনসিংহের জরয়েট মাজিষ্ট্রেট শরচ্চন্দ্র বোষ। তাঁহাকে দেখিয়া চন্দ্রনাথ ও হেমচন্দ্র বিস্মিত হইলেন,— শরৎকে কে ডাকাইল? কবে মৈমনসিংহ হইতে আসিলেন?

হেমচন্দ্র বিষয়লুভ লোক, তিনিই সরস্বতী ঠাকুর দ্বারা নূতন উইল লিখাই লইয়াছেন, —এ সকল কথা অপ্রমাণ করাইবার জন্ত শরচ্চন্দ্র সাক্ষীর স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন। চন্দ্রনাথ-বাবু কোন প্রশ্ন করিলেন না, শরৎ-বাবু আপনাই বাহা জানেন, বাল্যে লাগ-লেন। হেমচন্দ্রের মহন্ত, হেমচন্দ্রের নির্ভীকতা, হেমচন্দ্রের দৃঢ়তা, হেমচন্দ্রের অবচলিত

স্বায়ংসিদ্ধতা সজল-নয়মে বর্ণনা করিলেন । তারিণী-বাবু ও তাঁহার স্ত্রীর জন্ত বিন্দুর বস্ত্র, প্রদীপ ও মারা বর্ণনা করিলেন, রোগে, শোকে, পরিতাপে শতবার বিন্দুবাসিনী তারিণী-বাবুর বাটী গিয়া দাসীর স্তায় সেবা করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিলেন । তারিণী-বাবু যখন প্রকাশ্যে হেম ও বিন্দুকে জ্ঞাতীচ্যুত করিলেন, তখনও বিন্দু গোপনে বাইরা জ্যোতীমহাশয়ের সেবা করিতেন, জ্যোতীমহার শুক্রবা করিতেন । তারিণী-বাবুর নববধূ যখন বিন্দুর সে বাটী যাওয়া বন্ধ করিলেন, তখনও বিন্দু সে কথা না মানিয়া পীড়ার সময়ে, শোকের সময়ে মল্লিকবাড়ী বাইতেন । ঐ নববধূ সেদিন দরিদ্র বালিকা ছিল—দিবাপ্তে চারিটি ভাত খাইতে দেখে, এরূপ লোক গ্রামে ছিল না,—বিন্দু তাহাদের চাল-ভাল দিয়া আসিতেন, কাপড় কিনিয়া দিতেন, বিন্দু আপনার মেরেকে কেলিয়া মাতার মত গোপবালাকে কোলে লইয়া ছদ্ম খাওয়াইতেন । সেই গোপবালা যখন তারিণী-বাবুর গৃহিণী হইলেন, তখন অহঙ্কারে বিন্দুকে ভৎসনা করিয়া পাঠাইতেন, বিন্দুবাসিনী একদিনের জন্ত রুট কথা কহেন নাই, অভিমান করেন নাই, দাসীর মত জ্যোতীমহাশয়ের বাড়ী গিয়া শুক্রবা করিয়া আসিয়াছেন । বিবর পাইবার জন্ত হেমচন্দ্র দ্বিতীয় উইল করিয়া লরেন নাই, তাঁহার অমতে তারিণী-বাবু গোপবালার উপর নিতান্ত বিরক্ত হইয়া ঐ উইল করিয়াছেন । হেম-বাবু তারিণী-বাবুর বিবর গ্রহণ করিবেন না বলিয়া বার বার শরৎকে চিঠি লিখিয়াছিলেন । শরৎ সে চিঠি মৈমনসিংহে পাঠাইয়াছেন, সমস্ত আদালতে দাখিল করিলেন ।

তাঁহার পর শরৎ রমাশ্রমাদ সরস্বতীর কথা বলিতে লাগিলেন । রমাশ্রমাদের ঘেব-

তুল্য চরিত্র, অসাধারণ ধর্মশিক্ষা, আনন্দনীর উৎসাহ, অবিচলিত দেশহিতৈষিতা বর্ণনা করিতে লাগিলেন । জ্ঞাতি-নির্কিংশে, অবস্থা-নির্কিংশে, সকল হিন্দুকে ডাকিয়া বধর্মের শিক্ষা দিতেছেন, খের, হিংসা ও অনৈক্য-প্রসিদ্ধিত সমাজে ঐক্যসাধনে বস্ত্র করিতেছেন, সনাতন হিন্দুধর্মের সজীবনী কথা দ্বারা আধুনিক হিন্দু-সমাজে জীবনদান করিতেছেন । এই চেষ্টার রমাশ্রমাদ কলঙ্ক-তার আনন্দে বহন করিয়াছেন, বিন্দুকদিগের শিক্ষা-কথা শুনিয়া হাস্ত করিয়াছেন, ঘেবী-দিগের অপকার-চেষ্টার কথা শুনিয়া তাহা-দিগকে আলিঙ্গন করিয়া সংপরামর্শ দিয়াছেন । ঘেবী ও অভিমানীদিগের ভৎসনার মুহূর্ত্তের জন্তও রমাশ্রমাদের হৃদয় বিচলিত হয় নাই, সনাতনবাটীর জমীদার মহাশয়ের ভয়ে যুর্ভের জন্তও রমাশ্রমাদের উদ্বেগ লক্ষিত হয় নাই । স্বদেশবৎসল রমাশ্রমাদ একাগ্রচিত্তে, অবিচলিত-হৃদয়ে, স্বদেশের উন্নতিসাধন করিতেছেন, বধর্মের গৌরব-বর্দ্ধন করিতেছেন, অনৈক্য-বিস্বস্ত স্বদেশ-বাসীদিগের মধ্যে ঐক্যসাধন করিবার চেষ্টা করিতেছেন । তাঁহার পবিত্র জীবনের সেই পবিত্র উদ্দেশ্যসাধন করিবার চেষ্টার অস্ত তিনি বিপদ, ক্লেশ ও মিথ্যা কলঙ্কে পতিত হইয়াছেন । আমি রমাশ্রমাদকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা-স্বরূপ সম্মান করি, তাঁহার উন্নত-চরিত্রে দোষ, কলঙ্ক ও অপরাধ স্থান পায় না ।

এই পর্যন্ত প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব কলম কেলিয়া দিলেন,— তিনি ব্যগ্রস্বভাব, কিন্তু কৃষ্ণশূন্য নহেন । মুষ্টি দ্বারা সজোরে টেবিলে আঘাত করিয়া মোবে গর্জিয়া বলিলেন, “এই দেবতুল্য মহাব্যাক্ত পিশাচ বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্ত কামিনী-বাবু বস্ত্র করিয়াছেন? এই উন্নত-

কর দেশহিতবোধকে ধ্বংস করিবার মানসে গোপবালা সুরখাত করিয়াছেন ? আমাদের খুঁট আদালত কি মিথ্যা, শঠতা, প্রবঞ্চনার রসভূমি হইরাছে ? আমাদের গঠিত পুলিশ কি জমীদারদিগের অভ্যাচারের উপায়স্বরূপ হইরাছে ? রমাপ্রসাদ ! কল্যাণ আমি তোমাকে মহা অপরাধে অপরাধী মনে করিয়াছিলাম, অস্ত আমি আমার ভ্রম বুঝিলাম। তুমি নির্দোষী, উন্নতচরিত্র, পরোপকারী ও ধর্ম-পরায়ণ। তোমার ন্যায় অধিক লোক থাকিলে তোমার দেশ এত হতভাগ্য হইত না ! তোমাকে খালাস দিলাম এবং তোমার নামে যে মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছে, তজ্জ-
তুমি নাশিত করিতে পার।

সমস্ত বিচারগৃহ নিমন্তক, নির্ঝাঁক ! সেই নিমন্তকতার মধ্যে রমাপ্রসাদ তীব্রস্বরে কহিলেন, “বিচারপতি ! আপনার সুবিচার জন্ত দ্বিধা আপনায় মঙ্গল করিবেন, কিন্তু আমার আর একটি বক্তব্য আছে।”

মাজিষ্ট্রেট। কি ?

রমাপ্রসাদ। সাক্ষীরা বলিয়া গিয়াছে, ত্রিশৎ বৎসর পূর্বে ঐ কামিনীকান্ত একটি হাকীমা করিয়া তাহার ভ্রাতা রমণীকান্তকে খুন করিয়াছে। তাহার বিচার এখনও হয় নাই।

মাজিষ্ট্রেট। ত্রিশৎ বৎসর পূর্বের ঘটনাও অস্ত বিচার হইতে পারে ; কিন্তু তাহার প্রমাণ এখন কি আছে ? তাহার সাক্ষী এখন করজন আছে ?

রমাপ্রসাদ। হাকীমার প্রমাণ বথেষ্ট আছে। কিন্তু ভ্রাতৃবধস্বরূপ ভয়ঙ্কর পাতক হইতে বরং জগদীশ্বরই কামিনী-বাবুকে অব্যাহতি দিয়াছেন। রমণীকান্ত সে হাকীমার আহত হয়, কিন্তু প্রাণে মরে নাই। তিনজন দারবান রমণীকান্তের মৃতবৎ দেখে

সরাইয়া কেলে, পরে রমণীকান্ত চৈতন্ত পাইলে তাহাকে লইয়া পশ্চিমদেশে পলাইয়া যায়। সে তিনজন দারবান পশ্চিম হইতে আসিয়াছে, হীরা সিং, লাল সিং ও জগদহর সিংহ ঐ পাড়াইয়া আছে,—কামিনী-বাবু বোধ হয়, তাহাদের চিনিতে পারিবেন। আর, (কামিনী-বাবুর দিকে তীব্র দৃষ্টি করিয়া মস্তকের জটা সরাইয়া, সন্ন্যাসী সিংহ-নামে বলিলেন,) সে রমণীকান্ত এখনও জীবিত আছে, কামিনী-বাবু ভাল করিয়া দেখিলে বোধ হয়, তাঁহার ভ্রাতাকেও চিনিতে পারিবেন।

কামিনী-বাবু সেই জটাধারীর জটামূল লগাট দেখিলেন, তাঁহার অগ্নিবৎ প্রজ্বলিত নয়ন দেখিলেন, তাঁহার প্রচণ্ডমুষ্টি দেখিলেন, সেই ক্রুদ্ধস্রাব বালক আজি মহাবলে বলিষ্ঠ বীরপুরুষ হইয়া বৈরনির্ঘাতন করিতে আসিয়াছেন ! কামিনী-বাবু নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া গেলেন,—লোকে ধর্ম্মাধারি করিয়া জমীদার-বাবুকে বাহিরে লইয়া গেল।

কাছারিতে একটা মহা গুণ্ডগোল হইয়া উঠিল। সে গোল থামাইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, “রমাপ্রসাদ ! তুমিই রমণীকান্ত ? কামিনী-বাবু তোমাকেই বালাকালে খুন করিতে উত্তত হইয়াছিলেন ? সে বিষয়ে অভিযোগ কর, প্রমাণ লইয়া আইস,—ইংরাজ-শাসনাধীনে তুমি সু-বিচার পাইবে,—আমি নিজে তোমার অভিযোগ তদন্ত করিব।”

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—

কচি আঁবের অন্ন ও চিনিপাতা দি।

বিহার-গৃহের বাহিরে সে দিন যে কিরণ
যেমনাম, কিরণ আকোলন, কিরণ “মহা-
দাসীর জন্ম,” “বড়লাট এগ্নিন নাহেবের
জন্ম” প্রভৃতি শব্দ হইতে লাগিল, তাহা বর্ণনা
করিতে আমরা অক্ষম। জটীয়াবীবেশে
রমণীকান্ত জমীদারকে দেখিবার জন্ত দেশের
লোক ভাঙ্গিয়া আসিল, হাইকোর্টের উকীল
চন্দ্রনাথ-বাবুকে দেখিবার জন্ত, বড়লাট ডিউ
হইল, মৈয়নসিংহের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট শরৎকে
দেখিবার জন্ত অনেকে ছুটিয়া আসিল।
সে গোলমালের মধ্যে কথাবার্তা হওয়া অস-
ম্ভব,—কেবল চন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র ও শরৎকে
আসিজন করিয়া রমাঙ্গসার আপনার স্বদ-
য়ের কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

টিক হইল, সকলে মোক্তারের বাসায়
বাইবেন, তথায় সন্ধ্যার সময়সকল বিষয়ে
আলাপ হইবে। ইতিমধ্যে চন্দ্রনাথ-বাবু,
শরৎ-বাবু ও রমণীকান্ত-বাবুকে ধরাধরি
করিয়া বর্জমানের উকীলগণ একজন প্রধান
উকীলের বাড়ী লইয়া গেলেন, তথায় কিছু
জলযোগ না করিলে—সেইবারা কিছুতেই
ছাড়িবেন না। সুতরাং হেমচন্দ্র একাই
মোক্তার মহাশয়ের বাসা জিজ্ঞাসা করিয়া
তথায় উঠিলেন।

হেমচন্দ্র মোক্তার মহাশয়ের বাটা গিয়া
দেখিলেন, কাছারী হইতে তখনও কেহ আই-
সেন নাই; সুতরাং তিনি বাহিরের একটি
ঘরে রসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

কতক পর পার্শ্বের একটি ক্ষুদ্র অন্ধকার
ঘরের কপাটটি খুলিল, সেই ঘর দিয়া বাহির-
বাটা হইতে ভিতর-বাটা বাওয়া বার। সেই

অন্ধকার ঘরের ভিতর হইতে একটি সুগোল
দমদম ও তারিঙ্গ-পরাণ বাহি দেখা গেল।
মেরেমান্নবাটী যুবতী ও ঘোমটা দেওয়া,—
হেমচন্দ্র অন্ধরিকে চাহিলেন।

দমদম ও তারিঙ্গের শব্দ হইল। হেম-
চন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন, সেই মেরেমান্নবাটী
অমূল্য দ্বারা হেম-বাবুকে সেই ঘরে আসিতে
ইসারা করিতেছে।

হেম-বাবু নিতান্ত ভুল্ললোক, একটু
ইতস্ততঃ করিলেন, ডাবিলেন, বর্জমানের
মেরেদের এইরূপ আচার-ব্যবহার না কি?
তথাপি মেরেটি কি জন্ত ডাকিতেছে, জানা
উচিত, সুতরাং সেই ঘরে গেলেন। যুবতী
কপাট বন্ধ করিল, খিল দিল।

হেম-বাবু পাড়ার্গেয়ে ভালমানুষ,—
বর্জমানের মেরের হাতে পড়িয়া বড়ই বিপদে
পড়িলেন। অন্ধকার ঘরে অপরিচিতা যুব-
তীর সহিত এক মুহূর্ত্তও থাকি ভুল্ললোকের
উচিত কার্য্য নহে, মোক্তার মহাশয় হেম-
চন্দ্রের এ ব্যবহার জানিতে পারিলে কি
বলিবেন?

বাড়ীর ভিতর-দিকের একটা
খুলিয়া যুবতী সেই দিকে পলাইয়া গেল।
আবার সেই বাড়ীর ভিতর হইতে হেম-
বাবুকে ইসারা করিয়া ডাকিতে লাগিল।
বর্জমানের মেরেদের রীতি-সম্বন্ধে নানারূপ
চিন্তা করিতে করিতে হেম-বাবু অগত্যা
বাড়ীর ভিতর গেলেন।

যুবতী আসন পাতিয়া দিল এবং এক-
জন পাচিকা হেম-বাবুকে কয়েকখানা
ফুল্কা লুচি ও আলুর দম আনিয়া দিল।
হেম-বাবু হাত ধুইয়া আহারে বসিলেন।
দেখিলেন, বর্জমানের মেরেদের ব্যবহার
যেমনই হউক না,—তাহাদের স্বক্ৰমটা বড়ই
উৎকৃষ্ট।

কিন্তু পাচিকা যেহেতু বেহারা! লুচি দিতেছে আর মুচুক মুচুকে হাসিতেছে,—হেম-বাবু পাড়গেঁয়ে লোক, তাঁহার খাইবার রকম-সকম দেখিয়া বেহাে দুইটি হাসিতেছে!

আহার প্রায় শেষ হইল, পাচিকা অন্ন আনিয়া দিল। হেম-বাবু কচি আঁবের অন্ন একটু চাকিয়া দেখিলেন,—আবার চাকিয়া দেখিলেন,—অবগুণ্ঠনবতী পাচিকার মুখের দিকে চাহিলেন,—সহসা বামহস্ত দিয়া পাচিকার হাত ধরিলেন।

এ কি! হেম-বাবু নিতান্ত ভদ্রলোক, পরের বাড়ীর রাঁধুণীর হাত ধরা কি রকম! পাচিকা “ছি” “ছি” বলিয়া হাত টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল, হেম হাসিয়া বলিলেন, “আর লুকাইলে হইবে না, এই কচি আঁবের অন্ন খাইয়া চিনিরাছি, এ তালপুকুরের রাসা বিন্দু, তুমি কবে আসিলে, কি প্রকারে বর্দ্ধমানে আসিলে!”

বিন্দু তখন ঘোমটা খুলিয়া হাসিতে হাসিতে স্বামীর পার্শ্বে বসিলেন। বলিলেন, “বোগমায়ী সনাতনবাটীর প্রাচীন দাসীকে লইয়া বর্দ্ধমানে আসিয়াছেন, আমিও তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছি।”

হেম। বোগমায়ী এই বাটীতে আছেন? দাসী এ বাটীতে আছে?

বিন্দু। তাহারা দুই জনই এখানে আছে। যোক্তার মহাশয়ের গৃহিণী আমাদের অনেক বস্তু করিয়া এখানে রাখিয়াছেন। তাঁহার লোক বড় ভাল।

হেম। লোক ভাল হইতে পারেন, কিন্তু বাড়ীর মেয়েদের আচার-ব্যবহার একটু বেহারা! যে মেয়েটি আমাকে বাহির হইতে ডেকে আনিল, তাহার রকম বেশ কেমন কেমন!

বিন্দু। না গো না, সে মেয়েটির রকম চরিত্র খুব ভাল, তবে ছেলেবেলা থেকে একটু দারাল। ঐ যে সে আবার আসছে।

পূর্বোক্ত খুবভী একটি দাসী পাখরবাটি করিয়া চিনিপাতা দই আনিয়া বিল এবং হেবচন্দ্রের পাতে দুইটা সন্দেশ দিল।

চিনিপাতা দই দেখিয়াই হেম-বাবু মনে সন্দেহ হইল, আশ্বাসন করিয়া হাসিয়া খুবতীকে বলিলেন, “বুঝি, আর ঘোমটার কাজ কি? ঘোমটাটি খোল। এই চিনিপাতা দই দিইয়াই ধরা পড়েছে।”

হেম-বাবু মুখা তখন অভিমান ভাণ করিয়া বলিলেন,—“না গো না, ঘোমটা খুলিতে ভয় করে। ঘোমটা দিয়াই ‘বেহারা’ হইলাম, না জানি, ঘোমটা খুলিলে কি হইবে?”

হেমচন্দ্র অপ্রতিভ হইলেন, অনেক মিনতি দ্বারা স্বেচ্ছাসিনীর মান ভাঙ্গিলেন।

শরৎ ও সুধার কথা জিজ্ঞাসা করাতো বিন্দু তখন বলিলেন, “আমি বর্দ্ধমানে আসিয়া শুনিলাম যে, যোক্তা মহাশয় হইতে দুই তিন দিন দেরী আছে। আরও শুনিলাম যে, মৈমনসিংহ হইতে এখানে দুই দিনে আসা যায়। সরস্বতী ঠাকুরের এ বিপজির সময় শরৎ-বাবু আসিলে সাহেবদের বলিয়া কহিয়া হয় ত কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিবেন, এইরূপ সাত পাচ ভাবিয়া আমি শরৎকে টেলিগ্রাম পাঠাইলাম। শরৎ টেলিগ্রাম পাইয়া অনেক জেদ করিয়া কর্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট দশ দিন মাত্রের ছুটি লইয়া সুধার সহিত বর্দ্ধমানে আসিয়াছেন।”

এই সমস্ত শুনিয়া হেমচন্দ্র তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “এমন বুদ্ধিমত্তা উকাল তালপুকুরে আছে আদিলে সরস্বতী ঠাকুর আমাকে বোধ হয়, কলিকাতার উকাল

আলোকে পাইবাইতেন না। সরস্বতী তাঁকে
বলে, 'তাঁর কখন?'

বিন্দু বলিলেন, "আমের দিন আমি।"

হেম-বাবু নিশ্চিত হইয়া জিজ্ঞাসা করি-
লেন, "যে কি? তোমাকে কে বলিল?
ত্রিংশৎ বৎসর পর রমণী-বাবুকে গ্রামের
কে চিনিল?"

বিন্দু হাসিয়া বলিলেন, "পুরুষমানুষে
কেহ চিনে নাই, পুরুষমানুষে আপনার
লোককে তুলে,—যেয়েমানুষ তাহা তুলে
না। এই যে আমি ঘোমটা দিয়াছিলাম,
আর ভূমি আমাকে চিনিতে পারিলে না!
পুরুষের খাবার দিকেই মন, স্বামীকে তুলিয়া
আঁবের অন্নটা চিনিলে। যেয়েমানুষ ত
ভেমন নয়, ত্রিংশৎ বৎসর পরও বোগমারা-
দিদি রমণী-বাবুকে দেখিয়াই চিনিয়া-
ছিলেন। নারী কি স্বামীকে কখনও ভুলিতে
পারে?"

দুধাধাসিনী ধোকাকে কোঁলে করিয়া
হেম-বাবুর পার্শ্বে বসিলেন, "তিনিও যে
পাইয়া আবার একটু ঘোঁটা দিয়া বলিলেন,
"দ্বিদি, বোগমারা-দিদি রমণী-বাবুকে চিনিয়া-
ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেন, তাঁহার
খাবার প্রস্তুত করিয়া দিতেন, তাহাতে রমণী-
বাবু বোগমারা-দিকে 'ঘেহারা' মনে
করেন নিত?"

হেম-বাবু আজ দুই ভগিনীর কাছে
পরাস্ত হইলেন, দুই ভগ্নী একত্র হইলে
তাঁহাদের সহিত কথা পারিয়া উঠা ভার।
কথার কোন উত্তর না দিয়া বুদ্ধিমানের মত
কিছু আঁবের অন্নটুকু আর চিনিপাতা দই-
টুকু সমস্ত শেষ করিলেন।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বোগমারার দড়িহার।

বোগমারার দশ বৎসর বয়স্কবয়স্ক সময়
সনাতনবাটীর জমীদার-গৃহে রমণী-বাবুর
সহিত বড় দুধামের সহিত বিবাহ হয়।
চতুর্দশ বৎসর বয়সের সময় হতভাগিনী
স্বামীকে হারায়। চতুর্দশ বৎসরের বড়
স্বামীকে চিনিয়াছিল, স্বামীকে ভালবাসিতে
শিখিয়াছিল, স্বামীর দেবতুল্য মুখছবি হৃদয়ে
ধারণ করিতে শিখিয়াছিল। যৌবনের
প্রারম্ভে বোগমারা পতিকে হারাইলেন,—
তাহার পর সপ্তবিংশ বৎসর পর্য্যন্ত কেবল-
মাত্র পতির সেই দেবতুল্য মুখছবি হৃদয়ে
ধারণ করিয়া শোকে, কষ্টে, পরের অত্যাচার
ও অবমাননা সহ করিয়া পতিপ্রাণা নারী
প্রাণধারণ করিয়াছিলেন। যে বৎসরে তাল-
পুত্রে বিন্দুর জন্ম হয়, সেই বৎসরই সনাতন-
বাটী হইতে রমণী-বাবু দেশত্যাগী হন,
হুতরাং বিন্দু অপেক্ষা বোগমারা চতুর্দশ
বৎসরের বড়।

যে দিন সন্ধ্যার সময় রমণীকান্ত জটা-
ধারী-বেশে পুনরায় জমীদার-গৃহে আশ্রয়
লাইলেন, শান্তহৃদয় দুঃখিনী বোগমারা সন্ধ্যা-
সীম ঘরে একটু জল ছিটাইয়া কাঁট দিয়া
গেলেন। রাত্রিতে যখন সন্ধ্যাসী দীপ
জ্বালিয়া একাকী বসিয়া উন্নতভাবে ধর্মশাস্ত্র
পাঠ করিতে বসিলেন, দুঃখিনী সে ধর্মশাস্ত্রে
আকৃষ্ট হইয়া পার্শ্বের ঘরে বসিয়া শুনিতে
লাগিলেন এবং এক একবার সেই পুণ্য দেব-
তুল্য মূর্তির দিকে দেখিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা-
সীর গভীরঘরে শাস্ত্রপাঠ শুনিয়া, সন্ধ্যাসীর
প্রশান্ত উজ্জল মূর্তি দেখিয়া বোগমারার ছেলে
বেলাকার কথা এক একবার মনে পড়িতে

লাগিল,—কেন, যোগমারী আনেন না।
 পাঁচ ছই প্রহর সন্ধ্যাসী বীপ নির্ঝা-
 রিগ, বন কল, যোগমারী পূর্বস্থিতি
 দিয়া ব্যাকুল ওত হইয়া বিধবার নিরা-
 শ শবার ব্যাকুল করিলেন। নিদ্রা
 ছিল না, বার কালাকালের কথা মনে
 আসিতে লাগিল বার বৌবনের হৃদয়ে-
 য়কে মনে পড়িলাগিল, বার বার সেই
 সব-বেধবোর বেধনা সপ্তবিংশ বৎসর
 পর বিধবার আবার মন্বন করিতে
 লাগিল। বস মুখ ঢাকিয়া নীরবে
 কাঁদিয়া অভা নিদ্রা যাইল। নিদ্রা স্বপ্ন-
 পূর্ব, বোধ হইল, ছাদের উপর হইতে
 শাহার যৌবমায়ী, সেই তেজঃপূর্ণ রমণী-
 কান্ত উন্নতহাত গাইতেছেন। চমকিত
 হইয়া হতভী উঠিল, প্রাতঃকাল হই-
 রাছে, সূর্য্যাপি বৃক, তড়াগ ও শস্তক্ষেত্র
 রঞ্জিত হই; আর সেই সূর্য্যালোকে
 দণ্ডায়মান হউরতস্থরে সরস্বতী ঠাকুর
 বেদগান করছেন।

তাহার ষ—তাহার পর দিন দিন
 যখন সন্ধ্যার ঝাঁট দিতে আসিতেন,
 প্রাতঃকাল অপরাহ্নে কলমলাদি লইয়া
 আসিতেন, তার সময় প্রদীপ জালিয়া
 আনিতেন, যোগমারীর শান্ত হৃদয় উজ্জ্বল
 হইত, যোগীর শান্ত চিত্ত অশেষ চিন্তা-
 তরঙ্গে আহুত! আর যখন সরস্বতী
 ঠাকুর একালে উন্নতস্থরে শিষ্য-
 দিগের উপনিষৎ পাঠ করিতেন
 অথবা নিশি পর্য্যন্ত একাকী
 নীপালোকে সঙ্গীতপূর্ণস্থরে মহাভারত
 বা পুরাণ করিতেন,—যোগমারী
 নিশ্চেষ্ট সেই পাঠকের দিকে চাহিয়া
 থাকিতেন তত্প্রসূ হইয়া সেই অমৃত-
 বচন শ্রবণ করিত। তাহার জীবন আনন্দ-

পূর্ণ হইত, হৃদয় শান্তিপূর্ণ হইত। পাঠ-
 শেষ হইলে হতভাগিনী নীপনিধান করণ
 করিয়া, সেই যোগিবরের দিকে চাহিয়া
 চাহিয়া, শূন্যহৃদয়ে নিজ আবাসে ফিরিয়া
 যাইতেন। এ কি যৌবনের উদ্বেগ?—
 যোগমারীর যৌবন ত অনেক দিন পার
 হইয়া গিয়াছে। এ কি নুভন প্রেরণের
 উদ্বেগ? যোগমারীর হৃদয় ত প্রেরণের
 আকাজ্ঞা অনেক দিন তুলিয়াছে। তথাপি
 সন্ধ্যাসীর সেই প্রশান্ত মুখমণ্ডলের দিকে
 দেখিলেই যোগমারীর বেন পূর্বস্থিতি উদয়
 হইত, হৃদয় বিলোড়িত হইত, মন নানাকরূপ
 চিন্তা বা কল্পনা বা স্বপ্নে ভাসিয়া বাইত।

বে দিন সরস্বতী ঠাকুর আপন জীবন-
 ইতিহাস হেমচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্রকে বলেন,
 সে দিন যোগমারীর হৃদয় নানাকরূপ চিন্তার
 একেবারে ব্যাকুল ও বিপর্য্যস্ত হইল। সর-
 স্বতী ঠাকুর বনীর সন্তান ছিলেন, সরস্বতী
 ঠাকুর অষ্টাদশ বৎসর বয়সে একটি সন্ধ্যা
 পড়িয়া সর্ব্বস্ব হারাইয়াছেন, সরস্বতী ঠাকুর
 পশ্চিম হইতে পুনরায় সনাতনবাণীতে
 ফিরিয়া আসিয়াছেন। সরস্বতী ঠাকুর কি—?
 বিধাতা, ব্রহ্মা করুন। আমি বেন বুধা লোভে
 লুভ না হই, আমি বেন পাগমোহে হুভ না
 নই, আমি বেন পাগলিনী না হই।

কয়েকদিন ধরিয়া যোগমারী ব্যাকুলচিত্ত
 হইয়া রহিলেন, পূর্বস্থিতি ও নব-অপরিস্কৃত
 আশাতে সে শুভ হৃদয় উজলিতে লাগিল।
 পরে বে দিন সরস্বতী ঠাকুর যোগমারীর
 নিকট যোগমারীর স্বামীর কথা ও
 সম্পত্তির কথা উত্থাপন করেন ও কামিনী-
 কান্তের গৃহস্থীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া
 রমণীকান্তের কথা উত্থাপন করেন, তখন
 যোগমারীর মনে আর সন্দেহ রহিল না।
 ইচ্ছা হইল, তৎক্ষণাৎ স্বামীর চরণে আশ্রয়

বাইরা পড়িয়া তখনই সে প্রিয় চরণ দুইটি জড়াইয়া ধরেন। কিন্তু স্বামী কি তাহাতে সন্তুষ্ট হইবেন? স্বামী কি তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন? স্বামী ত এত দিন অবধি তাঁহাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিলেন না, সে বিষয়ে পরিচরও দিলেন না, স্ত্রীর কি সে পরিচর প্রথমে দেওয়া ভাল? নানা চিন্তার অভিভূত হইয়া যোগমায়ী সে দিন রাজে জল গ্রহণ না করিয়া শুইলেন।

রাজে ঘুম হইল না। নানা কথা মনে উদয় হইতে লাগিল, সন্ন্যাসীর অবয়ব, সন্ন্যাসীর বেদপাঠ, সন্ন্যাসীর খুলিটি মনে পড়িতে লাগিল, সন্ন্যাসীর খুলির ভিতর একটি ছোট বাক্স আছে, তাহা মনে পড়িতে লাগিল। বাক্সের চাবিটি বালিসের নীচে রাখিয়া সন্ন্যাসী নিজা বান, তাহা যোগমায়ী দেখিয়াছেন। মনে হইল, বাক্সে কি আছে? বাক্সটি একবার খুলিয়া দেখিব? তাঁহার দ্বন্দ্ব আমি খুলিব, ইহাতে কি দোষ আছে?

দ্বিপ্রহর রাত্রির সময় দীপ হস্তে করিয়া যোগমায়ী সন্ন্যাসীর ঘরে বাইলেন, বালিসের নীচে হইতে আঙুলে আঙুলে চাবিটি বাহির করিলেন, বাক্সটি খুলিলেন। বাহা দেখিলেন, যোগমায়ীর চক্ষু দিয়া বহু বহু করিয়া জল পড়িতে লাগিল। রমণীকান্ত বিবাহের পর মাতার একগাছি দড়াহাড় বধুকে দিয়াছিলেন, যোগমায়ী স্বামীর প্রথম উপহারটি জুদরে করিয়া লইয়াছিলেন। কাহারও কাছে রাখিতে বিবাল হয় না বলিয়া স্বামীর কাছে সে ধন গচ্ছিত রাখিয়া ছিলেন, আজ সপ্তবিংশ বৎসর পর সেই গচ্ছিত ধনটি স্বামীর বাক্সে দেখিলেন। ইতিমধ্যে রমণী-বাবু আহত হইয়া দেশত্যাগী হইয়াছেন, বেশে বিশেষে ভিক্ষা করিয়া বাইরা

যোগমায়ীর হারটি হস্ত করেন নাই যোগমায়ীর গচ্ছিত ধন কসান করেন নাই। “প্রভু! তুমি বর্ষণ, তাই অন্নাগিনীর গচ্ছিত ধনটি বহু দূর রাখিয়াছ। আর একটি ধনও তোমার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম,—সেটি বহুদিন প্রথম ভালবাসা! যে দিন সমুদ্র হইবে, যে দিন তুমি অনুমতি দিবে, সে সে ধনটিও দাবী করিব।” সমস্ত রাত্রি হারটি বৃকে করিয়া যোগমায়ী সেই বসিয়া কাঁদিলেন; পরে হার পুনরায় বাখিরা, চাবি বালিসের নীচে রাখিয়া, আ কক্ষে শয়ন করিতে গেলেন।

রমাপ্রসাদ বা রমণীকান্ত ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিলেন, তাঁহার পরিারণা হতাশাগিনী স্ত্রী জুদরের দ্বারা ভুলে, —সন্ন্যাসীর বেশে বা জটাভারে পাতা রমণীর চক্ষু প্রতারিত হয় না,—যোগমায়ীর নিকট আর গোপন থাকিবার চেষ্টা নাই মাত্র। সুতরাং একদিন সন্ধ্যার সময় যোগমায়ীকে গোপনে সমস্ত কথা বলিলেন, বিংশ বৎসর পর যৌবনের প্রণয়িনীকে যেরূপে ধারিয়া অশ্রুবর্ষণ করিলেন, সবেমাত্র যোগমায়ীর অশ্রু-মোচন করিয়া সেই শুষ্ক গুঠেন করিলেন; পরে অতিশয় গম্ভীর হইলেন, “যোগমায়ী! ভগবানের প্রসাদে আমরা এক দিন পরম্পরের মনের খুলিয়া বলিব, বহু বৎসর পর যৌবন-রস কথা শ্রবণ করিব,—এখন এই পর্য্যন্ত দ্বন্দ্ব দিন আমি নিজ নামে প্রকাশ না হস্ত দিন আমি সন্ন্যাসী মাত্র, তুমি জর-গৃহের বিধবা। ইতিমধ্যে লোকে আমাদের জানিতে পারিলে আমাদের এই সংসার আছে,—কামিনীকান্ত-বাবুকে খোঁজা, সাধনা!”

রিলেন। মিনী-বাবুর সহিত বিবাহ-
বিবাদ নিশ্চ করিতে অধিক বিলম্ব হইল
।। কামিনী-বাবুর উকীলগণই বিবাকচূর
মোকদ্দমা সা কামিনী-বাবুরকে বধেই ভৎ-
সনা করিয়াগেলেন, “আপনি যদি এ
রমণী-বাবুর জমীদারী অংশ নিষিদ্ধ করি-
না ছাড়িয়া এবং রমণী-বাবুর নিকট
কম্য প্রার্থনরূপা তাঁহার সহিত আলাপ
না করেন, আমাদের সহিত আপনাদের
সম্বন্ধ এইখানায় হইল। আপনাদের মোক-
দ্দমা স্পর্শ না কর্তব্যমানের উকীলগণ যেরূপ
কলঙ্কিত হচ্ছে, এরূপ কলঙ্কের ভার
আমাদের বঁ কখনও বহন করিতে হয়
নাই।” কামিনী-বাবু মহাবিক্রমশালী জমী-
দার, কিন্তু মহাবিপদে পড়িয়াছেন।
সুচতুর সুমারু তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া-
ছেন, বর্জমা উকীলগণ তাঁহাকে ভৎসনা
করিতেছেন। কামিনী-বাবু ইচ্ছা করিলে তাঁহার
বিরুদ্ধে পুরোহিত্যমীর মোকদ্দমা স্থাপন
করিতে পা। রোবে গর্জন করিয়া
কামিনী-ব্রহ্মগত্যা ভ্রাতার সমস্ত অংশ
ছাড়িয়া দি। জিৎসংসার-দ্বন্দ্বের কলি-
কাতার একটি বৃহৎ “জাতিসংরক্ষণ
সমাজ” স্থাপন করিলেন এবং হৃদয়ের শান্তি-
লাভের জরুরি বাইনাট দিবার প্রস্তাব
করিলেন। বোম্বেতে স্থানীয়কে পুনরায়
ডাকাইয়া ইলেন।

রমণী-বাবুর দ্বিতীয় কার্য্য,—তারিণী-
বাবুর বিবাহ-সমিতি স্থাপন করা। তারিণী-
বাবু শেষের দ্বারা সমস্ত সম্পত্তি বিন্দু
ও সুধাকে। গিয়াছেন, কিন্তু তারিণী-
বাবুর বিবাহ-সমিতি করিয়া সে বিবাহ
গ্রহণ করি। সমস্ত ও শরচ্চন্দ্র অস্বীকার
করিলেন। সমস্ত বলিলেন, “বিবাহ সম-
স্তই বাণ্ডুয়াই গ্রহণ করুন, ও বিবাহ

আমরা স্পর্শ করিব না।” রমণী-বাবু তর
করিলেন, “গোপবালা প্রথম যৌবনে বিবাহ
করাছেন, তাঁহাকে দেখিবার সুবিধা
লোক নাই, অনেকগুলি টাকা হাতে
দিয়া তাঁহাকে শীঘ্র পাণের পথে প্রেরণ
করাই কি তোমাদের ইচ্ছা?” অনেক ভর্ক-
বিতর্কের পর স্থির হইল যে, হেম ও শরৎ
সে বিবাহ দখল করিবেন এবং বিবাহের লাভ
কড়াকড়ি পর্য্যন্ত গণিয়া। কিন্তু কিছু
গোপবালার নিকট প্রেরণ করিবেন। বোর
অভিমানিনী গোপবালা রোবে গর্জন করি-
লেন, আবার বিন্দু ও সুধার নিকট ভিক্ষা
গ্রহণ করিতে হইল, এই অভিমানে ক্রন্দন
করিলেন। তিনি বিন্দু ও সুধার সহিত দেখা
করিলেন না, তালপুতুর গ্রামে মুখ দেখাইলেন
না, গোতুলচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া বিবাহ-
উদ্ধারের পরামর্শ করিবার জন্ত কলিকাতার
চলিয়া গেলেন। কয়েক দিন পর গোতুলচন্দ্র
বার্ষিক্যবস্ত্র হইয়া ফিরিয়া আসিল, গোপ-
বালার আর কোন খবর পাওয়া গেল না।
বিন্দুকে লোকে বলিত, গোপবালা পরামর্শ
গ্রহণ জন্ত সুমতি-বাবুর বাটীতে সর্বদা
যাতায়াত করিতেন।

রমণী-বাবুর তৃতীয় কার্য্য,—পুত্রের
বিবাহ স্থির করা। অনেক দিন পরে রমণী-
বাবু হেমচন্দ্রের নিকট আপন জীবন-ইতি-
হাস ব্যাখ্যা করিবার সময় ভিন্ন জাতির
মধ্যে বিবাহ বিধের কি না, সে বিবাহে হেম-
বাবুর মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হেম-
বাবু এখন সে প্রশ্নের উত্তর বুঝিলেন। তিনি
সানন্দে অঙ্গপূর্ণলোচনে যুবা দেবীপ্রসাদের
সহিত স্থানীয় যাতার বিবাহ দিতে সম্মত
হইলেন। স্থানীয় মাসী স্থানীয়কে বিন্দু
করিয়া বলিলেন, “দোখল বাছা, বড় বড়
বো হুঁজে যেন আমাদের ভুলে যাস নি।”

ব্রাহ্মণ-পুত্রের সহিত কারহ-কন্ডার
বিবাহ হইবে ভাবিয়া বহুদিনেই হুলস্থূল পড়িয়া
গেল। কিন্তু হেমচন্দ্র ও রমণীকান্ত কার্যো
ব্রতী হইয়া লোকনিলা বা লোকতরে
হার লোক নহেন। বিবাহের দিন
হইল, বর্জ্বান্নেই বিবাহের পত্র হইয়া গেল,
তালপুতুর গ্রামে মহাসমারোহে বিবাহ হইবে
হির হইল।

শরচ্ছত্র মৈমনসিংহে করিয়া গেলেন,
কিন্তু স্থখ বিবাহ না দেখিয়া যাইবেন না
বলিয়া ক লইয়া হেম ও বিষ্ণুর
সহিত তালপুতুরে আসিলেন। এমিকে
রমণীকান্ত ও যোগমারা মহাসমারোহে সনা-
তনবাটীতে আসিয়া আগুনদাগের জমীদারী
কেন্দ্র করিয়া বসিলেন। সনাতনবাটীতে হল-
স্থূল পড়িয়া গেল; হাটে বাজারে আজ
নতুন জমীদারের কথা ভিন্ন অন্য কথা নাই,
পুতুর-ঘাটে মেরে-মহলে আজ যোগমারার
কথা ভিন্ন অন্য কথা নাই। ফুলকুমারী কলসী
গাকে করিয়া হাটে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগি-
লেন, “ওলো, মিন্বে যোগীও নয়, সন্ন্যাসীও
নয়, আমাদের তিন আনী জমীদার লো!
মাথার জটা কেলে দিবে ঠিক কেন ক্রান্তিক
ঠাকুরের মত রূপ হয়েছে। যোগমারা দিদির
খুব কপাল-জার!”

ফুলকুমারী হাতে মিসি দিতে দিতে
বলিলেন, “ও লো, কপাল-জোর মিন্বেয়!
কাল্যাণেড়ে কাপড় পরে, গারে গরনা দিবে
যোগমারা দিদির ক্রম রূপ ঘেরিয়েছে
কেথেনিস? ঠিক কেন মাঝা বোটি বর্জ্বান্ন
থেকে বারে এল!”

ফুলকুমারী আকৃত-মাথা রাখা চরণ
হইতে হইতে বলিলেন, “ও লো, যোগমারা
দিদি মাঝা বো হবে কেন? মাঝা বো যে
হয়ে আসছে।”

হেমকুমারী কলসী নাড়াইয়া
বিনিমিত নিবিড় ক্রুদ্ধ বেশ্যার
খুলিতে খুলিতে বলিলেন, “হা
নয় যে, রমণী-বাবুর
জ্বর হেম-বাবুর মেয়ের মত সখ
বাঁধা”

গরীবী স্বর্ণকুমারী তাবিজ-
বাঁধা হাত নাড়িয়া বলিলেন, “পোড়া-
কপালী! তাও কি হয় লো আমরা যে
বামুন লো, আমরা যে দেবী যে আমাদের
সঙ্গে কি করেতমের বিয়ে কথায়?”

রমণীকান্ত গ্রামে আসিয়া এর ইতর
ভক্ত সকলকে বক্ত, মিষ্টার ও নানা উপহার
বিতরণ করিলেন; যোগমারা জ্বর-গৃহের
বৌ, বি, প্রাচীনা, নবীনা, সব সম্মান
করিয়া বস্ত্র ও অলঙ্কার বিা করি-
লেন। গ্রামে নতুন জমীদারের জরকার
হইতে লাগিল, জমীদার-গৃহে জ্বর-বাটে
যোগমারার চরিত্র-সম্মালাচন কিছুদিন
স্থগিত রহিল। প্রাচীনাগণ র তসর-
গরদের কাপড় পরিয়া অহুগ্রহ বা বলি-
লেন, “না, বাছা যোগমারার জ্বর
আছে, আমাদের জ্বর একটু ও আছে,
তা ত চিরকালই বলেছি। ভবোলা মন্দ,
তাই একটা ইতরজাতির সতী বেরেছিল,
তারই ছেলেটাকে ক্রান্তের মত বিয়ে
হিছে; নিতান্ত ভাঙ্গা কপাল বলে কি
বামুনের মেরে বো হয়ে কাঁচর সঙ্গে
সখ্য করে?”

গ্রামের পণ্ডিতাভিমাত্রী শরণ দল
বহু হইয়া একদিন রমণী-বাবুর ট গিয়া
এরূপ গহিত সখ্য করিতে নিষেধিলেন
সমাজের আদেশ লইয়া শত্রু কা
করা ভাল, এইরূপ নানা তবিলেন
রমণী-বাবুর হা হা জিজ্ঞাসা রিলেন

